ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে ডক্টরেট (Ph.D) উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

গবেষক: সুমিত কান্তি ঘোষ

পি. এইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0101417

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ২৯/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক: ড. উৎসা রায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

Certificate

Certified that the Thesis entitled **ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Utsa Ray,** Assistant Professor, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Utsa Ray 10|10|23
Countersigned by the Supervisor

Dated

ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF HISTORY
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700 032

Sumit Kanti Ghosh 10/10/23
Signature of the Candidate

Dated

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানাজনের নানান আলোচনা, সমালোচনা, সাহায্য এই সন্দর্ভকে রূপ দিতে সাহায্য করেছে। এবার যথাসম্ভব তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। যাঁর বিশ্বাস, ধৈর্যশীল এবং বৌদ্ধিক সহযোগিতা আমাকে বিগত ছয় বছর ধরে এই সন্দর্ভের নানা দিক রূপ দিতে সাহায্য করেছে, এবং যিনি বারবার সন্দর্ভের মূল প্রশ্নটি স্মরণ করিয়ে আমাকে ট্র্যাকে থাকতে সাহায্য করেছেন, তিনি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. উৎসা রায়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতায় বাধিত। আমার গবেষণা উপদেষ্টা কমিটির (RAC) সদস্য ড. সমর্পিতা মিত্র এবং ড. ঈপ্সিতা হালদারের কাছে আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। তাঁরা প্রতি ছয় মাস অন্তর আমার রিসার্চ রিপোর্ট অনুপুঙ্খ পাঠ করেছেন, এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে এই গবেষণার সার্বিক মানোন্নয়নে সাহায্য করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ "সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা"র অধ্যাপক ড. রাজর্ষি ঘোষের কাছে। তাঁর দৌলতে আমি জ্ঞানতাত্ত্বিক নানান পরিসরের সাথে যুক্ত হয়ে চিন্তার রসদ পেয়েছি। "উইভারস স্টুডিও সেন্টার ফর দ্য আর্টস"এর কর্ণধার শ্রীমতি দর্শন মেকানি শাহ'র কাছে আমি কৃতজ্ঞ – তিনি তাঁর প্রাইভেট কালেকশনের দ্বার আমার জন্য সদা উন্মুক্ত রেখেছেন। "অক্সফোর্ড সেন্টার ফর হিন্দু স্টাডিস"এর অধ্যাপক ডেরমট কিলিংলেই-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রামমোহনের চরিত্রের পোশাকি দিক সম্বন্ধে তিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছেন। অধ্যাপক সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। তিনি তাঁর পারিবারিক চিঠিপত্র, পোস্ট কার্ড দিয়ে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বই-পত্রের খোঁজ দিয়ে এই গবেষণার মানোন্নয়ন করেছেন।

গবেষণার প্রথম দুই বছরে মহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজ দেখতে সাহায্য করা থেকে নানান তথ্য-উপাত্তের সন্ধান দিয়ে, এই সন্দর্ভের রূপায়নে সাহায্য করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অভিলেখ্যাগারের অভিলেখ্যাগারিক শ্রীমতি বিদিশা চক্রবর্তী, শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দে এবং শ্রীমতি ঝুমুর সেনগুপ্ত। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নয়াদিল্লির জাতীয় অভিলেখ্যাগারের রিডিং রুমের কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা যতটা সম্ভব ফাইল-পত্র জোগান দিয়ে আমার দুইবারের দিল্লি যাত্রাকে ফলপ্রদ করেছেন। "সেন্টার ফর স্টাডিস ইন স্যোশাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটার"র অভিলেখ্যাগারিক শ্রীমতি কমলিকা মুখার্জীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি বিভিন্ন তথ্য, ছবির হদিস দিয়ে এই সন্দর্ভকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেখানকার পাঠ-পরিবেশ এবং প্রতিটি বই, পত্র-পত্রিকা খুঁজে আনতে কর্মীদের যত্ন, আমার কাজের উদ্যম বহুগুণ বাড়িয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের সংশ্লিষ্ট কর্মী, আশুতোষ কালেকশন, বিশেষত মাইক্রো-ফিল্ম বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। "সেন্টার ফর স্টাডিস ইন স্যোশাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা'র গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লাইব্রেরি ও ডক্যুমেন্টেশন বিভাগে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সেখানকার অধ্যক্ষ ড. জয়ন্ত সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই। "রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক"এর রিডিং রুমের সকল কর্মীদের ধন্যবাদ

জানাই। ইতিহাস বিভাগের (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সাবেক গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি বনানী দে'র প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। জয়শ্রী দিদি'কেও অনেক ধন্যবাদ। সেন্ট্রাল লাইব্রেরির (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সাময়িকপত্র বিভাগের কর্মীদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক প্রশান্ত রায়, ড. আকবর হোসেন, ড. ভিভিয়েনে রিচমণ্ড, ড. অনুরাধা চ্যাটার্জী, ড. ক্যাথরিন হার্পার প্রমুখ সম্পাদকেরা এই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা-পত্র নিয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন। অজ্ঞাতনামা পর্যালোচকদের তোলা নানান প্রশ্ন চিন্তায় খোরাক জুগিয়েছে। যা এই সন্দর্ভকে সর্বোতভাবে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপ সেকশনের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তাঁরা সময়মতো অর্থের জোগান দিয়ে গবেষণার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আই.সি.এস.এস.আর. পূর্বাঞ্চলীয় শাখার শ্রী নরেন্দ্রনাথ টিকাদার এবং চিরঞ্জিত সিনহা-কে। তাঁরা দিল্লির জাতীয় অভিলেখ্যাগার যাওয়ার জন্য স্টাডি গ্রান্ট পেতে সর্বত সাহায্য করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের আমার সকল শিক্ষক – ড. তিলোত্তমা মুখার্জী, অধ্যাপক অনুরাধা রায়, অধ্যাপক নুপুর দাশগুপ্ত, ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, অধ্যাপক মেরুণা মুর্মু, অধ্যাপক মহুয়া সরকার, ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী, অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণ, শ্রী সমীর দাস, অধ্যাপক কৌশিক রায়, ড. দেবজিৎ দত্ত – সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিভাগীয় জীবনে তাঁদের কাছ থেকে নানা সময় ইতিহাসের নানা পাঠ পেয়েছি। আমার শৈশব, কৈশোরের সকল শিক্ষকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ, তাঁদের সকলের সদগুণ আমাকে একনিষ্ঠ হতে উদ্যম দেয়।

এ যাত্রায় যাদের স্নেহ, সঙ্গ, সাহচর্য, বন্ধুত্ব আমাকে সমৃদ্ধ করেছে, এবং যাদের সাথে গল্প-গুজব আমাকে নির্ভার করেছে, তারা আমার ভ্রাতৃ ও ভগ্নী প্রতিম – দেবজয় চন্দ, আত্রেয়ী লাহিড়ী, সৈয়দ সরফরাজ আজম, অরুনাংশ মাইতি, তপোবন ভট্টাচার্য, কাবেরী মণ্ডল, ফারহিন তাবাসুম। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে যাদের বন্ধুত্ব আমাকে বিশ্বাস ও ভরসা জুগিয়েছে, তারা – আমন মালিক, উমি লেপচা, সোমেন দত্ত। এদের সকলকেই পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

আমার দিদা, আমার অকৃত্রিম বন্ধু সশরীরে থাকলে খুশি হতেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। মায়ের স্নেহ, যত্ন, আশ্রয়, প্রশ্রয়, ভরসা আমাকে কঠিন সময় পার হতে শক্তি দেয়। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। বাবাকে তাঁর স্নেহ-সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ। দাদা-দিদিকে ধন্যবাদ শৈশবের সুখস্মৃতিগুলির জন্য। আর আমার চার-পেয়ে বন্ধু পোপো যদিও এই কৃতজ্ঞতা-ধন্যবাদের জগতের উর্দ্ধে, তার উপস্থিতি এই ছয় বছরের একঘেঁয়ে যাত্রায় নিত্য আনন্দের জোগান দিয়েছে। আমি তার প্রতি দায়বদ্ধ।

উৎসর্গ

দিদা – জ্যোৎস্নাময়ী মহাজন'এর স্মৃতিতে

সূচিপত্র

ভূমিকা

1-39

প্রথম অধ্যায়।। ঔপনিবেশিক বাংলায় পোশাকি রুচির পরিবর্তন: বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয় ও বিলিতি উদ্যোগের সাপেক্ষে

40-88

দ্বিতীয় অধ্যায়।। শরীর, পোশাক, এবং ক্ষমতা: ঔপনিবেশিক কলিকাতায় বিলিতি পোশাকি রুচি ও রাজনীতি

89-153

তৃতীয় অধ্যায়।। শরীর, পোশাক, এবং রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরে পুরুষ ও তার সামাজিক পরিসরের পোশাকি নির্মিতি

154-256

চতুর্থ অধ্যায়।। শরীর, পোশাক ও লজ্জা: মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের পোশাকি নির্মিতি

257-316

পঞ্চম অধ্যায়।। শরীর, পোশাক ও রাষ্ট্র: পোশাকি স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার নির্মাণ

317-385

উপসংহার

386-389

উপাদান

390-425

চিত্র-সূচী

১.১ এমিলি ইডেন অঙ্কিত হিন্দু কলেজের ছাত্র, পৃ 22

২.১ বাঙালি পুরুষের পোশাকি বিবর্তন, পৃ 41

২.২ ফুলেল chintz পরিহিত Madam de Pompadour, পৃ 53

২.৩ ১৭০০-১৭৫০-সালে পাশ্চাত্য বাজারের জন্য তৈরি ভারতের "বেনিয়ান", পৃ 53

২.৪ করোমণ্ডল উপকূলে তৈরি ইউরোপীয় রুচির পোশাক, পৃ 54

২.৫ দমদমে নতুন প্রজাতির কটন চাষের প্রাথমিক উদ্যোগ বিষয়ক পত্র, পৃ 70

২.৬ র‍্যালী ব্রাদার্স ও ফিনলে মুইর এণ্ড কোম্পানির টেক্সটাইল লেবেল, পৃ 81

৩.১ জাহাজ থেকে অবতরণ করা সাহেবদের নিয়ে দর-কষাকষিতে ব্যস্ত 'ল্যাণ্ড-সার্করা', পৃ 91

৩.২ জেনারেল ক্যাপ্সিকাম রোটেনবিম ক্যাসেল জাহাজে উঠতে যাচ্ছেন, পৃ 97

৩.৩ বিল স্মিথ অঙ্কিত কলিকাতার ঔপনিবেশিক গুরুত্ব চিহ্নিতকারী সাউথ পার্ক কবরস্থানের একটি সৌধ, পৃ 98

৩.৪ ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সাথে স্যার ইম্পে ও তাঁর পরিবার, পৃ 102

৩.৫ কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো, পৃ 105

৩.৬ সাহেবি গার্হ্যস্থের একজন হিন্দু চাকর, পৃ 115

৩.৭ সাহেবি গার্হ্যস্থের একজন মুসলিম চাকর, পৃ 115

৩.৮ ব্রিটেন থেকে ভারতে আসার সময় কি কি পোশাক আনতে হবে, তার দিকে নির্দেশ করা একটি ফর্দ, পৃ 123

৩.৯ ফ্রান্সের পোশাকি সংস্কৃতি প্রভাবিত মধ্যযুগীয় ইউরোপে রাজপুরুষদের পোশাক, পৃ 124

৩.১০ J. Parker অঙ্কিত *Charles II and Sir William Temple* এবং The Record of Fashion-এ প্রকাশিত ইংরেজি কেরাণিদের পোশাকি দেহ, পৃ 126

৩.১১ James Gillary-অঙ্কিত “Dun-Shaw”, পৃ 129

৩.১২ ১৭৮৫ সালে মন্তে দে কারমো’স কার্গো-তে করে আসা পণ্যাদির বিজ্ঞাপন, পৃ 145

৩.১৩ ১৭৮৪ সালে ফুল্টন অ্যান্ড পোলক পণ্যাগারের পক্ষ থেকে দেওয়া পণ্যাদির বিজ্ঞাপন, পৃ 147

৪.১ Whiteaway Laidlaw, Calcutta-য় পোশাক অর্ডার দেওয়ার পোস্টকার্ড, পৃ 182

৪.২ Whiteaway Laidlaw, Calcutta-র ক্যাটালগের একটি পৃষ্ঠা, পৃ 183

৪.৩ পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচারে সজ্জিত বাচ্চারা, পৃ 185

৪.৪ বাচ্চাদের মিশ্র-রুচির পোশাক, পৃ 185

৪.৫ ঔপনিবেশিক প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক, পৃ 193

৪.৬ পাঁচমিশেলি পোশাক, পৃ 197

৪.৭ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত “প্রণাম বিভ্রাট”, পৃ 221

৪.৮ সাহেব ও তাঁর সরকার, পৃ 224

৪.৯ বাবু ও তাঁর পরিবার, পৃ 232

৪.১০ মিশ্র-রুচির পোশাক, পৃ 236

৪.১১ বিলিতি পোশাকের দিশি বিজ্ঞাপন, পৃ 236

৪.১২ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্যারিস ও লণ্ডন ফ্যাশনের বিজ্ঞাপনী কভার, পৃ 240

৪.১৩ পুজোয় জ্যাকেটের নতুন ডিজাইন, পৃ 251

৪.১৪ কে এইচ দে এণ্ড কোম্পানির পুজোর বিজ্ঞাপন, পৃ 251

৪.১৫ কার্টুনে দুর্গা, পৃ 254

৫.১ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র “সর্বাঙ্গের অশ্রুপাত”, পৃ 263

৫.২ পোশাকি সম্ভ্রমের নবরূপ, পৃ 267

৫.৩ শশধর রায়-কে লেখা ইন্দুভূষণের চিঠির একটি অংশ, পৃ 278

৫.৪ দেশি পোশাকের বিলিতি সংস্করণ, পৃ 283

৫.৫ মধ্যবিত্ত পুরুষের মান্য পোশাকি অবয়ব, পৃ 288

৫.৬ সময়ের আধুনিক অনুশাসন যন্ত্র – পকেট-ঘড়ি, পৃ 288

৫.৭ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র “রূপান্তর”, পৃ 294

৫.৮ ভিক্টোরীয় ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী, পৃ 303

৬.১ স্বদেশি বিজ্ঞাপন, পৃ 329

৬.২ স্বদেশি বিজ্ঞাপন, পৃ 329

৬.৩ ধুতির পাড়ে ফুটিয়ে তোলা কাব্য, পৃ 340

৬.৪ স্বদেশি লিথোগ্রাফে হিন্দু-পুরাণ – পাশ্চাত্য ভোগবাদের অতীব বিস্তারে কুপিত শিব, পৃ 348

৬.৫ মুসলিম অভিজাত, পৃ 355

৬.৬ মুসলিম সাধারণ, পৃ 355

৬.৭ মাদ্রাজ গভর্নরের মুসলিম প্রীতিকে ব্যঙ্গ করে আঁকা ছবি, পৃ 372

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে ডক্টরেট (Ph.D) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের **সারাংশ**

সুমিত কান্তি ঘোষ

পিএইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0101417

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ২৯/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক: ড. উৎসা রায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভারতীয় বা আরও বিশেষভাবে বাংলা দেশের পোশাকি অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হয় শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধটি। প্রথমেই আসি শরীরের কথায়। সামাজিক শরীর পারিবারিক, সামাজিক, লৈঙ্গিক, এবং আরও বৃহত্তরভাবে রাষ্ট্রীয় নানান বিধাণ বয়ে চলে। নানান ভৌগোলিক পরিসরে, নানান ভাষা, ধর্ম, পারিবারিক বোধ, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহে জন্ম নেওয়া মানুষ উত্তরাধিকারজাত সংস্কৃতিকে বহন করে। পরে কালের নিয়মে পরিণত হতে হতে শিশুর শরীর যতই সামাজিকতার নানা স্তর অতিক্রম করতে থাকে, ততই অর্জিত শিক্ষা ও কালীন স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সেই উত্তরাধিকারজাত সংস্কৃতিতে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রকট হয় তার চাল-চলনের মাধ্যমে। সেদিক থেকে ব্যক্তির সামাজিক শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, তার সামাজিক অস্তিত্বকেই নানা ভাবে তুলে ধরে। খৎনা করা থেকে নাক-কান ছিদ্র করা বা শরীরের নানা অঙ্গে উল্কি আঁকা থেকে চুল দাড়ির নানান ধরণ সবেতেই ব্যক্তির সামাজিক, লৈঙ্গিক, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য জানান দেওয়ার তাগিদ কাজ করতে থাকে। আর ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বর্ণীয়, রুচিজ অবস্থানকে জানান দেওয়ায় সবচাইতে যে ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হল পোশাক। Roach-Higgins & Eicher-এর মতে পোশাক হল "an assemblage of modifications of the body and/or supplements to the body" অর্থাৎ পোশাক হল শরীরের সংশোধনীর সমাবেশ এবং/ অথবা শরীরের সম্পূরক। এই সংশোধন ও সম্পূরণের তাগিদ অবশ্যই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। তাই জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের শরীর সামাজিকতার নানামুখীন ভাষ্য তৈরির একটি ক্ষেত্র। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে কোনো ভূখণ্ডের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিকে নিয়ে কাঠামোবদ্ধ, সেখানে সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শরীর যে ক্ষমতানুগত্যকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হবে – তাই স্বাভাবিক। আর এই আনুগত্যপ্রিয়তা ও অনুগামিতার মনস্তত্ব মানুষের নিত্যকার পোশাকি অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে। Brian J. McVeigh-এর মতে, এই মনস্তত্ব সহজাত নয়। কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে জন্ম নেওয়া শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সাথে এই মনস্তত্বের বিকাশ হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে স্থান-কাল-পাত্রের কার্য-কারণাধীন পরিসরে জন্ম নেওয়া শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে পোশাকি বিকাশ ঘটতে থাকে তা তার সামাজিক অর্জন।

সামাজিক পরিসরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় দেহের ব্যক্তিত্বে রূপান্তরণের প্রক্রিয়ায়, সমাজ হল বর্দিউ-বর্ণীত সেই ক্ষেত্র, যার সংস্পর্শে এসে জৈব দেহ কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আচার-বিচার, প্রথা-কৃষ্টি-ভাষায় বিজারিত হয়। আবার কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে উদ্‌ভুত নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও সেই ভূখণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচলনকে প্রভাবিত করতে থাকে;

এবং নতুন সামাজিক আচার-বিচারের অনুশীলনকে ত্বরান্বিত করে নতুন অভ্যাসের প্রতিষ্ঠান বা 'habitus'-এর বিকাশ ঘটায়।

আমাদের আলোচ্য সন্দর্ভে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাড়িত নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ফল। যে ক্ষেত্রের উদ্ভব নতুন শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচারকে ত্বরান্বিত করে এবং তারই ফলে নতুন দেহ-রাজনীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। যে দেহ-রাজনীতি মধ্যযুগীয় দেহ-রাজনীতি থেকে ভিন্ন। যার মূল কারণ হল পাশ্চাত্য বাজার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশেলে যুক্তি-বুদ্ধি-রুচির নতুন ঢেউ। সেই যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি প্রভাবিত শ্রেণি পরিচিতিও বর্ণ ও ধর্ম বিভাজিত বাংলা দেশে আরেকটি স্বতন্ত্র বিভাজন হিসেবে প্রকট হয়। আর সেই বিভাজনের দৃশ্যমান ভিত্তি হিসেবে উঠে আসে পোশাক। নতুন পোশাকি শিষ্টাচার। সুতরাং এই সন্দর্ভের মূল বিবেচ্য প্রশ্নটি হল, বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের শ্রেণি পরিসরের সংগঠনে পোশাকি রুচিকে কিভাবে সামাজিক পুঁজি, লিঙ্গ, ক্ষমতা ও জাতিত্বের সূচক হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়? এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি বিষয়ে কেন সন্দর্ভটি সীমাবদ্ধ থাকছে। তা আগে পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বৃহত্তর অর্থে ঘরের সাথে বাইরের সম্পর্ক রক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পুরুষেরাই পালন করেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদের আদি অভিঘাত এসে পড়েছে পুরুষের উপর। তা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে হোক, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হোক বা সামাজিক আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে। তাই পুরুষকে এই আলোচনার কেন্দ্রে বসিয়ে আলোচনাটা জরুরি।

এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় **ঔপনিবেশিক বাংলায় পোশাকি রুচির পরিবর্তন: বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয় ও বিলিতি উদ্যোগের সাপেক্ষে**-এর মূল বিবেচ্য প্রশ্নটি হল ভারত তথা বাংলা দেশের প্রাগৌপনিবেশিক বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ব্রিটিশ সময়কালে এসে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং সেই পরিবর্তন এদেশীয় বস্ত্র-রুচিকে কিভাবে পালটে দিয়েছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের রুচি-নির্ভর ভিত্তিটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল – তা দেখাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় **শরীর, পোশাক, এবং ক্ষমতা: ঔপনিবেশিক কলিকাতায় বিলিতি পোশাকি রুচি ও রাজনীতি**-এর মূল প্রশ্নটি হল ভারতীয় উপমহাদেশে বিলিতি সাম্রাজ্যবাদের পোশাকি ভিত্তি কিভাবে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বিলিতি সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতার দৃশ্যমান ভিত্তি হিসেবে পোশাককে কিভাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেই ব্যবহারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল কিভাবে, যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপের উপর ভিত্তি করে স্বদেশির আগে পর্যন্ত এদেশীয় মধ্যবিত্তীয় পুরুষের শ্রেণি চেতনা বিবর্তিত হবে।

সন্দর্ভটির তৃতীয় অধ্যায় **শরীর, পোশাক, এবং রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরে পুরুষ ও তার সামাজিক পরিসরের পোশাকি নির্মিতি**-এর মূল আলোচ্য প্রশ্নটি হল পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ততার পোশাকি দ্বন্দ্বের জায়গাগুলি কি।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ড্রেস কোডে মুঘলী শৈলীর পোশাক পরার বিধাণ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচি মধ্যবিত্ত পুরুষের দেহকে কিভাবে দ্বন্দ্বের একটা ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে কিভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বীজ উপ্ত হচ্ছিল।

সর্বোপরি নতুন শিক্ষা ও নতুন বাজার পোশাকি লজ্জা ও পোশাকি সম্ভ্রমের বিনির্মাণ ঘটিয়ে কিভাবে মধ্যবিত্ততার পোশাকি পরিসর গড়ে তুলছিল তা আলোচিত হবে চতুর্থ অধ্যায় **শরীর, পোশাক ও লজ্জা: মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের পোশাকি নির্মিতি**-তে। আর এই আলোচনাটি শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক পরিসরেই আটকে থাকবে না, তার পারিবারিক পরিসরও এখানে টেনে আনা হবে। অর্থাৎ পরিবারের মেয়ে-বউদের লেখা-পড়া শেখানো থেকে তাদের "এনলাইটেন্ড" স্বামী বহনের সার্বিক উপযোগী করে তোলার মধ্য দিয়ে যে আসলে মধ্যবিত্ত পুরুষ তার স্বাতন্ত্র্যের অলঙ্করণে নেমেছিল – তাও এই আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসবে।

পঞ্চম অধ্যায় **শরীর, পোশাক ও রাষ্ট্র: পোশাকি স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার নির্মাণ**-এর মূল আলোচ্য প্রশ্ন হল স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তীয় পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের তাগিদ কিভাবে বৃহত্তর একটা ক্ষেত্র লাভ করেছিল এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একই সাথে অপরীকরণের শক্তি কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, বা সেই অপরীকরণ রোধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগিদই বা কেমন ছিল।

এ সন্দর্ভের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন নির্ভর যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে আর্কাইভটি গড়ে উঠেছে সেটি নানামুখীন। অর্থাৎ শরীর ও পোশাকের রাজনৈতিক সম্বন্ধকে বুঝতে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা থেকে আহরিত দলিল-দস্তাবেজ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি অন্যদিকে শরীর ও পোশাকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধকে বুঝতে আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথা থেকে শুরু করে চিঠিপত্র, আলোকচিত্র এবং সমকালীন সাহিত্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার শরীর ও পোশাকের বাজারি সম্বন্ধকে বোঝানোর জন্য সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এসব বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরিত তথ্যসম্ভার বৃহত্তরভাবে যা তুলে ধরতে চেয়েছে, তা হল বাঙালি মধ্যবিত্ততার পোশাকি স্বরূপ। যে স্বরূপটি আধুনিকতার নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের একটা মনস্তত্ব তৈরি করেছে।

ভূমিকা

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঔপনিবেশিক বাংলার পারিচ্ছদিক রুচির পরিসরে একটা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। মূলত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যিক ও অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান ইংরেজের পোশাকি ক্ষমতার পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠতে গিয়ে, মধ্যবিত্ত বাঙালির নিজস্ব পোশাকি সামাজিকতার অবনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়েই তার বিকাশ। বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে আবার তাতে জাতিত্ব ও সাম্প্রদায়িক স্পৃহা জুড়তে শুরু করে। ঔপনিবেশিক সমাজে জাতি-স্পৃহার বিকাশের বা তার পূর্ববর্তী নানা পর্যায়কে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ব্যাখ্যায়নের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পথকে অবলম্বন করলেও, স্থান-কাল-পাত্রের জটিল সমীকরণের দিকে তাকাতে হয়।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসর

১৭১৭ সালের ফারুখশিয়ারের ফরমানের দৌলতে বাৎসরিক ৩,০০০ মুদ্রার বিনিময়ে ভারতে অবাধ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা পেয়ে, ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অবক্ষয়মান মুঘল সাম্রাজ্যের উপর নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার জাল বিস্তার করতে শুরু করে। তারই ফলশ্রুতিতে সুবা বাংলার মতো মুঘল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক কেন্দ্রের রাজশক্তির সাথে দ্বৈরথে নামারও সুযোগ পায় তারা। যা শেষ পর্যন্ত ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়, এবং সেই যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এই যুদ্ধের আগে থেকেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যে ভূখন্ডকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছিলেন, সেটি হল কলিকাতা। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতা নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল। পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিকাশে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব বৃদ্ধির বেশ কিছু কারণ ছিল -- একদিকে সরস্বতী নদীর ক্ষীণ হয়ে আসায় পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক বিচরণ কেন্দ্র সপ্তগ্রামের মৃত্যু; অন্যদিকে হুগলী থেকে মোহনার দূরত্ব বেশি হওয়ায় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সুতানুটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষত্ব; আবার, হুগলী নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলটি সুবা বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে বেশি দূরের নয়; বা সুতানুটি, গোবিন্দপুর, ডিহি কলকাতা -- এই তিনটি গ্রাম নিয়ে পত্তন হওয়া কলিকাতার গোবিন্দপুরে শেঠ-বসাকদের মতো বিদেশাগতদের সাহায্যকারী দেশীয় গোষ্ঠীসমূহের প্রবল উপস্থিতি -- যারা মূলত বিদেশাগতদের টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করতেন। আর এই সমস্ত সুযোগের সম্মিলনে কোম্পানির বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও সুবা বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে কলিকাতার রাজনৈতিক উত্থান।[1] সেদিক থেকে দেখতে গেলে কলিকাতার উদ্ভবকে ‘chance-directed, chance-erected’ বললে সত্যের অপলাপ হবে।[2] আবার কলিকাতার রাজনৈতিক বিকাশের

---

[1] শ্রীপান্থ, ‘কলকাতা’, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মূদ্রণ ২০১৬), পৃ। ২১-২৬।

[2] জোব চার্ণকের দুই শতক পর ১৮৮৭ সালে রুডিয়ার্ড কিপ্লিং তাঁর *A Tale of Two Cities* কবিতায় লিখেছিলেন--- ‘Thus the midday halt of Charnock — more’s the pity!-/Grew a city/As the fungus sprouts chaotic from its bed/So it spread/Chance-directed, chance-erected laid and built/On the silt/Palace, byre, hovel-poverty and pride--/ Side by

আবশ্যিক পূর্ববর্তী সূচক হিসেবে ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে শোভা সিংয়ের বিদ্রোহ দমনে মোঘলদের ব্রিটিশ কোম্পানির সাহায্যপ্রাপ্তি এবং সেই সুবাদে নবাব আজিমুস-শানের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠার বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখলে চলবে না। কারণ প্রীতিভাজন হওয়ার দরুণই ১৬,০০০ টাকার পরিবর্তে কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি এই তিনটি গ্রামের জমিদারীর স্বত্ব সাবর্ণ চৌধুরীদের হাত থেকে অনেক সহজেই কিনে নিতে পেরেছিল কোম্পানি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৬৮৬ সালে জোব চার্ণক সুতানুটিতে এসে বসবাস করবার আগে থেকেই শেঠ-বসাকরা 'আট পুরুষ' ধরে গোবিন্দপুর, সুতানুটিকে কেন্দ্র করে বিদেশীদের সাথে ব্যবসার দরুণ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন।[3] তাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার সুবিধার্থে অনেক পর্তুগীজ এবং আর্মেনিয়ান বণিকরাও এইসব অঞ্চলে বাস করতে শুরু করেছিলেন।[4] এক্ষেত্রে এটাও স্মরণ রাখতে হয়, ব্রিটিশ কোম্পানির আসার আগে থেকেই এই তিনটি গ্রাম বস্ত্র বাণিজ্যের সাথেও যুক্ত ছিল। এবং সেই বাণিজ্যে শেঠ-বসাকরাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। ড. অতুল সুর'এর মতে, শেঠদের পূর্বপুরুষ মুকুন্দরাম ও বসাকদের পূর্বপুরুষ কালীদাস বসাক, বাসুদেব বসাক এবং করুণাময় বসাক গোবিন্দপুরে এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র গড়ে তোলেন। তাঁরা গোবিন্দপুরের চার মাইল উত্তরে বরানগরের তাঁতিদেরকে দিয়ে বাপ্তা কাপড় (মোটা মসলিন) বুনিয়ে তা পর্তুগীজ বণিকদের কাছে বিক্রি করতেন। তাছাড়া প্রথম থেকেই এঁরা গোবিন্দপুরের থেকে এক ক্রোশ উত্তরে একটা হাট পত্তন করেন (যার নাম হয় 'হাটখোলা'), যে হাটে উল্লেযোগ্যভাবে সুতোর লুটি কেনাবেচা হত। সেই বাজার নির্ভর গ্রামটিই 'সুতালুটি' (পরবর্তীতে বিকৃত উচ্চারণের দরুন 'সুতানুটি') নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[5]

সুতরাং জোব চার্ণক কলিকাতার পত্তন করেছিলেন কিনা -- সেটা মতভেদের উর্দ্ধে নয়।[6] কিন্তু কলিকাতার নগরী হিসেবে বিকাশে ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থসচেতন অবদানকে অস্বীকার করবার জো নেই। নবাবের প্রীতিভাজন হয়ে লাভ করা এই তিনটি গ্রামে প্রজা বসিয়ে, জোব চার্ণকের বড় মেয়ে মেরীর স্বামী স্যার চার্লস আয়ারকে খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানির মুখ্য এজেন্ট হিসেবে বসানো হলেও, বিদেশবিভুঁইয়ে কোম্পানিকে আর্থিক মন্দার সাথে লড়বার জন্য কখনো

---

side;/And, above the packed and pestilential town,/Death looked down' নিয়েছি 'The Collected Poems of Rudyard Kipling', (Kent: Wordsworth Poetry Library,1994), pp.80-82 থেকে।

3 ভবানী রায় চৌধুরী, 'বঙ্গীয় সাবর্ণ কথাঃ কালীক্ষেত্র কলিকাতা [একটি ইতিবৃত্ত]', (কলকাতা: মান্না পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৬)।

4 সুতরাং জোব চার্ণকের হাতেই কলকাতার পত্তন হয়েছিল এই মতটি প্রশ্নযোগ্য। কারণ জোব চার্ণক কলকাতায় আসার বহু আগেই ১৫৮২ সালে টোডোরমল্লের 'অলস-ই-জমা-তুমর' অর্থাৎ মাশুলের তালিকায় এবং ১৫৯৬ সালে বাদশাহের সচিব আবুল ফজল আল্লামির লেখা 'আইন-ই-আকবরি'তে ফরাসি ভাষায় 'Kalkatah' শব্দটি রয়েছে। এমনকি 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'এও 'কালীকর্তা'র উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার এই ছোট্ট গ্রামে স্থাপিত কালী বিগ্রহকে পুজো করে পুরোহিত জীবনধারণ করতেন বলে এর নাম 'কালীকর্তা' (অর্থাৎ কালীই ওই অঞ্চলের কর্তা। রাম প্রাণ গুপ্ত অনূদিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* এর 'উদ্যান তোরণ', তৃতীয় ভাগ, পৃ ২৪) হরিপদ ভৌমিক, 'নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা', (কলকাতাঃ পারুল প্রকাশনী, ২০০০), পৃ।৯৫-১০৬ থেকে।

5 অতুল সুর, 'কলকাতাঃ চার্ণক থেকে সিএমডিএ পর্যন্ত এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস', (কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স, দ্বিতীয় মূদ্রণ ১৯৮৪), পৃ।২০-২২, ২৬-২৮।

6 শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, 'কলিকাতার কথাঃ আদ কাণ্ড', (কলিকাতা: শ্রীপ্রবোধ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩১)।

কখনো শেঠ-বসাকদের ঋণের উপরই নির্ভর করতে হত।[7] কিন্তু যেকোনোভাবেই কোম্পানি কলকাতাকে নিজেদের কায়েমি স্বার্থের কেন্দ্র বানাতে শুরু করে। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতার জমিদারির স্বত্ব অর্জনের অনতিপরেই কলকাতার প্রতিরক্ষার্থে ১৬৯৯ সালে ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে ফোর্ট উইলিয়ম তৈরির উদ্যোগ শুরু হয়। ১৭২৬ সালে ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণ শেষ হওয়ার পর থেকে, প্রতিপত্তির পিপাসায় কলকাতাতে আসা ইউরোপীয়দের মধ্যে বাণিজ্যিক, সামাজিক নানান দেওয়ানি সমস্যাকে আইনানুগ উপায়ে সমাধান করবার জন্য মেয়র'স কোর্ট চলত।[8] *Good Old Days of Honorable John Company*-তে বলা হয়, মেয়র'স কোর্টে দেওয়ানি, ফৌজদারী মামলার বহর বাড়তে থাকে। আর সেই মামলা সমূহ যে কেবলমাত্র ব্রিটিশ কোম্পানির এজেন্টদের মধ্যেকার সমস্যা নিয়ে তা কিন্তু নয়, বরং উন্নত জীবনধারণের আশায় কলকাতায় বাস করতে আসা 'নেটিভ' থেকে, কলকাতা বন্দরের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ইউরোপীয় গোষ্ঠী বা সেটেলম্যান্ট কর দিতে না চাওয়া ক্যাপ্টেন ডুরান্ডের মতো আরও অনেক ইংরেজরা এই কোর্টের জ্যুরিসডিকশনের আওতায় ছিলেন।[9] যেহেতু চুঁচুড়ার ডাচ ফ্যাক্টরি, ও চন্দননগরের ফরাসি ফ্যাক্টরির সাথে ব্রিটিশ ফ্যাক্টরির ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা চালানোর একমাত্র উপযুক্ত স্থান হয়ে ওঠে কলকাতা, সেকারণে কলকাতা বিভিন্ন শ্রেণির ও জাতির মানুষের ভাগ্যান্বেষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৭১০ সাল থেকে ১৭৫২ সালে কলকাতার জনসংখ্যা দশ-বারো হাজার থেকে বেড়ে চার লক্ষে পৌঁছয় এবং ১৭৮৯-৯০ সালের দিকে তা বেড়ে ছয় লক্ষে দাঁড়ায়।[10] জীবিকার প্রয়োজনে জেলে, ধোপা, চাষি, মালি, দরজি প্রভৃতিরা তাদের আপন আপন সংস্কৃতি নিয়ে কলকাতা শহরে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন। এহেন নবোত্থিত শহুরে বাতাবরণে এসে গ্রাম্যসমাজে বর্ণাশ্রমের শিকার অনেকেই আর্থিক উন্নতির মুখ দেখবার সাথে সাথেই শূদ্র থেকে কায়েতে রূপান্তরিত হয়েছেন। কারণ ইংরেজ আগমনের পূর্বে হিন্দুসমাজে জাত-পাতের বাঁধন ছিল প্রবল। জাত-পাতের সীমানা ডিঙ্গিয়ে সামাজিক বিকাশের সিঁড়ি ভাঙ্গা সহজ ছিল না। এর অন্যথা হত একমাত্র জমিদারদের প্রীতিভাজন হয়ে উচ্চ টাইটেল লাভ করলে।[11] কিন্তু ইংরেজ আমলে অর্থাগমের সাথে সাথে নিম্নবর্গীয়দের মধ্যেও জাতবিচারে

---

[7] ১৭০৩ সালে ইংরেজ কোম্পানি অর্থসঙ্কটে পড়ে বার্ষিক ১ টাকা সুদে শেঠ-বসাকদের কাছ থেকে ঋণ নেয়।

[8] মেয়র'স কোর্টে বিচার প্রক্রিয়া চালনার জন্য একজন মেয়র ও নয়জন সহকারী বিচারক থাকতেন। এখানে মোকদ্দমার বিবরণ রেজিস্ট্রি করবার জন্য পাতা প্রতি নয় আনা ফি নেওয়া হত।এখান থেকে কোম্পানির ১৬০০ টাকা আয় হত। যদিও এখানে বেশির ভাগ দেওয়ানি মোকদ্দমার শুনানী হত। এই তাদালতের রায়ে খুশি হতে না পারলে অপরাধী পক্ষ 'কোর্ট অব আপীল'এ আবেদন করতে পারতেন। ফৌজদারি বিষয় নিয়ে আইনী নিদানের জন্য 'কোর্ট অব কোয়ার্টার সেসন্স' নামের একটা ফৌজদারি আদালতও ছিল। অতুল সুর, 'কলকাতা', পৃ ৩৯-৪০।

[9] W.H. Carey, 'The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I', (Calcutta: R. Cambray & Co., Law and Antiquarian Booksellers & Publishers, 1906), pp. 31-32.

[10] A. K. Roy, ' Calcutta, Town and Suburb, part I, A Short History of Calcutta', (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), pp. 72-73; সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান', (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩), পৃ ৩৯।

[11] লক্ষ্মণ সেনের আমলে সিন্দুর ও শাখিনী নামের দুই পরগণা জাগির পেয়ে প্রতিপত্তি পাওয়া একটা পুরোহিত বংশ পাঠান সময়কালে 'রায়' উপাধি লাভ করেন। আবার সেই রায় কুলের জমিদার রাজীব রায়, বারেন্দ্র বামুন শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বারেন্দ্রভূমি থেকে এনে তাঁর এলাকায় 'মৈত্র' উপাধি দিয়ে স্থাপন করেন এবং শিবচন্দ্রের দুই বোনকে বিয়ে করেন। এতে বারেন্দ্রকূল ক্ষেপে ওঠে। হয়ত তাদের অভিযোগ ছিল -- পাঠানদের কাছে থেকে উপাধি নিয়ে জাত খোয়ানো পুরোহিতের কাছ থেকে উপাধি নিয়ে বারেন্দ্রগোত্রীয় নিজের জাত গরিমাকে অবমাননা করেছেন।

উচ্চস্থানীয়দের টাইটেল ধারণের প্রবণতা বেড়ে যায়। জমিদারের পরোয়া না করে, হাতে টাকা আসলেই স্বউদ্যোগে টাইটেল পাল্টানোর প্রবণতা বাড়ে। তাই সেকালের কুলজী ছড়ায় ছড়াকার লিখে গেছেন,—"হাল বয়, তাল খায়, গিধণায় বাস,/তার বেটা কায়েত হল, বিশ্বাস খাস।"[12] অষ্টাদশ শতকের লোকমুখে আরও ফেরে – "দুলোল হল সরকার, ওক্কুর হল দত্ত/ আমি কি না থাকব যে কৈবিত্ত, সেই কৈবিত্ত।" -- ধরনের ছড়া।[13] এখানে 'দুলোল' রামদুলাল দে। ইংরেজ কোম্পানির বেনিয়ান হয়ে তিনি কোটিপতি হন। 'সরকার' উপাধি লাভ করেন।[14] 'ওক্কুর' হলেন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, যিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ডিঙ্গি নৌকা ও হালকা জাহাজ সরবরাহ করে বড়লোক হন এবং 'দত্ত' পদবি ধারণ করেন। কিন্তু জাতে ওঠার প্রতিযোগিতায় জানবাজারের পিরিতরাম মাড় হেরে গিয়ে 'কৈবিত্ত'ই রয়ে গেলেন।[15] সুতারং দেশীয়দের কলকাতা নির্ভরতার তাগিদ এবং কলকাতার উপর নির্ভর করে দক্ষিণ এশিয়াতে ক্রিয়াশীল অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিযোগিতার সুফলকে উপলব্ধি করে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ছোট্ট জনপদের উন্নতিবিধানে এগিয়ে আসে। ১৭৫৬ সালে একজন লেখক হুগলী নদীর তীর ধরে বসতির ধরণ সম্বন্ধে বলেছেন—হুগলী নদীর তীরে ফোর্ট উইলিয়মের আশেপাশে কোম্পানির ফ্যাক্টরদের "large and handsome" ম্যানসন গড়ে উঠতে থাকে। তার সাথে খুব কম হলেও বিত্তশালী বাবুদের এবং নেটিভ বণিকদের বাসস্থানও লেখক দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন।[16]

কলকাতার বর্ণাঢ্যতা যত বেড়েছিল, সেই বর্ণাঢ্যতার রূপদাতা ইংরেজদের প্রতি দেশীয় সম্ভ্রমও উত্তরোত্তর বেড়েছিল। হিন্দু সমাজের গড়নের সাথে তাদের সামাজিক চরিত্র না মিলুক -- তাতে কি! নতুন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তেজ নিয়ে তারা হাজির – তা'ই পরিবর্তনকামী দেশীয় সমাজের চোখে অন্যমাত্রা পেয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের ইংরেজ-চরিত্র বর্ণনার দিকে তাকালে বোঝা যায়, হিন্দু সমাজের সাথে যাবতীয় বিরোধ সত্ত্বেও তাদের মান্যতার কারণ কি, "যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গীর মত।/ কর্ণবেধ নাহি করে, না দেয় সুন্নত।।/ শৌচ আচমন নাহি, যাহা পায় খায়।/ কেবল ঈশ্বর আছে বলে, এই দায়।।"[17] অর্থাৎ অষ্টাদশ

সেসময়কার যে ছড়ার অবতারণা হয়েছিল, তার দিকে তাকালে বিষয়টা খানিকটা পরিষ্কার হতে পারে – "গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিচয়ের মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।" বা "খাট খুটু ঠাকুরটী গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, গাঁই গোত্র কিছুই নাই রাজীব রায়ের শালা।" শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, 'কলিকাতার কথা, আদি খণ্ড', পৃ ৩৬-৩৭।

[12] হরিহর শেঠ, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', কলিকাতা, ১৩৪১, পৃ ৩৩০; সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের বাংলা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান', পৃ ৫৫।

[13] হরিহর শেঠ, 'প্রাচীব কলিকাতা পরিচয়', পৃ ৩৩২।

[14] সিমলার দে পরিবারের রামদুলাল মেসার্স ফেয়ারলী এণ্ড কোং কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন, আমেরিকার নানা কোম্পানির সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি বস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডলফিয়া, সালেম, নিউবেরী, মার্বলহেডের বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট ছিলেন। শ্রীমদনমোহন কুমার, 'ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে (১৭৫২-১৮২৫)', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮২ খণ্ড, সংখ্যা ১-২, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ; দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, 'রামদুলাল সরকার', (কলিকাতা ও ময়মনসিংহ: ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন)।

[15] তদেব।

[16] ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "নববাবুবিলাস", রমেনকুমার সর সম্পাদিত, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ', (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩), পৃ ১৭২।

[17] সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'বর্ধমানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড', (বর্দ্ধমানঃ বর্দ্ধমান প্রেস, আগস্ট ১৯৫৬), পৃ ১৫।

শতকে বাংলায় প্রতিপত্তিশালী বণিক হিসেবে প্রতিভাত ইউরোপীয়রা হিন্দুদের মতো চূড়াকরণ (যা এখানে 'কর্ণবেধ' বলে উল্লিখিত) করেন না, বা মুসলমানের মতন সুন্নতও করেন না। তাদের শৌচ, আচমনেরও বালাই নেই। যেহেতু তাদের জীবনধারা হিন্দু সাত্ত্বিকতার সাথে মেলেনি, তাই হিন্দু সমাজ তাদের 'নতুন যবন' (অর্থাৎ এরা খানিক মুসলমানের মত, আবার ঠিক মুসলমানও নয়) হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারই সাথে এই বোধটাও সচল হয়েছিল যে, সেই "অস্পৃশ্য"রা যেহেতু নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তেজ নিয়ে হাজির, তাই এদের ঈশ্বরজ্ঞান করা ছাড়াও উপায় নেই। আঠারো শতকের শেষযামেও পটপরিবর্তনের নতুন নায়ক – ইংরেজের প্রতাপকে অনুধাবণ করে পাবনার কবি রামপ্রসাদ মৈত্র লিখেছিলেন, "অপূর্ব্ব শুনহ সবে/ স্বর্গের যতেক দেবে/ বিলাতে হইয়া সাহেবরূপী/ ছাড়িয়া আহ্নিক পূজা/ পরিধাণ কুর্তি মুজা/ হাতে বেত শিরে দিলা টুপী।।"[18] আর হ্যাট-কোট-প্যান্টালুন-স্টিকধারী সাহেবদের বস্তুগত উন্নয়নের কেন্দ্র যেহেতু কলকাতা, তাই কলকাতা গিয়ে ভাগ্যান্বেষণের তাগিদ হিন্দুধর্মের সব বর্ণের মধ্যেই অনুভূত হয়েছিল।[19] আবার ইংরেজের সাথে কারবার করে আঙুল ফুলে কলাগাছ দেশীয়দের কথা ছড়া-প্রবাদের মধ্য দিয়ে মুখে মুখে যত চাওড় হতে থাকে, ততই কলকাতার স্বপ্ন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে অভিভূত করতে থাকে। প্রথম দিকের দেশীয় ধনকুবের ও প্রতিপত্তিশালী বনমালী সরকার, গোবিন্দরাম মিত্র, শিখ ধর্মাবলম্বী আমির চাঁদ, হুজুরিমল্লরা বিদেশিদের সাথে কারবার করে ধণে-মানে এতই বেড়েছিলেন যে, সমসাময়িক দেশীয়দের মুখে মুখে ছড়া হয়ে ফিরত— "বনমালী সরকারের বাড়ি।/গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।/আমির চাঁদের দাড়ি।/হুজুরি মল্লের কড়ি।"[20] 'বাড়ি', 'ছড়ি', 'দাড়ি', 'কড়ি' শব্দগুলো এখানে নিছক ছন্দ মেলানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। প্রত্যেকটা শব্দের সাথেই তৎকালীন কলকাতার মধ্যসত্বভোগীদের সামাজিক ক্ষমতার যোগসূত্র আছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপস্থিতিতেই কলকাতা সে নতুন ক্ষমতার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুর ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন"।[21] তাই জ্ঞাতি-কুটুম্বহীন কলকাতায় গিয়ে সামাজিক বিচারের ভয় না করে নতুন বৃত্তি অবলম্বনের (যা তার ধর্ম-নির্ধারিত বৃত্তির বিরোধী) মাধ্যমে অর্থাগমের পথ সুগম

[18] অক্ষয় কুমার মৈত্র সম্পাদিত, *ঐতিহাসিক চিত্র*, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, জানুয়ারি ১৮৯৯, পৃ ৯৭; শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস – আদি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত', (কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৪০); আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য',(কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণী, মে ২০০০), পৃ ১২৫।

[19] উনিবিংশ শতকে যে দেবত্বের আসন সাহেবরা পেতে শুরু করেছিলেন, মধ্যযুগের রচনা 'শূন্য পুরাণ'এ সেই জায়গাটি পেয়েছেন মুসলমানরা। কারণ সেসময় ভারতের রাজনৈতিক তখতে শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা। তাই 'শূন্য পুরাণ' বলেছে -- "ধর্ম্ম হৈলা যবনরূপী/ মাথা অত কাল টুপী/ হাতে সোভে তিরুচ কামান।/ চাপিয়া উত্তম হয়/ ত্রিভুবনে লাগে ভয়/ খোদাঅ বলিয়া একনাম।।/ নিরঞ্জন নিরাকার,/ হৈল ভেস্ত অবতার,/ মুখেতে বলেত দম্বদার।/ যতেক দেবতাগণ / সভে হয়্যা একমন,/ আনন্দেতে পরিল ইজার।।/ ব্রহ্মা হৈল মহামদ,/ বিষ্ণু হৈল্যা মেকাম্বর,/ আদম্ফ হৌল্যা শূলপানি।/ গনেশ হৈল্যা গাজী/ কাত্তিক হইল্যা কাজী/ ফকির হইল্যা মহামুনি।।/ তেজিয়া আপন ভেক,/ নারদ হৈল্যা সেখ/ পুরন্দর হইল মৌলানা।" রামাই পণ্ডিত প্রণীত 'শুন্যপুরাণ', শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, মাঘ ১৩১৪)।

[20] হরিহর শেঠ, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', পৃ ৩২৩; সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের বাংলা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান', পৃ ৪১ থেকে।

[21] তদেব।

করবার বাসনায় দেশীয়রা দলে দলে কলকাতায় ভিড়ছিলেন।[22] যদিও কলকাতা যাত্রা সকলের জন্য সুফল বয়ে আনেনি। শহরের অসংগঠিত অংশের দমবন্ধকর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[23] ওতে শণ, মাটি আর বাঁশের তৈরি ঘিঞ্জি বাড়িতে বসবাসকারী দরিদ্র শ্রেণিই ছিল বেশি। ১৮৪০-এর দশকে এক নবাগত ইংরেজের লেখা থেকে দেখা যায়, কলকাতার ব্ল্যাক টাউন অংশ এতই ঘিঞ্চি হয়ে আসছিল যে, কোনো উঁচু স্তম্ভে উঠে মনে হত – বাড়িগুলির ছাদ টপকে পুরো কলকাতা পরিভ্রমণ করা যাবে।[24] সুতরাং উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার বিভিন্ন পরিসরের বিকাশের আগে থেকেই বস্তুগত বিলাস-ব্যসনের লালসার দ্বারা চালিত 'calcutta dreams'এ দেশীয়রা আক্রান্ত হয়েছিলেন।[25] বিনয় ঘোষের মতে, এর মূল কারণ ছিল – টাকা। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির উপস্থিতিতে অষ্টাদশ শতক থেকে ধীরে ধীরে টাকাই হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক ক্ষমতার উৎস। যে মুদ্রা নবাবি সময়কালে সামান্য এহাত ওহাত ঘুরে বেশীরভাগ সময়ই রাজকোষাগারে বা অভিজাতের সিন্দুকে বিশ্রাম নিত, মুক্তবাণিজ্য নীতির আগমনের সাথে সাথে সেই টাকার 'সেকেলে মন্থরগতি' ভেঙ্গে যায় এবং তার 'গতিশীল' ও 'সদাজাগ্রত সতত সঞ্চরণশীল' রূপ প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ যতই এগিয়ে আসে, ততই যেন টাকা হয়ে ওঠে একটা অনুভূতিশীল, হৃদস্পন্দনযুক্ত স্বতন্ত্র চরিত্র। আর সেই চরিত্রের অবাধ বিচরণক্ষেত্র কলকাতা। যেকারণে 'ক্যাশ ফীলস'এর মরীচিকায় কাতারে কাতারে নানা বর্ণের, নানা জীবিকার মানুষ কলকাতামুখী হয়ে উঠছিল। আর শহরমুখীন এ জনতার স্রোত কলিকাতার সামাজিক পরিসরকে পাঁচমিশালি রূপ দিতে শুরু করে।[26] ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে[।] বৃহৎ কর্ম্মজালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানা দিগদেশগামি হইতেছে[।] নানাবিধ মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে[।] বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ বহু রত্ন আছে[।] ইংরাজ নবাব সংগ্রামকালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল, তাহাতে বিষাদরূপ হলাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠিয়াছিল[।] কলিকাতা নিরুপমা ও সর্বদেশখ্যাতা হইয়াছে[।] পরনিন্দাপরায়ণ অনেকজন হাঙর ও মুর্খরূপ ভয়ানক কুম্ভীর অনেক ব্যাড়াইতেছে[।] লক্ষ্মী সর্বদা বিরাজ করিতেছেন[।] তদ্দর্শনে ভগবান নারায়ণও

[22] ভবানীচরণ লিখেছেন, '...পল্লিগ্রাম নিবাসি লোকেরা এই কলিকাতায় আসিয়া কোন এক সোপাধি সংগ্রহ করিয়া কাহার বাটিতে কিম্বা বাসাতে বাস করেন[।] ... অতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের উপাসনা করিয়া বিনাব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং এখানকার আহার ব্যবহার বাক্য বিষয়ে নিপুণ হইয়া অনেকের নিকট মান্যও হয়েন[।] ... এখানকার নিবাসিরা (যারা কলিকাতায় কিছুকাল আগে থেকে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন) যে কর্ম্ম স্বীকার না করেন[,] পল্লীগ্রাম নিবাসিরা তাহা অকুতোভয়ে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন[,] মনে করেন যে[,] আমার এখানে জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ নাই[,] আমি নিন্দিত বা অনিন্দিত কর্ম্ম করিলে আমাকে কেহ কিছুই কহিবেক না।' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "কলিকাতা কমলালয়", *কলিকাতা কললালয়,* রমেনকুমার সর সম্পাদিত, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসনগ্র', (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩), পৃ ৩৩।

[23] Carey, 'The Good Old Days of Honorable John Company', p. 31.

[24] "There is behold a countless number of flat-roofed houses of with and without balustrades, so close do these roofs appear to be one another that he who inclines, may apparently walk and jump over them from the end of the native town to the other without interruption from streets, lanes, squares and compounds. …" 'Sketches of Calcutta by a Griffin', Glasgow, 1843; বিনয় ঘোষ, 'টাউন কলিকাতার কড়চা', (কলিকাতাঃ বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৬১) পৃ ৫৯-৬০।

[25] Clark Blaise & Bharati Mukherjee, 'Days and Nights in Calcutta', (New York: Doubleday & Company, 1977), p. 205.

[26] বিনয় ঘোষ, 'মেট্রোপলিটনঃ মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ', (কলকাতাঃ প্রকাশ ভবন, ষষ্ঠ মূদ্রণ ২০১৬), পৃ. ২৯।

বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।’[27] ভবানীচরণের লেখায় ‘পরনিন্দাপরায়ণ হাঙর’ এবং ‘মূর্খরূপ ভয়ানক কুম্ভীর’ এর রূপকে কলিকাতায় অরথগৃধ্ণু সংস্কৃতির একটি আভাস যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এই অর্থচাষজাত[28] সংস্কৃতিতে দলাদলির আভাসও পাওয়া যায়। এই দলাদলির প্রতিফলন সামাজিক জীবনযাত্রার সার্বিক দিকে পরিস্ফুট হতে শুরু করে। শহুরে শ্রেণির সাজ-পোশাক তা থেকে বাদ যায় কেন! এ সন্দর্ভ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা তা লক্ষ্য করব।

বাংলা দেশে কলকাতাকেন্দ্রিক নতুন প্রতিপত্তিশালী শ্রেণির বিকাশকে তলিয়ে দেখার দরকার আছে, কারণ এদের মধ্য দিয়েই আধুনিকতার পারিচ্ছদিক ভাষ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করবে। ব্রিটিশ কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি -- মাদ্রাজ, বোম্বে, এবং কলকাতায় এসব নতুন প্রতিপত্তিশালীদের বিকাশ ঘটেছিল। কোম্পানির উপস্থিতিতে তৈরি হওয়া বাণিজ্যিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বণিকদের সমাবেশ বাড়ে এসব কেন্দ্রে। এই বণিকদের মধ্যে কেউ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিভিন্ন রকমের বানিজ্যিক উদ্যোগে পার্টনার হিসেবে কাজ করেছেন, কেউবা এদেশের বাজারে ব্রিটিশের বানিজ্যিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। পশ্চিম উপকূলের ব্রিটিশ-বানিজ্যকেন্দ্র বোম্বেতে গুজরাটি বণিক গোষ্ঠী – বাহারা (পারসি, জৈন, মুসলিমদের মধ্যে যারা বাণিজ্যে অংশ নিতেন), মাদ্রাজে অন্ধ্রের কোমতি এবং তামিলনাড়ুর চেট্টিয়াররা এইভাবেই প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন।[29] কলিকাতাতে সুবর্ণবণিকদের মতো অন্ত্যজ (বলা হয়, দ্বাদশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে বাংলার সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিকদের ‘অন্ত্যজ’ বা অ-জলচল হিসেবে ঘোষণা করেন। তাদের দোষ – তারা বল্লাল সেনের দাবি অনুযায়ী উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করেননি।) বাণিজ্যিক গোষ্ঠী ছাড়াও ব্রাহ্মণ (বলা ভালো ‘জাত খোয়ানো’ ব্রাহ্মণ) ও কায়েতেরাও ব্রিটিশদের বেনিয়ান (অর্থ সরবরাহকারী), দেওয়ান (অফিস-কাছারির হিসাব রক্ষাকারী), বানিজ্যিক এজেন্ট, দালাল এবং কন্ট্রাক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন।[30] প্রত্যেকটি শহরেই আর্মেনীয় এবং বাগদাদী ইহুদিদের মতো অন্যান্য বণিকগোষ্ঠীর সাথেও এসব গোষ্ঠীর কারবার চলত। শুধু তা’ই নয়, বিদেশবিভুঁইয়ে আসা ইংরেজদের এদেশীয় ভাষা শিখিয়ে এদেশের জীবনপ্রনালীর সাথে

---

27 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কলিকাতা কমলালয়’, পৃ. ৩২।

28 বিলিতি কোম্পানির প্রভাবে উদ্‌ভুত বিভিন্ন কারবারে দেশীয়দেরও সুদ খাটিয়ে অর্থ বিনিয়োগ।

29 Blair B. Kling, ‘Partmer in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India’, (Calcutta: Firma KLM Private Ltd., 1981), p.2; চিত্রা দেব, ‘ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল’, (কলকাতাঃ আনন্দ, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৬), পৃ. ৬।

30 মিস্টার সাইকসের বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী যেমন, সিরাজের পতনের পর কোম্পানির দৌলতে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তেমনি ক্লাইভের বেনিয়ান পোস্তা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নকুধর ওরফে লক্ষ্মীকান্ত ধর ইংরেজদেরকে ‘টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া ... এতদ্দেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে স্থাপন করেন।’ ঠাকুর পরিবারের প্রধাণ শাখার আদিপুরুষ, পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী দর্পনারায়ণ ঠাকুর ছিলেন মিস্টার হুইলারের দেওয়ান। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দৌলতে পরিবর্তীতে ভূকৈলাস জমিদারির স্থপতি গোকুলচন্দ্র ঘোষাল অষ্টাদশ শতকের ষাটের দশকে চট্টগ্রামের গবর্নর হ্যারী ভেরেলস্ট-এর দেওয়ানি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ শান্তিরাম সিংহ যেমন মিডলটন ও স্যার টমাসের দেওয়ানি করে প্রতিপত্তি অর্জন করেন। Foreign Department Miscellaneous Branch, No. 131, 1839, National Archive of India, New Delhi; সম্বাদভাস্কর, ১১ ডিসেম্বর ১৮৪৯; ওয়াকিল আহমদ, ‘উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা’, (কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯), পৃ ২৫।

যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য অনেক দেশীয়রা ব্রিটিশদের কাছে মুন্সী বা ভাষা শিক্ষক হিসেবে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেছেন। কেউবা ইংরেজদের অফিস-কাছারি ও বাড়ির হিসাব রক্ষনাবেক্ষণের জন্য দেওয়ানের কাজ পেয়ে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। কেউ প্রতিপত্তি লাভ করেছেন ইংরেজ কোম্পানির সাথে দালালি, হিসেব-নিকেষ রক্ষা বা দেওয়ানি করে। যেমন ১৭৫০-এর দশক থেকে নবকৃষ্ণ দেব, ওয়ারেন হেস্টিংস'এর ফারসি শিক্ষক হিসেবে কাজ করা শুরু করেছিলেন। সেই ভাষা শিক্ষকের পদ থেকে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুন্সীর পদ লাভ করেন।[31] এই প্রতিপত্তি হয়ে ওঠে নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির একটা অস্ত্র। সামাজিক সম্ভ্রমলাভের আশায় এরা মাতৃশ্রাদ্ধ থেকে দুর্গা পুজোয় লাখ টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করেননি।[32] অষ্টাদশ শতকে কলিকাতার উন্মেষের পর্বে যশোরের জাতভ্রষ্ট 'পিরালি' বামুন কুশারীরা যেমন কলিকাতায় গোবিন্দপুরের কাছে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তখন কলিকাতায় ব্রিটিশ ফোর্টের চারিদিকে জলাশয় এবং জ্বর-জর্জরিত ছোটো ছোটো বিক্ষিপ্ত গ্রাম। আর সেই গ্রামগুলোতে বেশিরভাগই হিন্দু জেলেদের বাস। যেহেতু সেই জেলেদের ধর্মীয় আচারে-বিচারে উঁচু বামুনেরা যোগ দিতেন না, সেহেতু তারা তাদের এইসব আচার-বিচার নবাগত কুশারীদের দিয়ে সম্পন্ন করতেন এবং এই তাদের 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতেন। এই ঠাকুররা যজমানী ছেড়ে দিয়ে পরবর্তীতে দক্ষিণ এশিয়ার নবোত্থিত নগরকেন্দ্র কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কাণ্ডারি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক এজেন্ট নিযুক্ত হন এবং ফোর্ট উইলিয়ামে বসবাসরত সেনা ও কলিকাতার আশে-পাশের নদনদীতে নোঙর তোলা জাহাজের বণিকগনকে রসদ জুগিয়ে প্রতিপত্তি অর্জন করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ খণ্ডে দেখিয়েছেন, "তখন এদেশে এরূপ সরবরাহকারেরা ইংরাজ নাবিক, বণিক ও কাপ্তেনদের নিকট প্রচুর পরিমাণে উপার্জন করিতেন। কিছুদিন পরে এই ব্যবসায় এদেশের লোকের এরূপ আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, কোনো নূতন জাহাজ আসিলে তাহাতে দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য লোকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত করিত। শেষে এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, লোকে নবাগত ক্যাপ্তেনের নিকট অন্যান্য ব্যক্তির অগ্রে পরিচিত হইবার আশায় নৌকায় করিয়া কলাবেড়ে জয়নগর পর্যন্ত ছুটিয়া যাইত।"[33] অর্থাৎ বিদেশাগতদের সাথে আসা টাকার উপর ভিত্তি করে, জীবনের গতিপথ ঘোরাতে জাতভ্রষ্ট বামুনদের মতো সমাজের একটা অংশের মানুষ সুতানুটি-গোবিন্দপুরের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে কলিকাতায় ব্রিটিশ সহযোগী দেশীয়দের অনেকেরই এইভাবে কোম্পানির কারবারের সাথে জুড়ে উত্তোরত্তর বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করেছিল। ব্লেয়ার কিং সামাজিক বিকাশের সিঁড়ি বেয়ে এইভাবে উঠে

---

31 N. N. Ghose, 'Memoires of Maharaja Nubkissen Bahadur', (Calcutta: K.B. Basu, 1901), pp.10-11; সুশান্ত কৃষ্ণ দেব, 'তিন শতাব্দীর শোভাবাজার রাজবাড়ি', (কলিকাতা: শরৎ বুক হাউস, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ)।

32 পূর্ণেন্দু পত্রী, 'এক যে ছিল কলকাতা', (কলকাতা: প্রতিক্ষণ, মার্চ ২০১৮), পৃ ৩৯-৪০; অতুল সুর, 'তিনশো বছরের কলকাতা: পটভূমি ও ইতিকথা', (কলকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮), পৃ ৫৬।

33 নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড', (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ); জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত, 'বংশ পরিচয়, চতুর্থ খণ্ড', (কলিকাতা: কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ ১৩৩২); পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী, 'বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড', (কলিকাতা: প্রকাশক অনুল্লিখিত, ১৯৩৯)।

আসা ঠাকুর'দের নিয়ে বলেছেন, 'During the nineteenth century these descendants of humble priests would themselves become aristocrats —the "Medici" of Calcutta, the most gifted and versatile of families; civic leaders, philanthropists; merchant princes, patrons of the arts, prophets and theologians, musicians, artists and poets.'[34] অর্থাৎ এই ঠাকুর পরিবারই উনিশ শতকে ইটালীয় রেনেসাঁয় মেডিচি পরিবারের মতো ভূমিকা পালন করবে। এই পরিবার থেকেই উঠে আসবে সংগঠক, লোকহিতৈষী, অধ্যাত্মবাদী, ধর্মতাত্ত্বিক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, চিত্রকর – নানা রঙের ব্যক্তিত্বরা। ওয়াকিল আহমেদ শেখ ইতিসামুদ্দীনের ইউরোপ-ভ্রমণবৃত্তান্ত 'শিগুর্ফ নামা-ই-বেলায়েত' থেকে জানিয়েছেন, ইংরেজ কোম্পানির সাথে মুসলিমরাও কারবারে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা আর্থিকভাবে হিন্দুদের মতো তাঁরা সাফল্য পাননি।[35] তিনি আরও বলেছেন, মুঘলামল থেকেই ব্যবসা, মহাজনী কারবারে হিন্দুরা সবচাইতে বেশি জড়িয়ে ছিলেন। তাছাড়া যে অঞ্চলে কোম্পানির ব্যবসায়িক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, সে অঞ্চল ছিল মূলত হিন্দু অধ্যুষিত। মুঘলামলে চাকরির প্রসার তেমন না থাকায়, চাষাবাদনির্ভর জীবনধারণে অভ্যস্ত পুব বাংলার মুসলমানদের কলকাতায় আসাও সহজ ছিল না।[36] তাছাড়া ইংরেজ কর্তৃক এতবছরের মুসলিম শাসন উৎখাতের পর, ইংরেজদের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক মেলামেশাতেও মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা অনীহা কাজ করেছিল। একই কারণে বহিরাগত মুসলিম যারা কৃষিকাজকে হীনকাজ ভাবতেন, তাদের মধ্যেও ক্ষমতাচ্যুত হবার পর জমি ও কৃষিনির্ভরতা বেড়েছিল। ফলত উনিশ শতকের কলিকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও রুচির অঙ্গনে যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাবো, বা যে নাগরিক পরিসরের বিকাশ আমরা দেখব -- তার চালিকাশক্তি হিসাবে হিন্দু প্রতিপত্তিশালীরাই উঠে আসেন। উনিশ শতকে সেই প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুররা। রামমোহন যেমন পাশ্চাত্য যুক্তি-বুদ্ধি এবং ফারসি জ্ঞানের আলোকে হিন্দু ধর্মকে সংস্কারে নামেন, তেমনি দ্বারকানাথ কয়লার কোম্পানি থেকে, স্টিম-টাগ, স্টিমার তৈরি, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গঠনের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে, ভারত ভূখণ্ডে ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাথে সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারার মতন ক্ষমতাশালী 'কম্প্রাদর' হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাঙালি মুসলিম সমাজকে নতুন সময়ের আলোকে সংস্কার করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো তেমন কোনো চালিকাশক্তি সেসময় ছিল না বললেই চলে।

তবে হিন্দু সমাজের এই উনিশ শতকীয় বিকাশের সীমাবদ্ধতা ছিল। গোলাম মুরশিদ সেই সীমাবদ্ধতার অন্যতম দিকের আলোকে দ্বারকানাথের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর – 'এই দুই অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কেবল নিজেরাই যে আধুনিক ছিলেন, তাই নয়; গোটা ভারতবর্ষকেই তাঁরা মধ্যযুগীয়তা থেকে

---

34 Blair B. Kling, 'Partner in Empire', p.10

35 তিনি ইংরেজ কোম্পানির সাথে কারবারে অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের নাম করেছেন। যেমন, মুনশি আমানুল্লাহ, মুনশি ফকরুদ্দীন, মুনসি মোহাম্মদ আসলাব, মুনশি আব্দুল বারি, মুনশি মহম্মদ ফয়েজ, মুনশি মীর সদরুদ্দীন, মুনশি সলিমুল্লাহ, মুনশি শেখ ইতিসামুদ্দীন প্রমুখরা। ওয়াকিল আহমদ, 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা', পৃ ২৫-২৬।

36 তদেব।

আধুনিকতার আলোকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিলেন। সে কারণে রামমোহনকে যে আধুনিক ভারতবর্ষের জনক বলা হয় – তা মোটেই অযথার্থ নয়। ... কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, ... জনক তো দূরের কথা, দ্বারকানাথ ভারতবর্ষে আধুনিকতার পিতৃব্য বলেও স্বীকৃতি পাননি।'[37] এবং এই স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির রাজনীতিতে যে ঔপনিবেশিক মনোভাব নিয়ামকের ভূমিকা নিয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোলাম মুরশিদ লেখেন, 'বিলেতের সরকার এবং লণ্ডনের অভিজাত সমাজ তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলো, কিন্তু তিনি যে-সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার উপযুক্ত, সে স্বীকৃতি দেয়নি। ... কারণ বিলেতী কর্মকর্তারা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছিলেন। ... তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আধুনিক শিল্পোন্নত ভারতবর্ষের, কিন্তু ইংরেজরা সেটা আদৌ চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষ তাঁদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল জোগাবে।'[38] বাংলা দেশে ১৭৫৭ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত সময়কালের ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিলে তা খানিকটা পরিষ্কার হবে।

পলাশি যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি উসুল করবার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির ক্ষমতাকে (১৭৬৫ সাল) এদেশীয়দের উপর অর্থনৈতিক শোষণে কোম্পানির নির্বিচার ব্যবহার, ১৭৬৯-৭০ সালে বাংলায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ নামিয়ে আনে।[39] যা বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা হানি করে। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন, এই মন্বন্তরের দুর্বিষহ চিত্র ভারতবর্ষে কোম্পানির দেওয়ানি অধিকারকে কি পরিমাণ সমালোচনার সামনে ফেলেছিল! তার সাথে ভারতবর্ষের উপর ফরাসি আক্রমণের হুমকি এবং ১৭৭২ সালে উইলিয়াম বোল্টের Considerations on Indian Affairs-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যাওয়া [40] — কোম্পানির ভিতরকার অব্যবস্থা সামাল দিতে ইংল্যাণ্ডের দায়বদ্ধতাকে সজাগ করে তোলে। আর সেই দায়বদ্ধতার ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্মকাণ্ডের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট Regulating Act এর বিল আনে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে '..a system for the future government of our Asiatic dominions and trade to the East Indies' এর দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং ভারত ভূখণ্ডে নিজেদের বাণিজ্য ও শাসনতন্ত্রকে সুগঠিত করতে এরই আবশ্যিক পরবর্তী ঘটনা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আসে। আর এই অ্যাক্টের অনতিপরে ভারতে কোম্পানি ও ব্রিটিশ ক্রাউনের মিলিত সরকারের উপর শিলমোহর দিয়ে ১৭৮৪ সালে পাশ হয় 'পিট'স ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'। অর্থাৎ পাকে-চক্রে কোম্পানি এইসব অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা হাতে নিতে বাধ্য হয়। ১৭৬০'এর দশক থেকেই কোম্পানি প্রশাসন অভিযোগ তুলেছিল, বাংলার মধ্যযুগীয় জমিব্যবস্থা জমির প্রকৃত মালিকানা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা জমিদারের সাথে সাথে পোদ্দার, আওয়াবদার, কেল্লাদার, থানাদারের মতো শব্দবন্ধও পেয়েছিল। যেখান থেকে তারা সিদ্ধান্তে এসেছে, রাজস্ব আদায়ের একমাত্র কর্তা জমিদার ছিলেন না। তার অধঃস্তনরাও

---

[37] গোলাম মুরশিদ, 'দ্বারকানাথ ঠাকুর: অবজ্ঞাত নায়ক', গোলাম মুরশিদ, 'রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা', (ঢাকাঃ অবসর, ফেব্রুয়ারি ২০২০), পৃ ১৮; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯২৮)।

[38] তদেব, পৃ ৩২-৩৩।

[39] রজতকান্ত রায়, 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ', (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১১), পৃ ২৫৩-৩০৫।

[40] কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা অত্যধিক লাভের আশায়, আত্মীয়-পরিজনের নামে বা বেনামে আরও নানা ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকতেন, আর লাভের টাকায় নবাবি বিলাসিতায় দিন কাটাতেন।

নিজেদের ইচ্ছামতো রাজস্ব আদায় করছিলেন।[41] তাই সূর্যাস্ত আইন প্রণয়ন করে তারা নবাবি আমলের জমিদারদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা দিতে বাধ্য করে এবং খাজনা দিতে অপারগ পুরাতন জমিদারদের কাছ থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এইসব বাজেয়াপ্ত জমিদারী নিলামের মাধ্যমে পুরোনো জমিদারদের ধনী প্রজা, আমলা, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রিটিশদের দেশীয় সহযোগী – দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ও বণিকশ্রেণির হাতে (বিনয় ঘোষের ভাষায়, 'এক পুরুষের ধনী') বিকিয়ে দেয়।[42] এই বিলি-বন্টনব্যবস্থা ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ স্থির হয়, ব্রিটিশ কোম্পানি নিলামের মাধ্যমে যাঁদের হাতে জমির হস্তান্তর করবে, তাঁরাই জীবনভর সেই জমির উপর জমিদারী কায়েম করবে।[43] দ্বাদশ শতকের প্রাথমিক ভাগ থেকে 'ল্যাণ্ড এনক্লোজার মুভমেন্টের' মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপ তথা ইংল্যাণ্ডে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব এবং তার ফলে কৃষিব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। উক্ত মডেলকে সামনে রেখে এদেশীয়দের হাতে জমিদারি তুলে দিয়ে, দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালে রায়ত ও কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাগুজে লক্ষ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে থেকেই উক্ত মানসিকতা কোম্পানি প্রশাসনের অন্দরে কাজ করেছে। ১৭৬৯ সালের ১৬ই অগস্ট, অর্থাৎ মন্বন্তরের অনতিপূর্বেই একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে কোম্পানি জানায় – "The improvements of the lands, the content of riot [rayat], the extension and relief of trade, the increase and encouragement of any useful manufacture of production of the soil, and the general benefit and happiness of the province in every consideration."[44] তাই রণজিৎ গুহ এই জমি আইনের মধ্যে সচেতনভাবে এদেশীয়দের জমিভিত্তিক শ্রেণিতে পরিণত করবার মানসিকতা দেখতে পাননি।[45] কলিকাতার আদি ইতিহাস নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করা বিনয় ঘোষও দেখিয়েছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কলিকাতা নিবাসী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে জমিদারি কেনার দিকে ঝোঁকের মূলে ছিল জমি নিয়ে গতে বাঁধা একটি রক্ষণশীল ধারণা; যেটি অনুসারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটালে টাকায় টাকা বাড়ে বটে, কিন্তু সেই টাকাকে জায়গা-জমি কিনে রাখার জন্য নিয়োগ করলেই একমাত্র ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধাণ হয়। অবশ্য বিনয়

---

41 'The word Zamindar generally rendered land holder, is a relative and indefinite term; and does no more necessary signify an owner of land than the word poddar signifies an owner of moneo under his charge, or an Aubdar, the owner of the Province which he governs, or, in military language, the owner of the company of sepoys belongs to, or Kelladar, the proprietor of fort he defends, or, Thanadar, the owner of the Police post he has charge of.' The Zamindery Settlement of Bengal, Appendix IV, Part I, p. 27; শ্রীবামাচরণ মজুমদার, 'বাঙ্গালার জমিদার', (কলিকাতা: গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ), পৃ ৩৪; বদরুদ্দীন উমর, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক', (কলকাতা চিরায়ত প্রকাশনী, মে ১৯৮৩), পৃ ১৭-২০।

42 Ratnalekha Ray, 'Change in Bengal Agrarian Society 1760-1850', (New Delhi: Manohar, 1979); Sirajul Islam, 'The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation 1790-1819', (Dacca: Bangla Academy,1979); বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থমালার শেষ (৫ম) খণ্ড', (কলিকাতা: পাঠভবন, নভেম্বর ১৯৬০), পৃ ১৯।

43 Hemendra Prasad Ghose, *The Famine of 1770*, (Calcutta: The Book Company Ltd., 1943); শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, 'সচিত্র কলিকাতার কথা, মধ্যকাণ্ড', (কলিকাতা: শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৫)।

44 Proceeding of Select Committee, 16.08. 1769; শ্রীবামাচরণ মজুমদার, 'বাঙ্গালার জমিদার', পৃ ৪০-৪১।

45 Ranajit Guha, 'A Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement', (Stosius Inc/Advent Books Division, 1982), pp. 20-21.

ঘোষ ওয়ারেন হেস্টিংস এর মতামতকে প্রামাণ্য মনে করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ওয়ারেন হেস্টিংস বলেছিলেন, এদেশে বসবাসরত ইউরোপীয়রা ছাড়া খুব কম দেশীয়ই কোম্পানির 'ইন্টারেস্ট নোট' বা 'ট্রেজারি অর্ডার' কিনতে চাইতেন। বরং এদেশীয়দের ধারণা ছিল, জায়গা-জমি ক্রয় করলে বা সুদের কারবারে সঞ্চিত মূলধন খাটালে ভবিষ্যত অনেক বেশি সুনিশ্চিত।[46] সে যাই হোক, বিজ্ঞাপনের কাগুজে লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। মোঘল সময়কালের হস্তান্তরযোগ্য জমিদারির জায়গায়, বংশানুক্রমে একদল দেশীয়ের উপর জমির অধিকার অর্পণ করে প্রশাসন জমিভিত্তিক একটা শ্রেণির বিকাশ ঘটিয়েছিল বটে, কিন্তু তার সাথে সাথে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে বাণিজ্যভিত্তিক দেশীয় শ্রেণির বিকাশে বাঁধ সাধল, যার দরুণ এদেশে কোম্পানির একচ্ছত্র বাণিজ্যের পথ আরও প্রসারিত হয়েছিল। যা দেশীয়দের মধ্যে আলস্য, বিলাসিতার আবাদ করেছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। তাই উনিশ শতকের শেষদিকে যেতে যেতে, উনিশ শতকের শুরুর দিককার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিদারির হাড্ডিসার রূপ বেরিয়ে পড়ে। জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী উনিশ শতকের শেষে লিখেছিলেন, 'প্রায় শত বৎসর হইল, এই সমস্ত জমিদার স্ব স্ব সম্পত্তি অবাধে ভোগ দখল করিয়া এক্ষণে অনিবার্য্য ঘটনাক্রমে দেনদার, নিঃস্ব ও অবনতি দশাগ্রস্ত হইয়াছেন।' অথচ একসময় এই জমিদাররাই 'দান, স্বধর্মপালন, অথিতি-সৎকার, ক্রিয়া-কলাপ উপলক্ষে আনন্দোৎসব, দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি, গ্রামে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি দ্বারা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ও দেশস্থ লোকের কতই উপকার প্রভৃতি হিতকর কার্য্যগুলি প্রধানতঃ এসমস্ত মহামান্য বিখ্যাত বংশের সহায়তায় সম্পাদিত হত।'[47]

বাণিজ্যভিত্তিক দেশীয় শ্রেণির কথা যখন উঠল, তখন আমাদের স্মরণ করতে হয় -- ভারতবর্ষে কোম্পানি আধিপত্য বিকশিত হওয়ার আগে, এখানকার হিন্দু-মুসলিম-পারশী বিভিন্ন গোষ্ঠীর বণিকশ্রেণি স্থল ও জলপথে বানিজ্যকাজে কতটা সক্রিয় ছিলেন।[48] তপন রায়চৌধুরী বলেছেন, অষ্টাদশ শতকে একদিকে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য প্রকট হতে শুরু করেছিল এবং পশ্চিম ইউরোপীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক কোম্পানি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসায়িক পসার জমাতে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনও 'আদি আধুনিক ইউরোপের রাজতুল্য

---

[46] ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশীয়দের মধ্যে কেনার অনীহা বিষয়ে বলেছিলেন, "The fact is, that our public credit, by which I mean the credit of our interest notes, and treasury orders, never extended beyond the English servants of the company, and the European inhabitants of Calcutta: and to these may be added a few, a very few, of the Old Hindoo families at the Presidency. All the other inhabitants of the provinces are utterly ignorant of the advantage and security of our funds, and have other ways of employing their money, such as purchases of landed property, loans at a usurious and accumulating monthly interest, and mortgages, to which, though less profitable in the end, and generally insecure, they are so much attached by long usage, and rhe illusion of large growing profit, that it would not be easy to wane them from these habits…" 'Mr. Hastings's Review of the State of Bengal', London, 1786 ; বিনয় ঘোষ, 'টাউন কলিকাতার কড়চা', (কলিকাতাঃ বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬১), পৃ ১০৪।

[47] শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, 'জমিদারশ্রেণীর অবনতি', (কলিকাতা: নববিভাকর যন্ত্রে মূদ্রিত, ১২৯০ বঙ্গাব্দ), পৃ ৫-৬।

[48] Sushil Chaudhury, 'From Prosperity to Decline: 18th century Bengal', (New Delhi: Manohar,1995), pp.1-10. S. Bhattacharyya, "Regional Economy (1757-1857): Eastern India" in Dharma Kumar and Meghnad Desai, eds, 'Cambridge Economic History of India, 1757-1970, Vol.II', (Calcutta: Firma K.L Mukhopadhyay, 1960), pp.270-331; Tapan Raychaudhuri, "The mid-eighteenth century background", in Dharma Kumar and Meghnad Desai, eds, 'Cambridge Economic History of India, 1757-1970, Vol.II', pp. 3-35.

বেণেদের সাথে তুলনীয়’ দেশীয় বণিকরা এদেশীয় বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।[49] বিনিয়োগের জায়গায় দেশীয় বণিকদের উপস্থিতি ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিশিয়ালরা ঠিকভাবে নেননি। তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে তাঁরা বিভিন্ন বাণিজ্যিক পরিসরে দেশীয়দের উদ্যোগের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করেন। দেশীয় বণিকদের সরিয়ে নিজেদের অধিপত্য কায়েম করতে গিয়ে, ব্রিটিশ কোম্পানি তাঁত শিল্পের মতো এদেশের মর্যাদাপূর্ণ শিল্পের হানি ঘটিয়েছিল। দাদনি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁতিদের নির্দিষ্ট কাপড় বোণার বরাত দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা এদেশীয় তাঁতিদের শৈল্পিকতাকে সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল।[50] বিনয় ঘোষ বলেছেন, ভারতের মধ্যযুগের সমাজ ছিল, ‘কঠোর প্রায় অচল স্তরবিন্যস্ত পিরামিডের মতো’।[51] কিন্তু ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিযোগিতা নীতি ওই পিরামিড গাত্রে আঘাত হেনেছিল। ধণতান্ত্রিক যুগের মূল্যমান ‘টাকা’র অবাধ সঞ্চরণশীলতা সমাজের কাঠামোকে পাল্টে দিতে শুরু করে। ব্রিটিশ আগমন পূর্ববর্তী হিন্দুধর্মে বর্ণভিত্তিক সামাজিক প্রতিপত্তি বা মুঘল দরবারের কাছ থেকে জাগির পেয়ে প্রতিপত্তি ও সম্মানপ্রাপ্তিই ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পথ। কিন্তু ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুক্ত-বাণিজ্যের প্রভাবে যুগধর্ম পাল্টাতে শুরু করে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কে কত টাকা উপার্জন করতে সমর্থ হচ্ছে, তা’ই হয়ে ওঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠার অপর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।[52] আর কলিকাতা হয়ে ওঠে সেই প্রতিযোগিতার ভরকেন্দ্র। তাই পঞ্চানন ঠাকুর, ব্ল্যাকডেপুটি গোবিন্দরাম মিত্র, নবকৃষ্ণ দেব, মদন দত্ত, রামদুলাল দে’র মতো দেওয়ান, বেনিয়ান ও মুচ্ছুদ্দিদের গ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় আগমনের পেছনে একমাত্র কারণ ছিল, এই মহা অর্থ অন্বেষণের প্রতিযোগিতায় নিজেদের সামিল করে ফুলে-ফেঁপে ওঠা।[53] রজতকান্ত রায় দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এদেশীয় রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হওয়া বা অষ্টাদশ শতকে নবোত্থিত কলিকাতায় এসে ইংরেজদের সাথে কারবার করে ধনে-মানে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠা দেশীয় গোষ্ঠীগুলোকে, নিজেদের বানিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করতে চায়নি। বরং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাঁদের জমিভিত্তিক শ্রেণিতে পরিণত করে

---

49 ‘The big merchant or financier with his headquarters in some great centre of export or inland emporium , and his agents and dealer network reaching out to producers distributed over extensive areas, belonged to an altogether different class and was comparable with merchant princes of early modern Europe. The political turmoils of eighteenth century had by no means destroyed this class of traders. Even in her declining days Surat had Abdul Gufur, whose trade was described as ‘equal to the English East India Company’…..Ahmed Chellaby of Surat, the Armenians Cojah Sarhad and Cojah Wazid of Bengal, Suncarama Chetty of Coromondel Coast and the famous Jagat Seth, ‘merchant of the world’ were among other traders and financiers who commanded immense resources and had considerable influence with the political authorities. These are the men who participated in overseas trade with their own ships, acted as creditors to the nobility and the administration, and at times were involved in revenue farming as well.’ দ্রষ্টব্য, Tapan Raychaudhuri, “The mid-eighteenth century background”, in Dharma Kumar and Meghnad Desai, eds, ‘Cambridge Economic History of India’, p. 30.

50 Tapan Raychaudhuri, “The mid-eighteenth century background”, p. 23.

51 বিনয় ঘোষ, “টাকা আর টাকা আর মন”, বিনয় ঘোষ, ‘মেট্রোপলিটনঃ মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ’, পৃ ২১-৩১।

52 বিনয় ঘোষ, “বাংলার নবজাগরণঃ সমীক্ষা ও সমালোচনা”, বিনয় ঘোষ লিখিত, ‘বাংলার নবজাগৃতি’, (কলিকাতা ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৫৫), পৃ ১৪২-১৬১।

53 বিনয় ঘোষ লিখেছেন, ‘কোনো বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লণ্ডন শহর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ‘London has never acted as England’s heart but often as England’s intellect and always as her moneybag.’ কলকাতা শহর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যায়...কলকাতা শহরও তেমনি কোনোদিন বাংলাদেশের হৃদয়ের পরিচয় দেয়নি, তার মননশক্তি ও মানিব্যাগের পরিচয় দিয়েছে।’ বিনয় ঘোষ, “টাকা আর টাকা আর মন”, পৃ ২২।

এমন একটা শ্রেণি তৈরি করতে চেয়েছিল, যে শ্রেণি এদেশে কোম্পানির বাণিজ্যিক উদ্যোগে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে, প্রতিদ্বন্ধীর নয়।[54] ১৭৯৩ সালের ৬ মার্চ এক চিঠিতে কর্নওয়ালিস লিখেছিলেন, "The large capitals possessed by many of the natives, which they will have no means of employing ... will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is declared to be secured."[55] কর্ণওয়ালিশের উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, লাহা ও মল্লিকরা, পাইকপাড়ার রাজা সিংহরা, হাটখোলা ও রামবাগানের দত্তরা সকলেই এতদিন ইংরেজের সাথে বহুধামুখীন কারবার করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, সেই অর্থ জমিদারি কেনার কাজে ব্যয় করেন। ব্যবসায়িক উদ্যোগের খাঁতে বৃহত্তর পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রোধ হয়। নগর কলিকাতার ব্ল্যাক টাঊন অংশে বাংলা, বিহার, ঊড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারির করের টাকায় রাজকীয় জীবনযাপন, বিলাস-ব্যসনের ঝোঁক বাড়ে।

এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে, যেকোনো সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুগত পরিবর্তনের নাড়া একসাথে গ্রথিত। তাই কোনো ঔপনিবেশিক সমাজের বস্তুগত পরিবর্তন তখনই শুরু হয়, যখন সেই সমাজ বহির্শক্তিকে নিজেদের প্রভু হিসেবে স্বীকার করে। শাসক হিসেবে উপনিবেশবাসীদের কাছে স্বীকারযোগ্যতা অর্জনের প্রথম ধাপ হল, তাদের সমাজে এমন কিছু শ্রেণির সৃষ্টি করা বা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা, যারা নতুন অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে প্রভাবশালী হওয়ার উপযুক্ত। অর্থাৎ মোঘলী আমলের সীমায়িত অর্থব্যবস্থায় প্রতিপত্তিশালীদের সাথে পাল্লা দিয়ে যারা (জয়েন্ট স্টক কোম্পানি তাড়িত নতুন অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে) সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম। তাই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে নতুন সক্ষমতার ক্ষেত্রে যারা পা গলিয়েছিলেন, তাদের বেশিরভাগই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উদ্‌ভুত শহুরে জমিদারকূলে পরিণত হয়ে দেশীয় সমাজের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সামাজিক প্রভু হয়ে উঠলেন। তাদের জীবনযাপন, ভোগ-বিলাসও সচ্চলতার আদর্শ হয়ে ধরা দিল। সেই জীবনযাপনের ছিটেফোঁটার স্বাদ পেতেও গ্রামীণ চাষা, কারিগরদের মধ্যে কলকাতা যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছিল। কলকাতা এসে অভিজাত বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করে, মুটে বয়ে, দিনমজুরি করেও তারা যখন গায়ে শহুরে জীবনের সামান্য চিহ্ন নিয়ে, গন্ধ নিয়ে গ্রামে ফিরতেন – গ্রাম্য জীবনের বিস্ময়ের অন্ত থাকত না।[56] আর উনিশ শতকের বিশের দশক থেকে যখন কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি খুলে যাবে, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ প্রশাসনে বা বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানির অধীনে কেরানিগিরির সুযোগ বাড়বে, তখন তো ভবিষ্যতের নিরাপদ জীবনের সংস্থানের জন্য কলকাতার স্বপ্ন আরও অভিভুত করতে থাকবে

---

[54] 'In Eastern India racially discriminating administrative policies (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো) cartels against Indian competitors….By stimulating the marginal development of economy upto the certain point and keeping in cheek the further development of productive forces, British capitalism hindered the growth of Indian enterprise and the formation of industrial capitalist class rooted in the soil.' Rajat Kanta Ray, 'Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927' (Delhi: Oxford University Press, 1984), p.4.

[55] Second Report of Select Committes, 1808-1812, app IX, p. 103; বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০', পৃ ১৯।

[56] বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০', পৃ ৪৯।

সাধারণকে। শুধু সাধারণকেই কেন, পাড়াগাঁয়ের জমিদারদেরও।[57] গীতা মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিদারদের সাথে খাজনা প্রশ্নে প্রজাদের মতানৈক্য ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রজা বিদ্রোহ যতই বাড়বে, ততই জমিদার বংশের পরবর্তী প্রজন্মকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিরাপদ চাকুরির দিকে ঠেলে দেবার প্রবণতাও বাড়বে।[58]

কিন্তু এই পুরো চিত্র থেকে বাংলার মুসলমানরা যেন অদৃশ্য হয়ে রইলেন। গোপাল হালদার লিখেছেন, 'সেই যে মুসলমান সমাজ রাজ্য হারিয়ে আহত ক্ষুব্ধ হয়ে রইল তারপরে সে হল বিদ্রোহী – শুধু বিধর্মীর শাসনের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত পরধর্মের বিরুদ্ধেও শুধু নয় – একেবারে কালধর্মের বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহী হল। পরাজিত মুসলিম নেতারা ভাবলেন, পরাজয়ের কারণ – তাঁরা সত্যকার ইসলামকে জীবনে যথার্থভাবে রূপ দেননি, তাই তাদের পতন ঘটেছে। অতএব, বিশুদ্ধ ইসলাম, বিশেষ করে, ওহাবি পিউরিটানিক মতবাদ হল তাঁদের তখনকার জীবনের আদর্শ।'[59] সমাচার দর্পণে ১৮৩২ সালে ওয়াহাবি (চরমপন্থী ইসলাম) মণিউদ্দীন ও তিতুমীরের উপদেশক সৈয়দ আহমদের কথা লেখা হয়, যিনি কিনা প্রতি শুক্রবারে কলিঙ্গার মসজিদে ইসলাম ধর্মোপদেশ দিতেন এবং 'যাহারা খ্রীষ্টিয়ান বা হিন্দু সম্পর্কীয় তাহারদিগকে কাফর বলিয়া অত্যন্ত দ্বেষ' করে বলতেন 'আমি প্রবল হইলেই ঐ বেটারদিগকে জব্দ করিব।'[60] ফলত শাসক ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হতে শুরু করে। এটা ঠিক যে, ওয়াহাবিদের সাথে সাথে ফরাজিরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুব বাংলায় ক্রমবর্ধমান জমিদারি পীড়নের হাত থেকে মুসলিম প্রজাদেরকে রক্ষা করা এবং মুসলমান সমাজকে কুসংস্কার থেকে তুলে যুগোপযোগী করে তোলা। কিন্তু সেই আন্দোলনের গতিপথও শেষ পর্যন্ত 'ওয়াহাবি'তেই মিলে যায়। কারণ এই পুরাতনপন্থীরা ফরাজিদের প্রকৃত মুসলমান ভাবতে নারাজ ছিলেন। গোপাল হালদার লিখেছেন, ''ফরাজীদের' সঙ্গে পুরনো মওলবী মোল্লার ফতোয়া মত সাধারণ মুসলমান একসঙ্গে নমাজ পড়তেও অস্বীকার করতেন।' শুদ্ধ ইসলামে ফিরে যাওয়ার ডাক দিয়ে মুসলিম সমাজে এই রব তোলা হয় যে, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা, স্কুল কলেজ, শিক্ষা-দীক্ষা নয়; ভারতীয় বা বাঙালী যৌথ উত্তরাধিকার বা সংস্কৃতির অনুশীলনও আর নয়; এমন কি সংশোধন করে না নিলে বাঙালী মুসলিম ঐতিহ্যও নিয়ো না।' তাই ইংরেজি ভাষা তো দূর অস্ত, বাংলা ভাষার চর্চাতেও তাদের আগ্রহ জন্মায়নি। এম. কে. এ. সিদ্দিকি লিখেছেন, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাথে মুসলিম মৌলবিরাও ছিলেন। যদিও তাঁরা কেউ বাংলার চর্চা করেননি।[61] এ এফ সালাহুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, ১৮১৭ সালের কলিকাতায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং ১৮১৮ সাল 'ক্যালকাটা স্কুল

---

57 কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, (কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক স্টোর, ২০১৩), পৃ ৬।

58 গীতা মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা (সেকাল ও একাল পর্ব)', (কলিকাতা: কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত); গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', (কলিকাতা: অগ্রণী বুক ক্লাব, মে ১৯৪৭)।

59 গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', পৃ ৫৫-৫৬।

60 'জাবনিকোপদেশ', সমাচার দর্পণ, ২৮ জুলাই ১৮৩২।

61 M. K. A. Siddiqui, 'Muslims of Calcutta: A Study in Aspects of Their Social Organisation', (Kolkata: Anthropological Survey of India, June 2005), p. 24.

সোসাইটি'র পরিচালন কমিটিতে যথাক্রমে চার জন করে মুসলিম সদস্য ছিলেন। তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে ফারসি, আরবি পুস্তক পুস্তিকা প্রনয়ন করেছেন শুধু।[62] স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এঁরা কেউ বাংলা বই লেখেননি। ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, উনিশ শতকের প্রথম পাঁচ দশকে পুরোপুরি বাংলা ভাষায় কোনো পত্রিকাও মুসলমানদের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়নি। তাই গোপাল হালদার এই সিদ্ধান্তে আসেন, মধ্যযুগীয় যৌথ বাঙালি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বারো আনাই এভাবে অবহেলিত হয়।[63] মুসলমান সমাজ ১৮৭০ সালে হেস্টিংস-এর কাছে আরবি-ফারসি শিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা খোলার তদ্বির করে, কিন্তু ১৮২৯ সালে তাতে ইংরেজি শিক্ষা চালু করা হলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪২ জন। ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হলে, তাতে ইংরেজি বিভাগে মুসলিম ছাত্র ছিল ৩১ জন, হিন্দু ছাত্র ছিল ৯৪৮ জন। ১৮৩৭ সালে রাজভাষার স্থান থেকে ফারসিকে সরিয়ে ইংরেজির গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হলে, ১৮২০'র দশক থেকে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণি হিন্দুরা সরকারি চাকরিবাকরিতে অনায়াসে সুযোগ পেতে শুরু করেন। কিন্তু মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়ে।[64] গোপাল হালদারের ভাষায়, 'কাজেই উনিশ শতকের মুসলমান জীবন অভিমানে বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত, ধর্মান্দোলনে আন্দোলিত --- আর সৃষ্টি-চেতনায় বন্ধ্যা হয়ে রইল। সমস্ত বাংলা দেশে উনিশ শতকের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সামাজিক সংস্কারে, আর প্রগতিমূলক জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানের তাই কোনো দান নাই।'[65] আর অন্যদিকে জমিদারি, চাকরি-বাকরিতে অগ্রগণ্য হিন্দুদের মধ্যে মধ্যবিত্ততার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সহ-নাগরিকত্বে মুসলমানদের অনুপস্থিতি, হিন্দু সমাজে কিছু ভ্রান্ত ধারণার তৈরি করে। গোপাল হালদার লেখেন, উনিশ শতকীয় হিন্দু মধ্যবিত্ততার বিকাশের এক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়; হিন্দুরা '...ধরে নেন – ভারতীয় মুসলমান এদেশের শিক্ষা-সভ্যতা ও অতীতকে শ্রদ্ধা করেন না; এদেশের সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আপনার বলে মনে করেন না; এ দেশকেই তাঁরা মনে করেন না নিজেদের 'স্বদেশ'। কাজেই মুসলমান ধর্ম যেমন বিদেশীয়, মুসলমানকেও হিন্দুরা ধরে নিলেন বিদেশীয়; এবং হিন্দুত্ব ও হিন্দু রীতিনীতিকে সহজভাবে মনে হল "জাতীয়" ধারা। এ এক শোচনীয় ভুল।'[66] এ ভুল এদেশের দৃশ্যায়িত সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ -- পারিচ্ছদিক সংস্কৃতিতে কি ফল প্রসব করেছে, তা সন্দর্ভের অগ্রগতির সাথে সাথে পরিষ্কার হবে।

রুচির পরিসর

হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির মধ্যে যে চিড় উনিশ শতক জুড়ে ধীরে ধীরে প্রকট হয়েছিল, তার সচেতন প্রকাশ উনিশ শতকের শুরুতেও ছিল না। কারণ উপনিবেশজাত স্বতন্ত্র ক্ষমতার সংস্কৃতির দ্বারা পূর্ববর্তী ক্ষমতার সংস্কৃতি একনিমেষে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে না। যেকোনো

---

[62] A. F. Salahuddin Ahmed, 'Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-1835', (India: RDDHI, June 1976), p. 24.

[63] গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', পৃ ৫৭।

[64] ওয়াকিল আহমেদ, 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা', পৃ ২৭, ৩৪।

[65] গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', পৃ ৫৬-৫৭।

[66] তদেব।

ভূখণ্ডের সামাজিক পরিবেশ ও তার প্রতিবেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিশ্বে গজিয়ে ওঠা শক্তিকে নিজস্ব বিকাশের মডেল হিসেবে ধরে নিয়ে, সে ভূখণ্ডের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন শুরু হয়। অর্থাৎ আগত সংস্কৃতির সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক সম্পর্ক স্থাপনার ভেতর দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আন্তরিক পরিসরের সাথে সাথে বাহ্যিক শিষ্টাচারের পরিসরেও পরিবর্তন শুরু হয়।[67] নবাগত ক্ষমতাধরদের হাত ধরে আসা সামাজিকতার পারিচ্ছদিক পরিসর, স্থিত পরিসরের সাথে জারণ-বিজারণ করে একটা স্বতন্ত্র পারিচ্ছদিক পরিসর তৈরি করে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য মান্য পরিসরের মতো, পারিচ্ছদিক পরিসরেরও সামাজিক বিকাশের একেকটা ধাপ পেরিয়ে পূর্ণ অবয়ব পেতে দশকের পর দশক সময় লেগে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক আবহাওয়া থেকে নতুন আবহাওয়ায় এসে, পরবর্তীকালে উপনিবেশিক শক্তি হয়ে ওঠা গোষ্ঠীর মধ্যে ঔপনিবেশিকতার একদম প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয়/উপনিবেশের সংস্কৃতির দ্বারা জারিত হওয়ার উদাহরণও কম নেই। একদিকে এর পিছনে কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক আবহাওয়ায় এসে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, বা গ্রহণযোগ্যতা তৈরির চেষ্টা, অন্যদিকে নিজেদের দেশীয় সমাজের দ্বারা বঞ্চনার স্বীকার হওয়াও এর পশ্চাতে কারণ হিসেবে থাকতে পারে। কারণ, সামন্ততন্ত্র পরবর্তী কালে 'নতুন বিশ্ব আবিষ্কার'এর মানে ছিল, পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিসমূহের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার জন্য নতুন অর্থনৈতিক বিচরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার। যে আবিষ্কারের ফল পশ্চিম ইউরোপে 'ল্যান্ড এনক্লোজার' এর ফলে ভূসম্পত্তির অধিকার থেকে ব্রাত্য হয়ে পড়া পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানরা যেমন ভোগ করেছেন, তেমনি ইউরোপীয় সমাজে দারিদ্র্যের অভিশাপে ব্রাত্যরাও।[68] সন্দর্ভ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিষয়গুলির খোলস উদঘাটিত হতে থাকবে।

ইংরেজ কোম্পানি প্রভাবিত অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল ও ইংরেজদের সাথে চলাফেরা করতে গিয়ে এদেশীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের সামাজিক শিষ্টাচারে বাবুয়ানি প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের সেই বাবুয়ানিতে তখনও ইংরেজিয়ানার পূর্ণ প্রবেশ ঘটেনি। বলা ভালো, 'ফিরিঙ্গিপনা'র[69] জন্ম হয়নি। বাঙালি হিন্দুরা তখনও ইউরোপীয়দেরকে গো-খাদক, শূকর-খাদক সাব্যস্ত করে, তাদের উপর অস্পৃশ্যতার তকমা লাগিয়ে নিজেদের সামাজিক বাঁধন বজায় রাখার চেষ্টা করত। তাছাড়া তাদের সামাজিক শিষ্টাচারে পূর্ববর্তী মুঘল শিষ্টাচারের প্রাধাণ্যই ছিল বেশি। চকবাজারের বাবু প্যালানাথের কথাই ধরা যাক। তিনি অতিশয় ধার্মিক লোক। 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস ও উত্থান ও শয়নে নির্জ্জলা করে থাকেন।'[70] ১২১৯ বঙ্গাব্দে (১৮১২-১৮১৩) তিনি কিন্তু সারবর্ন সাহেবের কাছে তিনমাস ইংরেজি লেখাপড়া শিখেছিলেন।

---

67 Pierre Bourdieu, 'Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste', (Cambridge: Harvard University Press, eighth printing, 1996).

68 Sarmistha De, 'Marginal Europeans in Colonial India; 1860-1920', (Kolkata: Thema, 2008), pp.6-7.

69 মূলত উনিশ শতকে প্রাচীনপন্থীদের সাথে আধুনিকদের রুচির পরিসরে যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল, সেই সংঘাতে আধুনিকদের সামাজিক চাল-চলন প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা বার বার 'ফিরিঙ্গিপনা' হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, 'বেহিমিয়ান', ভারতবর্ষ পত্রিকা, ২৩ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪২।

70 কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, পৃ ১৮।

যদিও তা কেবল ইংরেজদের সাথে কারবারের প্রয়োজনে। তা ভিন্ন ইংরেজি কেতা তার না-পসন্দ ছিল। ‘মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবারাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পছন্দ।’ তাই ‘লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানে চুড়িদার, পায়জামা, রামজামা, কোমড়ে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমতো পোশাক।’[71] অবশ্যই দরবারি রুচির দিক থেকে এই পোশাক যথোপযুক্ত। ভারতের রাজদণ্ড লাভের আগে বহু ব্রিটিশও এই গরমের দেশে দরবারি পরিচ্ছদ রুচি অনুশীলন করতেন। কিন্তু ইংরেজ সহবাসে থেকে বাঙালি বাবুর পোশাকে-আসাকে, আচার-আচরণে ইংরেজি রুচির প্রকাশ শুরু হয়। ১৮১২ সালেও প্যালানাথ বাবু নবাবি কেতাকে কাজের তাগিদে ইংরেজি শিখেও ধরে রেখেছিলেন; কিন্তু ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনার পর ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত কলিকাতা নিবাসী বাবুর সন্তান-সন্ততিরা সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় জারিত হয়ে পাশ্চাত্য রুচির সাথে একাত্মতা অনুভব করতে থাকেন। শিক্ষান্তে এরা টেবিল চেয়ারে বসে মজলিস করেন। চুরুট ফোঁকেন। চা পান করেন পেয়ালা করে। ডিকান্টরে ব্রান্ডি খান। এদের আলোচনা সর্বদা ‘হরকরা’, ‘ইংলিশম্যান’, ‘ফিনিক্স’, ‘পলিটিক্স’, ‘বেস্ট নিউজ অফ দ্য ডে’ নামক সংবাদপত্রগুলো নিয়ে।[72] তাছাড়া তারা বাঁকা সিঁতেই চুল পেতে আঁচড়িয়ে অ্যালবার্ট ফ্যাশন রপ্ত করতেও শুরু করেন। আলবার্ট ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিচয় জানান দিতে পাগড়ী পরাও প্রায় ছেড়ে দেন। হুতোম উনবিংশ শতকে পুরুষের চুলের ফ্যাশনে পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আভাস দিয়েছেন। তিনি বলছেন, কলকাতার নব্য সভ্যতা অভিলাষী সর্বস্তরের হিন্দু ‘থরকামান চৈতন্য ফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফ্যাশন ভর্ত্তি হলেন।’ সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এদেশে ইংরেজ শাসনের মেয়াদ যতই বেড়েছে, ততই অনেকেই নিজেদের ‘আলবার্ট ফ্যাশানের জায়গায় ওয়েলসী’ ফ্যাশানে ভর্ত্তি করেচেন।’ অর্থাৎ যে হিন্দুরা একসময় মাথার শিখায় একগুচ্ছ চুল রেখে মাথার বাদবাকি দিকগুলো চেঁছে ফেলতেন, তারা আলবার্ট ফ্যাশন অনুশীলন করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই জায়গায় ধীরে ধীরে ওয়েলসী ফ্যাশন এসেছিল। হুতোম এসব ইংরেজি চুলের ফ্যাশনগুলো নিয়ে বিশদে বলছেন, ‘কুইন ভিকটোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস মস্তকের মধ্যভাগ থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সিতির ন্যায় চুল ফিরোন। রাজকুমারের পিতা প্রিন্স আলবার্ট বাঁকা সিঁতি কাটিতেন। পিতাপুত্রের চুল ফিরোনোর অনুকরণকে আলবার্ট ফ্যাশান ও ওয়েলসী ফ্যাশান বলে।’ কিন্তু দেশীয় সমাজের সকলেই এই ফ্যাশনের দিকে ভালো চোখে যে দেখেননি, অর্থাৎ সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে প্রতিটি নতুন রুচিকে যেতে হয়েছিল, তাও হুতোম বিশদে বর্ণনা করেছেন। যেমন ওয়েলসী ফ্যাশনে মাঝখানে সিঁতি করে একজন গন্ধবনিক (যারা কিনা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় সুগন্ধদ্রব্য, মশলা, তেজপাতা ইত্যাদি নিয়ে সমুদ্র বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতেন, সেদিক থেকে ঐতিহাসিকভাবেই তাদের মধ্যে অন্য সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করবার একটা গুন ছিলই) যখন কাজে যাচ্ছিলেন, তার সিঁথিতে আরেকজন বাঙালি ভদ্রলোক সিঁদুর লেপে

---

[71] তদেব।

[72] তদেব, পৃ ৭।

হেনস্থা করেছিলেন। এরূপ বহু ঘটনা সেসময় হামেশাই হত। হুতোমের মতে, ‘আজ কাল যেরূপ অনুকরণের ধুম, তাহাতে এরূপ করাই ভাল।’[73]

ইংল্যাণ্ডের রাজন্য এবং ভারতে তাঁদের প্রতিনিধিদের অর্থাৎ সপ্তম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ, লর্ড মেশো, লর্ড রিপন প্রমুখদের অনুকরণ করে দাড়ি রাখাও হয়ে যায় আধুনিকতার চিহ্ন।[74] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সেকালীন মধ্যবিত্ত পুরুষের চুল-দাড়ির ফ্যাশন নিয়ে লিখেছিলেন, ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কালে বাবরী চুল রাখা ছিল রীতি; ইংরেজ আমলে অ্যালবার্ট তেড়ী ও অ্যালবার্ট-কাট্ দাড়ি হল বাবুদের ফ্যাশান।’[75] ‘চাপ দাড়িতে চশমা’ হয়ে ওঠে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আধুনিকতার রূপায়নের অন্যতম ভঙ্গি।[76] চুল-দাড়ির ফ্যাশনে দ্বিমুখীন প্রবাহ খেয়াল করেছেন যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ‘সেকালে প্রায় সকলেরই মাথায় কেশ চারিদিকেই সমান থাকিত। যাহারা সৌখিন ও বিলাসী ছিলেন, মাথায় সিঁথা কাটিতেন, তাঁহাদের সম্মুখের কেশ পশ্চাদ্দিকের কেশ অপেক্ষা কিছু বড় থাকিত। সেকালে অনেককেই ঘাড় কামাইতে দেখিতাম, ঘাড়ের কাছে – যেখানে কেশের সীমা শেষ হইয়াছে , সেইখানটায় ক্ষৌরকার্য করা হইত, তাহার উপর নহে। আজকাল যেরূপ দুই রগ ও মাথার পশ্চাৎ ভাগ প্রায় কেশশূন্য করিয়া চুল ছাঁটা হয়, সেকালে সেরূপ ছিল না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের সকল ফ্যাশনই সমাজের উচ্চ স্তর হইতে নিম্নস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কেবল দুইটি বিষয় নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজকাল এই যে বাঙালী ভদ্র যুবকগণের বোধ হয় পোনর আনা রকমের রগ ও ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটিতে দেখি, ঐ ফ্যাসান এখনকার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মুসলমান কোচম্যান ও বিড়িওয়ালা শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন দেখিতেছি উহা ক্রমশঃ সমাজের উচ্চ স্তরেও সসম্মানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।’[77] যোগেশচন্দ্রের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট, উনিশ শতকীয় আধুনিকতার যে পোশাকি শিষ্টাচার গড়ে উঠেছিল, তা বিশ শতকের মধ্যভাগে গিয়ে রূপ পরিবর্তন করতে শুরু করে। কিন্তু উনিশ শতক জুড়ে গড়ে ওঠা আধুনিকতার পোশাকি শিষ্টাচার যে মধ্যবিত্তের মনন গড়ে তুলেছিল, তাও তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। কারণ বিশ শতকের মধ্যভাগে মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবাদের মধ্যে সমাজের নিম্নশ্রেণির চুলের ফ্যাশনের অনুপ্রবেশে যেন তিনি কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ।

সুতরাং উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকেও আধুনিকতার পারিচ্ছদিক ভাষ্যের নির্মাণে পুরাতন অনেক প্রথা হয়ে উঠতে থাকে অশিষ্টাচারের লক্ষণ। যেমন হিন্দুসমাজে মধ্যযুগ ধরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকা চূড়াকরণ প্রথা। এই প্রথায় সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে বাঙালি হিন্দু কিশোরদের কর্ণভেদ (কান ফোটানো) হত। ঠিক মুসলমান কিশোরদের যেমন সুন্নত বা

---

73 ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা, সমাজ কুচিত্র ও পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব’, (কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৩৬৩), পৃ ১৩, ১৫৮।

74 সভ্যতার বাহ্যচিহ্ন হিসেবে উনবিংশ শতকের হিন্দু যুবাদের গালভর্তি দাড়ি কিভাবে দৃষ্ট হচ্ছিল তা কাটীরাম ঠাকুরের লেখা থেকে বোঝা যায় – ‘এখনকার দাড়িওয়ালা যুবকদিগের কাছে ভণ্ডামি করিয়া কেহ যে পার পাইয়া যাইবেন তাহার যো কি? বর্ত্তমান কালের যুবক দল অত্যন্ত হুসিয়ার, কোনরূপ ভেলকি মেলকি দেখে ইহারা কোনরূপেই ভুলিবার ছেলে নহে।’ কাটীরাম ঠাকুর প্রনীত ‘আটাকাটি’, (কলিকাতাঃ সংস্কৃত প্রেস, ১২৯১), পৃ ২।

75 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘ফিরে ফিরে চাই’, (কলিকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭), পৃ ১১১।

76 শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, ‘পশ্চাদ্দৃষ্টি’, প্রবাসী, ফাল্‌গুন ১৩৬৮, পৃ ৬৮৯।

77 যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘সেকালের পরিচ্ছদ’, বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪০।

খৎনা (শিশ্নের অগ্রচর্ম কর্তন) করা হত। ব্যক্তিশরীরকে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সামাজিকতার ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নায়িত করাই ছিল এর অন্যতম কারণ। যৌবনের প্রারম্ভে এই সামান্য শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারা যেন, ভবিষ্যতের আপদকালীন সময়ে ব্যক্তিকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ রাখার প্রস্তুতি। বিপিনচন্দ্র পাল এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন -- 'সমাজগঠনের শৈশবাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কোন একটা অঙ্গ ক্ষত করিয়া সে যে বিশেষ কোনও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ইহা জানাইতে হইত। ধর্মের একতা, আচারবিচারের একতা – এসকলের দ্বারা সামাজিক ঐক্য বহু পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম যখন বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই, সামাজিক রীতিনীতি যখন প্রাচীন শ্রুতি ও স্মৃতির উপরে গড়িয়া উঠে নাই, তখন এক একটা বাহিরের চিহ্নের দ্বারা কে কোন গোষ্ঠির লোক ইহার পরিচয় হইত। বোধহয় সেই সময়ে আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে এই কর্ণবেধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।'[78] আর সময়ের সাথে সাথে মানুষের গোষ্ঠীগত জীবনের রূপ যতই নখদন্ত নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততই এইসব প্রথা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে। বাংলার লোকায়ত সামাজিক পরিসরেও তাই উনিশ শতকে প্রশ্ন উঠেছিল, "সুন্নত দিলে হয় মুসলমান/ নারীলোকের কি হয় বিধান।/ বামন চিনি পৈতে প্রমাণ/ বামনী চিনি কি করে।।/...আসা কিংবা যাওয়ার কালে/ জাতের চিহ্ন রয় কারে।।' আবার উনিশ শতকের বিশের দশক থেকে হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদের প্রচার ও প্রসার চূড়াকরণের মতো আনুষ্ঠানিকতাকে সেকেলে আচারে পরিণত করে। তাই কেবলমাত্র বিবাহের দিনকার একটা প্রতীকী আচারে পরিণত হয় চূড়াকরণ। কারণ উনিশ শতকীয় পটপরিবর্তনে হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত ও পাশ্চাত্য বাজারচালিত 'আধুনিকতা'র সাথে হিন্দু সাত্ত্বিকতার একটা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। সেই দ্বন্দ্বে এগিয়ে থাকা শক্তি অবশ্যই 'আধুনিক' মনোভাবাপন্ন দেশীয়রা। কারণ যুগের হাওয়াকে অস্বীকার করবার জো ছিল না।

হিন্দু কলেজের পত্তনের প্রথম দিকে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের বোন এমিলি ইডেন সেখানকার এক ছাত্রের ছবি এঁকেছিলেন (ছবি ১.১)। তাঁর মাথায় বড় পাগড়ি, অঙ্গে সোনা ও মুক্তোর গহনা। পরনে ঢোলা আঙরাখা ও ইজার। পায়ে নাগরাই।[79] অর্থাৎ সাত্ত্বিক মোঘলী দরবারি রুচির পোশাক। বলা বাহুল্য 'ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র, কেহ কেরানীর ভাই, কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতুষ্পুত্র, কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র ...।'[80] ইংরেজি সভ্যতা, অর্থনৈতিক প্রভাবে দ্রুত পাল্টে যাওয়া সময়ে নিজেদের মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে সকলেই সরকারি চাকুরির অভিলাষী হয়ে ইংরেজি শিক্ষার দিকে পা বাড়াবেন[81] এবং এদের মধ্যে যারা সরকারি কাজে নিযুক্ত হবার সুযোগ পাবেন,

---

[78] বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', (কলকাতাঃ পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃ ৫৫-৫৮।

[79] শ্রীপান্থ, 'কলকাতা', পৃ ৩১৭।

[80] সমাচার দর্পণ, ২৭ শে মার্চ ১৮৩০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড', (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চৈত্র ১৩৭৭), পৃ ২৭।

[81] কার্তীরাম ঠাকুর ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর দ্রুতহারে পরিবর্তিত জীবনমানের কথা লিখেছেন –ইংরেজ আগমনের পূর্বে পাঠশালাগুলোতে 'কোন খানে ৩০, কোন খানে ৪০ এবং কোন স্থানে বা শতাধিক ছেলে জমিয়া, "ক নিক", "খ নিক" বলে উচ্চরবে সুর করিয়া পড়ে পড়ে লিখিত; আর শুভঙ্করের আর্য্যা মুখস্ত করিয়া কড়ীকসা, মণকসা প্রভৃতি অঙ্ক কসাইট আরম্ভ করিত। এই সকল লেখাপড়াতেই তখনকার নবাব সরকারে ও জমিদারের জমিদারীতে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মকাজ শিক্ষা করিত এবং তাহাতেই তাহারা একরূপ করিয়া চালাইত। ... এইসকল লোক সুশিক্ষিত হইলে, কেহ পাটয়ারিগিরি, কেহ মুহুরিগিরি, কেহ দাওয়ানী ও কেহ কেহ বা নায়েব দাওয়ানী করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা

তারা ‘হবসন-জবসন’ সেজে আপিসে যাবেন।[82] পায়ে ধুসর রঙের গ্লেজক্লিডের পাম্পশু পরবেন। উরুর সঙ্গে গার্টার দিয়ে টানা হাফ-মোজা পরবেন। তার সাথে ন’গজ চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ধুতি। তার কোঁচাটি আবার জুতো থেকে আধ হাত উপরে প্রলম্বিত থাকে মত করে গোঁজা। বা কখনো কখনো পায়ের পাতার উপর প্রলম্বিত। আর ধুতির উপর গলাবদ্ধ কোটের নিচে ইংলিশ কফ সার্ট পরার চলও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হচ্ছিল। এই সাজ পোশাকের বাবুয়ানিতে, অনেকের কাছেই বাবুর পরিচয় একটা জগাখিচুড়ি যেন। এই জগাখিচুড়িত্বই বাবুকে একটা সময়ের দোদুল্যমান পরিচিতির আলোকে দাঁড় করিয়ে দেয়।[83] ক্রান্তীয় আর্দ্র আবহাওয়ায় এরূপ পাঁচমিশেলি পারিচ্ছদিকতা ছাড়া আধুনিকতার আস্বাদন সম্ভবও ছিল না অবশ্য।

নির্ব্বাহ করিত। তখন এখনকার মতো খোলা ভাটি ছিল না এবং বিলাতি মদেরও এত আমদানি ছিল না সুতরাং যে ব্যক্তি মাসে ১৫ টাকা বেতন পাইত তাহারও বারো মাসে তেরো পর্ব্ব ফাক যাইত না। আজি কালি পূর্ব্বপেক্ষা লোকে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছে কিন্তু মদ ও বারাঙ্গনারূপ শনির দৃষ্টিতে কেহ যে দশ টাকা হাতে করে কোন ক্রিয়াকলাপ করিবেন তাহার যো নাই।’ কাটীরাম ঠাকুর প্রনীত ‘আটাকাটি’, পৃ ৭।

82 Yule & Burnell অনুসারে ভারতে শিয়াপন্থী মুসলমানরা যখন মহরমের তাজিয়া অর্থাৎ হোসেন-হাসানের সমাধির প্রতীক নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরুত, তখন তারা “ইয়া হাসান! ইয়া হোসেন!” বুক চাপরে বিলাপ করত। এই পুরো বিষয়টিই সেকালীন ভারতবাসী ব্রিটিশদের কাছে একটা তামাশার মতন ঠেকত। তাই “ইয়া হাসান! ইয়া হোসেন” তাদের কাছে উচ্চারণগত পরিবর্তিত হয়ে ‘হবসন-জবসনে’ (‘Hobson-Jobson’) পরিবর্তিত হয়েছিল। যা বলতে তারা তামাশা বোঝাত। হিন্দু রথযাত্রার বিশাল রথ, ভিড় ও জগন্নাথকে দেখে তাদের শব্দভাণ্ডারে একইভাবে জগ্‌নাথ বা “juggernaut” বলতে প্রকাণ্ড, বিশাল কিছুকে বোঝাত। Henry Yule & A.C. Burnell, ‘Hobson-Jobson: The Definitive Glossary of British India’, (Oxford: Oxford University Press, 2015), p. 261, 288.

83 উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই পরিচিতির এই দোদুল্যমানতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, ‘বাল্যকালে কাহিনীতে শুনিয়াছিলাম – রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সিদ্ধির ঝুলি তুমি কার?’ ঝুলি বলিল, ‘যখন যার কাছে থাকি, তখন তার।’ বাঙ্গালির প্রকৃতি এই ঝুলির মত – যখন যার কাছে থাকে, তখন তার। বহুরূপীর ন্যায়, যখন যে সাহচর্য্যে থাকে, তখন সেই বর্ণ ধারণ করে। এই কারণে, সে সময়ের বঙ্গসমাজের রুচি মুসলমানের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। এখনকার বাঙ্গালি যেমন ইংরেজের কাছে কোট পেন্‌টুলন পরিতে, চপ কাটলেট খাইতে শিখিয়াছে, তখন তেমনি মুসলমানের কাছে ইজার চাপকান পরিতে, কোর্মা কাবাব খাইতে শিখিয়াছিল। আজ যেমন ইংরেজের দেখাদেখি এই সাত শত বৎসরের দাসজাতি রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছে, তখন তেমনি মুসলমানের দেখাদেখি ‘দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা’ বলিয়া বিধর্মী অত্যাচারীর পদতলে তটস্থ হইয়া মস্তক নত করিয়াছে।’ অর্থাৎ বাঙ্গালির যাবতীয় পরিবর্তনশীলতা ক্ষমতাকে আশ্রয় করে, সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোয় নিজেকে প্রতিস্থাপিত করবার তাগিদে। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত ‘সারস্বতকুঞ্জ’, (কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী ষ্টীম প্রেস, ১২৯২), পৃ ৭-৮।

চিত্র ১.১ এমিলি ইডেন অঙ্কিত হিন্দু কলেজের ছাত্র

(সূত্রঃ Miss Emily Eden, Portraits of the Princes and People of India, (Duchess of Kent: J. Dickinson & Son, 1844) @Royal Collection Trust).

এ না হয় গেল অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতকে রুচিশীলতার বাহ্যিক পরিবর্তনের সামান্যতম নিদর্শন। যে রুচিকেন্দ্রিক সামাজিক পরিবর্তনমানতার ইতিহাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উঠে আসা এবং রুচিচালিত সামাজিক রাজনীতির ভরকেন্দ্রে পরিণত হওয়া বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে পোশাকি রুচিতেই কেবল পরিবর্তনের সূচনা হয়নি। বস্তুগত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও রুচির পরিবর্তন ও বিকাশ শুরু হয়েছিল। সে রুচির প্রকাশ বাবু স্থানীয়ের রাজকীয় ম্যনসন তৈরিতেই হোক বা খানাপিনাতেই হোক। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকেও উচ্চ মধ্যবিত্ত বাবুদের বৈঠখখানা ঘরটিতে বাইজী নাচের জন্য পরিসর রেখে, চারিদিকে গোল করে তাকিয়া, বালিশ পাতা থাকত। সেদিক থেকে একে বৈঠকখানা না বলে আমোদখানাই বলা যেতে পারে। তবে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এই আমোদখানাই কার্যত ইউরোপীয়ধরনের বৈঠকখানায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে চীনা ডিজাইনের ফুলদানি, শিল্পোসৌকার্যে পূর্ণ কার্পেট, ভেনেসীয় আয়না, মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র, লুইস কুইন্সের (Louis Quinze) আসবাব -- কি নেই! কোনো কো্নো বাবুর বাড়িতে আবার দুটি বৈঠকখানা থাকত। একটিতে তো ইউরোপীয় রুচির সজ্জা আছেই। অপরটিতে ভারতীয় স্টাইলের সাজ-সজ্জাই প্রাধান্য পেত। কার্পেটের ওপর সাদা তাকিয়া, বালিশ, কুশন শোভা পেত। কিন্তু ইউরোপীয়ানার প্রভাবটা মধ্যবিত্ত মননে এতটাই প্রবল হয়ে ধরা দিয়েছিল যে ভারতীয় স্টাইলের বৈঠকখানাতেও ইউরোপীয় আসবাব যেমন-- মার্বেল বসানো কনসোল টেবিল, ঝাঁড়বাতি, তৈলচিত্রের অনুপ্রবেশ

ঘটেছিল। কোনো কো্নো মধ্যবিত্তের বাড়ির বৈঠকখানায় পিয়ানো রাখারও চল শুরু হয়েছিল।[84] ১৮৭৯ সালের একটি সূত্র থেকে জানা যায়, উপনিবেশিক সরকার ব্রিটেন থেকে ভারতে রপ্তানি হওয়া আসবাব-স্বরূপ আয়নার উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু আসবাব হিসেবে রপ্তানি না হয়ে আসবাব তৈরির কাঁচামাল হিসেবে রপ্তানির প্রশ্নে আয়নার উপর বাণিজ্য শুল্ক রাখার কথা বলা হয়েছিল। ভারতকে পাশ্চাত্য রুচির আসবাবপত্র রপ্তানির মুক্ত বাজারে পরিণত করবার একটা ইঙ্গিতও এই তথ্যটি বহন করছে।[85] রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, বাঙালিদের প্রধান আহার ভাত ,ডাল, দুধ, মাছ। বাঙালি হিন্দুর এই আহারের সাথে আজন্মলালিত সংস্কার জড়িয়ে ছিল। মুরগির ডিম, মুরগির মাংস খেলে জাত যাবে এহেন ধারণা তো ছিলই; তার সাথে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে এও উল্লেখ আছে মুসলিম সামন্ত রোটি খাইয়ে হিন্দুর জাত নষ্ট করেছেন।[86] অর্থাৎ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালি হিন্দুর আচার-বিচারের বহর যথেষ্ট বেশিই ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ হলে তো আর কথাই নেই। তবে আঠেরো শতকে ইংরেজদের প্রয়োজনে কলিকাতায় যে রেস্‌টুরেন্টগুলো খোলা হয়েছিল, ১৮৩০ এর দশক থেকে সেগুলি বাঙালি পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণদের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠতে শুরু করে। হিন্দু পরিবারগুলো তখনও খাদ্যাখাদ্য বিচারের সংস্কৃতিতে আবদ্ধ হলেও তরুণেরা রেস্‌টুরেন্টে গিয়ে চপ-কাটলেট, মুরগি-মাটন-বিফ এর মত তৎকালীন হিন্দু সমাজে ‘অখাদ্য’সমূহ উদরস্মাৎ করতে শুরু করে। রাজনারায়ণ বসুর মতে, শুধুমাত্র যে ইয়াং-বেঙ্গলরাই এটা করতেন তেমনটা ভাবলে ভুল হবে। ‘একজন পাড়া গেঁয়ে জমিদার কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক ইয়ং বেঙ্গলের মতো পোশাক পরিতেন ও উইলসনের দোকানে সর্বদা যাইতেন। আপাততঃ দেখিলে কাহার সাধ্য যে বলে, তিনি ইংরেজী জানেন না। কিন্তু তাহার পক্ষে ইংরেজি ‘A’ অক্ষর গোমাংস ছিল।’[87] অর্থাৎ রুচিশীলতার একটা সার্বিক পরিবর্তন উনবিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকে চোখে পড়তে লাগল। সে পরিবর্তন পোশাকে হোক বা মধ্যবিত্তের ঘরের সাজ-সরঞ্জামে বা খানাপিনায়। তাই পূর্বোক্ত সমূহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক শিষ্টাচার ও পারিচ্ছদিকতার পরিবর্তনের সম্বন্ধকে মাথায় রেখে মধ্যবিত্তের পোশাকি পরিচিতিকে বুঝতে আমাদেরকে সহায়ক গ্রন্থ পর্যালোচনায় নামতে হয়, এবং সন্দর্ভের মূল বিবেচ্য প্রশ্নটিকে সনাক্ত করতে হয়।

সহায়ক গ্রন্থ পর্যালোচনা

[84] Nirad C. Chaudhury, ‘Autobiography of an Unknown Indian’, (Mumbai: Jaico Publishing House, 2017), pp. 412-417; Utsa Ray, ‘Culinary Culture in Colonial India’, (New Delhi: Cambridge University Press, 2015), p. 23; Rosinka Chaudhuri, ‘Modernity at Home: A Genealogy of the Indian Drawing Room’, (Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences, January 2011); শ্রীপ্রমথনাথ বসু, ‘স্বামী বিবেকানন্দ জীবনচরিত, ১ম খণ্ড’, (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৩২৬), পৃ ২৪।

[85] From W.H. Grimly, Esq., Secretary to the Board of Revenue, To Secretary to the Government of Bengal, Revenue Department, 19th March 1879.

[86] গোলাম মুরশিদ, ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’, (ঢাকাঃ অবসর, ২০১৫), পৃ ৪৯৬-৪৯৭।

[87] রাজনারায়ণ বসু, ‘সেকাল আর একাল’, স্বপন বসু সম্পাদিত, (কলকাতাঃ চিরায়ত প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ ৪৪-৪৫।

শেল্ডন স্ট্রিকলার, পি জে বার্ক, এইচ তাজফেল, মণিকা স্ক্যার, মিনজং ক্যাং প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ব্যক্তি একই সাথে লৈঙ্গিক, পারিবারিক, ধর্মীয়, বর্ণীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক – এরূপ বিভিন্ন পরিচিতিকে বহন করেন।[88] রচ-হিগিন্স, জন্সন, স্কোফিল্ড প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকের মতে, এসব পরিচিতিকে সামাজিকভাবে ধারণের বাহন হিসেবে কাজ করে পোশাক; অর্থাৎ পোশাক ব্যক্তির সামাজিক পরিচিতিকে নির্ধারণ করে তার সামাজিক পরিসর রচনা করে।[89] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পোশাককে বলবেন, "দেহগানের তান" – যে দেহ সামাজিকতার নির্মিতি, আর যে পোশাক তার সঙ্গতকারী।[90] বিখ্যাত ভাবুক ও শিল্পী উইলিয়ম মরিস মানুষের সামাজিক জীবনে সঙ্গতকারী বস্তুর ভূমিকাকে উপলব্ধি করে বলতেন, "A nation is known more by its cups and saucers than by its pictures." – অর্থাৎ ঘটে-পটে, বেশবাসে দেশ-কাল-রাজনীতির রঙ প্রকাশ পায়।[91] আবার সেই রঙের মধ্যেই মানুষের দৈহিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জন্ম হয়। তাই বর্দিউর বলবেন, নির্দিষ্ট সামাজিক পরিসরে জন্ম নেওয়া ব্যক্তির মধ্যে ওই পরিসরের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, লৈঙ্গিক পুঁজি সঞ্চারিত হয়ে ব্যক্তিকে পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের দিকে চালনা করে।[92] অর্থাৎ পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের সামাজিক ভিত্তিতে উপনীত হওয়া যায় – সহজাত ও অর্জিত এই দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সহজাত প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি নিজের পোশাকি অস্তিত্বে সমাজের অন্য শ্রেণির চাইতে আলাদা কারণ তিনি নির্দিষ্ট রুচির পরিমণ্ডলে জন্ম নিয়েছেন। অর্জিত প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচয়ের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করতে চাইছেন, কারণ তার সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি ওই সামাজিক পরিচয়কে আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সেই আদর্শ বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে 'সভ্য' ও 'সুসংবদ্ধ' হয়ে উঠবার বাসনার মধ্য দিয়ে প্রকট হতে শুরু করেছিল। ১৮৭৪ সালে তাই রাজনারায়ণ বসু'র *সেকাল আর একাল* গ্রন্থে আমরা একই সাংস্কৃতিক পরিচিতির মধ্যে থেকেও নানা ভাবে পোশাক পরার বিরুদ্ধে উষ্মা দেখতে পাই। তিনি বলেছিলেন, – 'প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদিগের বাঙালি জাতির একটা নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোনো মজলিশে যাউন একশত প্রকার পরিচ্ছদ দেখিবেন। পরিচ্ছদের কিছুমাত্র সমানতা নাই' (বসু, ২০১৪)।[93] ১৮৮৫ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উচ্চশিক্ষান্তে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে *বিলাতের পত্র* গ্রন্থে *বাঙ্গালীর*

---

[88] Sheldon Stryker, 'Symbolic Interaction: A Social Structural Version', (Menlo Park: Benjamin Cummings Publishing Company, 1980); Sheldon Stryker, and P. J. Burke, 'The past, present, and future of an identity theory', *Social Psychology Quarterly*, Vol. 63 No. 4, 2000, pp. 284-297; H. Tajfel, *Social Identity and Intergroup Relations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); Minjeong Kang, Monica Sklar, Kim K. P. Johnson, 'Men at Work: Using Dress to Communicate Identities', *Journal of Fashion Marketing and Management*, Vo. 15, Issue 4, September 2011, pp. 412-427; Jan E. Stets and Peter Burke, 'Identity Theory and Social Identity', *Social Psychology Quarterly*, Vol. 63, No. 2, September 2000, pp. 224-237.

[89] M. E. Roach-Higgins and J. B. Eicher, 'Dress and identity', *Clothing and Textiles Research Journal*, Vol. 10 No. 4, 1992, pp. 1-8; K. K. P. Johnson, N. Schofield, and J. Yurchisin, 'Appearance as a source of information: a qualitative approach to data collection', *Clothing and Textiles Research Journal*, Vol. 20 No. 3, 2002, pp. 125-37.

[90] শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', (কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ় ১৩৫১), পৃ ১২৯।

[91] সবুজ পত্র, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৫৭৭।

[92] Pierre Bourdieu, 'Masculine Domination', Trans. Richard Nice. (Stanford, California: Stanford University Press, 2001); Pierre Bourdieu, 'The Logic of Practice', (Stanford: Stanford University Press, 1992).

[93] রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল', পৃ ৫৬।

পোষাক শীর্ষক নিবন্ধে একই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখেন, "যদি জাতি গুটিকতক সভ্য শিক্ষিত যুবকে না হয়, যদি অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ব্যবসায়ী জাতির মূল হয়; তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, বাঙালির কোনোই পোশাক নাই"।[94] এই দুটো উক্তির মধ্য দিয়ে এই আলোচনায় প্রবেশের মূল কারণই হল -- পরিচ্ছদের উপর ভিত্তি করে নব্য শিক্ষিত বাঙালি পুরুষেরা জাতিত্বের যে রূপ সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলেন, সেই রূপকল্পের পুঁজিবাদী, লিঙ্গবাদী ও ক্ষমতার পথগুলোকে আতসকাঁচ হাতে নিয়ে একটু বড় করে দেখা। পাশ্চাত্য শিক্ষা মধ্যবিত্তকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই চেতনায় উন্নীত করেছে যে, পোশাক শুধু নিছক পোশাকই নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিসরে তার একটা দৃশ্যমূল্য রয়েছে, অ-মৌখিক গুরুত্ব রয়েছে;[95] আর উনিশ শতকের ব্রিটিশ উপনিবেশিক পরিমণ্ডলে নিজের পাশ্চাত্য শিক্ষিত নাগরিক শরীরকে সেই গুরুত্বে উন্নীত করতে গেলে, বিলিতি সভ্যতার প্রকল্পে তথাকথিতভাবে যা 'অসভ্য' ও 'আদিমতা'র সমতুল – তাকে সভ্যতার ছাকুনিতে ছেঁকে পরিশীলিত করতে হবে! তাই ঊনবিংশ শতকের সত্তর আশির দশক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে যে আত্ম-অনুসন্ধানের স্পৃহা তৈরি হতে থাকে সেখানে জাতিত্বের দৃশ্যমূল্য তৈরিতে গণপরিসরে পুরুষের পাশ্চাত্য এটিকেট অনুসারী পোশাকের উপরই প্রকট এবং প্রচ্ছন্নভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ সেই পুরুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রুচিতে আবগাহণ করা পুরুষ। ক্রান্তীয় জলবায়ুর বিরাগে এবং ব্রিটিশ ক্ষমতার পরিসরের মধ্যে অবাঞ্চিত পা ফেলবার উপর লাগাম টানতে চাপানো বিধিবন্ধকতার জন্য কোট-প্যান্টালুন–বুট–ক্যাপ-স্টিক হয়ত গায়ে চাপিয়ে তিনি সাহেব-সুবা সাজতে পারেননি, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকের পুরুষতান্ত্রিক অহং এইসব নব্যশিক্ষিতের অহঙে চুইয়ে পড়েছে।[96] সুতরাং সেই চুইয়ে পড়া অহং নিয়ে তারা যে জাতিত্বের কথা বলেছেন, সেই জাতিত্বের পথটা লিঙ্গ-ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একেবারেই সমান নয়; কারণ শুরু থেকেই এই পথে সামাজিক ক্ষমতাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষা প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিহত করবার মানসিকতার দ্বারা চালিত ছিল না; বরং ব্রিটিশের সভ্যতার প্রকল্পে বিজারিত মন নিয়ে দেশের তথাকথিত 'অসভ্য' সংস্কৃতি ও সংস্কারকে প্রশ্ন করবার মানসিকতার দ্বারা চালিত। সেই প্রশ্নের গভীরতাকে সমাজের সব শ্রেণি সমানভাবে ছুঁতে পেরেছেন – তা একেবারেই বলা যাবে না। সেই কারণে জাতীয় আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতির সাথে প্রাশ্নাতীত আধিভৌতিক চিন্তা জুড়ে যেতে সময় লাগেনি। বনবিহারী দে'র মতো স্বদেশী প্রচারকের 'গান্ধি মহারাজ ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় কিনতে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন'- এরকম মিথ্যা ভাষ্যে মজে সরল-বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ আবার বিলিতি কাপড় কিনতে শুরু করেছিলেন।[97] সুতরাং সমাজের সব শ্রেণির মানুষ নিজের জাতীয় পরিচয়কে বুঝে, না কি শুধু একটা হিড়িকের বশে স্বদেশীর স্রোতে ভেসেছিল - সেটাও ভাববার বিষয়। শ্রেণি-সচেতন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী এই হিড়িককে লালন করে নিজেদের সামাজিক নেতৃত্বে বসানোর সোজা পথে হাঁটতে চেয়েছিলেন,

---

[94] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, "বাঙ্গালীর পোষাক", 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা ; সাহিত্য সংসদ, ২০১৭), পৃ ৭৩৫।

[95] M. E. Roach-Higgins and J. B. Eicher, 'Dress and identity', pp. 1-8.

[96] Elizabeth Wilson, 'Adorned in Dreams: Fashion and Modernity', (London: I. B. Tauris, 2003).

[97] 'স্বার্থ না দেশ', সচিত্র শিশির, ১ম বর্ষ, ৩য় সপ্তাহ।

তাই স্বদেশী জাত হিড়িকের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মধ্যবিত্তীয় সমালোনার সম্মুখীন হতে হয়।

পারিচ্ছদিকতার উপর নির্ভর করে মধ্যবিত্তের শ্রেণিচেতনা বিকাশের মূল ভিত্তি হল, ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নতুন ক্ষেত্রের উদ্ভব। বর্দিউর ভাষায় 'social fields'-এর উদ্ভব। যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরাতন ব্যবস্থাকে নিজের জ্যোতির সামনে ম্লান করে দিতে পেরেছে, এবং সেই জ্যোতির দ্বারা দেশীয় সমাজকে আকৃষ্ট করে, দেশীয় সমাজের আন্তরিক ভাব না হোক, অন্তত সামাজিকতার বাহ্যিক অনুশীলনের ভাবকে প্রভাবিত করেছে। এবং সামাজিকতা অনুশীলনের একটা নতুন প্রতিষ্ঠান বা 'habitus'-এর বিকাশ ঘটিয়েছে।[98] যার উপর ভিত্তি করেই নবাবি আমল পরবর্তী অনভিজাত সমাজ থেকে, বর্ণ ব্যবস্থার দরুণ নিচু নজরে দৃষ্টরাও একটা শ্রেণি হিসেবে উঠে এসেছেন। শুধু বাংলা দেশেই নয়, আমেরিকার মতো বহু উপনিবেশেই নতুন ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আগমনের দরুণ অনভিজাত গোষ্ঠী থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি উঠে আসার প্রক্রিয়াকে সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন।[99]

অবশ্য এই সংগঠনের পথ বাকি সবকিছুর মতনই সংঘাতময়। এ সংঘাত যেমন নতুন ক্ষমতার ছায়ায় গিয়ে সামাজিকভাবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য নিজেদের মধ্যেকার সংঘাত, তেমনই পুরাতন শাসকের সংস্কৃতির সাথে নবাগত শাসকশ্রেণির আমদানিকৃত অভ্যাসের সংঘাতও। সুতরাং নতুন অভ্যাসের প্রতিষ্ঠান (বা *'Habitus'*) সবসময়ই নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, সিম্বলিক সংঘাতের মাধ্যমে বিকশিত হয়। আর এই সংঘাতে ক্ষমতাধর পুরাতন গোষ্ঠীর চাইতে নতুন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তেজের প্রকাশই একদল নতুন মধ্যস্বত্বভোগীদের তাদের দিকে আকৃষ্ট করে; কারণ সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তিটা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সমান। আর এই প্রবৃত্তিকে ঔপনিবেশিকরা উপনিবেশে নিজেদের ক্ষমতা সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। একদল নেটিভের ঔপনিবেশিক সভ্যতার ছায়াতলে থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জনের মোহকে উপনিবেশে নিজেদের ক্ষমতা রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য দেহে বাদামি, বুদ্ধিতে গোরা শ্রেণির বিকাশমানতার উপর শিলমোহর দেয় ব্রিটিশ সরকার।[100]

অর্থাৎ খাতায় কলমে উপনিবেশিক শক্তির অনুকরণকারী একটা দেশীয় গোষ্ঠী তৈরির দিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের চেষ্টা জারি ছিল। যার মাধ্যমে একদিকে 'এম্পায়ার'-এর বিকাশ ঘটানো সহজ হবে, আবার অন্যদিকে 'নেশন'-এর বিকাশ রোধ করা যাবে। অর্থাৎ এণ্ডারসনকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন, ঔপনিবেশিক সমাজে অনুকরণপ্রিয় দেশীয় সমাজের বিকাশে মদত দেওয়া মানে, 'এম্পায়ার' এবং 'নেশন' এর মধ্যে সহাবস্থান ঘটানো।[101] যে মদতের ফলেই, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্‌ভুত বিনিয়োগ-ব্যবসায় হতোদ্যম জমিভিত্তিক অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণির

[98] Pierre Bourdieu, 'Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste', translated by Richard Nice, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 8th Print, 1996).
[99] Christina J. Hodge, 'Consumerism and the Emergence of the Middle Class in Colonial America', (New York: Cambridge University Press, 2014).
[100] Macaulay's Minute on Education. 1835.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html
[101] Homi Bhabha, 'The Location of Culture', (London: Routeledge, 1994).

প্রতিনিধিরা কলকাতা নগরে এতদিন যে বাবুয়ানি অনুশীলনে রত ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা পাওয়ার অধিকার পেয়ে তারা এবার ব্রিটিশ সরকারের কেরাণীর পদগুলোতে যোগ দিতে থাকেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান শুরু হয়।[102] তার সাথে সাথে পুরোনো অভ্যাসের জায়গায় ক্ষমতাধর নতুন গোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক অভ্যাসের অনুশীলন শুরু হয়। Bourdieu'র মতে এ অনুশীলন হল, নতুন অভ্যাসের প্রাতিষ্ঠান, নতুন সাংস্কৃতিক পুঁজি ও তৈরি হওয়া নতুন ক্ষেত্রের যোগফল। এই অনুশীলনের পথটা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংগঠনের প্রথম দিক থেকেই তৈরি হলেও, উনবিংশ শতকের শেষদিক পর্যন্তও সেই পথটা ছিল দ্বন্দ্বাকীর্ণ, দোলাচলের বৃত্তে স্তিত। সেই দ্বন্দ্ব, দোলাচল যেমন খাদ্যাখাদ্য, পোশাক–পরিচ্ছদের বিচারে ঘরের সাথে বাইরের, তেমনই আন্তঃসামাজিক। শুরু থেকেই ব্রিটিশরা সেই দ্বন্দ্বের চিত্রে ছিলেন না।

রাজনারায়ণ বসু বলেন, গরমের দেশে বাণিজ্য করতে আসা সাহেবও প্রথম দিকে ঢিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরে দেশীয়দের সামনে আসতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আলফ্রেড ক্রসবি লিখেছেন, ক্রান্তীয় সূর্যের প্রখরতার ভয়ে ভারতে বাণিজ্যিক বিকাশের প্রথম দিকে আসা সাহেবরা নবাবি পরিচ্ছদশৈলীর "ঢিলেঢালা অভ্যেস" অনুশীলন করতেন।[103] স্পিয়ারের মতে, সুয়েজ খাল খোলার পূর্ববর্তী সময়ে স্বজন-বান্ধবহীন অনিশ্চিত দেশে এদেশীয়দের সামাজিক শিষ্টাচার অনুশীলনই স্বাভাবিক ঠেকেছিল।[104] এমনকি স্বদেশের সাথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে এদেশীয় 'লাক্সারি আইটেম'ও এই সময় থেকে বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল। যেমন কাশ্মীরি ও পাইস্লি শাল ইংল্যাণ্ডের পারিচ্ছদিক ফ্যাশনকেই পালটে দিয়েছিল। সুচিত্রা চৌধুরী একে বলবেন, 'Textile Orientalism'।[105] কিন্তু খিদিরপুর ডক থেকে সাহেব ধরে এনে এই নতুন ভূমিতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা দেশীয় শ্রেণির মধ্যে কিন্তু বিলিতি আদব-কায়দার সংক্রামণ ঘটছিল। যার পিছনে মূল তাগিদ ছিল – অর্থলাভের নতুন পথের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া।[106] টাকা নিয়ে আসা সাহেবদের তখন থেকেই দেশীয়রা উন্নত জীব ভাবতে শুরু করেন। বিনয় ঘোষ যেমনটা বলেছিলেন, 'ক্যাশ ফীলস'এর ঘূর্ণাবর্তে কাতারে কাতারে মানুষ শহরতলি থেকে শহরে এসে জীবিকানির্বাহের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন এবং শহুরে অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণির ঠাটবাটে অনেকটাই সংক্রমিত হন।[107] কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমনটা বলেছিলেন – বামুন কায়েতেরা 'সভ্য' হয়ে উঠছে দেখে শহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক অর্থাৎ তথাকথিত "অ-জলচল" বা অস্পৃশ্যরাও দ্বিতীয় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন হয়ে উঠবেন বলে 'হামা

---

[102] Rajat Kanta Ray, 'Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1927', (Delhi: Oxford University Press, 1984).

[103] Alfred Crosby, 'Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900', (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

[104] T. G. P. Spear, 'The Nabobs: A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India', (London: Humphrey Milford & Oxford University Press, 1932).

[105] Suchitra Choudhury, 'Textile Orientalisms : Cashmere and Paisley Shawls in British Literature and Culture', (Athens: Ohio University Press, 2023); Susan North, 'Indian Gowns and Banyans – New Evidence and Perspectives', *Costume*, Vol. 54, Issue 1, 2020, pp. 30-55; Barbara Lasic, "Ethnicity", in Peter McNeil ed., 'A Cultural History of Dress and Fashion in the Age of Enlightenment', (London, Oxford: Bloomsbury, 2017).

[106] শ্রীপান্থ, কলকাতা; L. S. S. O'Molley, 'The Indian Civil Service 1601-1930', (London: John Murray, 1931), P. 67.

[107] বিনয় ঘোষ, "কলকাতার মন", বিনয় ঘোষ বিরচিত 'মেট্রোপলিটানঃ মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ'।

দিতে আরম্ভ কল্লেন' (সিংহ, ২০১৩)।[108] চাষার পুত্র নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ে চাষবাস ছেড়ে জুতো–মোজায় মজেছেন বলেও অনেক চাষী অভিযোগ করেছেন।[109] চড়কের মেলা হোক বা দুর্গা-প্রতিমা ভাসান বা পুজো উপলক্ষে বাঈ-নাচ, খেমটা-নাচের আসরে যোগ দিতে সমাজের নিম্নস্তরীয়রাও ধোপাবাড়ি থেকে আট আনা দিয়ে কোচান ধুতি, ধোপদুরস্ত কামিজ, ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনি একরাতের জন্য হলেও পরে আসতেন। মার্ক্স ব্যক্তির পুঁজি-কেন্দ্রীক সামাজিক সচলতার উপর ভিত্তি করে বলেছিলেন, যেখানে আর্থিক স্বাধীনতা নেই, সেখানে সব স্বাধীনতা বৃথা; ফলত সেখান থেকেই অসাম্যের জন্ম হয়। Bourdieu আরও আনুবীক্ষণিক স্তরে নেমে বলছেন, অসাম্যের পেছনে শুধু অর্থনৈতিক পুঁজি দায়ী নয়; নবোত্থিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন একত্রিত হয়ে যে সাংস্কৃতিক পুঁজির জন্ম হয়, সামাজিক অসাম্যের পিছনে তারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ডগলাসের মতানুসরণ করে বলতে হয়, ভাড়া-করা পণ্যকে যতটা সমাজে গণ্য-মান্য জায়গা অর্জনের তাড়নাজাত মনে হয়, পণ্যমোহজাত তাড়না ততটা মনে হয় না; বরং মনে হয় পণ্যমোহ সমাজে মান্যতা পাওয়ার তাড়না থেকেই উদ্‌ভুত।[110] সেই তাড়নাই উনবিংশ শতক থেকে কলকাতার নগর-কেন্দ্রিক শ্রেণিগুলোর মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে একটা মিশ্র-রুচির পরিসর গড়ে তুলেছে।[111] পারিচ্ছদিকতার ক্ষেত্রে যে রুচির শিকড় অনেক সময়ই আলগা হিসেবে ধরা দিয়েছে।

মিশ্র-রুচির রূপ প্রকট হওয়ার একটা মূল কারণ হল, সমাজের একেকটি ক্ষমতার স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে মান্য রুচির নানান ভগ্নাংশে ভেঙে ভেঙে চুঁইয়ে পড়া। যেকোনও সমাজে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করে নিজেদেরও সেই ক্ষমতার ছায়াতলে রাখার বাসনা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করে থাকে। ঠিক যেমনটা ছিল এদেশে নবাগত ইংরেজদের থাকা-খাওয়ার যোগানদানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা দেশীয়দের মধ্যে; তাদের ভাষা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করা দেশীয়দের মধ্যে; বা তাদেরকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টাকা জোগানদাতা দেশীয়দের মধ্যে। তবে সেই বাসনা আরও ফুল্লকুসুমিত হতে থাকে, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের মনোলোকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বুদ্ধির আবাদ করার সুযোগ হয়। সেই জ্ঞান-বুদ্ধিজাত প্রাথমিক অনুকরণ পিপাসায় ফাইলোলজির খাতিরে 'মিস্টার বানরজী' বা 'ইন্দ্রা, চন্দ্রা, ঘোষা'তে পরিণত হওয়ারা যেমন উর্দ্ধস্তনের পরম অনুগত হতে গিয়ে ফ্যাশন বিভ্রাট তৈরি করেছেন, তেমনই তাদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের নিচে অবস্থানকারীদের মধ্যেও ফ্যাশন বিভ্রাট তৈরি হয়েছে;[112] কারণ এটা মেনে নিতেই হবে যে, একটি ভিন্ন সংস্কৃতিকে আত্তীকরণ ঘটানোর যতই চেষ্টা চলুক না কেন – সেখানে কিছু স্বাভাবিক ফারাক থাকতে বাধ্য; আর সেই ফারাকগুলিকে মৌলবাদী সংস্কৃতিমনস্করা বিভ্রাট হিসেবেই মনে করেন।

---

[108] কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, পৃ ৯।

[109] রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল', স্বপন বসু সম্পাদিত, পৃ ৬৪-৬৫।

[110] M. Douglas, "Private Rationing: A Study in Controlled Exchange", in R. Firth ed., 'Themes in Economic Anthropology', (London: Lavistock, 1967), pp. 119-147.

[111] Utsa Ray, 'Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and Indian Middle Class', (Delhi: Cambridge University Press, 2015).

[112] কেদারনাথ দত্ত প্রণীত 'সচিত্র গুলজারনগর', (কলিকাতা: প্রিন্টিং প্রেস, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ/১৮৭১), পৃ ২-৩।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই যে নব্যশিক্ষিতরা বিভ্রাটের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন -- তা বলা যাবে না। কারণ হিন্দু কলেজে শিক্ষিত অভিজাতরা যখন সরকারি কাজে নিযুক্ত হতেন, তখন তারা "হবসন-জবসন" সেজে অফিসে যেতেন – এই অভিযোগ সমকালীন সাহিত্যে প্রচুর ছিল। নকশা সাহিত্য অনুসারে, তারা পায়ে ব্রাউন রঙের গ্লেজকিডের পাম্প-শু পরতেন, উরুর সঙ্গে গার্টার দিয়ে আটকানো হাফ-মোজা পরতেন, গলাবন্ধ-কোট বা ইংলিশ কফ-শার্ট পরতেন (কফ-শার্ট পরলে তা ধুতির নিচে ইন করা হত), ন'গজ চুয়াল্লিশ ইঞ্চি মিহি ধুতি পরতেন, যার কোঁচাটি জুতো থেকে আধহাত উপরে প্রলম্বিত থাকত। সম-কালীন এবং পরবর্তীকালে শ্রীপান্থের মতো অনেকে একে জগা-খিচুড়ি বলেছেন।[113] এই দু'নৌকায় পা দেওয়া ফ্যাশন অনুশীলনের পেছনে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইংরেজের নিজ রাজনৈতিক দেহের সততা বজায় রাখবার অসীম তাগিদের ভূমিকা ছিল। যে তাগিদে ১৮৩০-এর দশকে কোম্পানি আইন করে অফিশিয়ালদের এদেশীয় পোশাক পরে বাইরে বেরোনোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।[114]

ডেভিড কুচটা সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে দরবারি পরিচ্ছদের সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে চালচলনের ক্ষেত্রে দূষণ রোধকল্পে এগিয়ে আসতে হয়, যখন সেই দূষণ রাষ্ট্রের বা ক্ষমতার পুরুষকারের বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বা সেই পুরুষকারের পক্ষে হানিকারক হয়।[115] আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্র যেহেতু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক কর্তাব্যক্তিদের পোশাকের সাথে যদি শাসিতের পরিধেয়ের পার্থক্য নিরূপণ না করে, তবে তারা যে আলোকপ্রাপ্ত, আধুনিক, উন্নত জাত – সেটা শাসিতদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে না। ফলত বিভিন্ন উপদেশমূলক গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে সিভিলিয়নদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতে থাকে, আলোকপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা কেন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হতে না পারা নেটিভদের পথে হাঁটবে; (দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত একজন ব্রিটিশ অফিশিয়াল লর্ড রসেনবেরি নেটিভদের বলেছিলেন, "Not wholly man'' অর্থাৎ নেটিভরেয়া পরিপূর্ণ মানুষই নয়)। আফ্রিকাতে কর্মরত ব্রিটিশ উপনিবেশের আরেকজন সিভিলিয়ন এওয়ার্ড কাস্ট বলেছিলেন, নেটিভরা যে উপনিবেশিকদের মতো আলোকপ্রাপ্ত জাতের অনুকরণের সুযোগ পাচ্ছে, সেটা তাদের সৌভাগ্য।[116] নরবার্ট ইলিয়াস বলেছিলেন, কোনো সভ্যতার ইতিহাসই শুরু থেকে 'সভ্যতা'র ইতিহাস নয়। সব সভ্যতারই নানা লজ্জা ও বিড়ম্বনার দিক আছে। সেইগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিক্রম করে প্রতিটি সভ্যতাই তথাকথিত বিকাশের পথে উন্নীত হয়।[117] এদর্নো ও হর্কেইমার বলেছেন, ঔপনিবেশিক জাতি নানান বর্বরতাকে অতিক্রম করে সভ্য হলেও, অন্যকে বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির নামে তাদের স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশকে বিলম্বিত করে এবং নিজেরা ক্ষমতাসীন

---

[113] শ্রীপান্থ, 'কলকাতা'।

[114] শ্রীপান্থ, "সাহেব ধরা", 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক' থেকে (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫)।

[115] David Kuchta, 'The Three Piece Suit and Modern Masculinity in England 1550-1850', (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2002).

[116] Homi Bhabha, 'The Location of Culture'.

[117] Norbert Elias, 'The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations', translated by Edmund Jephcott, (Oxford: Blackwell Publishing, 2000).

হয়ে ধরা দেয়।[118] ক্রেইকের মতে, সেই ক্ষমতার দৃশ্যমান ভিত্তি হিসেবে জৈব দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিধাণের সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ।[119] কারণ কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর পোশাকি সাংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তাদের দেহ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বর্ণীয় অক্ষে প্রবেশ করে।[120] সুতরাং ১৮৯০'এর দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ডব্‌লু টি ওয়েব যখন দেশীয় ভদ্রমহোদয়দের জন্য 'ইংলিশ এটিকেট' শেখার বই লেখেন, সেখানে সুপরিকল্পিত ভাবে বোঝানো হয়, বিলিতি কেতা অনুসরণ করা খুব সহজ কাজ নয়; অর্থাৎ ঔপনিবেশিকদের সভ্যতায় সভ্য হয়ে ওঠা সহজ নয়। তার জন্য অনুপুঙ্খ শিক্ষা লাগে।[121]

মধ্যবিত্তের শ্রেণি পরিসরে উপনিবেশিকদের চোখে সভ্য হয়ে ওঠার কসরতও থেমে থাকেনি। ১৯০৩ সালে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'কর্মফল' এর নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানের চরিত্র – সতীশ-এর বয়ানে তা স্পষ্ট। সে তার মা বিধুমুখীকে বলছে, চাঁদনি থেকে কেনা কোট ট্রাজার্‌স পরে ভাদুড়ি সাহেবের বাড়ির ইভনিং পার্টিতে গিয়ে সে লজ্জায় পড়েছিল। কারণ ইভনিং পার্টিতে সে ইভনিং ড্রেস পরে যায়নি। তাই মায়ের মাধ্যমে বাবার কাছে তার দাবি, ভদ্রলোকীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তার দিনের তিনটি প্রহরে পরবার আলাদা আলাদা স্যুট চাই। যার জন্য ৩৫০ টাকা দরকার। তার বক্তব্য, তার পরিবারের যদি ভদ্রসমাজের সাথে মেলামেশার ইচ্ছা থেকে থাকে, "সুন্দরবনের মতো আদিম জীবন" যদি কাম্য না হয়ে থাকে, তবে পরিবারের উচিত তাকে টাকাটা দেওয়া। সন্তানকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে সেকালের মানদণ্ডে সুশিক্ষিত করে তোলার কাজে ব্রতী সতীশের মা বিধুমুখীও মনে করেন, তার স্বামী মন্মথের উপর ভরসা করলে এতদিন ছেলেকে "কোপিন পড়ার অভ্যাস করাতে হত।" তাই নিঃসন্তান দিদি-জামাইবাবুর শরণাপন্ন হয়ে তিনি পুত্রের বিলাসের জন্য রসদ জোগান।[122] এক্ষেত্রে যে বিষয়টি জোর দিয়ে বলতে হয়, সভ্য হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণি-বিন্যাসের পোশাকি ভিত্তি বিষয়ে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির দুটো প্রজন্মের মধ্যে অর্থাৎ সতীশের বাবা মন্মথের প্রজন্ম ও সতীশের প্রজন্মের মধ্যে একটা বিভাজিকা তৈরি হয়েছিল। কারণ মন্মথের প্রজন্মের কাছে ভদ্রসমাজের পোশাক হল, চোগা–চাপকান। তার মতে, এতে ভদ্রতাও রক্ষা হয়, দেশীয়ত্বও। নতুন প্রজন্মকে কোট-প্যান্টালুন পরতে দেওয়াকে, তাদের হাতে ধরে 'নষ্ট' করা ভেবেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, সতীশের প্রজন্ম ব্রিটিশের সামনে দর্প ভরে কোট-প্যান্টালুন পরার সাহস করতে না পারলেও, ওটাকেই সভ্যতার একমাত্র মানদণ্ড বলে ভেবেছে।[123]

---

118 Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, 'Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments', Edited by Gunzellin Schmid Noerr, translated by Edmund Jephcott, (Stanford, California: Stanford University Press, 2002).

119 Jennifer Craik, 'The Face of Fashion', (London, New York: Routledge, 1993).

120 Neil Howlett, Karen Pine, Ismail Orakcioglu, Ben Fletcher, 'The Impression of Clothing on First Impressions: Rapid and Positive Responses to Minor Changes in Male Attire', *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*, Vol. 17, Issue 1, 2013, pp. 38-48.

121 W. T. Webb, 'English Etiquette for Indian Gentlemen', (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1890).

122 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কর্মফল", পৌষ ১৩১০, 'গল্পগুচ্ছ', (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮), পৃ ৪৩৭-৪৬২।

123 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কোট ও চাপকান", ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র' (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, জানুয়ারি ২০১৫), পৃ ৬৯২-৬৯৬।

এখান থেকে এইটুকু ধারণা করা যায় বাঙালির বস্ত্র শৈলীতে নির্মাণ–অবনির্মাণ–পুনঃনির্মাণের মধ্য দিয়ে জাতিত্ব প্রাপ্তির একটা গল্প আছে।[124] নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখা পড়লে বোঝা যায়, এই নির্মাণ–অবনির্মাণ–পুনঃনির্মাণের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালির সত্তার সাথে ইংরেজত্ব তো জুড়েইছে, কিন্তু স্বদেশির মতো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই ইংরেজি-রুচিতে পরিশীলিত মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই আবার বাঙালীত্বের স্ফূরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার মতে স্বদেশির মধ্য দিয়ে এতদিনকার অর্জিত ইংরেজত্বটা বাঙ্গালীত্বের ধাক্কায় নস্যাৎ হয়ে যায়নি। নীরদ চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ, স্বদেশি আন্দোলনে সংঘাতটা বাঙ্গালীত্বের সাথে ইংরেজত্বের নয়; সংঘাতটা ছিল ব্রিটিশ ক্ষমতার সাথে দেশীয় ক্ষমতার।[125]

অর্থাৎ ব্রিটিশ ক্ষমতার ছত্রতলে থেকে, ব্রিটিশের পারিচ্ছদিক রুচি অনুসরণ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী সামাজিক কাঠামোয় মান্য পরিচ্ছদশৈলীকে অবনির্মিত করে, মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিকতায় পাশ্চাত্য শিষ্টাচার অনুসারী একটা নতুন পোশাকি ভদ্রতা নির্মিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শুরুর দশক থেকে স্বাদেশি আন্দোলনে মোটা কাপড়ের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, স্বদেশি বক্তৃতা শুনে সেই শ্রেণি আত্ম-পরিচিতির রাজনৈতিক অনুসন্ধানে নেমে সেই নতুন পোশাকি ভদ্রতায় বাঙালীত্বকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালালেও, নিজেদের মধ্যে উপ্ত হয়ে যাওয়া বিলিতি রুচি ও শিষ্টাচারের প্রভাবকে বাদ দিতে পারেননি।[126] পোশাকে–পরিচ্ছদে কে কতটা বাঙালি হয়ে উঠল – এটা যদি স্বদেশির মূলমন্ত্র হত, তাহলে বোধ হয়, খাদি-খদ্দর পরবার তাগিদ হিড়িকে পরিণত হত না বা আন্দোলনের অনতিপূর্বেই সেই হিড়িক থিতিয়ে পড়ত না।[127]

সুতরাং স্বদেশি ছিল কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্ব-অবলম্বনের প্রতীক। একে বাঙালি পোশাকি জাতীয়তার ভিত্তি বলা যাবে না, কারণ বাঙালির পোশাকি শিষ্টাচারের মধ্যে বিলিতি শিষ্টাচার অন্তঃসলিলা হয়ে রয়ে গেছে। হোক না বাঙালি পুরুষ গরদের ধুতি পরে স্বদেশি সভায় গ্যাছেন, কিন্তু যে ভাবে আজানুলম্বিত কোঁচা রেখে, ঢেকে-ঢুকে ধুতি পরে গ্যাছেন – সেই ধুতি পরিধাণের শিষ্টাচারটি বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচার অনুসারী। মার্ক্স শিল্পপুঁজিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, যন্ত্র-নির্ভর উৎপাদন সমস্ত কুঠির শিল্পকে ধ্বংস করে। সেদিক থেকে বিচার করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানের ঘরে ঘরে সেলাই মেশিনের ব্যবহার দেখে মনে হবে, তা জাপানের দেশীয় শিল্পকে বিনষ্ট করছে। কিন্তু এন্ড্রিউ গর্দন দেখাচ্ছেন, সময়ের দাবি মেনে সেই সেলাই মেশিনও যুদ্ধকালে মিলিটারি পোশাক বানিয়ে কিভাবে যুদ্ধ মেশিনে পরিণত হল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেই মেশিনগুলোই আবার পাশ্চাত্য-ঢঙের পোশাক বানিয়ে পাশ্চাত্য ফ্যাশনের চলমানতায় রসদ জুগিয়েছে। সুতরাং যুদ্ধকালীন সময়ে মেশিনগুলোর সেলাইয়ে একতা জাপানি-সত্তার নিজস্ব পথটাকে প্রকট করে।[128] অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আবেগ পুঁজিতে পরিণত হলে যন্ত্রও প্রয়োজন মাফিক নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার অস্ত্রে পরিণত হতে পারে। স্বদেশি

---

[124] Emma Tarlo, 'Clothing Matters: Dress and Identity in India', (Chicago: The University of Chicago Press, 1996).

[125] শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি', (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৩)।

[126] নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, 'আমার দেবত্তর সম্পত্তি'; Nirad C. Chaudhuri, 'Culture in the Vanity Bag', (Mumbai: JAICO Publishing House, 2009).

[127] রমাপদ চৌধুরি, 'হারানো খাতা', (কলকাতাঃ আনন্দ ,২০১৬)।

[128] Andrew Gordon, 'Fabricating Consumers: The Swing Machine in Modern Japan', (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2011).

আন্দোলনের প্রকৃতিও তাই। স্বদেশি আন্দোলনকালে ধুতি-শাড়ির পাড়ে জাতি-আবেগ জাগানিয়া ছড়া-গান লিখে ব্রিটিশ প্রশাসনে ত্রাশ সৃষ্টির চেষ্টা চললেও ধুতি-শাড়ি পরিধাণের বিলিতি এটিকেটে পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে উঠে আসা নিজের রুচি-গরিমাকে নস্যাৎ করেনি, বরং সেই রুচি গরিমার মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্যে পৌঁছানোর দাবি করেছে। জাপানে যেমন পাশ্চাত্যের প্রডাক্ট -- সেলাই মেশিন যুদ্ধকালে বর্জিত না হয়ে, নিজেদের ছাত্র-যুবাদের রণসজ্জা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে; এবং যুদ্ধ শেষে আবার একই মেশিন পাশ্চাত্য অনুসারী পোশাক বানিয়েছে; তেমনি নীরদ চৌধুরিরা স্বদেশি যুগের পরে মোজা পরা ছেড়ে দিলেও ধুতি পরিধাণের পাশ্চাত্য শিষ্টাচার তো ছাড়তে পারেননি। তাই ভবিষ্যতে কেম্‌ব্রিজে স্থায়ী বাসিন্দা হবার পর দ্বৈত পোশাকি সত্তাকে বহন করা, অর্থাৎ বাড়িতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ও বাইরে কোট-প্যান্টালুন-হ্যাট-বুট পরাই সহজাত হয়ে উঠেছিল। ঠিক একই কারণে রমাপদ চৌধুরির পিতা স্বদেশির পর কোট-প্যান্টালুন পরে পুনরায় অফিসে যাতায়াত শুরু করেছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার যখন নিজেদের সভ্যতাকে উপনিবেশের মাটিতে ক্ষমতার পোশাকি মোড়কে মুড়ে প্রদর্শন করেছে, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্ষমতার তদ্রূপ পোশাকি আচরণ অবলীলায় অনুশীলন করতে না পারলেও, নিজেদের পোশাকি রুচিকে ক্ষমতার আশ্রয়ে রাখবার বাসনা সক্রিয় ছিল।[129] কারণ স্কুল-কলেজে ভিক্টোরীয় নৈতিকতার আলোকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবাদের মধ্যে যে নতুন পোশাকি লজ্জার বীজ উপ্ত হয়েছিল, সেই লজ্জার আলোকে তাদের দেশীয় পরিচ্ছদশৈলী ধীরে ধীরে অবনির্মিত হতে শুরু করেছিল। সেই একই পোশাকি সম্ভ্রমের আলোকে নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্ভ্রমের অবনির্মাণও শুরু হয়েছিল। সেই সম্ভ্রমের আলোকে নারী প্রগতি ও নারীর শৃঙ্খল মুক্তি নিয়েও উনিশ শতক জুড়ে নানা যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ভিক্টোরীয় নৈতিকতার আধারে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত আধুনিকতার ভাগিদার হিসেবে নারীদেরও গঠন করা। কারণ ভিক্টোরীয় নৈতিকতায় একজন আধুনিক পুরুষের বিকাশে নারীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারীকে শুধুমাত্র সু-পত্নী হিসেবেই নয়, সু-মাতা, যোগ্য সহচরী হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল শিক্ষিত পুরুষের বিশেষ লক্ষ্য। তাই এতদিন অন্তঃপুরের অবগুন্ঠনে ফিনফিনে পাতলা শাড়ি পরিয়ে নারীদের আবদ্ধ করে রাখা সামাজিক সম্ভ্রমের পরিচায়ক হিসেবে গণ্য হলেও, উনবিংশ শতকের যুগধর্মে তাদের শ্লীলতার মোড়কে মুড়ে বাইরে বের করে আনা হয়ে উঠল সম্ভ্রমের প্রতীক।[130] অর্থাৎ দুইটি ক্ষেত্রেই নারী শরীরের উপর পারিবারিক ও সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষায় পুরুষতান্ত্রিক দায় চাপানো হয়। লওরা এডোয়ার্ডস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নারী প্রগতিকে মাথায় রেখে একে

[129] Wilson, ‘Adorned in Dreams: Fashion and Modernity’.

[130] Mrinalini Sinha, ‘Colonial Masculinity: The ‘Manly Englishman’ and the ‘Effiminate Bengali’ in the Late 19th Century’, (Manchester, New York: Manchester University Press, 1995); Chitta Panda, “Conqueror’s Attires and Sartorial Preferences in Nineteenth and Ealy Twentieth-Century Bengal”, Sabyasachi Bhattacharya ed., ‘A Comprehensive History of Modern Bengal, 1700-1950, Vol. III’, (Delhi: The Asiatic Society & Primus Books, 2020), pp. 959-1019.

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নির্দেশিত নতুন মেয়েলি পরম্পরা ('maternal lineage in a patriarchal world') সৃষ্টির প্রবণতা বলবেন।[131]

সন্দর্ভে বিবেচ্য মূল প্রশ্ন এবং তার পদ্ধতিগত ভিত্তি:

এই সন্দর্ভের মূল বিবেচ্য প্রশ্নটি হল, বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের শ্রেণি পরিসরের সংগঠনে পারিচ্ছদিক রুচিকে কিভাবে পুঁজিবাদী, লিঙ্গবাদী, ক্ষমতাবাদী ও জাতিত্বের স্পৃহার সূচক হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই প্রশ্নটিকে ভাঙলে উক্ত সূত্রগুলোর সাথে গাঁথা বিভিন্নমুখীন প্রশ্নের জন্ম হয়। প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসে সেটি হল -- মধ্যবিত্তের পোশাকি শ্রেণি পরিচিতির সংগঠনে পুরুষকেই কেন গুরুত্ব দেওয়া হল। এর মূল কারণ -- ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ অভিঘাত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সবদিক থেকেই প্রথম এসে আছড়ে পড়েছিল পুরুষের সামাজিক দেহের উপর। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বুদ্ধিতে শিক্ষিত পুরুষের সামাজিক দেহের উপর। যে অভিঘাতের মধ্য দিয়েই মধ্যবিত্ত পুরুষের নাগরিক দেহের জন্ম। সুতরাং মধ্যবিত্তের পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মধ্যবিত্ত পুরুষের কথা বলতে হয়। তার আলোকে ব্যাখ্যা করতে হয়, কিভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের বস্ত্র-রুচি, দেশীয় বস্ত্র-বাজারের সাথে বিলিতি বস্ত্র-বাজারের দ্বন্দ্ব এবং শাসক শাসিতের সামাজিক আচার-আচরণের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র রুচিশীলতার পরিসরে উন্নীত হয়েছিল। সেই দ্বন্দ্বকে ভালোভাবে বুঝতে হলে এদেশে শাসক হিসেবে ব্রিটিশের পোশাকি ক্ষমতার সংগঠনের বিষয়টিকেও ভালোভাবে বুঝতে হয়। মধ্যবিত্তের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য বাজার এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আন্তঃক্রিয়ায় কিভাবে নতুন পোশাকি লজ্জা ও সম্ভ্রমের বিকাশ হল – তাকেও বুঝতে হয়। তবেই আমরা স্বদেশির কালে বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে মধ্যবিত্ত পুরুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া আত্ম-পরিচিতির তাগিদটিকে নিপুণভাবে বুঝতে পারি। আর সেই তাগিদকে বুঝতে স্বদেশি কালে বস্ত্রের সিম্বলিক অনুসঙ্গের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ -- অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে বস্ত্র কিভাবে স্বাদেশিকতার চিত্ররূপ হয়ে ওঠে বা সেই চিত্ররূপের সংগঠনে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কেমন ছিল, এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? আবার মধ্যবিত্ত জাতীয়তার মধ্যে অপরীকরণের রাজনীতি কতটা সচল ছিল সেটাও বুঝতে হবে – বিশেষ করে ধর্মীয় অপরীকরণ এবং সাম্প্রদায়িক্তার উন্মেষকে বুঝতে হবে।

উপরের প্রশ্নগুলোর আলোচনার ক্ষেত্রে নানান চরিত্রের মহাফেজখানার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেই মহাফেজখানা কখনো রাষ্ট্রীয়, কখনো আত্মজীবনী, স্মৃতিকথার মধ্যে বিস্তৃত; কখনো বা সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে, কার্টুনে, ব্যঙ্গ কবিতায়, ব্যক্তিগত সংগ্রহের বিভিন্ন ফটোগ্রাফে। আবার দেশী-বিদেশী চিত্রকরদের আঁকা সমকালীন চালচিত্র, ব্রিটেন থেকে কর্মসূত্রে এদেশে আসা ইংরেজ সিভিলিয়নদের প্রকাশিত ভ্রমণকথা, উপদেশমূলক বই, ডাক্তারি উপদেশের সংকলন, তাদের দ্বারা পরিচালিত পত্র-পত্রিকাও আমাদের এই আলোচনাতে নিবিষ্ট হতে সাহায্য করে। এর সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সাহিত্য – ব্যঙ্গ-নকশা-প্রহসন থেকে শুরু করে

[131] Laura F. Edwards, 'Only the Clothes on Her Back: Clothing and Hidden History of Power in Nineteenth-Century United States', (New York: Oxford University Press, 2022).

নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতাও এই আলোচনার বিভিন্ন দিকের পরিস্ফুটনে সাহায্য করবে।

একসময় বাঙলার বস্ত্রশিল্পের জগতজোড়া খ্যাতি ছিল। ব্রিটিশ অফিশিয়ালদের লেখাপত্র থেকেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রবার্ট ওরমে বলেছিলেন, সামান্য কটা যন্ত্রপাতি দিয়ে ভারতীয় তাঁতিরা যে সূক্ষ্ম বস্ত্র বোনে, সেইরকম যন্ত্রপাতি দিয়ে ইউরোপীয় তাঁতিরা মোটা কাপড়ও বুনতে পারবে কিনা সন্দেহ।[132] জেমস টেলরও বলেছিলেন, খ্রিষ্টাব্দের শুরু থেকেই ঢাকায় বোনা মসলিন ইউরোপের নানা দেশে খ্যাতি অর্জন করে। রোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত মহিলারা এই কাপড় পরে নিজেদের আভিজাত্য প্রদর্শন করতেন।[133] কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের ফলে, বাণিজ্যিক মুনাফা লাভের স্বার্থে এদেশীয় বস্ত্রশিল্পকে ব্যবহার করার দরুণ দেশীয় বস্ত্রশিল্পের গরিমার হানি ঘটে। কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতিদের শ্রমকে নির্বিচারে কুক্ষীগত করতে গিয়ে তাঁতিদের স্বাধীন তাঁত বুননের উপর আঘাত করে। উইলিয়ম বোল্টের মতো ব্রিটিশ অফিশিয়াল কোম্পানির অত্যাচারে ঢাকা, মুর্শিদাবাদে তাঁতিদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে নির্বাসনে চলে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন (যদিও তা বিতর্কসাপেক্ষ)।[134] অফিশিয়ালদের এই ধরণের লেখা-পত্রগুলোর প্রায় প্রতিটিই মূদ্রিত। কিন্তু মহাবিদ্রোহে ভারতীয়দের মধ্যে কোম্পানির নির্বিচার শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, ঔপনিবেশিকদের সংগঠিত শোষণের দিকে চালিত করে। যার ফলে ১৮৬০-এর দশক থেকে পরীক্ষণমূলক কটন-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এদেশের তুলো চাষে শ্রীবৃদ্ধির মোড়কে ব্রিটেনের স্বার্থে রসদ জোগানোর চেষ্টা শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের নথিপত্র সাক্ষ্যপ্রমাণের কাজ করে। কিন্তু একই সাথে ভারতের বাজারে বিলিতি পণ্যের প্রভাব বেড়েছিল, অর্থাৎ এদেশে তুলো উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের বাণিজ্যিক বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করা। তাই উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশের সাথে সাথে ম্যাঞ্চেস্টার কাপড় বা অন্যান্য বিলিতি পণ্য বা বিলিতি শুল্কের আওতাভুক্ত পণ্যের প্রতি দেশীয়দের মোহও বাড়তে থাকে। মধ্যবিত্তের রুচির পরিসর বিলিতি বাজারের অভিঘাতে কিভাবে পাল্টে যাচ্ছিল, সে বিষয়ে আমরা যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতো ব্যক্তিত্বদের আত্মজীবনী থেকে ধারণা করতে পারি। এদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্টানের পর ঔপনিবেশিকরা নিজেদের রুচির পরিসরের সাথে শাসিতদের রুচির পরিসরের বিভাজনরেখা নির্ধারণ করে কিভাবে মধ্যবিত্তের মনে শাসক শ্রেণির রুচির প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করেছিল, সেই প্রক্রিয়াকে বুঝতে আমরা ও'ম্যালি'র মতো কোম্পানি অফিশিয়ালের লেখার দিকে তাকাতে পারি। তাছাড়া ক্যাপ্টেন থমাস উইলিয়মসন'এর মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে কাজ করতে আসা নবাগতদের জন্য গাইডে, ফ্যানি পার্কসের ভারত ভ্রমণ সংক্রান্ত বর্ণনায় এবং এরকম আরও বহু গ্রন্থে এদেশে

[132] Robert Orme, 'Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Morattoes, and of the English Concerns in Indostan; from the year M.DC.LIX/1659', (London: Printed for F. Wingrave, M,DCCC,V/1805).

[133] James Taylor, 'A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca, in Bengal', (London: John Mortimer, MDCCCLI/1851).

[134] William Bolts, 'Considerations on Indian Affairs; Particularly Respecting the Present State of Bengal and Its Dependencies', (London: Printed for J. Almon in Piccadilly, P. Elmsly in the Strand & Brotherton and Sewell in Cornhill, MDCCLXXII/ 1772).

ব্রিটিশ এবং দেশীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানা যায়। ব্রিটেনের এদেশে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে নেটিভ এবং ব্রিটিশ জীবনযাত্রার পোশাকি পরিবর্তনের দিকগুলো The Englishman, Calcutta Gazette-এর মতো বিভিন্ন সংবাদপত্রের দিকে নিবিড় দৃষ্টি রাখলে বোঝা যাবে। শুধুমাত্র সংবাদপত্রই নয়, সরকারি কানুনের লিখিত নিদর্শন থেকেও আমরা শাসক এবং শাসকের অধীনে কর্মরত মধ্যবিত্তের শ্রেণি পরিচিতির প্রকাশ এবং তার দ্বন্দ্ব দেখতে পাব। সরকারি কার্যক্ষেত্রে জুতো ও পাগড়ি নিয়ে যে নির্দেশনামা ছিল, সে বিষয়ে উনিশ শতকের ৭০-৮০-র দশকে মধ্যবিত্তের মতামত high imperialism-এর কালে তাদের শ্রেণি পরিচিতির অবস্থানকে বুঝতে সাহায্য করে। তাছাড়া উনিশ শতকের শুরুর থেকে বাবু সমাজের পারিচ্ছদিক রুচিবোধের পরিবর্তনমানতা, তার দোলাচল এবং ভদ্রলোকীয় পোশাকি বৃত্ত সংগঠনের বিষয়টিকে বুঝতে আমাদেরকে সমকালীন সাহিত্যগুলো সহায়তা করে। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, মধ্যবিত্তের পোশাকি চেতনাকে বুঝতে বিভিন্ন তথ্যসূত্রের আলোকে পোশাকি সংস্কৃতির সাথে যুক্ত নানান উপকরণকে নিবিড়ভাবে পাঠ করতে হয়। যেমন, লুঙ্গি; মধ্যবিত্ত হিন্দু নিজের পোশাকি পরিচিতির বুননের সাথে সাথে কিভাবে কোনো পারিচ্ছদিক উপকরণের মাধ্যমে সেই পরিচিতিকে অন্যের চাইতে আলাদা করেছে তাও নিবিড়ভাবে সমকালীন সাহিত্য পাঠ করার মাধ্যমে তুলে আনা যায়। আর তার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মধ্যে পারিচ্ছদিক প্রতিক্রিয়াকে বুঝতে কিছু সংবাদপত্র আমাদের সাহায্য করতে পারে। হিন্দু মধ্যবিত্তের পরিচ্ছদ রুচির পরিবর্তনমান শিক্ষিত মুসলমানরা কিভাবে দেখেছিলেন, তা সেখান থেকে পরিষ্কার হয়। হিন্দু ও মুসলমানের পরিচ্ছদ সংক্রান্ত সাত্ত্বিককতার প্রশ্নে শাসক হিসেবে ব্রিটিশের অভিব্যক্তি ঔপনিবেশিক সরকারের চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায়।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের মধ্যে নতুন সামাজিক সম্ভ্রম ও পোশাকি লজ্জার উন্মেষ কিভাবে হচ্ছিল তা বোঝা যায় উনিশ থেকে বিশ শতকের বিভিন্ন আত্মজীবনী থেকে। ব্যক্তিগত সংগ্রহের স্থিরচিত্রও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর সেই লজ্জা কিভাবে নিজের পারিবারিক পরিসরে, নিজের বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানের উপর জাঁকিয়ে বসে নারীর নতুন পোশাকি দেহের বিকাশ ঘটাচ্ছিল তা উনবিংশ থেকে বিংশ শতকের বিভিন্ন নারীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রহসন প্রভৃতি আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে। বামাবোধিনী পত্রিকা এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আছাড়া থিয়েটারের মঞ্চে পুরুষ-দেহে শাড়ি চাপিয়ে তাদের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করানোর মধ্য দিয়ে নারীদের থিয়েটারের মতন “পঙ্ক” থেকে রক্ষা করার মানসিকতা কিভাবে কাজ করেছিল, তা ‘সংবাদ রসরাজ’, ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’, ‘মধ্যস্থ’, ‘সংবাদ প্রভাকর’এর মতন পত্রপত্রিকাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। তাছাড়া পরবর্তীতে থিয়েটারে গণিকাদের আগমনের মধ্য দিয়ে ভদ্রলোকীয় সামাজিক শীলন বিষয়ক বিতর্ক বিষয়ে নটী বিনোদিনীর রচনা থেকে আভাস পাওয়া যায়।

আবার স্বদেশি আন্দোলন কালে শরীর কিভাবে জাতিত্বের চিহ্নস্বরূপ বস্ত্র বহনের মাধ্যম হয়ে ওঠে বা বস্ত্র কিভাবে জাতি-পরিচিতি বিকাশের মাধ্যমে পরিণত — তা নীরদ চৌধুরী এবং রমাপদ চৌধুরীর রচনা বা মহাফেজখানার বিভিন্ন নথিপত্র, ‘সচিত্র শিশির’এর মতো পত্রিকা

থেকে বোঝা যায়। সেই জাতিত্ব বস্ত্রশিল্পে স্বনির্ভরতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে কিভাবে সওয়াল করে, তা আলামোহন দাস ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়-এর রচনা থেকে বোঝা যায়। বস্ত্রশিল্পে স্বনির্ভরতা এবং পোশাকি পরিচিতির রূপায়ন কতটা বাস্তবিক ছিল বা কতটা হিড়িক ছিল তা সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের লেখাপত্র থেকে বোঝা যায়। 'চরকা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন , 'তাঁর (গান্ধিজি) হাত দিয়ে ভারতের ভাগ্যবিধাতা একটা দীপ্যমান দুর্জয় দিব্য শক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক।'[135] যদিও আমাদের আলোচনার পরিসর ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে গান্ধির আগমনের আগেই শেষ হবে, তবু বলতে হয় -- গান্ধিবাদী রাজনীতির যুগে পোশাকি উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গান্ধিকে ক্যারিশ্মাময় করে তোলার ধারাটি স্বদেশির সময়কাল থেকে চলা হিড়িকের মধ্যেই নিহিত ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী' ,'সচিত্র শিশির'এর মতো অনেক পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য গ্রন্থ থেকে এ বিষয়গুলো উঠে আসে।

সন্দর্ভে আলোচ্য অধ্যায়সমূহ

১। ঔপনিবেশিক বাংলায় পোশাকি রুচির পরিবর্তন: বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয় ও বিলিতি উদ্যোগের সাপেক্ষে

উনবিংশ শতকের বিশ তিরিশের দশক থেকে বাংলা দেশে বস্ত্ররুচির পরিবর্তনকে মূলগতভাবে বোঝার জন্য এই অধ্যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক কালে বাংলার বস্ত্রশিল্প নিয়ে স্বদেশি পরবর্তীকালে যে একটা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছিল, সেখানে বাংলার বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্যের বিষয়টি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসারের তাগিদে ঘটা করে প্রচার হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে বেশিরভাগ গবেষণার মধ্য দিয়ে বিশ্বের বস্ত্র-বাণিজ্যে প্রাক-ঔপনিবেশিক কাল থেকেই বাংলার বস্ত্রের শক্তপোক্ত অবস্থানের বিষয়টি প্রমাণিত সত্য। এমনকি ঔপনিবেশিককালেও কোম্পানির অফিশিয়ালরা এদেশীয় বস্ত্র ও বস্ত্রশিল্পীদের কাজের গুণমানকে অস্বীকার করতে পারেননি। এই গুণমানের কারণেই কোম্পানির আমলে এই বস্ত্রশিল্পের বাণিজ্যিক সত্ত্ব এবং শিল্প সত্ত্ব ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিকদের হাতে চলে গিয়েছিল এবং এদেশীয়দের বস্ত্র চাহিদার জোগানদাতা হিসেবে বিলিতি মিলের উৎপাদন জাঁকিয়ে বসেছিল। কিন্তু মহাবিদ্রোহের পর এদেশের শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে রাণীর হাতে চলে গেলে এদেশীয় বস্ত্রশিল্পের উপর শোষণের মাত্রাটা সুগঠিত রূপ পায়। অর্থাৎ ভারতের মাটিকে নিজেদের বস্ত্রশিল্পের কাঁচামালের জোগানদাতায় পরিণত করে, এদেশের তুলো এবং সিল্ক চাষের উন্নয়নে নিজেদের যন্ত্রের মোড়কে পূর্বের শোষণ প্রক্রিয়াকে জারি রাখার একটা তাগিদ উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে পুরোদমে শুরু হয়েছিল। তার সাথে সাথেই ভারতের বাজারে ম্যাঞ্চেস্টার-ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের আমদানি বাড়ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পরিবর্তনমান রুচি ও সামাজিক সম্ভ্রমের নতুন আদর্শের বিকাশের সাথে সাথে সেই ধুতি-শাড়ির বাজার বেশ লাভের মুখও দেখতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে

[135] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "চরকা", ভাদ্র ১৩৩২, 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র' (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, জানুয়ারি ২০১৫) পৃ ১১১৪।

ভারতের বস্ত্রশিল্পের নান্দনিক ও অর্থনীতকে দিকগুলোকে করায়ত্ত করে উপনিবেশিকরা কিভাবে মধ্যবিত্ত সাধারণের দেশীয় ঢঙের পারিচ্ছদিক রুচির উপর নিজেদের বাজারি অধিকার কায়েম করেছিল তা বিশদে আলোচিত হবে।

২। শরীর, পোশাক, এবং ক্ষমতা: ঔপনিবেশিক কলিকাতায় ব্রিটিশের পোশাকি রুচি ও রাজনীতি

বাংলা দেশে মধ্যবিত্তের পোশাকি পরিচিতি বিষয়ে বিশদে আলোচনায় প্রবেশের আগে আমাদের দেখতে হয় – ঔপনিবেশিক শাসকের পোশাকি ক্ষমতার অঙ্কুরোদগম, তার বিকাশ এবং তার পরিণতি বিষয়ে। পলাশী পরবর্তী কালেও এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অধিষ্টিত হবে কিনা, তা নিয়ে দোলাচল ছিলই; তাই অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেও কলকাতার নিলাম ঘরে সাহেবদের চাহিদার কথা ভেবে বিলিতি রুচির জিনিসপত্রের আধিক্য থাকলেও কোম্পানির তরফ থেকে এমন কোনো আইন ছিল না, যা সাহেবদের দেশীয় জীবনাচরণে বাধা দিয়েছে। অর্থাৎ সাহেব-সুবোরা চাইলে গরমের দেশে ঢিলে-ঢালা পোশাক পরে রাস্তা-ঘাটেও বেরুতে পেরেছে। যদিও এই দেশি জীবনাচরণের প্রতি কোনোদিনও কোম্পানি প্রশাসনের তরফে ভালো দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু বারণও ছিল না। কিন্তু পাকেচক্রে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে কোম্পানির সম্পৃক্ততা যতই বাড়ে, এবং এদেশীয় জীবনাচরণের সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা যতই বাড়ে, ততই তারা নিজেদের সভ্য এবং আলোকপ্রাপ্ত বাহবা দিয়ে এদেশীয় জীবনাচরণের সাথে নিজেদের পোশাকি দূরত্ব বাড়িয়ে ১৮৩০এর দশকে পোশাক আইন প্রয়োগ করে। যার মোদ্দা কথা হল, কোনো ব্রিটিশ অফিশিয়াল ভারতীয় জীবনাচরণ ও পোশাক পরিধাণ করতে পারবে না। এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে, উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বিশ শতকে ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে অবধি ব্রিটিশরা এদেশের ক্রান্তীয় আর্দ্রতায় নিজেদের পোশাকে সাম্রাজ্যিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বদেশীয় রুচির অনুপুঙ্খ অনুশীলন করার জন্য কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

৩। শরীর, পোশাক, এবং রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরে পুরুষ ও তার সামাজিক পরিসরের পোশাকি নির্মিতি

ঔপনিবেশিক শাসকের পোশাকি স্বাতন্ত্র্য এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের রাজনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে উপনিবেশে নিজেদের কর্মপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেটিভ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের বীজ কিভাবে উপ্ত হয়েছিল – তা এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়টিকে তুলে ধরতে একদিকে যেমন উপনিবেশিক সরকারের পোশাক সম্বন্ধিত আইন-কানুনের সাথে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী পুরুষের দ্বন্দ্বের জায়গাটিকে বিশ্লেষণ করা হবে, তেমনই বিলিতি রুচির বাজারের সাথে মধ্যবিত্তের সংযোগকে মাথায় রেখে উৎসব-অনুষ্ঠানে বা সন্তান প্রতিপালনে মধ্যবিত্ততার পোশাকি উদযাপনের বিষয়টিও এই আলোচনায় আসবে।

৪। শরীর, পোশাক ও লজ্জা: মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের নির্মাণ

লজ্জার সংজ্ঞা স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়। তাই অশ্লীলতার সংজ্ঞাও। উনিশ শতকে বাংলার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সূক্ষ্ম-বস্ত্র পরিধানের যে দেশাচার বাংলা দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভদ্রবিত্তদের কাছে লজ্জাজনক ঠেকেছিল, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেও কিন্তু সেই দেশাচার উনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রবিত্তদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বহাল-তবিয়তে বিদ্যমান ছিল। তবে সামাজিক মনস্তত্ত্বে এই পরিবর্তিত অবস্থার জন্য কাকে দায়ী করব—ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতকে না কি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তিকে? অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় কেরানি-গোষ্ঠীর উদ্ভবকেই স্বদেশীয় আচারের দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকানোর আবশ্যিক পূর্ববর্তী কারণ হিসেবে দেখতে হবে। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনার পরেও যদি মেকলে মিনিটের ভাষ্য মোতাবেক উপনিবেশ-রক্ষার প্রয়োজনে ‘বাদামি সাহেব’ তৈরির দিকে পা বাড়িয়ে ‘white-men’s burden’ তত্ত্ব আওড়ানো না হত, ততদিন যাবত মুঘল-সাম্রাজ্য উদ্‌ভুত সামাজিক রুচি-কাঠামোই চলমান থাকত। সমাজে নতুন শ্লীলতা ও অশ্লীলতা খোঁজার প্রয়োজন পড়ত না। লজ্জার নব্য সংজ্ঞা আমদানিরও দরকার পড়ত না। অর্থাৎ দেশীয়দের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে উপনিবেশের ‘মহৎ’ সভ্যতার যজ্ঞে তাদের সামিল করে উপনিবেশের শাসককূল আদপে নিজেদের শাসনকেই সমুন্নত ভিতের উপর সংস্থাপন করতে চেয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তির সাথে সাথে মধ্যবিত্ত পুরুষের নতুন পোশাকি রুচির মধ্য দিয়ে লজ্জা’র ধারণা কিভাবে নির্মিত হয়েছিল, এবং সেই লজ্জা কিভাবে ভিক্টোরীয় পোশাকি নৈতিকতার প্রতিনিধিত্ব করে মধ্যবিত্ত পুরুষের সমাজ দর্শন, পরিবার চেতনায় প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই চেতনার আলোকে নারীর সামাজিক শরীরকে নতুন পোশাকি দর্শনে ব্যাখ্যা করতে এবং নির্মাণ করতে শুরু করে, যে নির্মাণে সাধারণ ঘরের মেয়ের সাথে দেহোপজিবীনির পার্থক্য বা নিজের কলকাত্তাইয়া সামাজিক সত্তার সাথে কলকাতার বাইরের অঞ্চলের পার্থক্য এবং সেই পার্থক্য নিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব – এই অধ্যায়ের বিশদ আলোচ্য বিষয়।

৫। শরীর, পোশাক ও রাষ্ট্র: পোশাকি স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার নির্মাণ

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মধ্যবিত্তের মধ্যে পোশাকি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার যে তাগিদের কথা আমরা আগে থেকে বলে আসছি, তা মূলত দুইভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। একদিকে, একদল মধ্যবিত্ত হিন্দু চাকুরে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচার অনুশীলনের পূর্ণ সরকারি ছাড়পত্রের জন্য উদগ্রীব ছিল; অন্যদিকে আরেকদল পাশ্চাত্য শিষ্টাচারকে নিজেদের দেশি পোশাক-পরিচ্ছদে প্রকট করে পোশাকি আত্মপরিচিতির অনুসন্ধানে রত ছিল। একদিকে নিজেদের পোশাকি অস্তিত্বকে বিলিতি সভ্যতানুগত করে তুলে তার মধ্য থেকে নিজস্ব পরিচিতি খোঁজার চেষ্টা, অন্যদিকে পূর্বেকার শাসকের পোশাকি অস্তিত্বের থেকে নিজেদের দূরত্ব স্থাপনার তাগিদ, দুইই একইসাথে কাজ করেছিল। যা বিশ শতকের প্রথম দিকের স্বদেশি-বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক ইন্ধন পায় এবং আন্দোলনে সেই নতুন পোশাকি দর্শনের প্রয়োগের ফলে প্রশাসনের সাথে বিরোধের জন্ম হয়। তার সাথে সাথে মধ্যবিত্ত পুরুষের কলকাত্তাইয়া পোশাকি পরিশীলন বাঙালি পরিচিতির একীভূত স্বাতন্ত্র্য তৈরি করতে গিয়ে ধর্ম এবং আঞ্চলিক অপরীকরণের সৃষ্টি করে। যা নিয়ে শিক্ষিত মুসলমানরা ধীরে ধীরে সরব হতে শুরু করেন। অর্থাৎ পোশাকি স্বাদেশিকতা ও পোশাকি

সাম্প্রদায়িকতার প্রক্রিয়াটি কিভাবে সমানতালে চলেছিল, আবার সেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পোশাকি অনুশীলন কিভাবে শুরু হয়েছিল – তাও এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে হয়, এই সন্দর্ভে উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের শুরুতে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশের সাথে সাথে বস্ত্ররুচির পরিবর্তন বা বস্ত্ররুচির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের শ্রেণি পরিসরের স্বাতন্ত্র্য এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের ধর্মীয়, বর্ণীয় ও লিঙ্গগত রাজনীতির বহুমাত্রিক দিকগুলো বোঝার একটা প্রচেষ্টা থাকবে। উক্ত সময়ের আবর্তে আবদ্ধ ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রকে মধ্যবিত্তের পোশাকি রুচি ও রাজনীতির পরিবর্তনমানতার সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা হবে। এই সন্দর্ভের আলোচ্য সময়কাল ১৮৫০ থেকে ১৯২০ রাখা হলেও ঔপনিবেশিক শাসকের পোশাকি ক্ষমতার উদ্ভবকে বোঝাতে আলোচনা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই শুরু হবে এবং সাম্প্রদায়িকতার পোশাকি রূপকে বোঝানোর জন্য আলোচনায় অনেকসময় ১৯২০-র পরের নানা ঘটনার সূত্র টানা হবে। কিন্তু ১৮৫০-১৯২০ এই সময়কালকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হল। কারণ ১৮৫০-৬০ এর দশককে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা নতুন মোড় বলা যায় (অনেকে বলেন high imperialism'এর সূচনাকাল)। যে মোড়ে এসে আর্থিক আধিপত্যকে অনড় রাখবার চেষ্টা যেমন চলেছে, তেমনই দেশীয় কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীভূত ড্রেস কোডের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রের একীভূতকরণের প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা গিয়েছে; যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিক দেহের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। কারণ পাশ্চাত্য যুক্তি-বুদ্ধির সংস্পর্শে এসে দেশীয় সমাজে যে আত্মপরিচিতির উন্মেষ ঘটবে, তা ধীরে ধীরে প্রশাসনিকভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। যার ফলস্বরূপ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও তা কার্যকর হওয়ার পর ১৯০৫ সাল থেকে স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন শুরু হয়, যা ধীরে ধীরে চরমপন্থী আন্দোলনের রূপ নেয়। তাই ১৯০৫-১৯২০ এমন একটা সময়কাল যখন একদিকে স্বদেশি-বয়কট, অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকোপে মধ্যবিত্ত নাগরিক দেহের বিকাশ অন্যমাত্রা পেয়েছিল। সেই মাত্রার সামাজিকতা ও রাজনৈতিকতার উপর আলোকপাত করে আলোচনাকে সুসংহত করার জন্য, এই সন্দর্ভটি ১৯২০-র দশকেই শেষ হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পোশাকি রুচির পরিবর্তন: বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয় ও বিলিতি উদ্যোগের সাপেক্ষে

ভূমিকা

ব্রিটিশ আগমনের ফলে বাংলা দেশে নব্য রুচিশীলতার নির্মাণের পিছনে প্রাথমিকভাবে পশ্চিমা পুঁজির বিশেষ ভূমিকা ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে তার সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব জারিত হয়ে 'habitus' বা রুচির স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটায়; এবং ফলস্বরূপ নতুন শ্রেণি পরিচিতির বিকাশ ঘটে।[1] যাকে এই আলোচনা জুড়ে আমরা মধ্যবিত্ত হিসেবে চিনব। দেবেশ দাশ লিখেছেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে চোগা-চাপকানের দরবারি শিষ্টাচার সেকেলে হয়ে পড়েছে। 'লম্বস্যুটপটাবৃত' হওয়াই প্রাত্যহিক পোশাকি শিষ্টাচার হয়ে দাঁড়িয়েছে।[2] প্রাত্যহিকতায় এই বিবর্তন দু-তিন দশকে ঘটেনি। গোটা একটা শতক জুড়ে ঘটেছিল। তার গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল-- অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে এদেশীয় কিছু গোষ্ঠীর সাথে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন এবং সেই সূত্র ধরে দরবারি পোশাকি শিষ্টাচারের সম্প্রসারণ, যে দরবারি শিষ্টাচার মধ্যযুগ ধরে সাত্ত্বিক হিন্দু আচারে অশুচি হিসেবে দৃষ্ট হয়েছিল (ছবি ২.১ দ্রষ্টব্য)। আল বিরুনী তাঁর 'তাহকক-ই-হিন্দ'এ লিখেছিলেন, এদেশের হিন্দুরা মুসলমানের নাম শুনিয়ে, তাদের পোশাক পরিয়ে এবং তাদের চেহারার নকল করে শিশুদের ভয় দেখাত।[3] অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বে বাস করেও মুসলমান সামাজিক শিষ্টাচার হিন্দু সমাজের একশ্রেণির (উচ্চ বর্ণের বলেই মনে হয়) কাছে এতই ভয়ঙ্কর ঠেকেছিল যে, তারা পরিবারের কচি-কাচাদের ভয় দেখাতে মুসলমান সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুকেই ব্যবহার করতেন। অবশ্যই এই ভয়, অবিশ্বাসের কারণ মূলত দুই সমাজের মধ্যেকার সামাজিক দূরত্ব এবং হিন্দুদের সামাজিক শিষ্টাচারে আড়ষ্টতা। নীরদ চৌধুরি লিখেছেন, 'বাঙালি [হিন্দু] পুরুষ ইংরেজ রাজত্বের আগে একমাত্র মুসলমান নবাবদের কর্মচারী হইলে মুসলমানী পোষাক পরিত উহা অন্দরে লইয়া যাওয়া হইত না। বাহিরে বৈঠকখানার পাশে একটা ঘর থাকিত। সেখানে চোগাচাপকান ইজার ছাড়িয়া পুরুষেরা ধুতি পরিয়া ভিতরের বাড়িতে প্রবেশ করিত। তাহার প্রবেশদ্বারে গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা থাকিত। ম্লেচ্ছ পোষাক পরিবার অশুচিতা হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য পুরুষেরা গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মাথায় একটা দুইটা তুলসীপাতা দিত।'[4] ব্রিটিশ আমলেও প্রায় হিন্দু পরিবারে এই প্রথ প্রচলিত ছিল। লীলা মজুমদার লিখেছেন, কোট প্যান্ট বা চোগা চাপকান পরে মধ্যবিত্ত পুরুষেরা অফিসে গেলেও, বাড়িতে এসেই পরতেন চটি, ধুতি, পাজামা, শাল। নীরদ চৌধুরীর মতে, অনেক পরিবারে তো সেলাই বস্ত্র পরে

---

1 Pierre Bourdieu, 'Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste', Translated by Richard Nice, (Cambridge, Massachusetts: Harverd University Press, 1996).

2 দেবেশ দাশ, "রাজোয়ারা", 'দেবেশ দাশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড', (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃ ৯; শ্রীবাসব, 'গোমতী গঙ্গা', (কলিকাতা: বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৬৯), পৃ ২৮-২৯।

3 আবু মহামেদ হাবিবুল্লা অনূদিত, 'আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব', (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪), পৃ ৬।

4 নীরদ সি চৌধুরী, 'আত্মঘাতী বাঙালী', (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪২৫), পৃ ৪৯-৫০।

অন্দরমহলেই ঢোকা যেত না।[5] তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বাণিজ্যিক পুঁজির প্রভাবে সামাজিক মান্যতার আকাঙ্খা যতই বেড়েছে, হিন্দু সমাজের আড়ষ্টতা ততই কমতে শুরু করেছিল। হুতোম কলকাতায় দিন কাটানো পাড়াগাঁয়ের জমিদারদের পোশাকি অবয়ব বর্ণনা করেছেন এইভাবে, -- 'মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, ... বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তার মালা।'[6] বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে বেরুনো সৌখিন বুড়োর পোশাকের বর্ণনায় তিনি বলছেন, 'অনেকে বুড়ো মিনসে হয়েও হীরে বসানো টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তোর মালা, ... দু'হাতে দশটা আংটি পরে 'খোকা' সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না।'[7] যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, পুরাতন পোশাকি শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিসরে নিজেদের পোশাকি মান্যতা তৈরি। কারণ, হিন্দুদের কটিবস্ত্র ও উত্তরীয় পরার রীতি শুরু থেকেই ঔপনিবেশিকদের দ্বারা নগ্নতার দায়ে অভিযুক্ত ছিল। আবার মধ্যযুগ ধরে হিন্দু সামাজিকতায় সেলাই করা পোশাক ছিল 'ম্লেচ্ছত্বের' প্রতীক, তাই তা কেবল নবাবি ক্ষমতার সংস্কৃতির সাথে যুক্তদের মধ্যেই অনুশীলিত হত।[8]

ছবি ২.১) বাঙালি পুরুষের পোশাকি বিবর্তন (সাদা-কালো লিথোগ্রাফ @CSSSC_archive)

কিন্তু উনিশ শতকজুড়ে উত্থিত বাঙালি অভিজাতদের বাড়ির বৈঠকখানা ধরে হাঁটলে দেখা যাবে – নবাবি বাবু ও ইংরিজি বাবুর প্রতিকৃতি। দেশীয় পোশাকের বাবুও আছেন, তবে তারা হাতেগোনা।[9] যদিও তাঁদের দেশীয় পোশাকও ভিক্টোরীয় শিষ্টাচারে মোড়া। পশ্চিমা মিলের তৈরি কাপড়ের পসার এদেশের বাজারে যতই বেড়েছিল, ততই ন'গজ চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ধুতি জনপ্রিয় হয়ে

5 নীরদ চৌধুরী, 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি', পৃ ৫০; লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯), পৃ ৪৯।
6 কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', (কলিকাতা: নতুন সাহিত্য ভবন, আষাঢ় ১৩৬৩), পৃ ১৯।
7 তদেব।
8 Sylvia Houghteling, 'The Emperor's Humbler Clothes: Textures of Courtly Dress in Seventeenth-century South Asia', *Ars Orientalis*, Vol. 47, 2017, pp. 91-116.
9 শ্রীপান্থ, 'কেয়াবাৎ মেয়ে', (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০১৯), পৃ ১০৯।

উঠেছিল। যার দরুণ ধুতি পরার ধরণেও পরিবর্তন এসেছিল। অর্থাৎ ধুতির কোঁচা লম্বমান রাখা, ধুতির ওপরে কফ-শার্ট ও চাপকান পরা, ধুতির ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে যাতে ত্বক দেখা না যায়, তার জন্য উরুর সাথে গার্টার দিয়ে আটকে লম্বা স্টকিং পরা, তার সাথে মাথায় ব্রিমলেস ক্যাপ বা সামলা ও মুগলী পাগড়ি পরার পসার – পাশ্চাত্য বাজার ও শিক্ষার মিলিত ফল। পাশ্চাত্য বাজার ও শিক্ষার জারণের কালেও অনেক পরিবার সাহেবি পোশাককে অশুচি দেখলেও,[10] সমস্ত শরীর ঢেকে শিষ্টাচার প্রদর্শনের ভিক্টোরীয় আচারকে নস্যাৎ করে শুধু ধুতি-চাদরের সাত্ত্বিকতায় আটকে থাকতে পারেনি।

যে শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে এদেশীয় পোশাকি শিষ্টাচার ও রুচিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল, সেটি অবশ্যই ব্রিটিশদের আমদানি করা পাশ্চাত্য শিক্ষা।[11] যে আমদানির একটি লক্ষ্য ছিল, ভারতীয় নাগরিক সমাজকে নিজেদের শাসনের উপযুক্ত করে তোলা – না হলে যে সর্বক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এবং অপর লক্ষ্য ছিল – এদেশীয়দের দেহকে পাশ্চাত্য বাজারের উপযোগী করে তোলা। যাতে করে এদেশীয়দের উপর নিজেদের বাজারি আধিপত্য কায়েম করাও সহজ হয়। অবশ্য, উপনিবেশিকরা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারকে নিজেদের 'সভ্যতা'র প্রকল্প হিসেবেই প্রচার করেছিল। যার মূল বক্তব্য ছিল – শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে তাঁরা অসভ্য, আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের আলোকপ্রাপ্তির ফল বিলাচ্ছেন।[12] কিন্তু উপনিবেশবাসীরা সেই আলোকপ্রাপ্তির ফল পূর্ণ স্বাধীনতায় ভোগ করুন, তাও তাঁরা চাননি। কারণ উপনিবেশে নিজেদের কাজ-কর্ম চালাতে সাহায্য করবার জন্য নেটিভদের যতটুকু শিক্ষিত না করলে নয়, ততটুকু শিক্ষিত করতে পারলেই হল এবং নেটিভদের তাঁদের পোশাকি শিষ্টাচারের অনুবর্তী করে তুলতে পারলেই হল – নেটিভরা তাঁদের সমকক্ষ হয়ে উঠুন, তা সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। আর সেই কারণে নিজেদের ক্ষমতার পোশাকি-দম্ভ বজায় রাখার প্রচেষ্টা উপনিবেশিক ক্ষমতার সবস্তরেই বজায় ছিল। ফলত কোনো ব্রিটিশের সামনে নেটিভ শিক্ষিত ব্রিমলেস ক্যাপ খুলে সম্মান জ্ঞাপনের অনুমোদন পাননি (তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হবে)। পাগড়ি পরে সম্মান জানাতে বাধ্য থেকেছেন। কোট-প্যান্টালুনের শিষ্টাচারকে বাঁধা হয়েছিল কঠোর অনুশাসনে। সেই অনুশাসনের ভয়ে কোট-প্যান্টালুন পরে ব্রিটিশের সামনে যাওয়ার ধৃষ্টতা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝিও কোন মধ্যবিত্ত করেছেন কিনা চোখে পড়ে না। বরঞ্চ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়রা নাইট ড্রেস কিনেও সেটাকে সাহেবদের ডাকা পার্টিতে গায়ে চাপাতে পারেন নি। অগত্যা তার অনন্ত স্থিতি হয়েছে ওয়্যারড্রোবে।[13] তার বদলে তাদের জন্য যে পোশাক সরকারি নির্দেশনামায় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তা হল – লম্ব কোঁচার ধুতি, গলাবন্ধ ও চাপকান বা ট্রাউজার্স, পিরাণ, শাল। সুতরাং শতাব্দীর শেষভাগে ধুতির সাথে কোট পরার যে চল এদেশীয় পোশাকি শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার

---

[10] নীরদ সি চৌধুরী, 'আত্মঘাতী বাঙালী', পৃ ৫০।

[11] Sudit Krishna Kumar, "The 'Bawdy' Body: A Sartorial Narrative of the Baboo in Nineteenth-century Calcutta", in Sudit Krishna Kumar & Suvobrata Sarkar ed., 'Contextualizing the Body: An Indian Experience', (Delhi: Manohar, 2021), pp. 143-145.

[12] Macaulay's Minute on Education. 1835. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html

[13] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কোট ও চাপকান", 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সংকলন', (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫), পৃ ৬৯২-৬৯৫।

পিছনে শাসক শ্রেণির মানুষের মনোভাবকে অস্বীকার করবার জো নেই। কারণ তারা কোট-প্যান্টালুন পরা নেটিভ দেখলেই হেয় করতেন। অনেকেই বলেছেন, তার পিছনে কারণ ছিল মূলত দেশীয়দের 'লুস হ্যাবিট'। বা ঢিলেঢালা সাহেবী পোশাক পরার অভ্যাস।[14] ঔপনিবেশিকতার বিকাশের সাথে সাথে ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর নিজেদের পোশাকি রাজনীতির পরিসর যেমন পাকাপোক্ত হয়েছিল, তেমনি বিলিতি বস্ত্রবাজারের প্রভাবও প্রকট হয়েছিল। একদিকে সাহেবী পোশাক পরলে হেয় হওয়া, অন্যদিকে সাহেবী রুচির বাজারের প্রলোভনের চাপে তাই উপনিবেশবাসী মধ্যবিত্তের যে দেহ বিকশিত হয়েছিল তা ছিল দোলাচলের বৃন্তে স্থিত। আবার 'hybribized'ও বটে।

বস্ত্র রুচির এই ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের লভ্যাংশ ঘরে তুলতে বিলিতি বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৬২ সালে বিলেতের Messrs Diron, Hunter & Co. এর মতো বস্ত্র উত্পাদক কলকাতায় ১০% বাণিজ্য শুল্ক দিয়েও ধুতি, গলা-বন্ধ ও শাড়ি রপ্তানি করতে পিছিয়ে ছিল না।[15] তেমনি রবার্ট ওয়েবেলের মতো মিডেলসেক্স নিবাসী ব্রিটিশ গরমের দেশে নিজেদের জাত্যাভিমানসূচক টুপি পরবার অসুবিধার কথা ভেবে লুমের তৈরি কম আঁটোসাঁটো ক্যাপ এনে ভারত-নিবাসী ঔপনিবেশিকদের বাজার ধরবার চেষ্টা করেছেন। যাতে গরমের দেশেও তাঁদের প্রভুত্বের স্মারক টুপিকে বহাল রাখা যায়।[16] উপনিবেশিক ক্ষমতার আবরণ প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য পুঁজির মিলিত সমীকরণে তৈরি হয়নি।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগে পাশ্চাত্য পুঁজি এদেশীয় বাজারকে অধিকার করবার সর্বৈব চেষ্টা করেছে। ১৮৬২ সালে কোম্পানিকে ধুতি, শাড়ি, গলাবন্ধের মতো রপ্তানি দ্রব্যের উপর ১০% হারে শুল্ক দিতে বলা হলেও ১৭১৭ সালে ফারুকশিয়ারের ফরমানের মধ্য দিয়ে কোম্পানি বিনাশুল্কে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের ছাড়পত্র লাভ করে এবং দ্রব্যসামগ্রী এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিনাশুল্কে স্থানান্তরের দস্তকও লাভ করে। তাঁরা এও দাবি করতে থাকেন যে, তাঁরা যে সকল পণ্যের ব্যবসা করবেন -- তা নিয়ে আর কেউ বিনাশুল্কে ব্যবসা করতে পারবেন না।[17] সুতরাং ১৭১৭ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল অব্দি একটা সুসংবদ্ধ বাণিজ্যিক শোষণে বাংলার বহু শিল্প নষ্ট হয়ে যায়। মিস্টার মার্টিন-এর মতে ১৮৪০ সালে ইংল্যান্ডে ভারতীয় পণ্যের উপর শতকরা ৫০০ থেকে ১০০০ গুন শুল্ক চাপানো হয়। অবশ্য এই শুল্ক চাপানোর রীতিটা উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে নতুন নয়। ব্রিটেনের নিজ বস্ত্র বাজারকে রক্ষার জন্য ভারতীয় সুতোজাত পণ্যের উপর এই শুল্কের ইতিহাস আরও পুরোনো।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে যেমন ব্রিটেনে ভারতীয় সুতোজাত পণ্যের অবাধ গতি রোধ করে, নিজেদের বাজারকে সুরক্ষিত রাখতে তৃতীয় উইলিয়াম আইন পাশ করেন। সেই আইনের

---

14 Rosinka Chaudhuri, 'Freedom and Beef Steaks: Colonial Calcutta Culture', (New Delhi: Orient Blackswan, 2012).

15 Letter from W. J. Herchel, Esq. Officiating Junior Secretary to the Board of Revenue, To the Officiating Secretary to the Government of Bengal, Proceeding No. 87, September 1862, Financial Department, Separate Revenue Customs Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

16 Mr. Robert Wehbel of Middlesex – Specification of an Invention for improvement in Hats or Coverings for Head, File No. B. 112, Financial Department, Commerce Branch, June 1870, West Bengal State Archives, Kolkata.

17 Robert Travers, 'Death and the Nabob: Imperialism and Commemoration in Eighteenth-century India', *Past and Present*, No. 196, August 2007, p 93.

১১ ও ১২ ধারানুসারে ইংল্যান্ডের মেয়েদের ভারতীয় প্রিন্টেড কালিকোর বস্ত্র ব্যবহার করবার উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়; এবং বলা হয়, যারা এই বস্ত্র বিক্রি করবে বা যারা এই বস্ত্র পরবে, তাদের ২০০ পাউণ্ড স্টারলিং জরিমানা দিতে হবে। যার মূল্যমান ভারতীয় মুদ্রায় ২০ হাজারের বেশি।[18] সুতরাং অনুমান করাই যায়, উক্ত নিষেধাজ্ঞার ওজন কতটা। পরবর্তীতেও এই প্রবণতাই বহাল ছিল। ১৮৩১ সালে বাংলার ব্যবসায়িক সমাজের তরফে His Majesty's Privy Council-এ একটা পিটিশন দাখিল করা হয়, সেখানে উল্লেখ করা হয়, ব্রিটেনের কটন বাজারে বাংলার কটনের উপর ১০ শতাংশ হারে শুল্ক চড়ানো হচ্ছে, যেখানে স্বদেশীয় কালিকো বস্ত্রের উপর শুল্ক ছিল গজ প্রতি ৩ ১/২d।[19] বলা বাহুল্য যে, নিজেদের বস্ত্রের বাজারকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য এর পিছনে প্রবলভাবে কাজ করেছিল। রাজনারায়ণ বসুও লিখেছেন, ঢাকায় কাপড়ের ব্যবসা বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওই কাপড়ের উপর 'ভয়ানক জেয়াদা' মাসুল বসিয়েছিল।[20] ভারতীয় সুতোজাত পণ্যের উপর শুল্ক বাড়ানোর তালে তালে ইংল্যাণ্ডে পাওয়ার লুমের সংখ্যাও বেড়েছিল। একটা পরিসংখ্যান দিলে এর কারণটি পরিষ্কার হবে। ১৮২০ সালে ইংল্যাণ্ডে কটন পাউয়ার লুমের সংখ্যা ছিল ১২,১৫০, যা মাত্র নয় বছর পর ১৮২৯ সালে বেড়ে হয়, ৪৫,৫০০।[21] অর্থাৎ ভারতীয় বস্ত্রের গড়নকে নকল করে, ভারতীয় বস্ত্রের বিশ্ব বাজার এবং অভ্যন্তরীণ বাজার ধরার একটা কর্মযজ্ঞ ব্রিটেনে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার ফলস্বরূপ বিশ্বে ভারতীয় বস্ত্রের বাজার ধরার জন্য কালিকো এবং মসলিন উৎপাদনও শুরু হয়েছিল ব্রিটেনে। ১৮১৪ সালে ইংল্যাণ্ড ৫,১৯২,২২৮ পিস কালিকো ও মসলিন প্রিন্ট করিয়েছিল, তারমধ্যে ১,৮৬৮,০৬৮ পিস নিজেদের বাজারে বিক্রি করেছে, বিদেশের বাজারে রপ্তানি করেছে ৩,৩২৪,১৬০ পিস। ১৮৩০ সালে এসে তাদের মোট প্রিন্টের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,৫৯৬,৯৫২ পিস। তন্মধ্যে তাঁরা নিজেদের বাজারে বিক্রি করে ২,২৮১,৫১২ পিস এবং বিদেশে রপ্তানি করে ৬,৩১৫,৪৪০ পিস।[22] এই পরিসংখ্যানে বৃদ্ধির হার দিন যত এগিয়েছে, ততই বেড়েছে। তাছাড়া ল্যাঙ্কারশায়ার কটনের মধ্যে সবচাইতে সাধারণ ধরণের বস্ত্র যেমন শার্ট, হালকা কাপড়ের চোগা, এবং ধুতি উৎপাদনে ইংল্যাণ্ডের উত্তরদিকের অঞ্চল ব্ল্যাকবার্ন বেশ প্রসারলাভ করেছিল।[23] এতই প্রসারলাভ করেছিল যে ভারতের বাজার বিলিতি বস্ত্রে ছেয়ে গিয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সেকালে লোকে ''বিলাতী' কাপড় পেতো – কি সস্তা!' তন্মধ্যেও দুই শ্রেণির কাপড় ছিল। যেমন রেলি ব্রাদার্সের[24] 'উনপঞ্চাশ' থান ধুতি পরতেন বাবুশ্রেণীর লোকজন, আর 'লাট্টু মার্কা'

[18] 'Cotton Goods Guide for Buyer and Seller: A Pocket Manual', (New York: Premium Books, 1890), p. 113.
[19] Ibid.
[20] রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', (কলিকাতাঃ কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯), পৃ ২।
[21] 'Cotton Goods Guide for Buyer and Seller', p. 112.
[22] Ibid, p. 115.
[23] Ibid, p. 116.
[24] Ralli পরিবার আগে গ্রীসের Chios দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮১৮ সালে তারা সেখান থেকে লণ্ডনে আসেন। ১৮২৮ সালে ম্যানচেস্টারে Ralli Brothers' স্থাপিত হয়। আর ১৮৬৫ সালের মধ্যে তারা ইউরোপ, ইন্ডিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পনেরোটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বাণিজ্য চালনা করতে থাকেন। লণ্ডন-রাশিয়ার বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, কৃষ্ণসাগরীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে, ১৮৫১ এর দিকে কলকাতাতেও অফিস খোলেন এবং বাংলার পাটকে প্যাকিং এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে সংঘবদ্ধ ব্যবসা শুরু করেন। বলা বাহুল্য, এই রেলি ব্রাদার্স এদেশীয় পাশ্চাত্য রুচিশীলদের মনে বিলিতি ভালো মানের কাপড়ের ব্র্যাণ্ড হিসেবে ততদিনে আসনলাভ করেছে।

ধুতি পরতেন সাধারণ লোকজন।[25] ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালারাও এসব বিলিতি বস্ত্র কলকাতার রাস্তায় ফেরি করে বেড়াতেন। 'একটাকায় তিনখানা ধুতি' তো পাওয়া যেতই, তার সাথে জুটত একটা 'ফাউ'। অর্থাৎ একটা 'ফ্রি' ধুতি। প্রভাতকুমারের জীবনের প্রথম ভাগ যেহেতু কেটেছে রানাঘাটে, সুতরাং তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কলকাতার বাইরে বিলিতি পণ্যের জোগানের বিষয়টিও ভালোভাবে দেখা যায়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে রানাঘাটের উপকন্ঠে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা করে লক্ষীলাভ করেছিলেন লালগোপাল পাল।[26] তাঁর দোকানে গিয়ে বললেই হত 'কোন নম্বরের কি কি কাপড়' লাগবে। পুজো-আচ্চা, নব বর্ষ সবক্ষেত্রেই তাঁর দোকানে সে অঞ্চলের শিক্ষিত থেকে চাষীরা মহকুমা শহরে কাজে কর্মে এসে কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন। যেহেতু মহকুমা শহরজুড়ে তখন কাপড়ের দোকান ছিল না, তাই দোকান থেকে কাপড় কিনতে চাইলে সবশ্রেণির লোকেদের লালগোপাল পাল'দের মতো মুষ্টিকয়েক দোকানের উপর নির্ভর করতে হত। আর এই দোকানগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে, চাষীরা এখান থেকে ধারেও কাপড় কিনতে পারতেন। নতুন ধান উঠলে ধান বিক্রির টাকা দিয়ে ধার শোধ করে যেতেন।[27] সমাজের একদম নিচুস্তর অবধি বিলিতি কাপড়ের উপর নির্ভরতা এভাবেই বাড়ে।

এই সমূহ কারণে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বাজারে ধ্বস নামে। তবে ভারতীয় শিল্পের সম্ভাবনাকে মেরে ফেলে ১৮৫৩ সালে ইংল্যান্ডে ভারতীয় পণ্যের উপর বাণিজ্যশুল্ক শতকরা ৫% করা হয়। সুতোর উপর শুল্ক করা হয় শতকরা ৩%। ভারতের বাজারেও ইংল্যান্ডের সুতো ও কাপড়ের ওপর অনুরূপ শুল্ক বসে। কিন্তু ততদিনে ভারতের বাজারে বিলিতি ভোগ্যপণ্য একটা কাঙ্ক্ষিত বাজার লাভ করে ফেলেছে। ভারতীয় বাজারে বিলিতি পণ্যের ওপর শুল্ক বসিয়েও যে বিলিতি পণ্যের জনপ্রিয়তা কমানো সম্ভব নয় – তা কোম্পানি সরকারের কর্তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।[28] কিন্তু ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের রিপোর্ট দেখে বোঝা যায়, তবুও ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল-মালিকরা ভারতের বাজারে শুল্কের জন্য তাঁদের বাজার মার খাচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন। কিন্তু ওই সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এদেশের বাজারে ব্রিটিশ মিল-মালিকদের বাস্তব অবস্থাটা বোঝা যায় । ১৮৭৭-৭৮ সালে ব্রিটেনের মিলে প্রস্তুত ১০,৭০,২৭০ মূল্যের বস্ত্র কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে গিয়েছে। ১৮৯৪ সালে সেই মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩১,৪৩,৯৭৫। যেখানে ১৮৯৪-৯৫ সালে ভারতের কার্পাসজাত দ্রব্য রপ্তানির মোট মূল্য মাত্র ৩,৬০,০০০। তবু

David M. Higgins, Aashish Velkar, ' "Spinning a yarn": Institutions, Law, and Standards in the Lanchashire Cotton Textile Industry c1880-1914', *Enterprise and Society*, Vol. 18, No. 3, September 2017, pp. 591-631; Alexis Wearmouth, 'Thomas Duff & Co. and the Jute Industry in Calcutta, 1870-1921: Managing Agents and Firm Strategy' (Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Dunbee, 2015); Jairas Banaji, 'A Brief History of Commercial Capitalism', (Chicago, Illinois: Haymarket Books, 2020).

[25] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', (কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), পৃ ৪১।

[26] তাঁর অনুদানে শুরু হওয়া লালগোপাল উচ্চ বিদ্যালয় এখন রানাঘাটের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়।

[27] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ৪২।

[28] শ্রীকালীচরণ ঘোষ, 'ভারতের পণ্য: তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার, ২য় খণ্ড', (কলিকাতা: কে পি বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), পৃ ৫৫-৭৪।

বিলিতি মিল-মালিকরা ভারতীয় বস্ত্র আন্তঃশুল্ক না দিয়ে রপ্তানিতে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন – তাঁদের কেন বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে ব্যবসা করতে হবে![29]

অর্থাৎ, ভারতের বস্ত্র-বাজারের এহেন অবনতির পরও বিলিতি মিল-মালিকরা যে ভারতীয় বস্ত্রের সাথে কোনোরূপ সমঝোতা করতে রাজি নন – তা উপরের তথ্য থেকে সামান্য হলেও পরিষ্কার। যে বাঙালি বাবুরা ধুতি, চাপকান, গলাবন্ধ, শাড়ির জন্য উনবিংশ শতক থেকে বিলিতি বাজারের মুখাপেক্ষী হচ্ছেন, যে নিম্নবিত্তদের কম দামী মিলের তৈরি কাপড় পেয়ে দেশীয় বেশি দামের কাপড় বর্জন করতে হচ্ছে, একসময় তাদের সবাইকে কাপড় জুগিয়ে বাংলার কাপড় সূদূর আরবে এবং ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর ভেনিসেও চলে যেত। ইন্দোনেশিয়ায় এবং লোহিত সাগরের বন্দরে গুজরাটি বণিকরা বাংলার কমদামি বস্ত্রের জনপ্রিয় বাজার তৈরি করেছিলেন। তবে উপনিবেশ স্থাপনার পর সাদা চামড়ার মানুষের সংস্কৃতি দেশীয় সমাজে অনেক ক্ষেত্রে নিন্দনীয় হলেও, তাদের বাণিজ্য তরিতে বয়ে আসা বস্ত্রের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক উচ্চতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। ওপনিবেশিক শাসক নিজেদের ক্ষমতার এমন একটা পোশাকি ভিত্তি তৈরি করছিলেন, যাকে নেটিভরা নিজেদের পুঁজিবাদী ক্রিয়া-কলাপ দিয়ে ছুঁতে পারবেন না, আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়েও না। কারণ দেশীয় বিনিয়োগের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে, পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশীয়দের মধ্যে চাকরির প্রতি টান তৈরি করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা এমন একটা শ্রেণি তৈরি করছিলেন – যেটা ঔপনিবেশিক সমাজে তাঁদের ক্ষমতার দৃশ্যমান স্মারক হয়ে ওঠে। সেই শ্রেণির মধ্য দিয়েই ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এই পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করতে হলে আমাদেরকে বাংলার বস্ত্রশিল্পের অতীত এবং তার অবনমনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বুঝতে হবে, দেশীয়দের রুচির বিশ্বে পরিবর্তন কিভাবে সেই অবনমনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার বস্ত্রশিল্প: দেশী ও বিদেশী ব্যাখ্যায়

সুকুমার সেন 'বঙ্গভূমিকা' গ্রন্থে বলেছিলেন, বঙ্গ নামের অন্যতম মানে হলো 'কাপাস তুলো।' তাঁর মতে, এই অর্থটি সংস্কৃত অভিধান স্বীকৃত, তাই একে হেলা করা যায় না। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তির সাথে কার্পাস উৎপাদনের যোগ রয়েছে।[30] অমরকোষ এবং জৈন গ্রন্থাদিতেও আসাম এবং বঙ্গদেশের কার্পাস ও রেশমের সুখ্যাতি আছে।[31] কিন্তু বর্তমানকালে বাংলায় তুলা চাষ হয় না বললেই চলে। কারণ তুলা চাষের জন্য যে আবহাওয়া ও মাটির দরকার হয়, তা বাংলা দেশে অনুপস্থিত। পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশেই এখন বেশিরভাগ কার্পাস উৎপাদন সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তীকালে বাঙালি শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বাংলার হারিয়ে যাওয়া বস্ত্রশিল্পের প্রতিপত্তি নিয়ে একটা স্মৃতিচারণের উন্মেষ হয়। ১৯২১ সালে

---

[29] Letter from Government of India to Bengal Chamber of Commerce, To Board of Revenue, Proceeding No. B 23-28, 30th October 1895, Financial Department, Separate Revenue Customs Branch, West Bengal State Archives, Kolkata; শ্রীকালীচরণ ঘোষ, 'ভারতের পণ্য', পৃ ৮১।

[30] শ্রীসুকুমার সেন, 'বঙ্গভূমিকা ৩০০ খ্রি – ১২৫০ খ্রি', (কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৫৮), পৃ ৮-৯।

[31] ধ্রুবজ্যোতি সেন, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাজসজ্জা', অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৩।

‘সচিত্র কার্পাস’ গ্রন্থে বলা হয়, ২২ ডিগ্রি থেকে ২৭ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত, আয়তনে ৫,৯৫১,৫০৪ একর বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন একটা ক্ষেত্রে, যেখানকার ভূমি সমতল, উর্বর ও স্যাঁতস্যাঁতে। এখানকার নদী, উপনদী পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রচুর পলিমাটি বহন করে আনে, যা মাটির উর্বরতা সাধন করে। জলবায়ুর তারতম্যের কারণে এখানকার বাতাস আর্দ্র হয়। ফলত আবহাওয়া উষ্ণ হলেও সমুদ্রের নিকটবর্তী বলে, এ অঞ্চলে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব অপেক্ষা গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতের প্রখরতা তত বেশি অনুভূত হয় না। ফলে ‘পূর্ব্বে এদেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মিত এবং আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা এই সমস্ত কার্পাস হইতে চরকায় সূতা কাটিতেন। জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই, মলমল, জামদানি, আবরোঁয়া, বদনখাস প্রভৃতি বস্ত্র এবং শান্তিপুর, ফরাজডাঙ্গা, এবং কলমে, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানের ধুতি, সাড়ী ও চাদর এই দেশের কার্পাস হইতেই প্রস্তুত হইত।‘[32] ১৮১৮ সালে ২৩শে মে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত একটা সমাচারেও এহেন বক্তব্য প্রকাশিত হয় – “পূর্ব্বে তুলা বাংলাতে অনেক উৎপন্ন হইত, এখন দোয়াবে অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তি দেশে অধিক জন্মায়।”[33] বাংলার লোকায়ত প্রবাদ-প্রবচনও এ উৎপাদনের সাক্ষ্য বহন করে। আনুমানিক অষ্টম-দ্বাদশ শতকের জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞা বিদূষী খনার একটি বচন হল “শুন ভাই খনা বলে, তুলায় তুলা অধিক ফলে, ষোলো চাষে মূলা, তার অর্ধেক তুলা, মূলার ভুই তুলা। ইক্ষুর ভুই ধুলা। সরষে ঘন পাতালরাই; নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই, কাপাস বলে কোটা-ভাই জ্ঞাতিপানি নাযেন পাই।”[34] যোগেশচন্দ্র রায় বাংলার বস্ত্র-ঐতিহ্যের আরো গভীরে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে, বাংলা দেশে কার্পাস চাষকেই বস্ত্রশিল্পের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে মনে করার পিছনে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বাংলা দেশের নর-নারীরা কার্পাস ছাড়াও আরও বিভিন্ন সূত্রের কাপড় পরতেন। যেমন পট্ট বস্ত্র, এড়ণ্ডী, কেটো, রেশম, তসর, এড়ী ও মুগা বস্ত্র উল্লেখ্য। এই বস্ত্রগুলোর মধ্যে আমরা এখন তসর, এড়ী ও মুগার হদিস পাই। বিলিতি বাজারের প্রভাবে ও বিলিতি শিষ্টাচারের আমদানির দরুণ বাকিগুলির কথা আর শোনা যায় না। কারণ ওই কাপড়ের ধরণে শরীরের ত্বক ঠিকভাবে আবৃত হত না। যা বিলিতি বাজারের ও বিলিতি শিক্ষার আমদানিকৃত শিষ্টাচারের পরিপন্থী। তবে বস্ত্রের উপর ভিত্তি করে সামাজিক বিভাজনটা

---

32 বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মতিলাল লাহা, ‘সচিত্র কার্পাস’, (কলিকাতা: সরকার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯২১), পৃ ১১৯-১২০।

33 ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড’, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৪), পৃ ১৫৩; মলয় রায়, ‘বাঙালির বেশবাস: বিবর্তনের রূপরেখা’, (কলকাতা: মনফকিরা, ২০১৬)।
১৩২৮ বঙ্গাব্দে শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় লেখেন, ‘বঙ্গদেশে একসময় প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হইত এবং কার্পাসের ব্যবসায় ছিল ... কাপাসিয়া, কাপাসহাটী প্রভৃতি গ্রামের নাম সেই প্রাচীন কৃষির ও ব্যবসায়ের সাক্ষীস্বরূপ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত কোনো কোনো পরগণার প্রাচীন চিঠা’র জমির প্রকার বিষয়ক ঘরে কর্প কথা লেখা রহিয়াছে।’ তাঁর মতে, এই ‘কর্প’ হল কার্পাসের সাংকেতিক নাম। তিনি আরো লিখেছেন, বাংলা দেশে শুধু যে কার্পাস জন্মাত তা নয়,তার সাথে সাথে বস্ত্রবয়নের জন্য , কার্পাস বীজ ছাড়ানোর জন্য কলও থাকত। চরকা সম্বন্ধিত একটা ছড়ার বহুল প্রচলনকে নির্দেশ করে তিনি ঘরে ঘরে চরকার উপস্থিতির বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ছড়াটি এরূপ, “চরকা আমার ভাতার পুত/ চরকা আমার নাতি/ চরকার কল্যাণে আমার দুয়ারে বান্ধা হাতি।” শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ‘বস্ত্রসমস্যা’, ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে মুদ্রিত, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ১, ১১।

34 বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড একে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে – কার্ত্তিক মাস কার্পাস চাষের উপযোগী। কার্পাস উৎপাদন করতে জমিতে আটখানা চাষ দিতে হয়। এবং এমনভাবে বীজগুলি পুততে হয় যাতে দুটি কার্পাস গাছের মাঝে দাঁড়ানো যায়। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড, ‘বঙ্গে কার্পাস চাষ’, ১ম সংস্করণ, মৌলবী আলী খাঁ কর্তৃক প্রকাশিত, (প্রকাশকাল ও প্রকাশনা বিষয়ক পৃষ্ঠাটি নষ্ট হয়ে গেছে)।

নতুন নয়। সে ইঙ্গিত দিতেও লেখক ভোলেননি। ব্রিটিশ আগমনের পর এ দেশে কটন ও সিল্কের প্রতিপত্তি বাড়ার দরুণ তসর, এড়ী, মুগার কাপড়ের দাম বেড়ে যায়, কিন্তু তার আগে তসর সাধারণের পরিধেয় ছিল। টেকসই কাপড় ছিল বলে – এর চাহিদাও ছিল ভীষণ। এবং দামও অল্প। "পরে তসর খায় ঘি/ তার আর খরচ কি" – এই প্রচলিত ছড়া থেকে বোঝা যায় তসর সাধারণের ব্যবহার্য্য কাপড় হিসেবে দামে ও চাহিদায় কোন স্তরে ছিল।[35] তাছাড়া অপর যে কাপড়ের কথা তিনি বলেছেন, তা হল শণের কাপড়। শণের অংশু থেকে বোণা এই কাপড় ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারীরা পরতেন। ওড়িষ্যার ব্রাহ্মণ রাজকুমারের উপবীত ধারণের অনুষ্ঠানেও রাজকুমারকে এই কাপড় ধারণ করতে হত। এই কাপড়ের বুনন ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল না, ছিল জালের মতন। তাই ধীরে ধীরে এই বস্ত্র শুধু 'আচার-নিষ্ঠার' কাপড় হিসেবেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। সামাজিক ব্যবহারে হয়ে পড়ল অশিষ্টাচারের নিশান হিসেবে। আবার অপর এক কাপড়ের কথাও তিনি বলেছেন, তা অতসীর কাপড় বা ক্ষৌম বস্ত্র। অতসীর সংস্কৃত নাম 'ক্ষুমা', আর চলিত নাম তিসি। সেই তিসি থেকে তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাংলা দেশে এই তিসি গাছ থেকে ক্ষৌম কাপড়ও উৎপাদন করা হত। যে ক্ষৌম কাপড়ের উল্লেখ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে পাই। 'অন্নদামঙ্গল'এ 'ব্যাসের প্রতি দৈববাণী' অংশে দেবী অন্নদা ব্যাসকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।'[36] বোঝাই যাচ্ছে ক্ষৌম বস্ত্রের তাঁতিদের সাথে তসর বোণার তাঁতিদের একটা মর্যাদাগত সামাজিক বিভাজন আদি আধুনিক যুগের বাংলাতে ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদার নিশান হয়ে ওঠে কাপড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ।[37]

১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'কার্পাস শিল্প' বইতে বাংলায় তুলাচাষ সংক্রান্ত মিস্টার মেডলিকটের মত উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁর মতে, উনিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলা দেশে যে সামান্য তুলা চাষ হচ্ছিল তা কেবল স্থানীয় প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই। সেই তুলা থেকে কাটা সুতার বস্ত্র কেবল উৎপাদকরাই ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগে যেতে যেতে দেশীয় উদ্যোগে তুলো চাষের পরিধি সংকুচিত হ্যে যায়। কিছু তাঁতি গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া তুলো চায় হত না বললেই চলে। কারণ ততদিনে বাংলা মেশিনে তৈরি বিলিতি বস্ত্রের উন্মুক্ত বাজারে পরিণত হয়ে গেছে। ১৮৬২ সালের যে সময়ের কথা মেডলিকট বলছেন তখন মোট শতাংশের বিচারে ১/৮ এর মতো তুলা দেশীয় তাঁতিরা নিজেদের প্রয়োজনে চাষ করতেন। তবে ব্রিটিশের আমদানি বস্ত্রের মোট পরিমান ছিল ৭/৮। অর্থাৎ বাংলার বস্ত্রের বাজারে ৮ ভাগের মধ্যে ৭ ভাগই ব্রিটিশের আমদানি। আর মাত্র এক ভাগ দেশি তুলাজাত। তবে খুব শীঘ্রই বিলিতি বস্ত্রে বাংলার বাজার ঢেকে গেলে সেই পরিমাণ তুলা চাষেও অবক্ষয় হয়।[38]

বাংলার জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চানুসারে, তুলা চাষের এই অবক্ষয় যতটা না আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্য, তার চাইতে বেশি বিদেশি শক্তির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অগ্রগমন ও মুক্ত-বাণিজ্য নীতির জন্য। এই ইতিহাস চর্চায় মনে করা হয়, বাংলার বস্ত্র শিল্পের অবক্ষয় হঠাৎ করে

---

[35] যোগেশচন্দ্র রায়, 'বস্ত্র সংকট হইতে উদ্ধার', ভারতবর্ষ, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা, ১৩২৫/১৯১৮।

[36] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২য় পুনঃমুদ্রণ ১৪২৫), পৃ ১৭২।

[37] যোগেশচন্দ্র তায়, 'বস্ত্র সংকট হইতে উদ্ধার', পৃ ৬৯১।

[38] শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'কার্পাস শিল্প', (কলিকাতাঃ নিউ আর্টিস্টিক প্রেস, ১৩৩২), পৃ ১২৩-১২৪।

হয়নি। ইংরেজ কোম্পানি যেমন এখানে শাসনব্যবস্থার বিস্তারে 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করেছিল, সেরকমই তারা বাংলার বস্ত্রশিল্পেও হঠাৎ করে আঘাত হানতে পারেননি। কারণ বাংলার বস্ত্রশিল্পের একটা গভীর ঐতিহ্য ছিল। একটা পরম্পরা ছিল। 'সচিত্র কার্পাসে' দেখানো হয়েছে, ১৭৮৯-৯০ সালেও বাংলায় ভালো পরিমাণ কার্পাস-তুলা উৎপন্ন হত (সারণি ২.১ দ্রষ্টব্য)।[39] স্বদেশী আন্দোলনের পর বাংলার বস্ত্রশিল্পের অতীত ঐতিহ্য নিয়ে জাতীয়তাবাদী আলোচনা যে একদম অমূলক নয়, সেটা ব্রিটিশ অফিসিয়াল বা ব্রিটিশ লেখকদের বিবরণ থেকেও বোঝা যায়। তাঁরা বাংলার বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্যের জন্য এখানকার কার্পাস উৎপাদনের চাইতে সুনিপুণ শিল্পসত্তার অধিকারী তাঁতিদের গার্হস্থ্য নির্ভর তাঁত বুননের বেশি প্রশংসা করেছেন। আর. জে. পিক বলেছেন, কার্পাস সংস্কৃতির প্রথম সূচনা ভারতে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের 'পেরিপ্লাস অফ দ্য এলিথ্রিয়ান সি' তে ভারতের সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[40] লোহিত সাগরের বন্দর আদুলিতে এই বস্ত্র আরব্য বণিকদের হাত ধরে অ্যারীয় ও মিশরীয় গ্রিকদের হাতে চলে যেত। বাংলা তথা ভারত থেকে এই তুলা চাষও ধীরে ধীরে পার্সিয়া, মিশর ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে বলে তাঁর মত। তাঁর মতে, তাঁতিদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত শিল্পসত্তা এতই নিপুণ ছিল যে, তাঁদের হাতে বোণা কাপড় মেশিনে বোনা কাপড়ের চাইতে বহুগুণ উন্নত ছিল।[41]

সারণি (২.১) ১৭৮৯-৯০ সালে বাংলায় জন্মানো কার্পাসের পরিমাণ ও ধরণ

জেলা	কার্পাস	পরিমাণ	মন্তব্য
বীরভূম	ভোগ	বীরভূম– ৪০,০০০ মণ বিষ্ণুপুর—১০,০০০ মণ	বীজশূন্য কার্পাস বা রুই
বর্দ্ধমান যশোর ময়মনসিংহ মুর্শিদাবাদ	নরমা, মুড়ি ও ভোগ দেশী ও সুন্দর মিহি ও মোটা কার্পাস নরমা ও ভোগ	৫০,০০০ মণ ২৪,০০০ মণ --- ৪০০০ মণ	বীজশূন্য কার্পাস বা রুই --- --- বীজশূন্য কার্পাস বা রুই
নদীয়া পূর্ণিয়া	বীচ ও ভোগ কৃষকদের জন্য মোটা কাপড় তৈরির উপযুক্ত কার্পাস	২০,০০০ মণ ৮০০০ মণ	বীজশূন্য কার্পাস বা রুই বীজশূন্য কার্পাস বা রুই
রঙপুর	চিনটিয়া	৩৭৫ মণ	বীজশূন্য কার্পাস বা রুই

39 বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মতিলাল লাহা, 'সচিত্র কার্পাস', পৃ ১২১-১২২।

40 'তন্তুবায় সমাচার'এ লেখা হয়েছিল, 'ভরুকচ্ছে (বারোচ/ব্রোচ) আনীত দ্রব্যাদি ভারতের বিভিন্ন নগরে নীত হইত, সেইরূপ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে তুলা, মসলিন, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি ব্রোচে আনীত হইত ও তথা হইতে অর্ণব পোতে বোঝাই হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইত।'
তন্তুবায় সমাচার, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ ১৭২।

41 R. J. Peake, 'Cotton: From the Raw Material to the Finished Product', (London: Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., 1934), pp. 1-2; Sven Beckert, 'Empire of Cotton: A New History of Global Capitalism', (Penguin Books, 2015), p. 18.

শ্রীহট্ট ত্রিপুরা মেদিনীপুর	নরমা ও ভোগ ভোগ কুকুয়া, মুমি ও ভোগ	৪০,০০০ মণ ৩০,০০০ মণ ১৯৭৯ ১/২ মণ, ৮৮৫১ মণ, ৫০ মণ ১০০০ মণ	বীজশূন্য কার্পাস বা রুই বীজশূন্য কার্পাস বা রুই বীজশূন্য কার্পাস বা রুই
শান্তিপুর চট্টগ্রাম	--- নরমা ও ভোগ	৩৫০০ মণ ১২৫০০ মণ	বীজশূন্য কার্পাস বা রুই বীজশূন্য কার্পাস বা রুই
মাহদহ	বুড়ি, ভোগ ও মুরমা	২৫০০ মণ, ৪০,০০০ মণ	বীজশূন্য কার্পাস বা রুই

(সূত্র: বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মতিলাল লাহার *সচিত্র কার্পাস* থেকে)

কোম্পানির সরকারি ঐতিহাসিক রবার্ট ওমরের মুখেও প্রায় একই কথা শোনা যায়। তিনি বলেন, সামান্য কটা সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে ভারতীয় তাঁতিরা যে সূক্ষবস্ত্র বোনেন, সেরূপ যন্ত্রপাতি দিয়ে ইউরোপীয় তাঁতিরা মোটা কাপড়ও বুণতে পারবে কিনা সন্দেহ।[42] ১৮৫১ সালে জেমস টেলর বলেন, খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই ঢাকাই মসলিনের মত মিহি কাপড় ইউরোপের নানা দেশে খ্যাতি অর্জন করে। রোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত মহিলারা এই কাপড় পরে নিজেদের আভিজাত্য প্রদর্শন করতেন।[43] ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে কালীচরণ ঘোষ বলেন, বাংলায় উৎপাদিত তুলোর জন্য বাংলার

---

[42] Robert Orme লিখেছিলেন, '...there remains a puzzle: how works of such extraordinary niceness can be produced by a people.' তিনি ঢাকার মসলিন সুতো কাঁটার তাঁতিদের বিষয়ে লিখেছেন, 'As much as an Indian is born deficient in mechanical strength, so much in his whole frame endowed with an exceeding degree of sensibility and plaintness. The hand of an Indian cook-wench shall be more delicate than that of an European beauty: the skin and features of an porter shall be softer than those of a possessed *petit maitre*.' Robert Orme, 'Historical Frangments of the Mogul Empire of the Morattoes and the English Concern in Indostan from the Year M.DC.LIX'., (London: Printed for F. Wingrave, 1805), p. 412.

[43] James Taylor বিশ্ববাণিজ্যে অংশ নেওয়া কিছু বিখ্যাত মসলিনের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন – "মলমল খাস", যা কিনা রাজন্যের ব্যক্তিগত পরিসরের পরিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। রাছাড়া ছিল "ঝুনা" মসলিন, যা ছিল জালের মতন গড়নযুক্ত। দেশীয় নর্তকীরা বা বিত্তশালীদের ঘরের মেয়েরা এই মসলিন গরমের দিনে ব্যবহার করতেন। যদিও এই কাপড় পরে শরীরের নগ্নতা ঢাকা পড়ত না। যার মূল কারণ হল – কাপড়টির জালের মতন গড়ন। ছিল "আবরোঁয়া" নামের মসলিন। যার মানে করলে হয় 'জলের ধারা'। এই কাপড় এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, এটিকে নিয়ে নানা গল্পও শোনা যায়। একদা আওরঙ্গজেব তাঁর কন্যার প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল – রাজকন্যা সকলের সামনে উন্মুক্ত দেহে গিয়েছেন। রাজকন্যা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলেন – তিনি সাতটি আবরোঁয়ার জামা পরেছেন, তাতেও যদি নগ্নতা ঢাকা না পড়ে – তাঁর কি করনীয়! আরেকটি গল্প এরকম – তখন বাংলায় আলিবর্দি খাঁর রাজত্ব। ঘাসের উপর শুকাতে দেওয়া আবরোঁয়া কাপড় গরু খেয়ে নিয়েছে বলে – একজন তাঁতিকে শাস্তি হিসেবে ঢাকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দোষ তিনি গরুর হাত থেকে কাপড় রক্ষা করেননি। এছাড়া নবাবদের ব্যবহারের জন্য ছিল "সরকার আলি" নামের সূক্ষ্ম মসলিন। আবুল ফজল সোনারগাঁও-এর "খাসা" (সুন্দর) নামক মসলিনের উল্লেখ করেছিলেন। "শবনম" নামের মসলিনও উল্লেখযোগ্য ছিল। যার মানে করলে দাঁড়ায় "সাঁঝের শিশির"। আবরোঁয়া'র মতো এই মসলিনও ঘাসের উপর শুকোতে দিলে, ঘাস থেকে আলাদা করা কঠিন হত। "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি" তে যে মসলিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই "আলবেলে"ও খুবই মিহি ধরণের মসলিন ছিল। ইংল্যাণ্ডে "তানজিব" মসলিন ছিল বাণিজ্যিকভাবে সুপ্রসিদ্ধ। যে নামের মানে করলে দাঁড়ায় – দেহ অলংকার। এরকমই আরো নানা মসলিনের প্রকার নিয়ে তিনি বিশদে লিখেছেন। যেমন – "তুরুনদাম", "নয়নসুক", "শিরবতী" (মাথায় পাগড়ি বাঁধার কাপড় হিসেবে ব্যবহৃত হত), "কুমী" (সাধারণত কুর্তা বা শার্টের কাপড় হিসেবে ব্যবহৃত হত), "দরিয়া" (কাপড়ের উপর স্ট্রাইপ দেওয়া থাকত, এটিও শার্টের কাপড় হিসেবে ব্যবহৃত হত), "চারকানু" (এটাও

বস্ত্রের বিশ্বজোড়া নাম নয়, বরং এখানকার শিল্পীদের হাতের কাজের নৈপুণ্যই বিশ্বে বাংলার বস্ত্রের ব্র্যান্ড মূল্য তৈরি করেছিল। তাঁর মতে, বাংলায় তুলা উৎপাদনের জন্য মাত্র ২% জমি বিদ্যমান। যেখানে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের উপযুক্ত জমির পরিমাণ ১২.১%। সুতরাং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলাকে সুরাট বা বোম্বাই থেকে তুলা আমদানি করে বস্ত্র উৎপাদন করতে হত। কিন্তু বাংলার কারিগররা তাদের সুনিপুণ হাতের কাজে বাংলায় উৎপন্ন নাতিদীর্ঘ তুলার আঁশ দিয়ে মসলিনের মতো জগদ্বিখ্যাত কাপড় বুনতেন। অর্থাৎ বাংলার তাঁতিদের তাঁত বুননে মুন্সিয়ানাকেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের ব্র্যান্ড-মূল্য সৃষ্টির উৎস বলে অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন।[44]

কিন্তু বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় আলোচনায় বাংলার সেইসব বস্ত্রের কথাই বারবার উঠে এসেছে, যে বস্ত্রগুলো তাদের স্বদেশে অভিজাতদের আভিজাত্য বজায় রাখত, বা বাংলা তথা ভারতের অভিজাতরাই কেবল যে বস্ত্রগুলো পরতেন। বোল্ট বলেছেন, আলীবর্দী খাঁ-র সময়ে একজন ভদ্রলোক ঢাকায় এক সকালবেলায় ৮০০ খণ্ড মসলিন কিনেছিলেন। তখনকার দিনে একখণ্ড মসলিনের দামই ছিল ১০০ টাকার মতো। কোনো সাধারণ ব্যবসায়ীর পক্ষে ৮০০ খন্ড মসলিম কেনার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।[45] এত দামি বস্ত্র কিনতে গিয়ে নাকি রোমের অর্থভাণ্ডারেও চাপ পড়েছিল। যে কারণে রোমান সেনেটেও নাকি তুলকালাম শুরু হয়েছিল। রমাপদ চৌধুরীরা ছোটবেলায় এহেন বিষয় বইয়ে পড়তেন বলে জানিয়েছেন।[46] কিন্তু একটা বিষয় ভুললে চলবে না, নৈপুণ্যের দিক থেকে উন্নত মসলিন, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরী, মুর্শিদাবাদ সিল্কের সাথে বাংলার কমদামী বস্ত্রের চাহিদাও প্রভূত ছিল। বরং ঐ বস্ত্রের বাজারই যে বিস্তৃত ছিল বেশি – তা ঐতিহাসিকরাও প্রমাণ করেছেন। রশমেরী ক্রিল যেমন বলেছেন, সপ্তদশ শতকে ভারতীয় বিলাস-দ্রব্যের ৭০% বাজার পশ্চিম ইউরোপীয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানির দ্বারা অধিকৃত হবার আগে পঞ্চম শতক থেকেই এইসব পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যে এদেশীয়রা সক্রিয় ছিলেন।[47] অসীন দাশগুপ্ত বলেন, ভারতীয় সমুদ্র বাণিজ্যে পঞ্চদশ শতক থেকে যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত সেখানে বস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হিন্দু বণিকদের দ্বারা এসব বস্ত্র উপকূলে উপকূলে পৌঁছে যেত। আর উপকূল থেকে সেগুলি মুসলিম বণিকদের দ্বারা মহাসাগর পেরিয়ে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। ক্যাম্বে ও মালাক্কা সমুদ্রপথে যেমন গুজরাটি মুসলিম বণিকদের আধিপত্য ছিল। তাঁরা লোহিত সাগর অঞ্চলের কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, পার্সিয়ান গল্ফ থেকে বাস্রা ও বাগদাদ পর্যন্ত যেমন বাণিজ্যঘাঁটি গেঁড়েছিলেন, তেমনি আফ্রিকা উপকূলের কিল্ব, মোম্বাসা, মালিন্দী, পাতে অঞ্চলেও বাণিজ্য ঘাঁটি গেঁড়েছিলেন। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা ও জাভাতেও গুজরাটি ও তামিল জাহাজের আনাগোনা ছিল। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় মশলা ও অভিজাত বস্ত্রাদির পাশাপাশি ওইসব অঞ্চলে একটা বড় চাহিদার ক্ষেত্র ছিল –

দরিয়া'র মতোই। কিন্তু এর গায়ের স্ট্রাইপগুলো অন্য ধরণের হত), "জামদানি"। মসলিনের এত ধরণের মধ্যে বর্তমানে জামদানিটাই কেবল বেঁচেবর্তে আছে। James Taylor, 'A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca', (London: John Mortimer, 1851), pp. 45-50.

44 শ্রীকালীচরণ ঘোষ, 'ভারতের পণ্য', পৃ ৩৯-৪০।

45 William Bolts, 'Considerations of Indian Affairs, Vol. 3', (London: New York: Routledge, 1998), pp. 191-195; সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'কার্পাস শিল্প', পৃ ১২-১৫।

46 রমাপদ চৌধুরী, 'হারানো খাতা', (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৬), পৃ ১৭।

47 Rosemary Crill, 'Chintz: Indian Textiles for the West' (London: V&A Publications, 2008), 14–15.

বাংলার কমদামী সুতিবস্ত্র। মোম্বাসা, মালিন্দি এবং পাতের মতো আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দেশে অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভারতীয় দামী বস্ত্র হাতির দাঁত ও সোনার বিনিময়ে বিক্রি হলেও, সাধারণ মানুষের চাহিদার বিস্তৃত ক্ষেত্রে কমদামী সুতিবস্ত্রের চাহিদা বেশি থাকায়, সেই বস্ত্র থেকে ব্যবসায়িক লাভও সেখানে বেশি ছিল। সে বিষয়টাকে উপলব্ধি করেই গুজরাটি বণিকরা মক্কাতে বাংলা ও করমন্ডলের বস্ত্রের বৃহৎ বাজার তৈরি করতে পেরেছিলেন। ডাচ কোম্পানি এই সমীকরণকে না বুঝে উক্ত অঞ্চলে বেশি দামী বস্ত্রের বাজার তৈরি করতে গিয়েছিল। তাই প্রতিযোগিতায় তাদের হার মানতে হয়।[48] ভারতীয় বস্ত্রের সুলভ মূল্যজনিত চাহিদার কথা কোম্পানির অফিসিয়ালরাও বলেছেন। উইলিয়াম বোল্ট যেমন বলেন, অষ্টাদশ শতকের মাঝ বরাবর বাংলার তুলার দাম ছিল অনেক কম। ৮০ পাউন্ড ওজনের তুলোর দাম ১৬ বা ১৮ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হ্যারি ভেরেলস্ট এবং স্ক্র্যাফটন প্রমুখ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বলেছেন, বাংলার বস্ত্রের ও কাঁচা রেশমের সুলভতা এবং ভালো মানের জন্য ভারতবর্ষ ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশাল পণ্যবাহী ক্যারভান নিয়ে আসা বহু বণিক বাংলা থেকেও পণ্য সংগ্রহ করতেন।[49] অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেও যখন বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপস্থিতিতে পটপরিবর্তন ঘটছে, তখনও বাংলা থেকে এশীয় বণিকদের কাঁচা রেশম রপ্তানি কমেনি (সারণী ১.২ দ্রষ্টব্য)।[50]

সারণি (২.২) বাংলা থেকে এশীয় বণিকদের কাঁচা রেশম রপ্তানি ১৭৫৯-১৭৫৮

বছর	পরিমাণ (মণ)	পরিমাণ (পাউণ্ড)	মোট মূল্য (টাকা)
১৭৪৯	২০,০৩৭	১৫,০২,৭৭৫	৫৬,১০,৪২৩
১৭৫০	১৯,৫৭১	১৪,৬৭,৮২৫	৫৪,৭৯,৭৮৬
১৭৫১	২৩,৭৪০	১৭,৮০,৫০০	৬৬,৪৭,০৯৫
১৭৫২	১৭,৬১৫	১৩,২১,১২৫	৪৯,৩২,২২১
১৭৫৩	১৮,০৫৩	১৩,৫৩,৯৭৫	৫০,৫৪,৮৪০
১৭৫৪	১৫,২৪৯	১১,৪৩,৬৭৫	৪২,৬৯,৫৯৪
১৭৫৫	১২,২৬৯	৯,২০,১৭৫	৩৪,৩৫,৩১০
১৭৫৬	৭,৬৩৫	৫,৭২,৬২৫	২১,৩৭,৭৬২
১৭৫৭	২১,৩৪৭	১৬,০১,০২৫	৫৯,৭৭,০৪৫
১৭৫৮	১৮,১৯২	১৩,০৪,৪০০	৫০,৯৩,৬৩৪

(সূত্র: সুশীল চৌধুরী, সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য)

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলায় বস্ত্রশিল্পের প্রসার

[48] Ashin Dasgupta, "Merchants and Traders in Indian Ocean, C. 1500-1700" in Uma Dasgupta edited 'The World of Indian Ocean Merchant 1500-1800', (New Delhi: Oxford University Press, 2004), pp. 59-66.

[49] William Bolts, 'Considerations of Indian Affairs, Vol. 3', pp. 191-195., p. 200; Lvke Scrafton, 'Reflections on the Government of Indostan with the Short Sketch of History of Bengal 1738- 1756', (London: W. Strahan, 1770), pp. 25-26.

[50] B.P.C. Range, Vol. 44, Consult 14 June, 1769. নিয়েছি সুশীল চৌধুরী, 'সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য', (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৭), পৃ ১২১ থেকে।

বাংলা থেকে এশীয় ও ভারতবর্ষীয় বণিকদের তুলা ও বস্ত্র সংগ্রহের ইতিহাসটা নতুন নয়। রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে লেখা 'পেরিপ্লাস অফ দা এরিথ্রিয়ান সি'তে মিশরীয়, গ্রীক ও আরব দেশের বণিকদের কথা বলা হয়েছে। যারা কিনা লোহিত সাগরের অন্যতম বন্দর আদুলিতে ভারতীয় তুলা নিয়ে যেতেন। তাছাড়া অন্যান্য লোহিত সাগরের বন্দরেও কালিকো, কারুকার্যময় ও কারুকার্যহীন উভয় ধরনের মসলিন, তাঁত প্রভূতভাবে আমদানি হবার কথাও এখানে বলা হয়েছে।[51] নবম শতকের আরো পর্যটক ও ভূগোলবিদ সুলেমান 'সিলসিলাত্‌-উত্‌-তাওয়ারিখ'এ রুমি নামক একটা রাজ্যের কথা লিখেছেন। এরাজ্যে এমন সূক্ষ্ম ও মিহি কাপড় পাওয়া যেত, যা কি না লম্বায় চল্লিশ হাত ও চওড়ায় দুহাত হলেও আংটির মধ্য দিয়ে সহজেই আনা-নেওয়া করা যেত। এ রাজ্যটি বাংলায় হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ সমসাময়িককালে পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে এই ধরনের সূক্ষ্ম কাপড় বোনার কথা

ছবি: ২.২

ছবি: ২.৩

২.২) সপ্তদশ শতকে ফরাসি রাজ-দরবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ নারী *Madam de Pompadour* / প্যারিসকে রুচি ও ফ্যাশনের কেন্দ্রে পরিণত করতে যার ভূমিকা ছিল। ছবিতে তাঁকে ফুলের নকশা কাটা Chintz-*এ দেখা যাচ্ছে।* (@DEA PICTURE LIBRARY/Getty Images, নিয়েছি Barbara Lasic (2018)-*এর* 'Ethnicity' প্রবন্ধ থেকে।)
২.৩) ১৭০০-১৭৫০-এর দশকে ভারতে পাশ্চাত্য বাজারের জন্য তৈরি "বেনিয়ান"। অবশ্য এতে পাশ্চাত্য রুচি আনুসারে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। (@Los Angeles County Museum of Art, নিয়েছি Barbara Lasic *(*2018)-*এর* 'Ethnicity' প্রবন্ধ থেকে।)

[51] R.J. Peake, 'Cotton', p. 2.

চিত্র: ২.৪: ভারতের করোমণ্ডল উপকূলে তৈরি ইউরোপীয় রুচির ফুলের নকশা আঁকা ছিট (Chintz) কাপড়ে কম বয়সী ইউরোপীয় মেয়েদের জন্য তৈরি জ্যাকেট, যা অষ্টাদশ শতকে caraco- নামে পরিচিত ছিল। (@Victoria & Albert Museum, T. 229 & A- 1927; নিয়েছি Amelia Peck edited, Interwoven Globe থেকে)।

উল্লেখ নেই। এ কাপড়ের সূক্ষ্মতার জন্য একে "আব-ই-রাওয়ান" বা চলন্ত জলধারাও বলা হত।[52] রোমান ও পারস্য রচনায় বাংলার বস্ত্রের উল্লেখ দেখেই বোঝা যায় এই বস্ত্রের ব্যবসায়িক বিস্তার কতটুকু ঘটেছিল। সুশীল চৌধুরী বলেন, রোমান সাম্রাজ্যের যুগ থেকে ইউরোপের সাথে এশিয়ার যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত, তা মূলত স্থলপথেই। ক্যারাভান নির্ভর এই বাণিজ্যিক পণ্য বাংলা থেকে কিছুটা স্থলপথে ও কিছুটা জলপথে মির্জাপুর, দিল্লি, আগ্রা হয়ে লাহোর ও মুলতানে চলে যেত। সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ পেরিয়ে বাংলার চাহিদা-সম্পন্ন কাপড় ও কাঁচা রেশম মধ্যপ্রাচ্য বা মধ্য এশিয়া হয়ে চলে যেত ভূমধ্যসাগরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখান থেকে উল্টো দিকের বন্দর ভেনিসের নিয়ে যাওয়া হত এইসব পণ্যসামগ্রী। ইউরোপের নানা প্রান্তের শ্রেষ্ঠীরা সেখানে এসে ভিড় জমাতেন। এবং আগত বস্ত্র ও কাঁচামাল সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ব্যবসা করতেন।[53] ইংল্যান্ডের বাণিজ্যে প্রথম সুতিবস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকে হাকলিউট-এর (Hakluyt) লেখা থেকে। সেখানে দেখানো হয়েছিল, ইংল্যান্ড থেকে জেনোয়ার জাহাজ তুলা নিয়ে যাচ্ছে। সপ্তদশ শতকের শুরুতে অন্তর্পীয়রা (Antwerpian) সিসিলি, লাভেণ্ড, লিসবন থেকে তুলো নিয়ে আসছে ইংল্যান্ডে। ভারতবর্ষ থেকে আনা কার্পাস

52 আব্দুল করিম, 'ঢাকাই মসলিন', (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০১৬), পৃ ১৫, ৪৮।
53 সুশীল চৌধুরি, 'সমুদ্র বাণিজ্যের প্রক্ষিতে স্থলবাণিজ্য', পৃ ১১৬।

নিয়ে ইউরোপের আন্তঃবাণিজ্য যে জমে উঠেছে তা এখান থেকে বোঝা যায়।[54] তবে ভারতবর্ষজাত বস্ত্রের ও সুতোর রপ্তানির ফলে ইংল্যান্ডের পশমনির্ভর বস্ত্রশিল্প মার খাচ্ছিল। সাদা সুতি ও মসলিন ধীরে ধীরে ইউরোপীয়দের বস্ত্র-চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। বেভারলি লিমাইর এবং জর্জিও রিয়েলো বলেছেন, এর মধ্যে Chintz (যা ইউরোপের বাজারে "Indienees" নামে সমধিক পরিচিত ছিল) ইউরোপের বাজারে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ইউরোপীয় রুচিকে প্রভাবিত করে (ছবি ২.২ ও ২.৪ দ্রষ্টব্য)।[55] সেই তালিকায় কালিকোও ছিল। কালিকট থেকে আমদানি হওয়া ক্যালিকোর মতো রঙিন পরিচ্ছদ ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাণী দ্বিতীয় মেরী পরা শুরু করবার সাথে সাথে ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরে শুরু হয়ে যায় ক্যালিকোর ফ্যাশন। শুধু পরিচ্ছদই নয়, পর্দা, শয্যা-আবরণী হিসেবেও ইংরেজ বিত্তশালীরা ক্যালিকো ব্যবহার করতে থাকেন। প্রাচ্যদেশের রুচি-সৃজনকারীদের (taste-makers) লেখা-পত্তরেও এসব কাপড়ের কথা ঘুরে ফিরে আসত।[56] এমনকি Chintz-এর মতো প্রাচ্যদেশের রঙবাহারী, সহজে ধোয়ার যোগ্য, আরামদায়ক বস্ত্র প্রায়ই ইউরোপীয় সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত হত।[57] Amelia Peck লিখেছেন, এইসব কাপড় সুলভ মূল্যে নানা ধরণের পাওয়া যেত এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে এইসব কাপড়ের চাহিদা তৈরি হয়েছিল বলে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজের পোশাকি বিভাজনরেখা এইসব কাপড়ের ব্যবহার বাড়বার মধ্য দিয়ে ম্লান হয়ে আসছিল।[58] শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের বস্ত্রই ইউরোপের বাজারে প্রসার লাভ করেছিল তেমনটা নয়, গুজরাটি বাণিয়াদের পরিধেয় বেনিয়ানের "কাট"ও ইউরোপীয় পুরুষদের পরিচ্ছদশৈলীকে প্রভাবিত করে (ছবি ২.৩ দ্রষ্টব্য)।[59] ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বিদেশি বস্ত্রের এইরূপ বিপুল প্রসারকে ঠিকভাবে নেননি। কারণ এর ফলে তাদের বস্ত্র শিল্পের ক্ষতি হচ্ছিল। তাই ক্রমে আইন করে ক্যালিকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।[60]

সুতরাং ইংল্যান্ডের বাজারে বিদেশি বস্ত্রের প্রতি মোহাচ্ছন্নতা দেশীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষে যে হন্তারক তা সে দেশীয় বণিক, বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বরা বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষীয় ও

---

[54] R. J. Peake, 'Cotton', p. 3.

[55] Beverly Lemire and Giorgio Riello, 'East and West: Textiles and Fashion in Early Modern Europe', *Journal of Social History*, Vol. 41, No. 4, 2008, pp. 887-916.

[56] Barbara Lasic, "Ethnicity", Peter McNeil ed., 'A Cultural History of Dress and Fashion in the Age of Enlightenment', (London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney: Bloomsberry Academic an Imprint of Bloomsberry Publishing Plc, November 2018).

[57] Beverly Lemire, 'Fashion's Favourite: The Cotton Trade and the Consumer in Britain, 1660 –1800' (Oxford: Oxford University Press, 1991).

[58] Amelia Peck, " "India Chints" and "China Taffaty": East India Company Textiles for the North American Market", in Amelia Peck edited, 'Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500-1800', (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2013).

[59] যদিও তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। অনেকে বলেন, বেনিয়ানের কাটে জাপানি পুরুষের উর্দ্ধবাস কিমোনোর প্রভাব রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করেছে, ভারতীয় পুরুষের T-style উর্দ্ধবাসের প্রভাবও এই বেনিয়ানের ডিজাইনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। Susan Nort, 'Indian Gowns and banyans – New Evidence and Perspectives', *Costume*, Vol. 54, Issue 1, 2020, pp. 30-55.

[60] ১৬৬৮ সালে ফ্রান্সে, ১৭১৩ সালে স্পেনে এবং ১৭২১ সালে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আমদানিকৃত সিল্ক ব্যান করা হয়।
Barbara Lasic, Ethnicity, Peter McNeil ed., 'A Cultural History of Dress and Fashion in the Age of Enlightenment'; শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'কালিকট থেকে পলাশী', (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৬), পৃ ১০৪-১০৫।

আমেরিকার বয়নবস্ত্রের প্রাধাণ্য ইংল্যান্ডের বাজারে এতটাই বেড়ে যায় যে, সেখানকার তাঁতিদের চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হয়। পিটার লাইনবগ সেই বিষয়টাকে তাঁতিদের শাস্তিস্বরূপ ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে দেখিয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া গরিব তাঁতিরা চুরির দায়ে অভিযুক্ত।[61] তিনি তাঁতিদের ফাঁসিতে ঝোলানোর যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা মূলত ১৭৪০ এর দশক থেকে ১৭৬০ এর দশক পর্যন্ত সময়কালের।[62] লাইনবগের মতানুসরণ করে বলতে হয় – তাঁতিদের ক্রমবর্ধমান অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়ার কাল ছিল বাণিজ্যিক শোষণ। বিদেশি বস্ত্রের ফ্যাশনে বস্ত্র–উদ্যোক্তারা এতই ভেসে গিয়েছিলেন যে, দেশীয় তাঁতিদের বোনা কাপড় বাজারে লাভের মুখ দেখছিল না। ১৭৩৪ সালে ইংল্যাণ্ডের ‘Gentleman’s Intelligencer’ নামক সংবাদপত্রে মাইকেল কারমাডি নামক এক ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হতভাগ্য তাঁতির বয়ান ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকায় বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ বাংলার পুঁজিবাদের খেয়ালে তাঁতিশ্রম যে স্থান-কাল-পাত্র ব্যতিরেকে অবহেলিত হয়, তার চেতনা স্বদেশি পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সমাজে সচল হয়েছিল। সেই বয়ানে কারমাডি মৃত্যুর পূর্বে স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন, “সমবেত ভদ্রমণ্ডলী মিনিট কয়েক মধ্যেই যাকে মরতে হবে, ... সেই হতভাগ্য অপরাধীর গোটা কয়েক কথা একটু মন দিয়া আপনারা শুনুন। আমি স্বীকার করছি, অভাবে পড়ে অনেক রকমের গুরু অপরাধ আমি করেছি ... আমার অভাবই এর জন্য ষোলো আনা দায়ী। আমার অন্নাভাবের কারণ অর্থাভাব এবং অর্থাভাবের কারণ দেশে স্বদেশী কাপড়ের অনাদর। ... খৃস্টানমণ্ডলী, একবার ভেবে দেখুন, বিদেশী তুলার কাপড় ব্যবহার করে যদি আপনারা স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের প্রসার রোধ করেন, আমার বিশ্বাস তাহলে আপনারাই স্বদেশকে দুর্দশাগ্রস্ত করবেন। ফলে আমার মতো অপরাধীর দলে দেশ ছেয়ে যাবে। ... আমি অনুরোধ করছি যে, যে তুলার কাপড়ে আমার মৃত্যুমঞ্চ আচ্ছাদিত, জল্লাদদের কাছ থেকে তা কিনবেন না। কারণ যা আমাকে দুর্দশা থেকে চৌর্য্যে এবং চৌর্য্য থেকে অকাল মৃত্যুতে ঠেলে নিয়ে এসেছে, যদি আপনারা সেই বিদেশী কাপড়ই পরতে থাকেন, তাহলে আমিও কবরে শান্তি পাব না। ...”[63]

যাইহোক, ইংল্যান্ডের তাঁতিদের এরূপ দুর্বিপাকের মধ্যেই ১৭৩৩ সালে ইংল্যান্ডের জন কেই উড়ন্ত মাকু বা fly shuttle আবিষ্কার করেন। যেটা বয়নশিল্পের ইতিহাসে যন্ত্রযুগের উদ্ভব ঘটায়। এর ফলে বস্ত্রবয়নের গতিও বেড়ে যায়। ফার্নান্দ ব্রদেল বলেন, এতদিন ধরে মানুষ এমন একটা অর্থনৈতিক পরিসরের মধ্যে ছিল, যেটা সম্পূর্ণভাবে দৈহিক শ্রমনির্ভর। অষ্টাদশ শতক সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে "অবচেতন বন্দি" (unconscious prisoner) মানুষকে দৈহিক শক্তির জঙ্গম থেকে তুলে এনে বৌদ্ধিক ক্ষমতার স্থাবরত্বে প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু বিশ্বজোড়া সকল "অবচেতন বন্দি"র প্রচেষ্টার ফলে এই স্থাবরত্বের আগমন হয়নি। ব্রদেল বলেন, নির্দিষ্ট সভ্যতা, ব্যক্তি ও সমবায়ের পারদর্শিতার ফল ছিল এটি। এই ফল পরবর্তীতে উপনিবেশিকের ক্ষমতার বিশ্বে জারিত

---

[61] Peter Linebough, ‘The London Hanged: Crime and Civil Society in Eighteenth Century’, (London: Verso, 2003), pp. 258-259.

[62] শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ‘বস্ত্রসমস্যা’, ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে মুদ্রিত, ১৩২৮, পৃ ১৯।

[63] ‘বিদেশির বিপদ’, ভারতী, সপ্তম সংখ্যা, ১৩২৮।

হয়েছিল। বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিও এই সমীকরণের একটা ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।[64] অর্থাৎ পৃথিবীর যে গোষ্ঠী যান্ত্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করে শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল, সেই গোষ্ঠী শোষণ-শাসনের দিক থেকেও অগ্রসর ছিল।

১৭৬৬ সালে পোস্টালওয়েট *Dictionary of Trade and Commerce*-এ বলেছেন, ম্যাঞ্চেস্টার, বল্টন ও তত্সংলগ্ন অঞ্চলে বছরে এই যান্ত্রিক প্রভাবে ছয় লক্ষ দামের তাঁতজাত পণ্য তৈরি হয়। আর এই পণ্য ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে অভ্যন্তরস্থ বণিকরা লন্ডন, লিভারপুল ব্রিস্টলে রপ্তানি করতেন। তিনি বলেন, ১৭৩৩ সালে উড়ন্ত মাকুর উদ্ভব ঘটলেও ১৭৬০-এর দশকের আগে তা জনপ্রিয় হয়নি, কারণ কেই-এর আবিষ্কারের সুবাদে কিছু কিছু তাঁতি দ্রুত তাঁত বুনে বেশি লাভের মুখ দেখলে বিদেশি কাঁচামাল ও পুরাতন পদ্ধতি নির্ভর তাঁতি-সমবায়গুলি কেই-এর উপর এককাট্টা হয়ে ওঠে। ফলে তাঁকে প্রথম লিদস এবং পরে ফ্রান্সে পালাতে হয়। তাই ১৭৬০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডেও ভারতের মতো হাতে বোনা সুতোরই বেশি চল ছিল। তাছাড়া ইংল্যান্ডে কাঁচা রেশম ও তুলোও যেহেতু বাইরে থেকে আমদানি হত, সেকারণে সেখানে বস্ত্র উৎপাদনও কম হত। ফলত নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে ইংল্যান্ডের ঘরে বোণা বস্ত্র দিয়ে বাইরে বাণিজ্যিক পসরা জমানো তখনও ততটা সম্ভব ছিল না। বরং তাদের তখনও বহিঃবাণিজ্য চালানোর জন্য বাংলা তথা ভারতবর্ষীয় বস্ত্র ও কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে হত।[65] ১৭৬৯ সালে কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির ডাব্লিউ অল্ডার্শে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন। ওতে দেখা যাচ্ছে, ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৫ সাল অব্দি এশীয় বণিকরা রেশন বস্ত্র রপ্তানি করতো বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার। ইউরোপীয় বণিকদের রপ্তানির পরিমাণ তখনও ভারতীয় বণিকদের চাইতে কম (সারণি (২.৩) দ্রষ্টব্য)।[66] তবে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে এতদিন বিনাশুল্কে বাণিজ্য করা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে দেশীয় শ্রমের উপর প্রত্যক্ষ দখলদারী কায়েম করে। কে. এন.
চৌধুরী বলেন, ধীরে ধীরে ইউরোপীয়রা বাংলার বাণিজ্যের মুখ্য হোতা হয়ে ওঠেন। কারণ সমুদ্র বাণিজ্যে তাদের
আধিপত্য বাড়ে। যদিও চৌধুরী বাংলার বস্ত্রবয়ন-শিল্পের অবনতির কাল হিসেবে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগকে

সারণি (২.৩) এশীয় ও ইউরোপীয়দের পাঁচ বছরের বার্ষিক রেশমবস্ত্র রপ্তানি ও গড় ১৭৫০/৫১ – ১৭৫৪/৫৫

বছর	এশীয় (পিস)	ডাচ কোম্পানি (পিস)	ইংরেজ কোম্পানি (পিস)	মোট ইউরোপীয় সংখ্যা
১৭৫০/৫১	১২৪,৬৭৫	১২,৮৯০	১২,৭৬০	১৫,৬৫০
১৭৫১/৫২	৯২,৪৭৫	৩৯,৬২৮	২০,০৪১	৫৯,৬৬৯

[64] Fernand Braudel, 'Capitalism and Material Life 1400-1800', Translated from French by Miniam Kochan, (New York, Evanston, San Franscisco, London: Harper Torchbooks, 1974), p. xiv.
[65] Peake, 'Cotton', p.6.
[66] BPC, Range 1, Vol. 44, Consult 19 June 1769, W. Aldetsey's Report. নেওয়া হয়েছে সুশীল চৌধুরির 'সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য' থেকে।.

১৭৫২/৫৩	৮৯,৯৭৮	২৭,৭৭৭	৩২,৬১৫	৬০,৩৯২
১৭৫৩/৫৪	৭৪,৭৯৮	২৯,০২৯	২৪,৬৬৩	৫৩,৬২৯
১৭৫৪/৫৫	৭৫,০৬২	৪০,৮৮৩	৩৪,১৬০	৭৫,০৪৩
মোট সংখ্যা	৪৭৫,১৬৮	১৫০,২০৭	১২৪,২৩৯	২৭৪,৪৪৬
বার্ষিক গড়	৯১,৪৩৪	৩০,০৪১	২৪,৮৪৮	৫৪,৮৮৯

(সূত্র: সুশীল চৌধুরীর *সমুদ্র বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য*)

চিহ্নিত করেছেন;[67] কিন্তু এই কথাটার সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন জাগে। কারণ অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ইউরোপে তথা ইংল্যান্ডে তখনও বয়নকলের উদ্ভব ঘটেনি। সেখানে তাঁতিদের অবস্থা তখনও দুর্দশাময়। তাঁত বুননে সবাই আসতে চাইতেন না বলেই হয়তো ষষ্ঠদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে লোউ কানট্রির অত্যাচারে উদ্বাস্তুদেরকে ম্যানচেস্টারের আশেপাশের অঞ্চলে আমদানিকৃত তুলো দিয়ে তাঁত বুণতে উৎসাহ দেওয়া হত। পিটার মার্শাল বলেছেন, বুলিয়ান আমদানির দরুণ বাংলার বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মতো বেশি পরিমাণে রপ্তানি হয়ে যাচ্ছিল। দেশীয় তাঁতিদের শিল্প বুলিয়নের ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছিল। ফলত দেশীয় বণিকদের তাঁতিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ায় বাণিজ্য ও কমে যাচ্ছিল। যা দেশীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎকে নড়বড়ে করেছিল বলে তাঁর অভিমত। কারণ বুলিয়ন নির্ভর বাণিজ্যের ফলে এতদিনকার ছন্নছাড়া, তাঁত বোণা ছাড়াও অন্য কাজে ব্যপৃত তাঁতী সমাজ শুধু তাঁত বোণার কাজেই মনোনিবেশ করেন। ফলে কোম্পানি একচেটিয়া হারে এখান থেকে বস্ত্র, কাঁচা রেশম সুতো নিয়ে ব্যবসা করতে থাকে।[68] অসীন দাশগুপ্তের মতে ইউরোপীয় বুলিয়নের আমদানি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ঘাটতির জন্য শেষমেশ জাপানি কপার দিয়ে তাদের বুলিয়ন তৈরি করাতে হয়েছিল। সুতরাং তাঁর মতে বুলিয়ন তত্ত্বকে বাংলা তথা ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবনমনে সবচাইতে বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্ব বলা যায় না।[69] মোরল্যাণ্ড বলেন, সপ্তদশ শতকে সমুদ্র বাণিজ্যে যা কিছু বাড়বাড়ন্ত তা ইউরোপীয়দের দৌলতে। সেসময় স্থলবাণিজ্যে দেশীয় বস্ত্র বাণিজ্যের কোনো প্রসার ছিল বলে তিনি মনে করেননি।[70] সুশীল চৌধুরী তাঁর মতকে খণ্ডন করে দেখিয়েছেন, ইউরোপীয় বাণিজ্য তরীর আগমনের পর থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্তও এশীয় বণিকদের দেশীয় বস্ত্র নিয়ে রমরমা বাণিজ্য স্থল এবং জল উভয়পথেই ছিল।[71] ইয়ান ওয়েন্ডট অবশ্য উনবিংশ শতকে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতিকে হঠাৎ ভাবতে নারাজ। তিনি মনে করেন, ষষ্ঠদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নানামুখীন, জোরালো বস্ত্র বাণিজ্যের উদ্ভব উনবিংশ শতকে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রকে অবনমিত করেছিল। বস্ত্রবাণিজ্যে জোরালো রূপকে বোঝাতে গিয়ে

[67] K. N. Chaudhuri, ‘Trading World of Asia and the English East India Company’, (Cambridge University Press, 1978), p.24.

[68] P. J. Marshall, ‘Bengal: The British Bridgehead’, (Cambridge University Press, 1987), pp. 64-67.

[69] Ashin Dasgupta, “Merchants and Trade in Indian Ocean, c. 1500-1700”, in Uma Dasgupta edited The World of Indian Ocean Merchant 1500-1800’, (New Delhi: Oxford University Press, 2004), pp. 59-66.

[70] W. H. Moreland, ‘From Akbar to Jahangir: A Study in Indian Economic History’, (London: Macmillan, 1923), p. 59.

[71] সুশীল চৌধুরী, ‘সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারতমহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০’, (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৭), পৃ ১১৬-১৩৫।

তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে বস্ত্র উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত নারী-কেন্দ্রিক কাজগুলোর (যেমন – সুতো পাকানো সুতো কাটা ইত্যাদি) নারী-কেন্দ্রিকতা ভাঙল। এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাকার সেই কাজগুলোতে অংশগ্রহণ বাড়ল। তিনি এই প্রক্রিয়াটার নামকরণ করেছেন "de-feminization"।[72] সেদিক থেকে দেশীয় বস্ত্রবাণিজ্যের অবনমনে এবং বস্ত্রবাণিজ্যের ধরনের পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিদেশি শক্তির আগমনকে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই দায়ী করেছেন। আর এদেশীয় অর্থনীতির পরিবর্তনে বিদেশি শক্তির এহেন নিয়ামক ভূমিকা নিতে পারা, তাঁদেরকে সংঘটিত নীতি-নির্ধারণ হিসেবে তখতে বসতে আরও উৎসাহ জুগিয়েছিল। সুতরাং উক্ত সময়ে দাঁড়িয়ে শাসক এবং শাসিতের বস্তুগত পরিচয়ের দিকটি যে উপনিবেশিক ক্ষমতার কাছে প্রাধান্যের জায়গায় উপনীত হবে – এটা অবাক হওয়ার মত কিছু নয়।

কারণ ক্ষমতাধর সর্বদা তাঁর বাহ্যিক আড়ম্ভরের মধ্য দিয়ে এবং সেই আড়ম্বরের পরিসর তৈরি করে দেবার মধ্য দিয়ে শাসক ও শাসিতের বিভাজনকে প্রকট করেন। ফলত দেশীয় বস্ত্রবাণিজ্যে অবনমন এবং দেশীয় মানুষের পারিচ্ছদিক রুচিতে পরিবর্তনকে একসাথে দেখলে বোঝা যায়, উপনিবেশে পোশাকি রুচিশীলতার পরিবর্তনের পিছনে নতুন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিসরের দায় রয়েছে। কিন্তু এটাও অগ্রাহ্য করার মতো নয় যে, প্রাগৌপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিক সময়ের উত্থান, শুধুমাত্র দেশীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ক্ষতি করেই সম্পূর্ণরূপ পেতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত নবোত্থিত অর্থনৈতিক পরিসর সাধারণের মনকে জারণ-বিজারণ করে রুচির জগতে পরিবর্তন এনে নিজের বাজারের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভূখণ্ডে উদ্‌ভুত নতুন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বৃত্ত সম্পূর্ণতা পায় না। বার্নার্ড কোন্‌ "Cloth, Clothes and Colonisation" এ যখন ক্ষমতার পরিসর তৈরির পেছনে পোশাকের ভূমিকার কথা বলেন, সেই পরিসরটা আসলে নবোত্থিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে সাজুজ্য রেখে তৈরি হওয়া নতুন রুচিরও পরিসর।[73]

বস্ত্রশিল্পে অবক্ষয়ের সূচনা

বাংলার বস্ত্রশিল্পে অবনমনের সূত্রপাত যে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু হয়েছিল – একে অস্বীকার করবার সাধ্য নেই। কারণ পলাশী-পূর্ব বাংলার তাঁতিদের অবস্থা ছিল অনেকটা স্বাধীন। তারা বছরের নির্দিষ্ট সময় নিজেরাই সুতো কাটতেন ও কাপড় বুনতেন। প্রয়োজন পড়লে সুতো কিনতেন বা দাদনি বণিকদের কাছ থেকে দাদন নিতেন। সর্বোপরি তাঁতির তাঁত উৎপাদনের কাজে নির্ণায়ক ছিলেন তাঁতি নিজেই। কিন্তু ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী অর্জনের পর ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতির সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে থাকেন। কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতিশ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। আলাদা আলাদা অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত গোমস্তারা স্ব স্ব অঞ্চলের তাঁতিদের নাম নিজেদের খাতায়

[72] Ian Wendt, "Four Centuries of Decline? Understanding the Changing Structure of South Indian Textile Industry", Georgio Riello, Tirthankar Roy edited, 'How India Clothed the World: The World of South Asian Textiles 1500-1800', (Leiden, Boston: Brill, 2009), pp. 193-216, 205.

[73] Bernard S. Cohn, "Cloth, Clothes and Colonialism: India in Nineteenth Century", in 'Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India', (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996), pp. 106-162.

নথিভুক্ত করে তাঁতিদের তাঁত বুননের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। সুতরাং একেকটি অঞ্চলের তাঁতিরা একেকজন গোমস্তার আওতাধীন হয়ে যান। গোমস্তার বরাত দেওয়া কাজের বাইরে অন্য কাজ নিলেই তাঁতিদের ওপর অত্যাচার চলত। তাদের গারদে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এরূপ ক্রীতদাসসুলভ ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ঢাকা, মুর্শিদাবাদের তাঁতিদের নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে ফেলে দেওয়ার কথা সে সময়কার অনেকেই বলেছেন।[74] তবে এ বিষয়টা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু নির্বিচার শোষণ যে হয়েছিল তা বোঝা যায় ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে। দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালেও তাঁতিদের স্বাধিকার রক্ষার বিপরীতে কোম্পানি কাজ করেছিল। ৭০০০০০ lbs'এর মত কাঁচা রেশম ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিল বাংলা থেকে।[75] বলা বাহুল্য, ১৭৬০ সাল থেকে ম্যানচেস্টারের মেশিনে যে কাপড় বোনা শুরু হয়, বাংলা সেই কাপড়ের কাঁচামাল জোগানদানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তখনও খ্যাতির মধ্যগগনে থাকা বাংলার রেশমশিল্পকে ধ্বসিয়ে দিতে ইংল্যান্ডের দেশাত্মবোধক কিছু প্রতিষ্ঠান বাংলায় তৈরি বস্ত্র না পরতে প্রচার করতে শুরু করে। ১৭৭৫ সালে ইংল্যান্ডের এডিনবার্গের এহেন একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষীয় তাঁতিদের বরাত দিয়ে বানানো ড্রেসিং গাউন ও রোব ছেড়ে গ্লাসগো ও পাইসলির তৈরি সুতী, মিহি কাপড় পরতে মেয়েদের উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকে।[76]

বলা বাহুল্য, পলাশী যুদ্ধের পর, বিশেষত ১৭৭০'এর মন্বন্তরের আগেও ভারতবর্ষে কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন বাসনা ছিল না। মুসলমান শাসকরা যেমন ভারতে এসে এখানকার জল-হওয়ার মধ্যে আপনত্ব খুঁজেছিলেন, ইংরেজ কোম্পানি সে জায়গায় শুধুই লাভের স্বপ্ন দেখেছে। অবশ্য একটা বাণিজ্যিক কোম্পানির কাছে এর চাইতে বেশি কিছু আশাও করা যায় না।[77] বিষয়টা আরো ভালো করে বোঝা যায় পলাশী যুদ্ধের এক মাসের মধ্যে ক্লাইভের তাঁর বাবার কাছে লেখা চিঠি থেকে – "ইংরেজের কাছে জাফর আলী খান বাহাদুর [মীর জাফর] যে সমস্ত উপকার পেয়েছেন তার বদলে তিনি সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৩ কোটি দিতে রাজি। তাঁর বদান্যতায় আমি স্বদেশে এমন ঠাঁটে থাকতে পারবো যা আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার অতীত। .... বোনেদের জন্য আমি কুড়ি হাজার টাকা করে দিচ্ছি ... যথা সময়ে ভাইয়ের ব্যবস্থা করে দেব। ... আপনারও আর আইনের ব্যবসা করার দরকার নেই।"[78] এখানে সাম্রাজ্য বিস্তারের চাইতে আত্মস্বার্থ এষণাই বেশি। এরূপ স্বার্থ-তাড়িত ১৭৬৫ সালের দেওয়ানিই যে বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষ ঘটালো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৭৬০ এর দশকে দেখা গেছে, ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল মালদহ ও মেদিনীপুরের কমার্শিয়াল রেজিমেন্টকে নির্দেশ দিচ্ছে – তাদের অধীনস্থ জগন্নাথপুর, ওলামারা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো যেন শুধু ইংরেজ কোম্পানির জন্য কাপড়

---

74 Willam Bolts, 'Considerations on Indian Affairs', 1772, p. 194.

75 Peter Linebaugh, 'London Hanged', p. 272.

76 Peake, 'Cotton', p. 4.

77 Select Committee Fort William to Select Committee London, 14th July 1757; Bengal in 1756-1757, Vol. II, pp. 445-453; নিয়েছি রজতকান্ত রায়, 'পলাশীর ষড়যন্ত্র', পৃ ২৫৩ থেকে।

78 Clive to his Father, 19th August 1757, Bengal in 1756-1757, Vol.III, p. 360; নিয়েছি রজতকান্ত রায়, 'পলাশীর ষড়যন্ত্র', পৃ ২৫৩, ২৫৫ থেকে।

বোনে।[79] পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের মাত্র কয়েক মাস পরেই ডাচদের জন্য বোনা কাপড় ইংরেজরা একপ্রকার জোর করে তাঁতিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।[80] যেখান থেকে বোঝা যায় যুদ্ধজয়ের পর উপনিবেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের লোভ ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ কোম্পানি চেয়েছিল – তাঁতি পরিবারের বাইরের লোকেরাও ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য তাঁত বুনুক। রবার্ট ওরমে অষ্টাদশ শতকে বলেছিলেন, – 'এখানকার ধনী ব্যক্তিও ঘরে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে থাকেন। অভ্যাগতদের সাথেও তাঁর এই অবস্থায় কথা বলতে দ্বিধা নেই। .... কিন্তু ভারতের বস্ত্রশিল্প জগৎখ্যাত। তবে এদেশীয় তাঁতিদের তাঁত বুননকে বাণিজ্য ও চাহিদার অনুবর্তী হতে হবে। তাই তাঁত বুননের কাজে আরও অনেককে নামাতে হবে।'[81] যদিও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিককার একজন ইংরেজের অভিমত এটা। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে যেতে যেতে দেখা যায়, তাঁত বোনা, সুতো কাটার কাজে কোম্পানি ম্যানচেস্টারের মিলকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। উপনিবেশে সুতোকে বাণিজ্যমুখী করবার জন্য লক্ষ্যে তাঁতি ভিন্ন অন্য শ্রেণীর মানুষকেও অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে সুতো কাটার বরাত দেওয়া শুরু হয়েছিল। ১৮২৮ সালের ৫ই জানুয়ারি, জনৈক শান্তিপুরী সুতাকাটনী সংবাদপত্রে লেখেন, তাঁর স্বামী মারা যাবার পর তিনটি মেয়ে ও শশুর-শাশুড়ি নিয়ে তিনি অথৈ জলে পড়েছিলেন। কিন্তু বাঁচার জন্য 'আসনা ও সুতো' কাটার বরাত নিতে শুরু করেন। তাঁতি এসে 'তিন তোলার দরে' চরকা সুতো ও 'দেড় তোলার দরে' সরু সুতা নিয়ে যেতেন। এই রোজগারে তিনি তিনটি মেয়ের বিয়ে দিলেন। শ্বশুরের শ্রাদ্ধও সারলেন। তার মানে সুতা কাটা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে তাঁর জীবনে রসদ জুগিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের বিশের দশকে তিনি জানাচ্ছেন, বিলিতি শুল্কহীন সুতোয় বাজার ছেয়ে গেছে। চরকায় কাঁটা সুতো আর কেউ নিতে চাইছেন না। সুতাকাটনীর অভিযোগ, তিন থেকে চার টাকা সের দরে যে ওচার সুতোয় দেশীয় বাজার ছেয়ে যাচ্ছে, তাতে বোনা কাপড় দুই মাসও ভালো করে টিকত না। বিলেতের তাঁতির বোনা সুতো বিলিতি বাজারে লাভের মুখ তো দেখলই না, বরং উপনিবেশের বাজারে কমদামে বিক্রি হয়ে উপনিবেশের বস্ত্রশিল্পের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল।[82]

যত্ন করে হাতে কাটা সুতো বিদেশি সুতোর সাথে পাল্লা দিতে না পেরে কম দামে বিকিয়ে যেতে লাগল। উপনিবেশিক একচেটিয়া বাণিজ্যের যাঁতাকলে দুই দিকের তাঁতি সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হল। ফলত উনিশ শতকের শেষ দুটি দশকের মধ্যেই সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের উৎপাদন এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়। ঢাকাই মসলিনের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়-কলে ধুতি-শাড়ির উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।[83] ম্যানচেস্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের উপর থেকে আমদানি

---

[79] Om Prakash, "From Market Determined to Coercion Based Textile Manufacturing in 18th Century Bengal", Giorgio Riello & Tirthankar Roy edited 'How India Clothed the World: 1500-1850', (London: Boston: Brill, 2009), p. 225.

[80] Ibid.

[81] Robert Orme, 'Historical Fragments of the Mogul Empire', (London: Printed for Wingrave, in the Strand, Successor to the Mr. Nourse, MDCCCV), p. 472.

[82] "শান্তিপুর কোন দুঃখিনী সূতা কাটনির দরখাস্ত", ৫ই জানুয়ারি ১৮২৮; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)।

[83] E. B. Havell, 'The Printed Cotton Industry in India', *The Journal of Indian Art*, Vol. I, Oct. 1888.

শুল্ক উঠে যায়। অর্থাৎ ঐসব বস্ত্র ভারতের বাজারে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে – এই বিষয়টি সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়। ১৮৭৮ সালে 'সংবাদ প্রভাকরে' ম্যানচেস্টার কাপড়ের বিনাশুল্কে ভারতের বাজারে বিক্রি হবার ছাড়পত্র নিয়ে বিষাদগার করা হয়। সেখানে লেখা হয়, " বিগত ফেব্রুয়ারি [১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি] মাসের প্রথম সপ্তাহে রিউটার তারযোগে সংবাদ দেন যে, ম্যানচেস্টারের বণিক সমাজ ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অফ স্টেটের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া তুলাজাত বস্ত্রের আমদানি শুল্ক একেবারে রহিত জন্য আবেদন করিয়াছেন।"[84] আর এই আবেদনের জন্য পার্লামেন্টের চারজন সভ্য ম্যানচেস্টারের প্রতিনিধিদের নিয়ে ম্যানচেস্টারের ২৪৪৫ জন বণিক ও মহাজনের স্বাক্ষরিত পত্র এবং ১৩৬৭২ জন শ্রমজীবির স্বাক্ষরিত পত্র তৎকালীন সেক্রেটারি অফ স্টেট, লর্ড ক্র্যানব্রুক-কে জমা দেন। সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে "লর্ড ক্র্যানব্রুক তখন সপ্তসমুদ্র পারে – ইংল্যান্ডে – ভারত তখন তাহার চিত্তপট হইতে অন্তরে, কাজেই তখন তিনি ভারত সম্বন্ধে নিজের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ আশা দিয়াছেন যে, অচিরেই এই আমদানি শুল্ক রহিত করা হইবে। পরে তিনি ইন্ডিয়া গবর্নমেন্টকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। লর্ড লিটন এই আমদানি শুল্ক হ্রাস করিতে উদ্যত!"[85] এই শুল্ক তুলে নেবার মূল কারণ হিসেবে বণিক সমাজের অধিবেশনে বলা হয়েছিল – ভারতে বস্ত্রের দাম বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে কম মূল্যে বস্ত্র যোগান দেওয়া ম্যানচেস্টারের কর্তব্য। কিন্তু আদপেই কি মূল উদ্দেশ্য তা ছিল! ওই অধিবেশনের সভাপতিই যেখানে নিজ-মুখে শিকার করেছিলেন, "ম্যানচেস্টারে যত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার তিন অংশের এক অংশ ভারতে বিক্রীত হয়।"[86]

তার সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয় রুচিতেও বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা বাড়ে। বিদেশি মিলের তৈরি কাপড় সামাজিক মান-মর্যাদার পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠতে থাকে। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ পরিচ্ছদের ধরণকে অনুসরণ করুক তা ব্রিটিশরা কোনদিন চাননি কারণ তাদের পরিচ্ছদশৈলীর সাথে নিজেদের সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার প্রশ্নটি জড়িয়ে ছিল। তবে নিজেদের মিলে তৈরি কাপড় যাতে উপনিবেশবাসীরা ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রটাকে তারা প্রস্তুত করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষ থেকে সুতো নিয়ে গিয়ে বা সুতো কাটার জন্য কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে তারা যে কাপড় নিজেদের মিলে বুণতে শুরু করেছিলেন, সেই কাপড়ের নান্দনিকতা ভারতে বোণা দেশি কাপড়ের নান্দনিকতার সমতুল হয়ে উঠুক – সেই চেষ্টা তারা আপ্রাণ করেছিলেন। তাই দুটো ভিন্ন জায়গায় বোনা কাপড়ই প্রায় এক চরিত্র পায়।[87] অনেক সময় বিলিতি মিলে তৈরি কাপড়ের জমিন আরও মিহি ও আরামদায়ক। সুতরাং প্রশ্ন জাগে একই নান্দনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাপড়ই যদি ইংল্যান্ডের মেশিনে বোণা হতে শুরু করে, তাহলে ভারতবর্ষে বোনা কাপড়ের বাজারের চাইতে বিদেশে বোণা কাপড়ের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল কেন! এবিষয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় মত হল – ভারতে বোণা

---

[84] "ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থপরতা", সংবাদ প্রভাকর, ২৭/১১/১২৮৫ বঙ্গাব্দ; বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১৮৪০-১৯০৫, ১ম খণ্ড', (কলিকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

[85] তদেব।

[86] তদেব।

[87] Tara Mayer, 'From Caret to Couture: Contemporary Indian Fashion in Historical Perspective', *South Asian Popular Culture*, Vol. 16, Nos. 2-3, 2018, pp. 183-198.

কাপড়ের দাম বেড়ে গিয়েছিল, তাই কম দামে একই রকম দেখতে কম মূল্যের বিদেশি কাপড়ের চাহিদা বেড়েছিল। এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক দেশীয় অন্দরমহলে যেখানে ব্রিটিশরা অচ্ছুৎ হিসেবে পরিগণিত হতেন, সেখানে ব্রিটেনজাত পণ্য কিভাবে জনপ্রিয়তা পেল! এক্ষেত্রেও পূর্বের উত্তরকে সামনে রেখে বলা যায়, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষীয় ফ্যাশনের বুনিয়াদি রূপটার প্রকৃতিকে আয়ত্ত করে নিজেদের কলে সেরকম কাপড়ই বোনা শুরু করেছিলেন, যা ভারতবাসীর মনে পরিচ্ছদকেন্দ্রিক নৈতিক সংশয়কে দূর করে ভারতে বাজার চালনা করবে। ১৮৬৬ সালে জে. ফোর্বস ওয়াটসন ভারতবর্ষের বস্ত্র বাজারে ব্রিটিশ আধিপত্যকে বলবৎ করতে এখানকার বস্ত্রের বুনিয়াদি নান্দনিকতাকে বোঝার প্রয়োজন আছে বলেছেন।[88] এবং সেই তাগিদ থেকে ভারতের উত্তর,দক্ষিণ ও পূর্ব, পশ্চিম প্রান্তে প্রচলিত নানা ধরণের বস্ত্রের স্যাম্পল সংগ্রহ করে তাকে নথিবদ্ধ করেন।[89] আর সেকারণেই ১৮৬১ সালের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ব্রিটিশের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি ও নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে, বিলিতি পরিচ্ছদশৈলীর শাসকসুলভ নিরাপত্তা বলয়ে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, নিজেদের বুনিয়াদী ফ্যাশন ভেঙে বেরিয়ে আসার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যে প্রবণতা সমাজের অন্যান্য স্তরকেও পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তাই ব্রিটেনের কলে তৈরি বস্ত্রের শুধুমাত্র কমদামি বলেই ব্যবহার বাড়ছিল তেমনটা নয়, কোথাও এই বস্ত্র যেন সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ারও প্রতীকী সোপান হয়ে উঠছিল। নেটিভ মানসের এই পরিবর্তনটি ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকদের অজানা ছিল – তা বলা যাবে না। সেটা সরকারি ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত দেশীয়দের সরকারি তরফ থেকে ড্রেস কোড ঠিক করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার। অর্থাৎ উপনিবেশিক শাসকের মনে উপনিবেশে শাসক-শাসিত বিভাজন সৃষ্টির পরিচ্ছদ নির্ভর পথটা অনেকটা পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বিভাজনের সমান। পাশ্চাত্য শিক্ষা যেমন একদল ইংরেজি শিক্ষিত ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষপাতী সৈন্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি হস্তনির্ভর পুরাতন পদ্ধতির বস্ত্র বয়নকে মেশিন নির্ভর বস্ত্র বয়নের সাথে সংঘর্ষে দাঁড় করিয়ে ব্রিটিশ সরকার, মেশিনে তৈরি বস্ত্র গায়ে চাপানো মানুষকে যেন আধুনিক বিকাশের পথে সহায়ক তকমা লাগিয়ে দিলেন।

'হিঙ্গুনঘাট কটন': 'কটন কালচার' বিস্তারের মোড়কে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারী প্রকল্প

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই যে বাংলা তথা ভারতীয় তাঁত শিল্পকে আত্তীকরণ করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফে চলেছিল – তা আমরা আগের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি। এবার আমাদের দেখতে হবে, নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে এদেশের কটন বা সিল্কের চাষ-সংস্কৃতিকে তারা কিভাবে পাল্টাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, ১৭৬৯ সালের প্রথম দিক থেকে কোম্পানি এদেশে নিজেদের উদ্যোগে কাঁচা সিল্ক উৎপাদনের উপর

[88] John Forbes Watson, 'Textile Manufacture & the Costumes of the People of India', (London: Printed for the India Office by George Edward Eyre & William Spottiswood, Printers to the Queen's most Excellent Majesty, 1866), pp. 1-3.
[89] John Forbes Watson, 'The Textile Manufacturers of India', Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (London: India Office, 1866).

গুরুত্ব দিলেও, দেশীয় উদ্যোগে সিল্ক চাষের বিষয়টাকে নিজেদের স্বার্থহানির নজরেই দেখছিল। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের ষাটের দশক ভারতে বিকল্প সিল্ক ও কটন সংস্কৃতি তৈরি করে, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের উদ্যোগ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। যার মানে দাঁড়ায়, কাপড় বোনার সব ধাপগুলোই কোম্পানি ভারতীয় তাঁতির আওতা থেকে হাইজ্যাক করে ইংল্যান্ডের কাপড় ফ্যাক্টরির হাতে তুলে দিতে শুরু করে।

সারণি (২.৪)			
১৭৯৪-১৮১৩ সালের মধ্যে ভারতের সুতো দিয়ে ইংল্যাণ্ডে বোণা যে পরিমাণ বস্ত্র, উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে ভারতের বাজারের উদ্দেশ্যে আমদানি হয়, তার ক্রমবর্ধিত মূল্যমান			
বছর শেষ ৫ই জানুয়ারি		বছর শেষ ৫ই জানুয়ারি	
১৭৯৪	১৫৬ মূল্যমান	১৮০৪	৫,৯৩৬ মূল্যমান
১৭৯৫	৭১৭ ’’	১৮০৫	৩১,৯৪৩ ’’
১৭৯৬	১১২ ’’	১৮০৬	৪৮,৫২৫ ’’
১৭৯৭	২৫০১ ’’	১৮০৭	৪৬,৫৪৯ ’’
১৭৯৮	৪৪৩৬ ’’	১৮০৮	৬৯,৮৪১ ’’
১৭৯৯	৭৩১৭ ’’	১৮০৯	১১৮,৪০৮ ’’
১৮০০	১৯,৫৭৫ ’’	১৮১০	৭৪, ৬৯৫ ’’
১৮০১	২১,২০০ ’’	১৮১১	১১৪,৬৪৯ ’’
১৮০২	১৬,১৯১ ’’	১৮১২	১০৭,৩০৬ ’’
১৮০৩	২৭,৮৭৬ ’’	১৮১৩	১০৮,৮২৪ ’’

(সূত্রঃ Romesh Dutt, Economic History of India: Under Early British Rule, p. 257.)

তাই ভারতীয় তাঁতিদের তাঁত বুননির্ভর অর্থনীতিতে ইংল্যান্ডের কম দামী সুতো ও কাপড়ের আধিপত্য বাড়তে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অনতিপূর্বেই ১৭৯৪ থেকে ১৮১৩ – এই কুড়ি বছরে ইংলণ্ডে বোনা কটন বস্ত্র ভারতে রপ্তানির লক্ষ্যে দ্বিগুণ হারে উত্তমাশা অন্তরীপের (Cape of Good Hope) দিকে যেতে শুরু করে (সারণি (২.৪) দ্রষ্টব্য)।[90] ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের পর লন্ডনের 'হাউস অফ কমন্সে'র সভায় ওয়ারেন হেস্টিংস, থমাস মনরো, স্যার জন ম্যালকলম প্রমুখকে প্রশ্নোত্তরপর্বে বসতে হয়। সেখানে ভারতে বিলিতি পণ্যের বিস্তৃত বাজার নিয়ে তাদের উত্তরগুলো যথেষ্ট নীরবতা অবলম্বন করে ভারতীয় বাজার ও অর্থনীতিতে বিলিতি পণ্যের কুপ্রভাবের বিষয়টাকে এড়িয়ে গেছে।[91] ইউরোপের মত শৈত্যপ্রবণ অঞ্চলে বোনা

[90] Romesh Dutt, ‘The Economic History of India: Under Early British Rule’, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., Seventh Edition), pp. 256-257.
[91] ‘East India Question, Abstract of the Minutes of Evidence taken in the Hon. House of Commons’, (London: Printed for Black, Perry & Co. 1813).

কটনের বাণিজ্যিক দিশা যে ভারতের মতো নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাজার, সেটা কিন্তু শত নীরবতা সত্ত্বেও পরিষ্কার।[92]

ভারতের বাজারে নিজেদের পণ্যসামগ্রী বিস্তারের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র উপনিবেশিকরা আর্থিক ও সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বিস্তার ঘটানোর পথে অগ্রসর হননি। তারা আর্থিক ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য উপনিবেশের ভূমিকে কর্ষণ করে বিশ্বমানের কটন উৎপাদনের দিকেও এগিয়ে গিয়েছিলেন। যে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মেচিদের মতো ভ্রাম্যমান পাহাড়ি জনগোষ্ঠীও এক জায়গায় স্থিতু হবেন এবং ব্রিটিশদের আনা কৃষি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে বিলিতি পুঁজির দাসে পরিণত হবেন। দার্জিলিং'এর ডেপুটি কমিশনার ডি.ডাব্লিউ. মর্টন ১৮৬৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনারকে লিখেছেন – তিনি মিস্টার ন্যাসের কটন শিল্পের পরিকল্পনামাফিক প্রসার ও তার উন্নতিকল্পের সাথে সহমত। কারণ ইংল্যান্ডের বস্ত্রমিলে বস্ত্র উৎপাদনের সাপেক্ষে কাঁচামালের চাহিদা যেভাবে বাড়ছিল, উপনিবেশের মাটিতে কটন উৎপাদন সেই চাহিদাকে মেটাবে বলে তাঁর অভিমত। তিনি আরও বলেন, বন-সংরক্ষণে জোর দেওয়ার দরুণ পাহাড়ি অঞ্চলে স্থানান্তর কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে জীবনধারণ করা মেচিদের মত জনগোষ্ঠীর অনেকেই নেপাল ভুটানের দিকে চলে গেছে। বলা বাহুল্য, ১৮৬৭ সাল, ১৮৫৭ সালের পর দশটি বছর মাত্র। তাঁর মতে, সেইসব জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ প্রশমনের একটা পথ হতে পারে তাদের মধ্যে কটন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর মোড়কে তাদের শ্রমকে উপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যবহার করা। তাছাড়া তরাই ও ডুয়ার্সের মাটি ও আবহাওয়া যেখানে কটন চাষের পক্ষে উপযুক্ত, সেখানে সেই মাটিকে কটন চাষে ব্যবহার করাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেছিল।[93] উচ্ছেদ হয়ে যাওয়াদের শ্রমকে যদি তরাই ও ডুয়ার্সের মাটি কর্ষণ করে কটন ফলানোর কাজে নিয়োজিত করা যায়, তাহলে যে ক্ষোভের প্রকাশকে রোধ করা যাবে, সাম্রাজ্যের শিকড়কে আরো প্রসারিত করা যাবে এবং হিঙ্গুনঘাটের মতো বিশ্বমানের কটন ফলিয়ে নিজেদের বাজারকে ফলপ্রসূ করা যাবে – এই বিষয়গুলি মহাবিদ্রোহ-পরবর্তীকালে উপনিবেশিকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

এ প্রসঙ্গে অ্যানে ম্যাক্লিনটক-এর Imperial Leather-এর কথা চলে আসে। চলে আসে 'কুমারী ভূমির' তত্ত্ব। যে ভূমি কিনা তার কৌমার্য হারায় প্রবল প্রতাপ উপনিবেশিকদের পুরুষকারের প্রভাবে। আর সেই পুরুষকার উপনিবেশের আধিপত্যমনস্ক মানচিত্র বানানো, উপনিবেশের মাটিতে তার বাণিজ্যিক স্বার্থান্বেষী ফসল উৎপাদন, উপনিবেশের খনিগুলোকে সাম্রাজ্যিক পুঁজির আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।[94] ১৮৬৯-৭০ সালে নীলকর সাহেবদের যথেচ্ছ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত নীল বিদ্রোহের পরও ব্রিটিশের মানসিকতা কতটুকু বদলেছিল তা

---

[92] Giorgio Riello, 'The Indian Apprenticeship: The Trade of Indian Textiles and Making of European Cotton", Giorgio Riello & Tirthankar Roy eds., 'How India Clothed the World: The World of South Asian Textiles 1500-1850', (Leiden, Boston: Brill, 2009), pp. 309-346.

[93] From Captain B. W. Morton, Deputy Commissioner of Darjeeling to the Commissioner of Coch Behar, Proceeding No. 33, dated Darjeeling, the 27th December, 1867, Revenue Department, Land Revenue Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

[94] Anne McClintock, 'Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in Colonial Context', (New York, London: Routledge, 1995), pp. 1-17.

মিস্টার জে.টি. ন্যাশ-এর দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া একটি চিঠি থেকে বোঝা যায়। এই চিঠিতে বলা হচ্ছে – ভারতের মাটি থেকে লাভের ফল পেতে হলে সেই মাটিকে কেবলমাত্র পয়সা আয়ের ক্ষেত্র বানালে হবে না। তাকে নিবিড়ভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে, ভারতে বৃহত্তরভাবে ও নিবিড়ভাবে নীল চাষ সংঘটিত হতে পেরেছিল কারণ সেই চাষে ব্রিটিশদের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল। কিন্তু বাংলায় কটন চাষ সেই নিবিড়তায় পৌঁছাতে না পারার কারণ হিসেবে তিনি স্বদেশীয়দের নিম্নমানের ও অনিশ্চিত উদ্যোগকে দায়ী করেছেন।[95] এখান থেকে অন্তত এটা পরিষ্কার যে উপনিবেশিকদের নিজস্ব উদ্যোগ নিয়ে প্রত্যয় কতটা বেশি! স্বদেশীয়দের উদ্যোগকে ঠুনকো ও নিচুমানের সাব্যস্ত করে এই আত্মপ্রত্যয় বিদেশের মাটিতে তাদের পুঁজিশীল উদ্যোগকে সংঘটিত, সঠিক ও যৌক্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কারণ তারা জানতেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের বাইরে থাকা স্বদেশী উদ্যোগের অনুবর্তী হলে তারা উপনিবেশকে সাম্রাজ্যিক লাভের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করতে পারবেন না। তাই স্বদেশী উদ্যোগকে নিচু ও অনিশ্চিত দেখানোর মধ্যে উপনিবেশিক পৌরুষ ও উচ্চতার মাপকাঠি নির্ধারণের একটা প্রবণতাও কাজ করেছে।

শুধুমাত্র তরাই-ডুয়ার্সের মতো হালকা বসতির অঞ্চলে হিঙ্গুনঘাট কটন বীজ প্রদান করেই উপনিবেশিকরা বিশ্বায়িত কটন সাম্রাজ্যে নিজেদের একক করে তুলতে চাননি। সমতলেও এহেন কটন চাষের প্রসার ঘটাতে উপনিবেশিকরা আগ্রহী ছিলেন। ১৮৬০-এর প্রথম দিক থেকেই বাংলার কোথায় কিরকম কটন উৎপাদিত হয় এবং কিরকম কটন উৎপাদনের সম্ভাবনা – এসব বিষয় নিয়ে উপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। রাজস্ব দপ্তরের সেক্রেটারি আর. বি. চ্যাম্পেন ১৮৬৪ সালের ১৪ই এপ্রিল বাংলার জুনিয়র সেক্রেটারিকে তাঁর পর্যালোচনার কথা জানান। তিনি জানান, বাংলার দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে তুলো চাষ অনুল্লেখ্য। যদিও বা সেখানে কিছু পরিমাণ উৎপাদিত হয়, তাও সেখানকার নিজস্ব ঘরোয়া চাহিদা মেটানোর জন্য। প্রায় সময় এই অঞ্চলের তাঁতিদের উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলো থেকে কটন আমদানি করে বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হত।[96] কিন্তু সেই কটন তন্তুর দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানির অবস্থাও হীন হয়ে উঠেছিল। তার ফলে কি বঙ্গপ্রদেশে নিজস্ব কটন উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব বেড়েছিল? এই প্রশ্নটা সরাসরি না এলেও ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রশাসনের চিঠিতে এর একটা আভাস আছে।[97] ১৮৬৪ সালে চ্যাম্পেন বলেন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সাথে সাথে আরাকান থেকেও ঘরোয়া প্রয়োজন মেটাতে কটনতন্তু আনা হত নিম্ন বঙ্গে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কটনের দাম বেড়ে যাওয়ায়, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে উৎপাদিত কটন নিম্ন বঙ্গে বেশি ব্যবহার শুরু হয়েছে বলেও তাঁর পর্যবেক্ষণ। তিনি মনে করেন, দেশীয় বস্ত্রের দাম বেড়ে গেলেও দেশীয়

---

95 From - Mr. J. T. Nash, Late Lieutenant Her Majesty's 66th Foot, To - the Deputy Commissioner of Darjeeling, Proceeding No. 34, Revenue Department, Land Revenue Branch, dated Darjeeling, the 23rd December 1867, West Bengal State Archives, Kolkata.

96 From - R.B. Champan, Esq., Secretary to the Board of Revenue, To – The Junior Secretary to the Government of Bengal, Proceeding No. 42, Revenue Department, Land Revenue Branch, dared 14th April 1864, West Bengal State Archives, Kolkata.

97 From – H. W. I. Wood, Esq., Secretary to the Bengal Chamber of Commerce, To – E. C. Balley, Esq., Officiating Secretary to the Government of India, Proceeding No. 42, Revenue Department, Land Revenue Branch, dated 13th October 1863, West Bengal State Archives, Kolkata.

তাঁতিরা ঘরোয়া চাহিদা মেটাতে বস্ত্র উৎপাদন থেকে সরে আসেননি। কারণ তারা দেশীয় তন্তুর বস্ত্র গায়ে দিতেই বেশি সচ্ছন্দ্য। কমদামি ম্যানচেস্টার বস্ত্রের দেশীয় বাজারেও তাই দেশীয় উদ্যোগে বস্ত্রের উৎপাদন কমেনি।

আমাদের মনে হতে পারে, দেশীয় বস্ত্র যেটুকু টুকিটাকি উৎপাদন হচ্ছিল সেই উদ্যোগটার ভিত্তিতেও নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য হিঙ্গুনঘাট কটন উৎপাদনের জন্য ব্রিটিশ সরকার বিশেষ তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না, ১৮৬০ এর দশক ইংল্যান্ডের বিশ্ব বাজারের পক্ষে হানিকারক একটা দুর্যোগের সময়। ১৮৬১ সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয় – উত্তর ও দক্ষিণের প্রদেশগুলোর মধ্যে। ফলত দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে – যেখানে কিনা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কৃষিজ ফলন হত, সেখানে নিউ অর্লেন্স ও মিশরীয় কটনের মত বিশ্বমানের কটন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। সেকারণে "ম্যানচেস্টার কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন" চেয়েছিল, ভারত ভূখন্ডে কিছু কটন ক্ষেত্র তৈরি করতে, যে ক্ষেত্রগুলো ইংল্যান্ডের মিলে ক্রমবর্ধমান কটন তন্তুর চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে কটন উৎপাদন করবে।[98] সুতরাং ১৮৬১ থেকে ১৮৬৮ সালের "কটন ডিপার্টমেন্টের" পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ভারত ভূখণ্ডে একর প্রতি কটনের চাষ বেড়েছিল (সারণি (২.৫) দ্রষ্টব্য)।[99]

সারণি (২.৫)	
আমেরিকায় গণ-যুদ্ধের কারণে ভারতে ১৮৬১-১৮৬৮ সালে কটন উৎপাদন বৃদ্ধির একরভিত্তিক হার	
বছর	একর
১৮৬১-৬২	৩৭৫,৬২৩
১৮৬২-৬৩	৪২৭,১১১
১৮৬৩-৬৪	৪৮৮,৪৩৬
১৮৬৪-৬৫	৬৯০,১৯৮
১৮৬৫-৬৬	৫৮৭,৩৯৮
১৮৬৬-৬৭	৫৯৮,৮০১
১৮৬৭-৬৮	৫৫২,৫২০

(সূত্রঃ Henry Rivett-Carnac, Report on the Cotton Department, 1869.)

১৮৬৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর ভারতের কটন উৎপাদনের হালহকিকত নিয়ে ডিভিশনাল কমিশনারদের কাছে পূর্ব ভারতের খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়, দুরুঙ অঞ্চল, গোয়ালপাড়া অঞ্চল, কামরূপ, লখিমপুর, নওগাঁ, পাটনা, চম্পারণ, দার্জিলিং, বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ভাগলপুর,

---

98 From – Mr. J. T. Nash, Late Lieutenant Her Majesty's 66th Foot, To – the Deputy Commissioner of Darjeeling, Proceeding No. 34, Revenue Department, Land Revenue Branch, Darjeeling, 23rd December 1867, West Bengal State Archives, Kolkata.

99 Henry Rivett-Carnac, Esq., B.C.S., Cotton Commossioner of the Central Provinces and the Berars, 'Report on the Cotton Department for the Year 1867-68', (Bombay: Education Society's Press, 1869); Harasankar Bhattacharyya, 'Aspects of Indian Economic History (1750-1950)', (Calcutta: Progressive Publishers, 2nd Revised Edition, 1980), pp. 24-25.

তিরহুট, যশোর ও নদীয়ার জেলা এবং উপজেলা কালেক্টররা কিছু রিপোর্ট জমা দেন।[100] এই জেলা-উপজেলাভিত্তিক রিপোর্টগুলিতে প্রত্যেক অঞ্চলে কটন চাষে টালমাটাল পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে। একদিকে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ফলে কাঁচামালের সংকট, অন্যদিকে তার প্রভাবে ম্যানচেস্টারের মিলের বস্ত্রের দাম বেড়ে যাওয়া – এই উভয়মুখী সমস্যা থেকে নিজেদের বাজারকে রক্ষা করবার জন্য বাংলার এসব অঞ্চলে কটন চাষের প্রাকৃতিক ও মানবিক অব্যস্থাকেই তুলে ধরা হয়েছে।[101] যেমন চট্টগ্রামের কালেক্টরের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় গণ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ১৮৬২ সালে ব্রিটেন থেকে আমদানিকৃত সুতো দিয়ে ওই অঞ্চলে মোট ৫০,০০০ মূল্যের কাপড় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৫,০০০। যার মূল কারণ হিসেবে কমিশনার বিশ্ববাজারে কটন তন্তুর মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন (সারণি ২.৬ দ্রষ্টব্য)। রিপোর্টগুলিতে কমিশনার ও কালেক্টররা তাঁদের নির্দিষ্ট অঞ্চলের কটন সংস্কৃতির যে পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন তা বিশ্লেষণ করলে ম্যানচেস্টার-পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও দেশীয় বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধির কথা বার বার উঠে

সারণি ২.৬	
১৮৬১-১৮৬৪ সালে চট্টগ্রাম ডিভিশনে কটন তন্তুর মূল্য	
বছর	মণ প্রতি দাম
বীজযুক্ত কটন	
১৮৬১-৬২	৫-৮ টাকা
১৮৬২-৬৩	৫,৬,৭-১৯ টাকা
১৮৬৩-৬৪	১৩ টাকা থেকে কমে ৭ টাকা, আবার ১৯ টাকাতে বর্ধিত হয়।
বীজহীন কটন	
১৮৬১-৬২	১৫, ১৬, ২৫ টাকা
১৮৬২-৬৩	১৬-৪৯ টাকা
১৮৬৩-৬৪	১৭-৩৫ টাকা

(সূত্রঃ No. 671, dated 16th March 1864, in Abstract of Replies from District Officers, Proceeding No. 43, Revenue Department, Land Revenue Branch.)

আসলেও, দেশীয় বস্ত্রের চাহিদার সাথে দেশীয় সুতো যোগানের সাযুজ্য না থাকায়, দেশীয় কাঁচামাল ও বস্ত্রের উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টাকেও তাঁরা নস্যাৎ করতে পারেননি। তবে এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য কি তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। অর্থাৎ হিঙ্গুনঘাট কটন চাষের আগে দেশীয় কটন উৎপাদনের হালহকিকত খতিয়ে দেখার জন্যই রিপোর্টটি তৈরি হয়েছিল কিনা – তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। তবে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ভারতে বিশ্বমানের কটন বীজ চাষের প্রতি যে ঝোঁক উপনিবেশিক সরকারের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সেই ঝোঁকের আবশ্যিক ফল হিসেবে

---

100 Abstract of Replies from District Officers to the Board's Circular No. 80 d., Calling for a Report on the Extent and Growth of Cotton Cultivation, Proceeding No. 43, Revenue Department, Land Revenue Branch, dated 22nd December 1863, West Bengal State Archives, Kolkata.

101 No. 483, 338, 671, 634, Date of Reply – 2nd March 1864 in Abstract of Replies from District Officers, Proceeding No. 43, Revenue Department, Land Revenue Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

রিপোর্টগুলিকে ধরা যায়। ১৮৬২ সালে বাংলার সরকারের সেক্রেটারি J. Geoghegen পাটনা, ভাগলপুর, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নদীয়া, বর্ধমান, কটক, আসাম, ছোটনাগপুরের কমিশনারকে এবং দার্জিলিং ও কাছারের সুপারিনটেনডেন্টকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন "ম্যানচেস্টার কটন সাপ্লাই এসোসিয়েশন" ভারতে কটন চাষের অনিবার্যতা উপলব্ধি করছে; কারণ বস্ত্রশিল্পের বিশ্ব বাজারে ব্রিটেনের আধিপত্য বজায় রাখতে গেলে, ভারতে বিশ্বমানের কটন না ফলিয়ে আর বিকল্প পথ ছিল না। সে কারণে ১৮৬০-এর দশকে সরকারি নথিপত্রে যেন হিঙ্গুনঘাট হিড়িক উপস্থিত।[102]

যেমন উত্তর-পশ্চিম ভারতে কার্পাস উৎপাদনের হালহকিকত নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর Mr. Paterson Saunders-এর মতো পর্যবেক্ষককে পূর্ব সীমান্তের অর্থাৎ বাংলা, আসাম, ছোটোনাগপুর ডিভিশন এবং মহানদী অববাহিকা অঞ্চলে পাঠিয়ে কার্পাস উৎপাদনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করানোর কথাবার্তা সরকারিভাবে চলতে থাকে।[103] ১৮৬১ সালে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি এইচ. বেল, আগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সারাংশ প্রত্যেক রাজস্ব অফিসারদের পাঠাতে বলেন। এই প্রবন্ধে মূলত বিশ্ববাজারে বস্ত্রশিল্পে ব্রিটেনের হানির কথা ভেবে উত্তর ভারতে বিদেশি জাতের কটন বীজ বিলির জন্য ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের এগিয়ে আসতে বলা হয়েছিল।[104] এছাড়া বিদেশি জাতের কটন বীজ বিলি-বন্টন এবং সে বীজ চাষের ধরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি বাংলাসহ উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে বলা হয়।[105] ভারতে কটন চাষে উন্নতির বিষয়ে বলতে গিয়ে 'ম্যানচেস্টার কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন'এর তরফেও বলা হয়েছিল, ইংল্যান্ডের মিলে কাঁচামাল হিসেবে তিন-চতুর্থাংশ কটন জোগানের সম্ভাবনা ভারতের মাটিতে রয়েছে। এও বলা হয় -- সেই সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার যে উদ্যোগ ঔপনিবেশিক সরকার গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন, সেই উদ্যোগকে সুযোগ হিসেবে নিলে ভারতের বাজার বার্ষিক ৪০,০০০,০০০ স্টার্লিং বাণিজ্যের অঙ্গীভূত হতে পারবে। অর্থাৎ নাগরিক-যুদ্ধের কারণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক অবনতিকে ভারতের মাটি ব্যবহার করে পূরণের পন্থা ঔপনিবেশিক সরকারের চিঠিতে উপনিবেশবাসী চাষীদের জন্য 'সুযোগ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

---

[102] From – Geoghegen, Esq., under Secretary to the Government of Bengal to the Commissioner of Patna, Bhagulpur, Rajsahaye, Dacca, Chittagong, Nuddea, Burdwan, Cuttack, Assam & Chota Nagpur, the Superintendent of Darjeeling and Cachar, Proceeding No. 1, Revenue Department, Land Revenue Branch, July 1862, West Bengal State Archives, Kolkata.

[103] From – E.C. Bayly, Esq., Secretary to the Government of India, Homew Department, To – E.H. Lushington, Esq., Secretary to the Government of Bengal, Proceeding No.145, Revenue Department, Land Revenue Branch, 5th May 1862, West Bengal State Archives, Kolkata; From – J.D. Gordon, Esq., Junior Secretary to the Government of Bengal, To - the Secretary Government of India, Home Department, Proceeding No. 146, Revenue Department, Land Revenue Branch, 17th May 1862, West Bengal State Archives, Kolkata.

[104] Circular from H. Bell, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal, To – all Commissioners of Revenue, Proceeding No. 89, Revenue Department, Land Revenue Branch, 16th July 1861, West Bengal State Archives, Kolkata.

[105] From – A.M. Monteath, Esq., Under Secretary to the Government of Bengal, Proceeding No. 49, Revenue Department, Land Revenue Branch, 25th July, West Bengal State Archives, Kolkata; From – the Right Hon'ble Sir Charles Wood Bart, M.P & G.C.B, Her Majesty's Secretary of State for India, To – His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council, Proceeding No. 50, Revenue Department, Land Revenue Branch, 9th June 1862, West Bengal State Archives, Kolkata.

ভারতে বিদেশি কটন বীজ চাষের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকেও বিদেশি কটন বীজ চাষের প্রতি দেশীয় চাষীদের টানার প্রবণতা ততটা ক্রিয়াশীল ছিল না। কারণ একদিকে তখনও ইংল্যা-

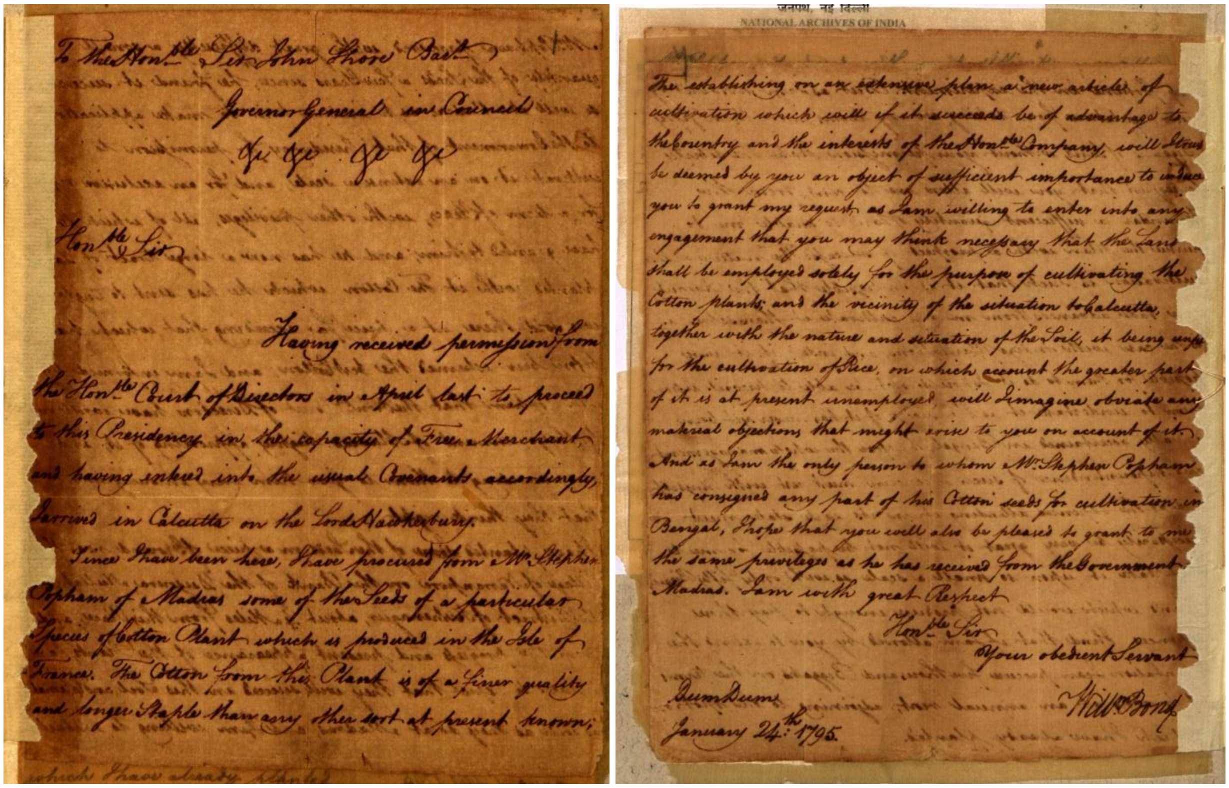
To The Hon.ble Sir John Shore Bart.
Governor General in Council
&c &c &c &c

Hon.ble Sir

Having received permission from the Hon.ble Court of Directors in April last to proceed to this Presidency in the capacity of Free Merchant and having entered into the usual Covenants accordingly, I arrived in Calcutta on the Lord Hawkesbury.

Since I have been here, I have procured from Mr. Stephen Popham of Madras some of the Seeds of a particular Species of Cotton Plant which is produced in the Isle of France. The Cotton from this Plant is of a finer quality and longer Staple than any other sort at present known;

The establishing on an extensive plan a new article of cultivation which will if it succeeds be of advantage to the Country and the interests of the Hon.ble Company, will I trust be deemed by you an object of sufficient importance to induce you to grant my request, as I am willing to enter into any engagement that you may think necessary that the Land shall be employed solely for the purpose of cultivating the Cotton plants; and the vicinity of the situation to Calcutta, together with the nature and situation of the Soil, it being unfit for the cultivation of Rice, on which account the greater part of it is at present unemployed, will I imagine obviate any material objections that might arise to you on account of it. And as I am the only person to whom Mr. Stephen Popham has consigned any part of his Cotton seeds for cultivation in Bengal, I hope that you will also be pleased to grant to me the same privileges as he has received from the Government Madras. I am with great Respect

Hon.ble Sir
Your obedient Servant
Will. Bond

Dum Dum
January 24th 1795.

ছবি ২.৫: বাংলার দমদমে নতুন প্রজাতির কটন চাষের প্রাথমিক উদ্যোগ বিষয়ক পত্রের প্রথম ও শেষ পাতা (Letter from Mr. W. Bond, Home Department, Public Branch, 26th January 1795, National Archive of India, New Delhi)।

-ণ্ডে কটন মিলের বিস্তার সে হারে হয়নি, অন্যদিকে নিজেদের কটন মিলের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বাঁধা-বাজার হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কটন-ক্ষেত্রগুলি কার্যকরী ছিল। তাই ভারতে যে কজন ইংরেজ তবুও নতুন জাতের কটন বীজ চাষ করেছেন, তাঁরা মূলত শখের বশেই তা করেছেন বলা যায় (ছবি ২.৫ দ্রষ্টব্য)।[106] সেই চাষের মধ্যে এদেশীয় কটন চাষের সংস্কৃতিকে নিজেদের লাভের অনুবর্তী করবার উনবিংশ শতকের ষাটের দশকের তাগিদটা সচল ছিল না।

কিন্তু উনিশ শতকের ষাটের দশকে ভারতে কটন চাষের ক্ষেত্রে উক্ত তাগিদটা পুরোমাত্রায় সচল হয়ে ওঠে। তাই ভারতে কটনের চাষ-সংস্কৃতিকে সুসংবদ্ধকরণের জন্য সরকারি তরফে 'Requisitions for Improvements of Indian Cotton' নামক শ্বেতপত্রও প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, এতদিন ভারতীয় কটন ব্রিটেনের বাজারে আমেরিকান কটনের যুযুধান হতে পারেনি

[106] Letter from Mr. W. Bond, narrating the success attending the cultivation of a new species of cotton under the patronage of the Madras Government by Mr. S. Popham, and requesting to be granted similar concessions for the cultivation of the same species of cotton in Bengal, Proceeding No. 9, Home Department, Public Branch, 26th January 1795, National Archive of India, New Delhi.

কারণ ভারতে কটনের বিজ্ঞানসম্মত চাষের অনুপস্থিতি। আর সেই বিজ্ঞানসম্মত চাষের অনুপস্থিতির কারণেই ভারতের কটন তন্তু আমেরিকার কটন তন্তুর চাইতে দৈর্ঘ্যে ছোটো বলে রিপোর্টে উল্লেখ।[107] তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল উনিশ শতকের ষাটের দশকে পূর্ব ভারতে কটন-ক্ষেত্রের বিকাশে দেশীয় প্রজাতির কটনের বৈজ্ঞানিক চাষের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, নিউ অরলেন্সের মতো আমেরিকান কটনের চাষে ঝোঁক সৃষ্টির প্রবণতাটি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তবে একদম ছিল না সেটা বলা যাবে না। এই কটন চাষে ইচ্ছুক নেটিভ রায়ত ও ফড়েদের কাছে বীজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বোম্বের Messrs Peel, Cassels & Company, কলকাতার Mosley & Hurst এবং মাদ্রাজের Messrs Line & Company'দের উপর সরকারি তরফে দায়িত্বও ন্যস্ত হয়েছিল।[108] কিন্তু বিদেশি প্রকৃতির কটন বীজ চাষের চাইতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় প্রজাতির বীজের 'বিজ্ঞানসম্মত' চাষে উৎসাহিত করবার ঝোঁকটাই ছিল বেশি।[109] মধ্যপ্রদেশের কটন কমিশনার এইচ. কারনাক বাংলার বর্ধমান, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, দার্জিলিঙে হিঙ্গুনঘাট কটনের চাষ বেড়েছে বলে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছিলেন।[110] তাছাড়া দার্জিলিঙের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াকে ব্যবহার করে, সেখানে 'বিজ্ঞানভিত্তিক' দেশী কার্পাস ফার্ম গড়ে তোলারও স্বপ্ন দেখেছিলেন, দার্জিলিঙে কার্পাস-ক্ষেত্র সৃষ্টির উদ্যোগের অন্যতম পুরোধা জে. টি, ন্যাস।[111] সেখানে স্থানীয় মেচদের শ্রমকে ব্যবহার করে Botanical Gardens'এর সুপারিনটেন্ডেন্ট ড. আণ্ডারসন-এর তত্ত্বাবধানে কটন উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা হবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়।[112] এমনকি কটন-ক্ষেত্রের আশেপাশে স্থায়ী বসতি সৃষ্টির জন্য উকিল, মোক্তার, আমলা শ্রেণীর ব্যক্তিদের জমি লিজ দেওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া শুরু হয় এবং বণ্ড টাইডধারীদের কাছ থেকে জমি কিনতে উৎসাহ দেওয়া হয়। কারণ ঝুম চাষের মধ্য দিয়ে পাহাড়িরা যে স্থানান্তর কৃষি

---

[107] Requisitions for Improvement of Indian Cotton, Proceeding No. 51, Revenue Department, Land Revenue Branch, 30th July 1862, West Bengal State Archives, Kolkata.

[108] From – J. Geoghegen, Esq., Under Secretary to the Government of Bengal, To – the Commissioner of Patna, Bhagulpur, Rajsahye, Dacca, Chittagong, Nuddea, Burdwan, Cuttack, Assam & Chota Nagpur, the Superintendent of Darjeeling and Cachar, Proceeding No. 1, Revenue Department, Land Revenue Branch, 5th August 1862, West Bengal State Archives, Kolkata.

[109] From – C. E. Montresor, Esq., Commissioner of Burdwan Division, To – the Officiating Secretary to the Government of Bengal, Proceeding No. 4, 36 Revenue Department, Land Revenue Branch, 15th January 1868, West Bengal State Archives, Kolkata; From – H.L. Harrison, Esq., Junior Secretary to the Government of Bengal, To – the Cotton Commissioner of the Central Provinces & Berars, Proceeding No. 5, Revenue Department, Land Revenue Branch, 1st February 1868, West Bengal State Archivesw, Kolkata.

[110] From – H. Rivtt-Carnac, Esq., Cotton Commissioner for the Central Provinces, To – the Under Secretary to the Government of Bengal, Proceeding No. 21, Revenue Department, Land Revenue Branch, 15th February 1868, West Bengal State Archives, Kolkata; Memorandum from F. B. Simson, Esq., Officiating Commissioner of the Dacca Division, Proceeding No. 76, Revenue Department, Land Revenue Branch, 14th February 1868, West Bengal State Archives, Kolkata; From – F. B. Simson, Esq., Officiating Commissioner of the Dacca Division, To – the Secretary to the Board of Revenue of Lower Provinces, Proceeding No. 77, Revenue Department, Land Revenue Branch, 14th February 1868, West Bengal State Archives, Kolkata; From – Captain B. W. Morton, Deputy Commissioner of Darjeeling, To – the Commissioner of the Coch Behar Division, Proceeding No. 33, Revenue Department, Land Revenue Branch, 7th February, West Bengal State Archives, Kolkata.

[111] Extract from a Lette, dated 8th February 1868, From – J. T. Nash at Darjeeling, Proceeding No. 70, Revenue Department, Land Revenue Branch, 24th March 1868, West Bengal State Archives, Kolkata.

[112] From – Colonel J.C. Haughton, C.S.I., Commissioner of the Cooch Behar, To – the Secretary to the Government of Bengal, Proceeding No. 69, Revenue Department, Land Revenue Branch, 24th March 1868.

করতেন, তা কোচবিহারের কার্যনির্বাহী কমিশনার সি. টি. মেটকাফ-এর কাছে অসংগঠিত এবং কটন-সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে অনুপযুক্ত ঠেকেছিল।[113] অর্থাৎ উপনিবেশিক সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়েও সংগঠিতভাবে কার্পাস চাষ করে শাসন-কেন্দ্রের (core) কটননির্ভর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে পূর্ব ভারতে কটন-সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে সমূহ আলাপ-চারিতা ও উদ্যোগের কেন্দ্রে ছিল হিঙ্গুনঘাট কটন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভারতীয় প্রজাতির কটনের চাইতে যেখানে আমেরিকান প্রজাতির কটন বিভিন্ন রিপোর্টে লাভজনক হিসেবে উঠে এসেছিল, তবু পূর্ব ভারতে পরীক্ষণমূলক কটন-ক্ষেত্রের বিকাশে দেশীয় প্রজাতির কটন বীজের উপরই কেন গুরুত্ব দেওয়া হল। এর পশ্চাদে কয়েকটি কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, নিউ অরলেন্স বা ইজিপ্টিয়ান প্রভৃতি প্রজাতির বিদেশি কটন ভারতে আমদানি করে বিস্তৃত কটন-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেও ভারতের আবহাওয়া ও জলবায়ুতে এসব কটন বীজ কতটুকু লাভের মুখ দেখাবে – এই বিষয়েও একটা প্রশ্ন ঔপনিবেশিকদের মনে ছিল। তাই দেশীয় কটনের মধ্যে ভালো প্রজাতি নির্ণয় করে – সেই প্রজাতির কটন ফলিয়ে নিজেদের লাভের পথকে সুগম রাখার তাগিদটাই উনিশ শতকের ষাটের দশকে অর্থাৎ "high imperialism"এর কালে উপনিবেশিকদের মধ্যে বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। সেই লাভের বাসনা থেকেই তারা সংশোধনাগারের মাঠ এবং সেখানকার বন্দিদের শ্রমকেও পরীক্ষণমূলক কটন চাষে ব্যবহার করতে শুরু করেন।[114]

তবে ১৮৬০-৭০ এর দশকে এই পরীক্ষণমূলক কটন-ক্ষেত্রের ফলাফল নিয়েও ঔপনিবেশিক প্রশাসন সজাগ ছিলেন। ১৮৬৮ সালেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পরীক্ষণমূলক কটন-ক্ষেত্রের হালহকিকত নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক কমিশনাররা ঔপনিবেশিক সরকারের রাজস্ব বিভাগে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালের ১৯শে নভেম্বর সে রিপোর্ট সরকারি গেজেটে প্রকাশ পায়। লোয়ার প্রভিন্সের বোর্ড অব রেভেনিউর কার্যনির্বাহী সেক্রেটারি টি. বি. লেন বেঙ্গল সেক্রেটারিকে ১৮৬৯ সালের ৫ই নভেম্বর জানান, বাংলার বেশিরভাগ অঞ্চলে হিঙ্গুনঘাট কটনের চাষ ব্যর্থ হয়েছে। শাহবাদ, তেহট্ট, বাঁকুড়া, সিংভূম ও বারাসাতের মতো অঞ্চলে পরীক্ষণমূলক চাষকে সফল বলে বর্ণনা করা হলেও – সেই সাফল্য বাণিজ্যিক লাভের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।[115] কিন্তু তবু ভবিষ্যতে বাংলায় এই প্রজাতিটির চাষ নিয়ে তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। কারণ পরীক্ষণমূলক চাষের মধ্য দিয়ে স্থানীয় অফিসার ও কৃষকদের মধ্যে এ বীজ চাষের নিয়মাবলী পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই ভবিষ্যতে ভুল-ত্রুটি শুধরে আরও সফল ফলন বাংলাতে সম্ভব বলে

---

[113] From – C.T. Metcalf, Esq., Officiating Commissioner of the Cooch Behar Division, To- the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, Revenue Department, Agricultural Branch 1861-1908A, West Bengal State Archives, Kolkata; From – J. Geoghegan, Esq., Officiating Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, To – the Secretary to the Government of Bengal, Revenue Department Agricultural Branch 1861-1908A, West Bengal State Archives, Kolkata.

[114] From – Collector, Bancootah, To – Commissioner of Burdwan, No. 292, dated 4th June 1869, From Abstract of Reports on the Cultivation of Hingunghat Cotton in Bengal for Season of 1868, Revenue Department Agricultural Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

[115] From – Collector, Barasat, To – Commissioner, Presidency, No. 867, dated 5th March 1869, From Abstract of Reports on the Cultivation of Hingunghat Cotton in Bengal for Season of 1868, Revenue Department Agricultural Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

তাঁর অভিমত।[116] পালামৌর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মি. ফোর্বসের রিপোর্টে পরীক্ষণমূলক চাষের ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে শুধরে কি কি সচেতনতার সাথে ভবিষ্যতে হিঙ্গুনঘাটের বীজ ফলাতে হবে – তার পরামর্শও আমরা দেখতে পাই।[117] অনেক জায়গায় হিঙ্গুনঘাটের তুলনায় বিদেশি প্রজাতির কটনের ভালো ফলনের কথাও আমরা জানতে পারি। তিরহুটে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হিঙ্গুনঘাটের চাষ করা মিস্টার টুইডাই-এরও মতামত ছিল তাই। কিন্তু তিনি এটা জানাতেও ভোলেননি – তাঁর উদ্যোগে চাষ হওয়া আমেরিকান কটন হিঙ্গুনঘাটের চাইতে অনেক বেশি উন্নত ছিল।[118]

এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশদে পরীক্ষণমূলক চাষ সংস্কৃতি আলোচনা নয়। তাই প্রশ্ন জাগতে পারে, বাংলা দেশের পারিচ্ছদিক রুচির বিশ্বে পরিবর্তনের সাথে এই পরীক্ষণমূলক চাষের সম্বন্ধ কোথায়! শুধুমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ এবং সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রকলে তুলো রপ্তানির হার কমে যাওয়া বা ১৮৫৭ সালে ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত নানা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মহাবিদ্রোহের পর ভারতকে সাম্রাজ্যিক উন্নতির বিশ্বে হাজির করবার ঔপনিবেশিক তাগিদকে শুধু মাথায় রেখে এই পরীক্ষণমূলক চাষকে ব্যাখ্যা করলে – ব্যাখ্যাটি একপাক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। আমার মনে হয়, ভারতবাসীর মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের বোণা কাপড় পরবার প্রবণতা যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার পিছনে ম্যাঞ্চেস্টার বস্ত্রের কম দামই শুধু দায়ী ছিল না। বিদেশি মিলের তৈরি কাপড় পরে, নিজেদের সামাজিক অবস্থান জানান দেওয়ার হিড়িকও এই বস্ত্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হয়, যেকোনো মোহ ততদিনই স্থায়িত্ব পায়, যতদিন না পর্যন্ত সত্যটি চোখের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছে। ভারত কেবলমাত্র ব্রিটেনের মিলের তৈরি বস্ত্রের বাজার ভিন্ন অন্য কিছু নয় – এই সত্যটি যদি ধীরে ধীরে এদেশের পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ও যুক্তি-বুদ্ধির সংস্পর্শে আসা মধ্যবিত্তের সামনে প্রকট হতে শুরু করত, তবে বিলিতি বাজারের প্রতি তাদের মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগত না। আর সংগঠিত শোষণের বলি একদম নিচুতলার মানুষের রাগ-ক্ষোভের সাথে এই মোহভঙ্গের তাড়নার একত্রিত হতেও বেশি সময় লাগত না। আমেরিকায় গণযুদ্ধের ফলে বিলিতি মিলে কাঁচামালের সংকট এবং ভারতে মহাবিদ্রোহে নানাশ্রেণির ভারতবাসীর ব্রিটিশদের প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ তাই ভারতের মাটিতে বিলিতি তুলো চাষে বিলিতি উদ্যোগের আবাদ করতে সাহায্য করেছে। যার মধ্য দিয়ে এদেশীয় বস্ত্রের বিশ্বায়িত বস্ত্রবাজারে পিছিয়ে পড়ার কারণটা যেমন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি নিজেদের প্রগতির ধারক হিসেবে তুলে ধরার প্রক্রিয়া অন্তঃসলিলা হয়ে থেকেছে। বিশ্বের বস্ত্রবাজারে বাংলা তথা ভারতের পিছিয়ে পড়ার যে কারণটি বারংবার দর্শানো হয়েছে, তা হল – এদেশের অবৈজ্ঞানিক তুলো-চাষ সংস্কৃতি। অর্থাৎ ভারতের বাজারে বিলিতি কাপড়ের বাড়বাড়ন্তকে বিশ্বায়িত বস্ত্রবাণিজ্যে প্রতিযোগিতার নিরিখে উপযুক্ত হিসেবে দেখানো শুরু হয়েছিল। যার মূল কারণ হল, বস্ত্র

---

[116] From- T.B. Lane, Esq., Officiating Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, To – the Secretary to the Government of Bengal, N0. 4952c, dated Fort William, 5th November 1869, Revenue Department, Agricultural Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

[117] From – Mr. Forbes, Assistant Commissioner, Palamow, To – Commissioner Chota Nagpore, No. 1488, dated 25th May 1869, From Abstract of Reports on the Cultivation of Hingunghat Cotton in Bengal for Season of 1868, Revenue Department Agricultural Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

[118] From – Mr. Tweedie, Tirhoot, To – Commissioner of Patna, No. 280, dated 10th June, from Abstract of Reports on the Cultivation of Hingunghat Cotton in Bengal for Season of 1868, Revenue Department, Agricultural Branch, WBSA, Kolkata.

উৎপাদনে তাদের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির অনুসরণ। আর ভারতের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ হল, ভারতের বস্ত্র উৎপাদনে সংগঠিত প্রক্রিয়া ও বৈজ্ঞানিকতার অভাব। ১৮৫৭ সালের পর, ভারতকেও সেই বস্ত্র-উৎপাদনের তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত পথে সামিল করার প্রথম ধাপে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত চাষ-সংস্কৃতিতে সামিল করবার মধ্য দিয়ে, ঔপনিবেশিকরা মহাবিদ্রোহের পর নিজেদের প্রজাপালক ও উপনিবেশের অগ্রগতিতে সদিচ্ছুক রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ভারতে পরীক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক চাষ সংস্কৃতির মাধ্যমে বিলিতি বস্ত্র এদেশীয় বস্ত্র বাজারকে নষ্ট করেছে – এই অভিযোগের ধুয়ো উঠে যাতে ভারতে নতুন কোনো অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি না হয়, সেই দিকটাও যে তাদের মধ্যে অন্তঃসলিলা থাকেনি তা বলা যাবে না। ঠিক এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই ঔপনিবেশিকরা বাংলা দেশের সিল্কের চাষ-সংস্কৃতির দিকেও নজ র দিতে শুরু করেন।

ঔপনিবেশিক প্রগতি তত্ত্ব, সিল্ক সংস্কৃতি এবং মহাবিদ্রোহ পরবর্তী বিলিতি উদ্যোগের অপর ভিত্তি

সিল্ক উৎপাদনের সাথে চিনের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকলেও, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতে কটন সংস্কৃতির পাশাপাশি সিল্ক সংস্কৃতিও সমানভাবে চলমান ছিল।[119] এই ঐতিহ্যের বিষয়ে অবগত করতে ঔপনিবেশিক ভারতের সিভিল সার্ভেন্ট এন জি মুখার্জী ১৯০৩ সালে Silk Fabrics of Bengal-এ ঋক বেদের শ্লোকাংশ – "ক্ষৌমে বসনে বাসনা-মগ্নে-মাধ্যেযতাম" -- উল্লেখ করেছেন।[120] পরবর্তীতে রামায়ণ এবং মহাভারতেও সিল্ক বস্ত্র বুননের নানা উল্লেখ পাওয়া যায়।[121] যেখান থেকে বোঝা যায় বৈদিক কাল থেকেই আনুষ্ঠানিকতায় ক্ষৌম বস্ত্র পরিধাণের একটা বিধান ছিল। কিন্তু সেই ক্ষৌম-বস্ত্র বা সিল্ক-বস্ত্রকে শুদ্ধির বিচারে অবশ্যই খাঁটি হতে হত। মিশ্র-তন্তুর ক্ষৌম-বস্ত্র হিন্দু আনুষ্ঠানিকতায় "অশুদ্ধ" হিসেবে গণ্য হত। যদিও মুসলিম শাসনামলে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র-তন্তুর সিল্কের চল ছিল বেশি। কারণ মুসলিম পুরুষদের কাছে খাঁটি সিল্কের পোশাক পরা 'হারাম'। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলে, মিশ্র জাতীয় সিল্কের দাম কম হওয়ায়, তা সমাজের বিরাট সংখ্যক সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঝিনরু লিউ দেখিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের কালে, উপনিবেশিকরা বিশ্ববাজারে নিজেদের 'লাক্সারি' পণ্যের বাজারকে আরও সুগঠিত করবার লক্ষ্যে চার্চে সুরক্ষিত প্রাচীন সিল্ককেও বাণিজ্যিক উপায়ে সিল্ক বানানোর তাগিদে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বার করে আনেন।[122] যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর মেশিনজাত সিল্ক ভারতের মতো উপনিবেশে বাজার তৈরি করতে

---

119 Xinru Liu, 'The Silk Road in World History', (Oxford, New York: Oxford University Press, 2010); James A. Millword, 'The Silk Road: A Very Short Introduction', (Oxford, New York: Oxford University Press, 2013); Cheryl Kolander, 'A Silkworker's Notebook', (Colorado: Interweave Press, Interweave Press, 1985).

120 । N. G. Mukerji, 'The Silk Fabrics of Bengal', (Calcutta: Printed in Bengal Secretariat Press, 1903), p. i.
পি কে মোহান্তি শাস্ত্রে সিল্কের গুরুত্ব বোঝাতে লিখেছিলেন, 'silk sumbolises peace,/ silk stands for truth,/ silk stands for goodness …/ silk stands for fairness…'; P.K. Mohanty, 'Tropical Tasar Culture in India', (Delhi: Daya Publishing House, 1998), p. 2.

121 Cheryl Kolander, 'A Silkworker's Notebook'.

122 Xinru Liu, 'Silk and Religion: A Exploration of Material Life and the Thought of People', (New Delhi: Oxford University Press, 1996), P. 3.

পেরেছিল। তবে ভারতের সিল্ক উৎপাদন ক্ষেত্রের সাথে ব্রিটেনের লড়াই করা যে কঠিন ছিল – তা ঔপনিবেশিক ভারতের সিভিল সার্ভেন্ট এন জি মুখার্জীর মতো ব্যক্তিত্বরা অস্বীকার করেননি। কারণ রেশম পোকা চাষ ও প্রতিপালনে ইংল্যাণ্ড তেমন কোনো দিশা দেখাতে পারেনি। তাই ইংল্যাণ্ডের মিলকে সিল্ক উৎপাদনে কাঁচামালের জন্য চিন, ভারতের মতো উপনিবেশ এবং জাপান ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলির উপর নির্ভর করতে হত। ১৯৭০ এর দশকে ভারতবর্ষে সিল্ক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

> রোমান সাম্রাজ্য ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর ভারতবর্ষের সাথে তার সরল যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সিল্কের কদর তখন ইউরোপে প্রবল। তার সুযোগ নিয়ে পারস্য ভারতবর্ষের সিল্ক খুব চড়া দামে বিক্রি করতে শুরু করল, চতুর্থ শতকে রোমান রাজা কন্সটান্টাইনের কাছে। কন্সটান্টাইনের ইচ্ছা হল সিল্ক তৈরির কায়দাটা আয়ত্ত করার। তিনি ভারতবর্ষে দুজন পাদ্রী পাঠিয়ে দিলেন। তারা সিল্কের পোকা থেকে কী করে সুতো তৈরি করতে হয় ও সে সুতোয় কী করে কাপড় বোণে, তা শিখে পরে গেল চিনে। চিন থেকে আসার সময় তারা নিয়ে এল কিছু পোকা বাঁশের চুঙ্গিতে ভরে। তারপর তারা সোজা দেশে পাড়ি দিল। এরফলে ভূমধ্যসাগরের কোনো কোনো দ্বীপে ছোটোখাটো সিল্কের কারখানা গড়ে উঠেছিল। তবে মোটামুটি এ উদ্যোগ সফল হয়নি। [123]

মূলত শীতল, সোঁদা আবহাওয়া এবং অধিক উৎপাদন মূল্যের জন্য ইংল্যাণ্ডের মতন ইউরোপ মহাদেশীয় অঞ্চলে সিল্ক চাষ বাণিজ্যিক লাভের মুখ দেখেনি। তবে সিল্ক বস্ত্র বুননে ইংল্যাণ্ডের কিছু অঞ্চল বেশ নৈপুণ্যের দাবি রাখে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে ম্যাক্লেসফিল্ড এবং স্পিটাসফিল্ডের নাম করতে হয়। ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত ফ্লেমিশ এবং ফরাসি তাঁতিরা ষষ্ঠদশ-সপ্তদশ শতকে এই তাঁত-অঞ্চলসমূহের বিকাশ ঘটান।[124] কিন্তু এসব অঞ্চলে বাইরে থেকে কাঁচামাল এনে সিল্ক বস্ত্র প্রস্তুত হত। নিজস্ব কোনো উল্লেখযোগ্য সিল্ক উৎপাদন ক্ষেত্র ব্রিটেনে গড়ে ওঠেনি। সেকারণে বিশ্বায়িত বস্ত্র বাজারে নিজেদের লাক্সারি সিল্কের বাজার ধরে রাখতে ব্রিটেন এশীয় দেশসমূহের সিল্ক উৎপাদন নিয়ে ভাবিত ছিল। তাই এন. জি. মুখার্জীর মতে উনিশ শতকে ভারতে সিল্ক চাষে আগের তুলনায় তেমন অবনমন না ঘটলেও, বিশ্বায়িত বাণিজ্যের যুগে ব্রিটেনের কাছে ভারতের ওই সিল্ক চাষকে নিজেদের বাণিজ্যিক ফায়দা তোলার পক্ষে বেশ অপ্রতুল ঠেকেছিল।[125] শুধু এন. জি. মুখার্জীই নন, খোদ ব্রিটিশরাই বাংলা দেশে সিল্ক চাষের বৈচিত্র্য নিয়ে লিখেছিলেন। যেমন, ড. এ. ক্যাম্পবেল নিজের ভারতবর্ষে থাকার ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন, বাংলা দেশে প্রভূত পরিমাণে সিল্ক উৎপাদন হত। একধরণের বন্য রেশম পোকা (নামোল্লেখ করেননি) ছিল যেখান থেকে খসখসে প্রকৃতির রেশম সুতো পাওয়া যেত। রেড়ির (যা থেকে রেড়ির তেল তোলা হয়) বাগানে আরেক ধরণের রেশম চাষ হত, যে রেশম থেকে পাওয়া সুতোর বস্ত্রকে তিনি ‘মনোমুগ্ধকর’ বলেছেন। যদিও সেই সুতো ভারী ধরণের হওয়ার দরুণ এর কাপড় পরা বাংলার অধিবাসীদের পক্ষে সম্ভব হত না। তাই এই সুতো

---

[123] সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা’, (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)।

[124] Cheryl Kolander, ‘A Silkworker’s Notebook’, p. 5.

[125] N. G. Mukerji, ‘The Silk Fabrics of Bengal’, p. i.

পাহাড়ি অঞ্চলে, তিব্বতের ভূসীমানার বাইরে চলে যেত। তাঁর মতে, বাংলায় এই ধরণের রেশম চাষে প্রাধ্যান্য দেওয়া উচিত। কারণ এই সুতোর কাপড় ইউরোপের শীতপ্রধাণ অঞ্চলে বাজার তৈরি করতে পারে।[126] ১৮৬০-এর দশকের শেষের দিকে 'Journal of Commerce'-এর 'Silk Supply Association' সংক্রান্ত রিপোর্টে ডেভিড স্যাডুইক ব্রিটেনের মিলে সিল্ক আমদানির ওঠাপড়ার খতিয়ান দিয়েছেন। ১৮৬৬ সালে সেখানে ৯,২০০,০০০ এল বি এস (lbs) সিল্ক তন্তু আমদানি হত বিভিন্ন দেশ থেকে। ১৮৬৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৫,৮০০,০০০ এল বি এস (lbs)। ১৮৬৮ সালে তা খানিক বেড়ে হয় ৬,৮০০,০০০ এল বি এস (lbs) । আমদানির হারে এরূপ ওঠাপড়ার পিছনে তিনি ৪০% থেকে ১০০% হারে রেশম তন্তুর দাম বেড়ে যাওয়াকেই শুধু দায়ী করেননি, তার সাথে সাথে ইউরোপীয় রেশম উৎপাদী মুষ্টিমেয় (ফ্রান্সের মতন) দেশগুলোতে রেশম পোকার বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, চিন ও জাপানে রাজনৈতিক চাপান-উতোরকেও দায়ী করেছেন।[127]

সুতরাং এই ওঠাপড়ার সাথে বাণিজ্যিকভাবে যুঝতে ইংল্যাণ্ডের তরফে ভারতের সিল্ক কালচারের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। যেটা আমরা হিঙ্গুনঘাট কটন চাষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছিলাম। ভারতের সিল্ক সংস্কৃতিকে নিজেদের বাণিজ্যিক লাভের অনুগত করে তুলতেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের মহাবিদ্রোহ পরবর্তী বহুল আলোচিত এবং বহুপ্রযোজ্য প্রগতির তত্ত্বটি এক্ষেত্রেও উঠে এসেছিল। যে তত্ত্বানুসারে সিল্ক চাষের ক্ষেত্রেও ভারতে যে পরিকাঠামো বিদ্যমান, তা বিশ্ববাজারের সাথে টক্কর দেওয়ার উপযুক্ত নয়। এককথায় বিশ্বমানের নয়। তাই ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে হিঙ্গুনঘাট কটনের পরীক্ষণমূলক চাষে ব্যর্থতার বিষয়ে রিপোর্ট জমা হওয়ার কিছু মাস আগে ভারতে "সংগঠিত" ও "সুশৃঙ্খলাবদ্ধ" সিল্ক চাষের উদ্দেশ্যে 'Cotton Supply Associastion'-এর আদলে 'Silk Supply Association' তৈরির লক্ষ্যে লণ্ডনের গ্রোসাম স্ট্রিটের Stubbs Mercantile Agency-তে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যার মূল কথাই হল, সিল্ক চাষকে অন্যান্য চাষের সাথে (যেমন তুঁত চাষ) যুক্ত করে Cottage Cultiuvation-এ পরিণত করা। তার সাথে সাথে বিভিন্ন জাতের রেশম পোকার সংকরায়ন করে ডিম নিষিক্ত করার মধ্য দিয়ে রেশম চাষে উন্নতি ঘটানো। রেশম চাষীদের চাষের খুঁটিনাটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রদানের জন্য সরকারি উপদেষ্টা নিয়োগ। তাছাড়া এই রেশম চাষে জোর দেওয়ার পশ্চাতে ব্রি্টেনের উদ্দেশ্যকে ধরিয়ে দিয়ে স্যাডুইক বলেছেন – সিল্ক উৎপাদনেও ভারতের স্বার্থকে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের সঙ্গে একত্রিত করতে হবে। আর সেই একত্রকরণের জন্য যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্রিটেনকে করতে হবে। কারণ মহাবিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ব্রিটেনের মূল উদ্দেশ্য উপনিবেশের স্বার্থকে নিজেদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সাথে একত্রিত করা। তাই সিল্ক উৎপাদনে ভারতের সমৃদ্ধি বাণিজ্যিক চাহিদার সমানুপাতিক কেন নয় – এর উত্তরে বলা হয়েছে, ভারতে রেশম চাষের সাথে নানারকমের সামাজিক ট্যাবু জড়িয়ে আছে। কটন চাষের মতো রেশম চাষও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে সামাজিক কৌলিন্যের হন্তারক। তাই তাঁর মত, মুসলিমদের মধ্যে রেশম চাষকে আরও ছড়িয়ে

[126] 'Silk Supply Association', from *The Journal of the Chamber of Commerce,* March 1869, Financial Department Commerce Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

[127] From – P. L. Simmonds, Esq., Honorary Secretary, Silk Supply Association, To – His Grace, The Duke of Aryyll, Secretary of State of India, dated Holborn, London, E.C., the 8th March 1869, Financial Department Commerce Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

দিতে হবে, যাতে তাদের পর্দানশীন মেয়ে-বৌদেরও এই কাজে নামিয়ে এনে তাদের শ্রমকে কাজে লাগানো যায়। তাঁর মতে, এতে দারিদ্র্য কবলিত মুসলিম সমাজে সংগঠিত লাভের পথ তৈরি হবে এবং ভারতের রেশম উৎপাদনের বাণিজ্যিক দিশা উন্মোচিত হবে।[128]

তার সাথে বাংলায় পূর্বেকার হারিয়ে যাওয়া উল্লেখযোগ্য রেশম সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করে নিজেদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কাজে লাগানোর কথাও বলা হয়। জর্জ বার্ডউড 'Industrial Arts of India'-তে লিখেছিলেন, বাংলায় পূর্বে যে হারে রেশম উৎপন্ন হত, তার পরিমাণ বর্ধমান ও রাজশাহীর মতো অঞ্চলে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল। ফলে পূর্বেকার মতো ন্যায্যমূল্যে বাংলার সিল্ক আর পাওয়া যাচ্ছিল না। রপ্তানির হারও তাই কমে যাচ্ছিল। তবে তিনি সংগঠিত রেশম চাষে ইউরোপীয় উদ্যোগ দেখে পূর্বেকার রেশমের ঐতিহ্য পুনঃবহাল হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখছেন, ইউরোপীয় একটি উৎপাদক গোষ্ঠী ১৮৭০ এর দশকে মি ওয়ার্ডেল অব লিকের তত্ত্বাবধানে মালদা, বগুরা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী অঞ্চলে বন্য তসর গুটির চাষ শুরু করেছিল। যার চাহিদা একসময় সুদূর রাশিয়াতেও ছিল। ১৫২৭ সালের দিকে মুর্শিদাবাদের "মাজছর" (রূপোর তরঙ্গ), "বুলবুলচশম" (বুলবুলের চোখ), "কালিন্তরক্ষী" (পায়রার চোখ) এবং "চাঁদ তারা" প্রভৃতি নামের কাপড় পার্সিয়ান গলফ হয়ে রাশিয়াতেও চলে যেত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি যে সময়ে মুর্শিদাবাদী সিল্কের অতীত ঐতিহ্যের কথা বলছেন, সেসময় সোনার ব্রোকেড দেওয়া কিংখাব, "ময়ূর গলা" ও "ধূপচান" এর জন্যও এর বেশ নাম ছিল।[129] কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বিলিতি মিলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে মুর্শিদাবাদী সিল্কের অবনমন ঘটতে থাকে। যদিও ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে কর্মরত দেশীয় আমলা এন জি মুখার্জী, সেই সিল্কের হারানো জৌলুসকে পুনরুদ্ধারকল্পে বিলিতি উদ্যোগের সুখ্যাতি করেছেন।

বিলিতি উদ্যোগের কথা যখন বলা হবে, তখন মাথায় রাখতে হবে, ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ে এদেশের বাজার ছেয়ে গেলেও, বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সিল্কের জায়গাটা ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় দখল নিতে পারেনি। বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ঘরের মেয়ে-বৌ এবং পুরুষ সদস্যদের যেকোনো আনুষ্ঠানাদিতে প্রথম পছন্দ ছিল বেনারসের সিল্ক। তাকে পবিত্র হিসেবেও মনে করা হত। মুখার্জী বলেন, বিলিতি উদ্যোগে বাংলায় রেশম চাষে গতি আসায়, বেনারসের সিল্ক বস্ত্র উতপাদনেও গতিসঞ্চার হয়। একই কথা বোম্বের ইউরোপীয় উদ্যোগে চলা সিল্ক ফ্যাক্টরিগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেখানে মূলত চিন থেকে রেশম তন্তু আমদানির মধ্য দিয়ে সিল্ক উৎপাদন চললেও বাংলার রেশম তন্তুও ওই অঞ্চলের সিল্ক উৎপাদনে রসদ জোগাত। আর ওই উৎপাদিত সিল্কের চাহিদা বাংলার মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট ভালো ছিল।[130] এই চাহিদাকে মাথায় রেখে ম্যানচেস্টারের কলগুলি লাক্সারি সিল্কের পাশাপাশি কৃত্রিম সিল্ক উৎপাদনেও হাত পাকিয়েছিল। তাই একসময় দেখা যাবে দেশীয় সিল্ক বেশি দামী ঐতিহ্যগত বস্ত্র হয়েই রয়ে যাবে। মানুষের প্রাত্যহিকতার দখল নেবে কলের তৈরি কৃত্রিম সিল্ক।

---

[128] 'Silk Supply Association' from *The Journal of the Chamber of Commerce* for March 1869, Financial Department Commerce Branch, West Bengal State Archives, Kolkata.

[129] George C. M. Birdwood, 'The Industrial Arts of India', (Henrietta Street, W.C. Chapman and Hall Ltd., 1880), pp. 275-276.

[130] N.G. Mukerji, 'The Silk Fabrics of Bengal', (Calcutta: Printed in Bengal Secretariate Press, 1903), p. i.

বাংলায় সিল্ক সংস্কৃতি নিয়ে উপনিবেশিকদের উদ্যোগ বিষয়ে মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজও নানান সাক্ষ্য রাখে। হিঙ্গুনঘাট কটন নিয়ে পরীক্ষণমূলক উদ্যোগের ঠিক এক দশকের মাথায় ১৮৭০ এর দশক থেকে বাংলার রেশম সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের হালহকিকত নিয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বর্দ্ধমান ডিভিশন, রাজশাহী ডিভিশন, প্রেসিডেন্সি ডিভিশন, চট্টগ্রাম ও ঢাকা ডিভিশন, আসাম, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের রেশম চাষ ও বাণিজ্যের খতিয়ান ১৮৭২ সালের ১৯শে এপ্রিল একটি সরকারি চিঠিতে উঠে আসে।[131]

বর্ধমান জেলার রেশম চাষের তেমন কোনো পূর্ব ইতিহাস সংক্রান্ত কাগজ-পত্র পাওয়া যায়নি বলে সেখানকার কালেক্টর উল্লেখ করেছেন। তবে কিনি কুলনা ও কাটোয়া অঞ্চলে সীমিত রেশম চাষ ও রেশম বাণিজ্যের কথা বলেছেন। যেখানে মোটামুটি ১০০ বিঘা জমিতে তুঁত চাষ নির্ভর গুটি প্রতিপালন চলত। সেই প্রতিপালনে ইউরোপীয় ও দেশী দুটি পদ্ধতিই অনুশীলিত হত। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশী পদ্ধতিতে রেশম গুটির উপর পেশাদারি নজর অনেকটাই কম নেওয়া হত। এই ১০০ বিঘা জমিতে উৎপাদিত রেশন দিয়ে বুদবুদ, সুন্দর, রানীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী গরদ সিল্ক বোনা হত। মেমারি, রাধাকান্তপুর, গাঙ্গুর থানার অন্তর্গত গন্টুরে অপেক্ষাকৃত ভালো মানের সিল্ক কাপড় বোনা হত। যেগুলির চল সমাজের উচ্চশ্রেণীদের মধ্যেই বেশি ছিল। তাছাড়া কাটোয়ার বাগটেকো অঞ্চলে বীরভূম অঞ্চল থেকে থেকে রেশম গুটি আনিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে তসর কাপড় বোনা হত। কিন্তু কালেক্টর বলেছেন, রেশম চাষের জন্য যে বন্ধুত্বপূর্ণ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়, তা ওই অঞ্চলে ছিল না। সে কারণে ওই অঞ্চলের রেশম চাষ তাঁর চোখে সফল ঠেকেনি। তাঁর সুপারিশ ছিল, রেশম গুটি পালন ও পরিচর্যার জন্য আরও সংগঠিত উন্নত ব্যবস্থা দরকার। সেকারণে সরকারকে উন্নতিকল্পে কিছু কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দেবার কথা তিনি বলেছেন। যার পেছনে আসলে দেশীয় শিল্পকে নিজেদের বাণিজ্যিক প্রকল্পের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার একটা নীরব উদ্দেশ্য কাজ করেছিল।[132]

অন্যদিকে বাঁকুড়ার কালেক্টরের রিপোর্টে তিনি গড়বেতা সাব-ডিভিশনের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে তুতিয়া[133] নামের এক শ্রেণি এবং কৈবর্তরা সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে রেশম চাষ করতেন এবং সিল্ক বুনতেন। ওই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই তুঁত-চাষ নির্ভর রেশম গুটি পালনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা রেশম পোকা ডিম দেওয়ার পর সেই ডিমগুলো মাটির হাঁড়িতে ভরে, হাঁড়িগুলোর মুখ ভালো করে বন্ধ করে ঘরের ভিতরে চালার সাথে বেশ কিছুদিন টাঙিয়ে রাখতেন। তারপর রেশনগুটিগুলি তারা হয় বিক্রি করতেন, নতুবা নিজেরাই সেদ্ধ করে গুটি থেকে রেশম তন্তু বার করে, সেই তন্তু দিয়ে সিল্কের সুতো কাটতেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই ঘরোয়া সিল্ক নাকি কখনো ভারতের বাইরে বাজার পায়নি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চাহিদাই বেশিরভাগ

---

[131] From – H. L. Dampier, Esq., Secretary to the Government of Bengal in the General Revenue, No. 1361, dated Calcutta, 19th April 1872, Revenue Department Agriculture Branch 1861-1908, WBSA, Kolkata.

[132] Letter from Collector of Burdwan, No. 633, dated 18th January 1872; Letter from Deputy Collector of Cutwa; Letter from Deputy Collector of Culna, No. 217, dated 15th January 1872; Commissioner of Burdwan Division, No. 181, 14th January 1872; Revenue Department Agriculture Branch, 1861-1908, WBSA, Kolkata.

[133] তুঁত চাষের সাথে যুক্ত বলেই মূলত তারা ‘তুতিয়া’ নামে পরিচিত ছিলেন।

সময় জুগিয়ে এসেছে। এই সুতো থেকে বোনা কাপড়কে রিপোর্টে 'বুণ্ড' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, এই একই রেশমগুটি ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে যখন সেখান থেকে 'বনক্ সিল্ক' বোনা হয়, সেই সিল্ক দেশীয় বুননের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর ও ভালো মানের হয়েছিল। অর্থাৎ ইংল্যান্ডে এই সিল্ক থেকে ভালো মানের কাপড় তৈরির কথা বলে, একে বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় হিসেবে তুলে ধরা হয়। বাঁকুড়ার কালেক্টর সবশেষে জানান, তাঁর জেলাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে রেশন পোকার প্রতিপালন হয় না। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল ও পার্শ্ববর্তী মানভূমের জঙ্গলে যে পরিমাণ তসর সিল্কের পোকা পাওয়া যায়, সেগুলো যদি ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিপালন করানো যায়, সেখান থেকেও লাভের ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদী। অবশ্য এহেন ব্যক্তিগত উদ্যোগের চাষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারি নিয়মাবলী মেনে চাষের উপর গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়।[134]

মেদিনীপুরের কালেক্টর জানিয়েছেন, তমলুকের মতো অঞ্চলে সেরিকালচারে দেশীয় চাষ-সংস্কৃতির সাথে সাথে ইউরোপীয় ফার্ম সংস্কৃতির অনুসরণও হয়েছিল। সেখানে তুঁত চাষনির্ভর রেশম চাষ এবং শুধুমাত্র রেশম পোকা প্রতিপালনের উপর নির্ভরশীল রেশনচাষ দুটোই একসাথে চলেছে। তমলুক সাব-ডিভিশনের ডেপুটি কালেক্টর বলেছেন, তাঁর অঞ্চলের পাঁচ হাজার বিঘা জমি চাষ হয়েছিল। সেই জমিতে তুঁত ও রেশম চাষ মিলিয়ে এক লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। সেখান থেকে লাভ পাওয়া যায় দু লক্ষ টাকা। তবে তাঁর অভিমত হল, শুধুমাত্র টাকা খরচ করলেই হবে না, ওই অঞ্চলের আবহাওয়ার বিচারে কোন রেশন গুটি চাষ ভালো, লাভের জন্য আরও উপযোগী সেগুলো বিচার করে চাষে মনোযোগ দেওয়ার কথা উঠে আসে।[135]

প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারও বারাসাত, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোহর অঞ্চলে রেশম চাষের হীনাবস্থা জানিয়ে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পূর্বে বারাসাতে যতটুকু রেশম উত্পাদন ও বাণিজ্য হত, তার সামান্যতমের অস্তিত্বও ১৮৭০-এর দশকে নেই। তবে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে বলা হয়, পানিহাটি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পানিহাটি অঞ্চলের রেশম চাষ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যশোহর ও নদীয়ার রেশম চাষ নিয়ে রিপোর্টে তেমন সদর্থক কিছু উল্লেখ করা হয়নি।[136]

রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনারের কাছে ওই ডিভিশনের অন্তর্গত বগুড়া, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর, নাটোর, ভবানীগঞ্জ প্রকৃতি অঞ্চলের কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টররা রেশম চাষের যে খতিয়ান তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটা ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছিল (যদিও এবিষয়ে বিশদে কিছু বলা হয়নি)। জঙ্গিপুরেও তেমনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফ্যাক্টরি তৈরি করেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। যে ফ্যাক্টরিতে মির্জাপুর থেকে রেশম-পোকা, এমনকী জাপানি রেশম-পোকা আনা হত। আবার

---

[134] Letter from Officiating Collector of Bancoorah, To – Commissioner of Burdwan Division, No. 1005, dated 12th December, 1871; Revenue Department Agriculture Branch, 1861-1908, WBSA, Kolkata.

[135] Letter from – Deputy Collector of Tumlook, To- Commissioner of Burdwan Division, No. 166, dated 19th January 1872; Revenue Department Agriculture Branch, 1861-1908, WBSA, Kolkata.

[136] Letter from – Sub-divisional Officer, Barasat, No. 19, dated 17th January 1872; Letter from – Officiating Collector of Nuddea, No. 2688, dated 5th March 1872; Letter from – Officiating Collector of Jessore, No. 412, dated 1st March 1872; Revenue Department Agriculture Branch, 1861-1908, WBSA, Kolkata.

নাটোরের রেশম চাষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, ওই অঞ্চলে 'পুরা' নামের একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল। যাদের মূল কাজ ছিল রেশম-পোকা প্রতিপালন করা। তবে বিগত কুড়ি বছরে সেই প্রতিপালনের সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে বসেছে বলে আক্ষেপ করা হয়। কারণ তুঁত চাষের অবস্থা ওই অঞ্চলে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই রিপোর্টটির বক্তব্য হল, ওই অঞ্চলের হারিয়ে যেতে বসা সিল্ক সংস্কৃতিকে যদি 'পুরা' শ্রেণীর উপর নির্ভর করে, আধুনিক স্কিলে তাদের প্রশিক্ষিত করে আবার উজ্জীবিত করা যায়, তবে সেই অঞ্চলের সেরিকালচারকে বাণিজ্যমুখীন করে তোলা সম্ভব।[137]

কোচবিহার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও তরাই সাব-ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার ও এক্সট্রা এসিস্ট্যান্ট কমিশনাররা বলেছেন, ওইসব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা আছে। জলপাইগুড়িতে যেমন, মেচী ও রাজবংশীরা তালগাছে রেশম-পোকা পালন করতেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ। দার্জিলিঙের তরাই-এ কিছু গোষ্ঠী রেড়ি বাগানে এণ্ডি নামক রেশম-পোকার চাষ করত। এই রেশম-পোকার থেকে উত্পন্ন রেশম তন্তু দিয়ে 'আই পাট্টানি' নামের কাপড় বোণা হত। তরাই সাব-ডিভিশনের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার বলছেন, সেখানকার মেচী ও আরও কিছু গরিব হিন্দু জনসাধারণের উদ্যোগে কমদামের কিছু রেশমি সুতো এবং রেশমের বাণিজ্য চলত।[138]

এছাড়া পূর্ব ভারতের চট্টগ্রাম, ঢাকা ডিভিশন, ভাগলপুর, পাটনা অঞ্চল, আসাম ডিভিশন, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টররা তাঁদের অঞ্চলে সিল্ক উৎপাদনের যে রিপোর্ট দেন, তার পরতে পরতে দেশীয় সিল্ক সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক বাজারে অবনমনের কারণ হিসেবে, তার চাষে সংঘটিত প্রকৃতির অভাবকে দায়ী করেছেন।

উপনিবেশিক তাগিদে দেশীয় সিল্ক সংস্কৃতির সংঘটিতকরণের কাজ শুরু হয় ১৮৯০-এর দশক থেকে। বর্ধমান ডিভিশনের অন্তর্গত কালনা সাব-ডিভিশনের হামেদপুর, গ্যাচে, পাঠানগ্রাম, খানপুর, হান্তারে, নাকদহ, হাপানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ওই সময় থেকে রেশম-পোকা প্রতিপালন শিল্প ও রেশম সুতো কাটার শিল্পের আরও বিকাশ ঘটতে শুরু করে। হিন্দু নিম্নবর্গের সদগোপ, চন্ডাল, গন্ধর্ববণিক, এবং মুসলমানরাও এই কাজে নিযুক্ত হতে থাকেন। উপনিবেশিক সরকারের প্রতিনিধি এন. জি. মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে পাটুলি এন্ট্রান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গৌরমোহন ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে সমাজের পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী থেকে এরকম তিন হাজার জন মানুষ রেশম-পোকা প্রতিপালন ও রেশম সুতো কাটার কাজে যোগদান করেন। যেহেতু এই অঞ্চলে কটন সংস্কৃতির বিকাশসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো সফল হয়নি, সেহেতু বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সরকার এই অঞ্চলে সিল্ক সংস্কৃতির বিকাশের গুরুত্ব দিয়েছিল।[139]

---

137 Letter from – Deputy Collector of City Moorshedabad, No. 150, dated 16th January 1872; From – Deputy Collector of Jungypore, No. 16, dated 22nd January 1872; From – Deputy Collector of Nattore, No. 166, dated 17th January 1872; To – Commissioner of Rajshahye; Revenue Department Agriculture Branch, 1861-1908, WBSA, Kolkata.

138 Letter from – Deputy Commissioner of Julpaigoree, No. 575, dated 16th January 1872; From – Deputy Commissioner of Darjeeling, No. 876, dated 16th January 1872; From – Assistant Commissioner of Terai Sub-Divisional 23rd January 1872; To – Commissioner of Cooch Behar Division; Revenue Department Agriculture Branch, 1861-1908, WBSA, Kolkata.

139 N. G. Mukerji, *The Silk Fabrics of Bengal*, p. 1.

অন্যদিকে ১৮৭২ সালের সরকারি রিপোর্টে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে রেশম চাষ নিয়ে তেমন কোনো সদর্থক মন্তব্য আমরা পাইনি। তবে ১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে ৫৫,১৪২ জন রেশম চাষের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী তা কমে দাঁড়াচ্ছে ৪১,৬১৫ জনে। কিন্তু সিল্ক কালচারকে জনপ্রিয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ড হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপনিবেশিক সরকারের উদ্যোগও থেমে থাকেনি। ১৮৯১-১৮৯৫ সালে যেমন নদীয়াতে রেশম-পোকা প্রতিপালনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার জন্য প্রায় দুই-তিন বিঘা জমিজুড়ে তুঁত গাছ পোতা হয়। একই ধরণের পরীক্ষামূলক চাষ যশোরের মাগুরা সাব-ডিভিশনে, উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে, কলকাতার নিকটবর্তী উল্টোডাঙ্গায় শুরু হয়।[140]

অন্যদিকে রাজশাহী ডিভিশনেও তুঁত চাষ, রেশম-পোকা প্রতিপালন, রেশম-সুতো কাটা, এবং রেশমি কাপড় বোনার উপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইউরোপীয় রেশম ফ্যাক্টরিতে আরও বেশি ভারতীয় রেশমের যোগান বাড়াতে, মালদার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে রেশম-পোকা এনে চাষ সংস্কৃতিকে আরও পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করা হয়।[141] এভাবে কটন ও সিল্ক কালচারের বিকাশের সাথে সাথে, এদেশের তুলো, পশম, এবং সিল্ককে প্রক্রিয়াজাত করে নিজেদের বাজারে রপ্তানি করার প্রক্রিয়াও সচল হয়ে উঠছিল। এবং সেই কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত বস্ত্রের

ছবি ২.৬: Textile labels। বামদিকেরটি Ralli Brothers & Company, Calcutta (@Priya Paul Collection of Popular Art, Delhi) এবং ডানদিকেরটি Finlay Muir & Co.র (@The Trustees of the British Museum)-এর।

মাধ্যমে ব্যবসা করার প্রবণতাও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিভিন্ন বিলিতি কোম্পানি, যেমন - Ralli Brothers', Finlay Muir & Co. চার্লস ক্যাল্টর অ্যান্ড কোং, চার্লস ফরেস্টর, অ্যাডমিস প্রভৃতির উদ্যোগে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল (ছবি ২.৬ দ্রষ্টব্য)। তুলা ও রেশম রপ্তানিতে এসব বিদেশি

[140] Ibid, p. 2.
[141] Ibid.

কোম্পানিগুলি যতই হাত পাকাতে থাকে, ততই দেশীয় বাণিজ্যিক উদ্যোগের কঙ্কালসার রূপটা বেরিয়ে পড়তে শুরু করে। ১৮৮০-র দশকে বস্ত্রবাণিজ্যে দেশীয় হতোদ্যম একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় এইভাবে -- '... তুলার চাষ আমাদের দেশে হওয়া উচিত। হওয়া দরকার। ম্যাঞ্চেস্টারের সহিত আমরা কোন কালে প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না। তবে ম্যাঞ্চেস্টারকে আমরা যতদূর হাতে রাখিতে পারি এখন তাহাই আমাদের কর্তব্য। তাহার একমাত্র উপায়, তাহাকে তুলা ও পাট জোগান দেওয়া। ইহাতে বেশ দু পয়সা লাভও আছে। তুলার দর ভাল। কাপড় বেচিয়া ম্যাঞ্চেস্টার তো দেশ হইতে সব টাকা লইয়া গেল, তবু তুলার চাষে আমরা যদি তাহার কাছ হইতে কতক টাকাও ফিরাইয়া আনিতে পারি, মঙ্গলের কথা।'[142]

বিলিতি পোশাকের বাজার ও দেশীয় পারিচ্ছদিক রুচি

একদিকে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতি এবং অন্যদিকে মহাবিদ্রোহ পরবর্তীকালে তুলো ও রেশম চাষ সংগঠিতকরণের ঔপনিবেশিক উদ্যোগ – এদেশের বাজারে Ralli Brothers, Finlay, Muir & Co.-এর মতো কোম্পানিগুলির গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। এদেশীয়দের রুচির সবস্তরকে ধরতে তারা কিরকম উদ্যোগী হয়েছিল, তা ছবি ২.৫-এর হিন্দু ধর্ম ও পুরাণকথা ভিত্তিক টেক্সটাইল লেবেলগুলির (কাপড়ের সাথে আটকানো কোম্পানির নাম লেখা ছোট ট্যাগ) দিকে চোখ দিলে বোঝা যায়। র‍্যালি ব্রাদার্সের ব্যবসা বাংলায় এতই বিস্তৃত হয়েছিল যে, স্বদেশীর সময়কালেও অর্থাৎ ১৯০০-১৯১০-এর মধ্যে কাশীপুরে পশম ও তুলা বাঁধার কারখানা থেকে পাটকল স্থাপন, বনগাঁয় ও নারায়ণগঞ্জে পাট নিয়ে কারবারের জন্য কল স্থাপন -- এরকম বিভিন্ন দিকে তাদের বিনিয়োগ হয়েছিল।[143] এর মূল কারণ হল, এদেশীয়দের পোশাকি রুচির পরিসরকে বুঝে, সেই অনুযায়ী থান কাপড়, ধুতি আমদানি করে তারা এদেশের বস্ত্রবাজারে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিল। একদিকে যতই বিদেশি কোম্পানির রমরমা বেড়েছে, ততই তাদেরকে টাকা ধার দিয়ে ব্যবসা চালাতে সহযোগিতা করা 'আশুতোষ দে অ্যান্ড কোম্পানি'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারও বেড়েছে এবং বস্ত্র ব্যবসায় দেশীয় উদ্যোগের বিকাশ কমেছে। তার বদলে বিলিতি কোম্পানিগুলির দ্বারা আমদানি বিলাস-পণ্যে নিজেদের কালীন ফ্যাশনের অংশীদার করার প্রবণতা বেড়েছে। আর এসব বেনিয়ানদের বৈঠকখানা হয়ে উঠেছে, নব্যরুচির বাবুয়ানির কেন্দ্র। বিনয় ঘোষ বলেছেন, 'আশুতোষ দে এণ্ড কোম্পানি'র বৈঠকখানা যা ছাতুবাবুর বৈঠকখানা (বর্তমানে আশুতোষ দে লেন) হিসেবে উনিশ শতকের শেষের দিকে সমধিক পরিচিতি ছিল, তাও বাবুয়ানির তদ্রূপ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[144]

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ১৮৯৬ সালের আশেপাশে কলকাতা মিউনিসিপালিটি হাওড়ার পুল থেকে পূর্ব দিকে বৃহৎ রাস্তার পত্তন করে। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান স্যার ফ্রেড্রিক হ্যারিসনের নামে রাস্তাটির নাম হয় হ্যারিসন রোড। সেই রাস্তার পাশে ছোট ছোট জমি

---

142 'তুলার চাষ', কল্পনা পত্রিকা, ৭ম খণ্ড, ১২৯৪, পৃ ৩৮।

143 সনৎ মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জুু দত্ত সম্পাদিত, 'বিবেকানন্দ পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত ও তৎকালীন সমাজ [১৮৭৬-১৯০৭]', (কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০ আষাঢ় ১৩৯৬), পৃ ১৯-২০।

144 বিনয় ঘোষ, 'কালপেঁচার রচনাসমগ্র', (কলিকাতাঃ পাঠভবন, জুন ১৯৬৮), পৃ ১৫১-১৫২।

খণ্ড খণ্ড ভাবে বিক্রি করা হয়। লেখকের মতে, রাজপুতানা থেকে আগত ব্যবসায়ীরা অনেকেই সেইসব জমি কিনেছিলেন। তারা সেখানে সার সার কাপড়ের দোকান খোলেন। সেখানে এবং কলকাতার বড়বাজারে র‍্যালী ব্রাদার্সের এদেশে আমদানিকৃত ম্যাঞ্চেস্টারের ধুতি বিক্রি হত।[145] লেখকের মতে, মূলত এসব রাজপুতানী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাত ধরেই র‍্যালীর ধুতি বাঙালির ঘরে ঘরে অবশ্য পরিধেয় হয়ে ওঠে। এই ব্যবসায়ীরা এসব ধুতি নিয়ে শুধু দোকানেই বসতেন না; পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে বেড়াতেন। আর হাঁক পেড়ে বলতেন, "বাবু, এক টাকায় তিনখানা কা-পুড়; একখানা ফাউ।"[146] এই সস্তার মোহে দেশি তাঁতের কাপড় ছেড়ে প্রায় পরিবারই র‍্যালীর ধুতি কিনতে শুরু করেছিলেন। র‍্যালীর ধুতির প্রসার বোঝাতে দুর্গাচরণ রায় তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক রচনায় লিখছেন, মানস সরোবরে বিচরণরত ব্রহ্মার পরনেও 'রেলীর ধুতি', যা কিনা বরুণ কলিকাতা থেকে এনে দিতেন।[147] উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে কেরানিবৃত্তিকে ধ্যান-জ্ঞান মনে করা বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে রেলি ব্রাদার্সের বিভিন্ন শাখায় কেরাণিবৃত্তির চাকরি পাওয়া যে একটা স্বপ্ন ছিল, তা বোঝা যায় একটা লেখা থেকে, -- 'বাংলাদেশে অসংখ্য-কেরানীকুল-তারণ রেলি ব্রাদার্স থাকিতে নীরদ বাবু যে কোন লোভে এই পাহাড়ের মধ্যে আসিয়া ৪০ টাকায় পড়িয়া আছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।'[148] বোঝাই যায়, র‍্যালী ব্রাদার্সের তৎকালীন প্রভাব।

আর সেই র‍্যালী ব্রাদার্সের আমদানিকৃত উনপঞ্চাশ নম্বর ধুতি ও থান কাপড় এতই প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে "রেলীর উনপঞ্চাশ" আভিজাত্যের সমকক্ষ হয়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। সেই থান কাপড় দিয়ে শার্ট, কোট, পিরাণ, বেনিয়ান ইত্যাদি বিলিতি ডিজাইনের পোশাক মনোমত তৈরি করা যেত।[149] কেদার বন্দোপাধ্যায় "দুঃখের দেওয়ালী"তে লিখেছেন, "রেলীর উনপঞ্চাশের প্রসিদ্ধি তখন বাংলাময় – অতবড় মান আর কোনো থান পায় নাই।" অর্থাৎ এত বড় মানের মানুষ হয়েও রেলীর কাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পরেছেন, এটাই বিস্ময়ের।[150] "তিনটী চিত্র"এর চরিত্র সুরেশ যেমন তাড়াহুড়োয় ওয়েস্ট কোট এবং কোটের সাথে হাঁটু অবধি ঝুলের ধুতি পরে বেরিয়েছেন, মনে মনে ভেবেছেন তাড়াহুড়োয় 'রেলীর ৪৯' ধুতি পরে বেরুনো গেল না। এবং নিজের বিচিত্র পোশাক নিয়ে নিজের মনে হেসেছেন।[151] উনিশ শতকের শেষের দিকে র‍্যালীর ফ্যাশনের ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল, 'চন্দ্রকোণার সাদা ধুতি, পেড়ে ছিল বড়ই জ্যোতি, রেলীর থানের দেখে ভাতি,

---

[145] বিমল মিত্র, 'সাহেব বিবি গোলাম', (কলিকাতাঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৫৩), পৃ ১৬৫।

[146] অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', (কলিকাতাঃ এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৯), পৃ ৫-৬।

[147] দুর্গাচরণ রায়, 'সচিত্র দেবগণের মর্ত্যে আগমন', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, (কলিকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ৫।

[148] 'পরিহাস', প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২১, ১ম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৬।

[149] সত্যরঞ্জন সেন, 'প্রবাদ-রত্নাকর', (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৫৭), পৃ ৮০৫; আশাপূর্ণা দেবী, 'উড়োপাখি', (কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ, জৈষ্ঠ্য ১৩৮০), পৃ ১২৮; পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন', ১ম পর্ব, (কলিকাতাঃ ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ১৯৫২), পৃ ১৭০।

[150] তদেব।

[151] শ্রীপ্রিয়নাথ পাল কর্তৃক প্রকাশিত উপন্যাস 'তিনটী চিত্র', (কলিকাতাঃ গ্রেট টাউন প্রেস, ১৮৯৪), পৃ ৬৫।

তারা লুকিয়ে গেল, ... বিলাতির মান্য এখন বড়ই বেড়ে গেল।'[152] তবে গ্রাম্য পরিসরে র‍্যালীর ব্যাপক প্রসার হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তাই র‍্যালীর আমদানি মিহি কাপড়ের ধুতি, গেঞ্জি, টুইল শার্ট পরিহিত কোনো যুবা যদি উনিশ শতকের শেষ দিকে গ্রামেগঞ্জে উদয় হতেন, তবে গ্রামগঞ্জে উৎসুক্যের সীমা থাকত না। কানাকানি পড়ে যেত যে অমুকের ছেলে "আধ-ব্রাহ্ম" হয়ে কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরেছে।[153]

বিলিতি কাপড়ের প্রসার ও দেশীয়দের বস্ত্ররুচির পরিবর্তন বিষয়ে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, 'আমি তখন খুব ছোটো, বোধ হয় আমার বয়স আট-নয় বৎসরের অধিক হইবে। মনে আছে, আমার মামা বাজার হইতে একজোড়া লালপাড় ধুতি আনিয়া আমার মায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, কাপড়ের কেমন জমি।" মা কাপড় জোড়াটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বেশ জমি ত, যেন রুটির মতো, কত দাম?" মামা বলিলেন, "দুই টাকা।" মা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "দুই টাকা! এত সস্তা!" মামা বলিলেন, "বিলিতি কাপড়! কলে বোণা হয়।" মা বলিলেন, "বিলিতি! আমি দেশী কাপড় মনে করিয়াছিলাম। ঠিক যেন দেশী কাপড়ের মতো পাড় ও জমি করিয়াছে।" '[154] সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে ম্যাঞ্চেস্টারে বোণা কমদামি কাপড় দেশীয় কাপড়ের রূপ নিয়েই শুরুর দিকে জায়গা করে নেয়। তাই তখনকার মানুষের মনে বিলিতি কাপড়কে দেশী কাপড় বলে ভ্রম হয়েছে। তবে ম্যাঞ্চেস্টারের কলের কাপড় ধীরে ধীরে নিজ স্বাতন্ত্র্যে পৌঁছেছিল। অর্থাৎ ধীরে ধীরে তার ব্র্যাণ্ড-মূল্য তৈরি হয়েছিল। আর সেকারণেই তখন এই কাপড়ের কদর হয়েছে তার 'বিলিতি' ট্যাগের জন্য। যতই বিলিতি কাপড়ের দিকে মানুষের রুচির যাত্রা শুরু হয়, ততই দেশীয় কাপড়ের প্রতি নিস্পৃহা বাড়তে থাকে। যোগেশচন্দ্র মহাশয়ের স্মৃতিকথায় তারও আভাস মেলে। তিনি লিখছেন, 'ষাট বৎসর পূর্ব্বে লোকে বিলাতী বস্ত্র দেখিয়া বলিত, ঠিক যেন দেশী কাপড়। আর এখন আমরা সূক্ষ্ম মিলের কাপড় দেখিয়া বলি – "ঠিক যেন বিলাতী কাপড়।" '[155] সুতরাং বলা চলে, বিলিতি কাপড়ের রূপ-গুণের স্বাতন্ত্র্য মধ্যবিত্তের মন কেড়েছিল। সেই কাপড়ের বৈচিত্র্য – লাল, কালোর সাবেকি পাড়ের সাথে সবুজ, হলুদের মতো বিভিন্ন রঙের পাড়, কাপড়ের জমিন, কাপড়ের সূক্ষ্মতা মধ্যবিত্তের মনে একটা স্বতন্ত্র্য জায়গা করে নিয়েছিল।

---

152 ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, 'স্ত্রীভূষণ বিসম্বাদ ও ঘোর কলির অনুবাদ', (কলিকাতাঃ কালীপ্রসন্ন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৯২), পৃ ৩৮।

153 তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে সাজে-গোজে ১৮৭০ এর দশকে হালফ্যাশনের সহুরে ব্রাহ্ম হয়ে ওঠা যুবাদের দিকে গ্রামের সর্বসাধারণের অবাক দৃষ্টি বর্ণনা করেছেন, 'গঙ্গাধর ভটচাজের আশ্চর্য বুদ্ধিমান ছেলেটি আধাব্রাহ্ম হয়ে ফিরে এসেছে। সাজে-গোজে চেহারায় তাকে আর গঙ্গাধর ভটচাজের ছেলে বলে চেনাই যায় না। হাল ফ্যাসনে ছোটবড় করে চুল ছাঁটাতে তাকে ভারী ভালো মানিয়েছে। তার উপর পরিষ্কার কালাপাড় মিহিজমি রেলির বাড়ির (অর্থাৎ রেলি ব্রাদার্সের) ধুতি, গায়ে গেঞ্জি ও টুইল শার্ট পায়ে চডা জুতো পরে সেদিন সে একটা কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে তার পিছন পিছন গ্রামে ঢুকেছিল সেদিন অধিকাংশ লোকই তাকে চিনতে পারেনি। ভেবেছিল কলকাতা শহরের কোনো ছোকরা বাবু আসছে। গ্রামে ঢুকতেই বাগদী-পাড়ার যে ছেলেগুলো পথের উপর গাবু খুঁড়ে নিয়ে কড়ি খেলছিল এবং খেলা দেখছিল তাদের একটা মস্ত অংশ তার পিছন ধরে নিয়েছিল। যে-সব মেয়েরা পথের ধারের পুকুরঘাটে বাসন মাজছিল কাপড় কাচছিল তাদের কার্যরত হাতখানা আপনি থেমে গিয়েছিল এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শতাব্দীর মৃত্যু', প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ ৩০৯।

154 যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'স্মৃতিতে সেকাল', (কলকাতাঃ অর্পণ, ১ম প্রকাশ ১৯৫০), পৃ ৯১-৯২।

155 তদেব।

দেশীয় রুচির পরিসরকে জেনে-বুঝে ভারতের কাপড়ের বাজার অধিকারের বিষয়টি ফোর্বস ওয়াটসনের লেখা বিশ্লেষণ করলে আরো ভালো ভাবে বোঝা যাবে। তাঁর লেখায় তিনি গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় প্রস্তুতকারকদের ভারতীয় পোশাকি রুচির স্থবিরতা বিষয়ে সচেতন করেছেন। যাতে কাপড় প্রস্তুতকারকরা সেই অনুযায়ী কাপড় তৈরি করতে পারেন। পোশাকি রুচির স্থবিরতার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য, ইউরোপে যেমন সময়ে সময়ে পোশাকের কাটে পরিবর্তন আসে, ভারতে তেমনটা হয় না। তাঁর মতানুসারে, ভারতবাসীর পরনে যে পোশাক উনিশ শতকের ষাটের দশকে দেখা যাচ্ছে, সেই পোশাক বহু শতক ধরে একই রকম আছে।[156] ওয়াটসনের এই মতামত অমূলক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলায় বস্ত্র সংকটের বিষয়ে লিখতে গিয়ে কালীচরণ ঘোষ লিখেছিলেন, বাঙালির বস্ত্র-সংকট অনুভূত হওয়ার মূল কারণই হল – বিলিতি বাজারের প্রভাবে তার বস্ত্রের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রসার। তিনি লিখছেন, একসময় বাঙালির মাথাপিছু বার্ষিক বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মোটে ১৬ গজ। তাহলে অনুমান করা যায়, বাঙালির বস্ত্রের বহর কতটা ছিল।[157] ভারতবর্ষে পোশাকি রুচিতে স্থবিরতার বিষয়টিতে আলোকপাত করতে গিয়ে ওয়াটসন এর কারণ হিসেবে আরেকটি বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, তা হল -- ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে সেলাই-বিহীন পোশাক পরার প্রবণতা। যেহেতু এই কাপড়ের জমিন বিস্তৃত হয়, তাই ওয়াটসনের নিদান – এই কাপড়ের জমিনে নানা শৈল্পিক দক্ষতা দেখাতে পারলে, তা ভারতের বাজার পাবে ভালো। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, শৈল্পিক দক্ষতায় পূর্ণ সেলাই-বিহীন কাপড় রপ্তানি করেই একদা বাংলা তথা ভারতের কাপড় বিশ্ব বাজারে স্থানলাভ করেছিল।[158]

ওয়াটসনের এমন সতর্কীকরণের মূল কারণই হল, ভারতের সার্বিক পোশাকি রুচিকে নিজেদের বাজারি দখলের আওতাভুক্ত করা। কারণ বাংলা তথা ভারতের সর্বজন পাশ্চাত্য শিক্ষার অধীনে এসেছিল – তা দাবি করা যায়না। বা এলেও এমন অনেকেই ছিলেন, যাদের পোশাকি রুচিতে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বা সাধিত হলেও আচারে-অনুষ্ঠানে নিজেদের ঐতিহ্যিক সত্তার পোশাকি ধরণকে আশ্রয় করে ছিল। এদের সকলের জন্যই একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজার তৈরিই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের মাঝ বরাবরও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে দেশে বোণা কাপড়-চোপড় অর্থাৎ ঢাকাই, শান্তিপুরে, ফরাসডাঙার বেশি-দামি ধুতি-উড়ুনি বা কমদামি অথচ টেকসই কোড়া শাড়ী ও ধুতি-উড়ুনি অনুষ্ঠানাদির পোশাক হিসেবে কদর পেত।[159]

---

156 J. Forbes Watson, 'The Textile Manufactures and Costumes of the People of India', (London: Printed for the India Office, 1866), p. 3.

157 কালীচরণ ঘোষ, 'বাংলার বস্ত্রশিল্পের প্রতি অবিচার', ব্যবসা ও বাণিজ্য, ১৩৫৩/১৯৪৬।

158 ওয়াটসনের ভাষায়, 'The steadiness of Indian taste and fashion is a point to which the manufacturers' attention should be directed . Among the people of India there is not that constant desire for change in the material and the style of their costume which is so noticeable in Europe. Some patterns which are now favourites, have been so far centuries, and certain articles for dress were ages ago very much what they now are. It is not however, to be understood from this that new styles of ornamentation have not been occasionally introduced by the native manufacturers in recent times. What this note is intended to convey is simply that there is much greater fixity of fashion in India than in Europe, and it is not necessary to point out that this has a very direct bearing on the operations of trade.' J. Forbes Watson, 'The Textile Manufactures and Costumes of the People of India', p. 3, 12.

159 যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'স্মৃতিতে সেকাল'; কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, (কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ৩য় সংস্করণ ২০১৩), পৃ ৭৩-৭৪।

ভারতে বস্ত্র-ব্যবসায়ে ওয়াটসনের মতো সতর্ক মনোভাব কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসকদেরও ছিল। সরকার এদেশে উপনিবেশ বিস্তারে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, এদেশীয়দের ধর্মীয় আবেগে আঘাত আসলে তার পরিণতি কিরূপ হতে পারে। তাই ম্যাঞ্চাস্টারের ধুতি-শাড়ীতে মূদ্রিত সব মোটিফের উপর ব্রিটিশ ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ নজর ছিল। ১৮৯৩ সালে সেরকমই একটা ঘটনার নিদর্শন আমরা পাঞ্জাবে পাব। ইংল্যাণ্ড থেকে সেখানে হিন্দুদের পরিধানের জন্য কিছু ধুতি রপ্তানি হয়েছিল। পাঞ্জাব সরকারের অভিযোগ ছিল, সেসব ধুতিতে পার্সিয়ান ভাষায় এমন কিছু কথা লিপিবদ্ধ ছিল, যা হিন্দু ক্রেতাদের মধ্যে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, আবার হিন্দুদের গায়ে সেই ধুতি মুসলমানদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।[160] লিপিকৃত সেই মোটিফগুলো ছিল পার্সিয়ান ক্যালিগ্রাফির মধ্য বিয়ে হস্তীর অবয়বের।[161] সরকারি অনুবাদক সেই ক্যালিগ্রাফিগুলোর অনুবাদ করেছিলেন – " O Omnipresent! O Muhammad! Thou will find (Ali) who is the displayer of wonders, thy helper in thy difficulties. All sorrow and anxiety (will vanish) and (my) object will be obtained soon with thy kindness. O Allah, through thy Prophecy O Muhammad and through thy guardianship, O Ali, O Ali, O Ali."[162] আল্লা ও তাঁর প্রেরিত মহম্মদের প্রসস্তিসূচক পার্সি ক্যালিগ্রাফিযুক্ত ধুতিগুলি নিয়ে বস্ত্র-বিক্রেতা, সেই বস্ত্র জোগানকারী ফার্মের পারস্পরিক দায় ঝেড়ে ফেলার মনোভাব এক্ষেত্রে বিশদে আলোচনার দরকার নেই।[163] শেষমেশ সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত – যেহেতু ধুতিগুলিতে লিপিকৃত মোটিফগুলি হিন্দুদের দ্বারা বোঝা দুঃসাধ্য, সেহেতু সেগুলি বাজারে ছাড়তে কোনো অসুবিধা নেই।

এদেশীয়দের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সামলেও কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের পোশাকি শিষ্টাচার অনুসারে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ধুতি-শাড়ির আয়তন বাড়িয়েছিলেন। ছেলে ও মেয়েদের থান কাপড়কে আলাদা করেছিলেন। যাতে এদেশীয় সংস্কৃতির সাথে সহবাস করতে গিয়ে, কোথাও তাদের রুচিশীল পরিশীলিত দৃষ্টি পীড়িত না হয়। বাঙালির বস্ত্র-রুচি বিলিতি বাজারের প্রভাবে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, তা আমরা যোগেশচন্দ্র রায়-এর লেখা পড়লে ভালো ভাবে অনুধাবণ করতে পারি। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালির 'বস্ত্র-দৈন্য' বিষয়ে লিখছেন, এই বস্ত্র-দৈন্য বহু পুরাতন। পার্থক্য কেবল দেখার দৃষ্টিভঙ্গির। ব্রিটিশ আগমনের আগে, এই 'দৈন্য' বাঙালির আবহাওয়া-জলবায়ু বা আর্থিক পরিবেশে কোনো দৈন্যই ছিল না। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রিটিশ আগমনের ফলে সেই স্বাভাবিক অবস্থাই বাজারি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে 'দৈন্য'এ পরিণত হল। তিনি বলছেন, সেকালে বস্ত্র এতই মহার্ঘ্য ছিল যে, "ঘুষ খাওয়া" অর্থে "ধুতি খাওয়া"

---

160 From – L. W. Dane, Esq., Chief Secretary to the Government of the Punjab, To – The Secretary to the Government of India, Home Department, No. 689s, dated 28th July 1893, Finance and Commerce Department, Statistics and Commerce Customs Branch, August 1893, National Archive of India, New Delhi.

161 From – The Officiating Chief Secretary to the Government of Punjab, To – The Commissioner in Sind, No. 340s, dated 23rd June, Finance and Commerce Department, Statistics and Commerce Customs Branch, August 1893, National Archive of India, New Delhi.

162 Translation of the inscription or the Arabic characters upon the dhotis, Finance and Commerce Department, Statistics and Commerce Customs Branch, August 1893, National Archive of India, New Delhi.

163 From – The First Class Magistrate, Karachi, To – The District Magistrate, Karachi, No. 3144, dated 7th July 1893, Finance and Commerce Department, Statistics and Commerce Customs Branch, August 1893, National Archive of India, New Delhi.

বলা হত। এমনকি মেয়েদের জন্য আলাদা শাড়ী ছিল না। এক ধুতিকেই নারী-পুরুষ উভয়েই পরিধেয় হিসেবে ব্যবহার করতেন। শুধুমাত্র মেয়েদের ধুতির আলাদা বিশেষত্ব বলতে তার একটা আঁচল থাকত।[164] কিন্তু বিলিতি উপনিবেশ বিস্তারের ফলে দেশীয়দের দরকারে-ফ্যাশাদে অফিস-কাছাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন বাড়ল। সাথে সাথে বাড়ল "কাপড় পরিয়া এস" গোছের নির্দেশের ঘনঘটা। অর্থাৎ যে কাপড় এতদিন তাদের কাছে স্বাভাবিক ছিল – তা শাসকের চোখে কোনো কাপড়ই নয়। ফলত শাসকের চোখে নেটিভকূল যখন থেকেই নিজেদের নগ্ন ভাবতে শুরু করলেন, তখন থেকেই সেই নগ্নতা ঢাকার প্রকল্পে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রশস্ত ধুতি জোগান দিয়ে বিলিতি মিল নিজেদের বাজারি টোপ ফেলল। যোগেশচন্দ্রের ভাষায়, বিলিতি বাজারের 'ভাবে বঙ্গ যত বিকাইয়াছে, অন্যে তত নহে।' সেকারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উদ্‌ভুত বস্ত্র-সংকট বাঙালির কাছে বস্ত্র-দৈন্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই বস্ত্র-সংকটের ধরণ নিয়েও তিনি বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিলিতি মিহি ও প্রশস্ত কাপড়ের বিস্তার এদেশীয় রুচিকে এমনি প্রভাবিত করেছে যে, 'ধুতির বহর খাটো হইলে লজ্জা বোধ করি, মোটা হইলে ভারী বোধ করি, গ্রীষ্ম বোধ করি।' কিন্তু মোটা-কাপড়ের কোট-প্যান্টালুন-মোজা-শু্য বেষ্টিত হয়ে গলদঘর্ম হওয়া বেশ গৌরবের।[165] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতে বিলিতি কাপড় প্রচলন হওয়ার শুরু থেকেই তার দাম কম ছিল না। শুরুর দিকে তার দাম বেশিই ছিল। কিন্তু নেটিভ-মহলে সমাদর আদায়ের পর ধীরে ধীরে সেই দাম কমতে থাকে। আর বিলিতি কাপড় সেই যে একবার দেশীয় রুচিকে বিমোহিত করল, স্বদেশীও সেই আবেশকে কাটাতে পারল না। 'বঙ্গলক্ষ্মী মিলের' কাপড় বিলিতি কাপড়ের চাইতে একটু মোটা ছিল বলে, সেই কাপড়ও বাঙালির ঘরে খুব চাহিদা অর্জন করতে পারেনি বলে যোগেশচন্দ্র লিখেছেন।[166] শিষ্টাচার ও সৌজন্য শিখতে গিয়ে বাঙালির সেই আত্মবিস্মৃতিকে তিনি বিঁধেছেন, 'সৌজন্য চাই, পরিধাণও চাই; কিন্তু সৌজন্য প্রদর্শনের চেষ্টায় সৌজন্যের ভাণ যেমন কটু বোধ হয়, বসনকে শিষ্টাচারানুরূপ করিতে গিয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেও সে বসনও কটু বোধ হয়।'[167]

বিলিতি কলের বস্ত্র মধ্যবিত্ত মানসিকতায় তাঁতের কাজের সাথে কিরূপ দূরত্ব রচনা করেছিল, তা নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'একসময় সরু সুতা কাটা স্ত্রীলোকের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে ধনী স্ত্রীলোকেরা পৈতা প্রস্তুত কার্য্যও অপমান বলিয়া বিবেচনা করেন। দেশে বিলাসিতার বৃদ্ধি ও রুচির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা এই ঘটনাতেই বোধগম্য। ...'[168] বাঙালি মধ্যবিত্তের পাল্টে যাওয়া পোশাকি রুচি বিষয়ে আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে শ্রীবামাচরণ বসুও স্বদেশীর সময়ে বলেছেন, 'এতদিন আমরা পরমানন্দে "পরের" পরিচ্ছদে "বাবু" সাজিয়া মহাগর্ব্ব করিয়া বেড়াইয়াছি, মাদ্রাজী ভ্রাতাকে তাঁহার মোটা কাপড় পরিতে দেখিয়া বিদ্রুপ করিতেও ছাড়ি নাই, বিজাতীয় ভাবে, বিজাতীয় সাজে সজ্জিত হইতে আমরা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হই নাই বরং নিজেরা শ্রেষ্ঠ ও সুসভ্য

---

164 যোগেশচন্দ্র রায়, 'বস্ত্র-চিন্তা', প্রবাসী, ১৯১৮, পৃ ৩৪।

165 তদেব, পৃ ৩৫।

166 তদেব।

167 তদেব, পৃ ৩৬।

168 শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'বস্ত্রসমস্যা', পৃ ২।

বলিয়াই গরিমা করিয়াছি।'[169] অর্থাৎ ১৯০৬-০৭ সাল নাগাদ যখন শ্রী বসু স্বদেশীর অভিঘাতে বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বদেশী পূর্ববর্তী কালের অর্জিত পোশাকি চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে বসেছেন, সেখানে আত্মম্ভরিতা ছাড়া কিছু খুঁজে পাননি। স্বদেশী কালেও সেই পোশাকি আত্মম্ভরিতা ঘোচেনি। তাই বাঙালি মধ্যবিত্ত বস্ত্রশিল্প প্রসারে মনোনিবেশ করেননি। স্বদেশীর হাওয়া স্তিমিত হতেই আবার বিলিতি বাজারের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিলিতি বস্ত্র বাজারকে ক্ষতিগ্রস্থ করলে, সেই বাজারের উপর নির্ভরশীল বাঙালি মধ্যবিত্তও হাহাকারে মজেছেন।

উপসংহার

বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্পের অতীত ও ব্রিটিশ আগমন পরবর্তী অবস্থার বিভিন্ন ধাপ নিয়ে আলোচনা করে, এই অধ্যায় মূলত যে বিষয়ে আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছে, তা হল – ভারতবর্ষে তথা বাংলায় সাম্রাজ্যবাদের বাণিজ্য নির্ভর, কৃষি নির্ভর ও রুচি নির্ভর পথটি কিভাবে সমান্তরালে বিকশিত হয়। এই বহুমুখীন পথের নাড়া এক সাম্রাজ্যবাদী মননের সাথে গাঁথা। তাই সাম্রাজ্যবাদের রুচি-কেন্দ্রিক পথের দিকে তাকালেও সাম্রাজ্যবাদের রূপই প্রকট হয়। কারণ বিলিতি বাজার তাড়িত রুচির পরিবর্তনের সাথে সাথেই সাম্রাজ্যবাদ শৈশব থেকে যৌবন প্রাপ্ত হয়; সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা বলবেন, উনিশ শতকের গোঁড়ার দিককার 'low imperialism' থেকে, উনিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকের 'high imperialism' এ স্থিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের এই যাত্রাও উপনিবেশবাসীর রুচির বিশ্বে প্রভাব ফেলে, কারণ অগ্রগমনের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদের যে পোশাকি রূপ প্রকট হয়েছিল, তাতে 'নেটিভের' পোশাকি শিষ্টাচার থেকে দূরত্ব বজায়ের একটা তাগিদও ভেসে উঠেছে। যে পোশাকি রূপ নেটিভকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে তার সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান। তাই ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সেই পোশাকি রূপও কিভাবে এদেশীয় পোশাকি রুচির মানচিত্রে পরিবর্তন এনেছিল, তা সন্দর্ভের অগ্রগমনের সাথে ফুটে উঠবে। তারজন্য প্রথমেই আমাদের ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পোশাকি রূপের বিকাশকে বোঝার দিকে অগ্রসর হতে হবে।

---

[169] শ্রীবামাচরণ বসু, 'বস্ত্রবয়ন শিক্ষা', (কলিকাতাঃ দীনময়ী প্রেস, ১৩১৩), পৃ ১।

শরীর, পোশাক, এবং ক্ষমতা: ঔপনিবেশিক কলিকাতায় বিলিতি পোশাকি রুচি ও রাজনীতি

ভূমিকা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরও এদেশে ব্রিটিশের উপনিবেশ স্থাপনা নিয়ে একটা মানসিক দ্বিধাবিভক্তি ছিল। হয়ত সেই দ্বিধা থেকেই ক্লাইভ ইংল্যান্ডে তাঁর পিতাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, পিতার আর আইন ব্যবসা করবার দরকার নেই। কারণ জাফর আলি খান বাহাদুর ইংরেজের কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছেন, তার পরিবর্তে তিনি ইংরেজকে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে তিন কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পরই কোম্পানির যে অনিয়ন্ত্রিত খাজনা আদায়, সেটাও পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানির ক্ষয় ক্ষতিকে সামাল দেওয়ার তাগিদেই।[1] সুতরাং ১৬৯৮ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত এই ৫৯ বছরে এবং তারও পরবর্তী বেশ কয়েক বছর কোম্পানি এদেশের মাটিকে কেবলমাত্র নিজেদের লাভের ক্ষেত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছে। কারণ তাদের কাছে এদেশের গরম ও ক্রান্তীয় আর্দ্রতা ইউরোপীয় রুচির জীবনযাপনের পক্ষে শুরু থেকেই অনুপযোগী ঠেকেছিল।[2] তাই সেই লাভের রাজনীতির সাথে ক্ষমতার রাজনীতির সম্বন্ধ স্থাপন হতে আরও বেশ কিছু দশক লেগে যায়। সেই দশকগুলিতেই ইংরেজদের আচার-বিচারে যা কিছু এদেশের প্রভাব – তার সংশ্লেষ ঘটেছিল। সংশ্লেষের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজরা এদেশীয়দের পোশাকি রুচিতে যতটা বিজারিত হয়েছিলেন, এদেশীয়দের মধ্যে কিন্তু সেরকম প্রবণতার প্রাবল্য প্রথম দিক থেকেই ছিল না।

দেশীয় পোশাকি শিষ্টাচার ও বিলিতি জীবনাচরণ: প্রাথমিক সংশ্লেষ

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ বা তারও আগে থেকে বাণিজ্যিক সূত্রে দেশীয় সামাজিকতার সাথে ইংরেজদের দেখাসাক্ষাৎ শুরু হয়। যেসব দেশীয় এর সর্বাগ্রে ছিলেন, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল – নবাগতদের সাথে আর্থিক সম্বন্ধ স্থাপন করে অর্থ লাভ। আর নবাগতদের উদ্দেশ্য ছিল নতুন জমিনে মানিয়ে গুছিয়ে নিয়ে লাভের পথ প্রশস্ত করা। প্রথম গোষ্ঠী কলিকাতামুখী নতুন সাহেবদেরকে একপ্রকার হাইজ্যাক করে ট্যাভার্নে নিয়ে গিয়ে যত্ন-আত্তি করে টাকা-পয়সা রোজগার করে সমাজে কিরূপ ফুলে-ফেঁপে উঠছিলেন, তা আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে

---

[1] রজতকান্ত রায়, ‘পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ’, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), পৃ. ২৫৩-২৫৫।

[2] Alfred Crosby, ‘Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900’, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), p. 135.

দেখেছি। আর কাজের প্রয়োজনে প্রথম গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ভাসা ভাসা বিলিতি শিষ্টাচারের অনুপ্রবেশ ঘটলেও, দেশীয় হিন্দু সমাজের বিরাট পরিসরে নবাগতরা তখনও ম্লেচ্ছ। ছবি ৩.১-এ নবাগত সাহেবকে ঘিরে থাকা দেশীয় দালাল ও পান্ডাদের লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁরা পায়ে নাগরাই-এর সাথে থান কাপড় দিয়ে শরীর মুড়েছেন। তার মধ্যে দুই-একজন মুসলিম দরবারি পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে আছেন। সাহেবকে ঘিরে থাকা হিন্দু পান্ডাদের সাথে ছবিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্যদের পোশাকের পার্থক্য রয়েছে। তাদের 'ল্যাঙট' পরে নানা কাজে মশগুল থাকতে দেখা যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন জাগতে পারে, সাহেবকে ঘিরে থাকা হিন্দু পাণ্ডাদের এরূপ থান কাপড়ে শরীর মুড়বার কারণ কি? এর মূল কারণ হল – সাহেবদের কাছে অষ্টাদশ শতকজুড়েই ল্যাঙট পরিহিত কুলি, মাঝি প্রমুখ দেশীয় শ্রেণির লোকজন নগ্ন বলে সাব্যস্ত হয়েছেন। যে নগ্নতা সাহেবদের দৃষ্টিকে পীড়িত করেছে। তা তাঁরা দেশীয় হিন্দুদের সাথে সামাজিক মেলামেশায় বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছেন। আবার লিখেও গেছেন।[3] সুতরাং নবাগতদের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থে দেশীয় হিন্দুরা শরীর মুড়েছেন থান কাপড়ে। কিন্তু দরবারি পোশাক পরেননি, ধর্ম রক্ষার জন্য। তবে অন্যের দৃষ্টিকে পীড়ন না দেওয়ার জন্য, এই যে থান কাপড়ে শরীর মোড়া – এখান থেকেই পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচারের সাথে দেশীয় শিষ্টাচারের প্রাথমিক সংশ্লেষ শুরু। পরবর্তীকালের রুচির ধর্মকে বুঝতে এই প্রাথমিক ভাসা ভাসা সংশ্লেষটিকে খানিক বোঝার চেষ্টা করতে হয়।

১৮৪৩ সালে প্রকাশিত Memoirs of a Griffin-এর প্রথম খণ্ডে কলিকাতায় নোঙর তোলা জাহাজের গ্রগয়েল নামক ক্যাপ্টেন ব্রিটিশ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে বলেছিলেন, 'Take care of the land-sharks, sir*'* অর্থাৎ মহাশয়দের একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তারা যেন ডাঙ্গার হাঙর সাহেব-শিকারিদের থেকে সাবধানে

---

[3] Fra Paolinno Da San Bartholomeo, 'A Voyage to East Indies: Containing an Account of the Manners, Customs, & C. of the Natives, with a Geographical Description of the Country', (London: J. Davis, 1800), P. 67, 206; Emma Roberts, 'Scenes and Characteristics of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian Society, Vol. 1', (London: W. H. Allen & Co., 1837), p. 8.

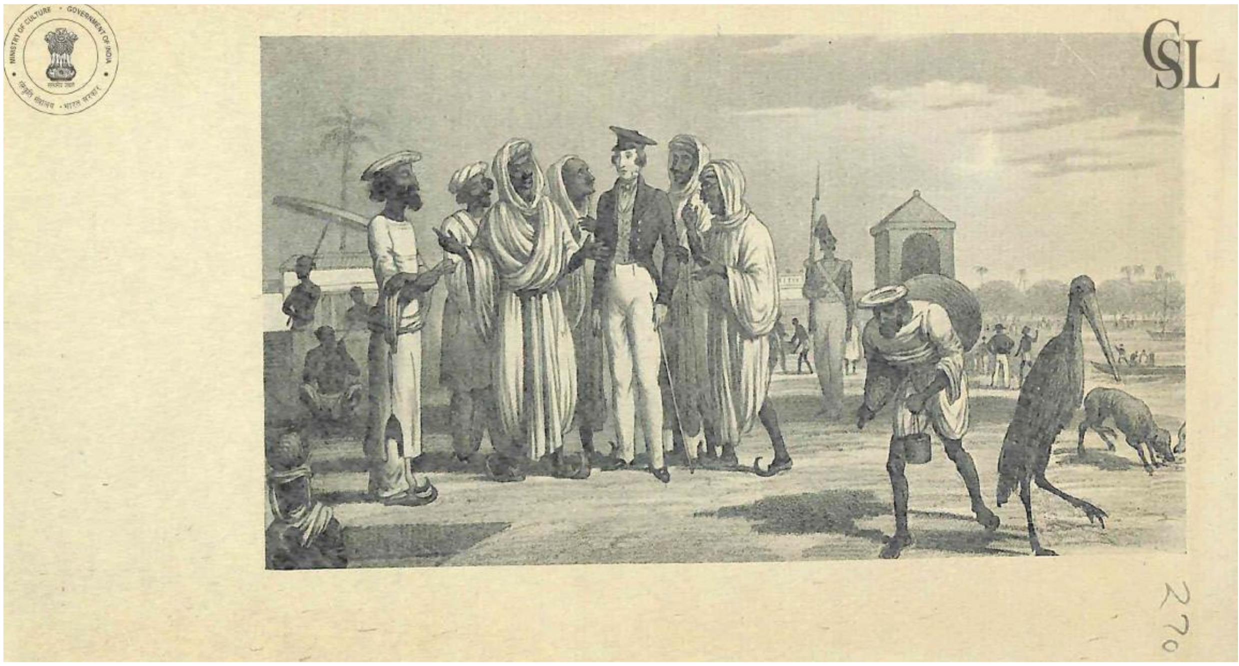

চিত্র ৩.১: জাহাজ থেকে অবতরণ করা সাহেবকে নিয়ে দরকষাকষিতে ব্যস্ত তথাকথিত 'ল্যাণ্ড-সার্ক'রা (Douglas Dewar, *Bygone Days in India*, (London:John Lane the Bodily Head Ltd.,1922), p.270)।[4]

---

[4] ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত F. J. Bellew'র *Memoirs of a Griffin* এ বেলিউ অঙ্কিত এই চিত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে, 'A Griffen, on Landing at Calcutta, being Besirged by Rum Johnnies'। এই নামকরণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব মোটা দাগে এই নামটির বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়—নবাগত একজন ইউরোপীয় ব্যক্তি জাহাজ থেকে নেমে দেশীয় দস্তুরি শিকারীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন। তবে ওই ইংরেজি নামকরণে দুটো শব্দ গুরুত্বপূর্ণ। একটা 'Griffin' এবং অন্যটা 'Rum Johnny'। কি এই শব্দদুটির প্রকৃত মানে? আমরা যদি *HOBSON JOBSON: A Glossery of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and, of Kindered Terms, Ethymological, Historical, Geographical and Discursive* গ্রন্থ অনুসারে এই দুটি শব্দের উৎস সন্ধানে নামি, তাহলে দেখতে পাব, Griffin শব্দের অর্থ নবাগত ইউরোপীয় হলেও ডাচ, পর্তুগীজ এবং ব্রিটিশরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শব্দটাকে বিভিন্ন ভাবে বলেছেন। কখনো সম্মানসূচকার্থে শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে, কখনো বা পরিহাসার্থে (William Crooke (edited), *HOBSON JOBSON: A Glossery of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and, of Kindered Terms, Ethymological, Historical, Geographical and Discursive*, (London: John Murray, 1903 edition),pp.395-396)। অন্যদিকে 'Rum Johhny' শব্দটির মধ্যে একপ্রকার হেয় নজরে দেখবার একটা ব্যাপার আছে। কলিকাতা শহরে আগত নবাগত ইউরোপীয়দের জন্য টাকার পরিবর্তে পরিষেবা দানকারী দেশীয়দের এই নামে ডাকা হত। উইলিয়মসন দেখিয়েছিলেন, 'Rum Johhny' শব্দবন্ধটি আসলে ইসলামী নাম Ramazani'র উচ্চারণগত বিকৃত রূপ (Crooke (edited), 'HOBSON JOBSON', pp.73-74)। এই 'Rum Johhny'রাই তারা যাদের ক্যাপ্টেন গ্রগয়েল ডাঙ্গার হাঙর বলেছিলেন। এই চিত্রটির মধ্যে দ্রষ্টব্য বিষয়টি হল, এখানে সাহেবকে দুই শ্রেণির দেশীয় আবৃত করে রেখেছেন। এক শ্রেণির পরনে সেলাই করা কামিজ, সেলাই করা সালওয়ার, কোমড় বন্ধনী, মাথায় পাগড়ি, গালে দাঁড়ি। অন্য শ্রেণির সকলে লম্বমান কোঁচার ধুতি পড়েছেন, শরীরে সেলাই না করা একখণ্ড কাপড় জড়িয়েছেন, মাথায় পাগড়ি পরেছেন। তবে দুটো শ্রেণির পাগড়ির ধরনে ভিন্নতা আছে। জামা-জোড়া পরা, দাঁড়ি রাখা দেশীয়দের সাথে, ধুতি-কাপড় জড়ানো দেশীয়দের পাগড়ির ধরন সচেতনভাবে আলাদা। বোঝাই যাচ্ছে, এই পরিচ্ছদ শৈলী একটা ধর্মীয় গণ্ডির দ্বারাও চালিত। কিন্তু মজার বিষয় হল, দুটি শ্রেণিই নাগড়া জুতো পরেছেন। এই ছবিটির আরেকটি পরিসরের দিকে যদি তাকাই দেখা যাবে, সমাজের একটা বৃহত্তর চিত্র। সেখানে টিকিধারী বামুন ছাতাবরদার ধুতি পরে দাঁড়িয়ে আছেন, আরেক টিকিধারী বামুন উদল গায়ে, ধুতি পরে বসে

থাকেন (ছবি ৩.১ দ্রষ্টব্য)।[5] যারা কিনা বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে নবাগত দিশাহারা সাহেবদের একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে উঠতেন এবং নতুন জায়গায় সাহেবের সড়গড় হয়ে ওঠার মাঝখানের সময়টিতে, সাহেবকে যেমন-তেমন চালনা করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আয় করে নিতেন। এসব সাহেব-শিকারিদের দিকে খানিকটা বিশদে তাকালে পরিষ্কার হবে, তারা ইংরেজি আদব-কায়দা কদ্দুর আত্তীকরণ করেছিলেন। জাহাজ থেকে অবতরণের পর, একজন ইউরোপীয়কে দেশীয় দস্তুরি-পিয়াসী মাথা ঝুঁকিয়ে ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে সম্বোধন করছেন, “Good marning, Sar”. যদিও বইটির লেখক ক্যাপ্টেন বেলিউ বলছেন, তখন কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সম্বোধনের পরেই সেই দেশীয় ব্যক্তির বয়ান এরকম - “Master, I perceive, is recently arrive at Bengal pris’dency.” অর্থাৎ দেশীয় ব্যক্তিটির মনে হচ্ছে, ইউরোপীয় মহাশয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে নতুন আসছেন। উত্তরে ইউরোপীয় ব্যক্তিটি জানিয়েছেন, “That’s pretty clear, … But can you direct me to Custom-house, and after that to some good hotel or tavern?” ইউরোপীয় ব্যক্তিটির কাস্টমস হাউস ও ভালো হোটেলের হদিস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার সাথে সাথেই দেশীয় দস্তুর-পিয়াসীর বক্তব্য, “Oh, Sartainly, Sar, everything Master require than I can do.”[6] অর্থাৎ অগোছালো ইংরেজি উচ্চারণে এবং অপটু ইংরেজি আদব-কায়দায় একজন দেশীয় ইংরেজিয়ানার যতটুকু আয়ত্ব করেছিলেন, তা নেহাত তার কাজের প্রয়োজনে। তার মানে এটা ধরে নেওয়া অনুচিত যে, নিজের একান্ত সামাজিক পরিসরে তিনি সেই আদব-কায়দার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ক্যাপ্টেন বেলিউর বইটা প্রকাশ পায় ১৮৪৩ সালে, সেহেতু অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে, ততদিনে এইদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়ে গেছে, এমনকি শাসক শ্রেণির আদব-কায়দা হিসেবে ইংরেজি আদব-কায়দার প্রতি সম্ভ্রমও বেড়েছে দেশীয়দের মধ্যে! এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, বইটা ১৮৪৩ সালে প্রকাশ পেয়েছে মানে, বইটা লেখার পেছনে যে অভিজ্ঞতাগুলো কাজ করেছিল, সেগুলো কেবলমাত্র ১৮৪০ এর দশকের অভিজ্ঞতা, এমন ভাবার কোন কারণ নেই। লেখক নিজেই এই গ্রন্থের শুরুতে জানিয়েছেন, যে কোন memoir এর কাহিনিগুলো এবং সেই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো কোনো কল্পনা পরিপুষ্ট ফল নয়। বাস্তব জগতে লেখকের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের কখনো কখনো মোলাকাত হয়। লেখক তাঁর চিন্তার নিজস্বতা দিয়ে

হুঁকা টানছেন। একজন দরিদ্র মুসলমান পিঠে বোঝা নিয়ে, খাটো ধুতি পেঁচিয়ে, ঊর্ধ্বাঙ্গে জামা পরে, খালি পায়ে চলেছেন। আসলে এই মানুষগুলোর আধিক্যই ডকের কাছে বেশি। কিন্তু চিত্রকরের চিত্রে তারাই বেশি আলোকিত, যারা সাদা চামড়ার সংস্পর্শে এসেছেন।

[5] Captain Bellew, ‘Memoirs of a Griffin or a Cadet’s First Year in India’, 2 Volumes together, (London: WM. H. Allen & Co., New edithion 1880), p. 73.

[6] Ibid, pp. 73-75.

সেগুলোকে বিশ্লেষণ করেন শুধু।[7] সেদিক থেকে বিচার করলে ১৮৪৩ সালের গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাতে যে ১৮০০ সালের উপস্থিতি নেই, সেটা কিন্তু বলা যায় না।

অর্থাৎ মোদ্দাকথা হল -- সাহেব মানেই যে দস্তুরি, সাহেব মানেই যে টাকায় দু পয়সা, তা তারা ভালোই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। আবার নবাগত ব্রিটিশরাদের অন্তঃকরণেও এই সত্যানুভূতি হয়েছিল যে - নতুন দেশে এদের ছাড়া উপায় নেই। জাহাজ থেকে নেমে ক্রান্তীয় আর্দ্রতার বাংলায় স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে চাইলে একজন করে 'সরকার' রাখতেই হত। তবে সরকার রাখা মানে প্রাত্যহিক বাজার-খরচ থেকে কিছু টাকা মার যাওয়া। আর এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে উল্টো দিক থেকে উত্তর আসত, "You are my father and mother, and I am your poor little child; I have only taken two annas in the rupee, dustoorie." অর্থাৎ - আপনি আমার মা-বাপতুল্য। আমি আপনার অবোধ সন্তানের মতো। আমি রুপি প্রতি দু'আনা দস্তুরী নিয়েছি মাত্র।[8] সাহেবদের বিভিন্ন স্মৃতিকথা দেখলে বোঝা যায়, জাহাজ থেকে ডাঙায় নামার পর থেকেই তাদের এইসব দস্তুরী-পিয়াসীদের মোকাবেলা করতে হত। তবু এদেশের ভ্যাঁপসা গরমে এরাই ছিলেন সাহেবদের 'অগতির গতি'।

স্যুট-বুটের সাহেবিয়ানাকে তিলমাত্র পরিবর্তন না করে, ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ুর দেশে বাণিজ্য করতে এসে অর্থ-শিকারি দেশীয়দের কবলে পড়া সাহেবদের মধ্যে কিন্তু শুরু থেকেই বাণিজ্য করে মোটা টাকা মুনাফা পেয়ে আবার স্বদেশে ফিরে যাবার মনোবাসনা প্রবল থাকত। তবে নিজেদের সাহেবিয়ানাকে শুরুর দিকে সাম্রাজ্যিক পরিচিতির কাঠামো হিসেবে প্রথম এবং প্রধাণ গুরুত্বের আসনে বসাননি তাঁরা। প্রয়োজনে তাদের মধ্যে দেশীয় আদব-কায়দা আত্তীকরণ করবার প্রবণতাও দেখা গিয়েছিল। আর সে আদব-কায়দা অবশ্যই তৎকালীন ভারতের মান্য রাজনৈতিক শিষ্টাচার দ্বারা পুষ্ট। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ছিল, নবাবি শিষ্টাচার অনুবর্তী। বিনয় ঘোষ দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশি বণিকতন্ত্রের পারস্পরিক এই দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টিকে 'সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের অবাঞ্ছিত পরিণয়' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[9] কারণ দেশীয় আভিজাত্যের সাথে মিশে যাওয়া এই তরলবৎ ইউরোপীয়রা এদেশে কোম্পানির অধীনে চাকরির সাথে সাথে সমানতালে ব্যক্তিগত বাণিজ্যও চালিয়েছেন; এবং লাভবান হয়ে এদেশীয় নবাবিয়ানাকে অনুসরণ করে সেই অর্থ প্রভূতভাবে ব্যয়ও করেছেন। সেই নবাবিয়ানাতে বাঈজীনাচ, হাতির লড়াই, মুরগির লড়াই, দুর্গোৎসবে ভোজ তামাসা থেকে শুরু করে হুঁকো গড়গড়ায় ধূমপান করে টাকা ওড়ানো কি

---

[7] Ibid, p. ix.

[8] Fanny Parks, 'Wanderings of a Pilgrim: In Search of Picturesque, during four-and-twenty Years in the East; with Revelations of Life in the Zenana, Vol. 1', (London: Pelham Richardson, 1850), p. 20.

[9] বিনয় ঘোষ, 'মেট্রোপলিটনঃ মন, বিদ্রোহ, মধ্যবিত্ত', (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০১৬), পৃ.১০।

না ছিল![10] এইসব সামন্ততান্ত্রিক আদব-কায়দাই কেবলমাত্র সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকে এদেশে আসা ব্রিটিশদের মধ্যে প্রবেশ করেনি, তার সাথে সাথে সামন্ততান্ত্রিকতার পোশাকি প্রভাবও তাদের উপর পড়েছিল। বিশ শতকের শেষ দিকে জেন স্রিম্পটন এবিষয় নিয়ে সবিস্তারে লিখেছিলেন। নবাগত ইউরোপীয়রা নতুন আবহাওয়ার সাথে তাল মেলাতে এদেশীয় অভিজাতদের মতো দেশীয় তন্তুর পোশাকও পরতেন। কিন্তু স্রিম্পটনের মত হল – ব্রিটনদের পোশাকি শিষ্টাচারে পরিবর্তন ঘটেনি।[11] ১৬১৫ সালে থমাস রো'র মতো কূটনীতিকের সাথে দিল্লির মুঘল দরবারে আসা এডওয়ার্ড টেরী যেমন ক্রান্তীয় গরম থেকে বাঁচতে তাদের মধ্যে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচার অনুগত দেশীয় তাফাত্তা সিল্কের মিহি কাপড় পরার চল থাকার কথা বলেছিলেন। উইলিয়াম হিকি ১৭৬৯ সালে মাদ্রাজে ইউরোপীয়দের মধ্যে 'gingham' নামক তসর ও কটন মিশ্রিত দেশীয় তন্তুর কাপড় পরে শরীরের আরাম বিধাণ করবার কথা বলেছিলেন (ছবি ৩.২ দ্রষ্টব্য)।[12]

ভারতীয় জীবনাচারের সাথে সাথে ভারতীয় তন্তুর পোশাক ধারণে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার পিছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল – ভারতের বিরুপ আবহাওয়ায় নিজেদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্থিতি। ও'ম্যালেই ১৯৩১ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ১৭৬২ সাল থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্যে ৫০৮ জন ব্রিটিশ সিভিলিয়ন ভারতবর্ষে বিভিন্ন কাজে সরকারিভাবে নিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন অবসরের পর স্বদেশে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। ১৫০ জন এদেশেই মারা যান। আর ৩২১ জন 'দুর্ভাগ্যের শিকার' হয়ে স্বদেশে ফিরতে পারেননি।[13] উইলকিন্সন দেখাচ্ছেন, প্রত্যেক বছর জুলাই থেকে অগস্ট মাসে মৌসুমী বায়ুর হাত ধরে ভারতবর্ষে বর্ষা আসত। সেই বর্ষায় কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং মুম্বাই তে প্রচুর ইউরোপীয় মারা যেতেন। এমনিতেই তো উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ছয়-সাত মাসের জাহাজ যাত্রায় প্রচুর ইউরোপীয় মারা যেতেনই। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাচ্ছেন, ১৬৯০ সালের দিকে মুম্বইতে প্রায় ৮০০ জন ইউরোপীয় থাকতেন। ১৬৯২ সালে সেই সংখ্যা নেমে আসে ১০০ তে। একটি বাংলা সাময়িকের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার কলকাতা আক্রমণের বছরে মেজর মিল্‌প্রেট্রিককে ফলতায় ২৪০ জন ইংরাজ সৈন্য নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে তাদের মধ্যে ২১০ জন সৈন্যই সংক্রামক জ্বরে প্রাণত্যাগ করেন। এভাবে

---

10 রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল', স্বপন বসু সম্পাদিত, (কলকাতাঃ চিরায়ত প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ.২৪।

11 Jayne Shrimpton, 'Dressing for the Tropical Climate: The Role of Native Fabrics in Fashionable Dress in Early Colonial India', *Textile History*, 23.1, 1992, p. 56.

12 E. Terry, 'A Voyage to East India', (London, 1777, reprinted from 1655 edition published for P. W. for Ja. Martin and J. Allestrye), p. 118; W. Hickey, A. Spercer Edited 'Memoirs of William Hickey', Vol. 1, (London: Hurst & Blackett,1913), p. 171.

13 L.S.S. O'Malley, 'Indian Civil Service 1601-1930', (London: John Muray, First Edition,1931),pp.30-31.

১৬৮৯, ১৭৬২, ১৭৬৮, ১৭৭০ সালে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধিতে প্রচুর ইংরেজের মৃত্যু হয়েছিল।[14] ১৮৩৩ সালে কলিকাতায় ১২,০০ ইউরোপীয়দের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মারা গিয়েছিলেন অগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাসের শেষ অবধি। ১৯০০ সালে বাংলার স্যানিটারি কমিশনারের একটা রিপোর্ট দেখলে আরও পরিষ্কার হয়, কিভাবে ১৮৯৯ সালে মুজফরপুরে নেটিভদের মধ্য থেকে কলেরা ইউরোপীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল।[15] ১৭৫৮ সালে মি. ওয়েব নামক ইংরেজ নাবিকের স্মৃতিকথার দিকে তাকালে আমরা ইংরেজদের এই দেশে এসে রোগক্লিষ্টতার আরেকটা প্রত্যক্ষ দলিল পাবো। তিনি ভারতের দক্ষিণ দিক হয়ে জাহাজে করে পার্সিয়ান গাল্ফের অন্তর্গত ইরানের বন্দর নগরী গুমব্রুনে (বা বন্দর-ই-আব্বাস) যাবার কথা বর্ণনা করেছেন –

> আমি ১৭৪৯ সালের ২৮শে নভেম্বর আপনার কাছ থেকে ছুটি নিই (সম্ভবত ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে) এবং ৩০শে নভেম্বর Essex, Capt. Robinson জাহাজে চেপেছিলাম। [কিন্তু ভারতের কোন অংশ থেকে জাহাজে চেপেছিলেন, তা স্পষ্ট করে বলা নেই। হতে পারে বঙ্গোপসাগর উপকূলের কোথাও থেকে তিনি জাহাজে চেপেছিলেন]......আমরা জাহাজে করে ১০ই ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার জোলোয়ান দ্বীপের কাছে পৌঁছে যাই। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত বৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে জলের প্রচণ্ড স্রোতে ১৪ই ডিসেম্বর আমরা ভারতবর্ষের একদম দক্ষিণস্থ প্রান্ত Cape Comorin (বা কন্যাকুমারী) র কাছে চলে আসি।...পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিমে প্রবাহিত সামুদ্রিক বাতাসে আমাদের জাহাজ রাত সাড়ে দশটার মধ্যে আঞ্জাঙ্গো ফোর্টের [[16]] কাছে এসে ভিড়ে। এই দুর্গটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থানুকূল্যে ১৬৯৫ সালে নির্মিত হয়...এই দুর্গেই আমরা কোম্পানির আরেকটি জাহাজ Ruby, Capt. Knight এর নাগাল পাই। পরেরদিন জাহাজটির উত্তরদিকের উদ্দেশ্যে পাল তোলার কথা ছ্যিল। সেই জাহাজটিকে ধরবার জন্য আমরা পরেরদিন সকাল আটটাই রওনা দিই।... বড় জাহাজগুলির মোটা রশি যাদের সাহায্যে বন্দরের পোতে বাঁধা থাকে, সেইরকমই একটি ড্রাগন নামক ছোটো জাহাজে আমরা চেপেছিলাম। আশা ছিল ওই জাহাজ রুবির কাছাকাছি গেলে আমরা রুবিতে উঠে যেতে সমর্থ হব। ১৮ই ডিসেম্বর নাগাদ ড্রাগনে চেপে আমরা ডাচ সেটেলমেন্ট কোচিনে এসে উপনীত হই। সেই সময়ই আমারা প্রায় সকলেই স্মল পক্সে আক্রান্ত হই। আক্রমণের

[14] 'কলিকাতার ইতিহাস', বীণাপাণি, ২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা, ১৩০২, পৃ ২৮২।

[15] From – Major H. J. Dyson, Sanitary Commissioner, Bengal, To – The Secretary of the Govt. of Bengal, No. 1068-26-2, dated Calcutta, the 23rd January, 1900, Municipality Department, West Bengal State Archives, Kolkata.

[16] অঞ্জাঙ্গো দুর্গটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অরথানুকূল্যে মালাবার উপকূলে স্থাপিত প্রথম দুর্গ।

তীব্রতা এমন ছিল যে, তাকে প্লেগের সাথে তুলনা করাই যায়। আমাদের মধ্য থেকে প্রায় ২০০ জনের মৃত্যু হয়।...(লেখকের অনুবাদ)[17]

কিন্তু উইল্কিন্সনের বক্তব্য, রোগভোগের ফলে এধরণের 'মৃত্যু মিছিল' সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বণিক, কারিগর, নাবিক, উৎসাহী সেনা, ধর্মযাজক, চিকিৎসকদের আনাগোনায় কোন ভাটা পড়েনি।[18] যদিও ১৭৮৫ সালে হেনরি থমাস কোলব্রুক ছয় বছর ভারতে কোম্পানির ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভের পর, তাঁর বাবাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ভারত আগের মতো সোনার খনি নেই। ইউরোপ থেকে আগতরা এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদেশ ছাড়তে চাইছেন। বিউয়ার জানাচ্ছেন, কোলব্রুক ভারতে আসা পর্যন্ত মোটামুটি ৬৬১ সিক্কা আয় করেছিলেন মাত্র।[19]

বলা বাহুল্য, কোম্পানির চাকরির পাশাপাশি কোম্পানি অফিশিয়ালরা স্বনামে অন্যান্য ব্যবসা শুরু করবার ফলে, কোম্পানির লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তাই ১৭৭৩ সালে বিচার ও রাজস্ব বিভাগে কর্মরত সিভিলিয়ানদের ব্যক্তিগত ব্যবসার সমূহ পথকে আটকানোর জন্য 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' পাশ হয়। এই আইনের ফলে একজন কোম্পানি অফিশিয়ালের ধনপতি হতে গিয়ে অনেকটা সময় লেগে যেত। আমরা জন শোরের আত্মজীবনী দেখলে বুঝতে পারব, তিনি যখন ১৭৬৯ সালে ৯৬ টাকা মাইনে নিয়ে কোম্পানির তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে চাকরি শুরু করেন, তখন সেই টাকা থেকে বাড়িভাড়া মিটিয়ে, আনুষঙ্গিক খরচ করে তাঁর হাতে বেঁচেবর্তে থাকত খুব অল্প টাকা। অন্তত ২০ বছর চাকরির সাথে যুক্ত না থাকলে টাকা-পয়সা আয় করার ক্ষেত্রে ভারতে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব ছিল না বলে তিনি জানিয়েছিলেন। শোর ধৈর্য ধরে ভারতে তবু কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন বলে, তিনি ২০ বছর পর আয়ের ২৫,০০০ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, বেশিরভাগ ইংরেজ যুবক যারা

---

[17] Mr. Webb, 'Journal from Calcutta in Bengal, by Sea, to Bufferah', (London:Printed for T. Kinnersly, in St. Paul's Church Yard, MDCCLVIII/1758), pp. 1-3

[18] Theon Wilkinson, 'Two Monsoons', (London: Duckworth, Firstedition 1967), pp.1-3

[19] Douglas Dewar, 'Bygone Days in India', (London: John Lane the Bodily Head Ltd.,1922), p.181

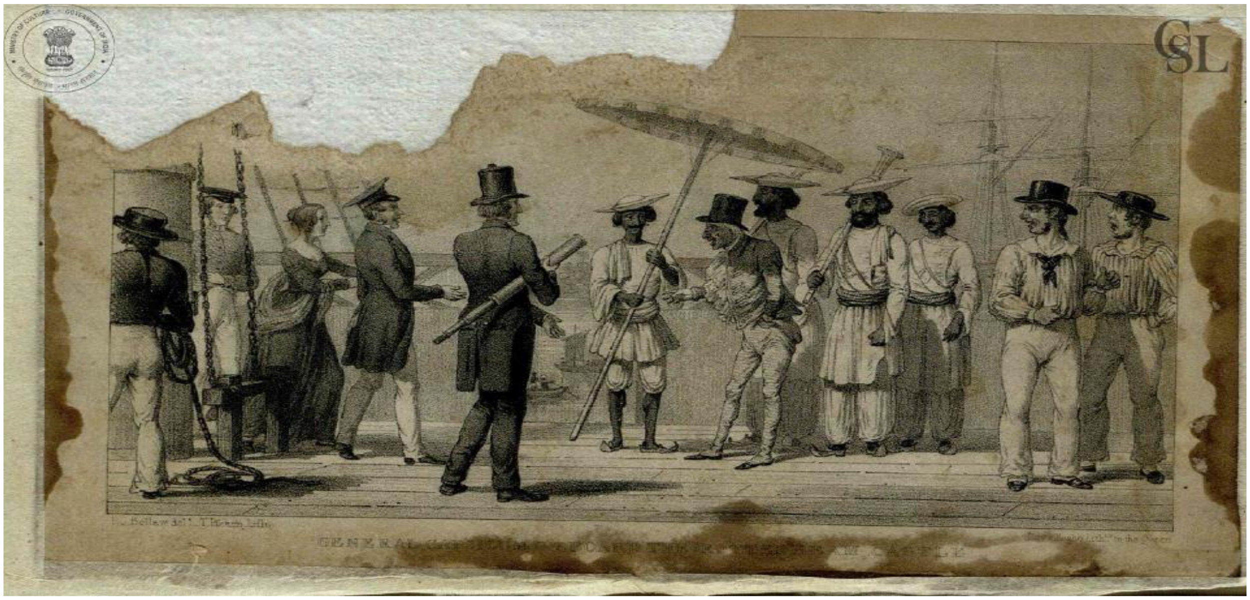

চিত্র ৩.২: জেনারেল ক্যাপ্সিকাম Rottenbeam Castle জাহাজে উঠতে যাচ্ছেন। জেনারেলের সাহেবিয়ানার সাথে জাহাজ থেকে নামা এদেশে নতুন সাহেবদের সাহেবিয়ানাতে একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। কারণ জাহাজ থেকে নামা সাহেবরা টেইল কোট-ট্রাউজারস-ব্রিমড হ্যাট-বুটে সজ্জিত বিলিতি রুচিশীলতাকে নিয়ে নতুন বিশ্বে ভাগ্যান্বেষণে এসেছেন আর জেনারেল ক্যাপ্সিকাম ক্রান্তীয় বিশ্বে ভাগ্যের ফেরটা কেমন, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা পেয়ে ভগ্ন দেহ ও ভগ্ন বেশে হাল্কা রঙের (দেশীয় তন্তুর) কাপড়ে বানানো কোট, ব্রিমড হ্যাট পরে জাহাজে উঠতে যাচ্ছেন। ডকে উপস্থিত অন্যান্য সাহেবদের পোশাকের হাল্কা ও ঢিলেঢালা ভাবও লক্ষনীয় (সূত্র: Captain Bellew, *Memoirs of Griffin*, p. 94)।

এদেশে কোম্পানির কাজে এসে উন্নতি করতে পারেননি, সেটা কেবলমাত্র তাঁদের ছেলেমানুষি চাঞ্চল্যের জন্য।[20] কিন্তু ১৭৮৭ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস জানিয়েছিলেন, রেগুলিটিং অ্যাক্টের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক অফিশিয়ালদের স্বনামে ব্যক্তিগত ব্যবসা করবার পথ থেকে সরানো গেলেও, তাঁদের জালিয়াতির মানসিকতা পাল্টানো যায়নি। সেই কারণেই অফিশিয়ালদের প্রায় প্রত্যেকেই আইনের ফাঁক বুঝে নিজেদের নামের পরিবর্তে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নাম ব্যবহার করে বেআইনি ব্যবসা চালাতে থাকেন। যেমন সেসময়কার বারাণসীর কালেক্টর, যিনি কিনা সরকারিভাবে মাসে ১০০০ টাকা আয় করতেন, কিন্তু বিভিন্ন বেআইনি, উপরি ব্যবসা করে তিনি বছরে চার লক্ষের সামান্য কিছু কম আয় করেছিলেন।[21] তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবীমহলে একটা প্রচলিত মত ছিল – এই প্রভুত পরিমাণ আয়ের সাথে সাথে এইসব

[20] L.S.S. O'Malley, 'Indian Civil Service', pp. 31-32.

[21] Ibid, p. 34

অফিসিয়ালদের জীবনযাপনে প্রাচ্যদেশীয় বিলাসব্যসনের প্রবেশ ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতক জুড়ে এ জন্যই বোধয় সাহেব মহলে একটা প্রচলিত প্রবাদ ছিল,

চিত্র ৩.৩: বিল স্মিথ অঙ্কিত কলিকাতার ঔপনিবেশিক গুরুত্ব চিহ্নিতকারী সাউথ পার্ক কবরস্থানের একটি সৌধ (সূত্র: Theon Wilkinson, *Two Monsoons*, p.5)।

"The kingdom of Bengal has a hundred gates open for entrance, but not one for departure."[22] কোম্পানির কর্মকর্তাদের দেদার বেনামি ব্যবসার সূত্রে এর দ্বৈত অর্থ বেরিয়ে আসে। এক, সুয়েজ খালপথ খননের পূর্বে বাংলায় আসা ব্রিটিশদের স্বদেশে ফিরে যাওয়া সহজ ছিল না। দুই, বাংলায় এসে নানা ধরণের অর্থকরী ব্যবসায় জড়িয়ে প্রভুত লাভবান হয়ে পড়া সেই যাওয়াটাকে আরও বিলম্বিত করে তুলত (ছবি ৩.৩ দ্রষ্টব্য)।

এইরকমভাবে অর্থসঞ্চয়ের পর তাঁরা যখন বৈভব নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতেন, এবং বিলাস-ব্যসনে দিন অতিবাহিত করতেন, তখন একদিকে তা দেখে ইংরেজদের দেশীয় সমাজের মধ্যে কলিকাতাকে নিয়ে আগ্রহ বাড়ত, অন্যদিকে ব্যঙ্গসাহিত্যে তাঁদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গরসের ফোয়ারা বয়ে যেত।[23] বাংলাদেশে যেমন ১৮৬০ এর দশক থেকে ইংরেজি শিক্ষিতদের বাবুয়ানি সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও প্রহসনের উপকরণ হয়েছিল, ইংল্যান্ডেও তেমনি উক্ত বিলাস-ব্যসনকে নিয়ে কম ব্যঙ্গ

---

[22] Theon Wilkinson, 'Two Monsoons', (London: Duckworth, Firstedition 1967), p.5

[23] বিনয় ঘোষ, "কলকাতার মন", 'মেট্রোপলিটনঃ মন, বিদ্রোহ, মধ্যবিত্ত', পৃ.১১।

হয়নি। ১৯৩২ সালে টি. জি. পি. স্পেয়ার একজন ভেনেসীয় দূতের বক্তব্যকে তুলে ধরেছিলেন। সেই বক্তব্যটা এরকম—যখনি তারা কোনো হ্যান্ডসাম বিদেশিকে দেখেন, তখনি তাদের মনে হয় সেই বিদেশি ইংলিশম্যান ছাড়া অন্য কেউ নন। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ইংরেজরা নিজেদের পোশাকি সংস্কৃতির সাথে জাতীয় গৌরবের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন।[24] কিন্তু ভারতবর্ষের মতো একটা দেশে বাণিজ্যিক কাজে এসে, সেই জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য যে সুবিধাগুলো দরকার, সেগুলোর থেকে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটত। এখানে কোম্পানি অফিশিয়ালদের নিজের দেশের সাথে সংযোগ যতটা না পত্রপত্রিকা আর ম্যাগাজিনের মাধ্যমে হত, তার চাইতে বেশি হত গুজব নিয়ে চর্বিত-চর্বণ করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে যেমন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ভারতে বাসকালীন সময়ে দুর্নীতির আবর্তে ঢুকে পড়া নিয়ে গুজবের ধুয়ো উঠেছিল। সেই অভিযোগকে সামনে রেখে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে এডমুণ্ড বার্ক ১৭৮৮ সাল থেকে ১৭৯৫ সালে দীর্ঘকালব্যাপী বিচার প্রক্রিয়াও চালিয়েছিলেন।[25] শুধু দুর্নীতিই নয়, বাংলা দেশে আসা ব্যবসাদার ইংরেজদের উপর স্বদেশবাসীদের নিয়মানুবর্তিতাহীনতার অভিযোগও ছিল। দূর দেশে এসে নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, স্বদেশীয় নিয়ম-কানুন থেকে দূরত্ব রচিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কম বয়সে কোম্পানির কাজে এই ক্রান্তীয় জলবায়ুর দেশে এসে তাঁদের জীবন থেকে খেলাধুলা, দৈহিক কসরতের সংস্কৃতি একপ্রকার লোপ পেত। কলিকাতায় মারাঠা ডিচ ঘেরা ফোর্ট উইলিয়ম এবং মাদ্রাজে ব্ল্যাক টাউন ঘেরা নিজেদের সংকীর্ণ পরিসরে তাঁদের আমোদের উপকরণ হয়ে উঠেছিল একমাত্র আরকের আসর এবং অলস সময় অতিবাহিত করা, ভারতীয় নর্তকীদের ‘একঘেয়ে’ নাচ দেখা বা দেশীয়দের পূজা-আচ্চায় অংশগ্রহণ করা।[26] স্পিয়ার বলতে চেয়েছেন, এহেন জীবনযাপনে প্রাচ্যদেশীয় বিলাসব্যসন যদি এসেই থেকে, তবে তা ইচ্ছাকৃত নয়; বরং পরিস্থিতির দাবি মেনে। কারণ এই দূরদেশে এসে ইচ্ছে করলেই স্বদেশে ফেরা যেত না। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল পথ খোলার আগে পর্যন্ত যাতায়াতে এইরকম দীর্ঘসূত্রিতা ছিলই।[27]

১৮৮২ সালের ‘A Drama in Muslin’ নামক উপন্যাসে বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভে ইচ্ছুক মায়ের কন্যা অলিভ বলেছিলেন, ‘when people go out to India, one never

[24] T. G. P. Spear, ‘The Nabobs: A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India’, (London: Humphrey Milford & Oxford University Press,1932), p.1

[25] E. M. Collingham, ‘Imperial Bodies: Physical Experience of the Raj, c. 1800-1947’, (Cambridge, Meldon: Polity Press, Reprint 2007), p. 14.

[26] Ibid, P. 16.

[27] Blecyden দেখিয়েছিলেন, সুয়েজ খালপথ আবিষ্কারের আগে ভারত-ব্রিটেন জাহাজ চলাচল বেশ অনিশ্চয়তাপূর্ণ ছিল। চার থেকে ছয় মাস সময় লাগত। খরচও হত প্রচুর। ব্রিটিশ মুদ্রায় ১০০০ পাউণ্ড এবং ভারতীয় মুদ্রায় ৮০০০ রুপি। Kathleen Blechyden, ‘Calcutta: Past and Present’, (London: W. Thacker & Co., 1905), p. 126; G.W. Steevens, ‘India’, (New York: Dodd, Mead &Comp., 1905), p. 69.

expects to see them again.' অর্থাৎ কোম্পানির কর্মী হয়ে বা ভাগ্য সন্ধানে ভারতগামী ব্রিটিশ যুবারা পুনরায় কবে দেশে ফিরবেন বা তাদের প্রেমিকাকে ফিরে এসে বিবাহ করবার শপথ আদপেই রাখতে পারবেন কি না, তা নিয়ে প্রেমিকাদের মনে একটা দূরাশা তৈরি হত।[28] সেই কারণে বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে *ডাবলিন কাসেল বল* পার্টিতে অংশগ্রহণকারী যুবাদের মন ভোলাতে আইরিশ মায়েরা যুবতী মেয়েদের সেখানে পাঠাতেন। যাতে বিদেশ-বিভুঁয়ে শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গহীন যুবারা তাৎক্ষণিক প্রেমে বিভোড় হয়ে সেই যুবতীদের বিয়ে করে তাঁদের সাথে নিয়ে যান এবং পরিবারও যেন কন্যাদায় থেকে মুক্তি পায়। সেই পার্টিতে গিয়ে অলিভের বোন মে গোউল্ড একজন পুরুষের সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন এবং সেই পুরুষের দ্বারা ত্যক্তও হন। এরপর দেখা গেছে গোউল্ড বাড়িওয়ালিরর কাছে বাড়িভাড়া পেতে বলছেন, তাঁর স্বামী ভারতবর্ষে রেজিমেন্ট অফিসার হিসেবে যোগ দিতে গেছেন। কারণ তিনি জানতেন, এহেন সামাজিক কলঙ্ক থেকে বাঁচতে এর চাইতে ভালো রক্ষা কবচ হয় না। কারণ যে স্বামী ইন্ডিয়ায় গেছেন, তিনি কবে ফিরবেন বা আদপেই ফিরবেন কিনা, অন্তত এই সহানুভূতিতেই একজন একাকিনী সন্তানসম্ভবাকে কেঊ বাড়িভাড়া দিতে নস্যাৎ করতে পারবেন না—এই বোধটুকু তিনি অর্জন করেছিলেন।[29]

সুতরাং স্বজনহীন এই দূরদেশে এসে জীবনকে উপভোগ করবার ইচ্ছায়, তাঁদের বেশিরভাগ সময় নবাবি ও দেশীয় আদব-কায়দার শরণাপন্ন হতে হত। আরকের সাথে জল মিশিয়ে খাওয়া থেকে, পান চিবোনো, বাঈজী নাচ দেখা, হুক্কায় ধূমপান করা, অনেক সময় হিন্দু পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী হওয়া অথবা মুসলমান নারীকে বিয়ে করা বা হিন্দুস্তানী মেয়ে বন্ধু রাখা, দেশীয় পোশাক পরা, দেশীয় ভাষা রপ্ত করা এরকম বহু দেশীয় পরিসরের সাথে তাঁরা মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বিজ্ঞাপনে এমনও দেখা গেছে, ভারত ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যেতে উদগ্রীব সাহেব হিন্দুস্তানী মহিলা বন্ধু সমেত বাগান বাড়ি বিক্রি করতে চেয়েছেন।[30] অবশ্য এর পেছনে মূল কারণই হল, তখনও পর্যন্ত তাঁদের বস্তু দেহের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক রচিত না হওয়া। কিন্তু তাঁরা যে এহেন জীবনচর্যার মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতের সাথে বিলীন হয়ে যেতে পেরেছিলেন, সেটা বলা যাবে না।

Madras Dialogues এ জন এবং পিটারের কথোপকথনে উঠে আসছে ভারতীয় পরিবেশে হোয়াইট ওয়াইন, রেড ওয়াইন, ক্ল্যারেট ওয়াইন, রেহনিস ওয়াইন, মজেল্লে ওয়াইন, পার্সিয়ান ওয়াইন, মুসাদেল ওয়াইন, মাল্মসি ওয়াইন, ম্যাদেরিয়া ওয়াইন এবং পাল্মা ওয়াইনের মধ্যে কোনটি

---

[28] George Moore, 'A Drama in Muslin: A Realistic Novel', (London: Vizetelly & Co., 1882), pp. 328-329.

[29] Ibid, PP. 256-258.

[30] Calcutta Gazette, 16th June 1809; B.V. Roy, 'Old Calcutta Cameos', (Calcutta: Dipali Press, 1946), pp. 29-30.

পান করা শ্রেয়, এই সংক্রান্ত প্রশ্ন। পিটার জনকে উত্তর দিয়েছিলেন—"এখানে কেউ তৃষ্ণার্ত বোধ করলে, তিনি একটি গ্লাসের চারভাগের তিনভাগ জল নিয়ে বাকি একভাগে মদিরা মিশিয়ে পান করেন"। এতে তৃষ্ণা মেটে এবং আরাম বোধ হয়। অবশ্য জন এই কথাটা শুনে খুবই অবাক হয়েছিলেন।[31] উনিশ শতকের শেষের দিকে যেমন জে এম কানিংহামও ক্রান্তীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বল্পাহার, বারে বারে আহার, মদ্যপান না করে নির্মল জল পানের উপদেশ দিয়েছিলেন।[32] কারণ ইউরোপীয়রা ক্রান্তীয় সূর্যকে ভয় পেতেন। ক্রান্তীয় উত্তাপ ও আর্দ্রতায় নিজেদের ফেলে আসা জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যক্ষয় হোক তা চাইতেন না।[33] সেকারণে অনেকেই মুঘলী ধরণের আলখাল্লা পরে শরীরের সাথে বাতাসের যোগাযোগের পথকে সুগম রাখতেন। অষ্টাদশ শতকের ৭০-এর দশকে ফোর্ট উইলিয়ামে চিফ জাস্টিস হয়ে আসা স্যার ইম্ফে এদেশের মানুষের পারিচ্ছদিকতা দেখে বলেছিলেন – এরা মোজা ও জুতো পরতে জানেন না, এদেরকে শেখাতে হবে।[34] কিন্তু সরকারি দায়িত্বের প্রতীকি বোঝা বয়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী স্বদেশীয় পোশাকে থাকলেও, তাঁর সন্তানদের এদেশীয় পোশাক অর্থাৎ ঢোলা আঙরাখা ও চুড়িদার পাজামা পরাতে দেখা গেছিল। যাতে শিশুদের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকে (ছবি ৩.৪ দ্রষ্টব্য)।

তবে বেশ কিছু কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেও ভারতীয় পোশাকি শিষ্টাচার দেখা গিয়েছিল। ভারতীয় জীবনশৈলীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ জন শোরের কথাই ধরা যাক না, তিনি ফারুকাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট হবার পরও ভারতীয় পোশাক পড়ে সরকারি অফিসে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। যে কারণে ১৮৩০ এর দশকে কোম্পানিকে ব্রিটিশ অফিশিয়ালদের পোশাক সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশে পরিবর্তন আনতে হয়েছিল।[35] কিন্তু ১৮৩০ এর দশকেই যে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রথম ভারতীয় জীবনাচরণের সাথে তাদের সাম্রাজ্যিক দেহের দূরত্ব রচনা করতে চেয়েছিল – তা নয়। সরকারি রিপোর্টে দেখা গেছে উনিশ শতকের শুরু থেকেই এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ১৮১০ সালে কোম্পানির সরকার একটা নির্দেশনামায় ব্রিটিশদের ভারতীয়দের মতো

---

31 Spear, 'The Nabobs', p. 19

32 জে এম কানিংহাম, 'ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহের নিমিত্ত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম পুস্তক', (কলিকাতা: প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, ১৮৮১), পৃ ৩৫।

33 Anne de Courcy, 'Fishing Fleet: Husband Hunting in the Raj', (London:Weidenfeld & Nicolson, First published 2012),p.85

34 শংকর, 'কত অজানারে', (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর ১৯৫৯), পৃ ১৬।

35 Beware, 'Bygone Days', p. 185.

পোশাক-আশাক ধারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।[36] ১৮২৬ সালের ১২ই জানুয়ারি তেমনি আরেকটি রিপোর্টে কোম্পানি তার সিভিল সার্ভেন্ট এবং পদাধিকারী অফিসারদের কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে ভারতীয় পোশাক পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[37] গিল্মর এই প্রচেষ্টাকে সাম্রাজ্যবাদের 'উপযোগিতা' সৃষ্টির তাগিদ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যে উপযোগিতাবাদের মূল উদ্দেশ্য হল, দেশীয় ধর্ম, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানকে স্থির এবং দূষিত হিসেবে সাব্যস্ত করে, সেখান থেকে

চিত্র ৩.৪: ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের সাথে স্যার ইম্ফে ও তাঁর পরিবার (সূত্র: Dalrymple, Forgotten Masters, pp.41-42)।[38]

---

[36] Dress to be Worn by Europeans, Home Department, Calcutta, 1810, National Archives of India, New Delhi.

[37] Government Order in Old Office Records 1826, Hyderabad Residency, National Archives of India, New Delhi, pp. 150-152.

[38] । Johan Zoffany, ১৭৮৩ সালে 'The Impey Family with a band of Indian Musicians' শীর্ষক এই তৈলচিত্রটি আঁকেন। বলা বাহুল্য স্যার ইম্পে ছিলেন ফোরট উইলিয়মে স্থিত সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বিচারপতি। তাছাড়া তিনি রাজা নন্দকুমারকে জালিয়াতি মামলায় ফাঁসি দিয়ে চর্চিত ও বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। এই উদ্‌ভুত বিতর্ককে সামাল দিতে তাকে ইংল্যান্ড যেতে হয়, ১৭৮৩ সালের শরৎকালে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর *Burying Ground Road* (এখন Park Street)এর বাসভবনে পরিবারের সাথে গান শুনে অবসরযাপনকালে এই ছবিটি আঁকা হয়। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে,

ইংরেজদের সাম্রাজ্যিক দেহকে সরিয়ে আনা।[39] এমনকি দেশীয়দের শাসনব্যবস্থার উঁচু পথ থেকে সরিয়ে আনার তাগিদও তার সাথে যুক্ত ছিল। গিল্মরের ভাষায়, - 'The nabobs and their sartorial vulgarity had been replaced by men in black frock coats who wished to emphasize their Britishness and to demonstrate the moral and cultural superiority of their civilization.'[40] অর্থাৎ এদেশে সাম্রাজ্যবাদের বীজ উপ্ত হওয়ার সাথে সাথে 'white Mughal' বা 'nabob'দের উপনিবেশের পোশাকি শিষ্টাচার অনুশীলন 'অশ্লীল', 'অশোভন' হিসেবে দেখা শুরু হয়। তুলিকা গুপ্ত লিখেছেন, ভারতীয় আবহাওয়ার সাথে নিজেদের স্বাদেশিক পোশাকি শিষ্টাচারকে মানিয়ে নিতে তারা অপেক্ষাকৃত হালকা গড়নের এবং লুস কাটের পোশাকে মনোনিবেশ করতে থাকেন।[41]

তবে জন শোরের মতো স্বাধীনচেতা অফিশিয়াল ১৮৩৭ সালে এসব নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে মতপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, নবাগত ইউরোপীয়রা তাঁদের পোশাকে-আশাকে নেটিভদেরকে অজান্তেই বিস্মিত করে দেন। সেই বিস্ময় থেকে এমনিতেই নেটিভরা দূরে সরে থাকেন সাদা চামড়ার ইউরোপীয়দের কাছ থেকে। সুতরাং নবাগতরা যদি নেটিভদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, তাঁদের কুক্ষীগত পোশাকি ধারণার বাইরে বেরিয়ে আসা উচিত। কোট-হ্যাট-প্যান্টালুন-বুট-স্টিকে সজ্জিত না হয়ে আলখাল্লা (Dressing Gown) পরে বেরুনো উচিত। তিনি স্বদেশীয়দের উদ্দেশ্য করে লিখছেন, সম্পর্ক আসলে কিছু ছোটো ছোটো ক্রিয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেই আপাত ছোটো ক্রিয়াগুলির বিষয়ে তাঁদের আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

মোগল পোশাক পরে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে একদল সংগীতজ্ঞ তবলা, তানপুরা, খঞ্জনীতে তাল দিচ্ছেন এবং সেই তালে তালে ইম্পে মহাশয়ের একটি কণ্যা ভারতীয় পোশাকে অর্থাৎ চুড়িদার এবং লম্বা অঙ্গরাখা পরে কত্থক নাচ করছে। স্যার ইম্পেকে তালের সাথে সাথে তালি দিতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ইম্পের আরেক কন্যাকে দেখা যাচ্ছে, সে মিস ইম্পের কাঁধে হাত দিয়ে দেশীয় স্টাইলে চুড়িদার ও জামা পরে দাঁড়িয়ে গান ও নাচ উপভোগ করছে। এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য হল, ইম্পের দুই কন্যাকেই কিন্তু দেশীয় অভিজাতদের পরিচ্ছদশৈলীকে অনুসরণ করে পোশাক পরানো হয়েছে। কিন্তু স্যার ইম্পে এবং মিস ইম্পে বিলিতি পরিচ্ছদশৈলীতেই দেশীয় সংগীতজ্ঞ এবং আয়াদের সাথে মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করছেন। এই চিত্রটিকে দেখে মনে হয়, শরীরের বয়সও যেন একটা শ্রেণির সামনে আরেকটা শ্রেণির ক্ষমতার সংজ্ঞা তৈরির চাবিকাঠি।

Johann Zoffany দ্বারা ১৭৮৩ সালে অঙ্কিত 'The Impey Family with a band of Indian Musicians' শীর্ষক এই ছবিটি বর্তমানে Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid এ সংরক্ষিত আছে। আমি ছবিটি নিয়েছি, William Dalrymple (ed.), 'Forgotten Masters: Indian Painting for the East India Company', (London: Philip Wilson Publishers, rirst Published 2019), pp.41-42 থেকে।

39 David Gilmour, 'The Ruling Caste: Imperial Lives in Victorian Raj', (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2006), pp. 11-13.

40 Ibid, p. 11.

41 Toolika Gupta, 'The Birth of Sherwani: The Influence of British Rule on Elite Indian Menswear', (New Delhi: South Asian Press, November, 2022).

তাঁর ভাষাতেই যদি বলি, ‘I have no wish to persuade my countrymen to give up their beef and veal; but I would advise them not to have these meats put upon the table while respectable Brahmins were standing around it’.[42] শুধুমাত্র এটাই নয়, ১৭৭২ সালের সিভিল সার্ভেন্ট, ১৭৮৮ সাল থেকে বেনারসের রেসিডেন্ট ও পরবর্তীতে ১৬ বছর ধরে বোম্বের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করা জোনাথান ডানকানের দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি সহিষ্ণুতা এবং ভালোবাসা ভারতবাসীর কাছে তাঁকে আপন করে তুলেছিল। মলেই বলেছেন, ডানকানের এই ঔদার্য বেনারসের গণপরিসরে এতটাই সমাদৃত হয়েছিল যে, সেখানে অশেষ দয়াবান, সহৃদয় মানুষকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ‘ডানকান সাহেব কা ছোটা ভাই’ এরকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল।[43] ৩৯ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে তিনি আচারে-বিচারে-ব্যবহারে এতটাই নিষ্ঠাবান হয়ে উঠেছিলেন যে, মলেই’এর মতে তিনি যেন বামুন হয়ে উঠেছিলেন।[44]

এই নিষ্ঠার পিছনে যে কখনো রাজনৈতিক বাসনা কাজ করেনি তা বলা যাবে না। ভারতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের “Brahmins of Superior Order” ঘোষণা করা জেসুইট মিশনারি Robert de Nobili’র কথা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে।[45] অবশ্য সকল ইংরেজই যে রাজনৈতিক ফন্দির দাস ছিলেন – তেমনটাও বলা যাবে না। রাজনারায়ণ বসু যেমন স্টুয়ার্ট নামের একজন ইংরেজ সৈনিকের কথা বলেছিলেন, যিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বহুদিন যাবৎ সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। দেশীয় সংস্পর্শে থাকতে থাকতে হিন্দুধর্মীয় আচার-বিচার ভালোবেসে তিনি গ্রহণও করেছেন। বাড়িতে পূজারি রেখে শালগ্রাম শিলার পুজো করাতেন। তাছাড়া সেকালে লোকমুখে একটি কথা প্রায়ই ঘুরে বেড়াত। কালীঘাট মন্দিরে নাকি প্রথমেই কোম্পানির নামে পুজোর পর, অন্য ভক্তের নামে পুজো হত।[46] মি ওয়ার্ড বলেছেন, সরকার বাহাদুর ব্রিটিশ আর্মির চারিদিকে সাফল্য কামনা করে কলিকাতার গুরুত্বপূর্ণ দেবালয় কালীঘাটে ৫০০০ রুপি দান করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[47] সুকান্ত চৌধুরী দেখিয়েছেন, ক্ষমতাশালী ব্রিটিশ অফিশিয়ালরা বাংলার নামী দামী ব্যক্তিত্বদের বাড়ির দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি

---

[42] Frederick John Shore, ‘Notes on Indian Affairs’, vol.1, (London: John W. Parker, 1837), p. 81.

[43] O’Malley, ‘Indian Civil Service’, p. 43.

[44] Ibid, pp. 78-79

[45] Rev. James Chambers, ‘Bishop Heber & Indian Missions’, (London: John W. Parker, MDCCCXLVI/1846), pp. 47-49.

[46] রাজনারায়ণ বসু, ‘সেকাল আর একাল’, পৃ ২৪।

[47] John Clark Marshman, ‘The Story of Carey, Marshman, and Ward, the Serampore Missionaries’, (London: J Heaton and Sons, 1864), p. 64

ইংরেজ সেনারা পুজোয় উপস্থিত হয়ে দেবী মূর্তিকে প্রণাম করে, প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন। ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্জনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে পুজো উৎসর্গিত হয়েছিল। এমনকি এটাও শোনা যায়, কোম্পানির অডিটর জন চিপ্স না কি বীরভূমের অফিসে দুর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। দুর্গাপূজার দিনগুলোর আনন্দ-উল্লাসে ১৮৪০-এর দশকে-

চিত্র ৩.৫: কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো। (সূত্র: British Library)

-র আগে ব্রিটিশদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। ১৮৩০-১৮৪০-এর দশকের কোনো এক সময় কলিকাতার Palmer & Company'র বণিক উইলিয়াম প্রিন্সেপ (১৭৯৪-১৮৭৩) অঙ্কিত ৩.৫-এর বনেদি বাড়ির পুজোর ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, বাঈজী নাচ এবং সঙ্গীত সহযোগে ব্রিটিশ অথিতিদের আপ্যায়ন করা হচ্ছে। পরিবারের তরফে পাগড়ি, আলখাল্লায় সজ্জিত ব্যক্তি কোট-প্যান্টালুন পরা সাহেব এবং গাউন পরা ম্যামদের কুশলাদি জিগ্যেস করছেন। কিন্তু ১৮৪০ সালে আইন করে কোম্পানি বাহাদুর তা আটকে দেন। ঔপনিবেশিক ক্ষমতার শুচিতা রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।[48]

48 Sukanta Chaudhuri ed, 'Calcutta: The Living City, Vol.1: The Past', (New Delhi: Oxford University Press, December 1990).

লোকমুখে বিদেশি কোম্পানির দেশি মাতৃদেবীকে পূজার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়বার মধ্য দিয়ে এতটুকু পরিষ্কার হয় যে, ইংরেজ সমাজের সাথে দেশীয় সমাজের গতায়তের পথটা কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকেও অনেক মসৃণ ছিল। শুধুমাত্র এতটুকুই নয়, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ফরাসডাঙ্গার কাছে বসবাসকারী ইন্দো-পর্তুগীজ ঘরে জন্মানো হেন্সম্যান অ্যান্টনির কথাও এক্ষেত্রে বলা যায়।[49] যিনি ফরাসডাঙ্গার গাঁজার আসরে যোগদান করবার মধ্য দিয়ে দেশীয়দের সাথে মেলামেশা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে এদেশীয় কবিগানের পরম্পরার সাথে যুক্ত হন। দুর্গার প্রতি প্রণতি জানিয়ে তিনি গেয়েছিলেন, "যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গী! / ভজন, সাধণ জানি না মা!/ জেতেতে ফিরিংগী"। দেশীয় কবিয়ালের দল কিন্তু এক্ষেত্রে নিজেদের ধর্মের সাত্ত্বিকতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। তাই বিপক্ষ কবিওয়ালা আন্টুনির প্রার্থনাকে ব্যঙ্গ করে গেয়েছেন—"ঈশুখ্রীষ্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে।/ তুই জাতফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গি পারবি না ক তরিতে"।[50] বিজাতীয় সাদা চামড়ার ব্যক্তির দুর্গার উপাসনায় দেশীয় ধর্মীয় আবেগ যেন কোথাও আঘাতপ্রাপ্ত। আর সেই আঘাতকে সামলাতে বিপক্ষ কবিয়ালের কন্ঠে খেউরের অবতারণা দেখিয়ে দিচ্ছে সাদা চামড়ার সমাজ ও বাদামি চামড়ার সমাজের মেলামেশার জগতেও কোথাও যেন জটিলতা আছে। কোম্পানি কালীঘাটের কালীকে পুজো দিচ্ছে—লোকমুখে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়বার কারণ দেবীর দৈব ক্ষমতার উপর ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখা কোম্পানির বিশ্বাস। কিন্তু একজন সাদা চামড়ার ভবঘুরে, বিষয়-বাসনাহীন মানুষ কেবলমাত্র দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি খাঁটি টানে যখন সেই সংস্কৃতিকে আত্তীকরণ করতে শুরু করেন, তখন থেকে সাদা চামড়ার গা থেকে ক্ষমতার গন্ধ উবে যেতে শুরু করে। তাই দেশীয় সমাজের তাঁর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ভয়ের লাগাম শিথিল হয়ে যায়। তার উপর তখন তো ফরাসডাঙ্গায় ফরাসি আধিপত্য বিস্তৃত, পর্তুগিজ আধিপত্য নয়। সুতরাং কবিগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁকে প্রতিপক্ষ দেশীয় কবিয়ালের খেউরের সম্মুখীন হতে হয় এইভাবে—"বলো হে আন্টুনি, একটি কথা জানতে চাই/এসে এদেশে তোমার গায়ে কেনো কুর্তি টুপি নাই"। কিন্তু বাঙ্গলিত্বের প্রতি ভালোবাসা জাহির করে, সাহেবি অহং বর্জিত অ্যান্টনি এর সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন এইভাবে—"এই বাংলায় বাঙ্গালির বেশে আনন্দে আছি।/ হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি।/ শ্বশুর বাড়ি বাপের বাড়ি, একই পোশাক একই বেশ/ এই মাটিতে জন্ম আমার/ ফিরিঙ্গির বাঙালাদেশ"।[51] দেশীয়ত্বের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর সাহেবি অহংকে খোঁচা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করা হলেও, "শ্বশুর বাড়ি বাপের বাড়ি একই পোশাক একই বেশ" বলে তিনি যেন জাত্যাভিমানী

---

[49] The Indian Daily News, 1898.

[50] রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল', পৃ ৩৩-৩৪

[51] অজিত রায়, 'বাংলা স্ল্যাং, সমুচয় ঠিকুজিকুষ্ঠি', (কলকাতা: গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা, ২০১৭), পৃ ৩৫; চলচ্চিত্র- *অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী,* পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার- সুনীল ব্যানার্জী, সঙ্গীত পরিবেশনা- অনীল বাগচী, ভাষা- বাংলা,ছবি মুক্তি-৬ অক্টোবর, ১৯৬৭। (হহফহচলচ্চিত্র, Archive.org)

সমাজকে পাল্টা খোঁচা দিয়েছেন। কারণ এই জাত্যাভিমানী সমাজ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পায়ে তৈলমর্দন করতে গিয়ে নীতিচ্যুত হন। তাই উপনিবেশিক প্রভুদের সামনে তাঁদের একরূপ প্রকট হয়, আবার ব্যক্তিগত পরিসরে তাঁরা ভিন্নরূপে অবস্থান করেন। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল, অ্যান্টনির সাথে দেশীয় কবিয়ালদের কবিগানের মধ্য দিয়ে কথোপকথনকে যদি 'টেক্সট' হিসেবে দেখি, তবে বোঝা যায় সমাজে ব্যক্তির মান্যতা লাভে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান কতটা জরুরি। কারণ সেই অবস্থানই ব্যক্তিকে ক্ষমতার পরিসরের সাথে সহজেই যুক্ত করে।

এদেশীয় সমাজের সাথে গতায়তের পথটা যে শুধুমাত্র লোকায়ত ক্ষেত্রেই ছিল – তা নয়। উনিশ শতকের প্রথমেও এদেশে ব্রিটিশদের দরবারি সংস্কৃতিতে মুসলমানি দরবারি সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। কলকাতায় লর্ড ওয়েলেস্লির দরবার সম্বন্ধে ১৮০৩ সালে লর্ড ভ্যালেন্সিয়ার বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়। সেই দরবার কক্ষ সুচারু কাজ করা পার্সি গালিচায় ঢাকা ছিল। সেই গালিচার অপর প্রান্তে স্থাপিত হয়েছিল সোনা ও ক্রিমসনে মোড়ানো একটা মসনদ। একসময় যার অধিপতি ছিলেন টিপু সুলতান। কিন্তু ইংরেজ আধিপত্যের ফলে তা হাতবদল হয়ে আসে ইংরেজের হাতে। ভ্যালেন্সিয়া লিখেছেন, লর্ড ওয়েলেস্লির উপস্থিতিতে সেই দরবার কক্ষে দেশীয় রাজ-রাজরাদের উপস্থিতিতে সান্ধ্যভোজ পর্যন্ত নাচ চলেছিল।[52] ই. এম. কলিংহাম বলেছেন, "Oriental Despot"-দের এসব দরবারি শিষ্টাচারের দ্বারা প্রভাবিত ব্রিটিশরা যখন স্বদেশে ফিরে যেতেন, তখন অনেক উদ্বেগ নিয়ে তাঁদের ফিরতে হত। কারণ প্রাচ্যবিদরা এসব "Oriental Despot"দের শাসন-শোষণ নিয়ে সমালোচনা করলেও, ভারতশাসনকারী ইংরেজরা সেই "Despot"দের দেখালো দরবারি আড়ম্বরকে এড়িয়ে যেতে পারেননি।[53] যার ফলে ভারতে ব্রিটিশদের পাল্টে যাওয়া জীবনযাত্রা এবং প্রাচ্যের দ্বারা প্রভাবিত নবাবি চালচলনকে তাঁদের দেশীয় সমাজে বাঁকা নজরে দেখা হত।[54] আমরা যদি শার্লক হোমসের গল্পগুলোর অপরাধপ্রবণ সাহেব চরিত্রগুলোর দিকে তাকাই, সেখানেও দেখতে পাব চরিত্রগুলোর জীবনের একটা সময় প্রাচ্যে কেটেছে। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের মানসে প্রাচ্যের সাথে অপরাধ প্রবণতার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ভাবা হচ্ছিল, উপনিবেশের দূষিত সামাজিক শিষ্টাচারে জারণের প্রভাবে সাহেবি

---

[52] Viscount George Valentia, 'Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, and Egypt, in the Years 1802, 1803,1804, 1805 & 1806', Vol. 1, (London: Printed for William Miller, Albemarle-Street, 1809), p.61.

[53] E.M. Collingham, ' Imperial Bodies', pp. 14-15.

[54] Ibid, pp. 35-36

পরিশীলনে আঘাত আসে। প্রাচ্যদেশের শোষণাত্মক অপরাধ প্রবণতাও সাহেবদের অবচেতনে গ্রাস করে।[55]

তাই প্রাচ্য থেকে সদ্য ফিরে আসা সাহেবরা নিজেদের স্বাদেশিক পোশাকি রুচি নিয়ে সর্বদা সজাগ থাকতেন। এতদিন ক্রান্তীয় অঞ্চলে থেকে সেই রুচির হয়ত কিছুটা অন্যথা হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশে ফিরে সেই রুচির পুনঃস্থাপনা নিয়ে তারা তৎপর হয়ে উঠতেন। ১৮৭৮ সালে Edmund C. P. Hull লিখেছেন, বহুদিন প্রাচ্যে বাসের পর "Old Indian"রা[56] যখন দেশে ফিরতেন, তখন নিজেদের স্বদেশবাসী জাত-ভাইদের পোশাকের সামনে নিজেদের পোশাককে অদ্ভুত মনে হত। সে পোশাক ভারতের যত নামী দর্জির কাছেই সেলাই করা হোক না কেন! বিখ্যাত ভারতীয় দর্জির কাছে সেলাই করা ওভারকোট নিয়ে হুল নিজে যখন লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন, তাঁর মনে হয়েছে, তিনি লণ্ডনের চলমান ফ্যাশনের হাওয়া থেকে পিছিয়ে পড়েছেন।[57] একইরকম অবস্থা তাঁর বন্ধুরও হয়েছিল। সদ্য দেশে ফিরে তিনি যখন লক্ষ্য করলেন, তাঁর পরণের পোশাকটা অনেকটাই ঢোলা তখন তাঁর নিজেকে স্বদেশে পরদেশীর মতো বোধ হয়েছিল। তাই চল্লিশ টাকা খরচ করে পোশাকগুলি দর্জিকে দিয়ে ফিট করিয়েছিলেন তিনি। কলিংহামের মতামত অনুসরণ করে বলতে হয়, সমুদ্রপাড়ি দেওয়া সাদা-চামড়ার মানুষদের শত সরকারি নিয়মাবলী সত্ত্বেও "যস্মিনদেশে যদাচার" অনুসরণ করতেই হত।[58] গরমের দেশে ফিটিংস স্যুট-বুটের ফ্যাশন অনুশীলন করা সম্ভব ছিল না। ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় এরূপ ফিট পোশাক পরিধান স্বাস্থ্যের পক্ষে নানাভাবে হানিকারক ছিল। যে হানির কথা মাথায় রেখে ক্রান্তীয় ভারতে এসে স্বাদেশিক পোশাকি শিষ্টাচারে পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। জনৈক ডাক্তার বলেছেন, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের একটা সাধারণ অসুখ ছিল হার্ট ও মহাধমনীর অসুখ। ডাক্তার আর এইচ হান্টার, 'Medical & Physical Society of Bombay'র কিছু আলোচনাচক্রে বলেছিলেন, ভারতে Queen's Royal Regiment'এর মধ্যে হার্টের অসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটার মূল কারণ হল, তাদেরকে ভারতীয় আবহাওয়ায় টাইট-ফিট কাপড় পরে কুচকাওয়াচ করতে হয়। টাইট-কাপড় ও ক্রান্তীয় আবহাওয়ার মধ্যে এমন বৈরী সম্পর্কের বিষয়ে অনেক মেডিকেল বুকেই লেখা হয়েছিল। যেখান

---

55 অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত, 'শার্লক হোমস রচনাসমগ্র' সটীক সংস্করণ, (কলকাতাঃ লালমাটি, পঞ্চম মুদ্রণ ২০২১) থেকে "The Adventure of the Specked Band", পৃ ৯১-১০৪; "The Baskem Valley Mystry", পৃ ৪৬-৫৯; "The 'Gloria Scott'", পৃ ২০৪-২০১৩।

56 যারা বহুদিন প্রাচ্যে বাস করেছেন, তাদের বলা হত।

57 Edmund C. P. Hull, 'The European in India or Anglo-Indian's Vade-Mecum', (London: C. Kegan Paul & Co., 1878), pp. 4-5.

58 Ibid.

থেকে সচেতন হয়ে ভারতবাসী ব্রিটিশরা হালকা ঢোলা পোশাক পরতে শুরু করেননি – তা বলা যাবে না।[59]

যেহেতু আমরা দেখেছি, এদেশে বাণিজ্য বিস্তারের একটা পর্যায়ে এসে বণিক কোম্পানির শাসনতন্ত্র চালু হয়েছে, সেহেতু কোম্পানি অফিশিয়ালদের দ্বারা দেশীয় আচার-বিচার গৃহীত হওয়ার পেছনে শুধুমাত্র জলবায়ুর বিরূপতাকে দায়ী করলে—তা বোধয় দায়সারা গোছের দাবি হয়। তাই ব্যবাসায়িক ও রাজনৈতিক গুঁটি সাজানোর পাশাপাশি ভারতীয় সাম্রাজ্যের তৎকালীন মুঘল দরবারি সংস্কৃতি বা অন্য দেশীয় সংস্কৃতি মেনে চলার মধ্যে নিজেদেরকে দেশীয় সমাজের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে অস্বীকার করবার করবার উপায় নেই।[60] আর সেই ইচ্ছেটা অনেক সময় সাদা চামড়ার অফিশিয়ালদের কূটনীতিক মানসিকতা থেকেও জন্ম নিয়েছিল। জন শোর ইউরোপীয়দের অন্যের সংস্কৃতিকে আঘাত না করে নিজের সংস্কৃতি পালনের কথা বলেছিলেন, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের জন্য প্রয়োজনে মোঘল দরবারি শৈলীর আদলে পোশাক পড়তে বলেছিলেন, যাতে নেটিভরা তাঁদের সাথে একাত্মতা অনুভব করবার সুযোগ পান এবং সে সুযোগে তাঁরাও যেন দেশীয় মনস্তত্ত্বকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ১৭৯০ সালে হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশ এবং প্রতিপক্ষ ফরাসি অফিসারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। সেই সময় উভয় পক্ষের মধ্যেই সেখানকার দেশীয় জীবনচর্যার সাথে তরলবৎ মিশে যাওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছিল।[61] হায়দ্রাবাদী ঐতিহাসিক গুলাম ইমাম খান *তারিখ ই খুরশিদ জাহী*-তে বলেছেন, হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট জেমস কার্কপ্যাট্রিক (১৭৯৮-১৮০৫) অনেক ইংরেজ অফিশিয়ালদের মতো নাক উঁচু স্বভাবের ছিলেন না। খুবই দিলদার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। দেশীয় ভাষাটাও ভালো মতো জানতেন।[62] ১৭৯৮ সালে রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই তিনি মুসলমানি কায়দায় পোশাক পরবার প্রচেষ্টা শুরু করেন। রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পরও তিনি এই কায়দা ছাড়েননি। শুধুমাত্র কোম্পানির আদেশকে সম্মান জানিয়ে কোম্পানির মিলিটারি অফিসারদের সম্ভাষণের ক্ষেত্রে বা নিজামের দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করবার সময় তিনি বিলিতি ফ্যাশনের পোশাক পরতেন। এমনি সময় তিনি দেশীয়দের মতো হুকাতে ধূমপান, দেশীয় স্টাইলে গোঁফ রাখা, দেশীয়দের মতন ছোটো ছোটো করে চুল ছাঁট দেওয়া, মুসলমান রাজপুরুষদের মতো হাতের আঙুলে মেহেদী লাগানো—সবটাই

---

[59] Charles Moreland, M.D, ‘Clinical Researches on Disease in India’, (London: Brown, Green & Longmans, 1856), p. 528.

[60] শ্রীপান্থ, ‘রাজসিক’, (কলিকাতা: ত্রিবেণী প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ); নিখিল সুর, ‘সায়েবমেম সমাচার’, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯), পৃ ৪-৫; Collingham, ‘Imperial Bodies’, pp.19-22.

[61] William Dalrymple, ‘White Mughal’, (Penguine Books, 2002), p. 115.

[62] Ibid.

করতেন।[63] সুতরাং কার্কপ্যাট্রিক একই সাথে দুটি শরীরকে লালন করতেন। একটি শরীর ব্রিটিশ কায়দায় পোশাক পরে নিজাম দরবারে তাঁর রাজনৈতিক অফিসের প্রতিনিধিত্ব করে, আরেকটি প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর রাজনৈতিক নম্রতাকে। ব্যক্তিগত পরিসরে দেশীয় পোশাক বহাল রাখাকে এক্ষেত্রে শুধুই ব্যক্তিগত ইচ্ছে-জাত বলা যাচ্ছে না, কারণ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অংশে কোম্পানি রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেই সময় কোম্পানি ব্যক্তিগত পরিসরে পুরোদস্তুর মুসলমানি কায়দায় জীবনযাপন করা একজনকে রেসিডেন্টের পদে বহাল রাখছে। তাই কোম্পানি এই ব্যক্তিগতকে রাজনৈতিক বলে ভেবেছে কি না—এই চিন্তাটাও একটু মাথায় রাখা দরকার। সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তির মন সবসময় স্বাচ্ছন্দ্যকেই আগে বেছে নেয়। সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বিকাশের লগ্নে ক্ষমতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পর্কটা সংঘাতময় ছিল না, তাই সেসময় দেশীয় জীবনাচরণ করা, দেশীয় রমণীকে বিয়ে করা নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বিকাশের সাথে সাথে ক্ষমতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যে দ্বন্দ্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার একটা অবিসংবাদিত মানসিক অবয়ব তৈরি করা।

সুয়েজ খালপথ খননের আগে কোম্পানি অফিসিয়ালরা তাঁদের দীর্ঘ ভারতবাসের জীবনে একবারের বেশি স্বদেশে যেতে পারতেন না। উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে যেতে মাসের পর মাস সময় লেগে যেত। ঝড়ের কবলে পড়লে তো আর কথাই নেই। তার উপর অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ড থেকে স্বামী অন্বেষণে যুবতী শ্বেতাঙ্গিনীদের ঢল তখনও নামেনি। সুতরাং দীর্ঘসময় এক দেশে বাস করে তাঁদের জীবনচর্যাতে বিকল্প স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ শুরু হয়েছিল। সেই স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজেই পুনার রেসিডেন্ট পালমার এবং হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্ট কার্কপ্যাট্রিক অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে দেশীয় সুন্দরী ফেজ বক্স এবং খাঈর-উন্নীসা-কে মুসলমানি রীতি অনুযায়ী বিবাহ করেন। ধীরে ধীরে তাঁদের আচার-বিচার, পোশাক পরিচ্ছদে মুসলমানি প্রভাব প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। শাসন-ক্ষমতা বিস্তারের শুরুতে এই বিষয়টা দেশীয়দেরকে তথা পুরাতন শাসক গোষ্ঠিকে নিজেদের কাছে আনার কূটনীতি হলেও, দেশীয় রমনী বিয়ে করে মিশ্র জাতের সন্তান প্রসবের বিষয়টা আস্তে আস্তে কোম্পানির মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে থাকে। ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল হিসেবে বাংলায় অবস্থান করা লর্ড ওয়েলেসলির আমল থেকে এই বিষয়গুলোর দিকে বাঁকা নজরে দেখা শুরু হয়।[64] ১৮০৯ সালে লর্ড ভ্যালেন্সিয়া মিশ্র শ্রেণির শিশুদের বৃদ্ধিকে সাম্রাজ্যের জন্য 'ঘনায়িত ক্ষতি' আখ্যা দিয়ে লেখেন, - 'The most rapidly accumulating evil of Bengal is the increase of half-cast children.'[65] কারণ ঔপনিবেশিক কর্তাদের মনে ভয় জেগেছিল, '…this tribe may …

---

[63] । Dalrymple, 'White Mughal', p. 115

[64] Ibid, pp. 264-300.

[65] Viscount George Valentia, 'Voyages and Travels to India, Vol. 1', p. 241

become too powerful for control.'[66] কারণ সংখ্যালঘু সাদা চামড়ার অফিসে-আদালতে তাদের সংখ্যা বাড়লে, তা সাম্রাজ্যের একীভূত ও খাঁটি বিলিতি সাম্রাজ্যবাদে প্রভাব ফেলবে। তাই ভ্যালেন্সিয়ার নিদান, এসব মিশ্র-জাতের ছেলে-মেয়েদের ইউরোপে পড়তে পাঠাতে প্রত্যেক বাবাকে বাধ্য করা, এবং পড়া শেষে সেখান থেকে এদেশে ফিরতে না পারার ব্যবস্থা করা। ভ্যালেন্সিয়ার ভাষায়, '…I have no hesitation in saying that the evil ought to be stopt; and I know no other way of effecting this object, than by obliging every father of half cast children , to send them to Europe, prohibiting their return in any capacity whatsoever.'[67] ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যেম সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী কোম্পানি প্রশাসনের অন্দরে সাম্রাজ্যের স্থিতাবস্থা নিয়ে উদ্বেগও যে সচল হয়ে উঠেছিল – ভ্যালেন্সিয়ার মতামত তারই প্রমাণ রাখে।

কোম্পানি অফিশিয়ালদের মধ্যে দরবারি আদব-কায়দা বিজারিত হবার দরুণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা দেয়, সেটা হল—ব্রিটিশের সাথে আর্থিকভাবে সংযুক্ত দেশীয়রা, যাদের সাথে মুঘল দরবারি সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, এবং দরবারি আদব-কায়দার অনুশীলন যাদের জীবনে আগে তেমন প্রাধাণ্য পায়নি তাদের মধ্যেও নবাবি আদব-কায়দার বিস্তার ঘটতে থাকে। গোবিন্দরাম মিত্র, নবকৃষ্ণ দেব, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, গোকুল ঘোষাল, রালদুলাল দে, মদন দত্ত প্রমুখ যারা কলিকাতায় ভাগ্যান্বেষণে নেমেছিলেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই নবাবি জাঁকজমক সঞ্চারিত হতে থাকে।[68] সুতরাং কলিকাতার উপর ভিত্তি করে নবাবি পোশাক ও আচার-অনুষ্ঠানের এহেন বিস্তারের পেছনেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিশিয়ালদের একটা ভূমিকা ছিল। কারণ নতুন একটি দেশে বাণিজ্যিক স্বার্থে দেশীয় কারবারিদের সাথে মেলামেশার প্রয়োজনে সেখানকার মান্য আদব-কায়দাকে গ্রহণ না করে নিজেদেরকে জাত্যাভিমানের নামে আড়ষ্ঠ করে রাখা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের পরিপন্থী। আর দেশীয়দের কাছেও যেহেতু গণপরিসরে মেলামেশার ক্ষেত্রে মোগলী আদবকায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদই অষ্টাদশ শতকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত একমাত্র ভদ্রতার মানদণ্ড, সেহেতু ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় অন্যান্য কোম্পানির সাথে কারবারে দেশীয়দের তখনকার সার্বভৌম মুঘল আদব-কায়দাকেই মেনে চলতে দেখা যায়। কিন্তু সেই কায়দার সাথে যে ধর্মের কোনো সংঘাত ছিল না তা নয়। তবে সেই সংঘাতকে মানসিকভাবে অতিক্রম করে বাজারের প্রয়োজনে, লাভের প্রয়োজনে প্রত্যেকটা আদবকে স্ব স্থানে সম্মান দেবার রাজনীতিটা দেশীয়রা যেমন আয়ত্ত করেছিলেন, তেমনি ইউরোপীয়রাও। অন্তত ব্রিটিশশাহী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত তো বটেই। *সচিত্র গুলজার নগর* এ ভাঁড়

---

[66] Ibid.

[67] Ibid.

[68] বিনয় ঘোষ, 'মেট্রোপলিটনঃ মন, বিদ্রোহ, মধ্যবিত্ত', পৃ. ১১।

টিকিধারী হিন্দুর কথা বলে, পোশাকের রাজনীতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষাতেই যদি বলি, 'টেক্কা হিঁদু কখন মগলের পোষাক, কখন মোল্লার পোষাক, কখন সাহেবি পোশাক গায়ে লটকান, আহ্নিকের সময় হিঁদু হন, প্রজা ও খাতকের গলায় ছুরি দেন, রাঁড়ী ভুঁড়ির সর্বনাশ করেন, গুণের মধ্যে তিনি দাতার দশমখোর, আর হিঁদুয়ানিতে ভক্ত-বিটেল।'[69] তবে রাজনৈতিক শাসন পরিবর্তনের সাথে এই বহুরূপী সাজার সংস্কৃতিরও পরিবর্তন শুরু হয়।

কারণ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যবিস্তারের দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যতই এগিয়ে গিয়েছিল, ততই তারা আদব-কায়দার নিজস্ব মানদণ্ড তৈরি করে নেটিভদের সামাজিকতার সাথে নিজেদের দূরত্ব রচনা করতে শুরু করেছিলেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মি. শোর[70] নামক কোম্পানির একজন 'হোমরাচোমরা কর্মচারীর' কথা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। ইংরেজদের ভারতীয় জীবনাচরণ ও ভারতীয়দের মেলামেশা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ শাসনকামী ইংরেজদের মনোভাব মি শোরের আলোচনায় উঠে এসেছিল। সৌমেন্দ্রনাথের অনুবাদে তা উঠে আসে – 'একথা একেবারে স্পষ্ট যে গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে জনসাধারণের চালচলনের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ইউরোপীয়দের সঙ্গে অধিক পরিমাণে ঘনিষ্ঠ হবার স্বাভাবিক পরিণতি। আগে তাদের ইউরোপীয়দের সাথে মিশবার অধিকার দেওয়া হত না। সেই অধিকার পেয়ে তারা দেখতে পেয়েছে যে আমরাও দুর্বলতা ও পাপ মুক্ত নই এবং অন্য সবার মতো ইউরোপীয়রাও লোভের বশীভূত। আমাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বা জাতীয়ভাবে যে শ্রদ্ধা আগে তাদের ছিল তা এখন নেই। এখন নিজেদের তারা আমাদের সমপর্যায়ের বলে মনে করে।'[71] শোরের বক্তব্য যদিও সরকারি নথিতে লিখিত বক্তব্য নয়, তবে ১৮৩০ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এবং তারও আগেকার দু-দুটো নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে ইংরেজদের এদেশীয় জীবনাচরণের উপর রাশ টানতে চাওয়ার পিছনে যে এরকম ভাবনা কাজ করেনি, তা ভাবা যাবে না। কারণ যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার চরিত্রই হল নিজেকে, নিজের বস্তু শরীর, আচার-বিচারকে অন্যের কাছে অগম্য করে রেখে নিজের শুদ্ধতা রক্ষার নামে, নিজেকে অন্যের কাছে অগম্য করে রেখে, নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরা।[72] তার

---

69 ভাঁড় প্রণীত 'সচিত্র গুলজার নগর', ভূমিকা অংশ

https://archive.org/details/bub-man ea1692452r781ad9da7833dd516224

70 ইনি ফ্রেডারিক জন শোর সম্ভবত নন। কারণ ফ্রেডারিক জন সোরের মতামত আমারা আগেই দেখলাম। কিন্তু লেখক সৌমেন্দ্রনাথ মি সোর'এর বক্তব্যকে উদ্‌ধৃত করলেও, কোনো তথ্যসূত্র ব্যবহার না করায় মি সোর সম্বন্ধে বিশদে জানা সম্ভব হয়নি।

71 সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতের শিল্পবিপ্লব: রামমোহন ও দ্বারকানাথ', (কলকাতা: বৈতানিক, ১৯৬৪), পৃ ১৫।

72 ঔপনিবেশিকতার প্রয়োজনে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের পরিচালন ব্যবস্থায়,শাসকের বস্তুশরীরের সাথে নেটিভদের আচার-বিচারের দূরত্ব এমনি সুপরিকল্পিতভাবে রচিত হয়েছিল যে এবং সেই দূরত্ব এদেশীয়দের মনে এমনভাবে বসে

উপর ইউরোপে যে এনলাইটেনমেন্ট, ব্যবসায়িক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল, সেই বিপ্লবকে নিজেদের শারীরিক বৃত্তে পরিস্ফুট করে, নিজেদের আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা প্রমাণের চেষ্টা তো ছিলই।[73]

ক্রান্তীয় আর্দ্রতা, স্বাস্থ্য, পোশাক এবং ক্ষমতা: বিলিতি পোশাকি রুচি ও রাজনীতি

Mark Harrison লিখেছেন, পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র স্থাপনার তাগিদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মধ্য দিয়েই এদেশের আবহাওয়াকে জেনে সেই আবহাওয়ার সাথে সাজুয্য রেখে নিজেদের শাসকসুলভ পোশাকি ভিত্তি রচনার দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অগ্রসর হয়েছিল। সেকারণেই অষ্টাদশ শতকের ছয়ের দশক থেকে মেডিক্যাল বুক লেখার তাগিদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। যা আগে ততটা সক্রিয় ছিল না।[74] উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরকম একটি ডাক্তারি পরামর্শ বইয়ের মুখবন্ধের দিকে তাকালে বিষয়টি পরিষ্কার হবে, 'The following essay was originally written as a thesis, in order to qualify me for receiving the degree of Doctor of Medicine from the University of Edinburgh, and is now published partly in fulfillment of that object – partly in the hope of supplying the parents and guardians of young Medical Men with some adequate conception of the nature of Bengal Medical service and partly with the view of furnishing Assistant-Surgeons and young officials

---

গিয়েছিল যে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কোনো সাদা-চামড়ার ব্যক্তির এদেশীয় সমাজের সাথে অবাধে মেলামেশা সন্দেহের চোখে দৃষ্ট হত। সংকর যেমন তাঁর আত্মীয়া খুকির সাদা-চামড়ার বরের কথা বলেছেন। যিনি এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে এদেশীয় জীবনযাপনে পা গলিয়েছিলেন। শংকর লিখছেন, '...লিণ্ডসে (খুকীর বর) বাবাজীবন ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাজারে গেলে লোকে আড়চোখে দেখে, সন্দেহ করে। সায়েবরা কুলীর মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে নিউ মার্কেটে বাজার করবে, থলি হাতে গড়িয়াহাটায় কেন? পাড়ার চায়ের দোকানে লিণ্ডসেকে বসতে দেখলেও লোকে ঘাবড়ে যায়। ফারপো এবং ফ্লুরি ছাড়া নাকি সায়েবদের মানায় না। সায়েবরা মোটর না চালিয়ে সাইকেল চড়বে এ-দৃশ্য সুশিক্ষিত ইণ্ডিয়ানদের কাছেও অসহ্য। লিণ্ডসে যখন সাইকেল চালিয়ে কলেজে যায় তখন পাবলিক ভাবে লোকটা হয় পাগল না হয় স্পাই।' শংকরের আরেকজন পরিচিত বারওয়েল সাহেবও একদিন রাস্তার এক ভিখিরির ছেলেকে কাঁদতে দেখে কোলো নিয়েছিলেন বলে, রাস্তায় চলতি-ফিরতি এদেশীয় ভদ্দরলোকরা সাহেবকে 'পাগল' সাব্যস্ত করেছিলেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে শাসক শ্রেণির দেহ এতই সাধারণের কাছে অগম্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, স্বাধীনতার পর সাহেব-সমাজের মানবিক সারল্যও এদেশীয়দের হজম হয়নি। দ্রষ্টব্য শংকর, 'যেখানে যেমন', (কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৬৩), পৃ ৮৪।

73 Tara Mayer, "Clothing the Enlightened Body: European Dress in India during the Age of Reason", in Marie Fourcade and Ines G. Zupanow ed., 'L'INDE DES LUMIERES: Discours, histoire, saviors (XVIIe – XIXe siècle), (Paris: Editions de l'Ecole des hautes etudes en Sciences Sociales', Published in Opean edition 16 September 2020).

74 Mark Harrison, 'Climates and Constitution: Health, Race and British Imperialism in India', (New Delhi: Oxford University Press, 2002), pp. 3-4.

generally with some useful advice on first arriving in the country.'[75] অর্থাৎ শুধুমাত্র মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিতে আসা সাদা-চামড়ার মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্যই নয়, এদেশে এসে তাদের পোশাকি চাল-চলনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করার জন্য মেডিকেল বুকের উদ্ভব। বিদেশি বণিকের সামাজিক শরীরকে রাজ-শরীরে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় এসব বই একটা বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করেছিল। আর রাজ-শরীরে উপনীত হবার মূল ছিল – নিজেদের পোশাকি আদর্শে স্বাদেশিকতা বজায় রাখা। শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনে দূরদেশে এসে থাকতে হলেও, সেই দূরদেশের সামাজিকতার সাথে নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখে চলা। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে একটি প্রতিবেদনের দিকে চোখ দিলে, উক্ত পোশাকি আদর্শের বিষয়টা ভালো করে বোঝা যাবে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'আমার নাম নূতন সভ্যতা; আমি পূর্ব্বে এ মুলুকে ছিলাম না, সুদূর তুষারবৃত দেশ হইতে আমি সম্প্রতি এ মুলুকে আসিয়াছি। দেশ পরিবর্ত্তনে আমার রং ও পোশাক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাই এখানে আসিয়া আমাকে দুই বেলা গা ঘষিতে ও মাথা ভিজাইতে হয়; অন্যথা আমার রং ময়লা ও টেরী ভগ্ন হইয়া যায়। শীতপ্রধাণ দেশে আমার জন্ম বলিয়া এখানে আসিয়াও আমি আপাদমস্তক কাপড় ঢাকিয়া থাকি। হাত দুইটী পকেটের মধ্যে গুঁজিয়া দিই এবং সর্ব্বদা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতে ভালবাসি। যেখানেই থাকি আমার স্বভাব, হাব, ভাব ঠিক পূর্ববৎ বজায় আছে।'[76] এই লেখার মাধ্যমে উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে একজন 'নেটিভ', ভারতের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া 'সভ্যতা'র উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে যে সভ্যতার চিত্রটি আঁকলেন, সেটি একটি কর্তৃত্ববাদী সভতা। আর সেই কর্তৃত্ববাদের পোশাকি ভিত্তিটি ততদিনে তৈরি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সভ্য মানেই নগ্নতার ঠিক উল্টোটা। গরমের দেশেও আপাদমস্তক পোশাকে ঢেকে থাকাই সভ্যতার লক্ষণ।

তবে নিজেদের স্বদেশীয় পোশাকি শিষ্টাচারকে অক্ষত রেখে বাংলার ক্রান্তীয় আর্দ্রতায় আপাদমস্তক ঢেকে সভ্যতার ওজন প্রদর্শন করতে গেলে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য যে কোথাও বিঘ্নিত হয় – তা ঔপনিবেশিকরা অনুভব করতে পেরেছিলেন। অষ্টাদশ শতক থেকেই বিভিন্ন ইউরোপীয় রচনায় বাংলার জলবায়ু নিয়ে বেশ নৈরাশ্যের সুর শোনা যায়। জনৈক স্কটিশ ভদ্রলোক তো সরাসরি বাংলাকে বিশ্বের সবচাইতে খারাপ জলবায়ুর দেশ বলেছিলেন।[77] কিন্তু সেই বাংলাই যখন ভারতে নিজেদের রাজনৈতিক যাত্রার ক্ষেত্র পরিণত করল, তখন নিজস্ব পোশাকি সংস্কৃতি বজায় রেখেও 'খারাপ' জলবায়ুর দেশে পোশাকি স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন পড়ে। কারণ মুক্ত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ফলে গড়ে ওঠা শহুরে পরিসরে নূন্যতম শ্রম দিতে গেলেও

[75] John McCosh, 'Medical Advice to the Indian Strangers', (London: WM. H. Allen & Co., 1841), p. v.

[76] শ্রী বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, 'নূতন সভ্যতার আত্মকথা', বীণাপাণি পত্রিকা, ভাদ্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ, ২য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

[77] নির্বেদ রায়, 'ইউরোপীয়দের চোখে কলকাতা', (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০২২), পৃ ৪৮।

বৌদ্ধিক এবং কায়িক উভয় প্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের দরকার। আবার এই কঠিন সত্যটিও ভারতে শাসনতন্ত্র বিকাশের সাথে সাথে উপলব্ধ হতে শুরু করেছিল যে, একজন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ, সেই অঞ্চলে যতটুকু অক্লান্তভাবে ভাবতে পারেন, কাজ করতে পারেন তাঁর পক্ষে ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলে এসে ভাবনা ও কাজের তদ্রুপ স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। মন এবং শরীর স্থানীয় প্রকৃতির মধ্য থেকেই জীবনীশক্তি আহরণ করে। তাই নিজেদের আপাদমস্তক ঢাকা পোশাকি সভ্যতার বর্মটাকে বজায় রেখেও কিভাবে ক্রান্তীয় আর্দ্রতায় স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়, এই প্রশ্নটি বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে শুরু করেছিল।

চিত্র ৩.৬ & ৩.৭

চিত্র ৩.৬) ১৮৬০-এর দশকের এক সাহেবের গার্হস্থ্যে প্রধান চাকর বা ‘সরকার’। তাঁর গলায় তুলসির মালা, মাথায় পাগড়ি, লম্ব-কোঁচা ধুতি ও হাঁটু-ঝুল চোগা। অর্থাৎ পোশাকে বোঝা যায়, তিনি সাহেবের গার্হস্থ্যের একজন হিন্দু কর্মী। (@getty.edu)

চিত্র ৩.৭) ১৮৬০-এর দশকের এক সাহেবের গার্হস্থ্যে খানসামা বা ওয়েটার। তাঁর মাথায় মুঘলী ধরণে বাঁধা পাগড়ি, মুখে দাড়ি, চোগার সাথে পরনে আছে চুড়িদার পা-জামা এবং কোমরবন্ধনী। সাহেবি গার্হস্থ্যে এই ছিল মুসলিম কর্মীদের জন্য নির্ধারিত পোশাক। (@getty.edu)

এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকের তিরিশের দশকের একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ ডাক্তার জেমস জন্সনের কথা বলতে হয়। ইনি ক্রান্তীয় অসুখ-বিসুখ নিয়ে বহু পর্যবেক্ষণ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোতে রেখে গিয়েছেন। হাওয়া-বদল বিষয়ে একটা গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'There is a condition or state of body and mind, intermediate between that of sickness and health, but much nearer the former than the latter, to which I am unable to give a satisfactory name. It is daily and hourly felt by tens of thousands in this metropolis, and throughout the Empire.' অর্থাৎ তিনি ব্রিটিশদের জন্য অনুপযোগী আবহাওয়ার অঞ্চলে শরীর এবং মনের এমন একটা অবর্ণনীয় অবস্থার কথা বলছেন যেটা কিনা সামান্য দৈহিক এবং বৌদ্ধিক অনুশীলনের পরেই একটা মানসিক অবসন্নতা রূপে হাজির হয়। তজ্জন্য বিরূপ আবহাওয়ার উপনিবেশগুলোয় নবোত্থিত শহুরে জীবনের কর্মোদ্যোগ এবং কর্মোদ্যমের ঝক্কিজনিত অবসন্নতা থেকে রেহাই পেতে হাওয়াবদলের গুরুত্বকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।[78] হাওয়া বদলের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-শাসনের তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ব্রিটিশদের সেই অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে জুঝবার জন্য বেশ কিছু উপায়ও তিনি বলেছেন। আলোচনার এক জায়গায় চৈনিক মহিলাদের পায়ে পরে থাকা ভারী অলঙ্কারসম জুতোর উদাহরণ টেনেছেন তিনি। যে জুতো পরে কিনা ঠিক মতো চলাফেরা করা মুশকিল। তাই কৌতুকচ্ছলে উপনিবেশে কর্মরত তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিরূপ আবহাওয়ায় প্রয়োজন হলে চৈনিক মহিলাদের মতো স্থবিরতা অবলম্বন করবার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর ভাষাতেই যদি বলি—'…in an atmosphere somewhat similar to that of the black-hole in Calcutta, by which a prodigious wear and tear of their constitution will be saved.' অর্থাৎ কলিকাতার অন্ধ গহ্বরের মতো আবহাওয়ায় কাজকর্মের ঝক্কি থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজনে এইরকম স্থবিরতা অবলম্বন করা শ্রেয়।[79] আমরা এমনিতেই অবগত আছি, ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় শরীরকে না ঘামিয়ে জীবনচালনার জন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে চড়া টাকা মাইনে দিয়ে দাসবিলাসের মাত্রা কিরকম ছিল।[80] নিজেদের পোষ্য কুকুরকে দেখাশোনার জন্যও তাঁরা 'দরিয়া' নামক কর্মচারী রাখতেন। তাছাড়া পাখা টানবার জন্য 'পাখাওয়ালা', খাবার টেবিলে সাহায্য করবার জন্য 'খিদমতগার', মালামাল বয়ে নেওয়া বা খবর আদান-প্রদানের জন্য 'চাপরাশি', হুকায় তামাক সাজিয়ে দেওয়ার জন্য 'হুঁকাবরদার', ভাঁড়ারঘর এবং পরিবারের সকল কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য 'খানসামা'র মতো চাকর তো ছিলেনই। তার সাথে

[78] James Johnson, 'Change of Air or the Philosophy of Travelling', (New York: Samuel Wood and Sons, 1831), pp.2-3

[79] James Johnson, 'Change of Air', p.10; Edward Terry, 'A Voyage to East India', (London: 1655), p. 100; Pramod K. Nayar, 'Marvelous Excesses: English Travel Writing and India, 1608-1727', *Journal of British Studies*, Vol. 44, No. 2, April 2005, pp. 213-238.

[80] John McCosh, 'Medical Advice to Indian Strangers', (London: Wm. H. Allen & Co., 1841), pp. 34-35; F. A. Steel & G. Gardiner, 'The Complete Indian Housekeeper and Cook', (Edinburgh & Bombay: Edinburgh Press, Educational Society's Press, 1893, 3rd edition).

সাথে নবজাতককে ও পরিবারের শিশুদের দেখাশোনার জন্যও দুই-তিনজন করে দাস-দাসী থাকতেন। তন্মধ্যে নবজাতককে দেখাশোনার জন্য যে আয়া থাকতেন, তাকে বলা হত "wet nurse"। কারণ তিনি বাচ্চাকে দুধ পান করাতেন। গরমের দেশে ইউরোপীয় মহিলারা বাচ্চাকে দুধ দেওয়াও ঝক্কির কাজ বলে মনে করতেন।[81] গ্রীষ্মকালে জলের সাথে সল্টপিটার মিশিয়ে জল ঠাণ্ডাকারী "আব-দার' নামক কর্মচারীও প্রায় সাহেবের বাড়িতে থাকতেন।[82] এরূপ বহু দাসদাসীর সাহায্য ছাড়া সাহেবদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন অচল ছিল।[83] বলা বাহুল্য যে, গার্হস্থ্যে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীদের জন্য ধর্মানুযায়ী পোশাক নির্দিষ্ট থাকত (ছবি ৩.৬ ও ৩.৭ দ্রষ্টব্য)। যাতে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা ঔপনিবেশিকদের পরিশীলিত দৃষ্টি কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে গৃহকর্মে নিয়োজিত 'নেটিভ'দের অঙ্গে অপ্রতুল পোশাক বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করে এমা রবার্টস লিখেছিলেন, - 'এরা (গৃহকর্মীরা) বুঝতেই পারে না যে, এদের স্বল্প পোশাক কাউকে আহত করতে পারে।'[84]

এদেশে নিজেদের ঘরোয়া পরিসর থেকেই অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে শাসক-শাসিতের পোশাকি বিভাজনরেখা প্রকট করে তোলা শুরু হয়।[85] কিন্তু সেই বিভাজনের বহুমাত্রিকতাকেও এক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া দরকার। তা বুঝতে হলে আমাদেরকে অর্থের সঞ্চরণশীলতার সাথে সাথে সংস্কৃতির সঞ্চরণশীলতার মেজাজটাকেও বুঝতে হবে। কারণ অর্থনৈতিক পুঁজির মূল উদ্দেশ্য যেমন নিজের এক্তিয়ারকে প্রসারিত করা, তেমনি সেই পুঁজি কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পুঁজির উদ্দেশ্যও কিন্তু তা'ই। কোনো সমাজের এই দুটি পুঁজি যখন অন্য একটি সমাজের উপর প্রবল হয়ে ধরা দেয়, তখন আমরা তাকে ক্ষমতা হিসেবে চিনি।[86] সেই কারণে ভারতের মতো ক্রান্তীয় আর্দ্রতার দেশে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে ব্রিটিশরা যখন নিজেদের পারিচ্ছদিকতার মৌলিক শিষ্টাচারকে অন্যের চাইতে আলাদা করে প্রকট করছেন, (যেমন – 'নেটিভ' গৃহকর্মীরা গৃহস্বামীর ঘরে জুতো পরতে পারবেন না), তখন কিন্তু একে জাত্যাভিমান বলে দাগিয়ে দিয়ে, আমরা তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক

---

[81] B. V. Roy, 'Old Calcutta Cameos', (Calcutta: Dipali Press, 1956), p. 28.

[82] Ibid, p. 32.

[83] Mrs. Monkland, 'The Nabob at Home or Return to England', Vol.1, (London: Henry Colburn,1842)

[84] Emma Roberts, 'Scenes and Characteristics of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian Society', Vol. 1, (London: W. H. Allen & Co., 1837), p. 8.

[85] Pramod K. Nayar, 'The Colonial Home: Managing Objects and Servants in India', *Anglo Saxonica*, Vol. 17, Issue 1, 2020, pp. 1-9.

[86] Pierre Bourdieu, 'Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste', (Cambridge: Harvard University Press, eighth printing,1996)

পুঁজির প্রতি দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যায়। সেই দায়বদ্ধতা এদেশীয়দেরও ছিল। তাই ১৮০৬-এর দশকে মাদ্রাজ আর্মির নেটিভ রেজিমেন্ট কোম্পানির প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেমেছিলেন। কারণ প্রশাসন মিলিটারিতে হিন্দুদের কানের দুল ও মুসলিমদের পাগড়ি পরার উপর হস্তক্ষেপ করেছিল।[87] এই একই দায়বদ্ধতা থেকেই এদেশ থেকে অর্থ উপার্জন করে এদেশের সামান্যতম প্রভাব নিয়ে ব্রিটেনে ফেরা সাদা চামড়ার মানুষদেরকে সেদেশের অভিজাতরা 'Nabob' বলে ব্যঙ্গ করতেন।[88] আবার এদেশের মাটিতে হাতে গোনা যে কিছু ইংরেজ দেশীয় আদব-কায়দা, পোশাকে-পরিচ্ছদে এদেশীয় পথকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের দিকেও ক্ষমতাধর ইংরেজরা সুনজরে দেখতেন না। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক পুঁজি ক্ষেত্র বিশেষে সজাগ হয়ে ওঠে। কোনো বাণিজ্যিক পরিসরে যদি, একটি বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর আর্থিক পুঁজি প্রবল তেজী হয়ে ধরা দেয়, তবে সেই গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পুঁজিও সেই পরিসরকে আয়ত্ত করতে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে। আবার এই প্রক্রিয়ায় ওই পরিসরের অন্যান্য সাংস্কৃতিক পুঁজিগুলি নিজেদের স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ এনে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

সুতরাং উপমহাদেশে বনিকের রাজা হয়ে ওঠা যেমন একটা পুঁজিবাদী উত্তরণের গল্প তেমনি পোশাকে-আশাকে বিলিতি সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতার ক্ষমতায় রূপান্তরও একটা সাংস্কৃতিক পুঁজির উত্তরণের গল্প। অর্থাৎ এদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থান পাল্টানোর সাথে সাথে বিলিতি পারিচ্ছদিকতা রাজনীতির উপকরণ হয়ে ওঠে, ক্ষমতা প্রদর্শনের অস্ত্র হয়ে ওঠে। তাই কর্তৃপক্ষকে আইন পাশ করে সরকারি কাজ-কর্মে সাদা চামড়ার মানুষের পরিচ্ছদশৈলীতে সকলরকম গাফিলতি বন্ধ করার শৃঙ্খলাবদ্ধ পথে হাঁটতে হয়। আর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পরিধেয়কে ক্রান্তীয় সূর্যের প্রখরতার সাথে তাল মেলাতে পরিধেয়ের উপাদানগত দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার উপর জোর দিতে হয়। সুতরাং ক্রান্তীয় জলবায়ুতে, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উপযোগী পোশাককে ব্যবহারোপযোগী এবং স্বাস্থ্যোপযোগী করে তুলে, ব্রিটিশ রুচির প্রতি দায়বদ্ধতার সাথে কোনোরূপ আপোষ না করে, উপনিবেশের সরকারি কাজ কর্মে ওয়েস্টকোট, প্যান্টালুন, হ্যাট, শু্য, স্টকিংস পরবার নিদানের মধ্যে পোশাকি রাজনীতির ক্ষমতার দিকটাকে উন্মোচিত করে এই আলোচনা একটা সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারে সাংস্কৃতিক পুঁজি কিভাবে অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে সেই ক্ষেত্রটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করবে।

যেকোনো ক্ষমতাবান সমাজে ক্ষমতার দৃশ্যমান সংস্কৃতি গড়ে ওঠে আবহাওয়া, স্বাস্থ্য, পুঁজি, রুচি এবং পোশাকি সংস্কৃতির একটা সমানুপাতিক মিশেলের মধ্য দিয়ে। জেমস জন্সন বলেছেন,

---

[87] Sumit Kanti Ghosh, 'Body, Dress, and Symbolic Capital: Multifaceted Presentation of PUGREE in Colonial Governance of British India', *Textile,* pp. 1-32, https://doi.org/10.1080/14759756.2023.2208502

[88] G. P. Spear, 'The Nabobs: A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India', (London:Humphrey Milford & Oxford University Press,1932)

সময়ের দাবি মেনে মানুষের মনকে লাগাম দেওয়া ও লাগামছাড়া করবার সামর্থ্য, মানুষকে পশুদের থেকে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে রাখে। তাই ক্রান্তীয় জলবায়ুর বিরূপতায় প্রয়োজনে নিজেদের স্বাদেশিক পারিচ্ছদিকতায় লাগাম দেওয়াই শ্রেয়।[89] মার্ক হ্যারিসনের মতে, ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে গেঁড়ে বসার পর ব্রিটিশদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে তাঁদের মনে হচ্ছিল যে, তাঁরা উত্তর ইউরোপের বরিষ্ঠ জলবায়ুর ফসল। যে কোনো অঞ্চলের সাথে তাঁরা মানিয়ে নিতে পারেন। কারণ নতুনের খোঁজে তারা সর্বদা উন্মুখ। যা ভারতীয়দের স্বভাবে নেই। তাঁদের মনে হতে শুরু করে - ভারতের ক্রান্তীয় জলবায়ুই ভারতীয়দের অলস ও অদৃষ্টবাদী করে তুলেছে।[90] আর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু তাঁদের করে তুলেছে নতুন অভিলাষী, অন্বেষণ-পরায়ণ। সেকারণেই শীতপ্রধাণ আবহাওয়ার মানুষ যখন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে আসেন, তাঁরা কিছু নিয়ম-কানুন পালন করলেই সেই অঞ্চলে সুস্থভাবে বাস করতে পারেন।[91] আর এই প্রসঙ্গেই জন্সনের পরামর্শ - ইউরোপীয়দের জীবনচর্যা বা Constitution-কে ক্রান্তীয় অঞ্চলে অনেক বেশি তরলবৎ হতে হবে। এক্ষেত্রে তরলবৎ হয়ে ওঠা মানে তাঁদের নিজেদের খাদ্যরুচি বা পোশাকি রুচিকে পাল্টে ফেলা নয়, বরঞ্চ নতুন আবহাওয়ার সাথে তালমিলিয়ে সেই রুচিকে অবনির্মাণ করা। ১৮১৩ সালে ডা জেমস কুরি'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ডা জন্সন একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যখন ক্রান্তীয় আবহাওয়ার প্রকোপে আমার মানসিক এবং শারীরিক সক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকেছিল, নিজের শুশ্রূষা নিজে করবার মত শক্তিও যখন লোপ পেয়েছিল, তখন আপনি আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিলেন'।[92] যেহেতু তিনি ভারতবর্ষের ক্রান্তীয় জলবায়ুতে এসে নিজে ভুক্তভোগী হয়েছেন এবং সপ্তদশ শতকের গোঁড়া থেকে ভারতবর্ষে ব্যবসার সূত্রে আসা পূর্বজদের অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করেছিলেন, সেহেতু ডাক্তার হওয়ার সুবাদে তাঁর কাছে এহেন আবহাওয়ায় স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় অনেকটাই বোধগম্য হয়েছিল। সেকারণে ভারতের ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় গ্রীষ্মের প্রাবল্য থেকে দেহকে রক্ষা করতে তিনি প্রথমেই অপেক্ষাকৃত হালকা জামাকাপড় পরার এবং রয়ে-সয়ে খাবার ও পানীয় গ্রহণের নিদান

---

[89] James Johnson, 'The Influence of Tropical Climates more Specially Climate of India on European Constitutions', (London: Printed for R.J. Stockdale,1813), pp.1-3

[90] Mark Harrison, 'Climates and Constitutions: Health, Race, Environment and British Imperialism in India', (New Delhi: Oxford University Press, 2002), p. 1.

[91] James Johnson, 'The Influence of Tropical Climates more Specially Climate of India on European Constitutions', pp.1-3; শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙালীর দুর্বলতার কারণ কি?', বীণাপাণি পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩০১ সাল, পৃ ১৪৮-১৪৯।

[92] "Letter to Dr. James Curry, Physician to Guy's Hospital from J. Johnsson, Postmouth Harbour,May,1813" নিয়েছি James Johnson, 'The Influence of Tropical Climates', p.vii-viii

দিয়েছিলেন। ডা. মসলের পর্যবেক্ষণও জন্সনের মতোই। তিনি বলেন - ক্রান্তীয় গ্রীষ্মের দেশে অন্য পানীয়ের পরিবর্তে শুধুমাত্র জল পান করলে শরীরকে চাঙ্গা রাখা অনেক সহজ হয়।[93]

কলিকাতার জেনারেল হাসপাতালের[94] প্রথম অ্যাসিস্টন্ট সার্জেন উইলিয়ম টুইনিং ১৮৩২ সালে ক্রান্তীয় বঙ্গের রোগব্যাধি এবং সাদা চামড়ার মানুষের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে একটা আলোচনা করেন। রক্ত-আমশয়, পাকস্থলীর অসুখ - জন্ডিস, হেপেটাইটিস এবং প্লীহা, কলেরা, বিভিন্ন প্রকার জ্বরের রোগীদের নিয়ে তিনি আলাদাভাবে লেখেন এবং এইসব ব্যাধির সম্ভাব্য প্রতিকারের জন্য কেমনতর নিদান দেওয়া হয়েছিল, সেবিষয়ে বিশদে জানান। প্রত্যেকটি রোগের ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ নিদান ছিল—রোগীদের ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় সবসময় স্বাস্থ্যকর ফ্লানেল ড্রেস বা সূক্ষ্ম পশম এবং মিহি সুতির কাপড়, মূল কাপড়ের নিচে অবশ্যই পড়তে হবে। যাতে ক্রান্তীয় আর্দ্রতায় শরীর থেকে নিসৃত ঘাম সুতি বা সুক্ষ্ম পশমের কাপড় টেনে নিতে পারে।[95] তার সাথে সাথে ক্রান্তীয় আর্দ্রতায় পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন নিয়ম করে স্নান করারও নিদান দেওয়া হয়।[96] অষ্টাদশ শতকের ষাট সত্তরের দশকে ক্যালকাটা গ্যাজেটের বিজ্ঞাপনগুলোতেও বিলিতি

---

[93] Benjamin Moseley, 'A Treatise on Tropical Diseases and on the Climate of the West-Indies', (London: T. Cadell, MDCCLXXXVII/1787) ,p.57

[94] ১৭০৭ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের উদ্যোগে কলিকাতার জেরস্টেইন প্লেসে অবস্থিত ওল্ড ফোর্টের প্রাঙ্গণে মূলত ইউরোপীয়দের জন্য এই হাসপাতাল গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে অবশ্য ১৭৭০ সালের এপ্রিল মাসে এর দরজা দেশীয়দের জন্য খুলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা উত্তর কালে এই হাসপাতালের নতুন নাম হয় শেঠ সুখলাল কর্নানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল বা এস এস কে এম হাসপাতাল।

[95] William Twinning, 'Diseases of Bengal with the Result of an Inquiry into their Pathology and Treatment', (Calcutta: Baptist Mission Press, 1832).

ভারতের আবহাওয়ায় শরীর টিকিয়ে রেখে কোম্পানির কাজ পরিচালনার জন্য কিরকম পোশাক পরিধান করা আরামদায়ক হতে পারে, এ বিষয়ে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসাররা পেয়েছিলেন মুঘল দরবার থেকে। ১৯৪৫ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার R. H. Phillimore ভারতবর্ষের নানাহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটা সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদলের অফিসাররা মুঘল সম্রাটের দরবারে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যার জট কাটাতে নজরানা নিয়ে যেতেন, সেই নজরানার পরিবর্তে মুঘল সম্রাট তাঁদের খিলাত দিতেন। সেই খিলাতে থাকত সুতির হালকা কাপড়ের উপর সোনার জরির কাজের জামা, পাগড়ি এবং কোমরবন্ধ। সেই পোশাকে সজ্জিত হয়ে অফিশিয়ালদের সম্রাটের সামনে একবার দাঁড়াতে হত, যার মধ্য দিয়ে এটাই বোঝানো হত যে, অথিতিরা সম্রাটের আথিত্য গ্রহণ করেছেন। ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় এই হালকা-পাতলা খিলাতের আরাম অনুভব করে, অনেক ব্রিটিশ অফিশিয়ালই নিজেদের ব্যক্তিগত পরিসরে এইধরনের পোশাক পরতে আগ্রহ অনুভব করতেন। ('Historical Records of Survey of India, Vol.1, 18th century, collected and compiled by Colonel R. H. Phillimore, Published by order of the surveyor General of India, Printed at the office of the Geodetic Branch', Survey of India, Dehra Dun (U.P), India, 1945, p. 302

[96] 'An Anglo-Indian Domestic Sketch: A Letter from an Artist in India to His Mother in England', (Calcutta: W. Thacker and Co. St. Andrews Library, 1849), pp. 56-57.

ফ্যাশনের সুতির কাপড়ের ছড়াছড়ি। একটা বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে, কলিকাতা ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যেতে ইচ্ছুক একজন সাহেব তাঁর ব্যবহৃত মেহগনি কাঠের চেয়ার, আয়েশি ডাইনিং টেবিল, চেয়ার পাল্কি, Bell's British Theatre'[97] এর সাথে সাথে এ অঞ্চলে তার ব্যবহৃত দরিয়া কাপড় কলিকাতার নিলাম ঘরে নিলামে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করছেন।[98] Yule & Burnell Dictionary অনুসারে দরিয়া কাপড় হল এদেশে ইউরোপীয়দের ব্যবহারোপযোগী সুতির কাপড় যা এমন সুক্ষ্মভাবে বোনা হত যে, সেই কাপড়ের গায়ে একপ্রকার লম্বালম্বি সুতোর স্ট্রাইপ তৈরি হত।[99] ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে এবং প্রশাসনিক কাজে আগমনরত ব্রিটিশ তরুণদের জন্য Vade Mecum বা গাইড বুকে ভারতের প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বর্ণনার সাথে সাথে ভারতের জলবায়ুতে কি পরা বা কি খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকারক সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে। ক্রান্তীয় গ্রীষ্মের দেশে চাকরি করতে যেতে ইচ্ছুকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাঁরা যেন জাহাজে ওঠার আগে চার ডজন সূক্ষ্ম অথচ দবজ কালিকো বা সুতির শার্ট নেন। ভুলেও যাতে লিনেন সুতোর শার্ট নিয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলের পথে পা না বাড়ান। কারণ ওই অঞ্চলের দুঃসহ গরমে প্রচুর ঘাম হয়। লিনেন সুতোর কাপড়ে ঘাম শুকোয় না। যেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।[100] সেকারণে টুইনিঙের মতো জন্সনও উর্দ্ধবাসের নিচে শরীরের ঘাম টেনে নিয়ে শরীরকে অস্বস্তি মুক্ত রাখার জন্য ফ্লানেল কাপড় পরার পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া ফ্লানেল কাপড়ের উপর পরা শার্টের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একগাদা বোতাম না দিয়ে, শার্ট পরা এবং খোলার সুবিধার জন্য ঘাড়ের আট ইঞ্চি নিচে শার্টের দুই অংশকে আটকাতে একটিমাত্র বোতাম ব্যবহার করবার কথা বলেছেন। আর টাই ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছেন।[101] তার বদলে সুতি কাপড়ের নেক-হেন্ডকারচেপ ব্যবহারের নিদান দিয়েছেন। অন্যদিকে ক্রান্তীয় অঞ্চলে যাওয়ার সময় তিনি চার জোড়া প্যান্টালুন নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। যার মধ্যে দুজোড়া মোটা কাপড়ের, দুজোড়া হালকা কাপড়ের। মোটা কাপড়ের প্যান্টালুনের কাপড় হিসেবে তিনি বনাত কাপড় (broad Cloth) এবং উচ্চমানের উলকে (Wove worsted) আরামদায়ক বলেছেন। অন্যদিকে হালকা প্যান্টালুনের কাপড় হিসেবে তিনি মোটা সুতি

---

[97] John Bell (১৭৪৫-১৮৩১) একজন ব্রিটিশ নাট্যকার। তিনি সপ্তদশ শতকের সত্তরের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত 'Bell's Brirtish Theatre' নামে বহু ভলিউমে ইংরেজি নাটকের সংকলন প্রকাশ করেন।

[98] Calcutta Gazette or Oriental Advertiser, Vol.1, No.1, Tuesday, 4th March, 1784.

[99] 'Yule & Burnell Dictionary', Doriya, p.325

[100] Captain Thomas William, 'The East India Vade-Mecum or Complete Guide for Gentlemen Intended for the Civil, Military or Naval Service of the Hon'ble East India Company', (London: Black, Parry and Kings-buny, 1810), pp. 8-9; John Briggs, 'Letter Addressed to Young Person in India', (London: John Murray, 1828), p. 3.

[101] Ibid

(corderoy) এবং উল, সুতির মিশ্রণে তৈরি Aleppine কাপড়কে আরামদায়ক বলেছেন। প্যান্টালুনের নিচে পরবার জন্য যত বেশি সম্ভব মিহি ও দবজ সুতি কাপড়ের অন্তর্বাস নিয়ে যেতে বলেছেন। উচ্চমানের উল এবং মিহি সুতির হাফ স্টকিং নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যথাক্রমে এক জোড়া ও তিন জোড়া।[102] অন্যদিকে শার্টের উপর পরবার জন্য চারজোড়া ওয়েস্টকোট অবশ্যই নিতে বলেছেন। তাঁর মতে এই চারজোড়ার মধ্যে দুজোড়া হবে উচ্চমানের উলের তৈরি এবং দুজোড়া হবে অসম্ভব মোলায়েম এবং আরামদায়ক আইরিশ লিনেনের তৈরি।[103] তাছাড়া ওয়েস্ট কোটের বুকপকেটে নেওয়ার জন্য মিহি পাড়যুক্ত সাদা রঙের চার জোড়া রুমাল নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আর দুজোড়া তাগড়াই, মোটাসোটা বুট এবং যতটা বেশি সম্ভব হালকা শ্যু নিয়ে ভ্রমণ করতে বলছেন।[104]

এরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে কাপড়-চোপড়-জুতো নিয়ে ভ্রমণ করতে বলার পেছনে কারণটা কি তিনি সেটাও পরিষ্কার করেছেন। বিলিতি কাটিঙের জামা-কাপড়, শ্যু-বুট উৎপাদনের জন্য দর্জি এবং বুট মেকারদের অস্তিত্ব ভারতে অপ্রতুল ছিল। তবে যে মুষ্টিমেয় দর্জি বিলিতি ফ্যাশনের পোশাক বানাতে পারতেন, তাদের সুখ্যাতিও তৎকালীন ভারত নিবাসী ইংরেজ সমাজে ছিল। মোমের আলোয় সুচারুভাবে ওয়েস্টকোট তৈরি করা দেশীয় দর্জির দরাজ সুখ্যাতি করেছিলেন এলিজা ফে।[105] এডওয়ার্ড টেরীও ভারতের পোশাক শিল্পীদের নকল করার ক্ষমতার সুখ্যাতি করেছিলেন। কিন্তু তবু বেশিরভাগ অ্যাডভাইস বুকে ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পোশাক নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। কারণ বিলেত থেকে বছর-ছয় মাসে বিলিতি সরঞ্জাম ভর্তি কার্গো কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বের উদ্দেশ্যে আসত। কিন্তু কার্গোতে আসা পোশাক-আশাক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হত প্রতিপত্তিশালী ব্রিটিশ অফিসারদের মোটা টাকার পরিবর্তে অর্ডারে বানানো। ভারতে বসবাসরত সব ইংরেজের আর্থিক অবস্থা বা তাঁদের দেশের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা সমান ছিল না। সেকারণেই থমাস উইলিইয়াম পরামর্শ দিয়েছেন, ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিধান করে স্বাদেশিক পোশাকি সংস্কৃতিকে বজায় রাখার উপযুক্ত বিলিতি রুচির পোশাক যতটা সম্ভব বেশি করে নিয়ে জাহাজে ওঠাই শ্রেয়।[106] কারণ উনিশ শতকের মধ্যভাগেও কলকাতা শহরে গড়ে ওঠা বিলিতি রুচি-অনুগত পণ্য যোগানদাতা বাজারের সংখ্যা ছিল অল্প। বা

[102] Ibid

[103] Ibid, p.10

[104] Ibid.

[105] Walter Kelly Firminger ed. ‘The Original Letters from India of Mrs. Eliza Fay’, (Calcutta: Messrs Thacker Spink & Co., 1908), p. 121.

[106] Captain Thomas William, ‘The East India Vade-Mecum’, p. 10.

যে কয়েকটি বাজার ছিল, সে বাজারের পণ্য নিয়ে সাহেব অধিবাসীদের মধ্যে তেমন সন্তোষ ছিল না।[107] কারণ, ভারতের বাজারে প্রাপ্ত বিলিতি রুচির পণ্যগুলির দাম ছিল বেশি, তুলনায় গুণমান ছিল খারাপ।[108] সেকারণে ১৮৪৭ সালে বহুদিন ধরে ভ্‌রতে বাসকারী একজন ইংরেজ লিখেছিলেন – ইংল্যাণ্ড থেকে এদেশে পাড়ি দেওয়ার সময় 'ওদেশে জিনিসপত্রের দাম কম' বা 'ওদেশে সব পাওয়া যায়' এসব কথা একদম শুনবেন না। এমন বলে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় কি কি নিয়ে আসতে হবে, পদ বিশেষে তার বিশাল ফর্দ দিয়েছেন। সেই ফর্দের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, বিলিতি

Equipment for a Civilian by Ship.

Forty-eight pairs cotton socks.
Twelve pairs silk socks.
Twelve pairs woollen socks.
Seventy-two shirts.
Twenty-four fine flannel waist-coats. See Note 1, p. 93.
Twenty-four pairs of calico drawers.
Two pair flannel drawers.
Forty-eight pocket handkfs.
Twenty-four fine cambric do.
Six black silk cravats.
Twelve pairs cotton gloves.
Twenty-four pairs kid gloves.
Four pairs braces.
Six pairs pyjamas.
Two pairs woollen pyjamas. See Note 2, p. 93.
One cotton dressing-gown.
One flannel dressing-gown.
One clothes bag.
One straw hat.
One cloth cap.
One cachmere jacket.
One pair cachmere trowsers.
Twelve pairs white trowsers for dress. See Note 3, p. 93.
Twelve pairs duck trowsers for riding.
Six pairs holland trowsers.
Twelve white jackets.
Twenty-four white waistcoats.
Six holland coats.
Six white linen coats. See Note 4, p. 93.
Six holland waistcoats.
Two pairs coloured trowsers.
One frock coat.
One shooting coat.
One dress coat.

Digitized by Google

চিত্র ৩.৮: আট পৃষ্ঠা জোড়া ফর্দের একটি পাতা (সূত্র: An old Resident, 'Real Life in India', p. 88).

হ্যাট-কোট-শ্যু-ট্রাউজারসের পারিচ্ছদিকতায় শুধু বেশি পরিমাণে সুতির কাপড় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বিলিতি-কাটের কাপড়-চোপড়ে পরিবর্তন তেমন চোখে পড়ে না। ভারতীয় প্রশাসনিক জীবনে সেই ফর্দের প্রতিটি উপকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, -'... supply your young friend with every item contained in the following list. ... he will require each item we have

---

107 বিনয় ঘোষ, 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৫-১৮৬; জ্যোতির্ময় সেন, 'আঠারো ও উনিশ শতকে কলকাতার বাজার', (কলকাতাঃ অলকানন্দা পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ ৫৪-৫৫।

108 Edmund Hull, 'The European in India or Anglo-Indian's Vade-Macum', (London: Henry S. King & Co. 1871), pp. 1-3; Edward Terry, 'A Voyage to East India', (London: 1655), p. 136.

specified.’[109] তাহলে বোঝা যায়, স্বরুচি অনুসারে জীবনযাপনের কড়াকড়ি উনিশ শতকের মধ্যভাগে যেতে যেতে ভারতে কিরূপ আকার নিয়েছিল (ছবি ৩.৮ দ্রষ্টব্য)।

ভারতে আসার সময় পোশাকে-পরিচ্ছদে যতটা সম্ভব ক্রান্তীয় অঞ্চলের উপযোগী পোশাক আনার মতটির বিপরীত মতও কিন্তু প্রচলিত ছিল। যা মতানুসারে গরমের দেশে গায়ে বেশি কাপড়ের পোশাক পরলে শরীরের তাপমান বেড়ে যাবে – এই মতটি ভ্রান্ত। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ম্যাকোস লিখেছিলেন, যাঁরা ক্রান্তীয়

চিত্র ৩.৯: ফ্রান্সের পোশাকি সংস্কৃতি প্রভাবিত মধ্যযুগীয় ইউরোপে রাজপুরুষদের পোশাক।[110]

---

[109] By an old Resident, ‘Real Life in India, Embracing a View of the Requirements of Individuals Appointed to any Branch of the Indian Public Service; The Methods of Proceeding to India; and the Course of Life in Different Parts of the Country’, (London: Houlston & Stoneman, 1847), pp. 88-97.

[110] । বিখ্যাত ফরাসি কবি Guillaume de Lorris এয়োদশ শতকের মাঝ বরাবর দরবারি প্রেমের গল্প নিয়ে ফরাসি ভাষায় Romance of the Rose কাব্য লিখতে শুরু করেন। ১২৬০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সৌভাগ্য ও আভিজাত্যের অধিকারী আরেকজন ফরাসি কবি Jean de Meun ১৩০৫ সালে এই কাব্যটি শেষ করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে বিখ্যাত চিত্রকর Lucas Van Leyden এই গ্রন্থের উপর ভর করে বেশ কিছু ছবি আঁকেন। উপরের ছবিটি তেমনি একটি। ছবিটিতে ডান দিক থেকে প্রথম তিনটি ফিগারকেই Doublet, Hose, হোসের ওপর মোজা এবং তার উপর সম্মুখভাগ চওড়া জুতো, Cloak, কারুকার্যময় plumed hat পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের প্রথম দুটি ফিগারের ক্লোকটি কাঁধের দুপাশ থেকে হাঁটুর একটু নিচ পর্যন্ত লম্বিত। আর পিঠ ও বুকের উপর দিয়ে ক্লোকটি কটিদেশকে অতিক্রম করে আর নামেনি। মূলত ঘোড়সওয়ারিতে সুবিধার জন্য অভিজাতরা পোশাকের কাটিঙে অদলবদল ঘটিয়ে নানা ফ্যাশন করতেন। তাছাড়া ডানদিক থেকে প্রথম তিনটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে তিনজন অভিজাতের সাথেই একপাশে পুচ্ছযুক্ত কারুকার্যময় হ্যাট আছে। ক্যাপের নিচে লম্বা পরচুলা আছে। তবে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় জন প্লামড হ্যাটটি

গরমে উষ্ণ ক্লোক পরা ইংরেজ দেখলে হাসেন, তাঁরা ক্রান্তীয় অঞ্চলে ক্যালরি ও রক্তের তাপমাত্রাজনিত তত্ত্বগুলো সম্বন্ধেই জানেন না। ১৮৪৬ সালে অনেকটা এই সুরেই এডওয়ার্ড জে ওয়ার্নিং লেখেন, গরমের দেশে শরীরে বেশি পোশাক চাপালে শরীরের তাপমান বাড়ে – এটা ভুল ধারণা। বরং বেশি পোশাক শরীরের নিজস্ব তাপমান বজায় রাখতে সাহায্য করে।[111] অর্থাৎ গরমের দেশে এসে কিরূপ পোশাল পরা উচিত – তা নিয়ে ইংরেজদের অভ্যন্তরেই একটা মতভেদ ছিল। কিন্তু শত মতভেদ থাকলেও একটা বিষয়ে মতৈক্য ছিল। তা হল গরমের দেশে এসেও নিজেদের পোশাকি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা।

পোশাক সংক্রান্ত এইসব পরামর্শে যদি খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে বুঝতে পারবো, ব্রিটেনে পোশাকের মধ্য দিয়ে যে নব্য পৌরুষের চেতনা সপ্তদশ শতকে প্রথম জেমসের সিংহাসনারোহনের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে, এই পরামর্শগুলো সেই চেতনাকে কোনোভাবেই লঙ্ঘন করেনি। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, নব্য পোশাকি পৌরুষ মধ্যযুগীয় বা আদি আধুনিক যুগের পোশাকি পৌরুষ থেকে আলাদা (চিত্র ৩.৯ দ্রষ্টব্য)। মধ্যযুগ এবং আদি আধুনিক যুগের ইউরোপীয় ফ্যাশনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটা প্রবল ঠাটবাট ছিল। যদিও সেই প্রাবল্যের মধ্যেও সামাজিক অবস্থান অনুসারে বিভাজন ছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকে যেমন ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন এবং পুঁজিবাদের উত্থানের হাত ধরে এতদিনকার সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও ভেঙে পড়তে শুরু করে। নবোত্থিত বণিক শ্রেণি এতদিনকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা লর্ড নাইটদের নকল করে তাঁদের মতো আড়ম্বরপূর্ণ পশম ও সিল্কের জামাকাপড় পরতে শুরু করেন। ষষ্ঠদশ শতকে সরকারি কর্মচারী বা চার্চের যাজক,

---

বগলদাবা করে বহন করছেন। তখনো তাঁর মাথায় আরেকটি ছোট্ট ক্যাপ রয়েছে। বলা বাহুল্য, অভিজাতরা মধ্যযুগে বড় ক্যাপের নিচে এই ছোট ক্যাপটিও পড়তেন। আর বড় ক্যাপটিকে মাথায় সংলগ্ন রাখবার জন্য তাঁরা কানের দুপাশ থেকে সুরম্য ফিতে ব্যবহার করতেন। কখনো বড় ক্যাপ খুলে রাখবার প্রয়োজন হলে, তাঁরা ক্যাপটিকে খুলে হাতে না নিয়ে ক্যাপটিকে পিঠের দিকে ফেলে দিতেন; আর ক্যাপটি গলা সংলগ্ন ফিতের দরুন পিঠে ঝুলে থাকত। আর সেই সময় তাঁদের মস্তকে ছোট ক্যাপটি শোভা পেত। ডানদিক থেকে তৃতীয় জনের পরিচ্ছদের সাথে প্রথম তিনজনের পরিচ্ছদ সবক্ষেত্রে সাদৃশ্যময় হলেও, ক্লোকের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ Gallant ভদ্রমহোদয় যখন দরবারে প্রবেশ করেন তখন তিনি ঘোড়সওয়ার হবার সময় ব্যবহৃত ক্লোক খুলে আরেকটি ক্লোক পড়েন। এই ক্লোকটির হাতগুলো হাঁটু পর্যন্ত এমন বিস্তার পেয়েছে, আচমকা দেখলে পাখির ডানা বলে ভ্রম হতে পারে। অন্যদিকে বামপাশে রাজার পোশাকটিতে ক্লোকটি আজানুলম্বিত এবং কারুকার্যময়। তাঁর মাথায় রাজমুকুট, দক্ষিণ হাতে রাজদণ্ড এবং কোমড়ের সাথে বাঁধা সুদৃশ্য খোপে তরবারি রাখা। ১৮৪৩ সালে হেনরি শ তাঁর গ্রন্থে এই ছবিটির ভদ্রমহোদয়ত্রয়ের পরিচ্ছদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁদের ফুলবাবু বা Dandies বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতকে ইংরেজের পোশাকি রুচির অনেকটা নির্মাণ, অবনির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ হয়ে গিয়েছিল। Henry Shaw, 'Dress and Decorations of the Middle Ages', Vol.II, (London: William Pickering, 1843), Plate No.57.

[111] Edward J. Waring, 'The Tropical Resident at Home: Letters Addressed to Europeans Returning from India and the Colonies, on Subjects Connected with their Health and General Welfare', (London: John Churchill & Sons, 1846), p. 107.

চিকিৎসকরা coat, doublet, hose[112] সম্বলিত রোব পরতে শুরু করেন। সমাজের অন্যান্য বৃত্তির মানুষরা, যেমন- খেতমজুর, ফেরিওয়ালা, কারিগর তাঁদের বৃত্তি অনুসারে পোশাক পড়তেন। বৃত্তি অনুসারে পোশাক পরিধানের ব্যাপারটা ইউরোপে বহুদিন চলেছিল। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের গোয়ালিনীরা তাঁদের মূল পরিধানের সাথে সাদা অ্যাপ্রন পরতেন। মিলার এবং ব্যাংকাররাও সাদা রঙের প্রাধান্যযুক্ত পোশাক পড়তেন।[113] এলিজাবেথ উইলসন যুক্তি দিয়েছেন, শিল্পবিপ্লোবত্তর কালপর্বে অতিরিক্ত ব্যয়কে নৈতিক চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক—এরকম একটা মত রাষ্ট্রীয়ভাবে গড়ে ওঠে। তাই ১৫৫৮ থেকে ১৬০৩ সালের সালের মধ্যে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সময়ে সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৈদেশিক আদান-প্রদানে রাষ্ট্র নীতি-নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মানুষের বংশানুক্রমিক জীবনযাত্রা আবার গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

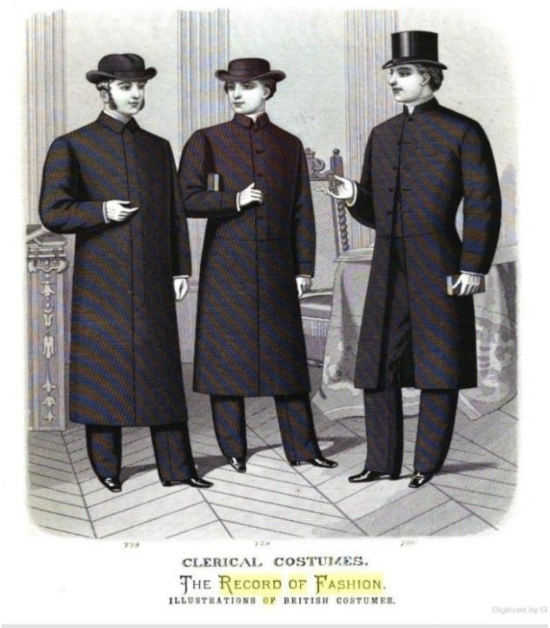

চিত্র ৩.১০: বামদিক থেকে প্রথম চিত্রটি J. Parker অঙ্কিত *Charles II and Sir William Temple* এর ছবি।[114] ডানদিকের ছবিটা ১৮৮২ সালে Dr. T. D. Humpreys সম্পাদিত The Record of Fashion নামক একটি পত্রিকা থেকে নেওয়া ইংরেজ কেরানীদের পোশাকি দেহের চিত্র।[115]

---

[112] Doublet--শার্টের উপর পড়া কোমড় পর্যন্ত বিস্তৃত কারুকার্যময় কোটের মতো পোশাক; Hose--কোমড় থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত আঁটসাঁট পোশাক, যেখান থেকে পরবর্তীতে মোজার ধারনা এসেছে।

[113] Elizabeth Wilson, 'Fashion and Modernity: Adorned in Dreams', (London: I.B. Tauris, 2003), pp.22-23

[114] বামদিকের ছবিটিতে দেখার বিষয় হল—সম্রাট এবং তাঁর সভাসদ দুজনেই ভেস্ট, ব্রিচেস এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট পড়ে আছেন। দুজনেই মাথায় উইগ পড়েছেন, পায়ে লেদারের জুতো। দ্বিতীয় চার্লসের মাথায় হ্যাট আছে, কিন্তু

কিন্তু ১৬০৩ সালে প্রথম জেমসের সিংহাসনারোহনের পর, রাষ্ট্রের অতিসক্রিয়তা কমতে শুরু করে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র দরবারের ব্যয়সংকুলানের উপর নজর দিতে শুরু করে। দরবারে পোশাকি আড়ম্বরকে তোল্লাই দিতে গিয়ে রাজকোষে চাপ রাড়ছিল। তাই Doublet, stiff collar বা cloak[116] এর মতো আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকি সংস্কৃতিকে 'মেয়েলি' হিসেবে অভিযুক্ত করে অভিজাতদের পুরুষকারের অহঙে আঘাত দেওয়ার একটা প্রবণতা রাজ দরবার থেকেই সচল হয়ে উঠছিল। কারণ সভাসদদের পোশাকি বর্ণাঢ্যতা বজায় রাখতে গিয়ে রাজকোষে আয়-ব্যয়ের সমতা বিধাণ বিঘ্নিত হচ্ছিল। তাই প্রথম জেমসের সময়কাল থেকে এলিজাবেথীয় সময়ের পোশাকি আড়ম্বর অনেক কমে যায়। যেমন ডাবলিটের আঁটসাঁট গলা অনেকটা কম কাপড়যুক্ত কলারে পর্যবসিত হয়, হোসের আঁটসাঁট রূপ পরিবর্তিত হয়ে হাঁটুর উপরে ঢোলা এবং হাঁটুর নিচে আড়ষ্ঠ ব্রিচে রূপ নেয়, তাঁর সময়েও অবশ্য হোস পরবার প্রথা ছিল (ছবি ৩.১০ দ্রষ্টব্য)। প্রথম জেমস বুঝতে পেরেছিলেন, দরবারি পোশাকের পরিবর্তন ঘটালে বৃহত্তর ইংরেজ সমাজের পোশাক আপনি পাল্টে যাবে। বংশানুক্রমিক জীবনযাত্রাকে সচল রাখার মডেলে যে ব্যয় সংকোচন সম্ভব নয়, বরং মানুষের ভোগবিলাসী মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে নবোত্থিত পুঁজিবাদের দ্বারাও রাষ্ট্র লাভবান হবে না-- তা বুঝতে পেরে তিনি সামাজিক পোশাকি শিষ্টাচারের উপর থেকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তুলে নেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে পুঁজিবাদের ক্ষমতার সাথে তাল মিলিয়ে চলবার পন্থার উপর জোর দেওয়া শুরু হয়। প্রথম জেমসের আমলের পোশাক দ্বিতীয় চার্ল্সের সময়ে এসে আরো আড়ম্বরশূন্য হয়ে পড়ে। ১৬৬৬ সালের ৭ অক্টোবর স্যামুয়েল পেপির দিনপঞ্জীতে দেখা যায়, ইংল্যান্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস এমন একটি পোশাককে দরবারি পরিচ্ছদ হিসেবে ঘোষণা করেন, যে পোশাকে Doublet, stiff collar বা cloak'এর আড়ম্বর নেই। বরং নবঘোষিত পোশাকটি vest'এর মতো আড়ম্বরহীন। Knee Breeches, vest এবং Jacket এই তিনটি অংশে পোশাকটি পরা হত বলে, এটি 'থ্রী পিস স্যুট' বলে পরিচিত ছিল। এই 'থ্রি পিস স্যুটে' ১৬৬০-এর দশক থেকে বিভিন্ন সময়ে রং, ডিজাইন, কাটিঙে বিভিন্নরকম পরিবর্তন আসলেও তার সামগ্রিকতায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। কারণ এই স্যুটের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী দশকগুলোতে ইংরেজ বা ইউরোপীয় সমাজে পৌরুষত্বের ধারণাটির অবনির্মিত সংযুক্ত হয়ে

সভাসদ সম্রাটের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে হ্যাট পড়েননি। এই ছবিটির সার্বিক চরিত্রে মধ্যযুগীয় আড়ম্বর অনেক কম। লম্বা কোটের হাত ও গলার কাছে কলার দিয়ে আটকানো দুটি অংশের প্রান্তভাগে লেস বসিয়ে কারুকাজ করা হলেও, তা মধ্যযুগের অনুপাতে নগণ্য। David Hume, 'The History of England', (London: R. Bowyer,1812).

115 ডানদিকের ছবিটিতে যে থ্রী পিস স্যুট আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে আড়ম্বরের চিহ্ন শূন্য। বরং চার্লসের সময় খানিকটা আঁটসাঁট ব্রীচ এখানে খোলামেলা ট্রাউজারে পরিণত হয়েছে। Dr. T. D. Hampreys ed., 'The Record of Fashion and Tailor and Cutter's Guide', 4 January 1882, Vol.VII, p.21.

116 Stiff collar--আঁটসাঁট গলাবন্ধনী; Cloak—আভিজাত্য প্রকাশ পায় এমন আজানুলম্বিত পোশাক।

পড়ে।[117] ১৮৫৩ সালের ২৫ শে জুলাই *New York Daily Tribune* এ কার্ল মার্ক্স'এর একটি প্রতিবেদনের দিকে তাকালে পোশাকের সাথে শাসকসুলভ পুরুষকারের বিষয়টা একটু পরিষ্কার হয়। তিনি সেখানে ক্ষয়িষ্ণু মুঘল দরবারকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'His(The Great Mogul) authority does not extand beyond the walls of his palace, within which the Royal idiotic race….,propagates as freely as rabbits……There he sits on his throne, a little shriveled yellow old man, trimmed in a theatrical dress…much like that of the dancing girls of Hindostan…..'.[118] একজন ইউরোপীয়ের মুঘল দরবারি পোশাকি সংস্কৃতিকে 'যাত্রাপালার পোশাক' এবং 'হিন্দুস্তানী নর্তকীদের' পোশাকের সাথে তুলনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, পোশাক তাদের অভিধাণে কতটা লিঙ্গায়িত এবং ক্ষমতাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

১৮৬০ এর দশকে বিখ্যাত সুইস ঐতিহাসিক Jacob Burckhardt ইটালীয় নগর সংস্কৃতিতে পোশাক-আশাকের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশকে প্রাধাণ্য দিয়ে বলেছিলেন, পোশাকি আচার কখনো উত্তরাধিকার লব্ধ হতে পারেনা। এটা ব্যক্তির অর্জিত বিষয়। মনন ও চিন্তাবৃত্তির ফল।[119] এর প্রায় এক দশক আগে ১৭৫৭ সালে Anglican Divine,[120] John Brown যেমন প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে সেই চিন্তা ও মননবৃত্তির রাশ ধরতে বলেছিলেন। তিনি রাজদরবারের অনেক কর্মচারীর 'ড্যান্ডি' বা ফুলবাবু সাজার প্রবণতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলেন, যেকোনো চলমান আদব-কায়দা একসময় গিয়ে সমাজে নিয়মের নিগড় রচনা করে। তাই নতুন আইন করে সহজেই সেই নিগড় খোলা সম্ভব হয়না। কারণ সেই চালচলন মানুষের প্রবৃত্তির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যক্তির পরিচিতিকে তৈরি করে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি মনে করে, প্রতিটি ব্যক্তির চালচলন নির্ভর পরিচিতি সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাহলে অবশ্যই সেই চালচলনকে 'General corruption of manner' বা চালচলনে সামগ্রিক দূষণ হিসেবে চিহ্নিত করে নতুন নীতি নির্ধারণের পথে এগিয়ে আসতে পারে।[121] অষ্টাদশ শতকের শেষ

---

[117] David Kuchta, 'The Three Piece Suit and Modern Masculinity, England 1550-1850', (Berkley, Los Angles, London: University of California Press,2002)

[118] The New York Tribune, July 25 1853; https://marxists.catbull.com

[119] Jacob Burckhardt, 'The Civilization of the Renaissance in Italy', (London: Phaidon Press,1955, originally published in 1860),pp.223-224. নিয়েছি Wilson, 'Adorned in Dreams', p.26 থেকে।

[120] সপ্তদশ শতক থেকে চার্চ অফ ইংল্যান্ড এবং চার্চ অফ আয়ারল্যান্ড'এর Anglica Divine রা রাজদরবারে চার্চের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতেন। বলা বাহুল্য, এই Anglicanism হল Catholicism ও Protestantism এর মধ্যবর্তী পথ।

[121] Kuchta, *The Three Piece Suit and Modern Masculinity*, p.3

চিত্র ৩.১১: ব্রিটিশ মন্ত্রী ও Board of Control for Indian Affairs-এর অগ্রগণ্য সভ্য Henry Dundas-কে ব্যঙ্গ করে ১৭৭৮ সালে James Gillary-র আঁকা ছবি "Dun-Shaw'.(@Trustees of the British Museum).

দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-সাহিত্যেও ভারতের উপর সাম্রাজ্যিক প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে 'ওরিয়েন্টাল ডেস্পট'দের রাজনৈতিক পোশাকি শিষ্টাচারের অনুপ্রবেশ ব্রিটেনে ঘটছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট জন গিলারির 'DUN-SHAW' ছবিটির দিকে যদি তাকাই (ছবি ৩.১১ দ্রষ্টব্য) লক্ষ্য করব, হেনরি ডুনডাসের একটি পা লণ্ডনের লিডেনহল স্ট্রিটে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসে, অন্যটি বেঙ্গল প্রভিন্সের উপর। তাঁর পরিধানে স্কটিশ কিল্ট স্কারটের সাথে ওরিয়েন্টাল টিউনিক, মাথায় গাগড়ির উপর ক্রাউন, পায়ে টারটার স্টকিং। এই মিশ্র পোশাকি রূপ নিয়ে তিনি পুবের সাম্রাজ্যের দিকে চেয়ে। তাতে সূর্য-চন্দ্রও অবাক। আবার কারটুনিস্টও অবাক। তাই তিনি Dundas'এর নামকরণ করেন 'Dun-Shaw' অর্থাৎ পুবের 'শাহ' বা সম্রাটদের দ্বারা প্রভাবিত Henry Dundas.

জন্সনও এই সমালোচনার মানসিকতা থেকে ভারতমুখী ইংরেজদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় আড়ম্বর দেখানো হল সময়ের দাবিকে পাত্তা না দেওয়ার মানসিকতা। আড়ম্বর দেখাতে গিয়ে তাঁর সমূহ ক্ষতি হতে পারে — এটা জেনেও যখন ব্যক্তি আড়ম্বরে দিন কাটান, সেটা অপুরুষোচিত। রাজা দ্বিতীয় চার্লস রাজদরবারে ঘনীভূত অর্থনৈতিক দূরাবস্থা থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে ড্রেস রিফর্মে নেমে পোশাকে-আশাকে পুরুষকারের যে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন, ভারতের মতো ক্রান্তীয় জলবায়ুর দেশে এসে বিলিতি কায়দার ভেস্ট পরে ঠাটবাট দেখিয়ে স্বাস্থ্যোবনতি থেকে স্বদেশবাসীদের বাঁচাতে জন্সলের পোশাক সংক্রান্ত নিদানও

তেমনি উপনিবেশের মাটিতে পুরুষকার সৃজনের একটা প্রকল্প। অবশ্য এই নিদান দেবার পথে এগুলোর আগে জন্সন ক্রান্তীয় আবহাওয়ার সাথে জুঝতে ভারতীয়রা কিরকম পোশাক পরেন তা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলছেন, এদেশে যেসব নেটিভরা গঙ্গাবক্ষে ইংরেজদের বজরার দাঁড় টানেন, তাঁরা খাটো ধুতি পড়েন। ধুতির কচ্ছটি দুই উরুর মধ্য দিয়ে টেনে কোমড়ের পিছনে গোঁজা। তাঁর ভাষায়, '… this dress, or undress corresponding pretty nearly to the fig-leaf of our great progenitor'.[122] অর্থাৎ এদেশীয় নাইয়াদের উদলা শরীরে শুধুমাত্র একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণকে তিনি মানবজাতির আদিপুরুষের পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর আরও বক্তব্য - ক্রান্তীয় অঞ্চলের খটখটে রোদ্দুরে হোক বা ঝমঝমে বৃষ্টিতে, এই মাঝিরা এরকম পোশাকই পরে থাকেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত পাড়ে পৌঁছনো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মাঝিরা দিন-দুপুরের রৌদ্রে ঘেমে নেয়ে একসাথে দাঁড় বেয়ে যান। সারাদিন এত পরিশ্রম করে খান সামান্য চাল ফুটোনো এবং দিনপ্রতি মজুরি পান তিন আনা মাত্র।[123] ভারতীয়দের পোশাকি দেহকে বিচার-বিশ্লেষণের এই প্রবণতা আঠারো শতক বা উনিশ শতকের প্রথম দিকে আগত ইংরেজদের মধ্যেও প্রবলভাবে ছিল।[124] এর পিছনে মূল কারণ হল, এদেশীয় আবহাওয়ার সাথে যুঝতে তারা কিভাবে সাজ-পোশাক করেন, তার দিকে নিবিড় দৃষ্টি রাখা। তাই ভারতীয় মাঝি-মাল্লার পরিচ্ছদে এরকম স্বল্পতার কারণ বোঝাতে গিয়ে তিনি আরো একবার পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ীই যে ব্যক্তির চালচলন নির্ধারিত হয়, সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়াও বলেছেন, প্রকৃতি মানুষের ত্বকের রং এবং ত্বকের ধরণকে এমনভাবে তৈরি করে, যাতে স্থানীয় আবহাওয়ার চরম পর্যায়েও দেহ অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে উপযোগী থাকে। সেকারণে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষদের রোমকূপের সংস্থান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষের চাইতে ভিন্ন। ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের রোমকূপ থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত এবং চ্যাটচ্যাটে ঘাম তীব্র গরমে ত্বকের কোমলতা রক্ষা করে এবং রোমকূপকে রেচন প্রক্রিয়ার উপযুক্ত রাখে। কিন্তু ইউরোপীয়দের লোপকূপের সংস্থান অন্য রকম হওয়ায়, তাদের ঘামের সাথে ওই বিশেষ তৈলাক্ত তরল নিঃসৃত হয়না। যার ফলে তাঁদের ত্বকের নমনীয়তা নষ্ট হয়।[125]

জন্সন শুধুমাত্র মাঝি মল্লারদের পোশাক-আশাকের দিকেই তাকাননি, তিনি খেটে খাওয়া মানুষ ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অন্যান্য বৃত্তির নেটিভদের পোশাকের মধ্যে পাগড়ি ও

---

[122] James Johnson, 'The Influence of Tropical Climates on European Constitutions', Vo.II, (Philadelphia: Benjamin & Thomas Kite, 1824), p.289.

[123] Ibid.

[124] Rev. James Chambers, 'Bishop Heber & Indian Missions', (London: John W. Parke, 1846), p. 4; Mark Harrison, 'Climates and Constitutions', p. 7.

[125] Johnson, 'The Influence of Tropical Climates on European Constitutions',Vo.II, pp.289-290

কোমড়বন্ধের কথা বলেছেন। ক্রান্তীয় সূর্যের প্রখর তাপ থেকে বাঁচতে পাগড়ির ব্যবহার দেশীয়দের জন্য কতটা দরকারি তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অন্যদিকে এদেশীয় শীতের শুষ্কতায় আন্তরয়ন্ত্রের কার্যকারিতাকে সুস্থ রাখার জন্য কোমড়বন্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ কোমড়বন্ধনী অন্ত্রাসয়ের মধ্যে ভিসেরাকে সংরক্ষিত করে শীতের ক্ষয়কারী প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাঁর মতে ইউরোপীয়দের যদি ভারতে এসে নেটিভদের পরিচ্ছদশৈলী থেকে কিছু অনুকরণ করতে হয়, তা অবশ্যই এই কোমড়বন্ধনী হওয়া প্রয়োজন।[126] বলা বাহুল্য, নবাগত ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকেই এদেশীয় জল হাওয়া সহ্য করতে না পেরে আন্ত্রিক ও আমাশয়ে ভুগতেন। তার সাথে যদি ইউরোপীয় ধরণে আঁটসাঁট পোশাক থাকে তাহলে তো কথাই নেই। ভারতীয় জলবায়ু ইংরাজী রুচির পরিচ্ছদের জন্য কতটা অনুপযুক্ত এবিষয়ে বার্নিয়ার লিখেছিলেন, এদেশের আবহাওয়া আঁটসাঁট পোশাকের জন্য অনুপযোগী বলে এদেশীয়রা জুতো জোড়া পর্যন্ত ঢোলা পরেন।[127]

নেটিভরা কোন সুতোর পোশাক পরে ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় জীবনধারণ করেন, এই পর্যবেক্ষণের উপরও জন্সন জোর দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, নেটিভদের মধ্যে হালকা কাপড় পরবার চলটাই সবচাইতে বেশি। রুচি অনুসারে সেই পোশাক সুতির হতে পারে, হালকা সিল্কের হতে পারে বা কালিকোর হতে পারে। সূর্যালোক থেকে মাথাকে বাঁচাতে এদেশীয়রা মাথায় পরিহিত টুপির উপর দৈর্ঘ্য প্রস্থে বড় সুতির কাপড়কে পেঁচিয়ে পাগড়ি বানাতেন এবং মাথাকে ঠান্ডা রাখবার জন্য সেই সুতির কাপড়টিকে সামান্য আর্দ্র রাখতেন।[128] তাই নবাগত ব্রিটিশদের প্রতি জন্সনের পরামর্শ ভারতে সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে, তাঁদের লিনেনের ফ্যাশন বর্জন করতে হবে। ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় লিনেন পরা আর বিলাসিতা করা সমকক্ষ বলে মনে করেছেন তিনি। অবশ্য এই বক্তব্যের পিছনে তিনি যুক্তিও দিয়েছেন। যেমন - লিনেন সুতো খুব তাড়াতাড়ি সূর্যালোক পরিবহন করে। যা মানবদেহের তাপমাত্রাকে ৯৭ ডিগ্রি থেকে বাড়িয়ে তোলে, ফলত বাইরে বা ছাদের তলায় যেকোনো জায়গায় এই সুতোর পোশাক যেকোনো রকম শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে সুতির কাপড়ে খুব ধীরগতিতে রোদের তাপমাত্রা পরিবাহিত হয়, ফলত শরীরের স্বাভাবিক তাপমান বিঘ্নিত হয়ে অসুস্থ হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। শুধুমাত্র তা'ই নয়, আবহাওয়ার উত্থান-পতনে অনেক সময় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা শরীরের তাপমাত্রা থেকে কমে যায়, তখন সুতির পোশাক শরীরের অধিক উত্তাপকে পরিবহন করে, আবহাওয়ার সাথে শরীরের তাপমাত্রার সমতা বিধাণ করে। আবার সুতির পোশাক শরীর থেকে

---

[126] Ibid, p.290

[127] Jamila Brij Bhushan, 'The Costumes & Textiles of India', (Bombay: Taraporevala's Treasure House of Books, 1958), p. 30.

[128] Johnson, 'The Influence of Tropical Climates on European Constitutions', Vo.II, p. 290.

ঘামকে নিঙড়ে নিয়ে শরীরে ঘাম বসে যেতে দেয় না, সেখানে লিনেন কাপড় ঘর্মাক্ত দেহের সাথে সংলগ্ন হয়ে থাকে। ফলত শরীরে ঘাম বসে গিয়ে স্বাস্থ্যের পরিচ্ছন্নতাকে নষ্ট করে এবং রোগ জীবাণুর খোরাক জোগায়।[129] অবশ্য জন্সন ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় সুতির চাইতে পশমের প্রচন্ড মিহি তন্তু দিয়ে বোনা ফ্লানেল কাপড়কে অনেক বেশি আরামদায়ক বলেছেন।

ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলে এসে নিজেদের পোশাকি পারিপাট্যের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা যে কতটা কষ্টকর সেই বিষয়টা তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। তাঁর ভাষায়, 'The necessity which tyrant custom—perhaps policy, has imposed on us, of continuing to appear in European dress—particularly in uniforms, on almost all public occasions, and in all formal parties, under a burning sky, is not one of the least miseries of a tropical life!'[130] অর্থাৎ কোম্পানি নির্দেশিত পোশাক পরে, ক্রান্তীয় সূর্যের দেশে সরকারী অনুষ্ঠান ও জমায়েতে অংশগ্রহণ করতে যাওয়াকে তিনি একটা অন্যতম দুর্দশা বলেছেন। সেই দুর্দশার ভুক্তভোগী তিনি ব্যক্তিগতভাবে হয়েছেন বলেই কর্মচারীদের উপর ইউনিফর্ম সংক্রান্ত বিধিনিষেধকে তিনি অমানবিক এবং কঠোর বলেও ব্যক্ত করেছেন। তবে ক্রান্তীয় অঞ্চলে এসে বিলিতি পোশাকি রুচির অখণ্ডতা রক্ষার তাগিদটা যে শুধুমাত্র উপর থেকে আরোপিত নয়, সেই বিষয়টা তাঁর আরও কিছু বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়। যেমন, ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার সময় প্রায় নতুন (তাঁর ভাষায় 'Griffinish') ব্রিটিশরা গাদাগুচ্ছ লিনেনের কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতেন। কেননা তাঁরা অবগত ছিলেন, এখানে ধোপারা অতীব সস্তায়, যত্ন করে কাপড় ধৌত করেন।[131] ফলত তাঁদের মনে হত, ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঘাম হলেও অসুবিধা নেই। দিনে তিন চার বার লিনেনের পোশাক পাল্টালেই হয়ে যাবে। পোশাক ধোওয়ার জন্য এত দরদী ও সস্তায় দেশীয় ধোপা থাকতে দিনে দুজোড়া পোশাক পরতে অসুবিধা কোথায়! জন্সন বলছেন, লিনেনের জায়গায় যদি সুতির কাপড় পরা হয়, তাহলে দিনে একজোড়া কাপড়েই সেরে যাবে। কারণ সুতির কাপড়ে ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় ঘাম কম হয়, বা হলেও কাপড় তা টেনে নেয় এবং শারীরিক অস্বস্তি অনেকটা প্রশমন করে। কিন্তু লিনেন কাপড় পরলে দিনে কয় জোড়া পোশাক লাগবে বলা শক্ত। কারণ এই কাপড় দ্রুত তাপ পরিবহণ করে শরীরকে উত্তপ্ত করে ঘাম সৃষ্টি করে, ঘামকে টেনে নিতেও পারেনা, শুকাতেও দেয় না। ফলত শরীরে অস্বস্তি বাড়বার সাথে সাথে আবার আরেকজোড়া পোশাক পড়তে হয়, সেই পোশাকটিও লিনেন হলে, পূর্বের ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি হয়। ফলত শরীরে জলশূন্যতা ও লবণশূন্যতা সৃষ্টি হয়। যা

---

[129] Ibid, pp. 290-291

[130] Ibid, p. 293

[131] যদিও এদেশে এসে অনেকের সেই 'ভ্রম' ভেঙেছিল। ফ্যানী পার্কস যেমন এদেশীয় ধোপাদের চৌর্যবৃত্তি ধরতে পেরে তাদের 'মস্ত ধূর্ত' আখ্যা দিয়েছিলেন। Fany Parks, 'Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque, during Four-and-twenty Years in the East; with Revelations of Life in the Zenana', Vol. 1, (London: Pelham Richardson, 1850), p. 288.

স্বাস্থ্যকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।[132] স্বাদেশিক পোশাকে শারীরিক এরূপ অস্বস্তির জন্যই এলিজা ফে'র মতো ভারত-বন্ধু ব্রিটিশ মহিলাদের এদেশে গাউন না পরে এদেশীয় রুচির পোশাক পরার উপদেশ দিয়েছিলেন।[133]

জন্সন কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসীকে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচার ছাড়ার উপদেশ দেননি। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অধীনে কাজ করে তাঁর মধ্যেও উপনিবেশের শত বিরূপতাতে স্বাদেশিক পারিচ্ছদিকতার প্রতি দায়বদ্ধতার মন গড়ে উঠেছিল। তাই জন্সন বলেননি - ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় এসে ব্রিটিশদের ওয়েস্ট কোট, প্যান্টালুন, ইজের, কলার, স্টকিং, ক্যাপ, শ্যু না পরে মুঘলি ধরণে ঢোলা আলখাল্লা পরা উচিত। বরং তাঁর পরামর্শ হল, ইংরেজরা লিনেন সুতোর বস্ত্র না পরে ফ্লানেল বা সুতির বস্ত্র পরেও নিজেদের জাতীয় রুচিকে এবং পোশাকি রাজনীতিকে প্রাত্যহিকতায় বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। Jayne Shrimpton'এর মতো ফ্যাশন-গবেষক ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের পোশাকের ধরণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলেও তিনি সেই পারিচ্ছদিক রুচির সাথে পোশাকি রাজনীতি ও ক্ষমতার যোগসূত্রকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। ওউপনিবেশিক মধ্যবিত্তের পোশাকি রুচিকে বুঝতে আমাদের রুচি ও রাজনীতির যোগসূত্রটিকেই বুঝতেই এই আলোচনার অবতারণা।[134]

ক্রান্তীয় অঞ্চলে আগত ব্রিটিশদের ক্ষমতা, স্বাস্থ্য এবং তার উপর নির্ভরশীল বাজারের কথা মাথায় রেখে ইংল্যান্ডে অনেকেই ক্রান্তীয় সূর্যের সাথে লড়াই করবার উপযোগী ক্যাপ ও জুতো আবিষ্কারে মেতেছিলেন। যেমন ১৮৭০ এর দশকে ইংল্যান্ডের মিডলসেক্স নিবাসী রবার্ট ওয়েবেল নামক এক ভদ্রলোক হ্যাট ও ক্যাপে আবহাওয়া অনুসারী পরিবর্তনে কিরকম ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা জানিয়ে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনকে একটা চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি বলেন, ভারতের মতো জলবায়ু অঞ্চলে ক্যাপ যত বেশি সাধারণ হবে ততই মঙ্গল। ক্যাপের প্রান্ত বা ব্রিমকে চোখে সূর্যের তেজ আটকানোর মতো প্রশস্ত রেখে, মাত্রাতিরিক্ত প্রশস্ত রাখার চলকে বাদ দেওয়া উচিত বলে তিনি মত দিয়েছেন। কারণ তাতে মাথার উপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। তাছাড়া, মাথার সাথে ক্যাপকে সংলগ্ন রাখতে নূন্যতম যতটুকু আঁটসাঁট রাখতে হবে ততটুকু রেখে মাত্রাতিরিক্ত আঁটসাঁট না করাই ভালো। হ্যাটের নিম্নাংশ যেটা মাথার উপরিভাগের সাথে সংলগ্ন থাকে, সেই অংশটার কাপড় সুতির হওয়া যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে কতটা জরুরি - তিনি তাও

---

132 Johnson, 'The Influence of Tropical Climates on European Constitutions', Vo.II, p.235, 295.

133 'The Original Letters from India of Mrs. Eliza Fay', p. 114.

134 Jayne Shrimpton, 'Dressing for a Tropical Climate', pp. 55-70; Sumit Kanti Ghosh, "Tropical Climate, Health, Dress and Power: Imperial Taste and Politics of Clothing in Early Colonial Bengal", in Prasanta Ray edited, 'Situations and Contexts: Narratives on Nineteenth Century Bengal', (Kolkata: Hyphen, August 2022), pp. 77-113.

বুঝিয়েছেন।[135] দক্ষিণ এশীয় উপনিবেশে ব্রিটিশের স্বাস্থ্য ও ক্ষমতার পোশাকি রক্ষাকবচ হিসেবে তাই রবার্ট ওয়েবেলের মতো বিভিন্ন উদ্যোগপতিদের উদ্যোগে ধীরে ধীরে 'শোলা টুপি'র মতো হালকা ও আরামদায়ক টুপির বিকাশ ঘটেছিল।[136] অন্যদিকে ক্রান্তীয় ধুলো এবং আর্দ্র অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে শরীরের যে অংশটি অনেক বেশি ধকল সহ্য করত, সেটি হল পা। ১৮৮১ সালে সেই পায়ের জন্য সুরক্ষিত জুতোর হদিশ দিয়েছেন, ইংল্যান্ডের নর্থেমটন নিবাসী থমাস লেকক। তিনি বলেছেন, ক্রান্তীয় অঞ্চলে কাজ করতে গেলে সিঙ্গেল সোলের জুতো পা-কে নিরাপদ রাখবার জন্য উপযুক্ত নয়। সে পায়ে মোজা পরে যতই জুতো পরা হোক না! সেকারণে তাঁর নিদান হল ডাবল সোলের জুতো পড়তে হবে। অর্থাৎ জুতোর অভ্যন্তরে জুতোর সাথে সংলগ্ন সোলের উপর আরেকটি মোটা ও নরম সোল দিতে হবে। যাতে চলা ফেরা আরামদায়ক হয় এবং শরীরে রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে।[137] শুধুমাত্র পোশাক-আসাক আর জুতোই নয়, ক্রান্তীয় অঞ্চলে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য স্নানের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। এমন কি ব্রিটিশ শরীরের উপযুক্ত ক্রান্তীয় স্নানের পদ্ধতি নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণও শুরু হয়েছিল।[138] উপনিবেশে শাসকের ক্ষমতার সুস্থ পোশাকি ভিত্তিটা কিরূপ হবে – তা নিয়ে বিভিন্নমুখীন চর্চাটা উনিশ শতকের প্রথম দিকেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা এদেশে ইংরেজ শাসন-ক্ষমতার ক্রমোত্তোরণের সাথে সাথে চলতে থেকেছিল। শাসক-শরীরের আরাম-বিধাণ ও শরীরে পোশাকি আবরণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যিক মানসিকতার প্রতিফলন সংক্রান্ত আলোচনার যে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি জন্সন উনিশ শতকের প্রথম দিকে রচনা করেছিলেন, সেই ভিত্তির উপরই উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে আরও নানা বিচার-বিশ্লেষণের কাঠামো উঠেছিল।

ফ্লানেল বিতর্ক: উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর প্রেক্ষিতে

কালের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্ষমতার সুস্থ পোশাকি ভিত্তি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা যত বাড়ছিল, ততই ক্ষমতার দৃশ্যমান ভিত্তির সুবিধার নানা দিকও প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শুরুর দিকে ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ানো সাহেবদের যেখানে পর্যাপ্ত পোশাক সাথে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল, উনিশ শতক শেষ হতে হতে সেই মতের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছিল – সেই প্রশ্নটা রয়েই যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতে নিজেদের পোশাকি রুচির পরিসর জারি রাখার

---

[135] Specification of an invention for improvements in Hats and coverings for the head by Mr. Robert Wheble, General Proceedings, B.112, June,1870, West Bengal State Archive.

[136] Douglas Dewar, 'Bygone Days', pp. 53-57.

[137] Improvements in the manufacture of boots and shoes by Thomas Laycock, Proceeding B, File. 15, November 1881, West Bengal State Aechive.

[138] 'An Anglo-Indian Domestic Sketch', p. 56-58.

জন্য প্রয়োজনীয় বাজার উনিশ শতকের শেষ দিকে যতটা পাকাপোক্ত ছিল, উনিশ শতকের শুরুতে ততটা পাকাপোক্ত ছিল না। তবু এই মতের পরিবর্তন না ঘটার কারণ কি? প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু ঔপনিবেশিকদের আলোকপ্রাপ্তি এবং সভ্যতার প্রকল্পের সাথেই বাঁধা আছে।

ব্যাবসা-বানিজ্য, ধর্মপ্রচার এবং প্রশাসনিক কাজে ভারতবর্ষে থাকতে গেলে ভারতে কি কি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেতে হবে, সেই প্রশ্নে ১৮৮১ সাল নাগাদ আমেরিকার Rev. A. D. Rowe অবশ্য বলেছেন, '... it is not *absolutely* necessary to take anything.'[139] কারণ তাঁর মতে, 'The larger cities of India can supply everything needed by European residents…'[140] কিন্তু একটি সমস্যার কথা তিনি এক্ষেত্রে জানিয়েছেন। সেটি হল, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ও আমেরিকান রুচির জামা-কাপড়ের উর্দ্ধমূল্যের সমস্যা এবং অনেক টাকা খরচ করেও ভালো মানের ইউরোপীয় সামগ্রী না পাওয়ার সমস্যা। তিনি বলছেন, ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য মনস্থ করে নিলে, এই বাস্তব সমস্যাটিকে মেনে নিতেই হবে। সভ্য জীবনযাপন থেকে বহুদূরে গিয়ে সেখানকার অবস্থার বিচারে নিজেদের তাল মেলানোর কর্তব্য স্বীকার করেই তবে এগুতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'We have known people who imagined going to India meant going into a rude wilderness, where they would never more have need of a "best suit", or any other accessory of civilized life.'[141] ভারতবর্ষের বাস্তবিক অবস্থাকে ইংরেজরা নিজেদের সাপেক্ষে যে বন্য বা wild অবস্থা হিসেবে দেখতেন, তা এই উক্তি থেকে পরিষ্কার। আর তার কথার সুরটা এমন, যে বন্য অবস্থায় জীবনধারণ দুরূহ, সেখানে 'evening dress-suits of the best quality' চাওয়া বিলাসিতা ছাড়া আর কি![142] তিনি তার সুরকে পরিষ্কারভাবে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের পূর্ব উপনিবেশ আমেরিকার কথা বলেছেন, যে আমেরিকাতে ইউরীপীয়রা যে পরিচ্ছদ পরিধান করে পার্টিতে যোগ দিতে পারতেন, সেই একই পোশাক পরে ভারতবর্ষে কোনো পার্টিতে অংশ নেওয়া দুষ্কর। কারণ ভারতের আবহাওয়া ইউরোপ বা আমেরিকার আবহাওয়ার মতন নয়। সেক্ষেত্রে ইউরোপের পোশাকি সংস্কৃতিকে ভারতে বলবত রাখতে হলে বেগ পেতে তো হবেই। তাই ভারতীয় আবহাওয়ার উপযোগী বিলিতি ফ্যাশনে মন না বসা ইংরেজদের স্বদেশ থেকে জামা-কাপড় এনে পরাকে নিয়ে বলা হয়েছে, '… the European resident in India needs to be provided with evening dress-suits of the best quality, and these are advantageously brought from home.'[143] এখানে 'advantageously'

---

[139] Rev. A. D. Rowe, 'Everyday Life in India: Illustrated from original photographs', (New York: American Tract Society, 1881), P. 397.

[140] Ibid.

[141] । Ibid.

[142] । Ibid.

[143] । Ibid.

শব্দটির ব্যবহার দেখে বোঝা যাচ্ছে, স্বদেশ থেকে জামা-কাপড় আনিয়ে পরিধান করা, ভারতবাসী সকল ইংরেজের পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিপুল ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা খুব কম জনেরই থাকত। তার উপর ভারতের আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে সেই জামাকাপড়ের বুননের সুতা নির্বাচনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হত। তাঁর ভাষায়, '…the material not ought to be heavy…'[144] কারণ সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হল পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্য। নিজেদের উপনিবেশবাসীদের চাইতে আলাদা করতে গিয়ে, সভ্য প্রতিপন্ন করতে গিয়ে যদি পরিচ্ছন্নতার ও স্বাস্থ্য রক্ষার দিকটি বিঘ্নিত হয়, তবে সেই সভ্যতার প্রকল্পের কোনো মূল্য নেই। Ryan Johnson সুস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সাথে ক্রান্তীয় অঞ্চলে পোশাকের কাপড় নির্বাচনের বিষয় নিয়ে বিশদে লিখেছেন।[145] কিন্তু সেই পোশাক নির্বাচনের সাথে যে সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার মানসিকতা জড়িয়ে ছিল – সেই বিষয়টি অনালোকিত হয়েই পড়েছিল।

এ সাম্রাজ্যিক মানসিকতাকে বুঝতে হলে উনিশ শতকের শেষের দিকে ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় সাদা-চামড়ার জন্য উপযোগী কাপড় বিতর্ক বিষয়ে প্রবেশ করা উচিত। কারণ, Rowe'র মতে, ভারতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রবণতা এতটাই আকস্মিক (তাঁর ভাষায়, 'The changes in temperature are very sudden') যে, সেখানে ফ্লানেল কাপড়ই শরীরকে সুস্থ রাখবার জন্য, অন্য যেকোন ওষুধের চাইতে ভাল কাজ করত। ভারতে সাদা-চামড়ার ডাক্তারদের মধ্যেও একটা কথা বেশ প্রচলিত ছিল, "...would not throw good medicine away upon any fool who would not wear flannel."[146] কিন্তু ভারতে ফ্লানেলের দামও যে কম ছিল না, তা বোঝা যায় লেখকের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন, 'In India flannels are dear, or if cheap, they are old and damaged in proportion.' অর্থাৎ কমদামী ফ্লানেল যদি পাওয়াও যায়, তাহলে বুঝতে হবে, সেই ফ্লানেলে কোনো খুঁত রয়েছে। তাই তাঁর নিদান হল, ভারতে আসার সময় ফ্লানেলের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভালো মানের কাপড়-চোপড় নিয়ে আসা ভাল - 'A good supply need to be brought along.' কিন্তু পরক্ষনে তিনি আবার বলছেন, ভারতে 'Thin white for under-wear, and heavy white for morning suits, will be found serviceable. Light tweeds, for gentlemen's wear, and lawns and linen, and other light material, for ladies' dresses, will be found a good investment.' অর্থাৎ যদি ভালো মানের লিনেন কাপড় ভারতে যাওয়ার সময় নেওয়া নাও যায়, ভারতে কিন্তু লিনেন কাপড়ের চলনসই হালকা সাদা রঙের অন্তর্বাস এবং গাড় সাদা রঙের মর্নিং স্যুট পাওয়া যেত। তাছাড়া হালকা পশমের বস্ত্র, হালকা লন ও লিনেনের কাপড়ও ভালো দাম দিলে পাওয়া যেত। তিনি সেই দামের পরিমাণ

---

144 I Ibid.

145 Ryan Johnson, 'European Cloth and "Tropical" Skin: Clothing Material and British Ideas of Health and Hygiene in Tropical Climates', *Bulletin of the History of Medicine'*, Vol. 83, Number 3, Fall 2009, pp. 530-560.

146 Rev. A. D. Rowe, 'Everyday Life in India', P. 398.

বোঝাতে বলেছেন, ‘A few pairs of wollen blankets will repay their cost in any part of India.’[147] এখান থেকে অনুমেয়, ভারতে ভালো মানের ইউরোপীয় ফ্যাশনের দাম কেমন হতে পারত।

তবে এদেশে বসবাস করতে গেলে ফ্লানেল কাপড়ের গুরুত্ব সূচক “...would not throw good medicine away upon any fool who would not wear flannel.” এই বক্তব্যটিকে একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। ১৮৭১ সালে এডমুণ্ড হুল ভারতে আসতে উৎসুক সাদা-চামড়ার ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘Before proceeding further with regard to the selection of outfit, I wish to enforce the following point. Flannel should *always* be worn next the skin; and this applies to Anglo-Indians of both sexes, and under all circumstances.’[148] অর্থাৎ ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় সব ঋতুতে, নারী-পুরুষ উভয়কেই তিনি Flannel পরবার নিদান দিচ্ছেন। এখন ফ্লানেলের বাংলা করলে হয়, মিহি ধরনের উলের তৈরি বুনন। ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় উলের সাথে সচরাচর শীতের সম্পর্ক। শীতকালে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখার জন্য আমরা উলের তৈরি জিনিসপত্তর ব্যবহার করি। কিন্তু এই বক্তব্যে ক্রান্তীয় সূর্যের অত্যধিক তাপ থেকে শরীরকে বাঁচাতে, সূক্ষ্ম উলের তৈরি ফ্লানেল কাপড় ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর পিছনে লেখকের যুক্তিগুলি লেখকের নিজের ভাষায় শুনে নেওয়া যাক—‘Take a piece of flannel, and stretch it over a glass of water, just so close that the ends of the fibres touch the water; then do the same with a piece of calico or linen; and it will be found, that the woollen fibres have hardly sucked up more water than they were in contact with; while the moister will have penetrated to the upper surface of the calico or linen. This explains the fact of chills more quickly arising from cotton and linen clothing. Perspiration penetrates at once to the external surface, and is acted on by atmosphere; while with a woollen garment, it is retained within, or absorbed so gradually as to produce no bad effects.’ [149] অর্থাৎ তাঁর মতে ফ্লানেলের অন্তর্বাস ক্রান্তীয় ঘামকে যেভাবে শুষে নেয়, সেভাবে কটন বা লিনেনের অন্তর্বাস শুষতে পারে না। ফ্লানেল বা সূক্ষ্ম উলের পরিচ্ছদ শরীরকে কিভাবে ঠাণ্ডা রাখে, তা বোঝাতে তিনি আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলছেন, - ভারতের ক্রান্তীয় উত্তাপে জানালা খোলা রেখে পাশাপাশি দুটি বিছানার একটিতে তোষকের উপর ফ্লানেলের কম্বল ঢাকা দিয়ে অপরটিতে পুরু সুতির শিট ঢাকা দিয়ে রেখে, দুপুর বেলার অধিক তাপমাত্রায় বিছানা দুটির উপর পাতা ফ্লানেল কম্বল ও পুরু সুতির শিটের তলদেশের তাপমাত্রা থার্মোমিটার দিয়ে মাপলে

---

[147] Ibid, p. 398.

[148] Edmund C. P. Hull, ‘The European in India; or Anglo-Indian’s Vade-Mecum. A Handbook of Useful and Practical Information for those Proceeding to or Residing in the East Indies, Relating to Outfits, Routes, Time for Departure, Indian Climate and Seasons, Housekeeping, Servants, etc., etc.; also an Account of Anglo-Indian Social Customs and Native Character’, (London: Henry S. King & Co., 1871), p. 7.

[149] Ibid. p. 7.

দেখা যাবে, ফ্লানেলের কম্বলে ঢাকা বিছানা, পুরু সুতির চাদরে ঢাকা বিছানার চাইতে শীতল। তাই হুলের সিদ্ধান্ত – 'All this goes to prove, that an object covered with wool is less susceptible to changes of temperature than one clothed with cotton; and in the degree that cotton is inferior in this respect to wool, linen is inferior to cotton.'[150] অর্থাৎ হুল ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় উত্তাপ রোধ করে শরীরকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখার জন্য উপযুক্ত তন্তুর নিরিখে প্রথম স্থানে রেখেছেন ফ্লানেলকে, দ্বিতীয় স্থানে কটনকে এবং সর্বশেষে রেখেছেন লিনেনকে। তাঁর সংযোজন, 'A woollen coat has the merit, not often thought of, of protecting the back from the sun; linen, silk, and cotton coats may "look nice and cool," but they afford no protection in this respect.' [151] অর্থাৎ কটন, লিনেনের ফ্যাশন-মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু ক্রান্তীয় সূর্যালোককে প্রতিহত করতে তাদের কোনো মূল্যই নেই।

কিন্তু আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছিলাম, ক্রান্তীয় অঞ্চলে শরীরের আরাম বিঁধানের জন্য সুতির কাপড়ের উপর জন্সন কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও জন্সন আরামদায়ক দেহাবরণ হিসেবে ফ্লানেলের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। তবে তার কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন, - '...in general flannel is inconvenient, for three reasons. First, it is too heavy; an insuperable objection. Secondly, where the temperature of the atmosphere ranges pretty steadily a little below that of the skin, the flannel is much too slow a conductor of heat from the body. Thirdly, the spicula of flannel prove too irritating, and increase the action of the perspiratory vessels on the surface.'[152] অর্থাৎ সুতি বা কালিকোর চাইতে ফ্লানেলের কাপড় বেশ ভারী। আবার বায়ুমণ্ডলের তাপমান যখন স্থিতিশীল থাকে এবং শরীরের তাপমাত্রা বেশি বেশি থাকে, তখন ফ্লানেল শরীরের অতিরিক্ত তাপকে বহল করে, বায়ুমণ্ডলের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে যথেষ্ট ধীর ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে ফ্লানেল কাপড়ের আঁশ শরীরে অস্বস্তির সৃষ্টি করে এবং ঘর্মগ্রন্থির কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। তবে এতসব সমস্যা সত্ত্বেও জন্সন এটাও স্বীকার করেছেন যে, '...[flannel] is safer covering than the later [cotton], and is adopted by many experienced and seasoned Europeans.'[153] কিন্তু এই বক্তব্যের আগে যতটুকু সংশয় প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংশয়ের মেঘ কাটিয়ে উনিশ শতকের শেষে যেতে যেতে ক্রান্তীয় আর্দ্রতায় ফ্লানেলের স্বাস্থ্যকরতা একপ্রকার যে স্বীকৃত হয়ে উঠেছিল, তা আমরা রোয়ি'র বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি।

---

150 Ibid, p. 7.

151 Ibid, p. 8.

152 James Johnson, 'The Influence of Tropical Climate', p. 237.

153 Ibid.

তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে গিয়েও যে ভারতে বিলিতি রুচির পণ্য-বাজারের প্রতি ব্রিটিশদের নির্ভরশীলতায় একটা অনীহ মনোভাব ছিল, তা ১৮৮০-র দশকে A.D. Rowe-কে ভারতে ভ্রমণ করার সময় ব্রিটনদের জুতো, মোজা, কাফ, কলার, অন্তর্বাস, তোয়ালে, রুমাল, টেবিল-ক্লথ, তোয়ালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে দেখে বোঝা যায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, আমেরিকা অথবা ইউরোপের জুতো যেরূপ জুতসই, ভারতে প্রস্তুত জুতোর মান খুবই খারাপ। আর মোজা, রুমাল, লিনেনের কলার, কাফ, সবধরণের অন্তর্বাস, তোয়ালে, টেবিলে পাতার জন্য লিনেন এর মতো প্রাত্যহিক ব্যবহার্য কাপড় বেশি পরিমাণে নিতে বলেছেন, কারণ ভারতবর্ষীয় 'অদক্ষ' ধোপাদের হাতে এসব খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। ইতিবাচক কথা তিনি যা বলেছেন, তা কেবল এদেশীয় দর্জিদের বিষয়ে। তাঁর মতে ভারতে আসার সময় যত বেশি পরিমাণ থান কাপড় আনা যায়, তত ভালো। কারণ দেশীয় দর্জিদের দিয়ে কমদামে নিজেদের প্রয়োজনমত সেলাই করে নেওয়া যাবে – 'if a good supply of material is brought, these articles can be made up here with the aid of native tailors very cheaply.'[154] বলা বাহুল্য যে রোয়ি যে সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেশ থেকে আসার সময় যতটা সম্ভব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসতে বলছেন, তখন কিন্তু কলকাতায় সাহেবদের স্বদেশীয় রুচির দ্রব্যসামগ্রী জোগান দিতে বাজারও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। যেমন ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড়ে ধর্মতলা বাজার, যেটি উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই কলকাতার ব্রিটিশ অধিবাসীদের রুচি অনুযায়ী পণ্য জোগান দেওয়ার নিমিত্তে নিউ মার্কেটে রূপান্তরিত হতে থাকে। আর অপর বাজারটি হল টেরিটি বাজার।[155] তবে এডমুণ্ড হুল এসব বাজারে প্রাপ্ত জিনিস নিয়ে ব্রিটিশদের অসন্তোষের কারণ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এসব বাজারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রেডি সেল এবং সেখান থেকে দ্রুত আয়। কিন্তু রেডি সেল করে আয় করতে গেলে কাস্টমসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিক্রেতার অনুপাতে ক্রেতার সংখ্যা বেশি থাকতে হয়। এসব বাজারের ক্রেতা ছিল মুষ্টিমেয় কলকাতাবাসী সাহেব-সুবোরা। ফলত জিনিসপত্রের দাম হত প্রচুর। দামের কারণে ইউরোপীয়রা এসব পণ্য কিনতেও চাইতেন না। তাই দোকানদাররা অপেক্ষাকৃত কমদামি পোশাক-আশাক ইউরোপের বাজার থেকে আমদানির দিকে ঝুঁকতেন। কিন্তু ভারতে আসার সময় এসব কমমূল্যের পণ্যকে দোকানদারের হাতে পৌঁছানোর আগে নানাপ্রকার ট্যাক্সের গণ্ডি পেরিয়ে আসতে হত। ওসব কমদামি পণ্যও তাই ভারতের বাজারে বেশ দামি হয়ে উঠত। ফলত ব্রিটিশরা বরং নিজেরা আসার সময় বা বন্ধু পরিজনকে দিয়ে স্বদেশ থেকে 'authentic' রুচির পোশাক-আশাক আনাতে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। হুলের মতে তাতে টাকাও সাশ্রয় হত।[156] আর নির্ভেজালত্বের কথা যখন এসেই পড়ল, তখন অষ্টাদশ শতকের

---

[154] Edmund Hull, 'The European in India', p. 8.

[155] বিনয় ঘোষ, 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', পৃ ১৮৫-১৮৬; জ্যোতির্ময় সেন, 'আঠারো ও উনিশ শতকে কলকাতার বাজার', (কলকাতাঃ অলকানন্দা পাবলিশার্স, জুন ২০১৪), পৃ ৩২।

[156] Edmund Hull, 'The European in India', pp. 1-3.

শেষের দিককার আরেকজন লেখিকা অ্যানা হ্যারিটের কথা বলতে হয়। তিনি লিখেছিলেন, স্বদেশের বাজারে পোশাকের বৈচিত্র ও গুনমান অনেক ভালো, সেই তুলনায় উপনিবেশের বাজারের বিলিতি রুচির পোশাক নিম্নমানের, তাতে বৈচিত্রও সীমিত।[157] অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সাংস্কৃতিক পুঁজির মৌলত্বকে এমনি জাগিয়ে দিয়েছিল যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের উত্তুঙ্গ দশায়, উপনিবেশবাসী ব্রিটনদের উপনিবেশের বাজারে পাওয়া যায়, এমন রুচির বিলিতি পণ্যে মন ভরেনি।

উপনিবেশে নিজেদের পোশাকি রুচিকে অক্ষত রাখতে গেলে যে পোশাকের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিককে আরও উন্নত করতে হয়, সেই বোধ থেকে ফ্লানেল, সুতি, কালিকো এসব তন্তুর চাইতে আরামদায়ক আর কোনো তন্তু উদ্ভাবন করা যায় কিনা – তা নিয়েও উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে গবেষণা শুরু হয়েছিল। London School of Tropical Medicine'এর Lecturer Dr. Louis W. Sambon বিশ শতকের শুরুতে লিখেছিলেন, 'The white man obviously at a disadvantage within the tropics. Bred and reared in a temperate climate, where his ancestors resided for countless generations, he is ill adapted to the changed environment, and although Nature will immediately begin to bring about such physiological changes as will enable him to conform to the new surroundings, he is, for a time at least, more vulnerable to disease.'[158] অর্থাৎ ক্রান্তীয় অঞ্চলে আবহাওয়া যেহেতু সাদা-চামড়ার জন্য উপযুক্ত নয়, সেহেতু এই আবহাওয়ায় বসবাসকারী ইংরেজদের নানা অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। Sambonও Johnson-এর মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলে সাদা চামড়ার মানুষের অসুখ-বিসুখ হওয়ার পিছনে উত্তর খুঁজেছেন ক্রান্তীয় আবহাওয়া অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সাথে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষের শারীরবৃত্তীয় গঠনের তারতম্যের মধ্যে। তাঁর ভাষায়, 'The most striking and important difference between the inhabitant of the temperate zone and the native of tropical regions is colour, the skin and their hair becoming darker the nearer we approach the Equator, where, as in certain districts of Equatorial Africa, the colour may be jet black.' ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের শরীরের বর্ণ কালো, বাদামি হওয়ার দরুন, সেই অঞ্চলের মানুষেরা ক্রান্তীয় সূর্যালোকের সাথে জুঝবার অস্ত্র প্রাকৃতিকভাবেই প্রাপ্ত। কারণ, তিনি লণ্ডনের University College এর লেকচারার Mr. Baly'র সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন, '…the skin of dark-coloured races we found evidence of strong absorption by the pigment therein. A thin layer of skin obtained and the spectrum of an electric are between iron poles was photographed after the rays had passed through the layers. We had no opportunity of examining the skin of very dark races, but even in the brown skin of natives of

---

[157] Anna Harriette Leonowens, 'Life and Travels in India', (Philadelphia: Porter & Coates, 1884), p. 24.

[158] Dr. Louis W. Sambon, 'Tropical Clothing', *The Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, February 15, 1907, p.67.

India we noticed that the rays of shorter wave-length than 3,600 are entirely absorbed, showing that the pigment exerts a strong absorptive power towards the ultra-violet rays present in sunlight, especially in tropical regions.'[159] অর্থাৎ মানব শরীরের চামড়া, চুল, চোখ রঞ্জনকারী যে মেলালিন রঞ্জক থাকে, সেই রঞ্জক সচরাচর ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের শরীরে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। সেকারণে সূর্যালোকের প্রভাব অনুসারে প্রকৃতি মানব শরীরে মেলানিনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে শীতল বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষের শরীরের বর্ণ করেছে সাদা, ক্রান্তীয় অঞ্চলে কোথাও মানুষের দেহের বর্ণ করেছে বাদামি, কোথাওবা সুতীব্র কালো। Sambon ও Balyর পরীক্ষানুসারে, ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের বর্ণ গাড় হওয়ার মূল কারণ হল, অতিরিক্ত সূর্যালোক শোষণ করে ক্রান্তীয় আবহাওয়ার সাথে শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রাকৃতিকভাবে অভিযোজিত করা। সেকারণে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গেলে, তাঁদের শরীরে মেলালিনের প্রভাব কমে গিয়ে শরীর অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে যায়, এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ ক্রান্তীয় অঞ্চলে আসলে তাদের শরীরে ট্যানের প্রভাব বাড়ে। তাই Sambon এর মতে, 'The white man who goes to the Tropics for a few years soon becomes somewhat tanned, but otherwise there is no change in the colour of his skin. In the course of generations, however, fair races transplanted to the Tropics develop more pigment and become dark-skinned; while conversely, dark races transplanted to the temperate zone become considerably lighter in colour. This tends to show that pigmentation is of protective value within Tropics…'[160] এ ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ করলে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি শরীরের গাড় রঙ সূর্যের তেজ শোষণ করবার ক্ষমতা রেখে থাকে, তাহলে ক্রান্তীয় অঞ্চলে আগত সাদা-চামড়ার ইউরোপীয়দেরকে বিভিন্ন উপদেশ-বইতে সাদা রঙের পোশাক ব্যবহারের উপদেশ কেন দেওয়া হত! এই যুক্তি মেনে নিলে, সূর্যের 'short ray' যা কিনা চামড়ার pigmentation ঘটায়, তা রোধ করবার ক্ষমতা তো কেবল কালো, লাল ও কমলা রঙের আছে। আর ক্রান্তীয় অঞ্চলে এসে সাদা-চামড়ার মানুষকে নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তো, সেই গাড় রঙের কাপড়ই পরা দরকার। কিন্তু তারা তা না করে, ভারতবর্ষীয়দের অনুকরণে গরমের হাত থেকে বাঁচতে সাদা রঙের হালকা পোশাক পরিধানের উপর জোর দিতেন। যা তাদের দেহকে তাপ থেকে আদপেই বাঁচাতে পারত না – এই মতটিকে Sambon বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করে বলেছেন, -- 'We are told that the use of white clothing for the Tropics has been adopted in imitation of native costume, and no doubt it is wise to follow the dictates of a long experience, but those who borrowed this custom overlooked the all important fact that the native is already fully protected by a natural armour of pigment which is impervious to the harmful actinic rays. Having no reason to fear the chemical rays of the sun, the native dons

---

159 Ibid, p. 68.

160 Ibid.

an ample white robe, which, by reflecting the long heat rays, keeps him comfortably cool.’ [161] আবার অন্যদিকে ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় বসবাসকারী অনেক জাতির মধ্যে শরীরের অ-ঢাকা অংশকে উত্তাপ থেকে বাঁচাতে লাল, কালো রঙ ব্যবহারের প্রবণতার কথাও তিনি বলেছেন। Sambon বলছেন, ‘Although white garments are of very general use amongst the natives of tropical countries, there is no doubt that red, yellow and brown are the predominating colours, more especially in regard to the protection of the head and abdomen. Where no garments are used, the body is frequently smeared with red paint or red oil. Amongst several brown-skinned races there occurs the habit of blackening the face to protect it from intense light. This custom is found in Morocco and along the north of Africa; it is found also in Fiji, and among the inhabitants of the Sikhim Hills.’[162] সেকারণে তিনি বলছেন, ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় সাদা চামড়ার মানুষদের শুধুমাত্র সাদা কাপড়-চোপড় পরলেই হবে না। সাদা কাপড়ের নিচে পরা অন্তর্বাসের রঙের উপর ধ্যান দিতে হবে। অবশ্যই সেই রং কালো, লাল বা কমলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সূর্যের actinic রশ্মি অর্থাৎ short wavelength বা ultraviolet উপাদানযুক্ত রশ্মি থেকে সাদা-চামড়াকে কেবল এই রংগুলিই বাঁচাতে পারে। তবে ক্রান্তীয় অঞ্চলে আগত সাদা-চামড়ার মানুষের শারীরিক আরামের জন্য বা তাদের পোশাকে রঙের বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করে Sambon একধরণের পোশাকের বুননের কথা বলেছেন। যা সূর্যের actinic রশ্মিকে প্রতিহত করে, উত্তাপকে প্রতিহত করবে। সেই বুননের ধরন সম্বন্ধে তাঁর অভিমত, ‘I endeavoured to produce a fabric composed of white and black, white and red, or white and orange threads woven in such a way as to present a warp or upper surface of white colour and a weft or under surface of black, red or orange.’ [163] বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা Sambon ও Baly’ নির্দেশিত উক্ত কাপড় বানানোর জন্য Mr. John Ellis এর ফার্ম অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। আর সেই কাপড়ে ব্যবহৃত তন্তুর নাম হয় ‘solaro fabrics’।[164]

বিজ্ঞাপনের আলোকে ঔপনিবেশিক কলিকাতায় বিলিতি রুচিবোধের স্বরূপ সন্ধান

ভারতবর্ষে নিজেদের পোশাকি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশদের আগিদকে বোঝার জন্য ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনের আলোকে তাদের দেহ, পোশাক, ক্ষমতার সম্পৃক্ততাকে বোঝার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা প্রথমে লক্ষ্য করেছিলাম,

---

[161] Ibid.

[162] Ibid.

[163] Ibid.

[164] Ibid, p. 69.

ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় এসে অনেক ব্রিটিশরা এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান জীবনচর্যার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সেই জীবনচর্যায় সাম্রাজ্যবাদী হাওয়া লাগার সাথে সাথে স্বাদেশিকতার ধুয়ো কিভাবে জাগতে শুরু করে। পরিবর্তনের মনস্তত্বকে বুঝে ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় ব্রিটিশের রুচি ও রাজনীতির স্বরূপকে নির্মাণ করতে গেলে আমাদের বিজ্ঞাপনের উপরও নির্ভর করতে হয় - যাতে আমাদের দেখার দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়ে বিষয়টির জটিলতাকে উপলব্ধি করা যায়। একটা আইনি লড়াইয়ের গল্পে ব্রিটিশের গায়ে অন্য রুচির পোশাক কিভাবে তথ্য প্রমাণের ক্‌লু হয়ে উঠছে, সে সংক্রান্ত একটি কাহিনি দিয়ে এই জটিলতায় প্রবেশ করা যাক।

১৮৩৫ সালের ১০ই জুলাই কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা ওঠে। যে মামলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মিস্টার গি নামক একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী কানপুরে মদ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসায় পসার জমিয়ে ১৮৩৩ সালে স্ত্রী মিসেস গি ও তিন সন্তানকে নিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন কারণ কলিকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী। কলিকাতায় এসে তিনি স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে তাঁর শৈশবের বন্ধু মিস্টার ডানবারের বাড়িতে ওঠেন। সেখানে মিসেস গি’র সাথে মিস্টার টারনার নামক এক ভদ্রলোকের আলাপ হয়। প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুজনের। সেসময়ই আবার সন্তানসম্ভাবা মিসেসে গি’র গর্ভস্থ সন্তান মিসক্যারেজ হয়। মিস্টার গি সন্তানটি তাঁর নয় দাবি করে কোর্টে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পর্ক রাখার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। সুপ্রিম কোর্টে মিস্টার গি’র পক্ষের আইনজীবী বলেন, তথ্যপ্রমাণ অনুসারে, মিস্টার টারনার যখনই মিস্টার গি’র অবর্তমানে মিসেস গি’র সাথে দেখা করতে আসতেন তখন তিনি ক্যান্টন নিবাসী চিনাদের সাজপোশাকে আসতেন। ইউরোপীয় বেশে নয়। আইনজীবী মিস্টার টারনারের এই বেশকে ‘ছদ্মবেশ’ বলেছেন। কারণ একজন ইউরোপীয় যদি নিজের ঘরে চিনা কোট পরে থাকেন, সেটা অসুবিধার নয়, কিন্তু তিনি যখন সেই কোট পরে পরস্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসেন, সেই দেখা করতে যাওয়ার মধ্যে নিজের জাতভাইদের চোখে ধুলো দেবার একটা প্রবণতা থাকে। ১৮৩০ সালের পোশাক আইনের মধ্য দিয়ে কোম্পানির সরকার নির্দেশ জারি করেছিলেন, কোনও ব্রিটিশ যাতে দেশীয় বা অন্য রুচির পরিচ্ছদ পরে বাইরে বাহির না হন। তবুও যারা এই আইন অমান্য করে পর রুচি অনুসরণ করে বাইরে বের হবেন, তাদেরকে রাষ্ট্র হয় শাসতন্ত্রের প্রতি অসম্মানকারী নতুবা অপরাধপ্রবণ হিসেবে দাগিয়ে দেবেন তাতে সন্দেহ নেই। সেকারণেই পরকীয়ার অভিযোগের সাথে ক্যান্টননিবাসী চিনাদের পোশাক পরে বাইরে বেরুনোর মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে আইনজীবী অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করছেন।[165] আসলে আইন বিচার প্রদানের জন্য যেকোনো বিষয়ের একটা উপরি ধারণা তৈরি করে বহু সূক্ষ্ম বিষয়ের অপরীকরণ ঘটায়—এই সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে নামার পূর্বে মামলাটির অবতারণা দরকার ছিল।

---

[165] ‘Alexander’s East India and Colonial Magazine’, conducted by a Socirty of Gentlemen from India, London, R. Alexander, 940, Strand, pp.73-77.

বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যখন দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন ভৌগোলিকতার, ভিন্ন রুচির গোষ্ঠী পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তখন তাঁদের মধ্যে আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটা সূক্ষ্ম আদান-প্রদান ঘটে। সে আদান-প্রদানগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সচেতনভাবে হয় না। তাই ওই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়বার সাথে সাথে আইন প্রয়োগ করে নিজেদের রুচির বিশুদ্ধতা বজায় রাখা একটা ক্ষমতা দেখানোর প্রকল্প মাত্র। যদি তা না'ই হত ইউরোপের বাজারে প্রাচ্যের পোশাকের চাহিদা তৈরি হত না। সালোনি মাথুর দেখিয়েছেন, কিভাবে ইংল্যান্ডের বাজারে Arther Lasenby Liberty প্রাচ্যের কিছু কিছু ফ্যাশনকে আইকনিক বা অননুকরনীয় হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। ফলত উনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে কাশ্মীরি শাল, ভারতের হরেক রকমের সিল্ক লিবার্টির ডিপার্টমেন্ট স্টোরে প্রদর্শিত হতে শুরু করে। ১৮৮৫ সালের শীতকালে লিবার্টির 'Living Village Artisan' শীর্ষক প্রদর্শনীতে কাশ্মীর থেকে বিয়াল্লিশ জন গ্রাম্য কুঠির শিল্পীকে ইংল্যান্ডের বাটারসি পার্কের অ্যালবার্ট প্যালেসে প্রদর্শনীর উপকরণ বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যা স্থানীয় অভিজাতদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি করে। যদিও এই বিষয়টি ইংল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী মহলে যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল।[166] এই বিষয়টি এখানে তুলে ধরবার পিছনে আমার মূল উদ্দেশ্যই হল, কাশ্মীরি শালের মতো উপমাহাদেশের সুরম্য কাপড় কিভাবে উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকেই ব্রিটেনের অভিজাত শ্রেণির কাছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর হাত ধরে আভিজাত্য প্রদর্শনের একটা উপকরণে পরিণত হয়েছিল—সেই বিষয়টিকে আলোকিত করা। অন্যদিকে সমুদ্রবাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপকূলভাগে ষষ্ঠদশ শতকে পর্তুগীজদের প্রাধাণ্যবিস্তার ঘটার পর তাঁরাও এদেশের শিল্পসত্তার সাথে নিজস্ব শিল্পসত্তার জারণ-বিজারণ করে শিল্প-স্থাপত্য, চিত্রকলা এমনকি বস্ত্রের উপর নন্দনকলায় একটা সমন্বয়ের নজির সৃষ্টি করেছিলেন। বারবারা কার্ল দেখিয়েছেন ষষ্ঠদশ শতকে পর্তুগীজরা যখন বাংলা ও গুজরাটের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচল, তখন থেকেই এই দুই অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পে 'কল্কা' ডিজাইনের সূত্রপাত হয়। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ শব্দ 'colcha' ও 'colja'র মূল লুকিয়ে আছে লাতিন শব্দ 'colcita'তে, যার অর্থ করলে দাঁড়ায় বালিশ বা গালিচা। Vocabularia Portugueze e Latino' তে সম্পাদক Rapjael Bluteau দেখিয়েছেন, কল্কা হল সুতির বেড কভার, যার উপর নানাহ শিকারের দৃশ্য অঙ্কিত থাকে। কিন্তু বারবারা কার্ল নতুন বিশ্ব আবিষ্কারোত্তর সময়ে এই শব্দটার ব্যাপকতার সন্ধান পেয়েছেন গালিচা, পরিধেয় থেকে স্থাপত্যচিত্র সর্বত্র। তিনি পূর্ব বঙ্গের সাতগাঁও কুইল্ট এবং হুগলী অঞ্চলের বেশ কিছু কুইল্ট সংস্কৃতির উদাহরণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, সপ্তদশ শতকেও যখন পূর্ব বঙ্গে ইসলামায়ন প্রক্রিয়া চলছিল, তখন সেখানাকার শিল্পমাধ্যমে ইসলামী প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু পূর্ব বঙ্গের বস্ত্রশিল্পকে পর্তুগীজরা বাণিজ্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করায় তসর, সিল্ক এবং সুতি বস্ত্রের উপর কল্কার প্রচলন হয়। সেই কল্কাতে বাংলার শিল্পশৈলী, ইসলামী

---

[166] Saloni Mathur, 'India by Design: Colonial History and Cultural Display', (Delhi: Orient Blackswan, 2011), p.21.

শিল্পশৈলী, রোমান মিথলজি, খ্রীস্টীয় প্রতিকীবাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সপ্তদশ শতকে হুগলী অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পেও কিভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পুরাণকথা ও রাজকীয় কাহিনির সম্মিলন ঘটেছিল, সেটাও কার্ল চিত্র সহকারে তাঁর গ্রন্থে বুঝিয়েছেন।[167] সুতরাং বোঝাই যায়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে দুটি ভিন্নপ্রকৃতির গোষ্ঠী যদি পারস্পরিক সংস্পর্শে আসে, তাদের পরস্পরের মধ্যে রুচিবোধের আণুবীক্ষণিক আদান-প্রদানের সেতু রচিত হতে বাধ্য। এই আদান-প্রদানের মধ্যে একটা অহমিকাহীন স্বতঃস্ফূর্তটা কাজ করে। কিন্তু বাণিজ্যিক শক্তি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঔপনিবেশিক সমাজের মনে অহংবোধ সক্রিয় হতে শুরু করে।

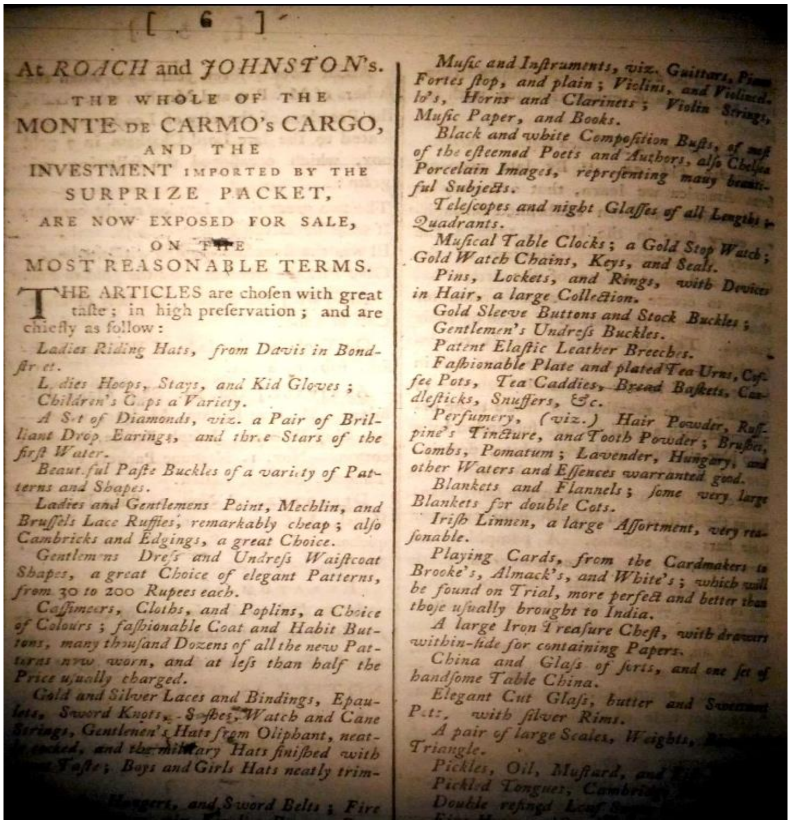

[6]

At ROACH and JOHNSTON's.
THE WHOLE OF THE
MONTE DE CARMO's CARGO,
AND THE
INVESTMENT IMPORTED BY THE
SURPRIZE PACKET,
ARE NOW EXPOSED FOR SALE,
ON THE
MOST REASONABLE TERMS.

THE ARTICLES are chosen with great taste; in high preservation; and are chiefly as follow:

Ladies Riding Hats, from Davis in Bond-street.

Ladies Hoops, Stays, and Kid Gloves; Children's Caps a Variety.

A Set of Diamonds, viz. a Pair of Brilliant Drop Earings, and three Stars of the first Water.

Beautiful Paste Buckles of a variety of Patterns and Shapes.

Ladies and Gentlemens Point, Mechlin, and Brussels Lace Ruffles, remarkably cheap; also Cambricks and Edgings, a great Choice.

Gentlemens Dress and Undress Waistcoat Shapes, a great Choice of elegant Patterns, from 30 to 200 Rupees each.

Cassimeers, Cloths, and Poplins, a Choice of Colours; fashionable Coat and Habit Buttons, many thousand Dozens of all the new Patterns now worn, and at less than half the Price usually charged.

Gold and Silver Laces and Bindings, Epaulets, Sword Knots, Sashes, Watch and Cane Strings, Gentlemen's Hats from Oliphant, neatly cocked, and the military Hats finished with ... Taste; Boys and Girls Hats neatly trim- ...

... Hangers, and Sword Belts; Fire ...

Music and Instruments, viz. Guittars, Piano Fortes stop, and plain; Violins, and Violincello's, Horns and Clarinets; Violin Strings, Music Paper, and Books.

Black and white Composition Busts, of most of the esteemed Poets and Authors, also Chelsea Porcelain Images, representing many beautiful Subjects.

Telescopes and night Glasses of all Lengths; Quadrants.

Musical Table Clocks; a Gold Stop Watch; Gold Watch Chains, Keys, and Seals.

Pins, Lockets, and Rings, with Devices in Hair, a large Collection.

Gold Sleeve Buttons and Stock Buckles; Gentlemen's Undress Buckles.

Patent Elastic Leather Breeches.

Fashionable Plate and plated Tea Urns, Coffee Pots, Tea Caddies, Bread Baskets, Candlesticks, Snuffers, &c.

Perfumery, (viz.) Hair Powder, Ruspine's Tincture, and Tooth Powder; Brushes, Combs, Pomatum; Lavender, Hungary, and other Waters and Essences warranted good.

Blankets and Flannels; some very large Blankets for double Cots.

Irish Linnen, a large Assortment, very reasonable.

Playing Cards, from the Cardmakers to Brooke's, Almack's, and White's; which will be found on Trial, more perfect and better than those usually brought to India.

A large Iron Treasure Chest, with drawers within-side for containing Papers.

China and Glass of sorts, and one set of handsome Table China.

Elegant Cut Glass, butter and Sweetmeat Pots, with silver Rims.

A pair of large Scales, Weights, ... Triangle.

Pickles, Oil, Mustard, and ...

Pickled Tongues, Cambri...

Double refined Loaf ...

চিত্র ৩.১২: মন্তে দে কারমো'স কার্গো তে করে আসা পণ্যাদির বিজ্ঞাপন। বস্ত্র, হোসিয়ারি, খেলার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে কি নেই সেখানে। সবচেয়ে উল্লেখ্য হল, প্রত্যেকটি পণ্যের মধ্যে ইউরোপীয় রুচির প্রকট ছাপ বজায় আছে।
(সূত্র: Calcutta Gazette, Vol.II, No.46, Thursday, January 13, 1785, National Library of India, Kolkata।

১৭৮০ সাল থেকে ১৮৩০ এর দশকের বিজ্ঞাপনের দিকে নজর দিলে বিষয়টি একটু পরিষ্কার হতে পারে। এসময়কার বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একটার পর একটা কার্গো বিভিন্ন

---

[167] Barbara Karl, 'Embroidered Histories: Indian Textiles for the Portuguese Market during 16th to 17th Centuries', (WiesingerstraBc: Bohlau Verlag Wien Koln Weimar, 2016), pp.12-13, pp.80-88

রুচির পণ্যসম্ভার নিয়ে কলিকাতা বন্দরে এসে থামছে মাস পনেরোর জন্য। জাহাজগুলির নাবিকরা তাঁদের জাহাজের পণ্যসম্ভারের দিকে উপনিবেশবাসী ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশদের আকৃষ্ট করবার জন্য কলিকাতার বিভিন্ন সাহেবি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এমনও দেখা গেছে কলিকাতা থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য জাহাজ ভাড়া জোগার করতে অনেক সাহেব এদেশে তাঁদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র অকশন হাউসগুলোকে তুলে দিতেন, এবং অকশন হাউসগুলি সেই দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করবার জন্য সাহেবি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিত। ১৭৮৪ সালের ৪ মার্চ ক্যালকাটা গ্যাজেটের একটা বিজ্ঞাপনে ভারতবর্ষ ছেড়ে স্বদেশে ফিরতে আগ্রহী একজন সাহেব এদেশে ব্যবহৃত সুদৃশ্য মেহগনি চেয়ার, আয়েশী ডাইনিং টেবিল, চেয়ার পালকি, ক্রান্তীয় আবহাওয়ার উপযোগী দরিয়া কাপড়, লোছা কাপড়, মদের মধ্যে জামাইকা রাম, কনিয়াক ব্র্যান্ডি, ম্যাদেরিয়া ওয়াইন ইত্যাদি সাহেবি জীবনশৈলীর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পণ্য কলিকাতার Messers Williams & Lee’s Auction Room’এ নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করবার কথা জানানো হচ্ছে।[168] এসব দ্রব্যসামগ্রী দেখে ধারণা করা যায়, এদেশে ব্রিটিশদের জীবনাচরণের ধরণ এবং তার স্বাতন্ত্র্য। একই বছরে Mr. Duncan’s Commission Warehouse বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছে, তাদের নিলামগৃহে বিভিন্ন সেনাদুর্গের আসবাবপত্র, রৌপ্য বাসন, ইউরোপীয় শৈলীর কাপড়চোপড়, ইউরোপীয় চিনজের সূক্ষ্ম কাপড়, ইউরোপীয় সিল্ক, ক্যাম্‌ব্রিক্স বা চিকন সুতোর কাপড়, সুতির পাতলা গজ কাপড়, জর্জেট কাপড়, ফ্যান্সি রিবন কাপড়, ইউরোপীয় বুট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। সাথে পাওয়া যাবে, জামাইকা রাম, উন্নত স্বাদযুক্ত ক্ল্যারেট নামক রেড ওয়াইন, মাউন্টেইন ওয়াইন, বার্গান্ডি ওয়াইন, রেনিস ওয়াইন, চেরি ব্র্যান্ডি ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, যারা জাহাজ করে ইউরোপে ফিরছেন, তাঁরা যাত্রাপথের আলস্য ও সংগ্রহে রাখবার জন্য এই লিকারগুলো কিনে নিয়ে যেতে পারেন।[169] ১৮৩০-এর ড্রেস কোড চালুর পর ১৮৩৭ সালে ‘The Englishman’ বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছে, ট্যাঙ্ক স্কয়ারে ‘superior London goods’, ‘prime London goods’ পাওয়া যাচ্ছে। এবং যারা এই পণ্যের পসরা সাজিয়েছেন, তারা ‘a party of long experienced’. অর্থাৎ শুধু বিলাতি পণ্য হলেই হবে না, তাকে ভারত নিবাসী ব্রিটনদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা চাই। কারণ বিলিতি পণ্যের নামে অনেক ভেজাল পণ্যের আনাগোনাও বেড়েছিল, যেখানে নির্ভেজাল স্বাদেশিকতা হয়ে উঠেছিল প্রধাণ লক্ষ্যবস্তু। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে – ‘An extensive assortment of fashionable Haberdashery [পুরুষের পারিচ্ছদিক উপকরণ] and Millimary [মেয়েদের পোশাকি উপকরণ], from one of the houses at the West end – i) An immense variety of Mordan & Co’s fancy goods; Rowland & Son’s genuine perfumery..., ii) Youth’s fashionable horse hair caps, iii) Silk and velvet bands, iv)

---

168 Calcutta Gazette or Oriental Advertiser, Vol.I, No.I, Tuesday, 4th March 1784.

169 Calcutta Gazette or Oriental Advertiser, Vol.I, No.II, Tuesday, 11th March 1784.

Joyce's celebrated copper caps and patent waddings, now preferred by sportsmen in England.'[170] অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের ফ্যাশনের হাওয়ার সাথে উপনিবেশবাসী ইংরেজদের সামঞ্জস্য বিধানের একটা তাগিদ এদেশে বিলিতি পণ্যের বাজারে কাজ করেছে।

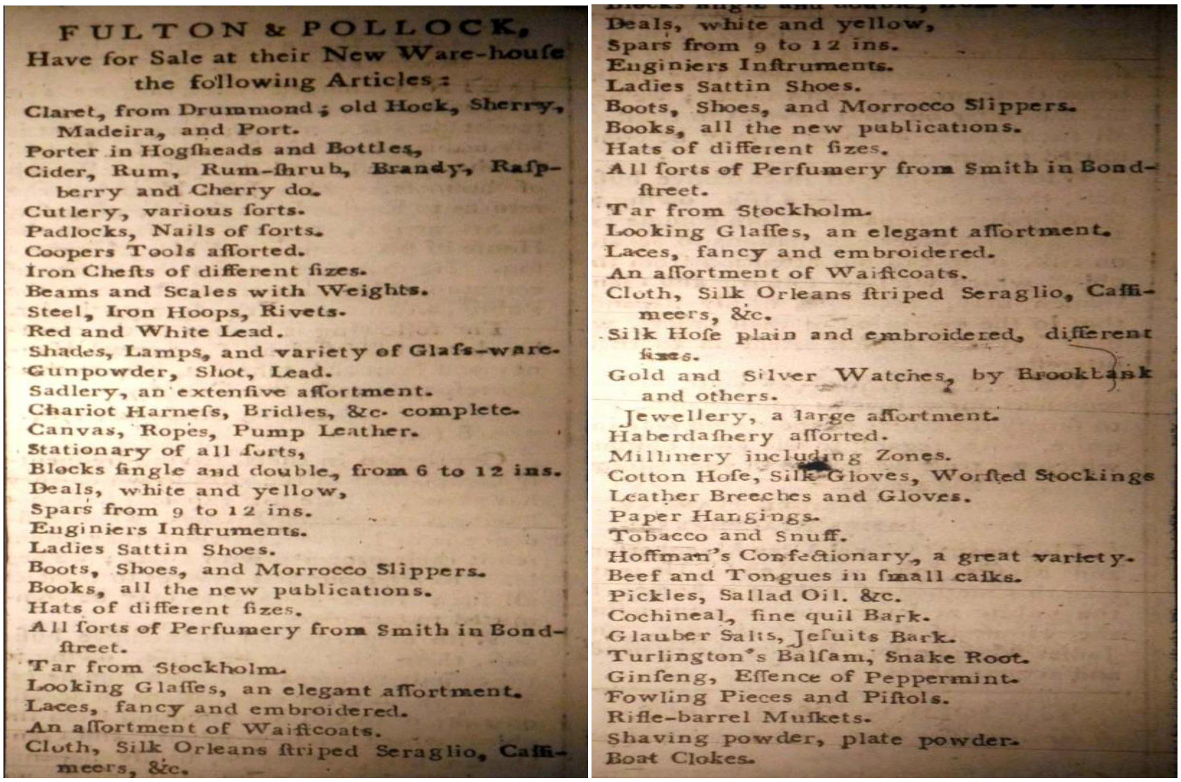
FULTON & POLLOCK,
Have for Sale at their New Ware-houfe
the following Articles :
Claret, from Drummond ; old Hock, Sherry, Madeira, and Port.
Porter in Hogfheads and Bottles,
Cider, Rum, Rum-fhrub, Brandy, Rafpberry and Cherry do.
Cutlery, various forts.
Padlocks, Nails of forts.
Coopers Tools afforted.
Iron Chefts of different fizes.
Beams and Scales with Weights.
Steel, Iron Hoops, Rivets.
Red and White Lead.
Shades, Lamps, and variety of Glafs-ware.
Gunpowder, Shot, Lead.
Sadlery, an extenfive affortment.
Chariot Harnefs, Bridles, &c. complete.
Canvas, Ropes, Pump Leather.
Stationary of all forts,
Blocks fingle and double, from 6 to 12 ins.
Deals, white and yellow,
Spars from 9 to 12 ins.
Enginiers Inftruments.
Ladies Sattin Shoes.
Boots, Shoes, and Morrocco Slippers.
Books, all the new publications.
Hats of different fizes.
All forts of Perfumery from Smith in Bond-ftreet.
Tar from Stockholm.
Looking Glaffes, an elegant affortment.
Laces, fancy and embroidered.
An affortment of Waiftcoats.
Cloth, Silk Orleans ftriped Seraglio, Caffimeers, &c.
Deals, white and yellow,
Spars from 9 to 12 ins.
Enginiers Inftruments.
Ladies Sattin Shoes.
Boots, Shoes, and Morrocco Slippers.
Books, all the new publications.
Hats of different fizes.
All forts of Perfumery from Smith in Bond-ftreet.
Tar from Stockholm.
Looking Glaffes, an elegant affortment.
Laces, fancy and embroidered.
An affortment of Waiftcoats.
Cloth, Silk Orleans ftriped Seraglio, Caffimeers, &c.
Silk Hofe plain and embroidered, different fizes.
Gold and Silver Watches, by Brookbank and others.
Jewellery, a large affortment.
Haberdafhery afforted.
Millinery including Zones.
Cotton Hofe, Silk Gloves, Worfted Stockings
Leather Breeches and Gloves.
Paper Hangings.
Tobacco and Snuff.
Hoffman's Confectionary, a great variety.
Beef and Tongues in fmall calks.
Pickles, Sallad Oil. &c.
Cochineal, fine quil Bark.
Glauber Salts, Jefuits Bark.
Turlington's Balfam, Snake Root.
Ginfeng, Effence of Peppermint.
Fowling Pieces and Piftols.
Rifle-barrel Mufkets.
Shaving powder, plate powder.
Boat Clokes.

চিত্র ৩.১৩: ফুল্টন অ্যান্ড পোলক পণ্যাগারের পক্ষ থেকে দেওয়া বিজ্ঞাপনেও ইউরোপীয় রুচির পণ্যাদির আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে (Calcutta Gazette, Vol.II, No.37, Thursday, November 11,1784)

১৭৮৪ সালের আরেকটি বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে Crown Princess, J. Clements এবং Commander নামক জাহাজের কার্গো মদ, চিজ, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্রাদি, ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় পরবার জন্য উপযুক্ত দামী ফ্লেমিশ লিনেন, ঢোলা ও ফিটিংস মিহি উলের পোশাক, স্টকিং, হ্যাট, বিভিন্ন আকারের জার্মান চশমা, জুতো ইত্যাদি ইউরোপীয় রুচির পণ্যাদি নিয়ে কলিকাতা বন্দরে এসে থামছে।[171] স্বদেশ থেকে বহু দূরে ইউরোপীয়দের দেশীয় খাবারের স্বাদ দেওয়ার জন্য বা যেসব ইউরোপীয়রা বিদেশবিভুইতেও খানাপিনায় দেশীয় রুচি বজায় রাখতে চান তাঁদের চাহিদার বাজার তৈরির জন্য ১৭৮৪ সালে কলিকাতার কাশিটোলা বাজারে Harmonie এর প্রাক্তন রাঁধুনি J.

---

[170] The Englishman and Military Chronicle, Calcutta, 4th May 1837.

[171] Calcutta Gazette, vol.I, 29th April 1784.

Trenholm একটি ঘর ভাড়া নিয়ে রেস্তরাঁ খুলেছিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি কলিকাতা নিবাসী সাহেবদের জানাচ্ছেন, তাঁর রসুইতে তাঁরা খাঁটি ইউরোপীয় ঘরানার খাবার- দাবার পাবেন। বিজ্ঞাপনে প্রাপ্তি তালিকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে সেখানে কুকিজ থেকে শুরু করে ' beef, mutton, duck, geese, pigeons, collared beef, veal, small pigs, fish coreach, mince meat, plum cakes, marmalads, butter eggs, mold punch' কি নেই! এমনকি বিজ্ঞাপনে এমনও লেখা হয়েছে, যেসব ইউরোপীয়রা স্বদেশে যাওয়ার জন্য মাসের পর মাস জাহাজে থাকবেন, তাঁদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে খাবারও এই রেস্তরাঁ তৈরি করে, যে খাবারগুলো অনেকদিন থাকলেও নষ্ট হবে না। এই বিজ্ঞাপনের শেষে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, যেসব ইউরোপীয়রা দূরদেশে এসেও 'Turtle dreff(ss)ed' বা আঁটসাঁট পোশাকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তাঁদের অবশ্যই J. Trenholm'এর রান্নাঘরে আসা উচিত।[172] ১৭৮৫ সালের আরেকটি বিজ্ঞাপন থেকেও দেখা যায়, উপনিবেশে আসা ইউরোপীয়দের স্বাদেশিক রুচির ক্ষুধা নিবারণের জন্য কার্গোতে করে কিরকম পণ্য ইউরোপ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। সেই পণ্যসম্ভারে নানা ক্যাবিনেট ওয়্যার অর্থাৎ মেহগনি নির্মিত হাত কেদারা, ডাইনিং টেবিল, ঘোড়ার লেজ দিয়ে নির্মিত আরাম কেদারা, ড্রয়ার দেওয়া মেহগনি সেক্রেটারি, বই রাখার সেলভ, মেহগনি নির্মিত ওয়াইন কুলার যেমন ছিল, তেমনি সাহেবদের জন্য অদ্‌ভুত ফ্যাশনের ব্রাউন বিভার হ্যাট, রাইডিং হ্যাট, ইংরেজ বালকদের জন্য ব্রাউন বিভার হ্যাট, নানাধরনের সিল্ক ও ইলাস্টিক বেল্ট, মেমসাহেবদের জন্য তখনকার চলতি ফ্যাশনের সাথে সংগতিপূর্ণ রাইডিং হ্যাট, উটপাখির পালক দেওয়া ফ্যাশনের প্লাম্বড হ্যাট এর হরেক ডিজাইনের কথা বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল। তাছাড়া মেমসাহেবদের চুল সুগন্ধি রাখবার জন্য হেয়ার পাউডার, শরীর সুবাসিত রাখতে ল্যাভেন্ডারের জল, বার্গেমতে লেবু এবং পিপারমিন্টের নির্যাস দেওয়া সুগন্ধি, ম্যাঞ্চেস্টার ভ্যালভেটের ওয়েস্টকোট, ভালো মানের কটন স্টকিং, মেমসাহেবদের জন্য ফুলের নকশাযুক্ত ভালো মানের চিনা সিল্ক স্টকিং, এম্‌ব্রইডারি নকশা করা সিল্ক শ্যু, প্যালিন শ্যু, স্লিপার, বাচ্চাদের জন্য মরক্কো পাম্প শ্যু, সাহেবদের জন্য ড্রেফস বা ড্রেস শ্যু, স্ট্রং শ্যু, তুরস্কের গ্রিন লেদারের বর্ডার দেওয়া হুসার টপ (সম্ভবত মিলিটারি ইউনিফর্মে ব্যবহৃত কোনও পারিচ্ছদিক উপকরণ) ইত্যাদি উপকরণের কথা বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়। কলিকাতার পোস্ট অফিস স্ট্রিটের মিস্টার জেমস স্কট নামক ভদ্রলোক Bernstroff নামক জাহাজে আসা এই সামগ্রীগুলো বিক্রির ভার নিয়ে জাহাজ কোম্পানিটির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।[173] তেমনি ১৮৩৭ সালে কাশীটোলা লেনের Guest & Co. 'superior quality' ও 'adapted for Indian wear' বিলিতি কাশ্মীরি প্যাটেন্টের আর্মি ও মিলিটারি স্টাইলের ফ্রক কোট, ড্রেস কোট, জ্যাকেট, ট্রাউজারস, ওয়েস্টকোটের বিজ্ঞাপন দিয়ে লিখেছে, 'জলের দরে এসব পোশাক পাওয়া যাচ্ছে' ('unprecedented low charges of cash')। অর্থাৎ অ্যানা হ্যারিট যে

[172] Calcutta Gazette, vol.I, May 13, 1784.

[173] Calcutta Gazette, Vol.III, No.70, June 30,1785

অভিযোগ করেছিলেন, - ভারতের বাজারে পাওয়া বিলিতি পণ্যের কোনো বৈচিত্র্য নেই – ক্রেতাদের এই অভিযোগকে সামাল দেওয়ার তাগিদও বিলিতি রুচির বাজারে সচল ছিল।

কাজের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে এসে ব্রিটিশদের পোশাকি রুচি যাতে বিশুদ্ধতা না হারায় বা স্বদেশে ফিরে যাবার সময় যাতে সেই ইউরোপীয়রা যাতে ইউরোপিয়ানা নিয়ে ফিরতে পারেন – এই উভয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন কলিকাতার The Old Fancy Shop নামক দোকানের মালিক মিস্টার পোর্টার। তাঁর দেওয়া বিজ্ঞাপনে লেখা হচ্ছে, দেশে ফেরার সময় যারা নিজেদের ফ্যাশনকে নিয়ে ফিরতে চান, তাঁরা তাঁর দোকানে 'expeditious and neatest manner'এর লিনেন কাপড়ের তৈরি ওসেস্ট কোট, ট্রাউজার, গলাবন্ধ, স্টকিং ইত্যাদির অর্ডার দিতে পারেন। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় বাস করে দরিয়া কাপড় বা সুতির কাপড় পরতে বাধ্য সাহেবদের স্বদেশীয় ফ্যাশনে দেশে ফিরে যাবার আকুতিটাকে উপলব্ধি করে, তিনি যে এহেন উদ্যোগ নিয়েছিলেন রা বোঝই যায়।[174] সুয়েজ খালপথ খুলে যাবার আগে ইউরোপ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ার কারণে, ভারতে নিজেদের সাহেবিয়ানাকে বহাল রাখতে ইংরেজরা ভারতবর্ষের কাছাকাছি সেটেলম্যান্ট গুলো থেকেও পণ্যসামগ্রী আনতেন। পোস্ট অফিস স্ট্রিটের মিস্টার স্কটকে আমরা ন্যান্সি গ্র্যাব নামক জাহাজের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, সেই জাহাজে করে নিয়ে আসা পণ্য সমূহকে নিজের নিলামঘরে বিক্রি করবার সিদ্ধান্তের দিকেও লক্ষ্য করতে পারি। সেই পণ্যসম্ভারে সিল্ক ও সাটিনের নানাহ বস্ত্র যেমন ছিল, তেমনি গরমের দেশে পরবার জন্য বাদামি ও সাদা কাপড়ের আরামদায়ক পাতলুন, সাহেব-ম্যামদের জন্য নানা ডিজাইনের শ্যু, স্লিপার, সূক্ষ্ম তন্তুর স্টকিং থেকে শুরু করে বিফ স্টেকের ডিস, তুরিন ও কারি ডিস, ডেসার্টের প্লেট, স্যুপ প্লেট, ফিস ও কারি ডিস, হট ওয়াটার প্লেট ইত্যাদি কি না ছিল![175] এদেশে সাহেবিয়ানা চরিতার্থ করবার ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা এদেশীয় উপকরণকেও উপেক্ষা করেননি। কলিকাতার উইলিয়ম লি'র অকশন হাউস ১৭৮৭ সালে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিল, ১১ ও ১২ই জানুয়ারি তারিখে সেখানে 'Vin de Grave', 'English Claret', 'Cherry brandy', 'Rasberry brandy' এবং ফরাসি লিকার 'Ratasia'র সাথে সাথে কাশ্মীরি ডিজাইনের কাপড় পাওয়া যাবে। সাথে আইরিশ লিনেনের হোস, স্টকিং জাতীয় পোশাকও পাওয়া যাবে।[176]

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাম্রাজ্যবাদের উত্তুঙ্গ অবস্থায় ব্রিটিশের রাজনৈতিক দেহ সংরক্ষণের জন্য বিলিতি পণ্যের তালিকা আরও প্রসারিত হয়েছিল। কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের Henry & A. Bernes এর নানা পণ্যের চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ ফেরালে তা বোঝা

[174] Calcutta Gazette, Vol.IV, No.92, December, 1785

[175] Calcutta Gazette, Vol.VI, No.148, December 28, 1786

[176] Calcutta Gazette, Vol.VI,No.150, Thursday, January 11, 1787.

যাবে। সেই পণ্য তালিকাটা দেখে নেওয়া যাক – বাচ্চাদের জন্য নতুন ডিজাইনের পোশাক, শরতের খামখেয়ালি বৃষ্টিপাতে পরার জন্য Cahmios leather এর পোশাক; Elastic Web এর বুট এবং শু্য; কার্পেট, লেদার এবং ক্যুরিয়ার ব্যাগ; পার্স, সিগার কেস, পকেট বই; কপি বুক, ল্যাডার, র‍্যাপিং পেপার; সেলাই করবার জন্য সিল্ক ও কটন সুতো; পাকানো দড়ি (Twine), বড় ব্যাগ (Portmanteaus), বাচ্চাদের খেলার বই; কাঁচের বাটি, সুরাপাত্র, কাঁচের শোভাবর্ধক জিনিসপত্র; কাঁচ এবং চিনেমাটির গয়নাগাটি; কালির বোতল (inkstand), রুলার, দৈর্ঘ্য পরিমাপক ফিতা; তাস, নানাহ উপন্যাস, অ্যালবাম; সুগন্ধি, সাবান, প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধপত্র; ফ্যান্সি জিনিসপত্র, কাগজের মণ্ডের তৈরি জিনিসপত্র (Papier Mache Goods); ছেলেদের অঙ্গসজ্জার পোশাক-আশাক, হোসিয়ারি অর্থাৎ মোজা-গেঞ্জি-আণ্ডারওয়্যার, ভেলভেট রিবন; লিনেন ড্রিল ফেব্রিক, সল, প্রিন্টেন কাশ্মীরি কাপড়; মিহি ও নরম ফেব্রিকের মধ্যে লন, মসলিন, মেরিনো এবং কেম্‌ব্রিক; ছাতা, সান শেডস, হালকা ছাতা (parasol); মিরসউন জাতীয় শ্বেত-মৃত্তিকা, কাট এবং মাটি নির্মিত ধুমপানের পাইপ ও টোব্যাকো পাউচ; সবধরণের ছুরি-কাঁটা চামচ; কেরোসিন ল্যাম্প, ঝাড়বাতি; খেলনার সেট; হারমোনিয়াম, মিউজিক বক্স, কন্সারটিনা; ব্যারোমিটার, মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ, অপেরা এবং সবধরণের অপ্টিক্যাল জিনিসপত্র; ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান ঘড়ি; সবধরণের ইংলিশ ও জেনেভা হাতঘড়ি; ক্ল্যারেট, ব্র্যাণ্ডি এবং মজেলে।[177] উপনিবেশে বিলিতি গার্হস্থ্যে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো শেলায়ের যাবতীয় উপকরণে স্বাদেশিক রুচি ও বাজারের উপর নির্ভরতার চিত্রটা এখান থেকে বোঝা যায়। ১৮৬৩ সালে ক্রান্তীয় উপনিবেশে বসবাসকারী 'লেডি'দের জন্য বিলিতি রুচির অনুপুঙ্খ পোশাকের পসরার দিকে তাকালেও এই সত্যটিই উপলব্ধি হয়। যেমন – টুল্লে, সিল্ক, ব্লন্ড, টার্টান ইত্যাদি তন্তুর বল ড্রেস; সিল্ক ও গ্র্যানাডাইন ফেব্রিকের জমকালো ইভনিং ড্রেস; ওর্গাণ্ডে মসলিনের নানান ডিজাইনের পোশাক; খুব হালকা রঙের মর্নিং ড্রেস; সাদা, কালো ও রঙবাহারি গ্লেস সিল্ক; সাদা-কালো লেস বসানো শাল; এম্‌ব্রয়ডারি করা ফরাসি কেম্‌ব্রিকের রুমাল; "ভিক্টোরিয়া" ও 'এম্প্রেস" ফ্যাশনের পেটিকোট; সাদা, কালো, বাদামি এবং ডিজাইন করা হেয়ার নেট প্রভৃতি।

উপরের প্রত্যেকটি ভোগ্যপণ্যের উদাহরণ থেকে এটা বোঝা যায় ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে এসে ব্রিটিশরা নিজেদেরকে স্বাদেশিক রুচির পরম্পরা থেকে আলাদা করতে চাননি। হয়ত কোনো কোনো সময় তাঁদেরকে চিনে উৎপন্ন, চিনা ডিজাইনের পোশাক ও হোসিয়ারি সামগ্রী ব্যবহার করতে হয়েছে বা এদেশীয় দরিয়া কাপড়, লোচা কাপড় পড়তে হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও সেইসব সামগ্রীকে নিজেদের রুচির উপযোগী করে ব্যবহার করবার প্রবণতাটাই তাঁদের মধ্যে সবচাইতে বেশি সক্রিয় ছিল। কিন্তু উপনিবেশের যে শিল্প দৃষ্টি সুখকর সেই শিল্পকে নিজেদের জীবনচর্যার সাথে যুক্ত করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেননি। সালোনি মাথুর দেখিয়েছিলেন উনবিংশ

---

177 The Indian Daily News, October 15 1868.

শতকের শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডে লিবার্টির ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের প্রদর্শনীতে কাশ্মীরি শালকে কিভাবে সম্ভ্রমের সাথে তুলে ধরা হচ্ছে। সুচিত্রা চৌধুরী বিলিতি সাহিত্যে এসব শালের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে উপনিবেশিকদের মাটিতে উপনিবেশের কাপড়ের সামাজিক নির্মাণকে তুলে ধরেছেন। ক্যালকাটা গ্যাজেটের প্রচুর বিজ্ঞাপন থেকেও দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে কাশ্মীরি ডিজাইন কিভাবে উপনিবেশবাসী ইংরেজদের রুচির পরিসরের সাথে যুক্ত হতে শুরু করছে। সুতরাং উপনিবেশিক শাসন ক্ষমতার প্রতীকায়নের জন্য একটা ইউনিফর্ম বেঁধে দিলেও উপনিবেশবাসী ইংরেজদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে কিন্তু ইংরেজিয়ানার সাথে যে উপনিবেশের পারিচ্ছদিকতার সচেতন বা অবচেতন মিশ্রণ কমবেশি ঘটেছিল, তাকে অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহার

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যখন এল দোরাদো'র খোঁজে নতুন বিশ্ব আবিষ্কারের নেশায় মেতেছিল এবং তাতে সাফল্য অর্জন করেছিল, সেই সাফল্যের ক্ষমতায় রূপান্তরিত হতে বেশিদিন সময় লাগেনি। নব আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলোতে ক্ষমতার ছড়ি ঘোরাতে যে যুক্তিটা সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় ছিল তাঁদের কাছে সেটা হল—তাঁরা আসলে শাসনের নামে শোষণ করছেন না, তাঁরা অসভ্যদের সভ্য করে তোলার মতো মহৎ কাজে নিজেদের সামিল করছেন মাত্র। অন্যকে 'অসভ্য' প্রতিপাদিত করা বা নিজেদের সভ্য হিসেবে তুলে ধরবার দাবিটা প্রাথমিকভাবে প্রতীকী পর্যায়ে আটকে থাকে। বলা ভালো দেহকে কেন্দ্র করে যে পোশাকি সংস্কৃতির পরিমণ্ডল, সেই পরিমণ্ডলে আটকে থাকে। সেকারণে জন্সন যখন এদেশে এসে অর্ধ উলঙ্গ মাঝিকে মানুষের আদিম বংশধরের সাথে তুলনা করেন, সেখানে ক্রান্তীয় অঞ্চলের আবহাওয়াকে, এখানকার মানুষের সভ্য হওয়ার পথে অন্তরায় বলে তুলে ধরবার একটা প্রবণতা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। সেদিক থেকে ইউরোপীয়রা যে সভ্য হয়ে উঠতে পেরেছেন, তার পিছনে তাঁদের অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুকে সাধুবাদ দেওয়া হয়। আর এই তথাকথিত ভৌগোলিক অগ্রগামিতা তাঁদের অভ্যাসকে যেভাবে গঠন করেছে, সেই গঠনের প্রতি অবিচার হোক -- এটা আইন প্রণয়ন করে বিলিতি পোশাক আবশ্যিক করবার আগে থেকেই বেশিরভাগ উপনিবেশবসী ব্রিটিশরাই চাননি। তাঁদের এই চাওয়ার পশ্চাতে নিজেদের স্বাজাত্যবোধের চেতনা কেমনভাবে কাজ করেছিল, তা আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি। এহেন সচেতনতা শুধুমাত্র ব্রিটিশের ভারতীয় উপনিবেশেই নয়, আরো বিভিন্ন উপনিবেশে একই রকমভাবেই দেখা গিয়েছিল। উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশে এই সচেতনতা এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে, উত্তর আমেরিকা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরও সেখানকার সাদা চামড়ার অভিবাসীদের মধ্যে তা জিইয়ে ছিল। Friend's Intelligencer & Journal-এ ১৮৮৫ সালে লেখা হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডকোটা অঞ্চলের কথা। সেখানকার বিভিন্ন তাঁবুর বাসিন্দা আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা তাঁদের স্থানীয় পোশাক পরে থাকতেন। সেকারণে সেখানকার সাদাচামড়ার মানুষেরা তাঁদের 'বন্য' ও 'অসভ্য'

বলে হেয় করতেন। নব্যশিক্ষিত ইন্ডিয়ানরা আবার সেই তকমাগুলোকে লজ্জার চোখে দেখতেন। প্রতিবেদকটির মুখেই শোনা যাক সেই অভিব্যক্তি—তিনি একদা তাঁর ডকোটাবাসী এক কাকাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কাকা, তুমি কেন সাদা চামড়ার মানুষের মতো পোশাক পরো না?' উত্তরে কাকা বলেন, 'আমার যদি থাকতো, আমি পরতাম'। প্রতিবেদকের কাকার বক্তব্য হল, সাদা চামড়ার মানুষের পোশাক পরবার জন্য টাকা লাগে, শিক্ষা লাগে—সেগুলো না থাকলে ওই পোশাক পরে সাদা চামড়ার মানুষের সামনে দাঁড়ানো যায় না। তাই অনেক ইন্ডিয়ানরা 'অসভ্য' তকমা ঘোচাতে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েও শিক্ষা ও টাকাকড়ির অভাবে 'খ্রীস্টানদের মতো' পোশাক পরতে পারতেন না। তথাকথিত 'অসভ্য' পোশাক পরেই থাকতেন এবং সাদা চামড়ার মানুষের কাছে 'বন্য' ও 'অসভ্য' হয়েই থেকে যেতেন।[178] সুতরাং 'সভ্যতা' এবং 'অসভ্যতা'র মাপকাঠি নির্ধারণে ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন স্বঘোষিত সভ্যরাই নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষ বা আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ শাসন করতে আসা সাদা-চামড়ার 'সভ্য'রা কালো, বাদামি চামড়ার তথাকথিত 'অশিক্ষিত', 'অনালোকিত' ও 'অসভ্য'দের পোশাক ও আচার-আচরণের দ্বারা যদি প্রভাবিত হয়, তাহলে তা যে তাদের সভ্যতার পক্ষে লজ্জাস্পদ — সেটা বলবার অপেক্ষা রাখে না। পোশাকি সভ্যতার এই ভাবটি পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ভারতের মতো উপনিবেশে নবোত্থিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর, যখন দেখা গেল বাঙালি পুরুষের মধ্যে বিলিতি সজ্জার প্রতি বিশেষ ঝোঁক, তখন অনেকেই বলেছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হলেও সাংস্কৃতিক অধীনতা প্রকট হতে শুরু করেছে। এবং সেই সাংস্কৃতিক অধীনতাকে সমালোচনা করে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'আপাদমস্তক বিলিতী পোশাকে আবৃত হয়ে যারা গটগট করে চলে, হটহট করে কথা বলে, চলাফেরায় প্রতি পদে 'স্মার্টনেস'এর চেকনাই বিচ্ছুরিত করে ... তাদের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক না থাকুক কিছু আসে যায় না, শুধু নির্বোধের চক্ষু সম্মোহনকর পোশাকের দৌলতে তারা সমাজ জীবনের উপর ছড়ি ঘুড়িয়ে চলছে। ... আমরা এমনতর বেশবাস অতি স্বাভাবিক ধরে নিয়েছি; অথচ এই বস্তু আমাদের কারুরই বোধ হয় চোখে পড়েনি যে, গত দেড়শ বছরের ইংরেজ-শাসনে ইংরেজ আমাদের সমাজে আমাদের জল-হাওয়ার পরিবেশে আমাদেরই মধ্যে বাস করতে বাধ্য হলেও একদিনের জন্যও আমাদের দিশী পোশাকে আবৃত হবার তাগিদ বা প্রয়োজন বোধ করে নি। এমন কি অভিনবত্বের ক্ষুধা, বৈচিত্র্যের স্পৃহা মেটাবার তাগিদেও তারা ও পথে অগ্রসর হয় নি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, কিন্তু যারা ওই ব্যতিক্রমের কারক তারা আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, আমাদের সমাজকে নিজ সমাজ বলে মনে করে নিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ ইংরেজ কোন অবস্থাতেই স্বীয় জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগের কথা কল্পনা করতে পারে নি – ভারতবর্ষের ন্যায় প্রবল গ্রীষ্মপ্রধাণ দেশের পচা

---

[178] 'Friend's Intelligencer & Friend's Journal', Vol. XLII, Vol. XIII, (Philadelphia: Friend's Intelligencer pvt. Ltd., 921 Aech Street,1885), p.445

গরমেও দুই প্রস্থ অন্তর্বাস পরে তার উপর কোট চাপিয়েছে, টাই বেঁধেছে, মোজা পরেছে, সময়ে সময়ে দস্তানাও হস্তগত করেছে।’[179]

[179] শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ‘বর্তমান বাঙালীর জীবনযাত্রা’, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ ২০।

শরীর, পোশাক, এবং রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরে পুরুষ ও তার সামাজিক পরিসরের পোশাকি নির্মিতি

ভূমিকা

দুটি ভিন্ন সমাজের স্বতন্ত্র প্রবাহমান সময়ের আন্তঃক্রিয়ায় নতুন সময়ের জন্ম হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক উন্নয়নের সামগ্রিকতায় তথাকথিত একটা 'উন্নত' সংস্কৃতি যখন সে সংস্কৃতির সাপেক্ষে 'পিছিয়ে থাকা' অপর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে সহাবস্থান করতে শুরু করে, তখন দুটি সংস্কৃতির প্রবাহমানতায় একটা কিনারা তৈরি হয়। হোমি ভব, মার্টিন হেইডিগারকে উদ্‌ধৃত করে দেখিয়েছেন, সেই কিনারা থেকেই দুটি সমাজ বা সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়া শুরু হয়। সেখানে দাঁড়িয়েই সমাজ দুইটির পুরাতন বুননের উপর নতুন পরিসর ক্রিড়া করতে শুরু করে। অর্থাৎ কোনো সমাজের বুকে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা পাওয়া মানে সেই সমাজ-স্থিত সংস্কৃতির পতন ঘটে যাওয়া—তেমনটা কিন্তু নয়। বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদের শিকার উভয় গোষ্ঠীকেই সাম্রাজ্যবাদ নামক প্রকল্পের তলে পরিবর্তিত হতে হয়। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে কিরকম পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি। এবার আমাদের দেখতে হবে সাম্রাজ্যবাদের শিকার এদেশীয় সমাজ কিরূপ পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মোঘল আদব-কায়দার বা মোঘল সংস্কৃতির ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল, তেমনটা বলা যাবে না। বরং উপনিবেশিকতার বিকাশের প্রথম দিকে দেশীয় পরিসরের সাথে বিদেশাগতদের পরিসরের আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এদেশীয় সংস্কৃতির পরিসর আরও বিস্তৃত হতে শুরু করে। হোমি ভব বলেছেন, এই আন্তঃক্রিয়া ব্যক্তিকে বিদেশি আদব-কায়দা বা আনুষঙ্গিক সংস্কৃতির সাথে সমন্বয়ের দিকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে বা উভয় দিকে চালনা করতে পারে। আর এইভাবেই কোনো সমাজে ঐতিহাসিক রূপান্তরের জন্ম হয়।[1] বাংলাদেশে তুর্কি আগমন এবং ইংরেজ আগমন উভয়ের মধ্য দিয়েই এদেশীয় সামাজিকতার সাথে বিদেশি সংস্কৃতির সংশ্লেষ ঘটেছিল। ক্ষমতার পোশাকি ভিত্তিকে তৈরি করার জন্য যা যা করণীয় - তা উভয় সংস্কৃতির শাসককূলই করেছিলেন। হয়ত মোঘলী দরবারি সংস্কৃতির পোশাকি ক্ষমতার ধরণ এবং বিলিতি দরবারি সংস্কৃতির পোশাকি ক্ষমতা বিস্তারের ধরণ আলাদা ছিল।[2] সেকারণে দুটি ভিন্ন সময়ে বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্রও ছিল আলাদা।

---

[1] Homi Bhabha, 'The Location of Culture', (London: Routeledge, 1994), p.1-5

[2] ১৭৮১ সালে একজন *Old Country Captain* কলিকাতার ইন্ডিয়া গেজেটে লিখেছিলেন যে—তিনি ১৭৬৩ সাল থেকে ভারতে বাস করছেন। প্রথম দিকের ভারতবাসকালকে তিনি এদেশের গরম আবহাওয়ায় ইংরেজদের স্বদেশীয়

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি - শুরু থেকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে শাসনযন্ত্র স্থাপন ছিল না, বরং উপনিবেশ বিস্তারের সাথে তাদের বানিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের যোগটাই শুরুর দিকে বেশি নিবিড় ছিল। সেই কারণে পোশাকে-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায় তারা ক্রান্তীয় আবহাওয়ার উপযোগী জীবনচর্যাকে প্রথমদিকে গ্রহণ করেছিলেন। এই জীবনচর্যায় স্বদেশের সাথে নিজেদের পোশাকি একত্ব রক্ষার রুচিগত তাগিদ তখনও ততটা অনুভূত হয়নি। আর যখন থেকে সেই তাগিদ অনুভূত হতে শুরু করে, তখন থেকেই কোম্পানি প্রশাসন এদেশীয়দের সাথে নিজেদের শাসকসুলভ দূরত্ব রচনা করতে থাকে। মধ্যযুগীয় শাসনের সাথে কোম্পানির শাসনব্যবস্থার এই বিষয়ে পার্থক্য নিরূপণ করে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছিলেন –

> ভারতবর্ষ উনিশ শতকে যে-সংস্কৃতিকে পেল, তা হল বাইরের জিনিষ এবং তা বস্তুত ভারতীয় জীবন ও মননের সাথে কোন রকমেই সম্পর্কিত নয় এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শহুরেদের বাইরে গোটা দেশের অন্তর্লোককে তা স্পর্শও করল না। ফলে সর্বতোভাবে নূতন একটা জীবন-চেতনায় মূর্ত হল না তা। ... এর তুলনায় আমাদের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে যে সমন্বয়মূলক নবজাগৃতির একটি আন্দোলন হয়েছিল, তাকে অনেকের কাছে বেশী নিকটের মনে হবে। অবশ্য আমাদের ধর্ম সমাজ সাহিত্য শিল্পকলা ও জীবনচর্যার বহিরঙ্গকে প্রভাবিত করলেও সত্তার অন্দরকে তাও বিশেষ ছুঁতে পারেনি এবং তা পারেনি বলেই রক্ষণশীলতার যে অনড় আবরণের মধ্যে হিন্দু মানসিকতা হাজার বছর ধরে পাক

ফ্যাশনের চাইতে স্বাচ্ছন্দ্যকেই বেশি গুরুত্ব দিতে দেখেছেন। সেই কারণে তাদের ভারতবর্ষের মাটিতে একসময় বেনিয়ান সার্ট, ঢিলে পাজামা, কোঞ্জি টুপি পরে থাকতেও অসুবিধা ছিল না। এমনকি তাঁরা মুঘলী দরবারি ঢঙ্গেও পোশাক পড়তেন। মসলিনের ঢোলা জামা পরে, 'হিন্দুস্তানী বান্ধবী'তে মন মজিয়ে আলবোলায় তামাক খেতেও প্রথমদিকে তাদের কোনো অনিহা ছিল না। আগের অধ্যায়েই আমরা দেখার চেষ্টা করেছি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোম্পানির কাজে যে ইংরেজরা এদেশে আসতেন, তাদের মূল বাসনা ছিল অর্থ আয় করে স্বদেশে ফিরে যাওয়া। সুয়েজ খালপথ আবিষ্কারের আগে স্বদেশে ফিরে স্বগোত্রীয় মহিলার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বা ফেলে আসা বউ-বাচ্চাদের সাথে মিলিত হওয়াই ছিল মূল বাসনা। দুর্ভাগ্যবশত রোগে ভুগে এদেশেই মারা গিয়েছেন এমন উদাহরণও খুঁজলে প্রচুর পাওয়া যাবে। আবার এমন উদাহরণও প্রচুর আছে - এদেশীয় মুসলমান বা পতিতা হিন্দু কন্যাকে 'বিশেষ বান্ধবী' তথা রক্ষিতা হিসেবে রেখে জৈবিক চাহিদা মিটিয়েছেন সাদা চামড়ার পুরুষরা। কিন্তু তাঁদের বিয়ে করেননি। তবে ভাবখানা এমন যেন তাঁদেরকে 'রক্ষিতা' বানিয়ে এদেশীয় সমাজের 'অব্যবস্থা' থেকে তাঁদের রক্ষা করে নিজেদের শিভালরির পরিচয় দিচ্ছেন। ইউরোপীয় ভারতবিষয়ক অনেক ভ্রমণ গ্রন্থ প্রাচ্যের নারীদের হারেম বন্দী ও সতীদাহের বলি হিসেবে অঙ্কিত করেছিল। কিন্তু সেই মেয়েদের উদ্ধার করে সাদা-চামড়ার পুরুষরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতলেও, সেই বন্ধুত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেননি। দিলেও তা খুবই নগন্য। কারণ বাদামী চামড়ার মেয়ে বিয়ে করলে যে নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আঘাত করা হয়। গবেষনায় এমনও উঠে এসেছে, স্বদেশে গিয়ে ভারতবর্ষে কোম্পানির অধীনে নিজেদের পদাধিকার বিষয়ে মিথ্যের বাতাবরণ তৈরি করে অনেক সাদা-চামড়ার পুরুষ স্বগোত্রীয় মহিলাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে প্রতারণাও করেছেন। দ্রষ্টব্য Sumanta Banerjee, 'Under the Raj: Prostitution in Colonial Bengal', (New York: Monthly Review Press, 1998), p. 37-38; Katie Hickman, 'Courtesans: Money, Sex and Fame in Nineteenth Century', (London: William Morrow, 2003); Katie Hickman, 'She-Merchants, Buccaneers & Gentlewomen', (London: Vergo, 2020); Ipshita Nath, 'Memsahibs: British Women in Colonial India' (London: C. Hurst & Co. Publishers, 2022); শ্রীপান্থ, 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক', পৃ. ১৯৯।

খাচ্ছে, মুসলিম মানসিকতা সাতশো আটশো বছর, তা ভেঙে-চুরে একটা একাত্মিক জীবন ও রাষ্ট্রবোধ গড়ে ওঠেনি। তবু স্বীকার করতেই হবে যে জিনিষটা উঠেছিল এই মাটি থেকেই এবং তার বৈজিক উত্তরাধিকার আমরা সবাই অল্পাধিক পেয়েছি।'[3]

নীহাররঞ্জন রায় এবং রিচার্ড ইটনের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বলতে হয় - মধ্যযুগীয় সামাজিকতার বৈজিক উত্তরাধিকার নিয়েই এদেশীয় সমাজ 'আধুনিকতায়' প্রবেশ করেছিল।[4] অনেকে বলেন, অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় শাসনতন্ত্র, অর্থনীতির উপর আক্রমণ এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন তা বৃহত্তর সামাজিক মননে এমন কোনো দাগ কাটতে পারেনি, যার উপর ভিত্তি করে দেশীয় সমাজ ওই সময় দাঁড়িয়েই এই নবাগত কোম্পানিকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে মুসলমান শাসনের শেষের লগ্নে এদেশীয় হিন্দু-মননে সেই শাসন নিয়ে যে একটা আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছিল সেই বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে। হয়ত সেই আতঙ্ক থেকে এদেশীয় হিন্দুদের উদ্ধারকারী হিসেবে ইংরেজদেরকেই কল্পনা করা শুরু হয়েছিল![5] তার উপর, ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনেক কর্তাব্যক্তিরাই তখন নিজেদের শরীরে এই সময়ে দেশীয় মোগলই পোশাক ধারণ করতে শুরু করেন। সাহেবদের যখন এইরকমভাবে দেশীয় পোশাক ধারণ করে দেশীয়দের সামনে বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে বা সাহেব দেশীয় পোশাক পরছেন ও দেশীয় আদব-কায়দা মেনে চলছেন—এই গল্পগুলো যখন দেশীয় সমাজের সবস্তরে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন সাহেবকে আক্রমণকারী বলে চিন্তা করে—এ সাধ্যি কার! হোমি ভব বলেছেন, যেকোনো সমাজে ঐতিহাসিক রূপান্তরের জন্ম হয়, সেই সমাজের সংখ্যালঘুর সাথে সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদান ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশারা ভারত ভূখণ্ডে যখন আসেন তখন তাঁরা একটা সংখ্যালঘু বাণিজ্যিক গোষ্ঠী। কিন্তু রেনেসাঁলব্ধ আলোকপ্রাপ্ত চিন্তার গুণে এবং টাকা বা পুঁজি ব্যবস্থার ধারক হবার দরুণ তাঁরা অন্য কাঠামোর একটা সমাজকে বাঁকে আনবার সামর্থ্য রাখতেন।[6] তাই একসময় যে সমাজে ধনমানের অধিকারী হতে পারতেন কেবল উচ্চবংশজাতরা, ব্রিটিশের হাত ধরে বানিজ্যিক পুঁজির আগমনের ফলে, সমাজচ্যুত একঘরে কিছু হিন্দু পরিবারও

---

[3] নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 'সংস্কৃতির ধর্ম: ধর্ম ও সংস্কৃতি', (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি,১৯৬৪), পৃ ১০৪-১০৫।

[4] নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব', (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৯), পৃ ৪৮১-৫৬৫; Richard M. Eaton, 'Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760', (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press), pp.270-274

[5] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ', (কলিকাতা: ইউনাইটেড পাবলিশার্স, তৃতীয় পাকাশ, জানুয়ারী, ২০০৫), পৃ ১১, ৯৬।

[6] বিনয় ঘোষ, 'মেট্রোপলিটন: মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ', (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ষষ্ঠ মূদ্রণ ২০১৬)

ধনে-মানে উপরে উঠতে থাকে।[7] কারণ তাঁরা ব্রিটিশের লাভজনক ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছে। যে সমাজ তাঁদের একসময় জাতের নামে একরাশ অপমান ও নৈরাশ্য দিয়েছিল—সেই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার চাইতে যে লাভের প্রতি দায়বদ্ধতা বেশি হবে, সেটাই স্বাভাবিক। দুর্গাচরণ রায় ইংরেজ আগমনের দরুণ এদেশীয় জাতব্যবস্থাতে ধ্বস নেমে, এদেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কিভাবে উল্টে যাচ্ছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, 'তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চাকরি করিতেছে এবং সমবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমারকে প্রণাম না করিয়া পাঞ্জা কসিয়া গুড মর্নিং বলিতেছে। এক হুঁকায় ছত্রিশ জাতিতে তামাক খাইতেছে। ...'[8] নতুন সময়ের অভিঘাতে নতুন দায়বদ্ধতায় চালিত হয়ে কলিকাতার আদি দেশীয় বাসিন্দারা কিভাবে রাতারাতি নিজেদের পদবি পাল্টে জাতে ওঠার খেলায় মেতেছিলেন, সেই গল্প আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলিতেও আলোচনা করেছি। সপ্তদশ শতকে বানিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সাথে ব্রিটিশের পারস্পরিক লেনদেন বাড়বার সাথে সাথে এই প্রবণতার প্রকট হতে শুরু করা। আর এর ফলে মধ্যযুগীয় বৈজিক উত্তরাধিকারের সাথে ব্রিটিশরা উপমহাদেশের যেসব অঞ্চলকে নিজেদের বানিজ্যিক সম্প্রসারণের কেন্দ্র করেছিলেন, সেইসব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিসর মিলিত হয়ে পাঁচ মিশালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে শুরু করে।

নতুন ব্যবস্থাপনার উপর এরূপ আস্থার কারনেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার একটা বৃহত্তর পুঁজিপতিদের জমিভিত্তিক শ্রেণিতে পরিণত করতে পেরেছিল। তা নগর কলিকাতার ব্ল্যাক টাউন অংশে এমন একটা শ্রেণি তৈরি করে, যে শ্রেণির সভ্যরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের জমিদারির করের টাকায় রাজকীয় জীবনযাপনের সময় কাটাতেন। বাবুয়ানি প্রদর্শন করতেন। যদিও 'বাবু' শব্দটি একটি পারসী শব্দ। যার অর্থ—সুগন্ধযুক্ত। মুঘল আমলের দরবারী সংস্কৃতির সাথে এর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল।[9] কিন্তু ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া

---

[7] চিত্রা দেব, 'ঠাকুর বাড়ির বাহির মহল', (কলকাতা: আনন্দ, তৃতীয় মূদ্রণ, ২০১৬)

[8] দুর্গাচরণ রায়, 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন', (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ৭৮৯।

[9] তন্তুবায় সমাচার'এ লেখা হচ্ছে - 'মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ অঃ) শেঠ বসাক সমাজ মধ্যে তিন ব্যক্তি যৌথ কারবার করিয়া বিশেষ যশঃলাভ করেন। অলদ ঋষি গোত্রজ শিবদাস পশ্চিমাঞ্চলে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) একজন সম্ভ্রান্ত মহাজন ছিলেন...তিনি মোগল রাজপরিবারে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন।...বাংলায় সুবর্ণ গ্রামে মৌদগল্য গোত্রজ এক শ্রেষ্ঠী বংশ বাস করিতেন।...তাঁহার বংশে বিখ্যাত বৈষ্ণব দাস শেঠ জন্মগ্রহণ করে।...অগ্নি ঋষি গোত্রজ কেশবরাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশিমবাজারে বাস করিতেন।...শ্রেষ্ঠীপ্রবর কেশবরাম বাঙ্গালা হইতে নব নব প্রকার উৎকৃষ্ট মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রাদি মোগল রাজদরবারের জন্য প্রয়াগে শিবদাসকে সরবরাহ করিতেন। উক্ত তিন ব্যক্তি মোগল রাজদরবারে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং অনেক খিলাত ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের বস্ত্রাদি এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইত যে তাহা দেখিয়া সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া ঐ তিন ব্যক্তিকে "বাবু" মান্যের সহিত অভিহিত করিয়া খিলাদ ও সনন্দ দেন। বাবু পারসী শব্দ, অর্থ সুগন্ধযুক্ত।' দ্রষ্টব্য, শ্রীসতীশ চন্দ্র ভড় সম্পাদিত 'তন্তুবায় সমাচার', কার্ত্তিক, ১৩৩৮, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ৬৩-৬৪

কোম্পানির মত জয়েন্ট স্টক কোম্পানি চালিত 'ক্যাশ ফীলস' এর আবর্তে ঘুরে নতুন শ্রেণি মধ্যযুগীয় অনাস্বাদিত বাবুয়ানির নতুন ধারক হয়ে ওঠে। আর সাম্রাজ্যের বিকাশমানতার সাথে সাথে সেই শব্দটি, শাসকের দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে অন্য দ্যোতনায় ধরা দিতে শুরু করে। শব্দটির সাথে জুড়ে যায় তাচ্ছিল্য। নেটিভ পুরুষকারের খাটো মানদণ্ডের নির্ণায়ক হয়ে ওঠে এই বাবুয়ানি।[10] পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, উপনিবেশিক শাসকের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে বহাল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাবু'র কিছু সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন। অবশ্যই সেই সংজ্ঞাগুলো উনবিংশ শতকে বাবুয়ানির নির্মিতির উপর নির্ভর করে। সেই সংজ্ঞাতে কি বলা হচ্ছে দেখা যাক –

> যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুরগাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষু, বিষ্ণুর তুল্য লীলাপটু, তিনিই বাবু। ... বিষ্ণুর ন্যায় ইহাদিগেরও দশ অবতার – যথা, কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা।[11]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যায় বাবুচরিত্রের একটা দিক খুবই প্রকট। সেই দিকটিতে বাবুচরিত্র অন্তঃসারশূন্য দেখনদারির ঘনঘটাতে আচ্ছন্ন হতে পছন্দ করে। আর সেই আচ্ছন্নতার প্রশ্নে পাশ্চাত্য শিক্ষিত চাকুরিজীবী বাবু বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিভিত্তিক বাবুর মধ্যে তিনি কোনো সীমারেখা টানেননি। কিন্তু আমাদের আলোচনার গভীরতার স্বার্থে আমাদেরকে সেই বিষয়ে তলিয়ে দেখতে হবে।

বাবুয়ানির চালচিত্র: উনবিংশ শতকের আলোকে

---

[10] 'In Bengal and elsewhere, among Anglo-Indians, it is often used with a slight savour of disparagement, as characterizing a superficially cultivated, but too often effeminate, Bengal.' দ্রষ্টব্য, Henry Yule and A.C Burnell, 'Hobson-Jobson: The Definitive Ghossary of British India', (Oxford: Oxford University Press, 2013),p.72

[11] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বাবু", যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত 'বঙ্কিম রচনাবলী', (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ঊনবিংশতি মূদ্রণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ), পৃ ১০

… "বাবু" জীব নানাবর্ণের হয়; মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃত বর্ণ (শ্বেতবর্ণ) তাহাদের মধ্যে আদৌ লক্ষিত হয় না।– সে সকল জীবের কতক কতক পালটবর্ণ, কতক কতক পীতবর্ণ (যে বর্ণকে ভারতীয় বর্ণ বিচারকেরা গৌর বর্ণ বলিয়া থাকেন।), কতক কতক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কতক কতক লোহিতাভ। এই সকল জানোয়ারের মধ্যে একবর্ণ অথবা একরূপ মুখশ্রীবিশিষ্ট একজোড়া জীব কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না—ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। এইকারণে তাহাদিগকে কখন কখন বহুরূপী জানোয়ার বলা যায়। রাজনীতিজ্ঞ ব্রান্সন সাহেব বিশেষ দক্ষতার সহিত বাক্ পটুতা দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই জাতির বর্ণভেদ নিবন্ধন জাতীয় ঐক্যের অভাব, তন্নিবন্ধনই ইহারা কদাচ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। এই জাতির আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহারা অত্যন্ত তৈলভক্ত। এই তৈলভক্তি দেখিয়াই, সদ্বিবেচক সদ্বক্তা মিস্টার ব্রান্ সন সকৌতুকে আখ্যা দিয়াছেন, "তৈলরঞ্জিত বাঙ্গালী বাবু"। [12]

উপরে উল্লিখিত নাম-না-জানা লেখকটির লেখনীর কিছু অংশ (মানবজাতির প্রকৃত বর্ণ, তাঁর মতে শ্বেতবর্ণ) দেখে মনে হতে পারে, তিনি সাদা-চামড়ার ইউরোপীয়দেরকে প্রকৃতির উৎকৃষ্ট জীব মনে করেন। কিন্তু বাবু-জীবনের পরার্থপরায়ণতাকে বোঝাতে তাঁর যে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ তা পুরো গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে। তাই তাঁর মতে, সাদা চামড়ার উৎকৃষ্টতার কথাকে মাথায় রেখে, তাঁদের তাঁবেদারী করে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বাংলা অঞ্চলে উত্থিত শ্রেণিই হল, 'বাবু'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন, বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিকাশের আগেই, পাশ্চাত্য জীবনাচরণের বাহ্য বস্তুগত দিকগুলো এদেশীয়দের আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছিল। পাশ্চাত্য বাজারের 'ফ্যান্সি ফেয়ারে' নিজেদের রুচিবোধকে বিকিয়ে দিয়ে প্রভাতকুমারের ভাষা 'বহুরূপী বা ক্যামেলিয়ন' সেজেছিলেন অনেকেই।[13] এই ফ্যান্সি ফেয়ারের সমালোচনাও উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু হয়েছিল। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ থেকে 'কল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'এ শিব কার্ত্তিকের বিষয়ে যা বলছেন, তা সমকালীন পিতাদের বাবুয়ানিতে হাতপাকানো পুত্রদের প্রতি শ্লেষ যেন। -- 'কার্ত্তিকেটা তো ঘোর ইয়ার হয়ে উঠেছে, রাত দিন কেবল আয়না ব্রুস নিয়েই আছে; আর ল্যাবেণ্ডার ওডিকলম প্রভৃতি কি ছাই ভস্ম গুলো মাথায় লেপছে। ব্যাটা কালাপেড়ে সিমলার ধুতি না হলে পরেন না এবং পাঁচ টাকা দামের চীনেম্যানের বাড়ীর জুত না হলে পায়ে দেন না। আমি পয়সা বাঁচিয়ে বাঘছালে লজ্জা নিবারণ ক'রে বেড়াই – বেটা আমার সিল্কের পাঞ্জাবী

---

[12] লেখক অনুল্লিখিত, 'কাল-মহিমা-রহস্যঃ বাবু কী?' (কলিকাতা: স্মৃতিসাধন সারস্বত মন্দির, ১৩১২ বঙ্গাব্দ), পৃ ৩

[13] তাঁর ভাষায়, 'শিক্ষার আগে এল ফ্যাশন। জুতোয়, জামায়, ম্যানচেস্টারের রেলি-ব্রাদার্সের ধুতিতে শাড়িতে, নূতন কালের চুল ছাঁটায়, কথায়-বার্তায় ঢঙে-ধারায়-ধরনে সে এক ফ্যান্সি ফেয়ার এসে বসে গেল দেশের মধ্যে।' দ্রষ্টব্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা', ১ম খণ্ড (কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস, বৈশাখ ১৩৬৭), পৃ ৩৭।

পোরে তেড়ী কেটে বাবু হয়ে বেড়ান।'[14] বঙ্কিমচন্দ্রও বিংশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বা তারও কয়েক দশক আগে থেকে বিকশিত হতে থাকা সেই বাবুর মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তার বহুরূপী সামাজিক ধরণ-গড়ন। হুতোমের ভাষায়, মুসলমানের সাথে কারবারে তিনি মুসলমানের মতন, আর ইংরেজের সাথে কারবারে ইংরেজের মতন হবার চেষ্টা করেন।[15] সাথে আছে, তার তৈলানুরক্তি, [16] তীক্ষ্ণবুদ্ধি, [17] এবং প্রখর অনুকরণশক্তি।

বিনয় ঘোষ কলিকাতার নগরজীবনে বাবুয়ানির বিকাশের কারণ হিসেবে একদল 'নতুন বাঙালী বড়লোক' এর উত্থানকে দেখিয়েছেন। অবশ্যই সেই বড়লোক শ্রেণির উত্থানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জড়িত—'কলকাতা যখন অষ্টাদশ শতক থেকে ধীরে ধীরে মহানগরের রূপ ধারণ করতে থাকল, এবং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুনাফা-শিকারের প্রধান লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠল, তখন এদেশের লোকের কাছেও অর্থ রোজগারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হয়ে উঠল নতুন মহানগর।'[18] অবশ্য এই নবোত্থিত বড়লোকদের

---

[14] দ্রষ্টব্য দুর্গাচরণ রায়, 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন', (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ১১।

[15] নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত হুতোম প্যাঁচার নকশা, ১ম ও ২য় ভাগ', (কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ ১৮।

[16] ১৮২১ সালে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় বাবুর উপাখ্যান বলে দুই কিস্তিতে একটা লেখা প্রকাশ পায়, সেখানে বলা হয়েছিল, বাপের আফিম কুঠির সাদা-কালো উপার্জনের টাকার মুখাপেক্ষী, বাস্তবিক অশিক্ষিত অথচ উমেদারবর্গের স্তব-স্তুতিতে শিক্ষিতের তকমাপ্রাপ্ত বাবু যখন চাকরি করবার মনস্থির করেও তাঁর অ-শিক্ষার গুণে কোথাও চাকরি পান না, তখন "উম্যেদওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম উত্তম কর্ম্ম দিবেন।" কারণ তা না হলে, চারিদিক উমেদার বেষ্টিত হয়ে আজন্ম তৈলমর্দিত হয়ে আসার অভ্যাসটির গোড়ায় যে জল পড়ে না! দ্রষ্টব্য "বাবুর উপাখ্যান", সমাচার দর্পণ, ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ৯ জুন, ১৮২১; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১৮১৮-১৮৩০, ১ম খণ্ড', (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ষষ্ঠ মূদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯), পৃ ১০৮-১১৪।

১৯০২ সালে এই উমেদার বা মোসাহেবদের নিয়ে একটা ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেটা এরকম— 'সেজেগুজে থাক বটে সাজা তব সাজা!/ দেখিয়া তোমার দুঃখ হাড় ভাজা ভাজা।/ গাড়ির সম্মুখে বস, ফির পাছে পাছে,/ অভাগা তোমার মত জগতে কে আছে?/ বাবুর হাসিতে হাস, কাঁদ হে কাঁদিলে,/ তুষ্ট, বাবু তুষ্ট যাহে, রাগ হে রাগিলে। ...' দ্রষ্টব্য 'নব্যবঙ্গ', ১ মার্চ, নবম বর্ষ, ১৯০২, পৃ ২৩৪

[17] তিনি বলছেন, ... 'আপনি যদি ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত হন, তাহা হইলে বুঝিবেন, ইংরাজী "বেবুন" শব্দ হইতে "এন্" বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া "বেবু" অর্থাৎ বাংলা "বাবু" শব্দের প্রচলন হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে একজন প্রসিদ্ধ কবি ঐ বাক্যের পোষকতা করিয়া গাহিয়াছেন, "তোমাদের বেবুনেরা চীনরাজ্যের নিকটবর্তী কোন প্রদেশের তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এক স্বতন্ত্র জাতিবিশেষ।" ' দ্রষ্টব্য, লেখক অনুল্লিখিত, 'কাল-মহিমা-রহস্যঃ বাবু কী?' পৃ ২

[18] বিনয় ঘোষ, 'টাউন-কলিকাতার কড়চা' দ্রষ্টব্য।

উত্থানের মধ্য দিয়ে নবাবি আমলের বিত্তশালী শ্রেণির পতন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেছেন, 'নবাবী আমল শীতকালের সুর্য্যের মতো অস্ত গ্যাল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগল।[[19]] নবো মুন্সি, ছিড়ে বেনে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।... কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো...।'[20] অষ্টাদশ শতকের শেষে বা ঊনবিংশ শতকের শুরুতে কঞ্চিতে জন্মানো বংশলোচনেরা পশ্চিমদেশের আধুনিকতার একটা মেকি আস্বাদনে নিজেদের নিয়োজিত করে সভ্যতার পরাকাষ্টা জাহিরে রত থাকতেন। নাম-না-জানা লেখকের ভাষায়,

> বাঙালী বাবুর অনুকরণশক্তি অতি তেজস্বিনী। এই শক্তির প্রভাবে সভ্যজাতির রীতিনীতি, আচার-বিচার, আহার-ব্যবহারাদির অনুকরণে তাহারা বিলক্ষণ পটু। কোট, ওয়েস্টকোট, ওভারকোট, নেকটাই ও মস্তকে হ্যাট শোভিত বাঙ্গালী বাবুদের স্থূল ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণমূর্তি দর্শনে সর্বদাই আমাদের হাসি পায়, বক্র বদনে মৃদু মৃদু না হাসিয়া থাকিতে পারি না। সভ্যলোকের কণ্ঠস্বর, বাবনধ্বনি ও উচ্চারানাদীর ভাবভঙ্গির ঠিক ঠিক অনুকরণে তাহাদের আশ্চর্য্য নৈপুন্য।...অপরাপর সভ্যজাতির সাথে এই জানোয়ারের আরো প্রভেদ – তাহাদের ভীরুতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা।...বহুক্রোশ দূরে কামানের গর্জ্জন ও বন্দুকের আওয়াজ শ্রবণে তাহাদের কি অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আপনারা সহজেই কল্পনায় আনিতে পারেন। সাহস, বীরত্ব ও নির্ভীকতা তাহাদের বাক্যাবলীর অভিধানে নাই।[21]

অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা তাড়িত আধুনিকতার অভিঘাতে অন্যজাতিকে তোতার-বুলির মতন অনুকরণ করতে গিয়ে মানবচরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশজাত যে নির্ভীকতা সেই নির্ভীকতা বাবুচরিত্রে বিকশিত হয়নি। শিবচন্দ্র বসু বাবুয়ানির আত্মবিস্মৃতির ফিরিস্তি শুনিয়েছেন এইভাবে — পাশ্চাত্য জ্ঞানের চালান (importation of western knowledge) বাবুকে এমন এক গড্ডালিকায় ভাসিয়ে দিয়েছে, যা তাঁর মনে একটা অহঙের প্রলেপ দিয়েছে। সেই অহঙে তিনি দেশীয় সবকিছুর দিকেই হেয় নজরে চান; আর ইউরোপীয় সবকিছুর প্রতিই ভীষণ টান অনুভব করেন।[22]

---

[19] নবাবি আমলের রাজপুরুষদের অবনমন ও ইংরাজ আমলের নতুন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর উত্থানের বিষয়টাকে বোঝানো হচ্ছে।

[20] অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিসার্শ, নবম মূদ্রণ ২০১৯), পৃ ৬৫।

[21] লেখক অনুল্লিখিত, 'কাল-মহিমা-রহস্যঃ বাবু কি?', প্রকাশক- শ্রীক্ষীরোদ বসু, (কলিকাতাঃ স্মৃতিসাধন সারস্বত মন্দির, ১৩১২ বঙ্গাব্দ), পৃ ৪-৫।

[22] 'The importation of Western knowledge has imbued him with new-fangled ideas, and shallow draughts, have made him conceited and supercilious, disdaining almost everything Indian, and affecting a love of European

এই টান উনিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশক থেকে বাবুকে এমন ছন্নছাড়া করে তুলল যে, তিনি এমন এক পোশাক গায়ে চাপান, যা না মুসলমানী না ইউরোপীয়। ভাবটা এমন যেন, টাইট-ফিট প্যান্টালুন, শার্ট, পশমের বা বনাত কাপড়ের কোট, নানা-ঢঙ্গের এমব্রয়ডারি টুপি বা সরু-ঢঙ্গে কোঁচানো শালের পাগড়ি পরলেই বা শীতকালে গলায় শাল জড়ালেই সভ্যতার সোপান বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া হল। যেন মাটন-চপ, চিকেন-কারি খেলে, ব্রাণ্ডী-পানি বা ওল্ড টম পান, ম্যানিলা বা বার্মা সিগার সেবন করাই হল পাশ্চাত্য সভ্যতার মাপদণ্ড। যেন হিন্দু শাস্ত্র যেসবে বিরোধ করে সেইসবে পা-গলানকেই সভ্যতা বলা হয়![23] খুব সাম্প্রতিককালে সুদীত কৃষ্ণ কুমারের লেখাতেও উঠে এসেছে, যে আধুনিকতার উৎপত্তি বা আবিষ্কার কোনোটাই এইদেশে হয়নি, সেই আধুনিকতার শুধুমাত্র ভোক্তা হিসেবে কিভাবে এইদেশে বাবু শ্রেণির বিকাশ হয়েছে।[24] আর মেকি ভোক্তাই যখন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত বাবুয়ানির সার্থকতা পশ্চিমা বাজারজাত সামগ্রী গায়ে চাপানোতেই হোক বা ঘরের অন্দরসজ্জায় বা নিত্যব্যবহারে পশ্চিমা দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারেই হোক বা পশ্চিমা বাজার অর্থনীতির ফসল পানীয় পানেই হোক – এইসব বাহ্যিক আড়ম্বরে আটকে ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিলিতি রুচির অগ্রগমনের সাথে সাথে দেশীয় শিল্পের কিভাবে অবনমন হয়েছিল, তা বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন। একসময় দেশীয় জনগণের কাঁস-পিতলের বাসনপত্র জোগান দিতে যে কাঁসারীপাড়া বা কাঁসারীটোলার উত্থান হয়েছিল, দেশীয় বাবুয়ানির বিকাশের সাথে সাথে সেই পাড়াগুলিও লোপ পেতে শুরু করেছিল। কারণ ‘রুচির বদল হয়েছে- চীনামাটির পেয়ালা পিরীচ এবং স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্র’ ব্যবহার বেড়েছে, ‘কাঁসার থালায়

---

aesthetics.’ দ্রষ্টব্য, Shib Chunder Bose, ‘The Hindoos as They are: A Descriptions of the Manners, Customs and Inner life of Hindoo Society in Bengal’, (Calcutta: Thacker, Spink and Co, Second Edition 1883), p.195.

বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা বাজার লাভ করছে দেখে সবসময় যে শিক্ষিত মিশনারিরাই ধর্ম ও অর্থের পসারের জন্য স্কুল খুলে বসছিলেন তা নয়, বিলিতি পণ্যের দেশীয় নকলের মতন, সেরূপ স্কুলও ছিল যেখানে ইংরেজি শিক্ষার বহর দেখানে একজন গোরা সাহেব রাখা হত, যার ইংরেজি জ্ঞান হয়ত নেটীভ শিক্ষকের চাইতেও কম। রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনীতে সেরূপ স্কুলের দেখা পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য, রাজনারায়ণ বসু, ‘আত্মচরিত’, (কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯), পৃ ১২।

23 ‘As a man of fashion the Babu cuts a burlesque figure, by adopting a dress, partly Mussalman and partly European, and by imitating the European style of living, as if modern civilization could be brought about by wearing tight pantaloons, tight shirts, and black coats of alpaca or broadcloth. He culminates in a coquettish embroidered cap or thin-folded shawl-turban, with perhaps a shawl neckcloth in winter. He eats mutton chops and fowl-curry, drinks Brandy-panee or Old Tom, and smokes Manilla or Burmah cigars. Certainly these things are proscribed in Hindoo Shastra...’ দ্রষ্টব্য, Shib Chunder Bose, ‘The Hindoos as They are’, p.196

24 ‘Modernity, as it appeared in nineteenth century Bengal, was neither inherited, nor invented: It is largely imported and imbibed from the West. Far from being its producer, Bengal was rather the consumer of this modernity. Modern ideas and practices came packaged from Europe as an adjunct to England’s political and economic control of India.’ দ্রষ্টব্য, Sudit Krishna Kumar, “The ‘Bawdy’ Body: A Sartorial Narrative of the Baboo in Nineteenth-century Calcutta”, in Sudit Krishna Kumar and Suvobrata Sarkar Ed. ‘Contextualizing the Body: An Indian Experience’, (New Delhi: Manohar, 2021), p. 143.

আধুনিক অথিতিদের ভোজ্য দেওয়ার রেওয়াজ লোপ পেয়েছে।' এক্ষেত্রে একটু বলে নেওয়া ভালো আজকের একবিংশ শতকীয় ব্রাণ্ডের সংস্কৃতিতে কাস-পেতলের থালায় সেই 'পুরাতনী আহার' হোটেল রেস্তোরাঁয় স্মৃতিবিলাসী খদ্দের টানার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।[25] ১৮৮৪ সালে 'বীণাপাণি' পত্রিকায় শ্রীকুশীলাল কাপাসী, পশ্চিমা বাজারের আমদানির উপর বাবুর নির্ভরতাকে হেয় করে ছড়া কেটেছেন,-- 'বিলাসে বাবুর দেখি অতীব মনন,/পমেটম, ল্যাভেণ্ডার,/ আরো রোজ ওয়াটার,/ অটোডি-রোজের কথা Exaggeration/ হাতে Hand-kerchief সুগন্ধি-চর্চ্চিত,/ বিলাসিনী বিনোদিনী করিতে মোহিত।'[26] সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সেকালীন দেশী ব্যবসাদাররাও তাই নিজেদের ব্যবসাবৃত্তির সাথে পশ্চিমা-যোগকে প্রকট করে বাজারে জায়গা করতে চেয়েছেন। যাতে বিলিতি সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত দেশীয়দের বাজারি ভোক্তায় পরিণত করে নিজেদের লাভের পথ সুগম করা যায়।[27] ১৮৭৫ সালের আগস্ট মাসে 'সাধারণী' পত্রিকায় 'চণকচূর্ণ' তথা চেনাচূর শিরোনামে গদ্য-পদ্য মেশানো একটা ব্যঙ্গ-কবিতা লেখা হয়েছিল। যার মূল বক্তব্য হল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চানাচূর তাবড় ইংরেজি সংবাদপত্রের দ্বারাও বন্দিত হয়েছে, সুতরাং ইয়ংবেঙ্গলরা বিলিতি চীজ-বিস্কিট ছেড়ে সেই চানাচূড় গ্রহণ করুক। কারণ বিলিতি সংবাদপত্র যেহেতু এর সুখ্যাত করেছে, সুতরাং এটি গ্রহণ করলে ইয়ংবেঙ্গলদের বিলিতি রুচিতে আঘাত লাগবে না। সেই ব্যঙ্গ-কবিতার দিকে তাকানো যাক, --'ভট্টাচার্য্য কি চেনা, সোমবার কো লেনা --/....../ ডেইলি নিউজ আখবর,/ ইংলিশম্যান জবর;/ ফ্রেণ্ডিইণ্ডি খোসবর/....../যো দিল চাহে চীহ-সফীজ।/ কিটীংস কফ লজে ঞ্জেস,/ থ্রোইন্‌টু দি গ্যাঞ্জেস;/ সুইট ইডিনবর বিস্কীটস,/ থ্রো ওবর দি ষ্ট্রীটস।/ বিলাতী চেনা,-- ইয়ংবেঙ্গল লেনা।/ ভাল আখবর লিখা বিজবর।/ বিলাতী চেনা, গরম গরম লেনা,/ চা-কা সাথ পিনা, টেবিলমে রাখনা,/ আও – আও—'[28] দেশীয়দের পাল্টে যাওয়া রুচির

---

[25] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), পৃ ১৯।

[26] শ্রীকুশিলাল কাপাসী, 'আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ', বীণাপাণি, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ

[27] বিলিতি দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, এদেশীয় ধনীরা 'পাশ্চাত্য আসবাবের নিকৃষ্ট জিনিষ আমদানী করে ... ঘরবাড়ি দোকানে পরিণত' করতেন। মধ্যবিত্তরা নকলের নকল আসবাবপত্র বাসনকোসন ঘরে এনে ভরতেন।' অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিদেশী রুচির আসবাবপত্র ও বাসনকোসনের তস্যনকল যে বাজারকে ছেয়েছিল, তা বোঝা যায়। দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১৯।

[28] ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এদেশীয় মধ্যবিত্তের রুচি পরিবর্তনের জন্য বিদেশি শাসকদের যত্ন, এবং এদেশীয়দের মৌলিক চাহিদা মেটাতে তাদের কার্পণ্য বিষয়ে শ্লেষ হেনেছিলেন, 'অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কার্জনসাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ... – কিন্তু জলের তৃষ্ণা তো স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিস! ব্রিটিশ গবর্মেন্ট আসিবার পূর্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালোরূপেই হইয়া আসিয়াছে – এজন্য শাসনকর্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন তো চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হল, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সাথে তাদের ব্যবসায়িক মননবৃত্তির সম্বন্ধকে তুলে ধরা। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি হলে বা অভাব সৃষ্টি না হলেও কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে নিজেদের বাজারের বিস্তার ঘটানো। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ", 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র', (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫), পৃ ৯৩-৯৪; সাধারণী, ২২শে ভাদ্র ১২৮১ সাল।

সাথে তাল মিলাতে এদেশীয় ব্যবসাদাররা নিজেদের ব্যবসার সাথেও বিলিতি যোগ দেখাতে কতটা তৎপর, তা মোটামুটি পরিষ্কার।[29] দেশীয় প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য এরূপ বিলিতি ট্যাগ ব্যবহারের প্রবণতার মূল কারণই হল, দেশীয় মধ্যবিত্তের মনে বিলিতি জীবনাচরণ নিয়ে একটা লুকোনো মোহাচ্ছন্নতা। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনীতে বাল্যকালে কিভাবে সেই মোহাচ্ছন্নতা কাজ করেছিল তার বর্ণনা করেছেন – 'তখন আমাদের বাড়িতে পেঁয়াজ ও বৃথা মাংসের প্রবেশ নিষেধ ছিল, কিন্তু পাড়ার একজন "কাকার" প্রসাদে, হোটেলের সুমধুর ভোজনে আমি দীক্ষিত হইয়াছিলাম। পেঁয়াজের সুগন্ধে উদ্ভাসিত নয়নাভিরাম কাটলেটের কথা স্মরণ করিয়া, আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, এবং কেহ জানিতে না পারে, কেবল কোঁচার কাপড় খুলিয়া গায়ে দিয়া, হোটেলে যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম।'[30]

ব্রিটিশ কোম্পানির উপস্থিতি তো বটেই, সাথে একশ্রেণির বাহ্যিক আড়ম্বর কলিকাতা নগরীকে গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে স্বপ্ন-ভূমিতে পরিণত করেছিল। গোঁড়া হিন্দু-সমাজের কাছে এই আড়ম্বর যাবনিক আড়ম্বর সদৃশ হলেও, জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে নতুন আদব-কায়দা ও উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়ে কলিকাতার 'বড় বাবুদের মতন' হয়ে ওঠার স্বপ্ন গ্রামের যুবা-মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিত বইকি![31] তাই স্বপ্নের টানে গ্রামের নানাবৃত্তির মানুষজন ভিড় জমাতে শুরু করল কলিকাতা নগরীতে। তাঁদের মধ্যে অনেকের মনোবাসনা পূর্ণও হল। কারো কারো আঙুল ফুলে কলাগাছ হল।[32] ভবানীচরণ এই নবোত্থিত বাবুদের পূর্বজদের সাথে কলিকাতা নগরীর যোগসূত্র বোঝাতে *নববাবুবিলাস*-এ বলেছিলেন, এই বাবুদের বাপ-দাদারা টাকার লোভে কলিকাতা এসে কর্মকার, স্বর্ণকার, চর্মকার ইত্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করে বা অর্থবান শ্রেণির জন্য

---

[29] দেশীয় মধ্যবিত্তের বিলিতি দ্রব্যের প্রতি অনুরক্তি উপলব্ধি করে অস্ট্রিয়ান, জার্মান, সুইডিশ সকল এনামেল ও চিনামাটির থালাবাসন বিক্রেতারাও ভারতের বাজার ধরার জন্য থালা বাটির তলায় ইংরেজিতে 'মেড ইন...' ছাপ্পা দেওয়া কাগজ লাগিয়ে দিতেন। দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ২২।

[30] সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'আত্মজীবনী', (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), পৃ ১৩।

[31] 'People in the country glory and console themselves with the idea that, in adopting new manners and customs, they are following the example of big Babus of Calcutta.' দ্রষ্টব্য Shib Chunder Bose, 'The Hindoos as They are: A Descriptions of the Manners, Customs and Inner life of Hindoo Society in Bengal', (Calcutta: Thacker, Spink and Co, Second Edition 1883), p.196

[32] কলিকাতা নগরী যতই শিক্ষা-দীক্ষা-ব্যবসা-আয়েসের কেন্দ্র হিসেবে প্রকট হয়েছে, ততই গ্রাম্য জীবনের বাঁধনও আলগা হতে শুরু করেছে। বিংশ শতকের শুরুতে সেই শিথিলতার আঁচ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছিলেন, 'মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল – এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায় – সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত – পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকা পরিত্যক্ত – সেখানে – উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না।' দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ", ভাদ্র ১৩১১, 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র', (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫), পৃ ৯৪।

ভাঁড়ামি, দূতকর্ম, জুয়াচুরি করে বা ভোগবিলাসের উপকরণ হিসেবে মেয়েদের জোগান দিয়ে, ধীরে ধীরে 'কোম্পানির কাগজ' বা জমিদারি কেনার পর্যায়ে নিজেদের নিয়ে গিয়েছিলেন।[33] শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর গ্রন্থে নবোত্থিত কলিকাতা নগরীকে 'তীর্থস্থান'এর সাথে তুলনা করেছেন। যে তীর্থস্থানে মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে, পাশ্চাত্য এনলাইটেনমেন্টের সংস্পর্শে এসে আত্মিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির বন্দোবস্ত করতে পারে। কিন্তু আত্মিক ও বৌদ্ধিক উন্নতি তো সাধনার বিষয়! আবার পাশ্চাত্য বাজারমুখী শিক্ষা যেহেতু, তাই এই শিক্ষা পেতে গেলে আর্থিক পুঁজিরও দরকার। গ্রাম-গঞ্জ থেকে কজনের পক্ষে সেই সাধনার দৃঢ় সংকল্প ও অর্থবল নিয়ে আসা সম্ভব হত! তাই কলিকাতার বিকাশলগ্নে সেইসব নরনারীর আনাগোনাও শহরে বেড়েছিল, যাঁরা ভাবতেন, শহরে গেলেই বোধয় নিমেষে ভাগ্য পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু শহর কিছু মানুষের স্বপ্নকে যেমন বাস্তব করে, কিছু মানুষকে তেমনি জীবনধারণের তাগিদে পঙ্কে নামিয়ে আনে। শাস্ত্রী মহাশয়, ১৮২৬ সালের প্রেক্ষিতে শিক্ষা-গৌরবের তীর্থস্থান কলিকাতার দক্ষিণের অঞ্চল চেতলা'তে সেইরূপ পঙ্কিল জীবনধারণে অভ্যস্থ মানুষের আধিক্যকে তুলে ধরেছিলেন।[34]

একশ্রেণির পঙ্কে নিমজ্জন আর আরেক শ্রেণির বিকাশের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা কিন্তু একসাথেই ঘটেছে। ১৮৮১ সালে লোকনাথ ঘোষ বিরচিত 'The Native Aristocracy and Gentry of Bengal'-এ উনবিংশ শতকে কলিকাতার একেকটি ধনাঢ্য পরিবারের বর্ণনা করে দেখানো হয়েছিল, কিভাবে পরিবারগুলো কোম্পানির সাহচর্যে এসে বিত্তশালী হয়ে উঠছে।[35] যেমন, পাথুরিয়াঘাটায় মুখার্জী পরিবারের স্থপতি বৈদ্যনাথ মুখার্জীর আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার

---

[33] '...এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জৈষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার, বর্ণকার, কর্মকার, চর্ম্মকার, চটকার, পটকার, মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগম মিথ্যাবচন পরকীয়রমণী-সংগঠনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন...' দ্রষ্টব্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "নববাবুবিলাস", রমেনকুমার সর সম্পাদিত 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ' (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩), পৃ ১৭২

[34] 'সর্ব্বত্রই দেখিতেছি তীর্থস্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা অতি জঘন্য। বহুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিশীল নরনারী এইসকল স্থানে সর্ব্বদাই আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া বা পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিবার মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য লোক এই সকল তীর্থস্থানের চারিদিকে বাস করে। দুশ্চরিত্রা নারীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। যাত্রীদিগকে বাসা লইতে হইলে অনেক সময় এইসকল নারীদের ভবনেই বাসা লইতে হয়। তাহারা দিনে যাত্রীদিগকে বাসা দিয়া ও রাত্রে বারাঙ্গনাবৃত্তি করিয়া দুই প্রকারে উপার্জ্জন করিতে থাকে। যখন রূপ ও যৌবন গত হয় তখন ইহাদের অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। চেতলা তখন (উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে) এই শ্রেণীর পুরুষ নারীতে পূর্ণ ছিল।' দ্রষ্টব্য, পৃথ্বীরাজ সেন সম্পাদিত, শিবনাথ শাস্ত্রী'র 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', (কলকাতা: মাইতি বুক হাউস, ২০১৬), পৃ ৫২-৫৩

[35] Joanne Lea Taylor, 'The Great Houses of Kolkata 1750-2006',(Thesis submitted in requirements for the Degree of Master of Built Environment by Research, University of New South Wales, 2008).

ভঙ্গমোড়া-গোপীনাথপুর গ্রামে। তিনি কলিকাতায় এসে দেওয়ানির চাকরি গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিবার দেওয়ানির টাকায় ফুল্লকুসুমিত হয়ে ওঠে। হাটখোলা দত্ত পরিবারের রাজা নবকিষেণের তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমদানি-রপ্তানি বিষয়ে বেনিয়ান। ঝামাপুকুরের লাহা পরিবারের দুর্গাচরণ লাহাও ছিলেন কলিকাতার বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান। লণ্ডন ও ম্যানচেস্টারে তাঁর নিজস্ব এজেন্সীও ছিল। কুমোরটুলির মিত্র পরিবারের গোবিন্দরাম মিত্র ছিলেন কলিকাতার অন্যতম পুরাতন সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা। ১৬৮৬-৮৭ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং তাঁর বাংলা, পারসীর সাথে সাথে ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তি দেখে কোম্পানির কলিকাতা কুঠির তৎকালীন গভর্নর জোব চার্নক তাঁকে কোম্পানিতে একটা চাকরি দেন। সেখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে কলিকাতার ব্ল্যাক জমিদারে পরিণত হন। এছাড়া জোড়াসাঁকোর ঘোষ পরিবারের অভয়চরণ ঘোষও কলিকাতায় এসে দেওয়ানি শুরু করেছিলেন।[36] বিনয় ঘোষ ভারত-সরকারের জাতীয় মহাফেজখানার পররাষ্ট্র বিভাগের নথিপত্রের মধ্য থেকে ১৮৩৯ সালের একটা ফাইল তুলে আনেন, সেখানেও দেখা যায় পুরোনো কলিকাতায় দেব পরিবার[37], মল্লিক পরিবার (নিমু মল্লিকের পরিবার) , সিংহ পরিবার (কৃষ্ণ চন্দ্র সিংহের পরিবার), আন্দুলের দেওয়ান রামচরণ রায়ের পরিবার, খিদিরপুরে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষলের পরিবার[38], পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার[39] ইত্যাদি পরিবারগুলোর প্রথম প্রজন্ম, হয় কোম্পানি অফিশিয়ালদের দেওয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন, বেনিয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন বা নতুন শহরে এসে নতুন ব্যবসায়িক বৃত্তি অবলম্বন করছিলেন।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, খিদিরপুরে কোম্পানি অফিশিয়ালদের জাহাজ থামবার সাথে সাথে এদেশীয় টাকা-শিকারী নেটিভরা কিভাবে সাদা-চামড়ার নবাগতদের উপর হামলে পড়তেন। এঁদেরই মত এদেশে জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে সাহেবদের দেওয়ান ও বেনিয়ানদের মুখাপেক্ষী হতে হত। আর দেওয়ানি, বেনিয়ানি থেকে লাভ করা টাকায় সেসব ব্যক্তি শহর কলকাতায় বাবুয়ানির প্রদর্শন করে নিজেদের সামাজিক স্ট্যাটাস জানান দিতেন। এই বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমাদের এই বৃত্তিগুলো সম্বন্ধে একটু জানার দরকার। হেনরি ইউল ও এ. সি. বার্নেলের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শব্দের সংকলনে বলা হয়েছে, ‘দেওয়ান’ হল সেই কর্তাব্যক্তি, যিনি কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বা বৃহত্তর কোনো গার্হস্থ্যের বেতনভুক ম্যানেজারের ভূমিকা

---

[36] লোকনাথ ঘোষ, ‘কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত’, (কলকাতা: অয়ন, ১৯৫৮)।

[37] পলাশীর যুদ্ধের পর যখন বাংলার মসনদে মীরজাফরকে সম্রাট বানিয়ে কোম্পানি বসায়, তখন এই পরিবারের নবকৃষ্ণ দেব রবার্ট ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন।

[38] গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলেস্ট সাহেবের দেওয়ানি করে প্রচুর বিত্ত অর্জন করেছিলেন।

[39] এই পরিবারের প্রধান শাখার দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

পালন করতেন।[40] অন্যদিকে ‘বেনিয়ান’ শব্দের মধ্যযুগীয় নানা প্রকার ব্যবহার থাকলেও, উনবিংশ শতকে বাংলায় বেনিয়ান ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা ব্রিটিশ কোম্পানির ব্যবসায়িক কারবারকে এদেশে প্রসারিত করে মুনাফা লাভের তাগিদে দালাল হিসেবে কাজ করতেন বা কোনো কোম্পানি অফিসিয়ালের ব্যক্তিগত বানিজ্যের প্রসারণের জন্য ভূমিকা পালন করতেন। এই শ্রেণিকে উনবিংশ শতকে ‘সরকার’ বলেও ডাকা হত।[41] কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, দেওয়ানি ও বেনিয়ানের কাজ কর্ম করে কোম্পানির আস্থাভাজন হয়ে উঠে রাজা, মহারাজা নানা খেতাব প্রাপ্তি ও চাকরি প্রাপ্তির দৌঁড়ে সামিল হবার প্রবণতা এদেশীয়দের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছিল— ‘সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবারের জুতো ও শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনির মতো রাস্তার বাঁদাড়ে, ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।’[42] প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এবং এইসব খেতাব ও পদ পেয়ে বা ‘কোম্পানির কাগজ’ অর্থাৎ জমিদারি কিনে এই শ্রেণির সামাজিক রুচিবোধে কিরকম পরিবর্তন হত, সেটাও সিংহ মহাশয় লিখেছেন, ‘...হিন্দু ধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখরাই, ফুল আখরাই, পাঁচালী আর যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লো। সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে [[43]] বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন।...’[44] অর্থাৎ সামাজিক রুচিশীলতার মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রে ছিল টাকা। আর রুচির বাহ্যিক প্রদর্শনের সাথে অর্থশালীর মনস্তত্ত্বে টাকা তো সবসময়ই জড়িত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেখিয়েছেন, শহরের একটা বিরাট শ্রেণি সেই টাকা আয় করতেন ‘মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা।’[45] তাঁর মতে, কলিকাতার নৈতিক আবহাওয়াও এতটাই অধোগামি ছিল যে, ‘কোনও সুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্রে বসিলে এইরূপ ব্যক্তিদিগের [অর্থাৎ জোচ্চোর, মিথ্যুক, প্রবঞ্চকদের] কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত।’[46] এই জায়গায় দাঁড়িয়ে

---

[40] ‘[In Bengal] a native servant in confidential charge of the dealings of a house of business with natives, or of the affairs of a large domestic establishment.’ দ্রষ্টব্য, Henry Yule and A.C Burnell, ‘Hobson-Jobson: The Definitive Ghossary of British India’, (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 203

[41] ‘In Calcutta it is (the Word Banyan) specially applied to the native brokers attached to the houses of business, or to persons in a employment of a private gentlemen doing analogous duties.’ দ্রষ্টব্য, Henry Yule and A.C Burnell, ‘Hobson-Jobson’, p. 82

[42] অরুণ নাগ সম্পাদিত ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্শ, নবম মূদ্রণ ২০১৯), পৃ ৬৫।

[43] পৃথ্বীরাজ সেন সম্পাদিত, শিবনাথ শাস্ত্রী’র ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, (কলকাতা: মাইতি বুক হাউস, ২০১৬), পৃ ৬০।

[44] অরুণ নাগ সম্পাদিত ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’।

[45] পৃথ্বীরাজ সেন সম্পাদিত, শিবনাথ শাস্ত্রী’র ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, পৃ ৬০।

শিবনাথ শাস্ত্রী ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত একদমই এক। তাঁরা উভয়েই কলিকাতার নাগরিক জীবনের সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে সম্পৃক্ত করে এঁকেছেন।

কলিকাতায় বাবুয়ানি'র বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদের রচনায় আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা অর্জিত বাবুয়ানি'র প্রতি তিরস্কার লক্ষ্য করেছি। ভবানীচরণ বাবুয়ানি'তে ভোগের বহর বোঝতে বলেছিলেন, পাশা, পায়রা- বুলবুলির খেলাতে টাকা উড়ানো, পোশাকি কেতার প্রদর্শন ও পরস্ত্রী-সঙ্গে সুখ প্রাপ্তি ছিল উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাবুয়ানির অর্ধদশা অর্থাৎ 'হাপবাবু'ত্ব প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। আর পূর্ণ বাবুত্ব প্রাপ্তির জন্য মদ্য-মাংশ আহার, নারী সম্ভোগ এবং নিজেদের দানবীর দেখানোর প্রবণতা তো ছিলই![47] যদিও এই শর্তগুলি উনবিংশ শতকের বাবু সমাজের নির্মিতি। এই বাবু সমাজ মধ্যযুগীয় সমাজে রাজদ্বারে সম্মানপ্রাপ্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা বাবু সমাজের চাইতে ভিন্ন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বা তারও আগে মুঘল দরবারে যারা 'বাবু' উপাধি লাভ করতেন, হয় তারা নিজেদের ব্যবসায়িক সাফল্যের দ্বারা তা লাভ করতেন, নতুবা সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য। কিন্তু উনবিংশ শতকে প্রথম দিকে কলিকাতা কেন্দ্রিক সমাজে টাকার সর্বব্যাপী সঞ্চরণশীলতা বাবুত্ব প্রাপ্তির পেছনে রাজনৈতিক আগলটাকে শিথিল করে দেয়। যার হাতে টাকা আছে সেই বাহ্যিক দেখনদারীর মাধ্যমে বাবু সমাজে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে থাকেন; আবার ধোপাবাড়ি থেকে কাপড়-চোপড় ভাড়া নিয়ে অন্তত একদিনের অনুষ্ঠানের জন্য বাবু সেজে নিজেদের জাহির করবার উদাহরণও তৎকালীন সাহিত্যে কম নেই।[48]

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বাবুয়ানির ভোগবিলাসী দিক তুলে ধরতে গিয়ে দেখিয়েছেন, বাবুরা মুঘল শাসনামলের অবক্ষয়ের কালে, মুঘল অর্থনীতিক কারবারের যেটুকু ছিটেফোটা বেঁচেবর্তে ছিল, সেটুকু থেকে আর্থিক রসদ আদায়ের জন্য পারশী ভাষাটা যেমন শিখেছিলেন, তেমনি ব্রিটিশ কোম্পানির আর্থিক কারবারে সামিল হয়ে মোটা টাকা আয়ের জন্য টুকটাক ইংরেজীও রপ্ত করতে আরম্ভ করেছিলেন। আর অর্থের পিছনে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে তাঁরা নিজেদের ধর্মে আস্থাহীন হয়ে ভোগসুখে দিন অতিবাহিত করাকেই একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকার করেছিলেন। আর সেই ভোগসুখ হল, বাউরি চুলের ঢেউ খেলানো স্টাইল করে, দাঁতে মিশি লাগিয়ে, ফিনফিনে

---

[46] তদেব।

[47] 'যাঁহারা চারি প পরিপূর্ণ হইবেক তিনি হাপবাবু হইবেন। পয়ের বিবরণ পাশা পায়রা পরদার পোশাক। যাহারা চারি প চারি খ, এই দুই পরিপূর্ণ হইবেক তিনি পুরা বাবু হইবেন। খয়ের বিবরণ খসি, খান-কী খানা খয়রাত।' দ্রষ্টব্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "নববাবুবিলাস", রমেনকুমার সর সম্পাদিত 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ', (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩), পৃ ১৮০

[48] নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', ১ম ও ২য় ভাগ, পৃ ২১।

কালাপেড়ে ধুতি পরে, ঊর্ধ্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিনের বা কোমরিকের বেনিয়ান পরে, গলায় কুচি করা চাদর বা উড়ানী সুন্দরভাবে জড়িয়ে, পায়ে পুরু বগলস সম্বলিত চিনা জুতো পরে, দিনের বেলা নিজের সামাজিক স্ট্যাটাসকে পোশাকে আশাকে সমাজের সামনে তুলে ধরে, রাতের বেলা বারাঙ্গনার গৃহে ঢুকে পড়তেন।[49] আর সকালবেলা চোখে মুখে রাতজাগার চিহ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরতেন।[50] তার উপর সাদা সাহেবের মতো ফিটনে চড়ে বা ঘোড় সওয়ার হয়ে গায়ে হাওয়া লাগানোও বাবুর বাবুয়ানির লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছিল। যদিও সাহেবের সামনে ঘোড়সওয়ার হয়ে বাবুয়ানি জাহিরে বাবুর লজ্জা। তাই বাবু প্রাণপণে চাইতেন ঘোড়সওয়ার অবস্থায় যেন সাহেবদের সামনাসামনি পড়ে না যান--

> [বাবুর] সাহেব লোকের ধারা একটা আছে [,] সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান। বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে [তখন ফোর্ট উইলিয়মের সেনা দুর্গ থেকে দিনের প্রতি ভাগে তোপ দাগা হত] নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও [,] প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন [,] চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন [,] তাহার পর চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক [,] সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে [।] ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া

---

[49] ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক কারবার নির্ভর কলিকাতার নগর সংস্কৃতি যতই বিভিন্ন শ্রেণীর কারবারিদের আনাগোনায় সমৃদ্ধ হতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয় নিবৃত্তির কেন্দ্র হিসেবে নগর কেন্দ্রের আশেপাশে (চিতপুর থেকে কালীঘাটগামী রাস্তার আশেপাশে, লালদিঘি থেকে বউবাজারগামী রাস্তার আশেপাশে, বন্দরের ভ্রাম্যমান নাবিকদের জন্য খিদিরপুরে) গণিকালয়গুলোর পত্তন ঘটতে শুরু করে। এদেশীয় দাম্পত্যে প্রেম, বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের ধারণা পোক্ত হয়ে বসার আগে বাহ্যিক বৈষয়িক কারবারে প্রবৃত্ত থাকা পুরুষদের মধ্যে গণিকালয়ে যাতায়াতের প্রবণতা হীন পদবাচ্য হত না। আর সেকালীন গণিকাদের মধ্যে সরস্বতী পুজোর সাথে সাথে কার্ত্তিক পুজোর চল ছিল। যে দেব সেনাপতি কার্ত্তিক কিনা অসুরের সাথে লড়াই করে অমর হয়েছিলেন, সংসার পাতেননি, সেই তিনিই গণিকাপল্লীতে হয়ে উঠতেন 'আদর্শ বাঙালী বাবু'র প্রতিভু যেন। 'গোলগাল, নাদুসনুদুস ... গোঁপ পাকিয়ে তোলা, খালি গা, কোঁচানো চাদর পাকিয়ে গলায় দেওয়া, ব্রাহ্মণের উপবীত আছে। কোঁচানো ধুতি, পায়ে কালো পাম্পসু...' দ্রষ্টব্য, Sumanta Banerjee, 'Under the Raj: Prostitution in Colonial Bengal', (New York: Monthly Review Press, 1998), p. 72; আবুল আহসান চৌধুরী, 'অবিদ্যার অন্তঃপুরেঃ নিষিদ্ধ পল্লীর অন্তরঙ্গ কতকথা', (ঢাকা: শোভা প্রকাশ); বিনয় ঘোষ, 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ১৯৯৯, পৃ ৩০২-৩০৩; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ২৮।

[50] 'এইসময় [ঊনবিংশ শতকের দশ কুড়ির দশকে] শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে ভ্রুপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা শিরে অরঙ্গায়িত চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি হাপ আকরাই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গানাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।' দ্রষ্টব্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', (পৃথ্বীরাজ সেন সম্পাদিত), পৃ ৬০।

যাইতেছিলেন [,] দেখেন রৌদ্র হইয়াছে [।] এই ক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব।[51]

কারণ সাহেব বাবুর কাছে ‘মা-বাপের’ সমতুল কিনা!। আরও একধাপ এগিয়ে ঈশ্বরের সমতুল বললেও ভুল হয় না।[52] তাই আর যাই করা চলুক, সাহেবকে কিন্তু চটানো যাবে না।[53]

কিন্তু অধস্তনের জাগতিক চিন্তার রাজ্যে উর্দ্ধস্তনের পদাঙ্ক অনুসারে চলবার একটা প্রবণতা প্রাকৃতিকভাবেই মজ্জাগত। তাই সাহেবদেরকে অনুকরণ করবার বাসনা শুধু সাহেবদের মতো ঘোড়সওয়ারী হওয়ার আগিদেই নিমজ্জিত থাকে না, বাবু সমাজের অনেকেই সাহেবি রুচির পরিচ্ছদ পরার নিরুচ্চার অথচ তীব্র বাসনাতে ধীরে ধীরে অবগাহন করতে আরম্ভ করেন। কালীপ্রসন্ন মহাশয় বলেছেন, ‘বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড় চমৎকার!’ কারণ এই সং তৎকালীন বাবুদের অন্তঃসারশূন্য ভোগবিলাসী মনকে সামালোচনা করেছে। দালালী, গোয়েন্দাগিরি, নিজের চাইতে বড় বাবুর খোসামুদী করে বা ঠিকে রাইটারি করে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের মাসিক আয়ের প্রায়ই চলে যেত নিজের জন্য বিলাসের উপকরণ জোগান দিতে। হুতোমের ভাষায়, ‘বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন [;] অথচ থাকবার ঘর নাই [,] মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুর বাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ি বসবার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা

---

[51] সমাচার দর্পণ, ৯ জুন ১৮২১, রমেনকুমার সর সম্পাদিত ‘ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ’, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩), পৃ ৪৫২-৪৫৩

[52]। ফ্যানী পার্কস উনিশ শতকের তিনের দশকে, কলিকাতায় নিজেদের গৃহস্থালী ও অন্যান্য বাহ্যিক কর্মসম্পাদনের জন্য নিযুক্ত ‘সরকার’এর তাঁদের প্রতি বাহ্যিক মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সরকার প্রায় কথায় কথায় পার্কসকে এটা মনে করিয়ে দিতেন, ‘You are my mother, and my father, and my God’, এই ডাহা অতিশয়োক্তি (পার্কসের ভাষায় ‘Eastern hyperbole’) হজম করতে না পেরে কখনও যদি পার্কস প্রত্যুত্তর করতেন, তখন বিপরীত দিক থেকে উত্তর আসত এরকম, ‘You are my protector and my support, therefore you are to me as my God’, এই অতীব তৈলমর্দন যে একপ্রকার নিরাময় অযোগ্য ব্যামো, তা বুঝে পার্কসও আর তেমন প্রত্যুত্তর করতেন না। দ্রষ্টব্য, Fanny Parks, ‘Wanderings of a Pilgrim, in Search of Picturesque, During Four-Twenty-years in the East with Revelations of Life in Zenana’, *Vol.1,* (London: Pelham Richardson, 1850),p.22.

[53]। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ সরকারের অধীনে দশটা-পাঁচটার কেরানির চাকুরিতে গা গলিয়ে নিরুপদ্রব জীবনযাপনে ইচ্ছুক বাঙ্গালির সমষ্টিগত চেতনাটি মনোমোহন গোস্বামীর সামাজিক নাটক ‘সমাজ’এ ফুটে ওঠে, ‘আমরা বাঙ্গালী, চাকরী ক’রতেই আমাদের জন্ম, চাকরীর স্পৃহা আমাদের মজ্জাগত; শিশুকাল হতে আমরা পুত্রকে শিক্ষা দিই, ‘ভাল করে লেখাপড়া কর, বড় চাকরী করবে।‘ চাকরীই আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; সাহেব আমাদের ইষ্টদেবতা, সাহেব তুষ্ট থাকলেই বাঙ্গালীর চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়।’ অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকের যে জমি নির্ভর বাবুয়ানি, তাই ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যে চাকরি নির্ভর বাবুয়ানিতে পরিণত হয়, তা একপ্রকার পরিষ্কার। যেখানে অধীনে থেকে কাজ করবার বাসনাটিই প্রবল। দ্রষ্টব্য, শ্রী মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত ‘সমাজ’, (কলিকাতাঃ কালিকা প্রেস, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। তবে সূচনা পত্রে উল্লিখিত যে নাটিকাটি ২৮ বৈশাখ ১৩১৪ সনে প্রথম অভিনীত।), পৃ ৫।

নাই অথচ দেশের রিফরমেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। ...গোয়েন্দাগিরি, দালালী, খোসামুদী, ও ঠিকে রাইটারী করে যা পান, ট্যাসলোয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুশেই সব ফুরিয়ে যায়।'[54] ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনার ফলে এবং ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গলদের উত্থানের ফলে দেশীয় তরুণ পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের মধ্যে সাদা চামড়ার মানুষদের রুচির সশ্রদ্ধ অনুকরণের প্রবণতাও আরও বাড়তে থাকবে। কারণ পাশ্চাত্য অনুকরণই তখন সংস্কৃতিবান হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে বোধ হচ্ছিল। এবং যুগের ফ্যাশন হিসেবে প্রতিপাদ্য হচ্ছিল।[55] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ফ্যাশনকে 'বন্যার প্রথমেই যেমন ঢেউয়ের আগে ভেসে আসে রাশিকৃত ফেনা আর নদীর উৎসমূলের খড়-কুটা আবর্জনা' – সেই ফেনা ও খড়-কুটার সাথে তুলনা করেন।[56] এই ঢেউয়ের প্রভাবেই ভবিষ্যতের দেশীয় ভদ্রলোক ইংরেজদের সামনে পাগড়ি ছেড়ে টুপি পরে সম্মান প্রদর্শনের আর্জি জানাবেন। বা জুতো খুলে উর্দ্ধতন ইংরেজ অফিসারের সামনে যাবার সরকারি নির্দেশিকাকে সমালোচনা করে, বুট পরে সরকারি কাজকর্মে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র আদায় করবেন।

আলোচনা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এসব বিষয় পরিস্ফুট হবে। তবে উনিশ শতকের শুরু থেকেই বাবুয়ানির সাথে সামাজিক স্ট্যাটাসের সম্বন্ধ রচিত হচ্ছিল। অনেক পরিবারই উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে বাবুয়ানিকে সামাজিক স্ট্যাটাস জাহিরের মাধ্যম করে তুলছিল। ভবানীচরণ ১৮২১ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় 'বাবুর উপাখ্যান'এ দেখান, দেওয়ানি করে অর্থশালী হয়ে ওঠা ধনবান কুলীন বামুন ভাবছেন, তিনি যা অর্থ উপার্জন করেছেন সেই অর্থে তার পুত্র বাবুগিরি করে, ঘুড়ি উড়িয়ে, বুলবুলির লড়াই দেখে আয়েসে দিন কাটাতে পারবে। তাকে কষ্ট করে বিদ্যাশিক্ষা নিতে হবে না। তার উপর কুলীনের ছেলের গায়ত্রী মন্ত্রেই শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে যায়![57] তবে পাশ্চাত্য শিক্ষা তাড়িত আধুনিকতার প্রভাব বাড়বার সাথে সাথে একশ্রেণির

---

[54] অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', পৃ ৭০

[55] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ৪২, ৫৪।

[56] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, এই ফ্যাশনের প্রভাবে 'ভৃঙ্গারে ভরে মৃত-সঞ্জীবনী অমৃতধারা আসেনি, এসেছিল কেস-বন্দী স্কটল্যাণ্ডের তৈরি স্কচ হুইস্কি।' সে হুইস্কির এতই প্রসার হয়েছিল যে, শাক্ত পরিবারে তারা পূজার কারণ ঘট স্থাপন, কারণের ভোগ, দেবীকে উৎসর্গীকৃত উপাদেয়তর দুর্লভ সামগ্রী হিসেবেও হুইস্কির প্রবেশ ঘটেছিল হয়ত। দ্রষ্টব্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা', *১ম খণ্ড* (কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস, বৈশাখ ১৩৬৭), পৃ ৩৬।

[57] 'দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না [।] কহেন ব্রাহ্মণের ছেলে গায়ত্রী শিখিলেই হয়[।] কপালে থাকে বিদ্যা হবে [।] আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না [।] পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে আমি দেখিতে আসিব না [।]' দ্রষ্টব্য, সমাচার দর্পণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮২১, রমেনকুমার সর সম্পাদিত 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ', (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩), পৃ ৪৫২

কাছে এই বাবুয়ানি হয়ে উঠতে থাকে নবাবি আলস্যের প্রবিভূ, সুতরাং সামাজিক অধঃপতনের নামান্তর। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিংশ শতকের মধ্যভাগে গিয়ে 'টাকা' থেকে 'আভিজাত্য'র বিকাশের একটা রৈখিক পথ এঁকেছেন। যেখান থেকে বোঝা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষা বাবুয়ানির সংজ্ঞায় কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাঁর ভাষায়--

> ধন-অর্জন করে লোকে ধনী হয়; কিন্তু ধনীর সন্তানেরা যখন জ্ঞানার্জন করে সংস্কৃতিবান হন, তখনই তাদের 'অভিজাত' সংজ্ঞা আমরা দিই।' অর্থাৎ শুধু ধনবান হলে অভিজাত হওয়া যায় না, তার সাথে যে শিক্ষাটাও লাগে, এই চিন্তাটাও পাশ্চাত্য এটিকেটজাত। এই এটিকেটে তাই পাশ্চাত্য-শিক্ষাহীন অর্থে গা ভাসানো বাবুয়ানি সামাজিক শ্লীলতার পক্ষে হানিকর। আবার সেই সামাজিক শ্লীলতা এমনই যে, স্কুল ছুটির পর বড় ঘরের সন্তানেরা বাকি ছেলেদের সাথে নদীতে হুটোপুটি করবে, তাতেও বড় ঘরের আভিজাত্যে ক্ষয় হয়। প্রভাতকুমারের ভাষায়, 'পনেরো বৎসর নদীতীরে বাস করে না শিখলাম সাঁতার, না করলাম নদীস্নান। এটা হচ্ছে সেকালের মেকি আভিজাত্য।[58]

কলিকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি যখন উনবিংশ শতকের বিশের দশক থেকে খুলে যাচ্ছিল, তখন গ্রামের শিক্ষনুরাগী অনেক পরিবার নিজেদের পুত্র সন্তানকে নবযুগের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে কলিকাতায় বা কাছের শহর কেন্দ্রে পাঠাতেন। ছেলেপুলে গ্রাম্যজীবনের খেলাধূলার মধ্যে থেকে গ্রাম্যচরিত্র লাভ করুক, তা ভারতীয় ইতিহাসের যুগসন্ধির ফসল বাবারা চাইতেন না।[59] কিন্তু কলিকাতায় গিয়ে তাঁদের সন্তান বাবুয়ানির গড্ডালিকায় না গা ভাসিয়ে দেয়, সেই ভয়ও যে পরিজনের মনে কাজ করত না তা নয়। তাই রামতনু লাহিড়ী কলিকাতায় যাঁর অবিভাবকত্বে থেকে বিদ্যালাভ করছিলেন, সেই গৌরমোহন বিদ্যালংকারের বাসায় আমোদ-প্রমোদের আসর বসে শুনে কেশবচন্দ্র, রামতনুকে নিজের মায়ের মামার ছেলে রমাকান্ত খাঁ মহাশয়ের বাড়িতে রেখে আসেন।[60]

---

[58] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ৪২, ৫৪।

[59] বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, (কলকাতা: পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃ ৫৯।

[60] পৃথ্বীরাজ সেন সম্পাদিত, শিবনাথ শাস্ত্রী'র 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ ৫৭।

অনেক বাবা-মা'ই কিন্তু উচ্ছন্নে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় সন্তানকে কলকাতায় পাঠাতে চাইতেন না। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাবা-মাও তেমনি। 'অভিভাবকশূন্য হইয়া, অল্পবয়সে ছাত্রাবাসে থাকিয়া..., কলিকাতায়, অল্প সময়ের মধ্যে, ছাত্ররা কুসঙ্গে পড়িয়া অধঃপাতে যায়...' এরূপ নানাহ আপত্তি তুলে ছেলেকে কটক থেকে কলকাতায় পাঠাতে চাননি। ইংরেজি সভ্যতার কুফলগুলো নিজেদের সন্তানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের নৈতিক আচার-বিচারে আঘাত আসুক তা পরিবর্তনমান সময়ের অনেক বাবা-মা'ই চাননি। তাই যুগের পরিবর্তনমানতায় স্বাধীনভাবে সামিল হতে না পেরে

পুরাতন সামাজিক শিষ্টাচার অনুবর্তী বাবুয়ানি কিভাবে বিলিতি বাজারি অর্থনীতির প্রভাবে নতুন বাবুয়ানির জন্ম দিয়েছিল – তা আমরা আলোচনার শুরুতেই উদ্‌ধৃতি সহযোগে দেখেছি। ঔপনিবেশিক বাজারি অর্থনীতির ফসল এই 'বাবুয়ানি'র হাত থেকে দেশীয় সমাজকে বাঁচিয়ে নিজেদের মূল বিষয়ে সচেতন করে তুলতে, তাই উনিশ শতকের শেষ কিছু দশক জুড়ে প্রচুর আচার-বিচার সংক্রান্ত বই লেখা হয়েছিল এবং বাবুয়ানির অনুকরণের আদর্শেই যে ভ্রান্তি নিহিত আছে – তাকে নির্দেশ করেও লেখাজোখা চলতে থাকে।[61] তাই ১৮৯৬ সালে শ্রী ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'আচার' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'বিজাতীয়েরা ও আমাদের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকেরা যতই বিজ্ঞতা করুন্, যতই উপহাস করুন্, যদি দেহের শুদ্ধি ও পবিত্রতা চান্, তবে শাস্ত্রের আদেশানুসারে কার্য্য না করিলে কোন ক্রমেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।'[62] তবে যুগধর্ম পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। ইংরেজি স্কুলে পড়ে জাত যাবে ভেবে, ছেলেকে শ্রীহট্টের হিন্দু স্কুলে স্থানান্তরিত করার পরও যখন বিপিনচন্দ্রের বাবা দেখলেন ছেলে বিলিতি কোম্পানির 'লেমনেড ওয়াটার' মুসলিম বিক্রেতার হাত থেকে খেয়ে 'জাত খুইয়েছে', তখন তিনি ছেলেকে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়েও বেশিদিন গোঁ ধরে থাকতে পারলেন না। কারণ যুগের সাথে তাল মেলাতে গেলে ইংরেজি শিক্ষাটা অপরিহার্য হিসেবে ধরা দিচ্ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রভাবে চারিদিকের পরিবেশটাই পাল্টে যাচ্ছিল। সেই পাল্টে যাওয়া পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নিজেদের হিঁদুয়ানিকে ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে রাখাটা অসম্ভব ছিল। বিপিনচন্দ্র বলেছেন, তাঁর যে পিতা জাতবোধে এতই উদ্দীপ্ত ছিলেন, তিনিই বদলি হয়ে যাওয়া একজন সাদা-চামড়ার জজ সাহেবের এগারো-বারো বছরের বালকের ছোট চেয়ার-টেবিল-আলনা-ত্রিপদী ইত্যাদি নিলাম থেকে কিনে এনে, নিজের অজান্তেই পুত্রকে 'সাহেবিয়ানায় দীক্ষিত' করেন। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়, 'মানুষের নিত্য ব্যবহার্য আসবাব ও বাহিরের পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহার মনের সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ বাবা ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই।'[63] অর্থাৎ নিজেদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পাশ্চাত্যের ভোগনির্ভর সাংস্কৃতিক

মনদুঃখে কাল কাটিয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যাও অল্প ছিল না। দ্রষ্টব্য, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'আত্মজীবনী', (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), পৃ ২১-২৩।

[61] রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, দেশীয় বাবুদের অনুকরণ সর্বস্বতা প্রেমের চিরন্তন আদর্শ বর্জিত। তাই সেই অনুকরণের কোনো সৌন্দর্য তাঁর চোখে ধরা দেয়নি। তাঁর ঠাকুরদাদার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলছেন, 'ঠাকুরদাদা, বাটিতে যে সকল রোগী সপ্লাদ্য ঔষধ লইতে আসিত, তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র সহস্তে পরিষ্কার করিতেন। ... ইহা তিনি পুন্যকার্য্য জ্ঞান করিতেন।' এরপর তিনি উনবিংশ শতকীয় সভ্যতাভিমানীদের মধ্যে এরূপ অহৈতুকী প্রেমের অভাব লক্ষ্য করে বলছেন, বাবুরা যে ইংরাজদের অনুকরণ করে নিজেদের জাতে তুলতে চান সেই ইংরেজরাও 'আপনাদিগের অতিপ্রিয় বন্ধুর এরূপ শুশ্রূষা' করেন, কিন্তু বাবুরা মানব চরিত্রের প্রেমময় গুণগুলিকে নিজেদের সভ্যতা কল্পচিত্রে নিচুস্তরে রেখে বাবুত্বের নামে পরিহাসের জন্ম দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য, রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', (কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯), পৃ ৫।

[62] শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'আচার', (কলিকাতাঃ মুখার্জী অ্যান্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৬), পৃ ২৯।

[63] বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, (কলকাতা: পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃ ৭২-৭৩; পৃ ২৯৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', (কলিকাতা: পুস্তক বিপিণি, ১৯৫৯), পৃ ২৯৩।

পরিসরের সাথে তাল মেলাতে গেলে নিজেদের সমাজের যে শৈথিল্য দরকার, তা প্রকট হয়ে উঠছিল। নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের ইংরাজি শিখিয়ে কেরানি তৈরির দৌঁড়ে সামিল করে, ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করবার তাগিদ ছিল বড় বালাই।[64] এই দৌঁড়ে সামিলদের কাছে ইংরেজ-জীবন আদর্শ হিসেবে মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতকের বিশের দশকে গোপাল হালদারের দাদা মনে করতেন, ‘ওরা [অর্থাৎ ইংরেজরা] জীবনটা উপভোগ করতে জানে।’ স্বদেশী আন্দোলনের কালে স্বদেশী দলে নাম লেখানো গোপাল হালদারের বন্ধু উপেনেরও ছিল একই ভাব – জীবনে ত্যাগ বা কৃচ্ছ্রসাধন আবার কি![65] জীবনটা ইংরেজদের মতন করে ভোগ করা চাই।

অবশ্য শাস্ত্রাচার ও জাতবিচার নিয়ে বাংলা দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গোঁড়ামি নতুন কিছু নয়। মোঘল সময়কালেও তা ছিল। মুঘল পোশাকি শিষ্টাচার-অনুসারী বা মোঘল সরকারের অধীনে কর্মরত এদেশীয় হিন্দুরা যখন তাঁদের মতন পোশাকি আদবকায়দা গ্রহণ করতেন, তাদেরকেও দেশীয় সমাজের দিক থেকে নানা সমালোচনা সহ্য করতে হত। ‘কবিতাকারের সহিত বিচার’এ রামমোহন সেরূপ সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন, -- ‘আহারাদির সময়ে কবিতাকার প্রভৃতি আপন উপাসনার দ্বারা শক্তিজ্ঞানী হয়েন অথচ অন্যকে তাহার ধর্ম্মানুসারে আহারাদি করিতে বিদ্রুপ করেন।। ... [কবিতাকার] লিখেন যে আমরা যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাই। যদ্যপি এমৎ সকল তুচ্ছ কথার উত্তর দিবাতে লজ্জাস্পদ হয় তথাপি পূর্ব্ব অবধি স্বীকার করা গিয়াছে সুতরাং উত্তর দিতেছি আদৌ ধর্ম্মাধর্ম্ম এ সকল অন্তঃকরণবৃত্তি হয়েন পরিধানাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি আছে দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাসা করি যে শিল্পবস্ত্রমাত্র যদি যবনের পোশাক হয় তবে কবিতাকার এবং তাহার বান্ধব অনেক পৌত্তলিকই শিল্পবস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাইয়া থাকেন যদি কবিতাকার বলেন পুত্তলিকার উপাসক ব্রাহ্মনাদির শিল্পবস্ত্র পরিধান করিবাতে দোষ নাই কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসকের দোষ আছে আর দিবসের মধ্যে এত কাল পরিলে দোষ নাই এতকাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ নাই এত কাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ হয় ইহার প্রমাণ যখন কবিতাকার দিবেন তখন অবশ্য বিবেচনা করিব।’[66] রামমোহনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, এমন একটা শ্রেণির অস্তিত্ব বাংলার হিন্দু সামাজিক পরিসরে ছিল, যারা ‘মুসলিমদের মতো’ সেলাই করা বা ‘শিল্পবস্ত্র’ পরতেন, কিন্তু একই সাথে আবার মূর্তি পূজাও করতেন, সাথে সাথে মূর্তি-পূজা না করা, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক এবং সেলাই করা বস্ত্র পরিধানকারী ব্রাহ্মদের সমালোচনাও

---

64 তদেব।

65 গোপাল হালদার, ‘রূপ্নারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, যৌবনের রাজটীকা’ (কলিকাতা: পুঁথিপত্র, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ৯।

66 রামমোহন রায়, “কবিতাকারের সহিত বিচার”, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘রামমোহন গ্রন্থাবলী’, (কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৫২), পৃ ৭৫-৭৬।

করতেন।[67] তাই রামমোহনের প্রশ্ন, মূর্তি পূজা করলে কি সেলাই বস্ত্র পরিধানের পাপের প্রায়শ্চিত্ব হয়ে যায়! আর হিন্দু হয়েও যারা বেদান্ত অনুসরণ করে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব না দিয়ে নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, তাদের সেলাই বস্ত্র পরিধান বা তাদের আহারাদি নিয়ে এত বিরূপ সমালোচনার যৌক্তিক কারণ দর্শানোর দাবি করেছেন তিনি। কারণ রামমোহনের কাছে আধ্যাত্মিক জীবনাচরণের সাথে বিলাসের কোন বিভেদ ছিল না।[68] এমন একটা সময়ে ও পরিসরে রামমোহনের সামাজিক বিকাশ হয়েছিল, যেসময় একদিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উন্মেষকাল অন্যদিকে মুঘল আধিপত্যের পতনকাল, আবার দেশীয় সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার কালও। রামমোহনের প্রাত্যহিক রুচিতে এই কালীন বৈশিষ্ট্য স্পষ্টত প্রতীয়মান ছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর Sophia Dobson Collet কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> Rammohun Roy was an early riser, and regularly took his morning walk. He used to oil his body every morning before bathing. Two big fellows used to oil him and shampoo him. While engaged in this process he would read by rotation and day by day in parts the Sanskrit grammar Moogdhabodha. After bath, he would have his breakfast in Indian fashion, squatting on the ground, surrounded by Indian Utensils for food. His breakfast consisted of fish and rice and perhaps milk 'too. He never took any meals between his morning and evening meal. He generally used to work till two and then go out and see his European friends in the afternoon. His evening meal was between seven and eight, and that as in the English fashion but the dishes were Mohammedan dishes, *Pillau*, *Copta*, *Korma* etc.[69]

---

[67] নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে হিন্দুস্তানের যে বড় সামাজিক ও সংস্কৃতিগত প্রভেদ গত দুই-তিন শত বৎসর ধরিয়া দেখা গিয়াছে তাহা এই – আমাদের মধ্যে নাগরিক, সভ্য ও বিদগ্ধ জন হিন্দু, মুসলমানরা প্রধানত গ্রামবাসী, কৃষক ও গাঁওয়ার; হিন্দুস্তান ইহার উল্টা – হিন্দুরা প্রধানত গ্রামবাসী, কৃষক ও গাঁওয়ার, খুব বেশি হইলে দোকানদার, আর মুসলমান নাগরিক সভ্যতার অবলম্বন। তাই হিন্দুস্তানে হিন্দু মাত্রেই সভ্য বলিয়া গৃহীত হইতে চাহিলে মুসলমানী রীতি ধরিত, অর্থাৎ তাহাদের ভাষা হইত উর্দু, পোশাক হইত আচকান ইত্যাদি, আদব-কায়দাও হইত মুসলমানসুলভ। এখন যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে সাহেব হইতে চায়, তখন তাহারা মুসলমান হইত।' কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক, সভ্য সমাজ বহুলাংশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকলেও, তাদের মধ্যে নিজস্ব আচার ও শাসকের আচার নিয়ে একটা দোলাচল ছিল। তাই নিজেরা শাসকের মতো পোশাক পরে সামাজিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও, অন্যকে একই পোশাক পরিধানের জন্য সমালোচনা করতেও ছাড়তেন না। দ্রষ্টব্য, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'হিন্দুর মুসলমানী পরিচ্ছদ কেন?' ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী (সম্পাদিত), 'নীরদচন্দ্র চৌধুরী নির্বাচিত প্রবন্ধ', (কলকাতাঃ আনন্দ, সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ ২২৩।

[68] Brian A. Hatcher, 'Hinduism Before Reform', (Cambridge, Massachusetts: Harverd University Press, 2020); তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, 'সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে রামমোহন রায়', (কলকাতা: কোরক, ফেব্রুয়ারি ২০২২)।

[69] Hem Chandra Sarkar ed., 'The Life and Letters of Rammohun Roy', Compiled and Edited by the late Sophia Dobson Collet, (Calcutta: Publisher is not mentioned, 1914), p. 137-138.

এখান থেকে বোঝা যায় রামমোহনের প্রাত্যহিক যাপনে দেশীয়, মুসলমানি ও পাশ্চাত্য পরিশীলনের একটা সম্মিলন ঘটছিল। শ্রীমতি ফ্যানি পার্কস রামমোহনের বাড়ির অন্দরসজ্জা বিষয়ে লিখেছিলেন, "বাড়ীর ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র সাজানো এবং সবই ইউরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ীর মালিক হলেন বাঙ্গালীবাবু" অর্থাৎ রামমোহন রায়।[70] Sophia Collet লিখছেন, 'He never went out without his shawl turban,-- not like the present Bengalis with a French smoking cap. When at home he was always dressed in the Mohammedan fashion, *Chapkan, Unagaga, Pyjamsa*, and a skull cap on his head. He never sat bearheaded, following in his instance the Mohammedan custom. He never gave up his Brahmmanical thread. His spoken Bengali was highly classified in structure. His English was good, but he spoke with great hesitancy lest he should commit some verbal error or other.'[71] এই বর্ণনা থেকে এতটুকু পরিষ্কার যে, তাঁর সমসাময়িক কালে মুঘল দরবারি সংস্কৃতির সাথে বা ব্রিটিশ কোম্পানির কাজের সাথে যুক্ত বেশিরভাগ হিন্দুরাই যখন নিজেদের ঘর ও বাইরের পরিসরকে পোশাকি আদবকায়দা বা খাদ্যাখাদ্য বিচারের মধ্য দিয়ে বিভাজিত রাখার প্রয়াসের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন রামমোহন বহাল তবিয়তে তথাকথিত মুসলমানি সংস্কৃতিকে নিজের হিন্দু অস্তিত্বের সাথে মিশিয়েছিলেন। পার্সি ভাষায়, আইনে তাঁর পাণ্ডিত্য, মোঘলী রুচির জীবনযাপনে তাঁর আস্থা, তাঁর সমকালীন অনেকের কাছে তাঁকে 'মৌলবী রামমোহন' করে তুলেছিল।[72] মোঘলী রুচি রামমোহনের জীবনাচরণের সাথে এতই ওতপ্রোত ছিল যে, তিনি যখন সমাজে উপাসনার জন্য যেতেন, তখন উক্ত রুচির পোশাকি আদব-কায়দা মেনেই যেতেন, কখনো ধুতি-চাদর পরিধান করে যেতেন না। দ্বারকানাথ ঠাকুর সারাদিন কাছারিতে চোগা-চাপকানের ভার বয়ে সমাজে উপাসনা করতে যাওয়ার সময় কেবল ধুতি-চাদর পরে যেতেন বলে, রামমোহনের অসন্তুষ্টি ছিল। অর্থাৎ রামমোহনের অন্ত-মধ্যযুগীয় পোশাকি পরিশীলনে ধুতি-চাদর ভদ্রতার অনুপযুক্ত ছিল। যেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে ধুতি-চাদর ছিল প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বিষয়াসক্তিকে দূরে ঠেলে নিজেকে নির্ভার করবার মাধ্যম।[73] মোঘলী রুচির পোশাক-আশাক যে একশ্রেণীর কাছে দায়িত্ব-কর্তব্যের

---

[70] ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, 'রাজা রামমোহন: বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি', (কলকাতা: বর্ণপরিচয়, অক্টোবর ১৯৫৯), পৃ ৬৩।

[71] Hem Chandra Sarkar ed., 'The Life and Letters of Rammohun Roy', p. 138.

[72] বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', সুব্রত রায়চৌধুরি সম্পাদিত, (কলকাতা: পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃ ২১।

[73] দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যদিও রাজা সমাজে পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও ধুতি-চাদর পরিয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময় পোষাক পরিয়া যাইতেন। (সমকালীন পোশাকি আদবে ধুতি-চাদর 'পোষাক' পদবাচ্য হয়নি, তাই 'পোষাক' বলতে বোঝানো হয়েছে চোগা-চাপকান-শামলা-জুতোর পরিপূর্ণ সজ্জাটিকে) ... রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্ত রূপ পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত। ... রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি-চাদর পরিয়া গমন করিতেন। রাজা ইহা পছন্দ করিতেন না। ... কিন্তু আমার পিতা সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন যে, সমস্ত দিন আপিসের পোষাকে থাকিয়া আবার সন্ধ্যার সময় পোষাক পরিধান করার কষ্ট ও

ভারবাহী হয়ে উঠেছিল, তা এখান থেকে পরিষ্কার। রামমোহনের বেদান্তচর্চার পরিসরে কিন্তু নন্দকিশোর বসুর (রাজনারায়ণ বসুর বাবা) মতো ব্যক্তিও ছিলেন, যিনি মনে করতেন, "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙঘয়েৎ।" অর্থাৎ জগতকে এক ব্রহ্মের প্রকাশ হিসেবে মেনে নিলেও সেই ব্রহ্মকে অনুধাবণের জন্য পূজার্চনার মতো লোকাচার বর্জনের দরকার নেই। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, নন্দকিশোর বসুর ঘরে 'একটি প্রেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অনুবর্তী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বাটীতে যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন।'[74] নিজস্ব সামাজিক মেলামেশায় দুটো মুখকে একই সাথে বহন করার একটা তাগিদ এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। ব্রাহ্মবাদের বিকাশকালে সমাজের নিজস্ব স্রোতের বিপরীতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় থেকেই হয়ত এই তাগিদ।[75]

তবে রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কালে এদেশীয় তৎকালীন ভদ্রলোকেরা মুসলমানি রীতি-নীতি বড়ই ভালবাসতেন। কারণ সেই রীতিনীতি অনুসরণ ছিল ব্রিটিশ পূর্ববর্তী মান্য সামাজিক শিষ্টাচার। যার রেশ ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকেও ছিল। তৎকালীন সমাজে পার্সি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদেরও নামের আগে 'মৌলবি' উপাধিটা যথেষ্ট সম্মানের হিসেবে পরিগণিত হত। এবং সমাজের গণ্যমান্য হিন্দুর ছেলেদের স্থানীয় মসজিদে গিয়ে মুসলিম সহপাঠীদের সাথে 'বিসমিল্লা রহমানির রহিম' আওড়ে কোরাণ তেলাওয়াত করা আশ্চর্যের ছিল না। কারণ তখন ওটাই ছিল রাজভাষা। সমাজের সর্বস্তরে সেই রাজভাষা, রাজপুরুষের আদব-কায়দার প্রতি প্রকট ও প্রচ্ছন্ন দুরকমেরই সম্ভ্রম ছিল। তবে হিন্দু সমাজের একান্ত অন্দরে নিজস্ব সামাজিকতার একটা আবর্ত মুঘল সাম্রাজ্যের শেষের দিকেও বেঁচে ছিল। তাই রাজনারায়ণ বসুর মুসলমানি আদব-কায়দাপ্রেমী বড় ঠাকুরদাদা যখন একদা ঢিলে পাজামা পরে দলাদলি বা ঝগড়া করছিলেন, এক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেছিলেন, "ঢিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন।"[76] এই বাক্যটির মধ্যে

অসুবিধা ভোগ করিতে পারিনা। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিলে অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত।' দ্রষ্টব্য, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), 'শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৭), পৃ ৩২৮-৩২৯।

[74] রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', (কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯), পৃ ৯।

[75] রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্যেও তার আভাস পাওয়া যায়, 'বর্ত্তমান ব্রাহ্মোরা এপ্রকার আচরণ কপটতাচরণ জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, সকল ধর্ম্ম একেবারে উন্নতিলাভ করে না। ক্রমে উন্নতি লাভ করে । অতএব সে ধর্ম্মের প্রথম অনুন্নত অনুবর্ত্তীদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না।' এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্মরণে রাখতে হবে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবার ব্রাহ্মবাদের আবর্তে আসার আগে থেকেই সমাজে 'পিরালী বামুনে' পরিণত হন, অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যারা পতিত হওয়ার পর এই মতাদর্শের তলে আসেননি, তাদের তো একটা ভীতি ছিলই — যদি সমাজ তাঁদের একঘরে করে! দ্রষ্টব্য, রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', পৃ ৯-১০।

[76] রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', পৃ ৩।

একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে। দেশীয় সমাজের মধ্যেকার তর্ক-বিতর্কে আমল পেতে গেলে সকলকে দেশীয় আদব-কায়দা অনুসারী হতে হবে। অর্থাৎ সেই দৃষ্টিতে ঢিলে পাজামা বিদেশিয়ানার চিহ্ন। সেই চিহ্নধারী দেশীয় ভদ্রলোক যত ভদ্রলোকই হোন না কেন, তাঁর মত কর্ণপাত করাও যেন পাপ – দেশীয় সমাজের বুননকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মৌলবাদীদের দৃষ্টিখানা যেন এরূপ। অবশ্য সমাজে রুচিশীলতার দিক থেকে মৌলবাদী এবং নব্যদের সংঘাতটা শুধুমাত্র যে মধ্যযুগে বা আদি আধুনিক কালে ছিল তা নয়, সেটা উনবিংশ শতকের শেষেও ছিল।[77] বিলাত-ফেরত নব্য শিক্ষিত চাকরিজীবী হলে তো কথাই ছিল না। তার চলন-বলন-পোশাক সবই সামাজিক-পারিবারিক স্ক্যানারে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হত। বিশেষত ইংরেজি সভ্যতার কালীন সুবিধা ভোগে অপারগ পাড়া-প্রতিবেশীর সমালোচনায় টেকা দায় ছিল। ‘একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?’ প্রহসনে যেমন বিলাত-ফেরত সিভিলিয়ান গোপাল বাবু কোট-প্যান্টালুন পরা নিয়ে তার বাবা রামধন বসুর যতটা না মাথাব্যথা তার চাইতে নিবারণ মিত্রের মতন প্রতিবেশীদের বেশী মাথাব্যথা।[78]

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সামাজিক চেতনার পোশাকি বিকাশ:

---

[77] দুর্গাচরণ রায় বরুণের মুখে নব্য রুচিবাগীশ বাঙালি সমাজের সম্বন্ধে বলেছেন, ‘ইহাদের মেজাজ ইংরাজী ধরণের। ইহাদের সভ্যতা ও চাল-চলনও সাহেবী গোছের। অনেকে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাস করেন না, একমাত্র নিরাকার ঈশ্বর স্বীকার করেন; কিন্তু কাজেও তাহা দেখান না।’ অর্থাৎ একদিকে হিন্দু ধর্মের সংস্কারে বিশ্বাসী আবার সমাজ চ্যুতির ভয়ে সেকথা বিশ্বস্ত জন ছাড়া সর্বসমক্ষে বলেনও না। ‘ধুতি চাদর পরিধান ও মাছের ঝোল ভাত অনেকের ভাল লাগে না। হ্যাট কোট পরিধান করিয়া টেবিলে বসিয়া মদ্য-মাংসাহার বেশী পছন্দ করেন। ইহাদের স্ত্রীই সর্ব্বস্ব। অনেকে মাতাকে মাতা বলিয়া পরিচয় না দিয়া বাপের পরিবার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৈতা ফেলা ও ব্রাহ্ম হওয়া একটা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ...’ দুর্গাচরণ রায়, ‘দেবগণের মর্ত্যে আগমন’, পৃ ৫০৩-৫০৪।

[78] বিলেত-ফেরত গোপালের চাল-চলন নিয়ে তাঁর বাবা এবং প্রতিবেশীর মধ্যে কথোপকথন –

রাম । ... [গোপালের] পেনটুলুন ও কোটের প্রতি কিছু বেশী টান। ওটা আর এখন বড় দোষের তলে গণ্য করা যায় না। আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ সহরতলি জায়গায় সাহেবি পোসাক পরা, দাড়ি রাখা, আর নাকে চসমা দেওয়া প্রায় সকলকারই অভ্যাসের তলে পড়েছে, সুতরাং ওটা আর এখন বেচাল বলে ধর্ত্তে পারি না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় কি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মতন দুই এক জন উঁচু দরের পণ্ডিত আজও বাঙ্গালির নরম চাল বজায় রেখেছেন তেমন ক জন ?’

কিন্তু বিলেত-ফেরতার প্রতিবেশীর অভিমত, --

নিবারণ। পেনটুলুন পরুগ তাতে আমার আপত্ত নাই। তার সময় আছে, স্থানও আছে; কর্ম্মস্থলে কি সাহেব সুবোর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পরুগ, আর যাই পরুগ; তাতে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু বাড়ীতে সাহেব সেজে বসে থাকা আমার মতে যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষঃত এই টাটকা বিলেত ফেরত। এখন ধূতি না পরলে হিঁদুর ছেলে না চল্লে, লোকের কাছে বিনয়ী, ঠাণ্ডা না হলে, ঘরে ফিরে লবার পক্ষে ঢের ব্যাঘাত ঘটতে থাকবে।’ অর্থাৎ এককককথায় দেশীয় সমাজে যদি সবাইকে নিয়ে চলার ইচ্ছে থাকে, একঘরে হয়ে বাঁচার ইচ্ছে না থাকে তবে বিলেত ফেরতা বলেই আরো বেশি দেশীয় ভাবধারা পোশাকে-আশাকে মেনে চলা দরকার। নাহলে সমাজ থেকে বিচ্যুত হবার ভয় থাকে। নিবারণ বাবুর বক্তব্যের মধ্যে এই সমাজ বিচ্যুতির কথাটা প্রতিবেশীয় ভদ্রতা মেনে সরাসরি না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে আছে। দ্রষ্টব্য, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত ‘একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?’ (কলিকাতা: সরস্বতী প্রেস, ২য় মুদ্রণ, ১৮৮০), পৃ ২-৩।

পোশাকি রুচিতে পরিবর্তনের সূত্রপাত যে শুধুমাত্র শাসক সমাজের প্রতি আনুগত্য থেকেই ঘটছিল, তেমনটা ভাবলেও ভুল ভাবা হয়। ইংরেজ সমাজ আপন পোশাকি সভ্যতাকে মাথায় রেখে এদেশীয়দের সভ্যতার ওজন মাপতে শুরু করেছিল। সেটাও এদেশীয়দের পোশাকি রুচি পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। মেকলে মিনিটের বাদামি সাহেব তৈরির প্রকল্পের আগে থেকেই, ইংরেজ মিশনারি, আমলা ও বিনিয়োগকারীদের এদেশীয় পোশাকি আদব-কায়দার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হীন দৃষ্টিভঙ্গির অভিঘাতেও এদেশীয়দের পোশাকি রুচিতে পরিবর্তন হয়েছিল। চাঁদপাল ঘাটে নেমে খাস বিলেত থেকে বাংলার ফোর্ট উইলিয়ামে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে আসা স্যার এলিজা ইম্ফে যেমন এদেশীয় মুটে-মজুরদের খালি গা, এবং জুতো-মোজাহীন পা দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "ব্রাদার্স দেখেছো, এদেশের লোকের গায়ে কাপড় নেই। পায়ে মোজা পর্য্যন্ত জোটে না! আমরা কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে প্রত্যেককে জুতো আর মোজা পরিয়ে ছাড়বো।"[79] স্যার ইম্ফের এই বক্তব্যের মধ্যে নেটিভ-দেহকে নিজেদের শাসনের পক্ষে উপযোগী করে তোলার বাসনা ধরা পড়ছে, যাতে পরস্পরবিরোধী দুটি স্বার্থের সংঘর্ষ রোধ করা যায়।

এই বাসনাটিই পরবর্তীতে মিশনারি ও ডেভিড হেয়ারের মতন ইংরেজ বিনিয়োগকারীদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলোতে পরিচ্ছন্নতার ইংরেজি কানুন প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রকট হতে শুরু করেছিল। বিখ্যাত স্কটিশ ঘড়ি প্রস্তুতকারক ডেভিড হেয়ারকে ভারতের আধুনিক শিক্ষার অঙ্গনে অন্যতম স্তম্ভ বলা যায়। তাঁর স্কুলে তিনি ইংরেজি পরিচ্ছন্নতার ধারণাকে মাথায় রেখে উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে ছাত্রদের গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। যা মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিকতার সাথে পরবর্তীতে অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে যাবে। অপরিচ্ছন্নতা হয়ে উঠবে 'অশিক্ষা' ও 'অসভ্যতা'র অঙ্গ। রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, 'যাহাতে বাঙ্গালী বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বেরোতো, তাহা হইলে তাহাকে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন।'[80] স্কুলগুলোতে বাল্যকাল থেকে যাপনের একটা অঙ্গ হিসেবে পাশ্চাত্য এটিকেট অনুসারী পরিচ্ছন্নতাকে আত্তীকরণ করানোর এই ধরণ শিশুমনে আধো শ্রদ্ধা আধো অনীহার মধ্য দিয়েও একটা শৃঙ্খলার বাতাবরণ তৈরি করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।[81] আর এই শৃঙ্খলাই ছিল

---

[79] শংকর, 'কত অজানারে', (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্শ প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৫৯), পৃ ১৬।

[80] রাজনারায়ণ বসু, 'আত্ম-চরিত', পৃ ১৩।

[81] স্কুলের ছাত্রদের পরিচ্ছন্নতা ও পোশাকি ভদ্রতা শেখাতে নানাহ গ্রন্থও লেখা হচ্ছিল। ১৯০৯ সালে সেরূপ একটা গ্রন্থে লেখা হচ্ছে – ' কারসিয়ং ভিকটোরিয়া স্কুলে সাহেবের ছেলেরা পড়ে। স্কুলের সঙ্গে ছাত্রনিবাস আছে, বালকেরা সেইখানে থাকে। তাহাদের মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটা; পোষাক পরিচ্ছদ এক রকমের সামান্য খাকী কাপড়ের; ইহাই ব্রাহ্মচর্য্য, আমাদিগেরও সেকালে ইহাই ছিল। আর এখন আমাদিগের কি হইয়াছে? আমাদের স্কুলের ছাত্রগণ সিঁথির উপর এলবার্ট কাটিয়া, ডবল প্লেট সার্টের উপর হাই কলার আঁটিয়া, চাদরখানি নানারকমের চুনট করিয়া,

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাথমিক সোপান। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আরও অনেকে পরবর্তীতে সভ্যতার সেই প্রথম সোপান বেয়ে যখন আধুনিক শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে পড়তে ঢুকবেন, এবং ডিরোজিওর মতন যুক্তিবাদী শিক্ষকের হাতে পড়বেন, তখন থেকে তাঁদের যুক্তিশীলতার বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি হয়ে ধরা দেবে পোশাক।[82] লালবিহারী দে লিখেছিলেন, ডিরোজীয়ানরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল জ্ঞান পেয়ে আচার-বিচার, পোশাক-আশাকে "unique individual" হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন –"Young Bengal, with his fantastic and ever-varying dress, might have furnished them [the leaders of fashion in London], in his own person, parts of the national costumes of all countries of the world."[83]

কলকাতার নবোত্থিত সাংস্কৃতিক জাগরণে তাঁরা না হয় নিজেদের ভাবাদর্শ নিয়ে উচ্চকিত গোষ্ঠী, যাঁরা দেশীয় সামাজিক নীতি-আদর্শ-ধর্ম বিষয়ে উন্নাসিক হয়ে উঠেছিলেন, এবং সেই উন্নাসিকতার মূর্ত রূপ হিসেবে 'আন্তর্জাতিক পোশাক প্রদর্শনীর' জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েও উন্নাসিক হয়ে যাননি, নিজের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল থেকেছেন আবার সরকারি দপ্তরে সাফল্যের সাথে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও ঔপনিবেশিক পোশাকি পারিপাট্য, পরিমার্জ্জন এবং পরিচ্ছন্নতার আদর্শ প্রবেশ করেছিল। কারণ চাকরি-বাকরিতে যোগদানের সাথে সাথেই তাঁদের হাতে 'untidy, unseemly, dirty' পোশাক না পরে, 'seemly, gentlemanly, clean' পোশাক পরার নির্দেশিকা ধরিয়ে দেওয়া হবে।[84] আর সরকারি

বাঁশবেড়ের কার্ত্তিক সাজিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত। আবার কেহ হয়ত দুই পায়ে দুই রকমের জুতা পরিয়া, লজ্জা নিবারণ হওয়া সুকঠিন --- এরূপ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ধোয়া জামার উপর ময়লা চাদর গায় দিয়া, বড় বড় চুলগুলি পাগলের মত এলো মেলো করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। দুইই দোষের, কিন্তু বিলাসিতায় বালকগণ যত অধঃপাতে যায়, নোংরামীতে তত নয়। বিলাসিতার অন্তরালে কত যে কুৎসিত ভাব লুক্কায়িত থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই বিলাসিতার ভাব বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে।' স্বদেশী সময়কালে লেখা এই উপদেশে নতুন দিকটি হল – যার কাছে বিলাসিতা শিখেছো, তার আরেকটি গুণ যে শিষ্টাচার, তাও শেখো – এই ভাবটিকে ধরিয়ে দেওয়া। দ্রষ্টব্য, শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী, 'বিদ্যালয়-বিধায়ক বিবিধ বিধাণ – বালকবালিকার অধ্যাপক ও অভিভাবকের সাহাযার্থ্যে' (কলিকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, অক্টোবর ১৯০৯), পৃ ৪৬-৪৭।

[82] নতুন শিক্ষা কিভাবে আধুনিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষের বিকাশ ঘটাচ্ছিল, তা বিশদে জানতে দেখতে হবে, Samarpita Mitra, 'Periodicals, Readers and the Making of a Modern Literary Culture: Bengal at the Turn of the Twentieth Century' (Leiden, Boston: Brill, 2020), pp. 1-27.

[83] শ্রীবিনয় ঘোষ, 'নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩, পৃ ৩৩।

[84] Orders regarding the dress of Clerks in Govt. Offices, To- The Secretary to the Board of Revenue, Land Revenue Department; The Secretary to the Board of Revenue, Miscelleneous Revenue Department; All Commissioners of Divisions; All Dist. Officers, Commissioner of Police, Calcutta; Inspector General, Civil Hospitals, Bengal; Sanitary Commissioner, Bengal; Inspector General, Lower Provinces; Inspector General of Jails, Lower Provinces; Inspector General of Rewgistration, Lower Provinces; Director of Public Instruction; Port Officer, Calcutta; Protector of Immigrants; Superintendent of Emigration, Calcutta; Embarkation Agent, Goalundo; Conservator of Forests; Superintendent of Botanical Gardens, Calcutta; Meteorological Reporter, Bengal; Bengali Translator to Government; Accountant General; Director at the Department of Land Records & Agriculture, Bengal; Hindi

দপ্তরে দেশীয়দের জন্য পরিশীলিত পোশাক ছিল চোগা, চাপকান, ট্রাউজার ও প্যাটেন্ট লেদারের বুট। রাজশেখর বসু লিখেছেন, 'উকিল ডেপুটি সাব জজ আর বড় কর্মচারীরা ইজার চাপকানের উপর চোগা বা পাকানো চাদর পরতেন, মাথায় শামলা বা পিরালী পাগড়ি দিতেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে আছে, মহেন্দ্র চাপকান পরে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যেত।'[85] হিন্দু মধ্যবিত্তের বহুল পরিহিত ধুতি-চাদর-চটি উক্ত অফিসিয়াল পরিশীলনের পক্ষে দূষিত এবং নোংরা বলে ভাবা হত। তাই সরকারি নির্দেশনামায় 'dirty' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে নিলেও হবে না, কারণ অফিশিয়াল এটিকেটের অনুশীলনের উপর নিবিড় চোখ রাখলে দেখা যাবে, নোংরা তা'ই যা পাশ্চাত্য শিক্ষিত পরিশীলনের পক্ষে ক্ষতিকারক।[86] সকল মধ্যবিত্তের মধ্যে পোশাকি দূষণের এই ভাবটা প্রবেশ না করলেও পোশাকি পরিচ্ছন্নতার ভাবটা কিন্তু আধুনিকতার বাহ্য-আবরণ হিসেবে প্রবেশ করেছিল।[87]

অনেকেই পরিশীলনের এইসব নব নব সংযোজনে ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব চলন থেকে চিত্তবিক্ষেপকে সমালোচনা করেছেন। কারণ নতুন আমদানিকৃত সভ্যতায় সভ্য হতে গেলে সভ্যতার পাশ্চাত্য মানদণ্ড এবং পশ্চিমা পণ্যের কাছে বিকিয়ে যাওয়াটাও জরুরি ছিল।[88] আর এই

Translator to Govt.; Uriya Translator to Govt., General Depaartment Miscellaneous Branch, Proceeding B. 60, February 1892, West Bengal State Archive, Kolkata.

[85] রাজশেখর বসু, "আমাদের পরিচ্ছদ", রাজশেখর বসু বিরচিত 'চলচ্চিন্তা', (কলকাতাঃ মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৮৮২ শকাব্দ), পৃ ৩।

[86] প্রভাতকুমার সেকালে আইন পেশার সাথে যুক্ত দেশীয়দের পোশাকে পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের বর্ণনা করেছেন, এবং ভারতের আইন ব্যবস্থার ক্ষেত্র যে স্বাধীনতার পরও 'কলোনিয়াল হ্যাঙ্গোভার' কাটাতে পারেনি – তা তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় – 'বাবা উকিল, আদালতে যাবার সময়ে পরতেন উকিলী সাজ। মুসলমানী যুগের চোগা-চাপকান, পায়জামা, মোজা, শামলা বা তাজ পরতে হতো। অনেক সময়ে তার উপর থাকতো পাকানো চাদর। আমাদের সময়ে আদালতে মুন্সেফ বাবু গলাবদ্ধ কোট ও প্যান্টালুন পরে এজলাসে বসতেন। আজকাল দেখি মফঃস্বলের আদালতে হাইকোর্টের জজদের অনুকরণে সাদা কলার পরে বসেন মুন্সেফবাবুরা। ভারত স্বাধীন হবার পর আজও দেখি চীফ জাস্টিস পর্যন্ত মাঝে মাঝে মাথায় পরচুলা পরে বসছেন। নূতন রাষ্ট্রপালকে oath বা শপথবাক্য পড়াচ্ছেন ঐ অপরূপ সাজে। এই ছবি দেখলে আমার তো হাসি পায়। ইংরেজ গিয়েছে, 'আংরেজি হঠাও' বলে আর্তনাদ করছি, অথচ অন্তরে-বাহিরে আমারা যে ইংরেজিয়ানায় ভরা – তা বুঝতেই পারিনি।' দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১১১।

[87] তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর মেশোমশায়ের পরিবারের পোশাকি পরিচ্ছন্নতা তাকে কিভাবে আকৃষ্ট করত, সেবিষয়ে লিখেছেন, 'গোটা বাড়িটাতেই একটা পরিচ্ছন্ন গোছানো ভাব ছিল। বাড়ির প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট স্থানটিতে থাকত ... বড় থেকে ছোট পর্যন্ত প্রত্যেকের কাপড় জামা ধবধবে পরিষ্কার থাকত। প্রত্যেকের নিজের গায়ে মাখা সাবান এবং কাপড়ের সাবান থাকত। গামছা রুমালে নিত্য সাবান দিতেন নিজে নিজে। প্রত্যেকের জুতোজোড়াটির পালিশ থাকত আয়নার মতো চকচকে। জামাকাপড়ে মহার্ঘতা ছিল না কিন্তু পরিচ্ছন্নতায় এবং শুভ্রতায় ছিল চোখজুড়ানো।' দ্রষ্টব্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা', প্রথম খণ্ড, পৃ ২৫৬।

[88] 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন'এ দুর্গাচরণ রায় ব্রহ্মা চরিত্রের বক্তব্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা গায়ে ধারণ করতে গিয়ে বাঙালির ষোলো আনা ব্যয়ের মধ্যে বাঙালির পতন দেখেছেন, 'দেখ বরুণ, বাঙ্গালীদের সত্বরেই পতন হবে।

সভ্যতা ধীরে ধীরে স্কুলের আদর্শবান ছাত্রদের হাত ধরে এবং ইংরেজি শিক্ষাকে দেশের ভবিষ্যত হিসেবে ধরে নেওয়া পরিবারগুলির হাত ধরে বা সরকারি কাজেকম্মে নিযুক্ত নেটিভ কর্মচারীদের হাত ধরে কলিকাতার শহরতলি গ্রাম-মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন হেয়ার সাহেবের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ‘The First Book of Reading for Native Children’ নামক বিখ্যাত টেক্সট বই লেখক প্যারীচরণ সরকারের হাত ধরে কলকাতার অনতিদূরে জিলা সদর বারাসতে সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঊষালগ্ন থেকেই তৎকালীন জুনিয়র পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হতেন। শিক্ষায়-আদব-কায়দায় সেখানকার ছাত্ররা ইংরেজ রাজপুরুষ ও ধর্মযাজকদেরও প্রশংসা অর্জন করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের মূল কারণই হল, যে সভ্যতার প্রকল্প ইংরেজদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল, তা কিভাবে নেটিভ শিক্ষিতদের মাধ্যমে নগর কেন্দ্রের বাইরেও বিকশিত হচ্ছিল তা বোঝানো।[89] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

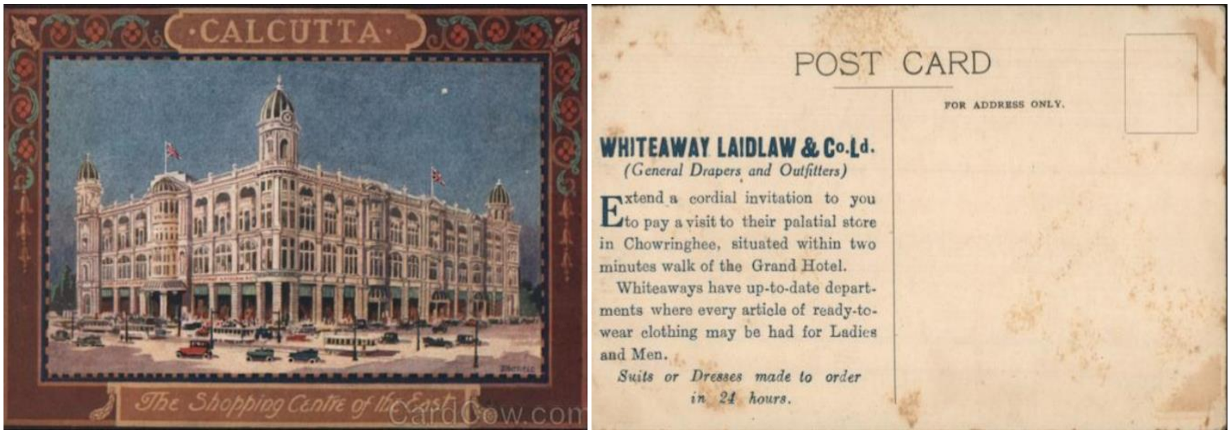

চিত্র ৪.১: Whiteaway Laidlaw, Calcutta’ থেকে বিলিতি রুচির পোশাক অর্ডার দেওয়ার পোস্টকার্ড (সূত্র: cardcow.com)

ইহারা যেরূপ বিলাসপ্রিয় হইয়াছে, আহাতে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সত্বরেই ইহাদের পতন হইবে। নচেৎ এক পয়সায় ডাব পাঁকে পুঁতিয়া রেখে খেয়ে ধাত ঠাণ্ডা করিবার যে পদ্ধতি আছে, তৎপরিবর্তে দু’ আনা চার আনা ব্যয়ে যাবনিক জলপানে অগ্রসর হইবে কেন? (অর্থাৎ লেমনেড ও সোডা ওয়াটারের কথা বলা হচ্ছে) আমি দেখিতেছি, আমার বাঙ্গালীদিগের সকল বিষয়েই প্রিবর্তন ঘটিয়াছে। তারা নাগরা জুতা পরিত্যাগ ক’রে বুট, দেশী ধুতি পরিত্যাগ ক’রে বিলাতী, এবং বালাপোসের পরিবর্ত্তে শাল জামিয়ার গায়ে দিতে শিখেছে। যে জাতি অল্প আয়ে এত বাবু হয়, তাদের যে শীঘ্র পতন হবে, তা তুমি কি স্বীকার কর না?’ দ্রষ্টব্য, দুর্গাচরণ রায়, ‘দেবগণের মর্ত্যে আগমন’, পৃ ১৯৪-১৯৫।

[89] ধর্মযাজক W. Dunber ১৮৫৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী এ স্কুলের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “I visited the Baraset English School this day, and spent some time in hearing the boys of some of the classes read prose and poetry, explaining the sense of the words and passages when required. I had previously heard a very good account of the school , and I have much pleasure in stating that I find every reason to think the high character the school has attained under its present able Head Master, Baboo Peary Churn Sircar, well deserved.” দ্রষ্টব্য, শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, ‘প্যারীচরণ সরকার: জীবনবৃত্ত’, (কলিকাতা: এলম প্রেস, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ), পৃ ৪৮, ১৬৫।

ছেলেবেলা যেমন কলকাতার বাইরে রানাঘাটে কেটেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও শিষ্টাচারের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠতে উঠতে, ছোটোবেলা থেকেই বিলিতি জিনিসের প্রতি আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল তাঁর এবং তাঁর সহোদর-সহোদরাদের। তাই সেই রানাঘাট থেকেই কলকাতার নিউমার্কেট চত্বরে অবস্থিত সাহেবের দোকান Whiteway Laidlaw তে তাঁদের বাবা চিঠি দিয়ে ক্যাটালগ আনাতেন (ছবি ৪.১ দ্রষ্টব্য)। সেই ক্যাটালগে বিভিন্ন স্টাইলের পোশাক, টুপি, ফ্রক, নেকটাই-এর বিজ্ঞাপন থাকত, এমনকি নানাধরনের ছিটের কাপড়ের টুকরোও নমুনা হিসেবে আঁটা থাকত (ছবি ৪.২ দ্রষ্টব্য)। একবার 'বাবা পছন্দ করে দুই ভাইয়ের জন্য অর্ডার দিলেন 'সেলর স্যুট' বা নাবিকের পোশাক [ছবি ৪.৩ দ্রষ্টব্য]। কয়েকদিন পরে রেল পার্সেলে এলো একটা টিনের বাক্স। বাক্স কেটে বের হলো নাবিকের

চিত্র ৪.২: Whiteaway Laidlaw-এর ক্যাটালগের একটি বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা (সূত্র: advertisingarchive.asia)

পোশাক – প্যান্টালুন, গ্যালিস, কোট, মোজা, টুপি। টুপিতে লেখা H.M.S. অর্থাৎ হিজ ম্যাজিস্টেস শিপ-এর আমরা নাবিক। দুই ভাই হাত ধরাধরি করে বের হই পথে – আমরা স্বতন্ত্র এই বোধ হয়েছিল সেদিন।'[90] ছবি ৪.৩-এর দিকে চোখ দিলেও আমরা প্রভাত কুমার বর্ণিত পোশাকগুলিকে

---

[90] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ৬১-৬২।

বিশ শতকের মধ্যভাগে এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'কাউ-বয় সুট', 'মিকি-মাউস সুট', 'প্যান্টি' (অর্থাৎ হাফ-প্যান্ট), নানা রঙবেরঙের গেঞ্জি বা নিটেড ওয়্যার, আর ছেলে আরেকটু বড় হলে তার জন্য ভেল্‌ভেটের ফুল-প্যান্ট, সিল্কের শার্ট (সেই শার্টের নানা নাম –টেনিস, ডবল কফ, স্পোর্টস), আর মার্কিন ঢঙের টাই। লেখক বলছেন, সেই টাইতে কখনো ছাপা আছে ফুল, কখনো ফল, কখনো বা ম্যামের মুখ। দ্রষ্টব্য, শিলাদিত্য, 'বস্ত্র-সঙ্কীর্তন', বসুধারা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭।

বুঝতে পারি। ছবির ডানদিকে উপবিষ্ট শিশুটি যেমন সেলর-কলার দেওয়া স্যুট পড়েছে, সাথে সাথে নি-প্যান্ট (বর্তমানকালে হাফ-প্যান্ট হিসেবে পরিচিত), লং-শক্স ও লেদার বুট, বাম দিকে উপবিষ্ট শিশুটির পরনে ওয়েস্টকোটের উপর ওভারকোট, গলায় নেকারচিফ জড়ানো, অধোবাস হিসেবে আছে নিকারবুকার প্যান্ট (হাঁটুর কাছে টাইট, কিন্তু উপরের দিকে ফোলানো প্যান্ট), লং শক্স ও লেদার বুট। আবার ছবি ৪.৪-এ বয়স অনুপাতে শিশুদের পোশাকে দেশী ও বিলিতি এবং বিশ্বের অন্য প্রান্তের পারিচ্ছদিকতার একটা মিশ্রণ দেখা যাচ্ছে। মধ্যিখানে চেয়ারে উপবিষ্ট শিশুটির পায়ে হাঁটু অবধি বিস্তৃত মোজা, গায়ে হাঁটু অবধি ঝুলের প্রাচ্যদেশীয় টিউনিক, মাথায় ক্যাপ।[91] তার ডান দিকে উপবিষ্ট তার চাইতে খানিক বয়সে বড় শিশুটির পায়ে বুট, অধোবাস নি-প্যান্ট, গায়ে চায়না-কোট (কলার-ছাড়া), মাথায় স্কুল ক্যাপের ন্যায় টুপি (যা অনেকটা প্রাচ্যদেশীয় ক্যাপের মতন)। আর বাম দিকে দুজন অপেক্ষাকৃত কিশোরের পরনেও চায়না কোট, অধোবাস লম্ব-কোঁচা ধুতি, কিন্তু জুতো প্যাটেন্ট লেদারের সু। অর্থাৎ এসব শিশুদের শরীরে চিনা রুচি, মোঘলী রুচি ও দেশীয় রুচি এসে বিলিতি শিষ্টাচারের অনুবর্তী হয়ে মিশেছে। এজন্যই বলছি যে, এই বিচিত্র পোশাক বিলিতি শিষ্টাচারের অনুবর্তী হয়ে মিশেছে – কারণ ভিক্টোরীয় পোশাকি শিষ্টাচারের রেখে-ঢেকে পোশাক পরার আদর্শ কিন্তু কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উনিশ শতকের ৮০-র দশকের আগে থেকে তো কলকাতায় নানান খুচরো বিলিতি কোম্পানি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাজার থেকে পোশাকের আমদানি করে বাচ্চাদের পোশাকে একটা মিশ্রণ তৈরি করেছিলই, কিন্তু ১৮৮২ সাল থেকে কলকাতায় মধ্যবিত্তের ঘরে এসব পোশাক পৌঁছে দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে Whiteaway Laidlaw-এর মতো Departmental store, বর্তমানকালের নিরিখে যাকে শপিং মলের সাথে তুলনা করা যায়। ১৮৮২ সালে কলকাতা থেকে Whiteaway Laidlaw-এর যাত্রা শুরু হলেও, ১৯০৫ সালে এসপ্ল্যানেডের মেট্রোপলিটান বিল্ডিঙ তৈরির পর, সেখানেই এর পসার জমে। সত্যজিৎ রায়ের ছোটোবেলাতে এই departmental store-এর বিলিতি খেলনা তাঁকে মোহিত করেছিল।[92] ১৮৯০-এর দশক থেকে Whiteaway Laidlaw-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হিসেবে উঠে আসে Hall & Anderson-এর উদ্যোগে General Departmental Store, যারা শুধুমাত্র পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়েই কারবার করত না, তাদের কারবারে

---

[91] মহেন্দ্রনাথ দত্ত একে ‘বনাতের কোট-ক্লোক’ বলেছেন, যা বাচ্চাদেরকে শীতকালে দোলায়ের পরিবর্তে পরানো হত, কারণ, ‘কাপড়ে আগুন লাগিয়া যাইবার ভয় ছিল।’ তিনি বনাতের কোট-ক্লোকের যে বর্ণনা দিয়েছেন, ‘...একটা বনাতের ঘেরা, সেইটা সমস্ত শরীরকে আবরণ করিত এবং গলাতে মখমলের পটি এবং সেই জায়গায় একটা পিতলের বাহারী আংটি দিয়া বন্ধ হইত।’ আগুন লাগার ভয়ই যদি কেবলমাত্র এই পোশাক পরানোর কারণ হত – তবে আরও ছোট চাপকান-চুড়িদারের মতো পোশাকও তো পরানো যেত, কিন্তু এই পোশাক পরানো হল, তার কারণ কালীন ফ্যাশনের হাওয়ায় মধ্যবিত্তের সঞ্চরণশীলতা। কিন্তু সব বাচ্চাদের যে এই পোশাক ভাল লাগত – তা বলা যাবে না। মহেন্দ্রনাথ এ পোশাক বিষয়ে তাঁর বাচ্চাবেলার অনুভূতিও লিখেছেন, এ পোশাকে ‘হাত নাড়িবার উপায় ছিল না, এই জন্য ক্লোক দেখিলে আমাদের বড় ভয় হইত।’ দ্রষ্টব্য, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, জামা পিরাণ, ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’, (কলিকাতাঃ মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫ই অক্টোবর), ১৯৭৫; পৃ. ৬।

[92] সত্যজিৎ রায়, ‘যখন ছোট ছিলাম’, (কলকাতা: আনন্দ, চৈত্র ১৪১৫), পৃ ২১।

ছবি ৪.৩: পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচারে সজ্জিত বাচ্চারা (@CSSSC_archive)[93]

ছবি ৪.৪: বাচ্চাদের মিশ্র-রুচির পোশাক (@CSSSC_archive)[94]

ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে, থালা-বাসন, কাচের জিনিসপত্র, জুতো, কাপড়-চোপড় সবকিছুই ছিল। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দিকে এদেশের পরিবর্তনমান রুচির সাথে পাল্লা দিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের রমরমা বেড়েছিল।[95]

---

93 "Bulbuli, Khoka, Riju", Studio Photograph, Y-127, Sevati Mitra Collection, CSSSC Archives, Jadunath Bhavan, Kolkata.

94 "A Group of Children", Bengal Photographs, I-8, Siddhartha Ghosh Collection, CSSSC Archive, Jadunath Bhavan, Kolkata.

সাত সাগর তেরো নদী পেরিয়ে একটা দেশে বণিক হিসেবে আসা এবং, সেখানে রাজত্ব কায়েম করার মধ্যে যে চরিত্রবল এবং সাহসিকতা লাগে – তা সেকালীন পিতা-মাতাকে চেতনে-অবচেতনে মোহিত করত।[96] ১৮৮৬ সালে ডা. আশুতোষ মিত্র বলেছিলেন – সাগর পেরুনোর মতন ঝক্কি বাঙ্গালির মতো ঘরকুনোদের জন্য নয়। তা কেবল ইংরেজরাই পারেন।[97] আর তাই তাঁদের পোশাক বা তাঁদের কোম্পানির দ্বারা সাগর পেরিয়ে আনা পোশাকও যেন শ্যিভলরির দ্যোতক হয়ে উঠতে থাকল। সেই পোশাক পরিচ্ছদের একটা এক্সটিক মূল্য সেকালের বাবাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল বলেই হয়ত তাঁরা সন্তানদের সেইসব পোশাকে সাজাতে চাইতেন। আর সেই এক্সটিকা এদেশীয় বামুনদের ব্রাহ্মণত্বের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ‘যে আচারের ঘর, আছার মারলেও ভাঙ্গে না’, সেই আচারের ঘরে ফাটল লাগিয়ে দিল। বামুনের সন্তানও তাই সুট-বুটে গৌরব অনুভব করতে শুরু করল, যারা একদা সাত্ত্বিকতার কঠিন জালে ‘জাত’ নামক একটা কল্পনাকে সচল রেখে, নিজেদের আর্থিক-সামাজিক প্রতিপত্তিকে একদা রক্ষা করতেন।[98] তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘... আমার চুল মানত ছিল বাবা বৈদ্যনাথের কাছে। সেই চুল মানত দিতে গেলাম আমি বিচিত্র পোশাকে। সার্জের সুট পরে মাথায় বেড়া বিনুনি বেঁধে, তার উপর একটা নাইট ক্যাপের মতো টুপি এঁটে। ... চুল বেঁধে সুট পরে টুপি মাথায় দিয়ে বেশ গৌরব অনুভব

---

[95] Christine Furedy, ‘Development of Modern Elite Retailing in Calcutta, 1880-1920’, *The Indian Economic and Social History Review,* Vol. XVI, No. 4.

[96] ছেলেপুলের বিলিতি রুচি-বিলাসে ইন্ধন দিতে গিয়ে অনেক বাবা-মায়েরা বক্রপথে তাদের মানবিক শিকড়কে ছড়ানোর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফল পরবর্তীতে বাবা-মাকেও পোহাতে হয়েছে, তার প্রমাণও বিংশ শতকের নানা গল্প-কথায় পাওয়া যায়। ছেলেকে সভ্যতারূপী দেখনদারীর প্রতিযোগিতায় সামিল করানো এক মায়ের আর্তনাদ তুলে ধরেছেন বনফুল তাঁর রচনায়, “একমাত্র ছেলে আমার। কত কষ্ট ক’রে যে মানুষ করেছি। যখন যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। তার আকাঙ্খা মেটাবার জন্যে আমার যা কিছু ছিল, সব গেছে। শুনেছ কখনও তেরো বছরের ছেলে হাতে রূপোর হাত-ঘড়ি বেঁধে ইস্কুল যায়? শুনেছ কখনও, যে ছেলে একটাও পাশ করতে পারেনি, তার রোজ রোজ নতুন পোশাক চাই? কত রঙের কত ধরণের পাঞ্জাবি যে তার কিনে দিয়েছি! কত রকমের জুতো, কত রকমের ছড়ি! গ্রামের ইস্কুলে তার পড়তে মন হ’ল না। শহরে গেল।” ফলত বিশ্ব-প্রকৃতির স্থুল ভাবে নিবিষ্ট ছেলে মাকে কি দিল। দিল মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্মতাহীন একরাশ গঞ্জনা। তাই মা যখন প্রশ্ন করে, “নিজের পেটের ছেলে যখন মদ খেয়ে এসে জুতো মারে, তখন মায়ের মনে যে কি হয়, তা বোঝবার তোমার ক্ষমতা নেই।” তখন আসলে নিজের অজান্তেই মা নিজেকে ধিক্কার জানায় – সন্তানকে বস্তুগত দেখনদারীতে ডুবে থাকতে দিয়ে মানবিক সূক্ষ্মতায় দিতে পারলাম না। দ্রষ্টব্য, বনফুল, ‘বৈতরণী-তীরে’ (কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৫৩), পৃ ৪৯।

[97] আশুতোষ মিত্র, ‘ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ’, (কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১২৯২ বঙ্গাব্দ), পৃ ২।

[98] আধুনিকতার অভিঘাতে বাংলা দেশের বামুন-পণ্ডিতদের পাল্টে যাওয়া বেশভূষা বেশভূষা নিয়ে রাজশেখর বসুর পর্যবেক্ষণ ‘ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা পরতেন ধুতি, কোরতা বা খাটো আঙরাখা, চাদর আর চটি, অনেক সময় শুধু ধুতি চাদর চটি। কোরতার বোতামের বদলে ফিতা থাকত, ঝুল কোমর পর্যন্ত। খাটো আঙরাখার গড়ন চাপকানের মতন কিন্তু ঝুল নিতম্ব পর্যন্ত।’ অর্থাৎ সাত্ত্বিক আচরণের সময় সেলাই বিহীন পোশাক ও এমনিতে সেলাই-করা পোশাক – আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা –আধুনিকতার এই সূত্রটি ততদিনে তাদের বোধে চলে এসেছিল। দ্রষ্টব্য, রাজশেখর বসু, “আমাদের পরিচ্ছদ”, রাজশেখর বসু বিরচিত ‘চলচ্চিন্তা’, (কলকাতা: মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৮৮২ শকাব্দ), পৃ ৩।

করেছিলাম; একটি শিশুর আধুনিকত্বের গৌরবে যতখানি স্ফীত হওয়া সম্ভবপর তা সেদিন হয়েছিলাম আমি।’[99]

শ্যিভলরির এক্সটিক মূল্য তৈরি হলেও, সেই এক্সটিকার দৌঁড় কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল পোশাক-পরিচ্ছদে প্রদর্শন পর্যন্তই। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকিত সন্তানেরা চাকরি-বাকরি করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করুক – সেকালের বাবা-মায়েদের স্বপ্ন ছিল এমনই। আর এই স্বপ্নের আবাদ যতই বেড়েছে, ততই এদেশীয়দের মধ্য থেকে ব্যবসার মানসিকতা দূরীভূত হওয়াতে এদেশের বাজারে বিলিতি পণ্যের আনাগোনাও সাবলীল হয়ে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিলিতি সভ্যতা বিষয়ে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্বোধনের পর অনেকেই বিলিতি সভ্যতার ক্ষয়কারী দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, এদেশের পুরাতন বর্ণব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে যতই দুর্বল হয়েছিল, ততই চাষা থেকে শুরু করে তন্তুবায়ের ছেলেপুলের কাছেও ইংরেজি শিখে চাকুরি করাটাই সভ্যতার একমাত্র সোপান হয়ে উঠল। ফলত সেই দেশীয় হতোদ্যমের উপর বিদেশি বিনিয়োগের বেসাতি শুরু হতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।[100] অর্থাৎ ভুবনচন্দ্রের মতানুসারে, আধুনিকতার ভুলভুলাইয়াতে এদেশীয়দের টেনে নিয়ে বিলিতি উপনিবেশ মধ্যবিত্ত মননের পরিসর যতই প্রসারণ করেছে, ততই পাশ্চাত্য পণ্য নির্ভরতার সাথে আধুনিকতার প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ রচিত হয়েছে এবং এদেশে ইংরেজদের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটেছে।[101] মানবিক জীবনবোধের বিকাশ স্থম্ভিত হয়ে দেখনদারীত্বে হড়কে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় –

> ...অধুনা বিদেশী ব্যবসায়ী লোকেরা আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়ীর ব্যবসা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এদিকে আবার শিক্ষা-সংক্রান্ত উদার-নীতি-প্রভাবে সর্ব্ব জাতীয় লোকেরাই ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখিবার অধিকার পাইয়াছে। ব্যবসায়ী লোকের সন্তানেরা, -- এমন কি কৃষক সন্তানেরা পর্য্যন্ত কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ইংরাজী

---

[99] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা’, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৭।

[100] মুকুন্দ দাস ‘পল্লীসেবা’তে লিখেছেন, “আজ বাঙালী সকল ব্যবসা বাণিজ্য হতে বিতাড়িত, তার কারণ সে সততা হারিয়েছে – যেইটে বাঙালী জাতির বিশেষত্ব ছিল; কলকাতার দিকে চেয়ে দেখো, বাঙালী ধুতি চাদরে বাবু, কেরাণীর দল, টাকা দেয় (অর্থাৎ কেনে)। কিন্তু যারা কুড়িয়ে নিচ্ছে, তারা সবাই বিদেশী। চৌতালায় বসে তারা বাঙালীর অবস্থা দেখে খিল-খিল করে হাসছে। -- গরুর গাড়ীর গাড়োয়াঙ্গুলি পর্যন্ত হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ। আর দু’চার বছর পরে এ’কলকাতায় তোমরা একটী বাঙালীকেও দেখতে পাবে কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।” অর্থাৎ কলকাতার ব্যবসা-বিমুখ বাঙালি চাকরির খোঁজে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। দ্রষ্টব্য, মুকুন্দ দাস, “পল্লীসেবা”, কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত ‘সরস সার কথাঃ রবীন্দ্রযুগ ১৮৬১-১৯০০’ (কলিকাতা: গ্রন্থগৃহ, ১৩৫৩), পৃ ১৭৩।

[101] শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ‘বঙ্গরহস্য – বঙ্গসমাজের বর্তমান প্রকৃতির আলোচনা, ১ম ও ২য় খণ্ড’, (কলিকাতাঃ বসুমতী প্রেস, ১৯০৭), পৃ ৪৯-৫০।

আফিসে কেরানীগিরি করিতে ধাবিত হইতেছে, জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতি ঘৃণা করিতে শিখিতেছে, জাতীয় ব্যবসায়ে কষ্ট অধিক, শ্রম অধিক, অথচ লাভ অল্প, কেরানীগিরিতে ততটা কষ্ট অথবা পরিশ্রম নাই, রম্য হর্ম্ম্যতলে চেয়ারে বসিয়া, টানাপাখার বাতাস খাইয়া, ইংরাজী অক্ষর নকল করিতে পারিলে স্বচ্ছন্দে মাসে মাসে বেতনলাভ হয় ... এই কারণে দিন দিন জাতীয় ব্যবসায়ের অবনতি হইতেছে। বিদেশীয়েরা যাহার উপর হস্তার্পণ করেন নাই, তাদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়েও দেশীয় ব্যবসায়ীর সন্তানের আর প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং সংসার-ব্যবহার্য্য সামান্য সামান্য দ্রব্যও বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছে, দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, অনুর্ব্বরা বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞলোকেরা মাতৃভূমিকে গালাগালি দিতেছে। দেশের লোকে চাকরী করিতেছে বটে, কিন্তু চাকরীর টাকায় সকলের সংসার খরচের ব্যয়-সংকুলান হইতেছে না, সকল দ্রব্যই মূল্য দিয়া খরিদ করিতে হয়, ... তাহার উপর আবার দেশের লোকের বিলাসিতা বাড়িয়াছে। চাকরী করিলেই বিলাসী হইতে হয়, সর্ব্বদা ফিটফাট থাকিতে হয়, ভাল ভাল পোষাক পরিতে হয়, অঙ্গে এসেন্স মাখিতে হয়, অবস্থাবিশেষে কিম্বা অবিশেষে ঘড়ী-চেন ব্যবহার করিতে হয়, দিব্যচক্ষু থাকিতেও চশমা পরিতে হয়। ...[102]

আবার 'আবগারীর সেবা করা একটী সভ্যতার অঙ্গ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই 'যাহারা ইংরাজী শিক্ষা করে, তাহারা সভ্য হয়, যাহারা চাকরী করে তাহারা সভ্য হয়; সভ্য হইলেই সভ্যতার অঙ্গটী অঙ্গভূষণ করিয়া লইতে হয়।' অর্থাৎ শুধু ইংরেজি শিক্ষিত হয়ে, চাকরি করে শিক্ষিত হলেই হল না, তার সাথে সাথে সভ্যতার কালীন চিহ্নগুলোও বাইরে ঝুলিয়ে রাখা চাই। তাই চাই নতুন নতুন পোশাক, সময়ানুবর্তিতা জানান দিতে চাই ঘড়ি, পাঠপ্রিয়তা জানান দিতে চাই চশমা, এবং উল্লাস জানান দিতে চাই মদ্য। ভুবনচন্দ্র এসবকে সভ্যতার চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন।[103]

---

[102] তদেব, পৃ ৪৯-৫০।

[103] কাটীরাম ঠাকুর বলেছেন, বর্ত্তমান কালের তেড়িকাটা, তের ঘিরে ঝুলের পিরাণধারী, পমেটম মাখা ও এষ্টাকিন পায় বি এ ক্লাসের কোন যুবার সঙ্গে গিয়ে কথা কহ, সে প্রথমে এমন করিয়া তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবে যে, তাহার কথার প্রত্যেক বর্ণকে যেন অমৃতাভিষিক্ত বলিয়া যেন তোমার প্রতীতি হইবে; তার পর ক্রমে ক্রমে তুমি আলাপ করিতে যত অগ্রসর হইবে, ততই ভুঁতুড়ী বেরিয়ে পড়িবে, তখন পরিষ্কার রূপ সব দেখিতে পাইবে এবং ঐ সভ্যকে একটী আস্ত ভূত বলিয়া তোমার প্রতীতি হইবে। এখনকার নব্য সম্প্রদায় দেশীয় প্রাচীন রীতিনীতির মধ্যে যেগুলি আদরণীয় ও গ্রাহ্য সে গুলি পরিত্যাগ করিয়া, অন্যদেশীয় নিন্দনীয় রীতিগুলি গ্রহণ করিলে লোকে কীরূপে সন্তুষ্ট থাকিবে? যাঁহারা এখনকার সভ্য এবং সভ্য বলিয়া যথেষ্ট দাবি রাখেন তাঁহারা পেটে না খাইয়াও কোনরূপে একটা তেরগিরে পিরাণ ও একজোড়া মোজা কিনিয়া চৈত্র মাসে বেলা দুই প্রহরের সময়ে ঐ মোজা পায় দিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন, বৃদ্ধ পিতা-মাতা অন্নাভাবে বাড়িতে হাহাকার করিতেছেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না; এ অবস্থা দেখিয়া লোকে কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিবে?' দ্রষ্টব্য, কাটীরাম ঠাকুর প্রনীত 'আটাকাটি', (কলিকাতা: সংস্কৃত প্রেস, ১২৯১), পৃ ১২-১৩।

সমাজের চিত্তও এই বাহ্যিক দেখনদারীত্বে হড়কেছে বারবার। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে জটাধর ভট্টাচার্য্য চরিত্রের উপর ভর করে সেই কালীন সত্যকে এঁকেছেন। যিনি কিনা ১৮৭০ এর দশকে নিজ গ্রাম ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন আধুনিক জীবন ও আরও প্রতিপত্তির খোঁজে এবং ১৮৭৬ সালে সাজে-পোশাকে চেহারার জৌলুসে নতুন মানুষটি হয়ে গ্রামে ফিরেছিলেন।[104] যে নতুনত্ব তাঁকে গ্রাম্যসমাজের নিজস্ব ধারা থেকে এতই পৃথক করে দিল যে, ইচ্ছে থাকলেও গাঁয়ের আর পাঁচজন তার সাথে আগের মতন মিশতে পারেনি এবং এই সম্ভ্রমটিকে জটাধর বেশ তাড়িয়ে উপভোগও করেছেন।[105] এমন উদাহরণও আছে – যেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, পাশ্চাত্য জীবনশৈলী গ্রহণ করে, পাশ্চাত্যের ধর্মে অনুরক্ত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েও অনেকে স্বদেশীয় সমাজে নিজের জাত-গরিমাকেও নস্যাৎ করতে পারেননি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েও এক বক্তৃতায় বলেছিলেন "I am a Brahmin Christian." রাজনারায়ণ বসু এই সূত্রে বলেছেন, শিক্ষা-দীক্ষায় শত উদারতা সত্ত্বেও আজন্ম লালিত সংস্কার মানুষের মধ্যে রয়েই যায়, সামান্য অচেতন হলেই তার প্রকাশ ঘটতে পারে।[106] বিংশ শতকের শুরু থেকে কলকাতা হাইকোর্টে জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী, ভারতপ্রেমী হিসেবে পরিচিত জন উডরফ মহাশয় বলেছিলেন, এই সংস্কারগুলোকে থাকতে দেওয়াই উচিত। তবে দেশীয় সমাজে ধর্মান্তরিতদের অন্তর্ভুক্তি হবে, তাদের অন্তত সমাজচ্যুত হতে হবে না। তাঁর মতে, খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরণের পর কোন দেশীয় ব্রাহ্মণকে যদি খ্রিস্টানত্ব বোঝাতে ধুতি-পৈতে-চাদর-চটি ছেড়ে কোট-প্যান্টালুন-বিফ ধরতে হয়, তবে দেশীয় সমাজে তার স্থিতি হয় বামুন থেকে একদম শূদ্রত্বে, আর ধর্মান্তরিত হিসেবে জন্মগতভাবে খ্রিস্টান ইউরোপীয় সমাজেও যে তাদের খুব সম্মান দেওয়া হয় – তেমনটা বলা যাবে না। দক্ষিন ভারতে ইতালীয় ধর্মপ্রচারক জেসুইত ডি নবোলির কথা

---

[104] তারাশঙ্করের ভাষায়, 'গৃহত্যাগ করেছিল সে ১৮৭০ সালে ফিরল ১৮৭৬ সালে। এই ছবৎসরে সে কলকাতায় যাকে বলে পাঁচজনের একজন হয়ে বসেছে। বাড়ির জন্যে জায়গা কিনেছে। একখানি তৈরি বাড়িও কিনেছে। মস্ত ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। জটাধরের চেহারাতে জলুস ধরেছে। ভটচাজবাড়িতে সন্তানের রূপ বংশানুক্রমিক সম্পদ। জটাধর নাম হলেও জটাধর কোনো জটাধারীর মতো ধূসর মলিন ছিল না কোনো কালেই; এখন সে ছোট বড় চুল ছেঁটে [ছোট বড় বা ছ আনা দশ আনা চুল ছাঁটাই তখন সবে উঠেছে] বাঁদিকে সিঁথি কেটে চুল ফিরিয়ে শক্তকফ শার্ট গায়ে তার উপর ওয়েস্টকোট চড়িয়ে – পায়ে হুড বার্নিশ চীনে-বাড়ির স্প্রিং দেওয়া জুতো পরে কিছু একটা সুবাস ছড়িয়ে গোবিন্দপুরকে চঞ্চল করে দিয়ে নিজেদের বাড়ি ঢুকেছিল। গ্রামের প্রবেশ-পথ থেকেই তার পিছনে ছেলেপুলের দল ছুটে গিয়েছিল।' দ্রষ্টব্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শতাব্দীর মৃত্যু, ১ম খণ্ড', কলকাতা, ১৯৬০, পৃ ১০।

[105] গ্রামের 'প্রবীণেরাও সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু চেহারাটা পোশাকে জলুসে এমনই তাদের সঙ্গে পৃথক বর্ণ পৃথক গোত্র পৃথক জাতির মানুষ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা ইচ্ছে থাকলেও তাদের গ্রামের নিজস্ব খাস এলাকার মধ্যেও পল্লীগ্রামের একচেটিয়া অধিকারের প্রশ্নও তাকে করতে পারেনি। প্রশ্ন করতে পারেনি --- "মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের নাম? কোথায় যাওয়া হবে?" অথবা সমাদর দেখিয়ে বলতে পারেনি --- একবার তামাক ইচ্ছে করবেন কি? এই সত্যটুকু জটাধর বুঝতে পেরেছিল। এবং সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের গাম্ভীর্যকে আরও গুরুতর ও থমথমে করে তুলে মনে মনে কৌতুক অনুভব করতে করতেই ভটচাজবাড়ির খামারবাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল।' দ্রষ্টব্য, তদেব।

[106] রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (কলিকাতাঃ কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯), পৃ ২৮।

বলেছেন তিনি, যিনি কিনা দক্ষিণ ভারতীয় বর্ণ বিভাজিত সমাজে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য পৈতে ধারণ করে বামুনের মতো সাজ-পোশাক ধরেছিলেন। এবং বাইবেলকে Yezur Veda অর্থাৎ Jesus Veda হিসেবে প্রচার করতে শুরু করেন। যদিও অনেক ব্রিটিশ অফিসিয়ালরা মনে করেছেন, যদি নেটিভ সমাজের খোলশ অক্ষুণ্ণ রেখেই খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা হয়, তবে ভারতীদেরকে সত্যিকারের সভ্যতার মাঝ পথ পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া হল – ভারতীয়দের সভ্যতার পূর্ণত্বে এগিয়ে দিতে হলে, তাদেরকে খ্রিস্টান জীবনাচরণের দিকেও এগিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন অনেকে।[107] অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল, পাশ্চাত্য শিক্ষার আমদানির সাথে সাথে বাংলা দেশের সমাজে সামাজিক পরিসরটিও পাঁচমিশেলি ধরণ প্রাপ্ত হয়েছিল। কোথাও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো ব্যক্তিদের সমাজে নিজের পূর্বেকার জাতগরিমার সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় রুচি গরিমার সমীকরণে যে ঘ্যাঁট তৈরি হয়েছিল, মধ্যবিত্তজ স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনে প্রয়োজনে সেই ঘ্যাঁট থেকে নিজেদের বাহ্য সত্তায় নানা রূপ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যেখান থেকে মধ্যবিত্তের আন্তরিক পরিচয়ের দোদুল্যমানতা বোঝা যায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মধ্যবিত্ত সামাজিক দেহের সাথে যুক্ত জুতো বা পাগড়ির মতো পোশাকি প্রস্থকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভাবকে নিবিড়ভাবে দেখলে একদিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পোশাকি ক্ষমতার পরিসরকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি অন্যদিকে সেই পরিসরের মধ্যে মধ্যবিত্ত পুরুষের নাগরিক অন্তর্ভুক্তির তাগিদও বোঝা যায়।

জুতো: শাসক-সত্তার নির্মিতি ও বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের স্বাতন্ত্র্য-অন্বেষণ

সামাজিক শরীরে ধারণ করা প্রতিটি পোশাকি উপকরণের সাথে সামাজিকতার নান ভাষা জড়িয়ে থাকে। সেই ভাষা স্থানু নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের ঘেরাটোপে এগিয়ে যাওয়া সামাজিক জীবনে সেই ভাষা নিরন্তর বহতা। কালের বিস্তারকে একটা কাপড়ের মতো মেলে ধরলেই বোঝা যায় সেই সামাজিক ভাষা কোন রূপে কোন সময় কোন নকসার বিস্তার ঘটিয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে বহমান কাল সমাজতাত্ত্বিকের কাছে "টেক্সট" তো বটেই, সাথে সাথে বহমান কালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতার প্রত্যুত্তরে পরিবর্তিত আচার-বিচারের পোশাকি রূপও কালীন সত্যকে পড়ার "টেক্সট"। Mina Roces লিখেছেন, ফিলিপিন্সে স্পেনীয় উপনিবেশের বিস্তারের ফলে ফিলিপিনো পুরুষদের মধ্যে ট্রাউজারসে ইন করে শার্ট পরা হয়ে ওঠে আধুনিকতার লক্ষণ। কিন্তু উপনিবেশিক প্রভুদের সামনে শার্ট ইন করে

[107] Sir John Woodroffe, 'Is India Civilized? Essays on Indian Culture', (Madras: Ganesh & Co. Publishers, 1922), pp. 77-81.

করে পরলে তা হয়ে যেতো অভদ্রতা।[108] ভদ্রতা ও অভদ্রতার আবর্তে উপনিবেশিক ক্ষমতার পোশাকি রূপটি শাসকের সামাজিক আচরণ এবং আইনী আচরণ দুয়ের প্রভাবে বিমূর্ত হয়ে ওঠে।

উপনিবেশগুলোতে সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতার বিমূর্তকরণে আধুনিকতার প্রকল্প তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সেই আধুনিকতার দৃশ্যমান ভিত্তি হয়ে উঠেছিল পোশাক। যে পোশাকি রুচির বিকাশ হতে শুরু করে পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশ যত ঘটেছে, ততই পাশ্চাত্য বাজারের পণ্যের প্রতি শাসিতের ধাবমানতা বেড়েছে। আর বাজারের প্রভাবের দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া পোশাকি রুচি শাসিতের যে শ্রেণির যতবেশি আয়ত্তাধীন হয়েছে, সেই শ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি, স্বাতন্ত্র্য ততই প্রকট হয়েছে। [109] তাই উক্ত আধুনিকতার প্রকল্পে শুধু ইউরোপীয় শিক্ষায় অশিক্ষিত মানুষজনই অসভ্য ও অনাধুনিক হয়ে থাকেনি, যারা ইউরোপীয় রুচির পোশাকি সজ্জা করেনি – তারাও অসভ্য পদবাচ্য হয়ে থেকেছে। Margot Riley লিখেছেন, সাদা চামড়ার অস্ট্রেলীয়দের কাছে Dress code এর অন্যথাকারীরা ‘primitive’ হিসেবে দৃষ্ট হতেন। আর ইউরোপীয় Dress code অনুসরণ করে পরিচ্ছদ ধারণকে ‘indicators of progress towards civilization’ বলে মনে করা হত।[110] আবার ইউরোপীয় কেতা ধরে শিষ্টাচারে উপনিবেশিকদের সমকক্ষ যদি নেটিভরা হয়ে যায়, তবে তো শাসকের পোশাকি স্বাতন্ত্র্য থাকে না! – এই উদ্বেগও উপনিবেশিকদের মধ্যে অন্তঃসলিলা থেকেছে। Simona Segre Reinach বলেছেন, ‘...the British prevented the Indian rulers, their subjects, from wearing Western dress on their journeys to the UK. Deference toward the British Empire had to be maintained, and it started with dress.’[111] এ তো না হয় লণ্ডনযাত্রী নেটিভদের সাথে লণ্ডনবাসীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য পোশাকি বিভাজনের নিদান। কিন্তু এদেশেও সেই বিভাজনের ক্ষেত্রকে চাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটা আলোচনার অগ্রগতির সাথে সাথে পরিলক্ষিত হবে। তবে শুরুতে যেটা হয়েছিল তা হল, নেটিভদের সাথে নিজেদের পোশাকি সজ্জার দূরত্বকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেশীয়দের ভাবতে বাধ্য করা – আহা রে তোমরা এখনও অসভ্যই রয়ে গেলে; সভ্যতা রক্ষা হয় এমন জুতোই পরতে জানলে না!

---

[108] Mina Roces, “Gender, Nation and Politics of Dress in Twentieth Century Philipines”, Mina Roces and Louise Edwards ed., ‘The Politics of Dress in Asia and the Americas’, (Brington & Portland: Sussex Academic Press, 2007), p. 23.

[109] স্বামী বিবেকানন্দ, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, (কলকাতাঃ উদ্বোধণ কার্য্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ, চৈত্র, ১৩৪৫), পৃ ৩৩-৩৪।

[110] Margot Riley, “Cast-Offs: Civilization, Charity or Commerce? Aspect of Second Hand Clothing Use in Australia, 1788-1900”, Alexandra Palmer and Hazel Clarke (ed.), ‘Old Clothes, New Looks: Second Hand Fashion’, (Oxford, New York: Berg, 2005), p.55.

[111] Simona, Segre Reinach, “Ethnicity”, Alexandra Palmer, ed., ‘A Cultural History of Dress and Fashion in the Modern Age’, (London, Oxford: Bloomsbury, 2018), pp.152-153.

এই মানসিকতাই উনিশ শতকের সাতের দশকে বাংলা তথা ভারতের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ বিদ্যাসাগরকে চটি জুতা পায়ে সরকারি ভবনে প্রবেশে বাধা দিয়েছে; তাঁর সাথে থাকা কাশীর কবি হরিশ্চন্দ্র এবং 'রামকৃষ্ণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'কে আধুনিক সভ্যজনোচিত পোশাক পরে থাকায় প্রবেশে কোনো বাধা দেয়নি।[112] এই ঘটনা উক্ত ভবনের[113] অর্থাৎ এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন নেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোচর হলে তিনি বিদ্যাসাগরকে ভবনের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে সশরীরে নেমে আসেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন, এই বৈষম্যের প্রতিকার করতে পারলে তবে তিনি উক্ত ভবনে প্রবেশ করবেন। তারপর উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ট্রাস্টির হনরারি সেক্রেটারি হেনরি এফ ব্লানফোর্ড মহাশয়কে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তাঁর অভিযোগ, "আমি গত ২৮শে জানুয়ারি (১৮৭৪) এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী দেখিতে যাই। আমার পায় দেশী জুতা ছিল বলিয়া, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পাই নাই। জুতা না খুলিলে শুনিলাম, প্রবেশ নিষেধ। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ... পসার-প্রখ্যাতিতে নামে মানে হাইকোর্ট সকলের সেরা। সেখানেও যখন এরূপ ব্যবস্থা

---

112 হরিশ্চন্দ্র মহাশয়ের পরনে ছিল – পায়ে ইংরেজি জুতো, গায়ে চাপকান চোগা এবং মাথায় পাগড়ী। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল বলেছেন, সুরেন্দ্রনাথের পরনেও নিশ্চয়ই তদ্রুপ পোশাক ছিল, যার ফলে তিনি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য, বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর: সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী' (কলিকাতা: শাস্ত্র-প্রকাশ কার্য্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ ১৩২৯), পৃ ৩১৮-৩১৯।

113 জীবনীকার লিখেছেন ১৮৭০ এর দশকে তখনও এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম পার্ক স্ট্রীটের এক ভবনে ছিল।

ছবি ৪.৫: ঔপনিবেশিক প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক (সূত্র: Cover page of Indian Charivari Album, Vol.1). [114]

নাই, তখন সাধারণের আরাম বিশ্রামের স্থানে [অর্থাৎ যাদুঘরে] এরূপ অসঙ্গত নিষেধ-বিধি দেখিয়া আমাকে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইইয়াছে।"[115] বিদ্যাসাগরের এই চিঠি লেখার ছয় বছর আগে উপমহাদেশের উপনিবেশিক প্রশাসনের অন্দরে জুতো প্রশ্নে দুই বছরব্যাপী চিঠি ও প্রতি-চিঠির যে ঘনঘটা যে তৈরি হয়েছিল – তা হয়ত বিদ্যাসাগর মহাশয় জানতেন না। উপনিবেশিক ক্ষমতার দৃশ্যমান ঘুটি মহাবিদ্রোহ পরবর্তীকালে এত সযত্নে সাজানো হচ্ছিল যে – বিদ্যাসাগরের মতন সচেতন নাগরিক তা এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে প্রবেশ করতে যাওয়ার আগে তা টেরই পাননি। পেলে তাঁর এই বিস্ময় হয়তো থাকত না।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে নেটিভদের পায়ে জুতোর ধরণের উপর নির্ভর করে উপনিবেশিক শাসক বেশ সংবেদনশীলতার মোড়কে বিলিতি ও দেশী শিষ্টাচারের বিভাজন রেখাটাকে দর্শিয়ে

---

[114] ছবিটি Charivari পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ। এখানে বক্তার স্থলে হাঁটু গেড়ে ভারতীয় স্টাইলে বসা সাদা-চামড়ার সাহেব। আর শ্রোতার স্থলে মোঘলী রুচি এবং মোঘলী ও দেশী রুচির সমন্বয়ে পোশাক পরিহিত নেটিভ ভদ্রলোকরা। তাদের সাথে একাসনে একটি কুকুরও রয়েছে। ডান পাশের ভদ্রলোক রুচিতে বিলিতি হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও শাসকের সাথে নিজের পোশাকি রুচির দূরত্বকে ঘোচাতে পারেননি। শাসক-শাসিতের পোশাকি বিভাজনটি উনিশ শতকের সত্তরের দশকের সমসাময়িক ঘটনাবলীর ছবিমূলক বিশ্লেষণে এগিয়ে আসা পত্রিকাটির প্রচ্ছদে প্রকট হয়েছে। Sir Punch, 'Indian Charivari Album', Vol. 1, (7 Dacre's Lane Calcutta, 1875, Publisher was not mentioned).

[115] বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগর', পৃ ৫২০-৫২১।

নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপটাকে প্রকট করছিলেন। এই প্রক্রিয়াটাকে সংবেদনশীল বলছি কারণ, এই সংক্রান্ত চিঠিপত্রের ভাষায় উচ্চ কর্তৃপক্ষের কোনো বিদ্বেষের দেখা মেলেনি। বরং বিদ্বেষ পোষণকারী অফিশিয়ালদের নিন্দা করা হয়েছিল। কিন্তু এই সংবেদনশীলতার উদ্দেশ্য ছিল – পাশ্চাত্য আধুনিকতার পোশাকি স্বরূপের কৌলিন্য রক্ষা। উপনিবেশে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অন্যতম প্রধাণ ভিত্তি পাশ্চাত্য রুচির পণ্যের ক্রয়-নিশ্চয়তা তৈরি করা। এবং দেশীয় পোশাকি আচার-বিচারকে প্রান্তিক করে তোলা। এই কর্মকাণ্ডে তাঁরা কিরূপ সফল হয়েছিলেন – তা আলোচনা এগোনোর সাথে সাথে পরিষ্কার হবে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা যে সেই অগ্রগমনের একটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল – তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেকারণে দেশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিতদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব রচিত হচ্ছিল। জুতো পরার উপর ভিত্তি করে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে উপনিবেশিক সরকারের নিজ সভ্যতার জোর প্রদর্শনের বিষয়টি নিয়ে কে. এন. পানিক্কর ১৯৯৮ সালে লিখেছিলেন।[116] তবে জুতোর উপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্তের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের সীমানা কিভাবে তৈরি হচ্ছিল, সেবিষয় অনালোকিত হয়ে পড়ে ছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বর্ণিত এই "The Great Shoe Question"এ 'গ্রেট' শব্দটি ব্যবহারের কারণই হল এর সারা ভারতব্যাপী বিশালতা।[117] কিন্তু সেই বিশালতার কেন্দ্রে ছিল বাংলা। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা বাংলা দেশে যে হারে পাশ্চাত্য রুচিশীলতা উৎপাদন করছিল – তা ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের চাইতে বেশিই ছিল। তাই বোম্বে প্রেসিডেন্সির পাশাপাশি ভারতের অন্যত্র জুতো কিভাবে উপনিবেশিক সভ্যতার কেন্দ্রীভূত প্রকল্পের চিহ্নে পরিণত হয়েছিল, তা বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। তার সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষ কিভাবে সেই প্রকল্পে সাড়া দিয়েছিলেন এবং কিভাবে নিজেদের সামাজিক সীমানা তৈরি করছিলেন – তাও দেখার দরকার আছে।

১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত আশুতোষ মিত্র নামের এক বাঙালি প্রকৌশলী বুন্দেলখণ্ডের এক ক্যান্টনমেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে জুতো খুলে প্রবেশ করেননি বলে জুতো নিয়ে দাপ্তরিক চিঠি চালাচালির ধুম পড়েছিল। যাঁর দরবারে সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বাঙালি বাবু আশুতোষ মিত্রের জুতো পরে যাওয়া নিয়ে এত চিঠি চালাচালির সূত্রপাত বুন্দেলখণ্ডের সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকাল এজেন্ট Captain W. Kincaid লিখেছেন, '…until such time as special rules were laid down for my guidance on this point by superior authority, I could not consent to exempt any class other than Christians from the practice so generally followed

---

[116] K.N. Panikkar, 'The 'Great' Shoe Question: Tradition, Legitimacy and Power in Colonial India', *Studies in History,* Vol. 14, No. 1, n.s. 1998, SAGE Publication, pp. 21-36.

[117] Ibid, p. 23.

throughout the length and breadth of Hindostan…'[118] অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের থেকে কোনো নির্দেশ না আসে, তিনি খ্রিস্টান ব্যতীত কোনো নেটিভদের জুতো পরে তাঁর অফিসে প্রবেশ করতে দিতে পারেননা। সে নেটিভ বিলিতি শিষ্টাচারে পোশাক পরিধাণ করে আসলেও তিনি জুতো খুলে তাদের অফিস-কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পক্ষপাতী।[119] কিন্তু কেন – তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। হতে পারে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকি অভ্যেস রপ্ত করা অথচ দেশীয় ধর্মানুসারীদের তিনি পূর্ণ-সভ্য ভাবতে পারেননি। তাই তাঁর চিন্তানুসারে, আত্মমর্যাদা নিয়ে তাঁর সরকারি অফিস-কক্ষে প্রবেশ করতে গেলে শুধু বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাক পরিধাণ রপ্ত করলেই হবে না, সাথে করে খ্রিস্টানও হতে হবে। কিন্তু আশুতোষ মিত্র মহাশয় নিশ্চয়ই খ্রিস্টান ছিলেন না। তাই বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরে Kincaid মহাশয়ের কক্ষে প্রবেশে বাধা পেয়েছেন। এই পুরো বয়ানটিতে তথাকথিত শিষ্টাচারী, কল্যাণকামী শাসকের একজন প্রতিনিধির অন্তঃসলিলা সংকীর্ণ ধর্মীয় এজেন্ডাটি বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রশাসনের একজন প্রতিনিধির আধুনিক শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ এই অনমনীয়তাকে ঢাকার জন্য ড্যামেজ-কন্ট্রোলে নেমেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য '..it is evidently not expedient to leave the determination of a matter affecting Native conceptions of propriety and dignity to the individual opinions of officer preciding.'[120] অর্থাৎ সাদা-চামড়ার অফিশিয়ালরা নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করে নেটিভদের নিজস্বতাকে, আত্মমর্যাদাকে খাটো করতে পারেন না। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে, সরকার বাহাদুর বলছেন – যে নেটিভরা বিলিতি শিষ্টাচার অনুসারে পোশাক পরা রপ্ত করতে পারেননি, তাঁরা দেশীয় পোশাক পরে জুতোসুদ্ধ অফিসে প্রবেশ করতে পারবেন। বরং সরকার বাহাদুরের বক্তব্য – বিলিতি পোশাক পরলে মোজাসহ বুট পরেই অফিসে প্রবেশ করতে হবে। আর দেশীয় পোশাকের সাথে বুট পরলেও তা খুলে অফিসে প্রবেশ করতে হবে। সরকার বাহাদুরের বক্তব্য, '..educated Native gentlemen are now found in every part of the country, is an additional reason for prescribing an uniform rule on the

---

[118] From Captain W. Kincaid, Assistant Political Agent, Bundelcund, To- the Political Agent, Bundelcund, -- No. 83A, dated Camp Nowgung, the 8th February, 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

[119] From Superintending Engineer, 3rd Circle, North-Western Provinces, To the Secretary to the Government, North-Western Provinces, in the Public Works Department, -- No. 339, dated the 23rd January 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

[120] From The Secretary to the Government of India, Foreign Department, with the Governor General, to the Registrars, High Courts, Calcutta and the North-Western Provinces, Agra, -- No. 1009-1010, dated Simla, the 10th June 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

subject.’[121] অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষিত প্রজারা নেটিভ হলেও, সরকারি চাকরি-বাকরির মধ্য দিয়ে তারাই যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের চলমানতার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সেটাকে স্বীকার করে, তাঁদের সুবিধার কথা মাথার রেখে জুতো-ভিত্তিক কেন্দ্রীভূত আইনের প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করেছিলেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষিত দেশীয়দের প্রবণতাই যেখানে নিজেদের “নেটিভত্ব” অস্বীকার করা, সেখানে তাঁদের সুবিধার পোশাকি রূপ কি হবে তা অনুমেয়। তাই সরকারি তরফে সার্কুলার জারি করে একমাত্র বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরে অফিসে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[122] আর অন্যদিকে দেশীয় শিষ্টাচার মেনে পোশাক পরিধান করলে জুতো খুলেই অফিসে প্রবেশ করতে হবে। ছবি ৪.৬-এ যুবকের স্টুডিও ফটোগ্রাফের পায়ের দিকে যদি লক্ষ্য করি, তাতে পায়ের গোড়ালির এক ফুট উপর অবধি ঝুলের ধুতি, আর সেই একফুটের অনাবৃত

---

[121] From The Secretary to the Government of India, Foreign Department, with the Governor General, to the Registrars, High Courts, Calcutta and the North-Western Provinces, Agra, -- No. 1009-1010, dated Simla, the 10th June 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

[122] সার্কুলারে লেখা হয়েছিল, ‘A variety of practice and consequent doubts having been found to exist as to manner in which native gentlemen who have adopted the English habit of dress in respect of boots or shoes and stockings should be allowed to appear at official receptions, public and private, and in courts of justice, His Excellency the Governor General in council has been pleased to prescribe the following rule for general observance in the Political Department :--

Native gentlemen distinctly habited as above shall not be required to take off their shoes and boots upon any occasion, whether the court or place of public or private reception be carpeted or not.’ দ্রষ্টব্য, Circular by W. Muir, No. 28, 6th June 1867 Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

ছবি ৪.৬: পাঁচমিশেলি পোশাক (@CSSSC_Archive)[123]

চামড়াকে আবৃত করেছে মোজা; আর পায়ে রয়েছে ফুলদার নাগড়া। আর উর্দ্ধবাস হিসেবে আছে গলাবদ্ধ চায়না কাটের শার্টের উপর কলার দেওয়া কোট, তার উপর আবার বগলের দিক থেকে ডান কাঁধের উপর টানা শাল। বিলিতি বাজারের প্রভাবে এই মিশ্র রুচির সামাজিক দেহ গড়ে উঠলেও, বিলিতি শাসকের চোখে এ সাজ এককথায় অশিষ্ট। এ সাজে পায়ে জুতো রেখে অফিসে-আদালতে প্রবেশে মানা। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল - উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সম্মানকে নাগরিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে আদায় করে নেওয়া। এদেশীয় পোশাকি শিষ্টাচারে সম্মান প্রদর্শনের দৃশ্যমান রূপ হল পায়ে হাত দেওয়া, বা জুতো খুলে ঘরে, মন্দিরে বা সম্মানজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা। আর অন্যদিকে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচারে জুতো খোলা মানে অভদ্রতা, তাদের ভদ্রতার পোশাকি মানদণ্ড হল টুপি খোলা। অর্থাৎ দুটি পোশাকি শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেভাবে নেটিভদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে নেওয়াই ছিল – এই যাবতীয় চিঠি চালাচালির মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠান যখন নিজের মান্যতাকে আদায় করার জন্য সামাজিক ও পোশাকি আচরণকে একটা লিখিত রূপ দেয়, সেখান থেকেই প্রতিষ্ঠান-মনস্কতা ও প্রতিষ্ঠান-বিরুদ্ধতার

[123] Studio Portrait of T. P. Sen, I-4, Siddhartha Ghosh Collection, CSSSC Archive, Jadunath Bhavan, Kolkata.

পোশাকি রূপেরও জন্ম হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের অনুদার প্রবৃত্তির মধ্যে একদিকে শৃঙ্খলা রক্ষার দায় থেকে, আর শৃঙ্খলার নামে চাপিয়ে দিয়ে নিজের অহংকে প্রতিষ্ঠা করার অন্তঃসলিলা তাগিদও থাকে। যদিও আধুনিক প্রতিষ্ঠান সেই তাগিদকে সরাসরি স্বীকার করে না। কারণ সেই তাগিদের রাজনীতির মূল ভিত্তি হল নমনীয়তার মধ্য দিয়ে কার্য হাসিল। তাই বিদ্যাসাগর যখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে চটি জুতা পরে প্রবেশে বাধা পেয়ে, এই নিয়মের বিষয়ে বিশদে জানতে চেয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন, সেই চিঠির প্রত্যুত্তরে কর্তৃপক্ষ জানান, "ট্রষ্টিগণ উক্ত প্রথা সম্বন্ধে কোন প্রকার আদেশ প্রচার করেন নাই ..."[124] কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আশুতোষ মিত্র মহাশয়কে উনিশ শতকের ষাটের দশকে জুতো পরে সরকারি অফিসে প্রবেশে বাধা দেওয়ার পর, উপনিবেশিক সরকার জুতো কেন্দ্রীক পোশাকি শিষ্টাচার এতদিন ধরে সরকারি অফিসে কিভাবে চলে এসেছে – তা জানার জন্য উদ্যোগ নেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল – একটা কেন্দ্রীভূত পোশাকি আইনের দিকে যাওয়া এবং নিজেদের শাসন-ক্ষমতার পোশাকি ভিত্তিকে প্রকট করা। সেই উদ্যোগের দরুণ ঝাঁসি, জালাউন, ললিতপুর, হামিরপুর, নাগোদ প্রভৃতি অঞ্চলের উর্দ্ধতন সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, "..that is not the custom for natives, even of rank or position, to enter Courts with their shoes on, … Chiefs themselves take their shoes off." অর্থাৎ শুধুমাত্র সাধারণ নেটিভরাই নয়, সেসব অঞ্চলের সমাজপতিরাও জুতো খুলে অফিস-আদালতে প্রবেশ করতেন।[125]

সকলেই যখন সরকার বাহাদুরের আইন মেনে জুতো খুলে অফিস-আদালতে প্রবেশ করছিলেন, তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে – উনিশ শতকের ষাটের দশকে জুতো নিয়ে মহাফেজ-খানার কাগজপত্তরে এত তোলপাড় কেন? যাঁর দরবারে সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বাঙালি বাবু আশুতোষ মিত্রের জুতো পরে যাওয়া নিয়ে এত চিঠি চিঠি চালাচালির সূত্রপাত বুন্দেলখণ্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকাল এজেন্ট Captain W. Kincaid লিখেছেন, মধ্যভারতের অধিবাসীরা জুতো খুলে অফিস-আদালতে আসতে তেমন গরিমসি করেন না, যারা করেন তারা সবাই চাকরিসূত্রে মধ্যভারতে বসবাসরত বাঙালি। তিনি বুন্দেলখণ্ডের এক্সিকিউনিভ ইঞ্জিনিয়ার Mr. Parker-কে পত্রে বলেছেন, 'The Head Clerk of your Agency, Mr. Dwarkanath, a most respectable man, of high standing, holding a respectable post, has never applied for any exemption from this rule in my court.'[126] অর্থাৎ দ্বারকানাথের মতো (দ্বারকানাথ ঠাকুর নন) বাঙালি উচ্চপদস্থ যেখানে তাঁর

---

124 বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগরঃ সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী', পৃ ৫২২।

125 From Lieutenant-Colonel E. Thompson, 1st Assistant Agent to the Governor General for Central India, in Charge Central India Agency Office, To the Secretary to the Government of India, Foreign Department, with the Governor General, -- No. 14-75, dated Indore Residency, the 14th May 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

126 From Captain W. Kincaid, Assistant Political Agent, Bundelcund, To- the Political Agent, Bundelcund, -- No. 83A, dated Camp Nowgung, the 8th February, 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

সামনে জুতো খুলে এসেছেন, সেখানে তাঁর চাইতে কম পদমর্যাদার বাঙালি অফিসিয়ালদের জুতো পরে অফিসে প্রবেশের প্রবণতা – তাঁকে বিস্মিত করেছে। অর্থাৎ উর্দ্ধতন ব্রিটিশ অফিশিয়াল Kincaid-এর কাছে তাঁর সামনে অফিস-কক্ষে জুতো পরে প্রবেশ বাঙালি শিক্ষিত অফিশিয়ালদের ঔদ্ধত্য হিসেবে দৃষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক দিকে জুতো পরিধানের উপর ভিত্তি করে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভাজন মনস্কতার উপর প্রশাসনের শিলমোহর ছিল না। ১৮০২ সালে চপ্পল পরে অফিস-আদালতে প্রবেশে অনাপত্তি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে একটি নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে, 'His Excellency in Council has judged it proper to direct that Natives shall not be prevented from wearing slippers at any place or upon any occasion where, by custom already established, it has been usual to admit them with their slippers. To guard against any recurrence of opposition to the practice, and prevent the dissatisfaction which must ever arise from the ill-judged and impolitic prohibition of any general and long established usage, …'[127] অর্থাৎ দেশ শাসনকারী সাদা-চামড়ার মানুষের মধ্যে প্রভুত্ব সূচক ভাব প্রকাশ পেতে শুরু করলেও, সে ভাবকে প্রশাসন আমল দিতে চাননি। প্রশাসন অনেকটা লালনকর্তার ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারণ নেটিভকূল তখনও অবুঝ। পাশ্চাত্য আধুনিকতার চালিয়াতিকে বোঝার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার যে জ্ঞানগম্যির দরকার – তা তাদের মধ্যে শূন্য। তাই এই করুণা। কিন্তু আর পাঁচটি দশক ঘুরে আসতে আসতে সেই করুণাঘন রূপ উধাও। কেন? কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে, পাশ্চাত্য আধুনিকতা কিনতে শিখে দেশীয় মধ্যবিত্তের মধ্যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার আদায়ের মননবৃত্তি সজাগ হতে শুরু করল। পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মধ্যে নিজেদের নেটিভত্ব অস্বীকারের একটা প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করল। ১৮৬৭ সালের এক রিপোর্টে এই অভিযোগ আনেন Kincaid। তিনি লিখেছেন, '..the Assistant Engineer considers that he has been lowered in the eyes of the Native.'[128] এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কে? আর নেটিভরাই বা কারা? অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আশুতোষ মিত্র। বাঙালি পাশ্চাত্য শিক্ষিত সরকারি চাকুরে। সর্বোপরি ভারতবাসী। আর নেটিভরাও ভারতবাসী। কিন্তু উক্ত বক্তব্যের বয়ান দেখলে স্পষ্ট – আশুতোষ মিত্রের মতন ভারতবাসী পাশ্চাত্যশিক্ষা পেয়ে যেন নেটিভ প্রজাতির পশ্চাতপদতাকে ছাড়িয়ে এসেছেন। তাই জুতো প্রশ্নে তাঁকে এবং একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত নেটিভকে এক পঙক্তিতে রেখে Kincaid সাহেব বিবেচনা করেছেন

---

[127] From J. D. Sandford, Esq., Register, High Court of Judicature, North-Western Provinces, To Colonel R. J. Meade, Agent to the Governor General, Central India, No. 581; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

[128] From the Executive Engineer, Bundelcund Road Division, To the Superintending Engineer, 3rd Circle, North-Western Provinces, -- No., (blank), dated the 17th January 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

বলে, তাঁর আধুনিক অহঙে ঘা পড়েছে। তার মানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেটিভরা আর নেটিভ থাকতে চাইছেন না, সব বিলিতি ধরা ধরতে চাইছেন। ষাটের দশকের এই ভাবটা বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তির কয়েক দশকের মধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। সাদা-চামড়ার সাহেবদের শাসনতান্ত্রিক অহঙের কাছে সেই ভাবটা সুবিধার ঠ্যাকেনি শুরুতে। তাই ১৮৫৪ সালে সরকারের আইন – কোনো “নেটিভ” জুতো পরে দরবারে প্রবেশ করতে পারবেন না।[129] অর্থাৎ যে নেটিভ অহং পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে নিজেকে আধুনিক ভাবছে, সেই অহংকে নিজেদের নেটিভত্ব স্বীকার করানোই হয়ে ওঠে ইউরোপীয় শাসন-ক্ষমতা চরিতার্থতার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু একটা পুরো দশক যেতে না যেতেই সরকারের এই আইন পুনঃবিবেচনার দরকার হল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে রাণীর হাতে যাওয়ার পর প্রশাসনের বহিরঙ্গে এদেশীয় আচার-আচরণের প্রতি সংবেদনশীলতার আরও এক পরত জুড়ে গেল। যে পরতের একটি দিক হল – নিজেদেরকে দেশীয় পোশাকি আচারের প্রতি সংবেদনশীল দেখানোর তাগিদ। যে তাগিদ থেকে প্রশাসন দেশীয় পোশাকি আচারের সাথে বিলিতি পোশাকি আচারের মিশেলকে বিলিতি বা দেশীয় পোশাকি শিষ্টাচারের পরিপন্থী হিসেবে দেখতে শুরু করেন। ভাবটা এমন যেন – প্রশাসন দুটি শিষ্টাচারের কৌলিন্য রক্ষার জন্যই তা করছেন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মান আদায় করা।[130] এবং নিজেদের পোশাকি শিষ্টাচারের কৌলিন্য রক্ষা করা। দেশীয় পোশাকি শিষ্টাচারের কৌলিন্য রক্ষা করার উদ্দেশ্য থাকলে, দেশীয়দের জুতো হাতে করে সরকারি ভবনে ঢুকতে হত না।[131]

---

[129] Replies to Circular No. 1543, dated 11th September 1867; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[130] মহাবিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে গভর্নমেন্ট-হাউসে দেশীয় আচার-আচরণ ও ধর্মযাপন নিয়ে মাথা-না-ঘামানোর অন্যতম প্রতিশ্রুতি দেওয়া মহারাণীর ঘোষণাপত্র বাংলায় পাঠ করবার জন্য বিদ্যাসাগরের ডাক পড়েছিল। ‘নির্দিষ্ট দিবসে যথাকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরাভ্যস্ত সাদা বেনিয়া, লংক্লথের চাদর ও শুঁড়তোলা তালতলার চটি-জুতা পায়ে দিয়া গভর্নমেন্ট হাউসে উপস্থিত হইলেন। তিনি দরবার-হলে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দারোয়ান তাঁহার চেহারা, সাজসজ্জা, বিশেষত শুঁড়তোলা তালতলার চটি-জুতা দেখিয়া ও তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিয়া দরবার-হলে প্রবেশ করিতে দিল না।’ পরে অবশ্য বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার বিডনের হস্তক্ষেপে তিনি দরবার হলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখানে দ্রষ্টব্য বিষয় হল, সাহেবী পোশাক ব্যতীত অন্যান্য দেশীয় পারিচ্ছদিক শৈলী কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক মানসিকতার মধ্যে একটা উদ্বেগের এবং অপরায়নের জন্ম দিয়েছিল। দ্রষ্টব্য, ‘সেকালের কথা: চটি-জুতায় বিদ্যাসাগরের বিপত্তি’, ভারতবর্ষ, ১৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ৬২২।

[131] বিদ্যাসাগর মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠিতে লিখেছেন, “দেখিলাম যে সব দর্শক চটি জুতা পায়ে দিয়াছিল, তাহাদিগকে জুতা খুলিয়া হাতে করিয়া লইয়া ফিরিতে হইতেছে।” অর্থাৎ জুতো হাতে করে তারা প্রশাসনিক ভবনের এদিক ওদিক যাচ্ছেন। পায়ের জুতো হাতে নিয়ে ফেরা কোনো খুব সম্মানের নয়। এ যেন নেটিভ হবার দণ্ড। দ্রষ্টব্য, বিহারীলাল সরকার, ‘বিদ্যাসাগরঃ সমালোচনা সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী’ পৃ ৫২০।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে ঢোকার পথে দারোয়ান না কি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, “হয় আপনি গাড়ি-বারাণ্ডায় জুতা রাখিয়া ভিতরে যান, অথবা জুতা খুলিয়া তাহা হাতে করিয়া ভিতরে অরবেশ করুন।”

কারণ সাম্রাজ্য-বিস্তারের একটা পর্যায়ে তাঁরা উপলব্ধি করলেন, সাম্রাজ্যের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে নেটিভদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন অনিবার্য্য, তখন তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য রুচির বিকাশ হওয়াও স্বাভাবিক। নেটিভদের মধ্যে পাশ্চাত্য রুচির সুচারু অনুশীলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারলে আখেরে পশ্চিমা বাণিজ্যিক পুঁজির উত্তরণে ইন্ধন দেওয়া হয়। এবং প্রশাসনের নিম্নতন চালিকা শক্তি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নেটিভদের মাঝে মধ্যে খুশি করতে পারলে যে নিজেদের প্রশাসনিক পুঁজির পক্ষে লাভজনক – সেটাও তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে দেশীয় বাঙালি মধ্যবিত্তরা যে নিজেদের নেটিভের থেকে স্বতন্ত্র ভাবতে শুরু করেছিলেন – এই অভিযোগটা নিছক নয়। বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার আশুতোষ মিত্রের চিঠিতে এর আভাস আছে। তাঁর ভাষায়, 'The reason of my being inquisitive on this subject is, that having been summoned to attend the court of Captain Kincaid, the Cantonment Magistrate of this station, to defend against a false charge brought against me by a Native, was forced at the entrance of the court to put off shoes, though I put on the dress in which we attend the courts and public offices in Calcutta and here too, which entitles us to attend them with shoes, but cap off …'[132] অর্থাৎ কলকাতায় বা কলকাতার বাইরে সাহেবী পোশাকের সাথে বুট পরে, এবং ক্যাপ খুলে অফিস-আদালতে তিনি এবং তাঁর সহকারীরা যাতায়াত করেন, এতে কোনোদিন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে এক "নেটিভের" মিথ্যা নালিশে তাঁর নামে নীতি-লঙঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। কারণ "নেটিভ" মহাশয়কে যখন জুতো খুলে ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয় তখন আশুতোষ মিত্র মহাশয় বুট পরে উক্ত কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। সাহেবী পোশাকের সাথে বুট পরে অফিস-আদালতে প্রবেশ করা সাহেবী প্রশাসনের রীতিবিরুদ্ধ নয়। তাই আশুতোষ মিত্র মহাশয় ধরে নিয়েছিলেন যে, নেটিভ ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে সাহেবী পোশাকের সাথে দেশী জুতো পরে Kincaid এর অফিসে প্রবেশের অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি হয়ত জানতেন না যে – Kincaid সাহেব কোনো নেটিভকে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাক পরা থাকলেও বুট পরে তাঁর অফিসে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। আশুতোষ মিত্রের পাশ্চাত্য পরিশীলনে পরিশীলিত মনে স্বদেশীয়দের স্বার্থের সাথে বিভেদ তৈরি হয়েছিল। যে বিভেদের কারণে তাঁর একবারও মনে হয়নি – সরকারি অফিসে প্রবেশ করতে গেলে পোশাকি শিষ্টাচার অনুসারে নেটিভদের মধ্যেও কেন বৈষম্য করা হবে! বরং তাঁর মনে প্রশ্ন

দ্রষ্টব্য, 'সেকালের কথা: চটি-জুতায় বিদ্যাসাগরের বিপত্তি', ভারতবর্ষ, ১৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ৬২২।

132 From the Assistant Engineer, Nowgong Subdivision, Bundelcund Road Division, To the Executive Engineer, Bundelcund Road Division, -- No. 99, dated the 21st December 1866; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

জেগেছে, বিলিতি শিষ্টাচার অনুসারী পোশাক গায়ে থাকা সত্ত্বেও বুট পরে সরকারি অধিকর্তার অফিসে প্রবেশ করে, তাঁকে জুতো না খুলে অফিসে প্রবেশের অভিযোগ কেন পোহাতে হচ্ছে!

তবে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজা-বুটসহ অফিসে প্রবেশের নির্দেশিকা হাইকোর্টে বলবৎ করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের অংশত আপত্তি ছিল।[133] হাইকোর্টের বক্তব্য ছিল, নেটিভ ভদ্রমহোদয়রা বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজা-বুটসহ আদালত কক্ষে প্রবেশ করতে পারেন – এবিষয়ে আদালতের কোনো অসুবিধা নেই। কারণ আদালতের শুনানি কক্ষের সবার জন্য নির্ধারিত অংশে সবাই জুতো নিয়েই প্রবেশ করে এসেছেন এতকাল। কে দেশীয় জুতো পরে এসেছেন, বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে বুট পরে কে প্রবেশ করছেন – তা নিয়ে আদালত মাথা ঘামায়নি। কিন্তু প্রত্যেকটি আদালতের বিচার-কক্ষের এমন একটা অংশ থাকে, যার মেঝে কার্পেটে ঢাকা থাকে। চিঠির বক্তব্য অনুসারে, 'I am desired to say that the High Court think it would be inexpedient to pass any rule which would lead to the supposition that it is the intention of Government that Natives when habited as described in the rule (অর্থাৎ বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ জুতো পরে সরকারি অফিসে প্রবেশ, দেশীয় শিষ্টাচারের পোশাক পরলে জুতো খুলে প্রবেশ) are to be allowed to enter that part (আদালতকক্ষের যে অংশটা কার্পেটে ঢাকা) of the Court without the permission of the Judge.'[134] অর্থাৎ আদালতকক্ষের কার্পেটে ঢাকা অংশে বিলিতি শিষ্টাচারে পোশাক পরা কোনো নেটিভ বিচারকের অনুমতি ব্যতীত বুট পরে এসে দাঁড়ান – সেটা কলকাতা হাইকোর্ট চায় না। এক্ষেত্রে নেটিভ বিচারকদের সম্মান-হানি হতে পারে বলেও কলকাতা হাইকোর্টের কণ্ঠে উদ্বেগের সুর শোনা গিয়েছে। কারণ কলকাতা হাইকোর্টের জুরিসডিকশনের অন্তর্গত নগরকেন্দ্রের বাইরের বিচারালয়গুলিতে যেখানে নেটিভ বিচারকরা সম্পূর্ণ এদেশীয় সামাজিক আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের নানা সমস্যাবলীর বিচার করেন, সেখানেও কেউ যদি বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পায়ে কার্পেট মোড়া মেঝেতে উঠে পড়েন, তবে কোর্টকক্ষে উপস্থিত বাদী-বিবাদী পক্ষ থেকে অফিসার সকলের সামনে বিচারকের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে -- জুতো পরে বিচারক ও ব্যারিস্টারদের জন্য নির্ধারিত কার্পেট মোড়া অংশে সাধারণ নেটিভদের প্রবেশ পাশ্চাত্য শিক্ষার ছোঁয়া লাগা নগরকেন্দ্রগুলোতে তো

---

[133] From J. D. Sandford, Esq., Register of the High Court of Judicature for the North-Western Provinces, Agra, To the Secretary to the Government of India, Foreign Department, with the Governor General, Simla, -- No. 1294, dated the 19th June 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

[134] From C. D. Field, Esq., Officiating Register of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, To the Secretary to the Government of India, in the Foreign Department, with the Governor General, -- No. 2236, dated Calcutta, the 24th July 1867; Foreign Department General Branch, September 1867, National Archives of India, New Delhi.

সম্মানহানিকর বটেই; কিন্তু দেশীয় সাত্ত্বিক আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নগরকেন্দ্রের বাইরের অঞ্চলগুলোর নেটিভ বিচারপতিদের জন্য আরও অপমানজনক।[135] নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসনের পালনকর্তার রূপটি ফুটিয়ে তুলতেও কোনো কসুর ছিল না। মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেট Mr. S.C. Bayley কোর্ট অব জাস্টিসে উক্ত নির্দেশিকা অনুসারে প্রবেশের স্বপক্ষে। কিন্তু বিহারের দরবারে বাঙালি বাবুরা বিহারি অভিজাতদের উপস্থিতিতে জুতো পরে প্রবেশ করুক সেটা তিনি চাননি। কারণ বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে বুট পরা পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণ হলেও, বিহারের দরবারে বিহারি অভিজাতরা জুতো খুলে প্রবেশ করেন। সুতরাং তাঁদের সামনে বাঙালি বাবুদের বুট পরে প্রবেশ, অভিজাতদের সম্মানে আঘাত আনবে বলে ম্যাজিস্ট্রেটের মত।[136] অন্যদিকে দরবারে এবং আদালতে নেটিভদের জুতো পরা না-পরা বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের প্রশাসক Colonel Hopkinson এর মতামত অনেকটা অনমনীয়। তাঁর মতে, একই নেটিভ দরবারে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সামনে বিলিতি শিষ্টাচারী পোশাকের সাথে বুট পরে যেতে পারবে, আর আদালতে যেতে পারবে না – বিষয়টি প্রশাসনের অন্দরের ছন্নছাড়া ভাবকে প্রকাশ করে। তাঁর মতে, সবক্ষেত্রে এক নিয়ম চালু হওয়া দরকার।[137] আবার আরেকধরণের মত দিয়েছেন Sir R. Temple ও Sir Salar Jungরা। তাঁদের মত হল, নেটিভরা ফ্লোর নোংরা না হয় যাতে, তা ভেবে যেকোনো জায়গায় জুতো খুলে প্রবেশ করেন। ইউরোপীয়রা যেহেতু তাদেরকে এক্ষেত্রে অনুকরণ করতে পারবে না, সেহেতু ইউরোপীয়দেরও তাদের কি পালনীয় কর্তব্য – তা নিয়ে মাথাব্যথা করা উচিত নয়।[138] কিন্তু মাথাব্যথা তো রাখতেই হবে। না হলে যে লোকমনে ক্ষমতার দৃশ্যমান ভিত্তি স্থাপন করা দুষ্কর! সেই মাথাব্যথা থেকেই অযোধ্যার চিফ কমিশনার বলেছিলেন,

---

[135] Circular Letter from the Secretary to the Government of India, Foreign Department, with the Governor General, To the Secretaries to the Government, Fort St. George, Bombay, Bengal, North-Wastern Provinces, and Panjub, Governor General's Agents, Central India, Rajpootana, and North-East Frontier, Political Agent, Munnipore, Residents Hyderabad and Nepa, Chief Commissioners, Oudh, Central Provinces, and British Burmah, and Commissioner of Mysore, -- No. 1543, dated Simla, the 11th September 1867; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[136] তিনি লিখেছিলেন, "Would not extend privilege to Durbars, at least in Behar, because there are many natives of rank there who, taking off their shoes themselves, would feel insulted if a Bengalee Baboo were allowed to keep his on at the same Durbar." দ্রষ্টব্য, Replies to Circular No. 1543, dated 11th September 1867, regarding shoe question; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[137] From Agent North Eastern Frontier, No. 320, dated 30th September 1867; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[138] Replies to Circular No. 1543, dated 11th September 1867, regarding shoe question; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

যেখানে কোনো নেটিভ স্বজাতীয়দের ঘরে জুতো পরে প্রবেশ করেন না, সেক্ষেত্রে তাদের অফিস-আদালতে জুতো খুলে প্রবেশ করতে সমস্যা কোথায়![139]

জুতো সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন নিয়ে সরকারের অন্দরে Sir Temple ও Sir Salar Jung-এর মতো মতামত কিন্তু আরও অনেকেই রেখেছিলেন। পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর যেমন দেশীয় ধরণের জুতো পরলে জুতো খুলে প্রবেশ করা ও বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরলে জুতো পরে প্রবেশ করা – এই নিয়মটিকে "immaterial" বা ফালতু নিয়ম বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই ধরণের নিয়মকে শাসিতের আচার-বিচারের প্রতি শাসকের উপেক্ষার ফসল হিসেবে বর্ণনা করে তিনি লিখছেন, 'The concession o the privilege [অর্থাৎ বিলিতি শিষ্টাচারে পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরতে পারা দেশীয়দের জুতো পরে অফিস-আদালতে প্রবেশ করতে দেওয়া] was originally the result of our ignorance of native ways and thoughts.'[140] তাছাড়া মধ্য ভারতের প্রশাসক, রাজপুতানার প্রশাসক, বার্মা ও মুন্নীপুরের প্রশাসকরাও তদ্রুপ মতামত পোষণ করেছিলেন।[141] কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা নিজেদের "নেটিভত্ব"কে কিভাবে অস্বীকার করছিল – তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। সেই স্বাতন্ত্র্যবিলাসী অস্বীকারের উদ্দেশ্য যে সরকারের কাছ থেকে নিজেদের প্রিভিলেজ আদায় করা – তা পরবর্তীকালে আলোচনার অগ্রগতীর সাথে আরও পরিষ্কার হবে। আর সেই স্বাতন্ত্র্যবিলাশ সাদা-চামড়ার কিছু অফিশিয়ালদের অহঙে আঘাত দিলেও অনেকের তাতে শিলমোহর দিতে কোনো অনীহা ছিল না। মধ্যপ্রদেশের প্রশাসক Mr. Campbell বলেছিলেন, দরবার বা আদালতে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচারে সজ্জিত মোজা-বুট পরা পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেটিভকূলের কাছ থেকে যদি সম্মান আদায় করতে হয়, তাহলে তাদের মাথায় ক্যাপ পরার উপরও জোর দিতে হয়। যাতে তারা উচ্চপদস্থদের সামনে ক্যাপ খুলে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে।[142] এক্ষেত্রে বিশেষত পার্সিদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পানিক্কর তাঁর প্রবন্ধে জুতো খুলে অফিস-আদালতে প্রবেশ নিয়ে পার্সিদের মধ্যে যে উষ্মার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল – সে বিষয়ে বিশদে লিখেছেন। পার্সিদের সংস্কারানুসারে কোনো

---

139 From Officiating Secretary, To Chief Commssioner, Oudh, No. 182, dated 11th January 1868; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

140 From Punjab Government, No. 345-1390, dated 23rd September 1867; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

141 From Agent, Central India, No. 64-300, dated 10th October 1867; From Agent, Rajpootana, No. 1196-72G; dated 30th September 1867; From Chief Commissioner, British Burmah, No. 6M-204, dated 2nd November 1867; From Political Agent, Munnipoor, No. 61, dated 18th November 1867; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

142 From Secretary, To Chief Commissioner, Central Province, No. 52-370, dated 6th Januaey 1868; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

ব্যক্তিকে জুতো খুলতে বাধ্য করা মানে তার ধর্মীয় সংস্কারকে অবমাননা করা। কিন্তু সম্মান-প্রদর্শন করতেই হবে। জুতো খুলে হোক বা ক্যাপ খুলে।[143] হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্টও যেমন একদল অভিজাতদের দেখাদেখি সাধারণ নেটিভদের দেশী জুতো পরে দরবারে প্রবেশের প্রবণতার উপর রাশ টানার জন্য কোথাও একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কথা বলেছেন। এরও মূল উদ্দেশ্য সম্মান আদায় করে নেওয়া।[144]

পক্ষে-বিপক্ষে নানা দিক বিবেচনা করে ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নির্দেশনামা বড়োলাটের কাছে পাঠানো হয়। জুতো সংক্রান্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৭ সালে সরকারের প্রাথমিক সুরটিই এই নির্দেশনামাতে গ্রথীত হয়েছিল। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেটিভ কর্মচারীদের সম্মানের দিকটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এমন কোনো নির্দেশ প্রণয়ন করা যাবে না, যা দেশীয় "জেন্টেলম্যানদের" মধ্যে সময়ে সময়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দেবে। অর্থাৎ এককথায়, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নিজেদের বিশ্বাস ও আস্থা না থাকলে তারা নিজেদের সেরাটুকু দিয়ে সরকারের সেবা করবেন কিভাবে। বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরতে দিয়ে তাই পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের আস্থা-পিয়াসী উপনিবেশিক সরকারের নির্দেশনামায় লেখা হচ্ছে, '...Natives of India who have adopted the European style in respect to boots and shoes should be permitted to appear on official and semi-official occasions in the presence of the servants of the British Government. ... The practice has been for many years allowed at Government House in Calcutta, and was definitively settled by Notification, No. 5356, of the 19th December 1854, in the Foreign Department.' অর্থাৎ নেটিভদের বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরে অফিসে-আদালতে প্রবেশের যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তা ১৮৫৪ এর আইনের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু সেই পূর্ব নিয়ম আবার বহাল করে, সরকারের প্রতি প্যাশ্চাত্য শিক্ষিত সরকারি চাকুরে নেটিভকূলের ক্রমবর্ধমান আশাভরসাকে সজীব রেখে সাম্রাজ্যের তরণীকে ভাসিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সরকারের বক্তব্য, 'It is now deemed requisite that the same privilege should be allowed throughout the Bengal Presidency. Otherwise there would arise grave inconvenience if Natives of position and consequence, who had enjoyed this concession at the capital and before Viceroy, were to be denied it before any British officers at the stations in the interior of the country. … individual Native gentlemen might feel uncertain as to what they are or are not entitled to do, and thus embarrassing personal questions might form

---

143 Replies to Circular No. 1543, dated 11th September 1867, Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

144 From Resident Hyderabad, No. 47, dated 9th October; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

time to time arise.'[145] তাই যেসব নেটিভ বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ জুতো পরে অফিস-আদালতে আসবেন, তাদের জুতো নিয়ে অফিস-আদালতে প্রবেশে নির্দেশিকাতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু যারা দেশীয় শিষ্টাচারের পোশাক পরে আসবেন, তাদের দেশীয় শিষ্টাচার মেনে জুতো খুলে অফিস-আদালতে প্রবেশ করার বিধাণ নির্দেশিকা প্রদান করেছে।

তবে এই বিধাণ নিয়েও অনেক ব্রিটিশ অফিশিয়ালদের মধ্যে কিন্তু ছিল। যেমন H. M. Durand মনে করেছেন, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানকার অবস্থা কলকাতার মতো নয়, অর্থাৎ যেখানে দেশীয়দের মধ্যে বিলিতি শিষ্টাচারের অনুপ্রবেশ তেমন ঘটেনি, সেখানে এই আইন প্রণীত হলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত নেটিভরা ভাবতে পারে – ইউরোপীয় আচার ও ইউরোপীয় জুতোর বাজারের পৃষ্ঠপোষতা করতে সরকারের এই ফন্দি। তাছাড়া তিনি আরও বলছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের জন্য এই আইন প্রণয়ন করলে, সরকার বাহাদুরের দ্বারে প্রিভিলেজ প্রাপক নেটিভরা দেশীয় রাজপুরুষদের কাছ থেকে একই প্রিভিলেজ পেতে চাইবে। তাতে তাদের সম্মানে আঘাত আসতে পারে।[146] যদিও গভর্নর জেনারেল John Lawrence দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টি পত্রপাঠ খারিজ করেন। তিনি বলছেন, দেশীয় রাজপুরুষদের কথা চিন্তা করা তাঁর কাজ নয়। হবেই বা কেন। উনিশ শতকের ষাটের দশক তো একপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের উত্তুঙ্গ দশা। তখন আর ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারে রাজপুরুষদের সাথে আঁতাত রক্ষার ততটা প্রয়োজনীয়তা নেই।[147] কিন্তু গভর্নর জেনারেল প্রথমোক্ত বিষয়টি নিয়ে কোনো বাক্য-ব্যয় করেননি। অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে বিলিতি রুচির পরিসর বাড়ার ফলে উপনিবেশে বিলিতি পণ্যের বাজারকে সচল রাখার তাগিদ যে সাম্রাজ্যিকভাবে সচল ছিল – তা গভর্নরের স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না।[148] অন্যদিকে Sir W. Muir যেমন বলেছিলেন, ভারতের সব অঞ্চলে উনিশ শতকের ষাটের দশকেও বিলিতি স্টাইলে জুতো পরা ও দেশীয় স্টাইলে জুতো পরার মধ্যে পার্থক্য সঠিকভাবে প্রসারলাভ করেনি। যার ফলে নেটিভদের মধ্যে এই সরকারি নির্দেশ একটা বিভ্রম তৈরি করতে পারে এবং এই

---

[145] Replies to Circular No. 1543, dated 11th September 1867, Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[146] Munite by Major General the Hon'ble Sir H. M. Durand, 20th February 1868; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[147] Minute by His Excellency the Governor General, dated 3rd March 1868; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[148] বিশ শতকের তিরিশের দশকে দেশীয় বাজারে দেশী ধরণের জুতোর সাথে পাল্লা দিয়ে বিলিতি ধরণের জুতোর প্রাধাণ্য এঁকেছিলেন একজন লেখক। সেই জুতোর মধ্যে চাপলি, নাগরাই, লক্কা, রমনী রঞ্জন নাগরা, চরণ-শ্রী স্যাণ্ডেল যেমন ছিল, তেমনি পাম্পসু, ডার্ব্বি, আলবার্ট, অক্সফোর্ড, বুট ইত্যাদিও ছিল। তাঁর ভাষায়, 'আজকাল বিলাতী খুরওয়ালা জুতার সহিত প্রতিযোগিতায় হঠিয়া গেলেও কিছুদিন আগেও স্বদেশীয় সুন্দরীদের মহলে লক্কার খুব প্রতিপত্তি ছিল। দ্রষ্টব্য, 'পাদুকা-প্রসঙ্গ', শনিবারের চিঠি, ১ম সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৪১।

বিভ্রম জনিত পোশাকি আচরণের ফলে সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অসম্মানিত হতে পারেন।[149] গভর্নর জেনারেল এই মতটিকেও পত্রপাঠ খারিজ করেছেন। তাঁর মতে, ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে বাংলার বাইরেও সেই শ্রেণির বিকাশ ঘটাবে যাদের মধ্যে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচার গ্রহণের প্রবণতা বাড়বে। তাই ভারতে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী সাম্রাজ্যিক শিষ্টাচারের পরিসরের কথা বিবেচনা করে এই আইনকে তিনি প্রয়োজনীয় বলেছেন।[150]

প্রশাসনিক চিঠি-পত্রের খণ্ডিত বক্তব্যগুলি থেকে যদি জুতো প্রশ্নে প্রশাসনের মূল ভাবকে তুলে ধরা হয়, তাহলে দুটি দিক বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত, প্রশাসন উচ্চপদস্থ আধিকারিক তথা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মান আদায় করা নিয়ে বেশি সচেতন। দ্বিতীয়ত, প্রশাসন পাশ্চাত্য রুচির ক্রমবর্ধমান পরিসরে বিলিতি শিষ্টাচারের কৌলিন্য রক্ষা নিয়ে বেশি সচেতন। বিলিতি পোশাকি রুচিতে অশিক্ষিত বিশাল সংখ্যক নেটিভের কোনো স্বর সেখানে নেই। কেবল চাপিয়ে দেওয়াটাই সেখানে মুখ্য। তাই ১৮৭৪ সালে জুতোর প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের সাথে যে আচরণটি হয়েছিল, সেই আচরণের জন্য কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো ক্ষমা প্রার্থনা নেই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা লিখেছিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ফিরিয়া গিয়াছেন বলিয়া ... তাহার জন্য একটু দুঃখপ্রকাশও করা হইল না; দ্বারবানকে দোষী করাও হইল না; আর ভবিষ্যতে তাহাকে এরূপ করিতে বারণ করা হইবে, তাহাও বলা হইল না।" বরং "সোসাইটীর অধ্যক্ষসভা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে টিটকারী দিয়া বলেন যে, দেশীয় লোকে দেশীয় আচার-ব্যবহার ভাল জানেন।"[151] অর্থাৎ দেশীয় হিন্দুদের জুতো খুলে গৃহ, মন্দির ইত্যাদিতে প্রবেশকে ইংরেজরা সম্মান জ্ঞাপনের নিশান হিসেবে পাঠ করেছিলেন। কিন্তু 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'এর মতো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র উপনিবেশিকদের সেই পাঠকে পত্রপাঠ খারিজ করে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, "সোসাইটীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্যকে বুঝাইয়া বলা হয়, -- দেশীয় আচার জুতা খোলা বটে; কিন্তু সে কোথায়? যেখানে চেয়ারে বসিবার ব্যবস্থা, সেখানে জুতা খুলিতে হয় না; যখন ফরসা বিছানায় বসিতে হয়, তখনই

[149] Minute by Hon'ble Sir W. Muir, dated 21st February; Foreign Department General Branch, March 1868, National Archives of India, New Delhi.

[150] Minute by His Excellency the Governor General, dated 3rd March 1868.

[151] বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর: সমালোচনা, সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী*- পৃ ৫২৪।

বিদ্যাসাগরের মতন ব্যক্তিত্বের সাথে ঘটা এমন ঘটনা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক সংবাদপত্র The Englishmanও লিখতে বাধ্য হয়েছিল, "If the leaving the shoes behind is a mark of respect, it matters little whether the shoes are of European or the native pattern. But if there is a mark of respect attached to the leather, it is immaterial as to what form the leather may take. We hope the Council of Asiatic Society and the Trustees of the Museum will have the good sense not to make native gentlemen feel that to enter their room is to court insult." দ্রষ্টব্য, শ্রীবিনয় ঘোষ, 'নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩, পৃ ৩৬।

জুতা খুলিতে হয়। সম্মান দেখাইবার জন্য জুতা খোলা ভারতবাসীর নিয়ম নহে।"[152] অর্থাৎ 'হিন্দু প্যাট্রিয়টের' মতে সাদা-চামড়ার বৈষম্যবাদই এই চটি সমস্যার মূলে।

হিন্দু বর্ণবাদের শ্রেণি-বৈষম্যে আঘাত করে সাদা-চামড়ার ইংরেজ প্রশাসন নিজেদের প্রগতিবাদী হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেও, সেই প্রগতির মধ্যেই অন্তঃসলিলা হয়ে নতুন বৈষম্যের বীজ উপ্ত হচ্ছিল বলেও বিদ্যাসাগরের সমকালীন আরেকটি সংবাদপত্র অভিযোগ তুলেছিল। ব্যঙ্গের সুরে ১৮৭৪ সালের ১২ই জুলাই 'সাধারণী' পত্রিকার "তালতলার চটি" শীর্ষক রচনায় লেখা হয়েছিল, "ইংরাজ, বটবিটপীর সহিত সাফোটক সমান করিয়া তুলিয়াছেন, কেবল বুট-চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না। ইংরাজ, মহারাজ সতীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের সহিত মধু মুচীকে এক কাণ ফোঁড়া কাগজে গাঁথিলেন, কেবল, রে চটি! তোর দূরদৃষ্টক্রমে বুট-চটি, একভাবে দেখিতে পারিলেন না। ইংরাজ, বিচারকার্য্যের সাহায্য জন্য সাক্ষী ডাকিয়া আনেন, আনিয়া তিনু ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্ব্বভৌমকে দাঁড় করান, আবার সার্ব্বভৌমের স্থানে গুলজার মণ্ডলকে উঠাইয়া দেন, ইংরাজের চক্ষে উচ্চ নীচ নাই, কেবল রে চর্ম্মচটি! তোরই প্রতি তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরাজ বাহাদুর বস্ত্র পরিষ্কারককে অস্ত্র চিকিৎসক করিয়াছেন, মলজীবির পুত্রকে মসীজীবি করিয়াছেন, ধীবর মৎসজীবিকে, ধীমান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পীরবক্স খাঁকে রায়বাহাদুর করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগ্য তালতলার চটি, এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র উন্নতি হইল না।"[153] যুগে যুগে জুতো এভাবে ক্ষমতা, স্ট্যাটাস ও ক্ষাত্র-তেজের প্রতীক হয়েছে।[154]

আশুতোষ মিত্রের মতো স্ট্যাটাস-বিলাসীরা সংখ্যায় বেশি হলেও বিদ্যাসাগরের মতো হাতেগোনা নির্ভীকও কিন্তু কালের প্রবাহের সাথে এসেছেন। যেকারণে শির বিকিয়ে দেওয়া আর শির সোজা রাখার পার্থক্যটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ঠিক কিরূপ তা বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরী চটি কোথাও যেন স্বাধিকারের চিহ্ন হয়ে ওঠে। কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের মধ্যে আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদে উৎকর্ষের কল্পিত বিশ্বের পিছনে দৌঁড়ানোর যে প্রবণতা গড়ে উঠছিল, ধুতি-ফতুয়া-চাদর-চটিজুতোয় বিদ্যাসাগরের সচেতন বেশ-বিন্যাস যেন যাপনের মধ্য

---

[152] তদেব।

[153] তদেব, পৃ ৫৩৫; সাধারণী, ২য় ভাগ, ১৩ সংখ্যা, ২৯ শে আষাঢ় ১২৮১।

[154] 'পাদুকা-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে এর কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছিল। যেমন, একটি গল্প শোনা যায়, প্রাচীন মিশরের কোনো রাজা নাকি নদীতে একজোড়া জুতা ভাসতে দেখে জুতার অধিকারিণীকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। এখান থেকে লেখকের যুক্তি, 'ইহা হইতে বোঝা যায়, তখন জুতার শুধু চলই ছিল না – জুতা গড়িবার পদ্ধতিও কতটা উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল যে চেহারা দেখিয়াই জুতার মালিক পুরুষ কি নারী এবং সুন্দরী কি অসুন্দরী ধারণা করা যাইত।' লেখকের সকৌতুক বক্তব্য – বিশের দশকে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় জুতা দেখে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অসম্ভব। কারণ সবশ্রেণীর মানুষই তো তথাকথিত সভ্য-রুচির দিকে ধাবিত। দ্রষ্টব্য, 'পাদুকা-প্রসঙ্গ', শনিবারের চিঠি, ১ম সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৪১।

দিয়ে সেই মধ্যবিত্তজ কুপমণ্ডুকতার প্রতিবাদ। তাই বিদ্যাসাগর সরকারি কার্য্যেও ড্রেস কোডকে অমান্য করার হিম্মত রেখেছিলেন। এমন একটা সময়ে বিদ্যাসাগর গড়ে উঠেছিলেন, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেটিভ যুবাদের মধ্যে দেশীয় সমাজ-সভ্যতা-ধর্ম বিষয়ে নাক কুঁচকে মেকি সভ্যতা প্রদর্শনের প্রবণতা ছিল বেশি। তিনি কিন্তু স্রোতের বিপরীতে থেকেছেন। বিনয় ঘোষ বলেছেন, বিদ্যাসাগরের মধ্যে কি সেই স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা ছিল না? ছিল, কিন্তু সেটা অন্যভাবে। সেখানে দেশীয় আচার-বিচারের প্রতি নাক কুঁচকে স্বাতন্ত্র্যের মেকি ভানটা ছিল না। যেটা ছিল, তা হল – সেই দেশীয় আচার-বিচারের মধ্য দিয়েই দেশীয় সমাজের মধ্যে থেকে সেই সমাজের পশ্চাদপদতাকে কাটানো। যেটা ইয়ং বেঙ্গলরা পারেননি। দেশীয় সমাজ কুসংস্কারগ্রস্ত বলে তাঁদের অনেকেই স্বধর্ম ত্যাগ করেছেন। অসীম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশীয় সমাজের উন্নতির জন্য কিছু করতে পারেননি। সমাজের ভেতরে থেকেই সমাজের উন্নতিসাধন করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই কঠিন দায়িত্বটি বিদ্যাসাগর পালন করেছিলেন।[155] তাঁর স্বাধিকারের বোধ এতই প্রবল ছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে তা ইংরেজের হাতে বিকিয়ে যায়নি। শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, “ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতোসুদ্ধ টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।”[156] নিজের পোশাকি স্বাধিকারের এই সোচ্চার ভাবের জন্য নানাভাবে অপদস্থতার শিকারও হয়েছেন। দমে যাননি। সেই অপদস্থতা নিয়ে নানা গল্পও চাওড় হয়েছিল। যেমন কোনো সরকারি কাজে বিদ্যাসাগর দেশীয় শিষ্টাচারের পোশাকে কোনো এক সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে, সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পোশাক দেখে তাঁকে নীচস্থানীয় নেটিভ ভেবে নিয়ে টেবিলের উপর থেকে নিজের বুট-পরা পা নামিয়ে ভদ্রতা দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। সেই সাহেবকেই একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে আসতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশাল বাড়ি ও তাঁর সুবৃহৎ পুস্তাকাগার দেখে সাহেব ভাবছিলেন – এমন বাড়ি ও লাইব্রেরির কর্তার এমন দীন বেশ। যা কিছু নিজের সত্তার সাথে জড়িত তাকে অস্বীকার করাই তো দীনতা। এই বোধটা বাঙালি সমাজে স্বদেশীর আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল। বিদ্যাসাগরও তাঁর তালতলার চটি-পরা পা টেবিলে তুলে সাহেবের কৃতকর্মের শোধ নিয়েছিলেন এবং সাহেবকে বলেছিলেন, ‘ভদ্রতার এমন নমুনা আপনাদের কাছে শেখা।’[157] – এই ধরণের কাহিনির বহুল প্রচারের মূল কারণই হল, সাদা-চামড়ার শাসকদের বিদ্বেষে বাঙালির অন্তর্লোক এতটাই হীনমন্যতায় নিমজ্জিত হয়েছিল যে, তারা অবচেতনে সেই বিদ্বেষের শোধকে এইভাবে উদযাপন করছিলেন।

---

[155] শ্রীবিনয় ঘোষ, ‘নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর’, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩, পৃ ৩৪; শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগরনতুন করে জানা অন্যভাবে চেনা :*, (কলকাতা: পুনশ্চ, ফেব্রুয়ারি ২০২১), পৃ ৩০৪-৩২০।

[156] তদেব, পৃ ৩৬।

[157] শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ, ‘পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ’, ভারতবর্ষ, ৫২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৭২, পৃ ৭৩৬।

পাগড়ি: শাসক-সত্তার অপর দৃশ্যমান ভিত্তি ও উনিশ শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয়

জুতোর মতো পাগড়িও ঔপনিবেশিক ক্ষমতার চরিতার্থতায় ভূমিকা রেখেছিল। ১৮৮০'র দশকে ব্রিটিশের অফিস-কাছারিতে পাগড়ি পরা নিয়ে একদল দেশীয় মহোদয়দের মধ্যেকার বিরক্তি এবং সেই বিরক্তি নিয়ে শাসক-বাহাদুরের মনোভাবের আবর্তে শাসকের পোশাকি চরিত্রের বিকাশ বোঝা যায়। তার সাথে দেশীয় মধ্যবিত্ত পুরুষের পাশ্চাত্য রুচির পরিমণ্ডলকেও বুঝতে সাহায্য করে।[158] অর্থাৎ উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে সাম্রাজ্যবাদের উত্তুঙ্গ দশায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উপনিবেশিক শাসকের মধ্যেকার ক্ষমতার টানাপোড়েনকে বুঝতে পাগড়ি'র অবস্থানকে একটা 'টেক্সট' হিসেবে পড়া যায়। অ্যালিসন লুরি'র মতানুসরণ করে বলতে হয় – শরীরে ধারণ করা পোশাক এইভাবেই সামাজিক ভাষা লাভ করে।[159]

বলা বাহুল্য, ১৮৮০'র দশকে ভারতবর্ষীয় মধ্যবিত্ত সমাজ অনেকটাই নাগরিক সমাজের কাঠামো পেয়ে গেছে। যার পরিণতি হিসেবে আমরা ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের উত্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারি। যদিও এই নাগরিক মঞ্চের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পদ্ধতিটা প্রশ্নযোগ্য তবুও মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক মননের বিকাশের অগ্রগতির ফসল হিসেবেই যে এর উত্থান—এই দিকটাকে অস্বীকার করবার জো নেই। তাই ১৮৮০'র দশকে এসে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত একদল দেশীয় যখন সরকার নির্দেশিত দেশীয় কর্মচারীদের 'Dress Code'এর অঙ্গীভূত একটি উপকরণ—শামলা বা পাগড়ি পরতে তাঁদের অসুবিধার কথা জানাচ্ছেন, সেই মতপ্রকাশের বিষয়টাকেই এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হয়। অবশ্য শেক্সপিয়র-কীটস-বাইরন-শেলী পড়া বাঙালি মধ্যবিত্তের পরিচ্ছদ বিষয়ে মতপ্রকাশের যাত্রাপথটার সূত্রপাত ১৮৬০ এর দশক থেকে। কারণ ওই দশকেই আশুতোষ মিত্রের মতো একজন দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে বুট পরে অফিসে প্রবেশে তাঁকে কেন বাধা দেওয়া হল – এই বিষয়টি জানতে চেয়ে সরকারের কাছে তদ্বির করেছিলেন। যদিও সেই তদ্বিরের জোর ততটা বেশি ছিল না। কিন্তু সরকার তবু বিনা মেঘে বৃষ্টির মতো পাশ্চাত্য শিক্ষিত আশুতোষ মিত্রদের বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরে অফিস-আদালতে প্রবেশের লিখিত আইন এনেছিলেন।[160] এই ছাড়পত্রের পিছনে এদেশে

---

[158] Pagree Question- Memorial of natives of Bengal for adoption of European costume of uncovering the head, File No.250, proceeding No-19-20, February 1880, Political Department, WBSA, Kolkata.

[159] Alison Lurie, 'The Language of Clothes: The Definitive Guide to People Watching Through Ages' (Middlesex: Hamlyn Publishing, 1983).

[160] Shoe Question, Proceeding No.4-5, 18th October 1867, Political Department, WBSA, Kolkata.

বিলিতি রুচির ক্রমবর্ধমান পরিসরের বাজারি দিককে সুনিশ্চিত করবার একটা তাগিদ যে ছিল – তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আবার ভারতের মতো বহুধা-ভাবের দেশে বহু বৈচিত্র্যের পোশাককে সরকারি কাজকম্মে একটা একীভূত রূপ দেওয়ার তাগিদ সরকারের জুতো সংক্রান্ত নির্দেশিকা নিবিড়ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়।

ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিস্তারের প্রথম লগ্নে ব্রিটিশরা যখন দেশীয়দেরকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা শুরু করেন, তখনই তাঁরা দেশীয় সেনার ঐক্য বিধানের লক্ষ্যে তাঁদের পোশাক কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। ১৭৯৮ সালে 'A Bengal Officer' নাম নিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন গোরা সাহেব দেশীয় ঔপনিবেশিক সেনাদের পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে শৃঙ্খলার আবশ্যিকতা সাম্রাজ্যের সুস্থিতির জন্য কতটা প্রয়োজন—তা উপলব্ধি করে একটি ছোট্ট গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে তিনি লেখেন—' The want of general uniformity, in the Dref[s]S of our native Corps, is a circumf[s]tance that cannot have ef[s]caped common obf[s]ervation; but Commanding Officers exercif[s]ing a latitude in this ref[s]pect, think perhaps, that it would argue a poverty of taf[s]te, to lean to others for a grace.—Variety is therefore f[s]o much indulged, that f[s]carce two battelion in the f[s]ervice have a mutual coincidence in Dref[s]s.'[161] অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্তে তৈরি বাহিনীর নেটিভ ও ব্রিটিশ বিভাগের মধ্যে পোশাকের আসমান-জমিন তফাত যেন চোখের সামনে সাম্রাজ্যিক অনৈক্যকে তুলে ধরে। সরকারি কাজেকর্মেও সেই ঐক্যবিধাণের মানসিকতা থেকে শাসকের জুতো প্রশ্নে পাশ্চাত্য শিক্ষিত সরকারি চাকুরিজীবীদের প্রতি উদারতা।

যদিও সেই অনৈক্য ঘোচাতে কম্যান্ডিং অফিসাররা তেমন উদ্যোগী নন। কারণ নিজেদের ইউনিফর্মের রুচির পরিধিকে নেটিভদের রুচির পরিধির ধারে কাছে আনলে যেন তাঁদের রুচি কৌলিন্যহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার বিভাজন মানসিকতাটা পোশাকের মধ্যেও কিরূপ অন্তঃলীন হয়ে অবস্থান করে তা এখান থেকে খানিকটা স্পষ্ট। তাই গ্রন্থকার সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না – এই মানসিকতা রেখে পোশাকি আইন প্রণয়নের নিদান দেন। সেই নিদানে দেশীয় সেনা ও ইংরেজ সেনাদের মধ্যে বিভাজন প্রদর্শক একমাত্র উপকরণ হল মস্তকাবরণ। দেশীয় সেনাদের জন্য তা পাগড়ি ও ব্রিটিশ সেনাদের জন্য তা ক্যাপ। তা বাদ দিয়ে দেশীয় ও ব্রিটিশ সেনা উভয়কেই কোমড় বন্ধ, প্যান্টালুন, বুট, ক্লোজ জ্যাকেট, হুক আর আইস দিয়ে জ্যাকেটকে আঁটসাঁট করে না বেঁধে দেশীয় সেনাদের কোটকে দেহ সংলগ্ন রাখতে কালো রঙের সুন্দর গুচ্ছসুতোর টাসল ব্যবহার করবার কথা বলেছেন।[162] সবকটা পোশাকি প্রস্থই

[161] *Observations and Remarks on the Dress, Discipline of the Military* by a Bengal Officer, (Calcutta: C.A Vogel—Telegraph Press, 1798), p.5

[162] Ibid, p.6

ক্রান্তীয় আবহাওয়ার উপযোগী হওয়া চাই। কিন্তু বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকি প্রস্থ ক্রান্তীয় আবহাওয়ার উপযোগী করে তুলতে গিয়ে – তার সৌন্দর্য্যবোধ হারাক সেটাও লেখক চাননি।[163] আবার পাশ্চাত্য আচারের পোশাকি রূপ রক্ষা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়ার দেশে প্রশাসনিক ক্ষমতার চরিত্রায়নের ভিত্তি অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের শরীর ভুক্তভোগী হোক – সেটাও তাঁরা চাননি। তাই এমন একটা মধ্যবর্তী পথ খোঁজা হয়েছিল, যাতে ক্ষমতার পোশাকি চরিত্রায়নও করা যায় আবার বস্তুশরীরের আরাম বিধাণও করা যায়।[164] পাশ্চাত্য পোশাকি আচারকে উপনিবেশের আবহাওয়া অনুসারে অভিযোজিত করতে বলা হলেও তাই, যে পাশ্চাত্য পোশাকি আচারে ক্রান্তীয় জলবায়ুর কোনো বিরোধ ঘটছে না – তাকে বাতিলের কথা বলা হচ্ছে না। বা নেটিভ সেনানির শরীরের সব অংশ পাশ্চাত্য ধরণের পোশাক অধিকার করে নিলেও কিছু অংশকে দেশীয় শিষ্টাচারের অধিকারে থাকতে দেওয়া হচ্ছে। হতে পারে, সেই দেশীয় পোশাকি শিষ্টাচারের সাথে নেটিভদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি জড়িয়ে। কিন্তু উপনিবেশিক প্রশাসনে সেই আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়াও তাদের বৃহত্তর ক্ষমতার রাজনীতির অঙ্গ। তাই উক্ত রচনায় বাকি সব বিভাজন তুলে দেওয়ার পক্ষে মত থাকলেও পাগড়ি ও টুপির প্রশ্নে বিভাজন তোলা নিয়ে কোনো বাক্যব্যয় করা হয়নি। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, ১৮০০-র দশের দশকের মাদ্রাজে নেটিভ রেজিমেন্টের সেনাদের মাথা থেকে পাগড়ি হঠিয়ে টুপির মতো মস্তকাবরণ ড্রেস কোডে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে ভারতের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। যার দরুণ দেশীয় কর্মচারীদের

---

163 লেখকের মতে, এই ক্লোজ জ্যাকেট ইংরেজ সেনানীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু সেই জ্যাকেট হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। ক্রান্তীয় জলবায়ুর দেশে এহেন জ্যাকেট কতটুকু আরামদায়ক সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু যেহেতু জনপ্রিয় পোশাকি প্রস্থ – তাই যেন পরতেই হবে। আর আবহাওয়ার সাথে সাজুয্য রেখে পরতে গিয়ে যত বিপত্তি। পোশাকের নান্দনিক বোধটাই অনেকসময় ভুক্তভোগী হত। লেখকের দৃষ্টিতে পড়েছে – সেনানিরা জ্যাকেটের স্কার্ট অংশ কেটে, সেই অংশকে মিলিটারি দ্রব্যসামগ্রী বহনের থলে হিসেবে ব্যবহার করছেন। যা মোটেই রুচিস্মমত ঠ্যাকেনি তাঁর কাছে। সুতরাং তাঁর নিদান সেনানিরা যদি এহেন জ্যাকেট পরেন তাহলে সেই জ্যাকেটের সৌকর্য বজায় রেখেই তা পরুন। তা না হলে জ্যাকেটের কাটা অংশে কোমরবন্ধনী আটকে দিন। দ্রষ্টব্য, Ibid

164 সেনাদের জুতোর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ঘোড় সওয়ার সেনারা হাঁটু পর্যন্ত বুট পরলে কোনো আসুবিধা নেই কিন্তু পদাতিক সৈন্যরা যদি হাঁটু অবধি বুট পরতে চান তা মানা যায় না। কারণ সবক্ষেত্রে একটা মানানসই ব্যাপার আছে। তার উপর এইধরনের বুটে রক্তসঞ্চালনের অসুবিধার কারণে স্থলভাগে স্বাধীনভাবে পদসঞ্চালনে বাধা আসে। সেকারণে লেখক পদাতিক বাহিনীর জন্য সাধারণ পা-ঢাকা বুট উপযোগী বলে দাবি করেছেন। তবে দেশীয় সেনাদের জবড়জং জুতোকে তিনি জ্যাকেট, পাগড়ি ও প্যান্টালুনের সাথে মানানসই নয় বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য—'If we are so subservient to the tyranny of custom, that our European Officers, of infantry, must still retain the long boot, with all its faults, why insist on it with the Native Officers?—They already wear the pantaloon; and in God's name let them have short boot also…' এখানে তিনি বলতে চাইছেন, কোন কোন সময় প্রথার বাইরে বেরুতে হয় পরিস্থিতির দাবি মেনে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুট ব্রিটেনে পদাতিক সেনাদের জন্য উপযোগী, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো ক্রান্তীয় জলবায়ুর অঞ্চলে নয়। তাই এখানে গোরা সৈন্যদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে প্রথাগত রুচি নিয়ে গোঁ ধরে থাকলে হবে না। আবার অন্যদিকে দেশীয়রা যখন ইম্পেরিয়াল আর্মির সাথে যুক্ত হয়েছে, তখন তাদের জৈব শরীরও সাম্রাজ্যের লক্ষ্ণ প্রকাশের মাধ্যম। সুতরাং ব্রিটিশ সেনার পোশাকি উপকরণ তাদের পরতে দেওয়া যাবে না, এই মত নিয়ে পড়ে না থেকে, তাঁদেরকে প্যান্টালুনের মতো ছোট পা-ঢাকা বুট পরতে দিতে হবে। দ্রষ্টব্য, 'Observations and Remarks on the Dress, Discipline of the Military', p.13

পোশাকে হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশাসন সাবধান হয়ে ওঠে।[165] কিন্তু সরকারি চাকরিতে পাশ্চাত্য রুচির পোশাকি অনুশীলনে উদগ্রীব নেটিভদের অফিস-আদালতে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরে প্রবেশে ছাড়পত্র দেওয়া উপনিবেশিক প্রশাসন ক্ষমতার পোশাকি রূপটি বজায় রাখতে কিভাবে তৎপর হয়েছিল – তাও বিচার করে দেখতে হবে। কারণ অফিস-আদালতে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাক পরিধান করে মোজাসহ জুতো পরে প্রবেশে ছাড়পত্র দেওয়া মানে একদিক থেকে মনে হতে পারে – অফিশিয়াল কাজে শাসকের শরীরের সাথে শাসিতের শরীরের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু শাসকের ক্ষমতাশীল মন ততটা সরলও নয়। পাগড়ি প্রশ্নে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচারকে শাসক শাসিতের সামনে কিভাবে উপস্থাপন করবে এবং নিজেদের ক্ষমতার পোশাকি ভিত্তিটাকে কিভাবে বিনির্মাণ করবে – তা তলিয়ে দেখতে ও ভাবতে হবে।

বার্নার্ড কোনের মতানুসরণ করে বলা যায়, চাকুরিদাতার চাকুরের পোশাক-পরিচ্ছদ কি হবে, সেটা ঠিক করে দেবার মধ্যে একটা নিয়মতান্ত্রিক মানসিকতা কাজ করে।[166] সেই নিয়মগুলো অনেকসময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-যৌনতা এসব নির্মিতির সাথে যুক্ত হয়ে এমন সব রোম্যান্টিক কল্পনা তৈরি করে, যেগুলো কখনও কখনও বিভাজনের সমীকরণে ইন্ধন জোগায়। সেই কল্পনার রূপটা কিরকম সেটা একটা ছোট্ট উদাহরণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা দরকার। ১৯২২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, ‘Clothing: Choice, Care, Cost’ নামে একটি বই প্রকাশিত হয়, সেখানে সেনাবাহিনীর সাথে পোশাকের সম্বন্ধকে প্রকাশ করা হয় একটা কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি এইরম— “When I first put this uniform on,/I said as I looked in the glass./ It’s one to a million if any civilian,/My figure and form can surpass.’’[167] একজন নাগরিক যখন সেনাতে রূপান্তরিত হন, তখন সেনার পোশাকের সাথে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কল্পনা নাগরিকের মানসে প্রবেশ করে এবং মানসকে আচ্ছন্ন করে, দেশের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার বোধকে উজ্জীবিত করে। সুতরাং পোশাক এক্ষেত্রে যেমন নিয়মের দৃশ্যমান উপকরণ, তেমনি পোশাক রোম্যান্টিক কল্পনারও দৃশ্যমান ভিত্তি। এই দ্বিমুখীন সম্বন্ধকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে সেই নিয়ম এবং কল্পনা উপনিবেশবাসী একটা গোষ্ঠীর কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার আলোকপ্রাপ্তির সাথে সাথে একসময় শৃঙ্খল হয়ে ধরা দেয়। সুতরাং নিয়মের শৃঙ্খলে পরিণত হওয়ার মাঝামাঝি সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চাকুরিজীবী নেটিভ শ্রেণির স্বরটা পাগড়ি পড়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা নিয়ে সোচ্চার হওয়ার মধ্য দিয়ে কিভাবে

---

[165] Sumit Kanti Ghosh, ‘Body, Dress, and Symbolic Capital: Multifaceted Presentation of PUGREE in Colonial Governance of British India’, *Textile, pp. 1-32*, https://doi.org/10.1080/14759756.2023.2208502

[166] Annette B. Weiner & Jane Schneider ed., ‘Cloth and Human Experience’ (Washington, London: Smithsonian Institution Press, 1989), pp.303-304

[167] Mary Schenck Woolman, ‘Clothing: Choice, Care and Cost’, (Philadolphea: Lippincott Company: 2nd Edition, 1922)

ফুটে উঠেছে এবং নিয়মতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সরকার সেই সোচ্চার অবস্থাকে মোকাবিলা করে নিজেদের ক্ষমতার পোশাকি চরিত্রকে কিভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন, তা দেখা দরকার।

১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসে চাকুরিজীবি মধ্যবিত্ত নেটিভদের পক্ষে বাবু তারিণী কুমার ঘোষ বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর Sir Asley Edenকে একটি পত্র লেখেন। সেখানে উপনিবেশিক দরবারে, অফিসে, কাছারিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরেদের জুতো পরে প্রবেশের ছাড়পত্র সংক্রান্ত ১৮৬৮ সালের ১৯শে মার্চের নির্দেশিকাকে উল্লেখ করা হয়েছে।[168] যে নির্দেশিকার মূল বক্তব্য ছিল -- নেটিভদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে, অফিসে-আদালতে আসার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচার অনুশীলনের ঝোঁক বাড়ছে। তাই তাঁরা যাতে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচার নির্ভুলভাবে পালন করতে পারেন – সেজন্য তাদেরকে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে মোজাসহ বুট পরে অফিসে-আদালতে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া উচিত। এবং দেওয়া হয়েছিলও। বলা বাহুল্য, এর আগে ১৮৫৭ সালে দেশীয় সেনাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত নানা ক্ষোভ কিভাবে সিপাহী বিদ্রোহ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব তার ফলস্বরূপ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তান্তরিত হয়েছে। ব্রিটেনের স্বার্থ ভারতবর্ষের স্বার্থের সাথে অভিন্ন বলেও দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সাম্রাজ্যিক গদিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অনেকটা 'ধীরে চলো নীতি' অবলম্বন করেছিল। তাদের কাছে শিক্ষিত নেটিভদের বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে জুতো পরে দরবারে প্রবেশের ছাড়পত্র মঞ্জুর করা ছিল একপ্রকার শিক্ষিত নেটিভ চাকুরিজীবীদের হাতে রাখার একটা কৌশল। ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে, পোশাক সংক্রান্ত সরকারি বিধি-নিষেধের কড়াকড়িকে একটু শিথিল না করলে, যে বাঙালি মধ্যবিত্ত তাদের অফিসে কেরানির কাজ করেন, সাম্রাজ্যের চাকাকে সচল রাখতে সাহায্য করেন, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখা একটু চাপের হবে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের মধ্যে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচারের অনুশীলনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার এই সরকারি উপলব্ধি ভিত্তিহীন নয়। ১৮৬০ এর দশকে হুতোম লিখেছিলেন, 'আজকাল ইংরাজি লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানারকম বেশ ধরে আপিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যালো। দুই একজন সেকেলে কেরানিরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখতে পাবো না।'[169] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও বাঙালি মধ্যবিত্তের পরিবর্তনমান পরিচ্ছদ শৈলীর মধ্যে দোলাচলের একটা অদৃশ্য অথচ উচ্চকিত বৃত্তকে উপলব্ধি করে তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন, "কারো ধুতি উড়োনি পায়ে দীর্ঘ

---

[168]। Resolution on the question of Native Gentleman being required at reception , public or private or in courts of Justice to appear with their shoe,19th March,1868, Proceeding No.20, Political Department, January, 1880.

[169] কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত (কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার,২০১৩), পৃ।৫

বুট/ কারো ধুতির উপর ঝোলে একটি পিরাণ মোটে/ কারো সেটি অর্ধ ঢাকা দীর্ঘ চায়না কোটে।/বিলাতি পিরান কোট কারো চারু অঙ্গে/কারো আবার নেকটাই কাপড়ের সঙ্গে।"[170] তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে বাঙ্গালির পোশাকের এই দোলাচলকে বাঙ্গালির পরিচিতির দোলাচল বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচিবোধে উত্তীর্ণ হয়ে মোঘল দরবারী পোশাককে যেমন নবোত্থিত উপনিবেশিক ক্ষমতার পরিসরের সাথে মেলাতে পারছিলেন না, তেমনি ব্রিটিশ রাজ নিজেদের রাজনৈতিক দেহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য চাকুরিজীবী নেটিভদের উপর যখন সেই মোঘল দরবার-ঘেঁষা পোশাক 'ড্রেস কোড' হিসেবে প্রণয়ন করেছিলেন -- সেটা মেনে নিতেও তাঁদেরকে নতুন রুচি তাড়িত অহং বাধা দিচ্ছিল। সুতরাং তাঁরা পড়লেন দোলাচলে। নিজেদের পোশাকি চরিত্রকে শাসকশ্রেণির পোশাকি চরিত্রের আদলে বিনির্মাণ করতে গিয়ে করে ফেললেন ফ্যাশন-বিভ্রাট। কারণ বাদামি চামড়ার মানুষ সাহেব হবে, এ গোরা সাহেবের সহ্য হবে কেন, ওই সাহেবিয়ানাই যেখানে রাজনৈতিক! ওই বস্ত্র পারিপাট্যে সজ্জিত দেহটাই যেখানে ক্ষমতার প্রদর্শনের একটা আধার! দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আরেকটি কবিতায় বলছেন, 'পড়িয়া ইংরাজি প্যান্ট গলা আঁটা কোটে,/চাপকান অঙ্গে আর রোচে নাকো মোটে,/অথচ ইংরাজি সজ্জা, পরিতেও হয় লজ্জা,/ভয়েতেও কতকটা বটে,/ বাবুদের সাহেবিতে সাহেবরা চটে;/ এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত/ সাহেবিটা বাইরেতে পোশাকে অন্তত;/ কেরানির চাপকান পরিতেও অপমান,/এই বেশ তাই পরিবর্তে;/ ত্রিশঙ্কুর মত স্থিতি না স্বর্গে না মর্তে।'[171] সেই ত্রিশঙ্কুর স্থিতি থেকে নিজেদের সামাজিক দেহকে একটা সুনির্দিষ্ট রুচিতে স্থাপন করবার জন্যই মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকদের প্রতিনিধি হয়ে ১৮৮০র দশকে মালদহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু তারিণী কুমার ঘোষ লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে দেওয়া তাঁর পত্রে বলেছিলেন, 'whatever may have been the custom of Ancient times, the wearing of Pagri is at present not a national custom of the Bengalis. We do not wear pagris except when in the presence of our European Superiors.'[172] অর্থাৎ অতীতের পোশাকি আচার যাই হোক, উনিশ শতকের সত্তরের দশকের বাঙালি পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষ তাদের সামাজিক ব্যবহারে আর পাগড়িকে রাখেন না। কেবল সরকার-বাহাদুরের উচ্চপদস্থদের সামনে তাদের এই পাগড়ি পরে থাকতে হয়।

এই বক্তব্যের মধ্যে অনুযোগের সুর আছে। কারণটা আগেই বলা হয়েছিল – পড়াশোনার আধিক্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত রুচিশীল পুরুষ আর কোনো পুরাতন আচারকে মাথায় বইতে রাজি নন। তাই অনুযোগ-সম্বলিত এই পত্র গণ-স্বাক্ষর কর্মসূচীর পর সরকারকে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই

---

170 মলয় রায়, 'বাঙালির বেশবাসঃ বিবর্তনের রূপরেখা' (কলকাতাঃ মনফকিরা, ২০১৩), পৃ। ১৭০

171 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', প্রথম খন্ড, (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, নবম মূদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪২১), পৃ।৫৫২-৫৫৪।

172 To the Lieutenant Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept., WBSA

অনুযোগকে নিছক অনুযোগ হিসেবে দেখলেই হবে না। একে মধ্যবিত্তীয় অহঙের প্রাথমিক নথি-ভিত্তিক নিদর্শন হিসেবে দেখতে হবে। যে অহঙ মধ্যবিত্তকে কোনোভাবেই নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে দেয় না। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'রূপ ধাঁধার পিছনে ছুটিয়ে নেয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তীয় পুরুষের অহঙে পাগড়ি বোঝা মনে হচ্ছিল, কারণ এই পাগড়ি মুসলমান দরবারি সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলে হয়ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন – অনুকরণ করতে হয় তো বিজিত জাতির অনুকরণ না করে পরাজিত মুসলমানের অনুকরণ কেন![173] এক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত, ভারতে ইসলাম আগমনের পর বাদশাহদের মধ্যে পাগড়ি এবং টোপির সমন্বয়ে তৈরি "শিশ শোভা" বা মস্তকাবরণ সম্মান ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে মান্যতা পায়। সম্রাট আকবর পার্সিয়ান ''কুলহ'' এবং এদেশি পাগড়ির সমন্বয়ে তৈরি এই মস্তকাবরণের দেশীয় নাম দিয়েছিলেন, 'শিশ শোভা'। অর্থাৎ পার্সিয়ান সংস্কৃতির অন্যান্য দিকের মতো দেশীয় পোশাকি সংস্কৃতির সাথে পার্সিয়ান পোশাকি সংস্কৃতির আদানপ্রদানের মাধ্যমে এদেশে মুসলমান শাসকের পোশাকি চরিত্রায়ন ঘটেছিল। আর সেই চরিত্রায়নে পাগড়ি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে অনেক ক্ষেত্রে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে পাগড়ির প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল মুসলমানি পরিচ্ছদশৈলীর একটি উপকরণ হিসেবে। কিন্তু ভারহুত, বোধ গয়ার স্থাপত্যের গায়ে বা সাঁচির তোরণের গায়ে যে খোদাইগুলো রয়েছে সেখানে পাগড়ির হদিশ পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টিয় একাদশ শতকের মধ্যে অর্থাৎ ইসলাম আগমনের পূর্বে পাগড়ির পারিচ্ছদিক উপকরণ হিসেবে আবস্থিতিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।[174] গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থও নানা প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, ভারতবর্ষীয় পোশাকি সংস্কৃতিতে পাগড়ির পুরাণত্বকে দেখিয়েছিলেন। দেখিয়েছিলেন, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে পাগড়ি পরিধাণে শাস্ত্র কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল।[175] ধ্রুবজ্যোতি সেন যেমন অজন্তার চিত্র বিশ্লেষণ

---

173 দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 'ইংরাজী ও বাঙ্গালী পোষাক', ভারতী, বৈশাখ ১৩০৩।

174 A. Biswas, 'Indian Costumes', New Delhi: Publications Division, first print 1985, reprint 2003; p.10, 22

175 তাঁর ভাষায়, 'দেহের ঘটক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে মস্তক উত্তমাঙ্গ নামে অভিহিত। এই উত্তমাঙ্গ সুস্থ থাকিলেই মানব নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়া বিবিধ সূক্ষ্মতত্ত্বের নির্ণয়ে অধিকারী হইতে পারে। সুতরাং শীতোষ্ণাদির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।' আর ভারতীয় উপমহাদেশে সেই কর্তব্য সম্পাদনার্থেই উষ্ণীবের ব্যবহার শুরু হয়। বেদান্ততীর্থ উষ্ণীবের মানে করেছেন—যা 'উষ্ণকে হিংসা অর্থাৎ নিবারণ করে।' বেদান্ততীর্থ মহাশয় বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে উষ্ণীবের বিষয়ে তাঁদের অভিমত আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। যেমন সুশ্রুতসংহিতায় ঝড়-জল-রোদ-শীতের হাত থেকে মাথাকে রক্ষা করতে উষ্ণীব ব্যবহারের নিদান দেওয়া হয়েছিল। ("পবিত্রং কেশ্যমুষ্ণীষং বাতাতপ রজোপহম্ ।/ বর্ষানিল-রজো-ঘর্ম-হিমাদীনাং নিবারনম্।।"—সুশ্রুতসংহিতা, নিদানস্থান, ২৪ অধ্যায়।) এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, মাথার উপর এই উষ্ণীব রচিত হত কি বস্তু দিয়ে! শাস্ত্রবিশারদ বেদান্ততীর্থ সেই প্রশ্নেরও উত্তর নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি আশ্বল্যায়গৃহ্যের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন বস্ত্রের দ্বারা মাথাকে আচ্ছাদিত করে বেঁধেই উষ্ণীব রচিত হত। ("আয়ুষ্যমিতি সূক্তেন মনিং কন্ঠে প্রতিমুচ্যোষ্ণীষং কৃত্বা/ তিষ্টন্ সমিধোহভ্যাদদ্যাৎ ।"—৩/৮/১৬) তার মানে কি রাজা-প্রজা সকলেই মাথায় একই ধরনের উষ্ণীব ধারণ করতেন? বেদান্ততীর্থ বলছেন, রাজা এবং রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের শিরবেষ্টিত থাকত মূল্যবান ধাতু দিয়ে নির্মিত, মানিক্যখচিত মুকুট, আর সাধারণ মানুষ পরতেন কাপড়ের পাগড়ি। কিন্তু পদাধিকার

করে দেখিয়েছেন – প্রাচীনকালে ভারতীয় দরবারি আচারেও খালি মাথায় রাজদর্শনে যাওয়া ছিল অশিষ্টাচারের লক্ষণ। অজন্তার একটি চিত্রে দেখা গেছে নিঃসম্বল ব্যক্তি আর কিছু না পেয়ে মাথার উপর একটি পদ্মপত্র চড়িয়ে রাজদর্শনে যাচ্ছেন।[176]

কিন্তু রুচি যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বাজার অনুগত, তখন মধ্যবিত্ত স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী অহঙের অনুগমনও সেই রুচি অনুশীলনের দিকে। তাই মাথা থেকে পাগড়ি হঠিয়ে, টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শনের বাসনা। জেনিফার ক্রেইকের মতে, এইভাবেই সামাজিক শ্রেণি-পরিসরে পোশাকি স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে শুরু করে।[177] সেই চেতনা থেকেই জুতো সংক্রান্ত নির্দেশিকার একটা সরকারি উপলব্ধিকে ঢাল বানিয়েছেন তারিণী কুমার ঘোষ এবং তাঁর সহ-স্বাক্ষরকারীরা। সেই সরকারি উপলব্ধিটা এখানে আরেকবার বলতে হচ্ছে, 'The same privilege should be allowed throughout the Bengal Presidency, otherwise there would arise grave, inconvenience if natives of positions and consequence, who had enjoyed this concession at the capital before the viceroy, were to be denied it before any British officers at the stations interior of the country.'[178] অর্থাৎ রাজধানী কলিকাতায় গভর্নমেন্ট হাউসে ভাইসরয়ের সামনে ইউরোপীয় ফ্যাশনে জুতো পরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র পাওয়া দেশীয় মহোদয়দের যদি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ব্রিটিশ অফিসারদের সামনে জুতো খুলে প্রবেশ করতে বলা হয়, একটা

অনুসারে রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে মুকুটের বিভাজন ছিল। বেদান্ততীর্থ নাট্যশাস্ত্র থেকে দেখিয়েছেন, রাজার মাথায় পূর্ণ-মুকুট ও রাজকুমার বা রাজপরিবারের অন্যদের মাথায় অর্ধ-মুকুট ধারণের কথা। ("নরাধিপনাং কর্তব্যং মস্তকে মুকুটং বুধৈঃ।/ সেনাপতেঃ পুনশ্চাপি যুবরাজস্য চৈবহি।/ যোজয়েদর্ধমুকুটং কৃটমাত্রশ্চ যে নরাঃ।") অর্থাৎ ক্ষমতাকে দৃশ্যমান রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে পাগড়ি যে শুধু উনিশ শতকেই অনুঘটকের কাজ করেছিল, তেমনটা নয়, পাগড়ির সাথে ক্ষমতার যোগ সেই আর্যযুগ থেকেই ছিল। দ্রষ্টব্য, গিরিশ্চন্দ্র বেদান্ততীর্থ, 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়', (কলিকাতাঃ সুবর্ণরেখা, আষাঢ় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), পৃ ৫৫-৫৬।

ধ্রুবজ্যোতি সেন গান্ধার ভাস্কর্য বিশ্লেষণ করে উষ্ণীবের উপর বিশ্বর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাব যে সেই প্রাচীন কাল থেকেই এসে পড়ছিল -- তা দেখিয়েছেন – 'গান্ধার ভাস্কর্যে যতরকম পোষাক দেখা যায় তার মধ্যে ... মণিমুক্তা এবং বিচিত্র ধরণের সূত্রের সাহায্যে পুরুষের মাথার দীর্ঘ কেশ কখনো চূড়ার আকারে কখনো দুটি ফাঁস একত্রিত করে কখনো বা বিচিত্র উষ্ণীবে, পূর্ণ বা অর্ধ আবৃত অবস্থায়, মস্তক সজ্জিত করতে দেখা যায়। কোন কোন উষ্ণীব দেখে মনে হয় টুপির মতো মাথার মাপে সেগুলি তৈরী হত। পাঞ্জাব বা আফগানিস্তানে প্রচলিত পাগড়ির সঙ্গে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে এ ধরণের পাগড়িও দেখা যায়। বিচিত্র উপায়ে পাগড়িকে ফুলিয়ে বা ফাঁপিয়ে রাখার উপকরণও কম ছিল না। হাত পাখার মত পাগড়ির কিয়দংশ ছড়িয়ে আছে এমনও দেখা যায়।' দ্রষ্টব্য, ধ্রুবজ্যোতি সেন, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাজসজ্জা', অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৩।

[176] ধ্রুবজ্যোতি সেন, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাজসজ্জা', অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৩, পৃ ৬০৯।

[177] Jennifer Craik, *The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion*, (London, New York: Routledge, 1993).

[178] Resolution on the question of Native Gentleman being required at reception , public or private or in courts of Justice to appear with their shoe,19th March,1868, Proceeding No.20, Political Department, January, 1880.

অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হবে। এই অসন্তোষকেই একপ্রকার ঢাল বানিয়ে মালদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণী কুমার ঘোষ দেশীয় চাকুরিজীবীদের মাথা থেকে পাগড়ির বোঝা নামাতে দাখিল করা পিটিশনে লেখেন, ' The history of civilization in all countries is history of the violation of national manners and customs.'[179] অর্থাৎ তাঁর মতে সকল সভ্যতার ইতিহাসই আসলে নিজেদের আচারব্যবহার এবং প্রথাকে ভেঙে নূতনের দিকে এগিয়ে যাবার ইতিহাস। এখানেই প্যিরে বর্দিউর নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উত্থানের সাথে সাথে মানুষের রুচিবোধ পাল্টে গিয়ে নতুন রুচির অনুশীলন সংক্রান্ত তত্ত্বটির যাথার্থ্য। কারণ সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর পাশে পাশেই রুচির ঘোরাফেরা। পোশাকের মাধ্যমে সেই রুচির ক্ষমতা কেন্দ্রিকতা সবসময় সোচ্চারভাবে প্রকাশিত না হলেও নিরুচ্চার ভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। সেই নিরুচ্চারকে দেখিয়ে দেওয়াটাই হল সমাজতাত্ত্বিকের অন্যতম কর্তব্য।

অবশ্য পাগড়ি পরতে অসুবিধার কথা জানিয়ে তারিণী কুমার ঘোষ একটি ব্যবহারিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, অফিসের মধ্যে পাগড়ি পরে থাকার ব্যাপারটি যেমন-তেমন, কিন্তু দেশীয় মহোদয়রা যখন গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্দুরে বাইরে কাজে যান, তখন মাথার উপর পাগড়িকে বোঝা মনে হয়। যেসব দেশীয় কর্মচারীরা ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের উপর ন্যস্ত অঞ্চলের দায়িত্ব তদারকি করতে যান, ছুটন্ত ঘোড়ার উপর বসে মাথার পাগড়ি সামলানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। তিনি সবিনয়ে স্বীকার করছেন, এই সমস্যায় পড়ে বেশিরভাগ নেটিভরাই হালকা টুপি ব্যবহার করতে বাধ্য হন, সেকারণে পাগড়িটা আলাদা করে একটি বাক্সে পুরে নিয়ে তাঁদের চলতে হয়, যাতে শাসকশ্রেণীর উচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করবার প্রয়োজন পড়বার আগেই পাগড়িটা পরে নেওয়া যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটার বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি অকপটভাবে 'অহেতুক' এবং 'বোঝা' শব্দদুটোকে ব্যবহার করেছেন।[180] তাই এর পরক্ষণেই তিনি দাবি জানিয়েছেন, সরকার যদি ইউরোপীয় ফ্যাশনে জুতো পরে নেটিভ মহোদয়দের দরবার, কোর্ট অফ জাস্টিস, এবং যেকোনো সরকারি ব্রিটিশ অফিশিয়ালের সামনে যাবার অনুমতি দিতে পারেন, তাহলে দেশীয় মহোদয়দেরকেও ব্রিটিশ মহোদয়দের মতো মাথায় হ্যাট পরতে দিতে কি অসুবিধা, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সামনে হ্যাট খুলে সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ দিতে কি অসুবিধা![181] যেনতেন প্রকারেণ পাশ্চাত্য শিক্ষা তাড়িত রুচিকে অনুশীলন করে তারিণী কুমার ঘোষের পক্ষে পিটিশন স্বাক্ষরকারীরা যেন দলাদলির ইতিহাস থেকে জন্ম নেওয়া কলিকাতার নাগরিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেদের পোশাকি স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। যা দেশীয় সমাজে তাঁদের

---

[179] To the Lieutenant Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept.,WBSA

[180] Ibid

[181] Ibid

মান্যতাকে আরও পোশাকি রূপ দেবে। তারিণী কুমার ঘোষের বক্তব্যের আরও কিছু দিক তুলে ধরলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

তিনি বলছেন, তিনি জানেন যে, দেশীয় সমাজে এমন ব্যক্তিত্বরাও আছেন, যাঁরা পাগড়িকে বাঙ্গালির জাতীয় পরিচ্ছদ মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, ‘ It [Pagri] is quite comfortable and appropriate and nothing national should be changed.’[182] তারিণী কুমার ঘোষ এবং তাঁর সহ-স্বাক্ষরকারীরা এরকম কোন ন্যাশানালের অস্তিত্ব আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না।[183] তারিণী কুমার ঘোষ সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের বাসনায় পাগড়ি নিয়ে শাস্ত্রীয় বচন মানাকে পিছিয়ে থাকার নামান্তর ভেবেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাই যাঁরা পাগড়িকে ন্যাশানাল পরিচ্ছদের অংশবিশেষ বলে দাবি করেন, তাঁদের রুচি এবং প্রতীতি বিষয়ে তিনি নাক গলাতে চান না। তিনি চান, তাঁর সাথে সহমত পোষণ করে যাঁরা পাগড়ির বোঝা নামানোর পক্ষে পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদের দাবি যেন সরকার বাহাদুর মঞ্জুর করেন।[184] অর্থাৎ পাগড়িকে মাথা থেকে নামানোর জন্য তারিণী কুমার ঘোষের অভিমত যে মধ্যবিত্ত সমাজের সকলের অভিমত নয়, সেটা আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই বুঝতে পারছি। নকশা এবং প্রহসন সাহিত্যেও পাগড়ির সাথে দেশীয় ঐতিহ্যের সম্বন্ধকে সাহিত্যিকরা নানা বয়ানে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন সেটা তামরা পূর্বে একটা উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছি। সেই ঐতিহ্যকে তারিণী বাবুরা মানতে রাজি ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে ভারতী থেকে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে বলছেন, ‘……নকল করিতে হয় ত

---

[182] Ibid

[183] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও স্বাধীনতা-উত্তর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘হিন্দু বাঙালীর ‘নাঙ্গা’ মাথা চিরকাল – কোনো ‘জাতীয়’ বা ‘ন্যাশনাল’ শিরভূষণ ছিল না, আজও নেই।’ দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘ফিরে ফিরে চাই’, পৃ ১১০-১১১।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ‘অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে-মদ্দে (অর্থাৎ মহিলারা) পাগড়ি প’রত। এখন যেমন বাঙলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপনি-মাত্র থাকলেই শরীর ঢাকার কাজ হ’ল, কিন্তু পাগড়িটা থাকা চাই; প্রাচীনকালেও তাই ছিল মেয়ে-মদ্দ।’ অর্থাৎ উনিশ শতকে বাংলা বাদ দিয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, গায়ে ঠিকমতো কাপড় না থাকা পুরুষমানুষেরও একটা প্রবণতা ছিল মাথায় পাগড়ি বাঁধা। প্রাচীনকালে এই প্রবণতা পুরুষের চাইতে এদেশের মেয়েদের বেশি ছিল বলেই তাঁর অভিমত। দ্রষ্টব্য, স্বামী বিবেকানন্দ, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, ‘জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড’, (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, পৌষ ১৩৬৭), পৃ ১৮৫-১৮৬।

দীনেশচন্দ্র সেনের লেখাতে আবার অন্য মত পাই। তিনি বলছেন, ‘এক কালে বোধ হয় পাগড়ী পরাটা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য ছিল। এ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে অনেক ইঙ্গিত আছে। গোপীচন্দ্রের প্রাচীন গানে দৃষ্ট হয়, গোপীচন্দ্রের মাতার মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া ভ্রাতা খেতুরি তাঁহাকে বলিতেছেন, “কার জন্য পাগড়ী রেখেছ মাথার উপর” ...’ দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র সেন, ‘বৃহৎ বঙ্গ’ (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১), পৃ ৫৯০-৫৯১।

[184] To the Lieutenant Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept.,WBSA

মুসলমানের নকল ছাড়িয়া, ইংরাজের নকল করাতে আমি কোনো হী্নত্ব দেখি না। কারণ প্রথমত—এ মুসলমানি রাজত্ব নয়, ইংরাজী রাজত্ব। দ্বিতীয়ত--…….মুসলমান জাতির অনুকরণ করার চেয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সভ্য ইংরাজের অনুকরণ কেন না করি।'[185] কিন্তু এই মতের বিপরীতে ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, '….তাহাদের [মুসলমানদের] শিল্প বিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনি স্বভাবের অমোঘ নিয়মে, কেবল আপন বিপুলতা, আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল।'[186] তাঁর মতে দেশীয়রা এত শখ করে যে নাইট ড্রেসটা, ইভনিং ড্রেসটা কিনছেন, তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে এই পোশাক পরে গোরা সমাজের সামনে দাঁড়ালে তাদেরকে কতটা বিদ্রুপের শিকার হতে হয়, কতটা অপমানিত হতে হয়। সুতরাং যে পোশাকে প্রাণের আরাম নেই, অপমান আছে, সেই পোশাককে কি কেবল জাতে ওঠার জন্য, দেশীয় সমাজে নিজেদের হামবড়া দেখনোর জন্য নিজের পোশাক বলে দাবি করা যায়? এই মোক্ষম প্রশ্নটি তিনি তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিটা ইতিহাস সচেতন উপলব্ধি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বক্তব্যের মধ্যে বর্তমানকে কিভাবে ক্ষমতার ছত্রছায়ায় রেখে ফুল্লকুসুমিত করে তোলা যায়, ইতিহাসবিমুখ এই বস্তুচেতনার দিকে ঝোঁক বেশি। ক্ষমতার পোশাকি কাঠামোর ছত্রছায়ায় থাকতে গিয়েও বিলিতি পারিচ্ছদিক কায়দার সাথে দেশীয়ত্বের মিশ্রণ ঘটেছিল। যেমনটা ছবি ৪.৭-এ আমরা দেখছি। স্যুট-বুট-হ্যাটে সজ্জিত 'নেটিভ সাহেবের' দুজনার মধ্যে একজন মন্দিরের বিগ্রহের দিকে হাত জোর করে প্রণাম করছেন, অন্যজন টুপি খুলে সম্মান দেখাচ্ছেন। তারিণী কুমার ঘোষের বক্তব্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তিনি ও তাঁর সহ-স্বাক্ষরকারীরা অথেনটিক বিলিতি কায়দা অনুসরণ করে সম্মান প্রদর্শনে উদগ্রীব। তিনি বলেন, 'the practice of wearing caps and hats, and of uncovering the head in token of respect, is as a matter of fact allowed in many cases--- notably in the case of natives who visit England, both during the stay in that country and after their return to India.'[187] অর্থাৎ যেসব দেশীয়রা বিলাতে যান বা বিলাত থেকে দেশে ফিরে আসেন,

---

185 ভারতী, চৈত্র, ১৩০২

186 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কোট ও চাপকান", 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র', (কলকাতাঃ কামিনী প্রকাশালয়,২০১৫), পৃ ৬৯৬

187 To the Lieutenant Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January 1880, Political Dept., WBSA

চিত্র ৪.৭: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ‘প্রণাম বিভ্রাট’ (@Victoria & Albert Museum)

তাঁরা নির্দ্বিধায় মাথায় হ্যাট, ক্যাপ পরে যত্রতত্র ঘোরেন।[188] সম্মান জ্ঞাপনের জন্য হ্যাট বা টুপি খুলে হাতে নেন। তাহলে তাঁদেরকে কেন নিজেদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে পাগড়ি পরতে হবে! বঙ্কিমচন্দ্র নিজের শৈল্পিক সংবেদনশীলতা দিয়ে মধ্যবিত্তের এই বাসনাটিকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ‘দুর্গোৎসব’ কাব্যে লিখেছেন, ‘এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,/ সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান।/ দুড়ুম দুড়ুম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,/ দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ!/ ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধুতি, জলে ফেলে খুঙ্গী পুঁথি;/ সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।/ লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্যে মটন খাই,/ দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।/ সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান।।’[189] একই রকম আকুতি তারিণী বাবুর চিঠির ভাষাতেও, ‘We would

---

[188] রাজশেখর বসু, “আমাদের পরিচ্ছদ”, রাজশেখর বসু বিরচিত ‘চলচ্চিন্তা’ (কলকাতাঃ মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৮৮২ শকাব্দ), পৃ ৩।

[189] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “দুর্গোৎসব”, নবকুমার ভট্টাচার্য্য ও বাসুদেব মোশাল, ‘পুরাতনীঃ পুজো নিয়ে পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন’ (কলিকাতা: অভিনব প্রকাশনী, ১৩৫৯), পৃ ৭২-৭৩।

submit to your honor's kind consideration that the enforced wearing of the Pagri against their sense of the fitness of things cannot but act as a cause of moral depression on the people whose welfare is entrusted to your Honor's care, that Government does not gain anything by such enforcement; and that it acts as a drawback to easy intercourse between European and native gentlemen, officially as well as socially.'[190] তারিণী বাবু এবং তাঁর সমর্থনে পিটিশনে স্বাক্ষর করা মহোদয়রা পাগড়িকে যেহেতু তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া মনে করেছেন, সেহেতু তাঁদের বক্তব্য, এই চাপমুক্তি সম্পর্কে যদি সরকারের তরফে কোনো সদুত্তর না আসে তাহলে, তাঁদের মধ্যে নৈতিক হতাশার জন্ম হবে। তাই অভিভাবক সুলভ সরকারের উচিত তাঁদেরকে সেই হতাশার হাত থেকে মুক্ত করা। এই পিটিশন শেষ হয়েছে সরকারের খেয়ালের উপর বিশ্বাস রেখেই। জুতো সমস্যা সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটা বাক্য 'any matter connected with the official position which he occupies.'---ব্যবহার করে তারিণী বাবু বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্তত তাঁদের অফিসিয়াল অবস্থানের কথা বিবেচনা করে সরকার পাগড়ি সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন করতে পারেন।[191] তারিণী কুমার ঘোষ এবং তাঁর সহ-স্বাক্ষরকারীরা যে তাঁদের অধস্তন দেশীয় কর্মচারীদের সঙ্গে একই রকম পরিচ্ছদ শৈলী ভাগ করে নেয়াটাকে কোথাও নিজেদের কর্তৃত্বের কম তেজের কারণ ভাবছেন, তা এখান থেকে স্পষ্ট। কারণ পোশাকে-আশাকে বাবুয়ানি ধরে কলিকাতা নগরে হামবড়া ভাব দেখনোরও একটা ইতিহাস আছে। সমকালীন আত্মজীবনী ঘাটলেও সেকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেকার বিভাজনটা বোঝা যাবে। প্রভাতকুমারের পরিবার তাঁদের প্রতিবেশীদের বাড়ি যাতায়াত করতেন না। কারণ তাঁরা ছিলেন উকিলের পরিবার, আর আশেপাশে বসবাসকারীরা ছিলেন মোক্তার, অর্থাৎ উকিলের অধীনে কর্মরত শ্রেণী। তাছাড়া প্রতিবেশীরা বাঙ্গাল। ওঁদের মেয়ে-বৌরা 'দোপাট্টা' করে শাড়ি পরেন। ওঁদের বাড়িতে শুঁটকি রান্না হয়। ঘরোয়া আলাপে প্রভাতকুমারের মা বলতেন, 'আমরা উকিল বাড়ির লোক, পড়শিরা মোক্তার – মামলার জগতে আমরা ব্রাহ্মণ – ওরা ব্রাহ্মণেতর।'[192] অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুর পূর্ববর্তী বর্ণভেদের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষিত চাকুরিজীবীর

---

190 To the Lieutenant Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept., WBSA, Kolkata.

191 Ibid

192 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ৪৪; বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, (কলকাতাঃ পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃ ৪৬।

গোপাল হালদার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, কলকাতার পৌর ও প্রাকৃতিক জীবন কিভাবে তাঁর 'বাঙ্গাল' পরিচিতিকে নির্মাণ করেছে। যদিও তাঁর বক্তব্যে বেশিরভাগই উঠে এসেছে কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশে পুব বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপস্থিতি কিভাবে শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনে কলকাতায় থাকা পুব বাংলার একজন যুবাকে নিজের জন্মভূমিকে দেখবার অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিল। বিপিনচন্দ্র এবং প্রভাতকুমারের বক্তব্য দেখে এটাও বলা যায়, শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশই নয়, কলকাতার পৌর পরিসরে পুব বাংলার মানুষের প্রতি হীন দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতাও, পুব বাংলার ছাত্র-যুবাদের মনে নিজস্ব পরিচিতির আবাদ ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। গোপাল হালদারের বক্তব্যটিকে এক্ষেত্রে তুলে ধরা দরকারি বলে মনে হয়, -- '...কলকাতাতেই আমি আবিষ্কার করলাম আমার আজন্মের বাঙাল

উত্থান সমাজে আরেকটি শ্রেণীভেদ ঘটিয়ে দিল। যার নিয়ন্তা উপনিবেশিক প্রশাসনে তাঁর পদাধিকারের ধরণ। তাই সরকারি পরিসরে উচ্চপদস্থদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াসটা পাড়ার সামাজিকতাতেও বিদ্যমান। আর পোশাক সেই স্বাতন্ত্র্যকে প্রকট করবার একটা হাতিয়ার। সামাজিক পরিসরে সম্ভ্রমের বুনন শুধুমাত্র পদাধিকার দিয়েই হয় না, তার সাথে যুক্ত থাকে সাংস্কৃতিক ভৌগোলিকতার গুরুত্ব। ঊনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম দিকেও কলকাতা সেরকমই ভৌগোলিকতার ভিত্তি হয়ে ওঠে, যার ইংরেজ প্রভাবিত সাংস্কৃতিক ব্যপ্তির আশেপাশে যেতে পারাটাই বিশাল গরিমার সৃষ্টি করত। পূর্ববঙ্গ ভৌগোলিক দিক থেকে অনেক দূরবর্তী তো বটেই, তার সাথে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের জীবনাচরণ এবং খাদ্যাভ্যাসও কলকাত্তাইয়া পরিশীলনের কাছে একটা হেয় করার উপকরণ ছিল। নিজেদের জীবনযাপনের মানে আড়ম্বর বজায় রেখে, সমাজের অন্যান্য শ্রেণির থেকে নিজেদের আলাদা রাখতেই তাই চাকরির বেশিরভাগ মাইনে ব্যয়িত হত।[193]

তারিণী বাবুরা না হয় পাগড়ি খুলে বিলাতি প্রথায় সম্মান জ্ঞাপনের সরকারি ছাড়পত্র আদায় করে, বিলাতি জীবনযাপনের উপর পুরোপুরি সরকারি শিলমোহর নেওয়ার পর্যায়ে একধাপ এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর জুতো সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন মানে কি ইউরোপীয় এটিকেট অনুসারে চলার পূর্ণ ছাড়পত্র দেশীয়দের সমর্পণ করবেন! ইউরোপীয় পোশাকি শিষ্টাচারের পূর্ণ ছাড়পত্র দিলে তো দুধ আর জল মিশে গেল। যুগ যুগ ধরে ইউরোপের মাটিতে রাজন্যের পোশাকি শিষ্টাচারকে সবসময়ই প্রজার পোশাকি শিষ্টাচার থেকে আলাদা

সত্তাকে। আমার যে সত্তা পদ্মার বুকে – ঢাকা-বিক্রমপুর-নোয়াখালির মেঘনার কোলে দোল খেয়ে-খেয়ে পুলকিত, ঘনশ্যাম গাছপালা, ঝাউ-নারকল-হিজল-সাঁপলা-বাঁশঝাড়-বেতবনের সঙ্গে মিলেমিশে অচেতন আনন্দে বাল্য-কৈশোরকে আপন গন্ধে মুগ্ধ কস্তুরী মৃগের মতই ছুটে ছুটে নিয়ে এসেছে যৌবনের দিকে – একবারের মতও ইতিপূর্বে সচেতন হয়ে বুঝতে পায়নি সেই বাঙাল 'বাঙলার রূপকে'—পূর্ববঙ্গের নিসর্গ সত্তার মধ্যে আমার যে সত্তা ছিল তখনো নিমজ্জিত, আমারই নিকট অনাবিষ্কৃত – এই কলকাতাই গঙ্গার নাতিপ্রখর প্রবাহ ও তার পৌর-পরিবেষ্টনের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করে, মমতাময় হাতে আমার চোখ খুলে দিল আমার সেই পূর্ববাঙলার জন্মগত প্রকৃতি-পরিবেশের দিকে। ... সেই পদ্মা-মেঘনার দুর্বার বিস্তৃতি ও গর্জন, মেঘবৃষ্টি মুখর বাঙলার সকাল-সন্ধ্যা ঝিঁঝিঁ-ডাকা, জোনাকি-ফোটা বনজঙ্গল, বাঁশঝাড়ের গা ছমছম করা শব্দ, ঝাউগাছের মাথায় মাথায় বাতাসের ক্রন্দন – সাঁপলা-ফোটা বিক্রমপুরের খালবিল, জোয়ারে পরিস্ফীত নোয়াখালির নদীর যৌবন-মদমত্ততা, পদ্মা-মেঘনার মিলন-উল্লাসের উদ্দাম ঐশ্বর্য ... এসব আবাল্যের দেখা সেই সঙ্গীদের মন দিয়ে গ্রহণের মত অনুভূতিও আমাকে দিল কলকাতা – কলকাতা আমাকে দিনে দিনে দৃষ্টিদান করলে।' দ্রষ্টব্য, গোপাল হালদার, 'রূপনারায়ণের তীরে, ২য় খণ্ড, যৌবনের রাজটীকা' (কলিকাতাঃ পুঁথিপত্র, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ১৭-১৮।

[193] কাটীরাম ঠাকুর বলেছেন, 'যাঁহাদের ঘাড়ে সাবডিবিজানের ভার এবং মাসে চারি পাঁচশ টাকা বেতন ভোগ করেন তাঁহাদের আরো বিপদ।' কারন তাদের সামাজিক 'স্ট্যাটাস' রক্ষা করতেই প্রায় টাকা চলে যায়। তাই কাটীরামের মতে, 'কেবল ধোপ কাপড় ও ইজার পেন্টালুন' এদের মান রক্ষা করছে, কিন্তু আদপে 'এই মহাত্মারা সর্ব্বাপেক্ষা গরীব। ... মাস কারবার পরদিন ইহাঁদের হাতে একটী পয়সাও থাকে না, পাঁচ সাতটা শনিতে ইহাদের বেতনের টাকা গুলি অতি শীঘ্রই উদরস্মাৎ করিয়া ফেলে সুতরাং মুদী প্রভৃতি খুচরা পাওনাদারদিগকে আর এক মাস কাবরা দেখাইয়া স্থির রাখেন।' দ্রষ্টব্য, কাটীরাম ঠাকুর প্রনীত 'আটাকাটি', (কলিকাতাঃ সংস্কৃত প্রেস, ১২৯১), পৃ ৯।

করবার প্রয়াস চলেছে। উপনিবেশেও সেই চেষ্টা জারি ছিল।[194] কিন্তু তারিণী কুমার ঘোষদের পিটিশান অনুসারে পাগড়ি বিষয়ে ছাড়পত্র দিলে রাজা-প্রজার পোশাকে তো কোনো তফাত থাকল না। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই লেফটেন্যান্ট গভর্নর এস্লি ইডেন উক্ত পিটিশন সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত নির্দেশিকা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'Attention to costume was a form of respect in which the forefathers were never deficient.'[195] অর্থাৎ পরিচ্ছদ ঐতিহ্যের বিষয়। সেটা স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ অনুসারে ধীরে ধীরে তৈরি হয়। সুতরাং তারিণী বাবুদের 'পাগড়ি আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদের উপকরণ নয়' এই দাবি উক্ত বক্তব্যের দ্বারা খারিজ হয়ে গেল। আর এটাও নীরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, ইংরাজি পারিচ্ছদিক আদব-কায়দা গ্রহণ করলেই ইংরেজের সমকক্ষ হওয়া যায় না। এককথায় – পুরুষানুক্রমে কোনো জাতির অঙ্গ না হলে, কাপুড়ে জাতিত্বে কি লাভ! ইডেনের অর্ডারে উল্লিখিত আরো কিছু বক্তব্যকে পরিবেশন করলে, বিষয়টি

[194] সুমিত কান্তি ঘোষ, ' "পাগড়ি হঠাও"; শরীর, পোশাক ও ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক পরিচালন', *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ২৬, ২০২১, পৃ ১-১৪।

[195] Letter forwarded from the office of Lieutenant Governor to Tarini Coomer Ghosh, Deputy Magistrate of Malda; Baboo Parbutty Charan Roy, Deputy Magistrate of Dacca; Baboo Chandra Coomer Dutta, Deputy Magistrate of Bukergunj; Moulvie Mohabat Ali, Moonsif of Goalundo; Baboo Mohini Mohan Chuckerbutty, Deputy Magistrate of Sahabad; Baboo Jodupati Banerjee, Deputy Magistrate of Comilla, Tipperah; Baboo Ram Chandra Mookerjee, Honorary Magistrate of Krishnanagar, Nuddea; February, 1880, Political Department, WBSA.

চিত্র ৪.৮: সাহেব ও তাঁর সরকার (@CSSSC_Archive)[196]

পরিষ্কার হবে। সেখানে বলা হচ্ছে—'The Memorialist are much mistaken if they imagine that in wearing brimless caps, they are initiating European customs. No European of respectability would appear in public in such caps and they [memorialist] can not therefore claim as they do to associate its adoption with "Western Culture".[197] এখানে তিনি সরাসরি বলছেন, যাঁরা ব্রিমলেস ক্যাপ পরে বলছেন, 'আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসারী', তাঁরা আসলেই জানেন না, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিটা কি জিনিস! তাঁরা জানেন না, ইউরোপীয় সমাজে কোনো সম্মানীয় ব্যক্তি ব্রিমলেস ক্যাপ পরে জন-পরিসরে আসেন না। দেশীয়দের ইউরোপীয় পোশাকি আদব-কায়দা অনুসরণ করার সুযোগ দিলে, দেশীয়দের সাথে উপনিবেশকারীদের সামাজিক মেলামেশায় সুবিধা হবে, না হলে দেশীয়রা নৈতিক হতাশায় ভুগবেন - তারিণী বাবুদের এই ধারণা লেফটেন্যান্ট গভর্নর পত্রপাঠ খারিজ করেছেন। তিনি বলছেন, ইউরোপীয়দের সাথে দেশীয়দের মেলামেশা তো অবস্থিত নিয়মেই ভাল আছে। ছবি ৪.৮-এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিলিতি সাহেব সেমি-লং কোট, ট্রাউজারস, বুট, টুপি ও নেকারচিফে সজ্জিত, আর তাঁর নেটিভ 'সরকার' পাগড়ি, আচকান, পাজামা ও শাল ও বুটে সজ্জিত। এই যে দূরকম পোশাকি সামাজিকতার সৃজন – তাকে কাকতালীয় বলা যাবে না। তা ঔপনিবেশিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূতই বলতে হয়। তাই ইডেন মনে করেছেন, ইউরোপীয় ও দেশীয়দের সামাজিক সম্বন্ধ এর চাইতে আর কি ভাল হতে পারে। তাঁর চোখে শাসকের সাথে শাসিতের যেরকম সম্পর্ক হওয়া উচিত উপনিবেশকারীর সাথে উপনিবেশবাসীর সম্পর্ক সেরকমই আছে। চলমান পোশাক সংক্রান্ত নিয়ম পাল্টে নতুন কোনো বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। কারণ, 'In giving up the custom of appearing with the head covered on public occasions, native gentlemen are adopting neither the customs of the West nor of the East.'[198] অর্থাৎ দেশীয় ভদ্রমহোদয়রা এবং ইংরাজি শিক্ষিত ছেলেপুলেরা যে পোশাকে নিজেদের সজ্জিত করে পদস্থ ব্রিটিশ অফিসিয়ালদের সামনে হাজির হয়ে ইংরাজিয়ানা দেখানোর চেষ্টা করেন, সেই পোশাকটা না পাশ্চাত্য পোশাক, না দেশীয় পোশাক। সুতরাং মহোদয়দের উচিত এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে, পোশাক সংক্রান্ত যে কানুন তাদের জন্য নির্ধারিত আছে, সেটাকেই মেনে চলা। আর অফিস-আদালত-কাছারিতে না-ঘর-কা, না-ঘাট-কা মার্কা পোশাক না পরে, যদি একান্তই বিলিতি পোশাক পরার সাধ জাগে, তবে শুদ্ধ বিলিতি কায়দা মেনে সেই

---

[196] B. 44, 'A Sahib and His Sircar', Battala Wood Painting, Mr. R.P. Gupta Collection, CSSSC Archive.

[197] Ibid

[198] Ibid

পোশাক পরতে হবে। যদি সেই কায়দা আয়ত্তে না থাকে, তাহলে সেই পোশাক না পরে আইনানুগ পোশাক পড়াই শ্রেয়।

এখানে একটা জিনিস একটু তলিয়ে দেখতে ও ভাবতে হবে। উনিশ শতকের ষাটের দশকে উপনিবেশিক প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল – ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশ ঘটছে এবং নবোত্থিত বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরেদের মধ্যে বিলিতি শিষ্টাচারে পোশাক পরার প্রবণতা বাড়ছে। তাই বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাকের সাথে অফিস-আদালতে মোজাসহ বুট পরে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া জরুরি। কিন্তু সেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ উনিশ শতকের আশির দশকে এসে বলছেন – দেশীয় মধ্যবিত্ত পুরুষ যে পোশাক পরছেন, তা না হচ্ছে দেশীয় পোশাক, না হচ্ছে বিলিতি। তা মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঝুলে আছে। আবার সেই মাঝামাঝি জায়গা থেকে নেটিভ চাকুরেরদের তুলে আনাবার জন্য পাগড়ি খুলে ক্যাপ পরার অফিশিয়াল সম্মতি দেওয়া নিয়েও প্রশাসনের আপত্তি। ভাবটা অনেকটা এমন – বিলিতি ফ্যাশন পুঙ্খানুপুঙ্খ রপ্ত করা নেটিভের কর্ম নয়। এখানে যে নেটিভদের দিকে প্রশাসক আঙ্গুল তুলছেন, তাদেরকে শুধুমাত্র উপনিবেশিক সরকারের অফিসে চাকুরিজীবী নেটিভ ভাবলেই চলবে না। তারা হয়ত গোপাল হালদারের দাদা বা বন্ধুর মতো পাশ্চাত্য পরিশীলনের স্রোতে গা ভাসাতে চাওয়া নেটিভ। যাদের স্বপ্ন একদিন সরকারি চাকুরি হবে। বিলিতি কায়দায় জীবন-যাপন হবে। কিন্তু স্বপ্ন আর সামর্থ্যের মধ্যে বর্তমানে যেহেতু যোজন দূরত্ব, তাই পুরো বিলিতি হয়ে উঠতে না পারলেও – আধা বিলিতি হতে দোষ কি![199] চারিদিকে তাই মিশ্র রুচির বিস্তার। পোশাকি চরিত্রের কৌলিন্য রক্ষায় আঁটসাঁট প্রশাসনের কাছে এ বড় দৃষ্টিকটু ব্যাপার। তাই নিজেদের নেটিভ কর্মচারীদের পাগড়ি ফেলে টুপি পরে পুরো সাহেব হয়ে ওঠার আশায় বাঁধ সেধে যেন প্রশাসন ধরিয়ে দিচ্ছে – যারা মিশ্র শিষ্টাচারের খিচুড়ি বয়ে চলছে, তারা আর তোমরা তো একই প্রজাতির; তোমাদের এ জন্মে সাহেব হয়ে ওঠা হবে না।

---

[199] শ্রীযামিনীকান্ত সেন লিখেছিলেন, যেকোনো সৌন্দর্য্যের প্রাণস্বরূপ হল সঙ্গতি। বর্ণ ও রেখার সঙ্গতি যেমন চিত্রকে পরিপূর্ণ করে, মূর্তির বক্রতা, ঋজুতা ও ঘনত্ব যেমন মূর্তিকে পরিপূর্ণ করে, তেমনি একটি সামাজিক দেহকে পরিপূর্ণতা দেয় তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সঙ্গতি। তাই যে সামাজিক শরীরের এগুলি থেকে একটা আছে আরেকটি নেই, সেই শরীরের সামাজিক সঙ্গতিও তার চাইতে উঁচুতে অবস্থিত পক্ষের কাছে খাটো। ধরা যাক কারো পাশ্চাত্য শিক্ষিত রুচি আছে, সেই রুচি অনুযায়ী দেখার চোখ আছে, বাজারের কোন জিনিসটি তার দেহকে পাশ্চাত্য রুচি অনুযায়ী সাজানোতে লাগবে – তা সে জানে। কিন্তু তার তা কেনার অর্থ নেই। অগত্যা তাকে সেই শিক্ষিত ভাবটি নিজের দেশীয় পোশাকে বজায় রেখে চলতে হয়। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের মানদণ্ডে তার সামাজিক পরিপূর্ণতা হল না। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তির শিক্ষিত রুচি নেই। কিন্তু প্রচুর অর্থ আছে এবং পাশ্চাত্য সমাজের আড়ম্বরের প্রতি একটা স্থূল লোভ আছে। তাই ইভনিং ড্রেস পরে মর্নিং পার্টিতে এসে হাজির হয়েছেন। অর্থাৎ শিষ্টাচারী হতে গেলে যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার তা এখানে নেই। তাই তিনিও পাশ্চাত্য শিক্ষিত সামাজিকতার পরিমণ্ডলে পরিপূর্ণ নন। দ্রষ্টব্য, শ্রীযামিনীকান্ত সেন, ‘পরিচ্ছদ-কলা’, সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৩৪, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, পৃ ৫৭৭।

এই পুরো বিষয়টাকে দেহ, পোশাক ও ক্ষমতার পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের নিরিখে দেখলে বোঝা যায়, কিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচি দেশীয়দেরকে মধ্যযুগীয় মোগল শাসন উদ্‌ভূত রুচির সাথে দ্বন্দ্বে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত পোশাকি রুচি যাতে ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক দেহকে বা ক্ষমতার পোশাকি চরিত্রকে কোনোভাবে ছুঁতে না পারে, সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে ব্রিটিশ সরকার কিরকম কানুন প্রয়োগ করছে, কানুনের অখণ্ডতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। শুধুমাত্র যে সরকারি তরফেই এটা করা হচ্ছিল তা কিন্তু নয়। ১৮৯০ সালের দিকে দেশীয়দেরকে ব্রিটিশ আদব-কায়দা শেখনোর লক্ষ্যে বেশ কিছু এটিকেট বুক লেখা হয়। একটি এটিকেট বুকে বলা হচ্ছে, নীতিবোধ এবং নিঃস্বার্থ মনোভাবের কথা। বলা হচ্ছে, ভয় সবসময় খারাপ নয়। ভয় থেকেও মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে। যদি তার মধ্যে নীতিবোধ থাকে। যদি নিজের প্রতি, নিজের গোষ্ঠীর প্রতি, নিজের প্রথা এবং কানুনের প্রতি বিশ্বাস থাকে। যদি ঠিক এবং ভুল বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা থাকে। যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধার বাতাবরণকে বজায় রেখে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে। এইসব থাকলে সভ্য চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয়।[200] কিন্তু এইক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, নৈতিক এবং নিঃস্বার্থ চিন্তার কথা সত্যিই কি উপনিবেশকারীদের ক্ষেত্রে খাটে! নরবার্ট ইলিয়াস তাঁর 'Civilizing process' গ্রন্থে এই প্রশ্নটির অবতারণা করেছেন। যদিও ব্রিটিশরা উপনিবেশ বিস্তারকে নিজেদের স্বার্থে বলতে নারাজ। তাঁরা সর্বদা দেখাতে চান, উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বার্থের চাইতে সভ্যতার প্রকল্প অনেক বেশি জড়িত। তাঁরা সভ্য বানানোর কর্মযজ্ঞে নিজেদেরকে সামিল মাত্র দাবি করেন। তাই নরবার্ট ইলিয়াস আবার প্রশ্ন তোলেন, এই সভ্যতার একমাত্রিক সংজ্ঞা তৈরি করবার মধ্য দিয়ে কি ক্ষমতা চরিতার্থ করবার এষণা কাজ করছে না? তিনি মধ্যযুগ ধরে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার, শ্যিভালরির বিষয়কে উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন, সেই সময়টাকে কি আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয়রা সভ্যতার সময় বলতে পারবেন? কিন্তু সেই সময়কে অতিক্রম করে, ইউরোপের বুকে নতুন যে ভালো সময়ের বিকাশ হয়েছে, সেটা একটা স্বাভাবিক বিকাশের ফল। প্রাগ-ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থাগুলোরও স্বাভাবিক বিকাশের একটা গতি ছিল। উপনিবেশ স্থাপনার পর সেই গতির নিজস্ব ধারাবাহিকতা কি বিঘ্নিত হয়নি![201] বিঘ্নিত তো হয়েইছে, বরং শাসিতের উপর নিজেদের ক্ষমতার কাঠামোকে চাপিয়ে দেওয়াতে, শাসিতের সমাজের বিকাশে অ-স্বতস্ফূর্ততা জুড়েছে। এটিকেট বুকে দেশীয়দের ইংরাজি পোশাকি শিষ্টাচার শেখানোর নাম করে, ইংরাজি বস্ত্র পরিপাটি করে পরতে শেখনোর নাম করে, এমন সব জটিল নিদান উপস্থাপিত হয়েছিল, যে নিদান অনুসরণকারীদের কাছে ওসব রাজ-শিষ্টাচার হয়েই রয়ে গিয়েছিল। অন্তরে কদ্দুর প্রবেশ করেছিল – তা বলা শক্ত।

---

[200] W.T. Webb, 'English Etiquette for Indian Gentlemen', (Calcutta: Thacker, Spink & Co, second Edition 1890), p.1

[201] Norbert Elias, 'The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations', Translated by Edmund Jephcott (Oxford: Blackwell Publishing, 2000)

কিছু উদাহরণ দিয়ে তা বোঝা দরকার মনে করি — সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভাইসরয়ের Levee বা প্রাতঃকালীন মজলিসে কোনো দেশীয় মহোদয় যদি ডাক পান তাহলে তাঁকে হয় পুরো ভারতীয় পোশাক পরতে হবে নতুবা পুরো বিলিতি ঢঙ্গে পোশাক পরতে হবে। ভাইসরয়ের সিংহাসনের কক্ষে প্রবেশ করতে হলে গায়ে জড়ানো শাল বাইরে খুলে রেখে প্রবেশ করতে হবে। গলায় কোনো কম্ফর্টার জড়ানো যাবে না। আবার ভারতীয়দের খিল্লাত বা সনদ প্রদানের অনুষ্ঠানে কোনো ভারতীয় সভ্য-ভদ্র পোশাক না পরে প্রবেশ করতে পারবেন না। ধুতি পরে গেলে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পায়ের পেছন দিকের ত্বক দেখা না যায়। দিশি জুতো পরে আসা চলবে না। শক্স ও স্টকিংসের সাথে বিলিতি ফ্যাশনের জুতো পরে আসতে হবে। বিলিতি ফ্যাশনের জুতো জোড়া পায়ের সাথে লেপ্টে থাকতে হবে। কেউ যদি ঢিলা জুতো পড়ে আসেন, তাঁকেও জুতো খুলে দরবারে ঢুকতে হবে। আর দিশি জুতো পরে আসলে তো অবশ্যই তাঁকে জুতো খুলেই দরবারে প্রবেশ করতে হবে।[202] এটিকেট বুকের স্ববিরোধ এইখানেই যে, একদিকে তা দেশীয়দের আত্মবিশ্বাসকেই ভয়কে জয় করে ওঠার চাবিকাঠি বলছে, অন্যদিকে কেবলমাত্র প্রভুসুলভ শাসকদের চোখে অনেক ক্ষেত্রে কুরুচিকর ঠেকার কারণে দেশীয়দের নিজস্ব পরিচ্ছদশৈলীর উপর বিলিতি রুচির প্রলেপ দিতে বলা হচ্ছে। কিন্তু বিলিতি রুচিকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে কোনো আনকোরা দেশীয় পাছে সায়েব সেজে সায়েব প্রভুর সামনে আসেন, সেইজন্য সাজে পোশাকে 'সায়েবিয়ানা'কে একটা মহার্ঘ্য জিনিস হিসেবে দেখানো হয়েছে।

এটিকেট বুক এবং ইংরেজ উপনিবেশিক পরিচালন ব্যবস্থা অবশ্য এই কাজে সফলও হয়েছে। বিংশ শতকের বিশের দশকে গোপাল হালদারের জীবনী থেকে তা স্পষ্টত বোঝা যায়। তাঁর দাদা এবং বন্ধু উপেন দুজনাই 'বাঙালির সস্তা স্যুট ও সস্তা বাবুগিরির প্রতি ... অভিজাত অবজ্ঞা'র দৃষ্টিতে দেখতেন।[203] এদিকে সেই মহার্ঘ্যের অনুপুঙ্খ অনুসরণ করবার মতো অর্থ বা মানসিক জোর ক্রান্তীয় আবহাওয়ার মানুষের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয়র ছিল। গোপাল হালদারের দাদা ও বন্ধু উভয়ই যেমন সেসময় ছাত্রজীবনে থাকায় বাঙ্গালির মতই পোশাক পরতেন। কিন্তু সেই পরিধানের মধ্যে বিলিতি আদবের ছাপ ছিল। তাই দুজনেরই বেশভূষা ছিল 'সতর্ক, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি।'[204] কথায় আছে মনটাই আসল রাজা। বিলিতি শিক্ষা ও জীবনশৈলীর ছত্রছায়ায় থাকতে থাকতে বাংলার একটা শ্রেণি যে আভিজাত্যের একটা মানসিক সীমানা তৈরি করেছিলেন, তাও গোপাল হালদার আমাদের ধরিয়ে দেন। আর সেই আভিজাত্যের মানসিক সীমানাকে বস্তুবিশ্বে

---

202 W.T. Webb, 'English Etiquette', p.19, 64.

203 গোপাল হালদার, 'রূপনারায়ণের তীরে, ২য় খণ্ড', পৃ ৯-১০।

204 গোপাল হালদারের দাদা এবং বন্ধু উপেন দুজনেই মনে করতেন, 'ইংরেজী খানা খেলেই মনে হবে 'বেঁচে থাকি'। ইংরেজী হ্যাট-কোট পরলেই মনে হবে—গটগট করে বুক ফুলিয়ে চলি। তা না, ওই থোড়-বড়ি-খাড়া খেয়ে চাদরে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে চলো, আপনা থেকেই মনে হবে 'হরি হে, পার করো'।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১০।

প্রকট করে তোলার জন্যই তারিণী কুমার ঘোষের মতন মুষ্টিমেয় ব্রিটিশরাজের চাকুরেরা মাথা থেকে পাগড়ি নামিয়ে নিজেদের পোশাকি আদবকে বিলিতি পারিচ্ছদিক রাজনীতির ছত্রছায়ায় নিয়ে যেতে চান। যাতে করে স্বদেশীয় সমাজে সম্ভ্রম পাওয়া যায়।[205] তবে এবিষয়ে ব্রিটিশ অফিশিয়ালের প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা যায়—ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের দেহ ও পোশাকি রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় কতটা সচেতন। কিন্তু যেসব নেটিভের দেহ উপনিবেশিক এখতিয়ারের বাইরে ছিল, তাদের হ্যাট পরে সাহেব সাজাকে উপনিবেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।[206]

শরীর, পোশাক এবং স্বাচ্ছন্দ্য: মধ্যবিত্ত নাগরিক দেহ এবং মধ্যবিত্ততার রুচিশীল উদযাপন

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম, ভারতের ক্রান্তীয় আর্দ্রতার সাথে তাল মিলিয়ে সাদা-চামড়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ইংরেজরা নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসকসুলভ শরীর সৃজনে কিভাবে ব্যাপৃত হয়েছিল। সেই সৃজনে ঔপনিবেশিক শাসকের শরীরের আরাম বিধানের কোনো কার্পণ্য যেমন ছিল না, তেমনি তাদের শাসকসুলভ উপস্থিতির দৃশ্যমান আড়ম্বর সৃষ্টিরও কোনো কার্পণ্য ছিল না। এই শাসনের ছত্রতলে, এই শাসনের উদার পাশ্চাত্য শিক্ষনীতির ফলে এবং পাশ্চাত্য পণ্যে ছেয়ে যাওয়া বাজারের সান্নিধ্যে যে মধ্যবিত্ত শ্রেনি তৈরি হল, সেই শ্রেণির রুচিও তাই পোশাকি আরামের একটা পরিমণ্ডল থেকে আরেকটা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল। নতুন পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে নিজেদের পোশাকি সামাজিকতায় শাসকের শিলমোহর আদায়ের তাগিদ কিভাবে সক্রিয় হয়েছিল, তা আমরা জুতো ও পাগড়ি প্রশ্নে প্রশাসনের সাথে পত্র-চালাচালি দেখে এতক্ষণ বোঝার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু এবার যদি আমরা রাজনৈতিক স্তর থেকে প্রাত্যহিক যাপনের স্তরে নেমে আসি, তাহলেও এদেশীয়দের ঋতুভিত্তিক পোশাকের বিভিন্নতার দিকে তাকালে বুঝতে পারব, কিভাবে মধ্যবিত্ততার পোশাকি পরিসরের বিকাশ ঘটছিল। ইংরেজ-আগমনের আগে যেমন এদেশীয় শীতকালীন পোশাকি রুচিতে আড়ম্বরের কোনও আতিশয্য ছিল না। বিত্তশালীরা চোগা-চাপকানের বা পারসী কোট বা চায়না কোটের উপর শাল এবং আলোয়ান পরতেন[207], কেউ পশমী জামা বা পিরাণ গায়ে দিতেন, কেউ বা তার উপর কাশ্মীরি শাল বা মুর্শিদাবাদী বালাপোশ

---

[205] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শতাব্দীর মৃত্যু', ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ ৩০৯।

[206] পরশুরাম, 'গুপী সাহেব', পরশুরাম গ্রন্থাবলী, পৃ ৪২৩। Archive.org/details/dli.scoerat.10776parasuramgranthabali2ndkhanda

[207] রাজশেখর বসু বলেছেন সেকেলে রুচিশীলরা অর্থাৎ যাদের রুচি মোঘলী দরবারি সংস্কৃতির অনুবর্তী ছিল তারা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলযুক্ত পারসী কোট বা কলারহীন ঢিলা গড়নের চায়না কোট পরতেন। দ্রষ্টব্য, রাজশেখর বসু, "আমাদের পরিচ্ছদ", রাজশেখর বসু বিরচিত 'চলচ্চিন্তা', (কলকাতাঃ মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৮৮২ শকাব্দ), পৃ ৩।

জড়াতেন;[208] সাত্ত্বিক আচারী ধনী হিন্দুরা খালি গায়ের উপরই এই শীত-নিবারক কাপড়গুলো জড়াতেন, এবং সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা জড়াতেন দোলাই।[209] জ্ঞানদানন্দিনী বিবাহের পূর্বে তাঁদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের শীতকালে পোশাকের সংস্থান নিয়ে লিখেছেন, 'কাপড়ের মধ্যে একখানা শাড়ি পরতুম, আর শীতকালে একটা দোলাই মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের কাছে গিঁট বেঁধে দেওয়া হত।'[210] নিম্নবিত্ত পরিবারে কাপড়ের যে কত অনটন ছিল তা সেকালীন নতুন কাপড় বাড়াবার আগে কিছু লোকাচারের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়। কাপড় বেশিদিন টেকসই হবার জন্য নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের নতুন কাপড়ের একপ্রান্ত থেকে একটি সুতো নিয়ে, তাকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে, বলতে শেখানো হত – "কাঁটা নাও", "খোঁচা নাও", "আগুন নাও"।[211]

কিন্তু এদেশীয় রুচির বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার, পাশ্চাত্য বাজারের থাবা পড়ার সাথে সাথে মধ্যবিত্তের শীতকালের সাথে আরাম ও উদযাপনের একটা সম্বন্ধ বিকশিত হতে থাকে। গায়ে উঠতে শুরু করে অনেক প্রস্থ পোশাক। প্রথমে 'গেঞ্জি'[212], তার উপর 'কামিজ' বা শার্ট[213], সেই শার্টের উপর ওয়েস্ট কোট, তা উপর ওপেন-ব্রেস্ট কোট, তার উপর থাকতো চাদর বা কুঁচিয়ে

---

[208] শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ, 'পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ', ভারতবর্ষ, ৫২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৭২, পৃ ৭৩৫।

[209] উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় হালিশহরের গণ্ডগ্রাম থেকে বিবর্তিত হয়ে শহরে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে 'গণ্ড' শব্দটির 'বৃহৎ জনাকীর্ণ' অর্থ থেকে 'অজ পাড়াগাঁ' অর্থে নেমে আসা বিষয়ে বলছেন, 'দুর্দৈবের কোন্ প্রথম দিবসে কিরূপ বিপাকের অবস্থায় প'ড়ে 'গণ্ডগ্রাম' তার মহিমার শাল-দোশালা থেকে রিক্ত হয়ে দৈন্যের দোলাই গায়ে দিতে আরম্ভ করলে ...' এই রূপকার্থ থেকে 'দোলাই' শব্দটির সাথে যে ভাব জড়িয়ে আছে, তা উপলব্ধি করা যায়। দ্রষ্টব্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় পর্ব*, (কলিকাতাঃ ডি এম লাইব্রেরি, আশ্বিন ১৩৫৮), পৃ ৬; হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, 'কলকাতার রাত্রি রহস্য', সম্পাদনা ও টীকা কৌশিক মজুমদার, (কলকাতা: বুক ফার্ম, ২০২০; প্রথম প্রকাশ ১৯২৩), পৃ ৭৭।

[210] ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী সম্পাদিত 'পুরাতনী', (কলিকাতাঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কার্ত্তিক ১৮৭৯ শকাব্দ), পৃ ১৪, ২৪।

[211] তদেব।

[212] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ইংলণ্ডের দক্ষিণে ইংলিশ চ্যানেলে গায়েনসি ও জারসি বলে দুটো দ্বীপ আছে। জেলে মাঝি প্রভৃতি দ্বীপবাসীরা যে জামা গায়ে দিত, তার থেকে এই নাম। 'জারসি' পরে খেলোয়ারেরা; আর গেঞ্জি পরি আমরা সবাই।' দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ফিরে ফিরে চাই, পৃ ১১২; দ্রষ্টব্য, রাজশেখর বসু, "আমাদের পরিচ্ছদ", রাজশেখর বসু বিরচিত 'চলচ্চিnta', পৃ ৩।

[213] প্রভাতকুমার লিখেছেন, আমরা এই ' 'কামিজ' পেয়েছিলাম পর্তুগীজদের কাছ থেকে। এই শার্টের কলার কতো রকমের। আবার সাহেবরা 'ডবল-ব্রেস্ট' শার্ট পরতো ডিনার স্যুটের স্নজ্ঞে। সে শার্টের বুকের দিকটা মোটা কাপড়ে তৈরি, স্টার্চ দেওয়া – কাঠের মতো শক্ত ও চুনের মতো সাদা।' দ্রষ্টব্য, তদেব।

পাকানো উড়ুনি।[214] অধোবাস হিসেবে 'তিন-প্রস্থ ধুতি'।[215] হেমেন্দ্রকুমার রায় বিশ শতকের শুরুতে মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবার শীতের পোশাকের বহর বিষয়ে শ্লেষ হেনেছিলেন, 'জুতো, মোজা, সোয়েটার, গলাবন্ধ, ওয়েস্টকোট, কোট, ওভারকোট, অলস্টার, শালদোশালা আর যৌবনের প্রবল উত্তাপেও তোমার শীত ভাঙছে না ...'[216] আবার শীতের পোশাকের প্রতিটি প্রস্থ ধারণের কায়দা নিয়েও নানান সামাজিক নির্মিতির জন্ম হয়েছিল। রাজশেখর বসু কোটের উপর চাদর নেওয়াকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের পোশকি চেতনায় কিভাবে আঞ্চলিকতার নির্মিতি ঘটেছিল তা দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'শার্টের উপর চাদর বা উড়ুনি ইচ্ছাধীন, কিন্তু কলকাতার যুবসমাজে কোটের উপর চাদর পরা বাঙাল বা খোট্টা-বাঙালীর লক্ষণ গণ্য হত।'[217] অর্থাৎ একসাথে দুটো শীতনিবারক ব্যবহার করা কলকাতার তথাকথিত উচ্চরুচির যুবসমাজে বোকামি এবং মাথা-মোটার মতো আচরণের নামান্তর ছিল।[218] উনিশ শতকের কুড়ি তিরিশের দশক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাক নান্দনিকতার প্রশ্নেও সমালোচিত হয়েছিল। ধুতির উপর কোট পরা বা কোটের উপর চাদর নেওয়া – এই বিষয়গুলোকে নান্দনিকতার প্রশ্নে রুচি-বিকার সাব্যস্ত করে, শ্রীযামিনীকান্ত সেন লিখেছিলেন, '... ধুতির সঙ্গে কোটের একটুও সামঞ্জস্য হ'তে পারে না – ধুতির flowing line-এর পুষ্পিত প্রাচুর্য্যের সঙ্গে কোটের কঠিন লাইনের আড়ষ্ট রেখা খাপ খায় না। কোটের লাইনের সঙ্গে প্যান্টের লাইন মেলে – ধুতি এবং কোটের সঙ্গম অদ্‌ভূত – তা'তে মানুষের ওপরকার hemisphereকে hydraulic press-এ চাপা এবং নীচের দিকটা বেলুনের মতো ফাঁপানো মনে হয়।'[219]

সে যাই হোক, কিন্তু বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই সারা শীতজুড়ে দেহের উপর সবসময় আলস্টার রাখতেন, যাঁদের ঠাণ্ডার ধাঁত – তারা গলায় কম্ফর্টার জড়াতেন।[220] সর্বসাধারণের মধ্যে র‍্যাপারের

---

214 প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'আমার কাকা এই অপরূপ পোশাক পরে আসতেন ঘোড়ায় চড়ে। অথচ পরনে একটি ধুতি।' ঊর্ধ্বাঙ্গে প্রস্থে প্রস্থে পাশ্চাত্য প্রভাবিত শীতের পোশাক আর নিম্নাঙ্গে লংক্লথের ইজার বিহীন শুধুমাত্র ধুতি – খানিক বেমানানই বটে। দ্রষ্টব্য, তদেব।

215 অশোক মিত্র, 'তিন কুড়ি দশঃ প্রথম চব্বিশ বছর, ১৯১৭-১৯৪০' (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, কার্তিক ১৩৬০), পৃ ১৩২।

216 হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, 'কলকাতার রাত্রি রহস্য', পৃ ৭৭।

217 রাজশেখর বসু, "আমাদের পরিচ্ছদ", রাজশেখর বসু বিরচিত 'চলচ্চিন্তা', পৃ ৪।

218 শ্রীযামিনীকান্ত সেন, 'পরিচ্ছদ-কলা', সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৩৪, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, পৃ ৫৮৩।

219 তদেব।

220 শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, 'আমাদের পোষাকে যুদ্ধের প্রভাব' (অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে পঠিত রচনা), বঙ্গশ্রী, ১২শ পর্ব, ২য় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩৫১, পৃ ৬৮।

প্রচলন ছিল। যে র‍্যাপার কিনা সুতির মোটা কাপড়ের যেমন হত, তেমনি পশমেরও হত। সব নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাবারা পরিবারের সকলকে পশমের র‍্যাপার কিনে দিতে না পারলেও, অন্তত সন্তানদের জন্য পশমের র‍্যপার কিনে নিজেদের জন্য কাপড়ের ওপর

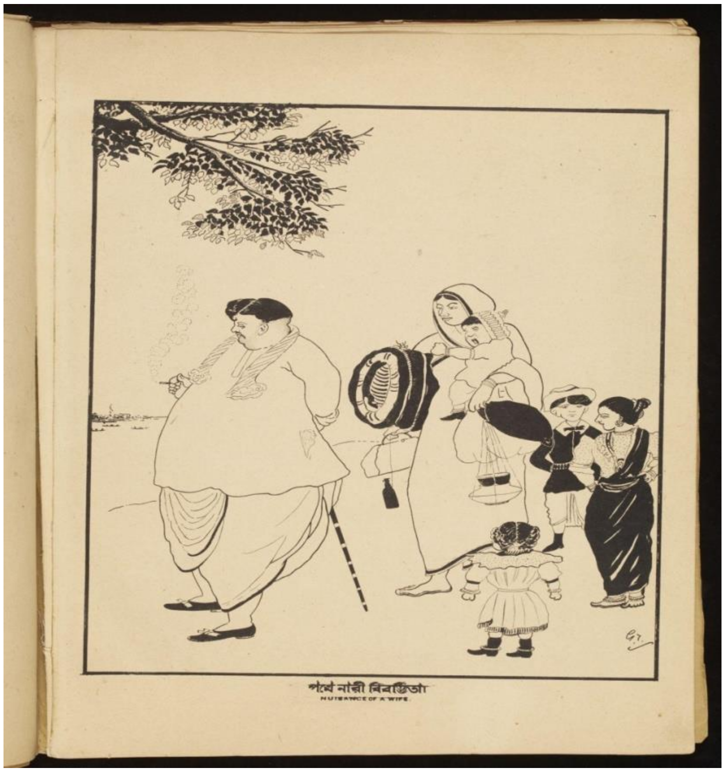

চিত্র৪.৯: বাবু ও তাঁর পরিবার (ছবি কৃতজ্ঞতা: Victoria & Albert Museum, London, IS.5:5-1987)।

কাপড়ের প্রস্থ দেওয়া সুতির র‍্যাপারও ব্যবহার করতেন। সন্তান যেন তাদের স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত রূপ। তাই নিজেরা আর যাই করুন, সন্তানকে সবচেয়ে ভালটুকু দিয়ে সাজানো চাই।[221] কিন্তু সন্তানকে সবটুকু পাশ্চাত্য রুচির পোশাকি আভরণে সাজাতে গিয়েও মধ্যবিত্তের ভাসা ভাসা সৌন্দর্য্যবোধের রূপ বেরিয়ে এসেছিল বলে বিংশ শতকের বিশের দশকে সমালোচনা হয়েছিল। সেখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, যে শিশুরাজ্য স্বপ্ন ও আনন্দের মিশেলে গড়ে ওঠে, সেই শিশুর রাজ্যকে বাঙালিরা কি আভরণ দিতে পেরেছে? তার উত্তরে বলা হচ্ছে, ‘সন্ধ্যার সময় কলকাতার কোন park বা উদ্যানে গিয়ে একটু পায়চারি করলে দেখতে পাওয়া যাবে, কিরকম কৌতুকাবহ

---

[221] আশাপূর্ণা দেবী, “সোনালী মেঘ”, ‘গল্পসমগ্র’, চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৭১), পৃ ৮; সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, “বিনোদ হালদার”, ‘সৌরিন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ’ থেকে (কলিকাতাঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির); শিলাদিত্য, ‘বসন-সঙ্কীর্তন’, বসুধারা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭; অশোক মিত্র, *তিন কুড়ি দশ,* পৃ ১৩২।

সজ্জা তাদের (শিশুদের) আমরা দিয়েছি। যেরকমের অদ্‌ভুত ফ্রক তাদের গায়ে দেখা যাবে, তা'র দোসর দুনিয়ার কোনো সভ্য বা অসভ্য জাতির মধ্যে পাওয়া যাবে না; ... ইউরোপীয়েরা এরকম ফ্রক, গল্যাবদ্ধ, ব্যাগের মত টুপি দেখলে শিউরে উঠবে, কারণ ফ্রক জিনিষটা তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেলেও, এরকম জিনিষ তাদের কল্পনাতীত। এক দফা এই সমস্ত ফ্রক প্রভৃতি এবং ন্যাকড়াবাঁধা মোজাসুদ্ধ জুতো, তার উপর আছে ডায়মণ্ড কাটা পায়ের মল, গলায় বিছে হার – বেশ একটু ভারি – কানে দুল, টুপির নীচে লাল রিবনের টুকরোও দেখা দিচ্ছে; -- কিছু বাদ যায়নি, কোনদিকে অভাবের গলদ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এই সব মালমসলা নিয়ে শিশু চলছেন ফিরছেন – হায়রে বাঙ্গালী জাতি।'[222] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" তথা ৪.৯ ছবিটি লক্ষনীয়। সেখানেও বাবুর পোশাকি সামাজিকতার দিকে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তাকানো হয়েছে। চকচকে black leather shoe-stick-cigarette-এ সজ্জিত পাশ্চাত্য পরিশীলিত বাবু ক্রন্দনরত বাচ্চা-কোলে স্ত্রী ও অপর তিন সন্তানে পরিবৃত। বাবুর স্ত্রী বাবুর সাত্ত্বিকতার প্রতীক যেন। তাঁর পরনে কোনো বিলিতি সাজ নেই, পায়ে জুতো মোজা নেই। কিন্তু তাঁর চার সন্তানই যেন বাবুর সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতীক। তাদের সকলের শরীরকে যুগের "hibridised" ফ্যাশনে গলিয়ে বাবু যেন নিজের সামাজিক ক্লাস নির্ধারণ করেছেন। বাবুর কিশোর পুত্রের পরণের পোশাকের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাকে লং কোটের সাথে লম্ব-কোচা ধুতি, ব্রিমড হ্যাট, হাঁটু-লম্বা সক্স ও বুটে সাজানো হয়েছে, যে সজ্জার মধ্যে কোনো নান্দনিক বোধ নেই বলে যামিনীকান্তও সমালোচনা করেছিলেন।

মধ্যবিত্তীয় মানসিক বলয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়া নিম্ন-মধ্যবিত্তরা উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর করে নিজেদের সাজাতে না পারলেও, অন্তত নিজেদের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য কোন না কোন পাশ্চাত্য ঘেঁষা উপকরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের কাছে এবং আশেপাশের মানুষজনের কাছে নীরবে নিজ রুচির পরিসর জাহির করতেন।[223] সেকারণেই হয়ত শার্ট-কোট-ট্রাউজারস-বুটে সজ্জিত হয়ে ওঠার আর্থিক সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও বা গরমের দেশে বিলিতি শিষ্টাচারের উক্ত পোশাকে সজ্জিত হয়ে আরাম পাওয়া দুষ্কর জেনে – মধ্যবিত্তের অনেকে ধুতির সাথে শার্ট পরতে শুরু করেছিলেন। অনেকে বা ধুতির সাথে কোট পরতেও শুরু করেছিলেন। শ্রীযামিনীকান্ত

---

[222] শ্রীযামিনীকান্ত সেন, 'পরিচ্ছদ-কলা', সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৩৪, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, পৃ ৫৮৫-৫৮৬।

[223] তারাশঙ্কর স্মৃতিকথায় তাঁর মেশোমশাইদের বাড়ির এই রুচি জাহিরের প্রবণতা বিষয়ে লিখেছেন, 'নগেনবাবুদের পাঁচ ভাই যাঁরা তখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন – তাঁদের সকলের বয়স পঁয়ত্রিশের নিচে; কিন্তু তাঁরা তখন থেকেই সাদা পাড় অর্থাৎ থান ধুতি ব্যবহার করতেন।' তারাশঙ্করের বলার ধরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, যেন ওই বয়সে থান ধুতি পরা সমসাময়িক রুচিশীলদের থেকে আলাদা। কিন্তু থান ধুতি পরেও যা ওই বাড়ির পুরুষেরা বিশেষভাবে করতেন, 'এঁদের বাড়ির মহার্ঘতা ছিল জুতোতে এবং গেঞ্জিতে। এদুটো তাঁরা বেশ দামী ব্যবহার করতেন এবং এ সবের উপর এমন যত্ন ছিল নিজেদের যা আমার কিশোর মনকে মুগ্ধ করেছিল ...' অর্থাৎ ওই দুই বিষয়ে তাদের যত্ন ও পারিপাট্য কিশোর মনেও মুগদ্ধতা ছড়াতে সমর্থ হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতিকথা', ১ম খণ্ড, পৃ ২৫৬।

সেনের মতে, এই প্রবণতা একটা শ্রেণির পরিচ্ছদ-কলার অসাজুয্যকে তুলে ধরে।[224] কিন্তু তারাশঙ্করের স্মৃতিকথা পড়লে বোঝা যায়, বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে দেশীয়দের মধ্যে পোশাকি স্বাচ্ছন্দ্য-মানসিকতার বিস্তারও ঘটতে থাকে। যে পোশাক পরে রুচি-পুলিশির কবলে পড়তে হয়, সেই পোশাক পরার বাসনা থেকে মধ্যবিত্তের অপেক্ষাকৃত নিচুতলার মানুষজন এবং স্বাদেশিক মননবৃত্তির মানুষজন অপসৃত হতে থাকেন। যে শার্ট পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচার অনুসারে কোটের তলে পরার বিধান, সেই শার্ট কোটছাড়া ধুতির সাথে পরা এবং সামাজিক বিদ্রুপের স্বীকার হওয়ার চাইতে এমন পোশাক পরাই ভাল, যাতে স্বাচ্ছন্দ্যও থেকে আবার স্বাদেশিকতাও। তাই পিরাণকে আরও বেশী ঝুলযুক্ত করে যে পোশাক এল তার নাম পাঞ্জাবি।[225] পিরাণের এই ঝুল বর্ধনে পাঞ্জাব প্রদেশের আজানুলম্বিত কামিজের রেফারেন্সেরও ভূমিকা ছিল। তাই রাজশেখর বসু বলেছেন অধুনা যাকে 'পাঞ্জাবি' বলছি, তা পিরাণ ও পাঞ্জাবের আজানুলম্বিত কামিজের যোগফল।[226] যদিও আহমেদ শরীফের মতো চিন্তাবিদ বলেছেন, হাতা পাঞ্জা পর্যন্ত বিস্তৃত বলেই এর নাম পাঞ্জাবি।[227] সে যাই হোক, যে অস্বচ্ছল মধ্যবিত্ত আধুনিকতার অভিঘাতে সভ্য হতে গিয়ে একদা ধুতি-চাদর ছেড়ে ধুতি-শার্ট বা দুতি-কোটের সাজ ধরে 'বহুরূপী' তকমা জুটিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা কাপুড়ে সভ্যতার অন্তসারহীন স্বরূপ বুঝে গিয়েছিলেন বা জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের পোশাকি রুচি ১৯২০-৩০ দশকের মধ্যেই ধুতি-

---

[224] শ্রীযামিনীকান্তের ভাষায়, 'শোনা গেছে যখন য়ুরোপের পরিচ্ছদ Polynesia-য় গেল, তখন আদিম আধিবাসীরা অকুতোভয়ে কোটকে প্যান্টের জায়গায়, এবং প্যান্টকে কোটের জায়গায় ব্যবহার করত। এই সাহস সুসভ্য বাঙালীরও আছে দেখতে পাওয়া যায়; বলতে কি আমাদের পরিচ্ছদ-কলার এত অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য রয়েছে যে, নিপুণ দ্রষ্টার তাতে তাক লেগে যাবার কথা। বাংলা দেশের ভাবুকগণ, বিলাতের যে underwear, সেটাকে স্বচ্ছন্দে বাইরে ব্যবহার করতে লজ্জিত হয় না। সার্ট পরে ভদ্রলোকেরা সর্বত্রই চলাফেরা করে, কিন্তু তা'তে যে কৌতুকের সৃষ্টি হতে পারে, তা কেউ ভাবে না। সার্টের ছাঁট তার উপরের একটা কোটের অপরিহার্য্যতা স্বীকার করে রচিত হয়েছে – হাতের কাফ বা গলার band-এ তা বোঝা যায়; ওরকম অসমাপ্ত অবস্থায় সার্ট ব্যবহার চলেনা। অথচ সে বিষয়ে কারও হুঁস নেই – অম্লান-বদন যুবকেরা পলিনেসীয় জাতির ন্যায় এই অসংলগ্নতায় ব্যথিত হচ্ছে না।' তিনি আরও লিখছেন, 'Dressing-gown পরে ময়দানে বেড়ানো বা Sleeping suit-এর উপরকার অংশ পরে নির্ভয়ে চলাফেরার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।' পোশাকি সৌন্দর্য্য ও তার নৈপুণ্যের পাশ্চাত্য অনুবর্তিতা পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচির ফল। সুতরাং সেই সৌন্দর্য্যবোধের খানিক নড়বড়ও বড্ড চোখে লেগেছে তাঁর। দ্রষ্টব্য, শ্রীযামিনীকান্ত সেন, 'পরিচ্ছদ-কলা', সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৩৪, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, পৃ ৫৮৩।

[225] সে পাঞ্জাবির স্টাইলের সংস্থানেও নানাজনের প্রভাবে নানা পরিবর্তন হয়েছে। প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'বাবা 'পাঞ্জাবি' পরতেন – সে জামার বোতাম ছিল কাঁধের দিকে। পরে শুনেছি সামনে বোতাম দেওয়া 'পাঞ্জাবি' জামার প্রচলন করেন রবীন্দ্রনাথ (?)।' দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১১২।

[226] রাজশেখর বসু, "আমাদের পরিচ্ছদ", পৃ ৪।

[227] 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', অষ্টম খণ্ড, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫), পৃ ৫০৬।

পাঞ্জাবিতে স্থিত হয়েছিল, আর সভ্যতার পশ্চাতে ধাবমানরা ওই সময়কালেই চোগা-চাপকান-শামলা-পাগড়ি ছেড়ে কোট-প্যান্টালুনের সভ্যতারূপী স্বাচ্ছন্দ্যে বাধা পড়লেন।[228]

উনিশ শতকের আটের দশকে জন্ম নেওয়া রাজশেখর বসুর মতো রসায়নবিদ নিজের পোশাকি চেতনায় ফ্যাশনের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের এবং আরামকে মেলাতে চেয়েছেন। তাঁর মতানুসারে শুধু উৎকৃষ্ট সাজবার জন্য আধুনিকতাকে পোশাকের মধ্য দিয়ে গায়ে চাপালেই চলবে না। সেই পোশাক মধ্যবিত্ত পুরুষের প্রাত্যহিক কর্মযজ্ঞে কতটা আরামের তাও পরিচ্ছদ ধারণের সময় মাথায় রাখতে হবে। তিনি বলেছেন, 'অনেক কাল আগে একজন মান্যগণ্য ইংরেজ (নাম মনে নেই) কয়েক বৎসর বাঙলা দেশে বাস করে বিলাতে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন – We are baked for four months, boiled for four months and allowed to cool four months. এই বিবরণে অত্যুক্তি আছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে আমাদের মাতৃভূমি গ্রীষ্মকালে সর্বদা মলয়জশীতলা থাকে না, গুমট আর ভ্যাপসা গরম দুই আমাদের ভোগ করতে হয়। এদেশের বাতাস পশ্চিম ভারতের মতো শুকনো নয়, সেজন্য তাপ প্রবল না হলেও ঘাম বেশী হয়। এখানে বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত প্রায় সাত মাস অল্পাধিক গরম, শীত ঋতুও মৃদু ও অল্পস্থায়ী। অতএব আমাদের পরিধেয় প্রধানত আর্দ্রোষ্ণ (humid and hot) বায়ুর উপযুক্ত হওয়া উচিত। অবশ্য শীতকালে পরিবর্তন করতে হবে।'[229] রাজশেখর বসু যখন এই বিষয় নিয়ে লিখছেন তখন ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছে, কিন্তু উপনিবেশিক হ্যাঙ্গোভার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বরং স্বাধীনতার পর চলনে-বলনে 'অহেতুক' ইংরেজী চালের মধ্যে পুরুষকূল আরও বেশি নিমজ্জিত। তাই পুরুষকূলকে স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে সচেতন করে তোলার মননটি লেখকের মধ্যে স্বাধীনতা-পূর্ব কাল থেকেই প্রবাহিত। যা তার লেখার পরতে পরতে

[228] রাজশেখর বসু, 'আমাদের পরিচ্ছদ', পৃ ৪।

[229] তদেব, পৃ ৬।

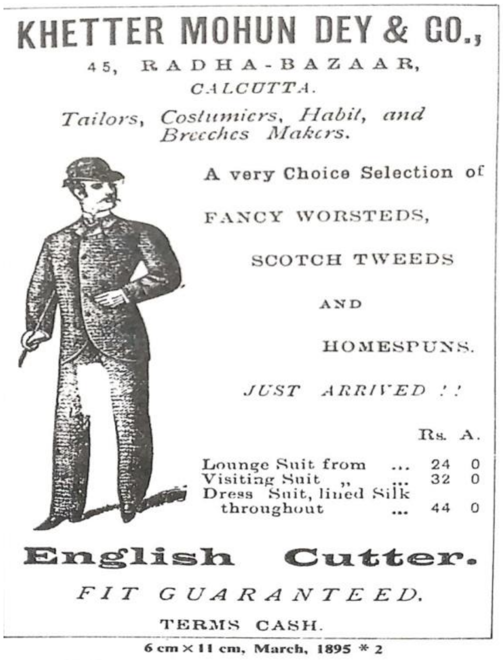

ছবি ৪.১০ & ৪.১১: মিশ্ররুচির পোশাক ও বিলিতি পোশাকের দিশি বিজ্ঞাপন [230] [231]

ধরা পড়েছে। তিনি লিখছেন, 'ইউরোপীয় পুরুষ খালি গায়ে মোটরে চলেছে এই দৃশ্য এখন কলকাতায় বিরল নয়।' পূর্বে সেই দৃশ্য বিরল ছিল অবশ্যই। কারণ তখন সাদা-চামড়ার শাসক সমাজ পোশাকি শিষ্টাচারে নিজেদের দেহ মুড়েছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর সেই শিষ্টাচারী আইনের বোঝা যখনই সাদা-চামড়ার শরীর থেকে নেমে গেল, কলকাতার ভ্যাপসা গরমে স্বাচ্ছন্দ্য পেতে উদল গায়েও গাড়ি হাঁকিয়ে ইংরেজরা চলাফেরা করেছেন। কিন্তু এদেশীয় ভদ্রমহোদয়গণ 'গলা থেকে পা' পর্যন্ত ঢেকেছেন তার পরিবর্তে। পূর্বের বিলাস সভ্যতারূপী শেকল হয়ে ধরা দিয়েছে। তার একটা বাস্তবিক কারণ, স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে ক্রমান্বয়ে ধুতির দাম বৃদ্ধি। যার মূল কারণ পশ্চিমা পোশাকের চাহিদা বৃদ্ধি।

ছবি ৪.১১-এ Messers Khetter Mohun Dey & Co.-এর বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালে বোঝা যায়, বিলিতি রুচির বাজার ধরার জন্য দেশীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও কতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কলকাতার রাধা বাজার স্ট্রিটের উক্ত প্রতিষ্ঠানটি উনিশ শতকের পাঁচের দশকে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ ও মিলিটারি ইউনিফর্ম জোগান দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে

---

230 Group Photograph, 1909, Y-8, Sevati Mitra Collection, CSSSC Archive, Jadunath Bhavan, Kolkata.

231 Ranabir Ray Choudhury, 'Adertisements of Early Calcutta 1875-1925' (Bombay: Nachiketa Publication Ltd., 1992), p. 160; 'The Encyclopedia of India', Vol. III, (Calcutta: The Cyclopedia Publishing Co., 1909), p. 426.

এদেশে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি ঝোঁক বাড়লে, সেটি সাধারণ পুরুষের পোশাক-আশাকও রাখতে শুরু করেছিল – তা বিজ্ঞাপন দেখে অনুমেয়। রাজশেখর বসুও বলেছিলেন, ‘মোটা কাপড়ের প্যান্ট বা ট্রাউজারের খুব চলন হয়েছে। শুনতে পাই স্মার্টনেসের লক্ষণ হচ্ছে ঘোর রঙের প্যান্টের উপর সাদা বা ফিকা রঙের শার্ট। শার্ট পুরো হাতা হওয়া চাই, কিন্তু কনুই পর্যন্ত আস্তিন গোটানো থাকবে। গরিব গৃহস্থকেও ছেলের শখ মেটাবার জন্য দামী কাপড়ের প্যান্ট-শার্ট যোগাতে হয়।’ ইংরেজি শিখে চাষার ছেলের কৃষিকাজে না গিয়ে মোজা পরে বসে থাকার ইচ্ছের সাথে বিংশ শতকের মধ্যভাগে গরিবের ছেলের শার্ট-প্যান্ট পরবার ইচ্ছের মধ্যে রুচির কোনো বিবর্তন নেই। বরঞ্চ শিষ্টাচারের পাশ্চাত্য অনুগামী ব্যাখ্যানটা অনেকটা একস্থানে স্থির বলেই মনে হয়। রাজশেখর বসু এই স্থিরতার কিছু কারন দর্শিয়েছেন। যেমন, প্রথমত, এইসব রঙিন কাপড়ের প্যান্ট চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ধুতির চাইতে দামে সস্তা।[232] অন্যদিকে আধুনিক কর্মব্যস্ততায় প্রত্যহ সাদা ধুতি কাঁচাও ঝামেলা তুল্য হয়ে উঠছিল।[233] প্রত্যহের সাদা ধুতি প্রত্যহ কাঁচা আর প্রত্যহের রঙিন প্যান্ট যাতে ময়লা লাগলেও বোঝা যায় না, তাই প্রত্যেকদিন কাঁচতেও হয় না – এই দুরকম বিকল্প যদি দেওয়া হয়, অবশ্যই কর্মব্যস্ততা নেই এমন মানুষও দ্বিতীয় বিকল্পটিই নেবেন। যাতে পাশ্চাত্য কাপুড়ে সভ্যতাও বওয়া হল, আবার খাটুনিও কম হল। এই মানসিকতাকেও পাশ্চাত্য কাপুড়ে সভ্যতা আমাদের সমাজে গেঁড়ে বসবার কারন হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন। ছবি ৪.১০-এর দিকে তাকালে বোঝা যায়, রেখে-ঢেকে পোশাক পরার বিলিতি শিষ্টাচার সমাজের মধ্যবিত্তকে এমন বেড়িতে বেঁধেছিল যে, ১৯০৯-এর স্বদেশির আবহেও তার থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। ছবিতে চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রমহোদয়দের সকলেই লম্ব-কোঁচা ধুতি পরেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ধুতির সাথে পাঞ্জাবি পরেছেন। বাকি দুজনের মধ্যে ডানদিকে উপবিষ্ট জন পরেছেন ধুতির উপর শার্ট এবং শার্টের উপর কলার দেওয়া গাড় ধুসর বর্ণের চাইনা কোট এবং বামদিকের জন পরেছেন কলার দেওয়া কালো চাইনা কোট। আর

---

[232] শিলাদিত্য নবযুবাদের বিংশ শতকের মধ্যভাগের পোশাক নিয়ে লিখছেন, ‘বয়স বাড়ল – খোকাবাবু হলেন দাদাবাবু। কাপড় (অর্থাৎ ধুতি) পরলেন না কোনোদিন। কৈফিয়ত – কোমরে থাকে না, খুলে পড়ে যায়, বেল্ট পরতে হয়, ইত্যাদি। সুতরাং হাফ-প্যান্ট ফুল-প্যান্ট হল, শার্টের সঙ্গে আমদানি হল বুশ শার্ট। পা-জামা আরও ঢোলা হল, পাঞ্জাবি হল চূড়িদার। বুশ-শার্ট (প্রকারান্তরে হাওয়াই শার্ট, দক্ষিণ এশিয়ার ভিয়েতনামে মার্কিন সেনার আনাগোনার হাত ধরে এই শার্টের ফ্যাশন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।) তার রকমই কত! সাদা কাপড়ের আছে, একরঙা-দোরঙা আছে, শার্টিং এর আছে, আবার রেয়নের আছে, প্রিন্টেড কাপড়েরও আছে। সে প্রিন্টের বাহার কত – যেন একখানি খবরের কাগজ।’ দ্রষ্টব্য, শিলাদিত্য, ‘বসন-সঙ্কীর্তন’, বসুধারা, বৈশাখ ১৩৬৭।

[233] তদেব, পৃ ১০-১৩।

দুর্গাচরণ রায় শরীরে আধুনিকতা চাপানো বাঙালি পুরুষের কালেভদ্রে পোশাক কাঁচার প্রবণতা নিয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে বরুণের মুখে টিপ্পনী কেটেছেন – ‘উহারা যে বস্ত্র পরিধান করে, তা না মরিলে পরিত্যাগ করে না; বস্ত্রখানি জলে ভিজিলে পাছে শীঘ্র ছিন্ন হয়, সেই আশঙ্কায় সহজে জলাভিষিক্ত হইতে দেয় না। ...’ দ্রষ্টব্য, দুর্গাচরণ রায়, ‘দেবগণের মর্ত্যে আগমন’, পৃ ১৮৭।

উপবিষ্ট জনদের পিছনে দণ্ডায়মান ডানদিকের সর্বশেষ জন সম্পূর্ণ বিলিতি শিষ্টাচারে সেজেছেন। এবং বাকিরা নানা রঙের কলার দেওয়া চায়না কোট পরেছেন। কিন্তু ছবিটির দ্রষ্টব্য হল – ধুতি পরিহিত সকলেই বিলিতি স্টাইলের পা-ঢাকা বুট-জুতো পরেছেন। চেয়ারে উপবিষ্ট বাম দিকে থেকে দ্বিতীয় জন মনে হয় ধুতির সাথে চুড়িদার প্যান্টও পরেছেন। যা দেখে অনুমেয় যে ছবিটি শীতকালে তোলা হতে পারে। সুতরাং শীতের পোশাকি স্বাচ্ছন্দ্যেও পশ্চিমা রুচির বাজারের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংশ্লেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কলকাতা অঞ্চলে একটা বিমিশ্র পোশাকি রুচির জন্ম হয়েছিল – তা সহজেই অনুমেয়।

তবে বাজার ও শিক্ষার দৌলতে এই সহজ-যাপিত পোশাকি শিষ্টাচার নিয়েও মধ্যবিত্ত সমাজের একদলের ছুঁৎমার্গ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দার সংস্পর্শে থেকে মধ্যবিত্তের একটা অংশে একপ্রকার উন্নাসিকতার বুনন শুরু হয়, যে উন্নাসিকতা তাঁদেরকে সমাজের সহজ প্রবাহ থেকে আলাদা করে দেয়। আভিজাত্যের মানসিক সীমানায় আটকে, মধ্যবিত্তের মধ্যেও সস্তার সাহেবিয়ানা দেখিয়ে জাতে ওঠার প্রবণতাকে ‘ভালগার’ হিসেবে চিহ্নিত করে গোপাল হালদারের বন্ধু উপেনের মত অনেকেই ‘পস’ হতে চেয়ে নিজেদের আরো একা করে ফেলেছেন।[234] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী হিসেবে সাহেব কলকাতার বাজারে ফ্যাশন-দুনিয়ার চোখ ঝলসানো জিনিসপত্রের আনাগোনা মধ্যবিত্তের একদলের মধ্যে ‘দুটাকার সাহেবিয়ানার’ প্রতি খাটো নজরের সৃষ্টি করে, দুর্মূল্য সাহেবিয়ানাকে আত্তীকরণের ঘোড়দৌঁড়ে সামিল করে। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে আরও ইংরেজমনস্ক, আরও আধুনিক হওয়ার এই বাসনাকে বাণিজ্যিক মুনাফা হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাও তালে তালে বাড়তে থাকে। তাই কলকাতা শহরে প্যারিস ও লণ্ডন ফ্যাশনের ঋতুক্রমিক নানা পণ্যের পসরাও সময়ের সাথে সাথে বেড়েছিল। ১৮৫৮ সালের ১৪ অক্টোবর ‘Paris and London Fashions for the Autumn’ শীর্ষক একটি বিজ্ঞাপনে (ছবি ৪.১২ দ্রষ্টব্য) কলকাতার Old Court Street ঠিকানার Messrs Baker & Catliff এর হয়ে লেখা হয়, ‘THE WHOLE OF Their Extensive Stock of NEW GOODS FOR THE COMING SEASON.

[234] গোপাল হালদারের বন্ধু উপেন আই এস সি পাশ করে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (১৯১৮ থেকে ১৯৪৮ সাল অবধি কলকাতা মেডিকেল কলেজ বাংলার গভর্নর Thomas Gibson-Carmichael কে সম্মানার্থে এই নামে পরিচিত ছিল) ডাক্তারিতে ভর্তি হতে পারতেন, কিন্তু ‘উপেনের মাপকাঠিতে (ওই) হাসপাতালে না আছে ডাক্তারি শেখবার মতো আয়োজন-পত্র, না তার ছাত্রদের চাল-চলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কথা-বার্তায় ডাক্তারী ছাত্রের যোগ্য স্মার্টনেস ও মর্যাদাবোধ।’ বি এস সি পাশ করে শেষে তিনি পুঁজি নিয়ে নেমেছিলেন শেয়ার বাজারে। উপার্জনও করছিলেন বেশ। সেই আভিজাত্যের মানসিক সীমানাটা বেঁচে ছিল। বন্ধুদের সাথে গল্প করতেন, নিজে ব্যবসায় সুস্থির হয়ে বন্ধুদেরকে ‘ডিসেন্ট লাইফে’ সেটেল করে দেবেন। ‘ইউরোপীয় স্টাইলে’ বন্ধুদের সাথে ‘উইক এণ্ড’ কাটাবেন, যা হবে ‘ফেয়ার কম্পেনি বাট রেসপেকটবল এ্যাণ্ড ডিসেন্ট।’ কিন্তু ১৯২৯ এর মন্দা এসে সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। সবকিছু থেকে উপেন নিজেকে গুটিয়ে নিল। কল্পনার আভিজাত্যের বাহ্যিক সাকার রূপ দিতে না পারার হতাশা তাকে বন্ধু-বান্ধবের সাথেও সাক্ষাৎ করার পথে বাধ সেধেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সেই রুচিশীল উপেন সবার অলক্ষ্যে কাঁচড়াপাড়া যক্ষা হাসপাতালে মারা যান। একেই বোধয় কালের পরিহাস বলে। দ্রষ্টব্য, গোপাল হালদার, ‘রূপনারায়ণের তীরে, দ্বিতীয় খণ্ড, যৌবনের রাজটীকা’, (কলিকাতাঃ পুঁথিপত্র, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ১৪।

They do not hesitate to say that they have the largest stock of millinery and Drapery ever shown in Calcutta at one time. The whole has been selected with great care by one of the partners, who has been home especially for that purpose, and can therefore be confidently recommended to the Public as comprising every Novelty procurable in Paris and London.'[235] এই সযত্নে বাছাইকৃত পণ্য সম্ভারের মধ্যে বাচ্চা থেকে শুরু করে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য Lyon, Spitalfields এবং Manchester সিল্ক;[236] পুরুষের আঙরাখা, মেয়েদের গলায় জড়ানোর তেরছা ধরণের শাল বা Fichus, প্যালেটট কোট এবং জ্যাকেট;[237] ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য হ্যাট-টুপি;[238] পুরুষের জন্য গেঞ্জি বা বেনিয়ান ও মোজা্র বিস্তর সম্ভার;[239] বাচ্চাদের জন্য ও মহিলাদের জন্য অন্তর্বাস; বড় ব্যাগ এবং হাত-ব্যাগ; লিনেনের কাপড় চোপর; সাধারণ মসলিনের কাপড়-চোপড়; সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়; বেড-কুশন কভার; জামাকাপড়ে লাগানোর লেস; গ্লোভস; কম্বল,

---

[235] The Indian Daily News, 14 October 1868.

[236] কাপড়গুলি কিরকম তার কিছু নমুনা দিয়ে রাখা ভালো। বিজ্ঞাপনে হরেক রকম সাটিন কাপড়ের কথা আছে – 'Black French Dress Satins, Pure White Satins, Black Ground French Broche Satins, Satin Stripped Moire Antiques, ', আছে বিভিন্ন রঙের গ্লেস কাপড়ের কথা –' Glaces Gro Grains, The New Coloured Shot Glaces', বিভিন্ন ধরণের সিল্ক কাপড়ের কথা, 'Coloured Ottoman Silks, Black Ground French Broche Silks, Fancy Striped Silks, Yokohama Silks.' দ্রষ্টব্য, The Indian Daily News, 16 October 1868.

[237] তেরছা শাল বা Fichue এর মধ্যে – তেত্রিশ টাকা দামী Maire Blanche, ৪২ টাকা দামী Maire Louise, ৪৫ টাকা দামী Maire Antonette এবং ৭০ টাকা দামী Fenette উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জ্যাকেটের মধ্যে 'Black Silk Jacket of Rich Glace, Gro Grain trimmed with Satin, Pure Lyon Silk Velvet Jackets, Silk, Velvet, Cashmere and Lace House Jackets'; প্যালেটট কোটের মধ্যে Black Sattara; আঙরাখা বা Mantle এর মধ্যে Patti – a beautiful Mantle of Knitted Silk and Andalusian Wool, in White and all Colours, peculiarly adapted to the Opera Carriage', 'Zephyr Silk Opera Mantle in Pink, Sky and White, Silk Striped Bournouse Mantles in every Colour, Black and White Lace Mantles', শালের মধ্যে 'Coloured Cashmere, Black Grenadine Shawls' ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য, তদেব।

[238] হ্যাট-ক্যাপের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে, 'Fifty different styles to select from.' বোঝাই যাচ্ছে কি বিপুল সম্ভার। আর শুধু সম্ভারই নয়, ক্রেতাদের নতুন ফ্যাশনের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, 'The latest Fashions received by every P. and O. Steamer.' আর সেসব ক্যাপ-হ্যাটের দাম বারো টাকা আট পয়সা থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে। আর এসব হ্যাট-ক্যাপের আকার আকৃতিও বহুতর। যেমন বালিকা ও মহিলাদের জন্য 'Straw, Lyons, Mercury, Cleveland, Cannes, La Belle, Clara, Paris, Rosetta, Princess' প্রভৃতি জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যাণ্ডের, ভিন্ন ভিন্ন আকারের হ্যাট ছিল সেই সম্ভারে। বালকদের জন্য ছিল, 'The Albert, New Wales, Derby, Exbridge, Windham, Canton, Stanhope, Samdringham, Buckingham' ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য, তদেব।

[239] এছাড়া নানা সাইজের মোজার সমাহারও চোখ ধাঁধানোর মতো, 'Unbleached Cotton Socks, White Cotton Socks, Coloured Cotton Socks, Spun Silk Socks, Grey and Merino Socks, Fancy Merino Socks, White and Coloured Lambswool Socks'; আর গেঞ্জির মধ্যে, 'Merino Banians or vests', ভারতের আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে বানানো, 'Indian Gauze Banians', শীতের উপযোগী 'Lambwool Banians', গরমে শরীরের ঘাম শোষার জন্য উর্দ্ধবাসের নিচে পরার 'Coloured Saxony Flannel Shirts', সুনিদ্রার জন্য ব্যবহৃত 'Flannel Sleeping Suits' ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য, তদেব।

ফ্লানেল, কার্পেট; বিবাহের সাজসজ্জা ইত্যাদি। আর বসন্তের ক্রান্তীয় আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে একই পণ্য বিক্রেতা কোম্পানি হাজির করেছিল ঋতু অনুসারী

ছবি ৪.১২: The Indian Daily News এ ১৮৬৮ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রকাশিত প্যারিস ও লণ্ডন ফ্যাশনের বিজ্ঞাপনী কভার (@National Library, Kolkata)

কাপড়-চোপড়ের সম্ভার – বায়ুমণ্ডলের ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার জন্য উপযোগী কেম্‌ব্রিক তন্তুর কাপড়, সুতোর সূক্ষ্ম বুননযুক্ত সুতির কাপড় pique, মসলিন তন্তুর জামা-কাপড়, সাটিনের নেট-লেস লাগানো চটকদার জামাকাপড়, Blond lace এবং satin lace দিয়ে ডিজাইন করা Parisienne style এর সুললিত, সুচারু এবং আরামদায়ক পোশাক, বলরুমে পরার জন্য সূক্ষ্ম মসলিনের টারলাটান ড্রেস, ছেলেদের বলরুমে অংশগ্রহণের জন্য সাটিনের উপর স্ট্রাইপ দেওয়া ক্যাম্‌ব্রিকের পোশাক, মেয়েদের জন্য লেস লাগানো তেরছা শাল, তাছাড়া ক্যাম্‌ব্রিকের রুমাল, লেস লাগানো লাল রঙের রুমাল ইত্যাদি।[240] Francis Ramsay & Companyর গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞাপনে পুরোনো মালপত্র খালি করে নতুন মালপত্র তোলার আগে বিশেষ ছাড়ের ঘোষণা দিয়ে লেখা হয়েছিল, ‘Have just received a splendid assortment of NEW GOODS, which they are offering considerably below their value, with the view of REDUCING the STOCK as much as possible STOCK-TAKING.’ আর সেই জামাকাপড়ের মধ্যে ছিল, ‘Elegant French Bonnet, Black Lace Jackets, White Brussels Lace Fichues (মেয়েদের গলায় জড়ানোর জন্য তেরছা জাতীয় কাপড়), Black Pusher Lace Fichues, French Muslin Robes’, ঘরের সৌখিন আসবাবপত্র ঢাকার জন্য ‘French Furniture Chintzes’, এছাড়া ‘Best Quality British Printed Cambrics, Fine Linen Ginghams’ (মালয়েশীয় অপেক্ষাকৃত কমদামী, টেকসই চেক কাপড়), এবং দামি কাপড়ের মধ্যে ‘French Printed Muslin’ ইত্যাদি।[241]

---

[240] Spring Fashions, 1869, The Indian Daily News, 5 February 1869.

[241] Paris Fashions for July, The Indian Daily News, 5 September 1868; নীলিমা দেবী, ‘অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ’, মাসিক বসুমতী, ২৪শ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৫২, পৃ ৭৬-৭৭।

এই সমূহ বিজ্ঞাপনে উনিশ শতকের মধ্যভাগ জুড়ে ইংরাজি সংবাদপত্রগুলো ছয়ালাপ। শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দেহের ওজন প্রদর্শনের সাথেই কেবলমাত্র এইসব বিজ্ঞাপনের সম্বন্ধ তা ভাবা যাবে না, কারণ আগের অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে শাসকের রাজনৈতিক শরীর তৈরিতে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বিলিতি রুচির প্রসারের প্রেক্ষাপটের সাথে এখনকার প্রেক্ষাপটের তফাত আছে। উনিশ শতকের দুই-তিনের দশক থেকে ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্তির সাথে সাথে যে দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে শুরু করল, সেই শ্রেণীর পোশাকি রুচির যে পরিসর এতক্ষণ ধরে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম, সেটা এইধরণের বিজ্ঞাপনের দ্বারাও যে অনেকাংশে প্রভাবিত তা অস্বীকার করা যাবে না।[242] কারণ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজে ইংরেজি কাগজে বিজ্ঞাপিত কোনো দেশীয় গোষ্ঠীর দিকে যেখানে সম্ভ্রমের চোখে দেখা হত, সেক্ষেত্রে ইংরেজি কাগজে বিজ্ঞাপিত পণ্যসম্ভারের একটি পণ্যকেও কি চক্ষে দেখা হতে পারে – তা অনুমেয়।[243] এই একই জিনিস দেখা যেত, গবর্নরের প্রদত্ত উপাধি না পেয়েও, সেই উপাধি ধারণ করে সামাজিক স্তরে নিজেদের কাগুজে মান্যতা তৈরির প্রবণতার মধ্যে।[244] ইংরেজি কাগজে বিজ্ঞাপন, ইংরেজ সরকারের উপাধি যেমন সামাজিক সম্মানের পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠছিল, তেমনি অনেক দেশীয় দোকানপাটে দোকানের মালিকরা মধ্যবিত্ত ‘পস’ খদ্দেরদের আকর্ষণ করার জন্য ইংরেজ প্রভাবিত শিষ্টাচার – যেমন গদির পরিবর্তে চেয়ার, কর্মচারীদের গায়ে ফিতে-

---

[242] উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতক জুড়ে পত্র-পত্রিকায় মধ্যবিত্ত সৌখিন পুরুষের চরিত্র-সৃজনে গল্প-উপন্যাসে নানা-সময় নানা পোশাকি ফ্যাশনের মধ্যে বিলিতি ডিজাইনের প্রতি ঝোঁক রাখার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত একটি গল্পের চরিত্র, ‘অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি’ হারমোনিয়াম-বাদক হরিচরণের পোশাক যেমন, ‘কোঁচানো কালোপাড় ধুতি। লেস-বসানো বুটিদার আদ্দির পাঞ্জাবি গিলে-করা। পায়ের পাম্প-শুয়র পালিশে আয়নার ঔজ্জ্বল্য। লতানো পাতাকাটা টেরি। মোম-পালিশ সূক্ষ্মাগ্র বাহারে গোঁফ। ...’ এখানে পাঞ্জাবির লেস-বসানো স্টাইলটির সাথে আমরা বিলিতি কাপড়ের বিজ্ঞাপনে লেস-বসানো কাপড়ের সাদৃশ্য পেতে পারি। দ্রষ্টব্য, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ‘নারীনাং’, বসুধারা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৯।

আরেকটি গল্পে থিয়েটারের অভিনেত্রী জিজ্ঞেস করছে, ‘ঢ্যাঙাপানা ফর্সাপানা একটি ছেলে, গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি। আসেনি?’ গরমের দেশে আরামে চলাফেরা করবার জন্য এই ফ্লানেল কাপড় নিয়ে এককালে সাদা-চামড়ার মানুষের মধ্যে কত আলাপ-আলোচনা হয়েছে – তা আমরা দেখেছি। তাদের সভ্যতায় সভ্য হতে গিয়ে এককালে উদল গায়ে গরম নিবৃত্তি করা বঙ্গবাসীর মধ্যেও, তাদের গ্রীষ্মকালীন রুচির ফ্লানেল কাপড় প্রবেশ করেছিল। দ্রষ্টব্য, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘ইতি’, ভারতবর্ষ, ১৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৫, পৃ ৭৯।

[243] ১৩২২ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকায় এদেশীয় মধ্যবিত্তের বিদেশীদের বিজ্ঞাপনের উপর কি গভীর আস্থা, তা বোঝাতে লেখা হয়েছিল, ‘আজকালকার দিনে বিদেশীর মুখে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতে থাকিলে দেশীয় সমাজে শীঘ্রই প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় ...’ দ্রষ্টব্য, ‘বিদেশে আর্য্য সমাজ’, ভারতী, ৩৯শ বর্ষ, ফাল্‌গুন ১৩২২।

[244] ১৮৬৯ সালে The Indian Daily News এর সম্পাদকের কাছে প্রেরিত চিঠিতে জনৈক ভদ্রলোক বাংলা দেশের নাকউঁচু দেশীয়দের অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে লিখেছেন, ‘I see in the paper many native gentlemen entitling themselves *Kumar*, and who, I am sure, have never been honoured with that distinction’, পত্র-প্রেরকের মতে, এই স্যুডো-কুমাররাই আবার সমাজে নানা বিষয়ে নিজেদের উন্নাসিক দেখানোর চেষ্টা করে। দ্রষ্টব্য, Native Snobs, by a Plain Speaker, The Indian Daily News, 3 February 1869.

বাঁধা পিরাণের বদলে ইংরেজ-সরকারের অফিস-আদালতে চলনসই চাপকানের সমগোত্রীয় পাঞ্জাবি-চূড়িদার, ম্যানেজারের গায়ে বিলিতি স্যুট প্রবর্তন করছিলেন।[245] এই পরিবর্তনগুলো সবসময়ই দ্বিপাক্ষিক। ক্রেতা-মহলে চাহিদা বাড়লে বিক্রেতাকেও সেই চাহিদার অনুপাতে নিজেদের পাল্টাতে হয়। আবার ক্রেতা-মহলকে সবচাইতে ভালো মানের আরাম উপহার দিয়ে ব্যবসায়িক লাভের প্রতিযোগিতা বিক্রেতা মহলে যতই বাড়তে থাকে, ততই আরামের বাজারি সংজ্ঞার অক্ষও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর সেই সংজ্ঞায় নিজেদের শরীর মুড়ে ক্রেতার আত্মতুষ্টিও সাময়িকের হয়ে ওঠে। কিন্তু মোদ্দা কথা হল – বাজার স্বাচ্ছন্দ্যের সংজ্ঞা তৈরি করে। বিলিতি শীতের জামা-কাপড়ের বিজ্ঞাপন এবং প্রদর্শন কলকাতা শহরে যত বেড়েছিল, মধ্যবিত্তের কিছু জনের মধ্যে কলকাতার অত্যল্প শীতেও সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে ফ্যাশন প্রদর্শনের প্রবণতা বেড়েছিল। একজন লেখক তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, "শীতকালে আমাদের সজ্জার অবস্থা আরও কৌতুকজনক হয়। ঈডেন গার্ডেনে মাঝে মাঝে দেখা যায়, সমস্ত শরীরকে যতরকম উপায়ে হতে পারে প্যাক করে, অনেকে হাওয়া খেতে আসে। বিলেত হতে সদ্য প্রত্যাগত এক সাহেব আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – এরকম সজ্জার মানে কি? Russia-তে যেরকম শীত, এখানে ত সেরকম নেই! ..."[246]

মধ্যবিত্তীয় এই রুচি-বিলাস এবং বাজারি-সাচ্ছন্দ্যের স্রোতে গা ভাসানোর প্রবণতা যতই বাড়ে, ততই তার সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের অহঙও বাড়ে। বাঁচতে গেলে নুন্যতম যা দরকার হয়, চাহিদা যখন তার চতুর্গুণ হয়ে ওঠে – তখন বাঁচার মধ্যে আর সহজতা থাকে না। আকালের কালে চাইলেও সহজ হয়ে ওঠা যায় না আর। তখন মধ্যবিত্ত পুরুষ হয়ে যায় একাকী। চাহিদার পিছনে দৌঁড়াতে গিয়ে চারিপাশের সবার সাথে সম্পর্কটা কখন চাহিদা জোগানের হয়ে ওঠে – তার হুঁশ থাকে না। আর যখন মালুম হয়, তখন আর ফেরার পথও থাকে না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মন্দার কালে মধ্যবিত্ত পুরুষকে বলতে শোনা গেছে, 'মধ্যবিত্তদের অপেক্ষা তথাকথিত নিম্নশ্রেণী যাহারা, জননী ভারতবর্ষের সুজলতা, সুফলতা ও শস্যশ্যামলতার দরুন অনশন ও অর্দ্ধাশনে তাহারা অনেকটা অভ্যস্ত। তাছাড়া গণজাগরণ-আন্দোলনের সুযোগে তাহারা সঙঘবদ্ধ হইয়া যেন তেন প্রকারে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু মরিতে মরিব আমরা। জনতার সঙ্গে এক হইয়া গিয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে বাঁচিতে পারি, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মৃত্যুদণ্ড

---

245 উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সোনা-লোহা', বিচিত্রা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, কার্ত্তিক ১৩৩৫ পৃ ৬৩৩।

246 "কা", 'বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ', বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ ৩২৩।

ঘোষিত হইয়া গিয়াছে।’[247] কারণ রুচি নামক অহং অবস্থার সাথে পরিবর্তনমান তাগিদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল থেকে, তাকে ‘ভালো’ এবং ‘খারাপ’এর সামাজিক নির্মাণের মধ্যিখানে ঝুলিয়ে রাখে।[248]

কারণ ব্যক্তির মধ্যবিত্ততা তাঁর নাগরিক দেহের পোশাকি উদযাপনের উপর চেতন-অবচেতনে নির্ভরশীল। সেই উদযাপনের ভিত্তি হল বাজারের সাথে মধ্যবিত্তীয় মানসিক বলয়ে ঢুকে পড়া ব্যক্তির সুষম সম্বন্ধ। অর্থাৎ নিজের সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী কিনতে পারার ক্ষমতা। এতক্ষণ ধরে পাশ্চাত্যের আমদানিকৃত আধুনিকতার অভিঘাতে সৃষ্ট কলকাতার মতো নগর-পরিসরে মধ্যবিত্ত নাগরিক পুরুষ-দেহের উপর ওঠা পোশাকের প্রতিটি প্রস্থ কিভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণে তার পরিচিতি নির্মাণ করে, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এবার বাজারি ব্যবস্থার সাথে তার সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে সেই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিভাবে বুনোট বাঁধতে থাকে – তা দেখা প্রয়োজন।

এই প্রক্রিয়াটা একমুখীন নয়। সমাজের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সকল দলই বাজারের সাথে নিজেদের সুষম সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেদের সামাজিক মান্যতার ভিত্তি তৈরি করতে থাকেন। সেই ভিত্তিটা বিত্তানুক্রমে ক্রম উর্দ্ধমুখীন। যে কারণে অনেক সময় অর্থনৈতিক সক্ষমতার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষও নিজের সামাজিক ভাবমূর্তি তৈরির জন্য পোশাককে প্রধাণতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।[249] কারণ সামাজিক প্রবৃত্তিই হল – পেহেলে দর্শনধারী, ফির গুণবিচারি। পোশাকি আবরণের মধ্য দিয়ে অপর পক্ষের সামনে দর্শনধারী হয়ে ওঠা একটা চলমান প্রক্রিয়া। শাসক শ্রেণীর সামনে শাসিতের নিজেকে উপস্থাপন বা শাসিতের সামনে শাসক-ক্ষমতার পোশাকি উপস্থাপন, মধ্যবিত্তের সামনে নিম্নবিত্তের উপস্থাপন বা নিম্নবিত্তের সামনে মধ্যবিত্তের পোশাকি উপস্থাপন কোনো ছক বাঁধা প্রক্রিয়া নয়। স্থান-কাল অনুয়ায়ী সামাজিক অহঙের মূর্তিমান ভাব এক রূপ থেকে আরেক রূপে বয়ে যায়। তাই যা গতকালের ফ্যাশন, তা আজকের নিত্তনৈমিত্তিক, আবার কখনো ফ্যাশন হয়ে ধরা দিতেই পারে। সেদিক থেকে বিচার করলে, মানুষের পোশাকি রুচির সাথে যুক্ত প্রতিটি প্রস্থই সামাজিক পিড়ামিডের একদম নিচ থেকে পরিশীলিত হতে হতে উপরে উঠছে, আবার সেই পরিশীলিত রুচি ভাঙতে ভাঙতে নিচে নামছে। তেমনি বৃহৎ সময় থেকে ব্যক্তির নিজের যাপিত অণু-সময়ে নামছে, আবার সেই অণু-সময় একে অপরের সাথে মিলে আবার একটা বৃহৎ সময়ের জন্ম দিচ্ছে। এই দ্বিমুখীন

---

[247] ‘সংবাদ-সাহিত্য’, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ ১০০; বিনয় ঘোষ, “পার্ক স্ট্রীটের আত্মকথা”, ‘কালপেঁচার রচনাসংগ্রহ’ থেকে, (কলিকাতাঃ পাঠভবন, জুন ১৯৬৮), পৃ ১৪৩।

[248] শ্রীউমাপদ নাথ, ‘জাতীয় পোষাক’, প্রবর্ত্তক, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৮/মার্চ-এপ্রিল, ১৯৬২, পৃ ৪৩২।

[249] Alison Lurie, ‘The Language of Clothes: The Definitive Guide to People Watching Through Ages’, (Middlesex: Hamlyn Publishing, 1983), p. 116.

পরিচালনের কোনো না কোনো পর্যায়ে ফ্যাশনের গড়ে ওঠা, স্থিত হওয়া এবং আবার অবনির্মিত হতে থাকা।[250] সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই দ্বিমুখীন পরিচলনস্রোতের যোগফল। দুই স্রোতের মধ্যখানে থেকে একদিকে তার উপরের শ্রেণীর মতো হয়ে ওঠার বাসনা, অন্যদিকে নিচের শ্রেণীর মতো হয়ে না যাওয়ার সচেতনতা থাকে। সমাজের যে শ্রেণীই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে উর্দ্ধগতি লাভ করতে চায়, সেই শ্রেণীর মধ্যেই নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেতে বাধ্য। প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, পোশাকে-পরিচ্ছদে মধ্যবিত্তীয় কিনারা তৈরি হতে বাধ্য। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাই নিজের অর্থনৈতিক ক্ষমতার একদম সেরাটুকু দিয়ে, বাহ্যসত্ত্বাকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস।

অবশ্য বাহ্যসজ্জার উপস্থাপনা ব্যক্তির শিক্ষার সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার সূক্ষ্মতা যত অল্প, স্থূলতা তত বেশি এবং স্থূলতা যত বেশি ততই সামাজিক অবস্থান নিয়ে মেতে থাকার প্রবণতা বেশি। সেদিক থেকে বিচার করলে, যারাই মধ্যবিত্তীয় মানসিক বলয়ে আবদ্ধ, তারাই হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানের ধাঁধায় আবদ্ধ। এই অন্য কোথাটি অশেষ। আজকে দাঁড়িয়ে সেই অন্য কোথাটি ব্যক্তির মনে যা রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, দশ বছর পর সেই অন্য কোথাকে পাওয়ার মোহভঙ্গ হয়ে ব্যক্তির জ্ঞান সূক্ষ্মতায় স্থিত না হলে, তার রূপ নানা সামাজিক-রাজনৈতিক অনুঘটকের প্রভাবে পাল্টে পাল্টে গিয়ে অশেষ বেশে ব্যক্তিকে ভোলাতে থাকে। সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে নিজেদের সামাজিক স্ট্যাটাস-প্রিয় আন্তরিক সত্তার পোশাকি প্রকাশ কিভাবে উনিশ-বিশ শতকের মধ্যবিত্তজ সামাজিকতার নির্মাণ করেছিল তা দেখা দরকার।

১৮৬৮ সালে শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার ছদ্মনামে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ তাঁর ‘পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব’এ লিখেছেন, ‘বাবুর বাড়ির পুজো, বড় জাঁক, পনেরো দিন থেকে নহবত বসেছে। এখানে লুচি মণ্ডার অভাব নেই।......অনবরত মিষ্টান্ন তয়ের হচ্চে... এখানে শুধু লুচিমণ্ডা কেন খুঁজলে “বিফস্টিক” পর্যন্ত মেলে।”[251] এইভাবে প্রচুর অর্থ অপচয় করে, ক্ষমতাশালীদের বিনোদন দিয়ে, নিজেদের আভিজাত্যের বহর দেখিয়ে কোম্পানির অনুগ্রহ লাভ ও সমাজিক সম্ভ্রম লাভের চেষ্টায় তৎকালের প্রায় বাবু’ই সচেষ্ট ছিলেন। সেই বাবুয়ানি দেখাতে দুর্গা পুজোই শুধু নয়, বাবুর বাড়ির ছেলের অন্নপ্রাশন, মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, জন্মদিনের উৎসবে সায়েব-মেমদের হাজির করে, ফুলের তোড়া ও ফলের ঝাঁপি দিয়ে আপ্যায়ণ করতে পারাটা যেন দেশীয় সমাজের মধ্যে সামাজিক গৌরব-বর্ধনের একটা ভিত্তি রূপে দেখা দিয়েছিল। সেই গৌরবের কাছে দেশীয় সমাজের আচারে-বিচারে বজ্র-আঁটুনিও অনেক সময় তুচ্ছ হয়ে পড়েছিল।

[250] Georg Simmel, “Clothes and Fashion”, Michael Carter ed., ‘Fashion Classics: From Carlyle to Barthes’, (Oxford, New York: Berg, 2003), pp. 75-76.

[251] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘হুতোম প্যাঁচার নকসা ও অন্যান্য সমাজচিত্র’ (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ, ১৩৬৩ ব.) পৃ. ১৯৬।

কলকাতার ইতিহাসে ইংরেজদের কাছ থেকে প্রথম 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন নবকৃষ্ণ দেব। তিনি সপ্তদশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে ইংরেজ অনুগ্রহে কলকাতার সবচেয়ে ধনী মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। মায়ের শ্রাদ্ধে প্রচুর ইংরেজকে সমবেত করে, নয় লাখ টাকা খরচ করে, তিনি তৎকালীন সমাজে নিজের গরিমার প্রদর্শন করেছিলেন।[252] ১৭৬৬ সালে হলওয়েল সাহেবও তাঁর গ্রন্থে বাঙালি অভিজাতের দুর্গাপুজোয় সাহেবদের পেয়াদা পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করা, এবং সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাপক ভুরিভোজ, বাঈজীনাচ এবং সুরাপানের আসর বসানোর কথা লিখেছিলেন।[253] দেশীয় অভিজাতদের মধ্যে রাজপুরুষদের সামনে তোষামোদী রূপ নিয়ে দাঁড়ানোর মধ্যে সামাজিক গৌরবের সাথে সাথে স্বীয় কার্য হাসিলের একটা যোগ ছিল। কিন্তু যে শ্রেণী সেই আভিজাত্যে উপনীত হতে পারেননি, কিন্তু উপনীত হবার বারো আনা বাসনা মনে রাখেন, সেই শ্রেণীও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে নিজেদের বাসনার রঙকে কিভাবে প্রকাশ করেন, তা বোঝারও দরকার আছে। হুতোম উনিশ শতকের মধ্যিভাগে বারোইয়ারি বা সার্বজনীন পুজোর আমোদে সামিল হতে আসা 'বুড়ো মিনসে'র উদাহরণ টেনে মুঘলী দরবারি পারিচ্ছদিক রুচির শিষ্টাচারের দফারফা কিভাবে পুরাতনপন্থী প্রবীণের হাতে হত – তার উপর আলো ফেলেছেন। যাঁরা পুজোর এই ক'দিন হীরের মতো পাথর বসানো টুপি, জড়ির কারচোপের কাজ করা কাবা, দু'হাতে দশটা আংটি, গলায় মুক্তার মালা পরে 'সং সেজে' বাইরে বের হওয়াকে মস্ত ফ্যাশনদারী ব্যাপার ভাবতেন। বিলিতি রুচির হাইটাইমে মোঘলী সাজের এই জমকালো উপস্থাপনের মধ্যে কোথাও "আমাদের সময়ের সাজ সবচেয়ে দারুণ" – এই ভাবকে প্রকট করার চিন্তা অবচেতনে কাজ করেছে কিনা – তা ভাবতে হবে।[254] আবার পোশাকি আধুনিকতার ধাক্কাকে আমল দেওয়া নবীনদের মধ্যে পোশাকি রুচির আনুষ্ঠানিক প্রকাশকে নিয়েও হুতোম টিপ্পনি কেটেছেন। আধুনিকতার ধাক্কা উপলব্ধি করতে পারা, অথচ স্বাবলম্বী হয়ে না উঠতে পারা[255]

---

[252] সেই শ্রাদ্ধ নিয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্তের কলিকাতা বিষয়ক গ্রন্থে লেখা হচ্ছে—"একটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড কাষ্ঠ ফলক দ্বারা চতুর্দিক পরিবেষ্ঠিত, মধ্যে মধ্যে প্রবেশপথের অপূর্ব তোরণ, তাহাতে সশস্ত্র সৈনিক পুরুষেরা সর্বদা প্রহরীর কার্য করিতেছে। উপরে সুন্দর চন্দ্রাতপ, তাহাতে ঝালর সকল দোদুল্যমান। নিম্নে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের বসিবার জন্য পৃথক পৃথক আসন। ......কোনো স্থানে গায়কেরা মধুর হরিসংকীর্তনে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তিসুধা ঢালিয়া দিতেছে। মধ্যস্থলে বেদি সন্নিকটে দ্বাত্রিংসৎ স্বর্ণ রৌপ্যের ষোড়শ, পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া চন্দ্রাতপকে স্পর্শ করিতেছে।......সভার অনতিদূরে ভাণ্ডার মহলে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, তৈল প্রভৃতি তরল পদার্থের হ্রদ কাটান হইয়াছে। মিষ্টান্নের স্তূপ সকল দেখিলে এক একটি পর্বত বলিয়া মনে হয়।" দ্রষ্টব্য, পূর্ণেন্দু পত্রী, 'এক যে ছিল কলকাতা', (কলকাতাঃ প্রতিক্ষণ,সপ্তম মূদ্রণ, মার্চ ২০১৮), পৃ. ৩৯-৪০।

[253] ড. অতুল সুর, ' 'তিনশো বছরের কলকাতাঃ পটভূমি ও ইতিকথা', (কলিকাতাঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮), পৃ. ৫৬।

[254] কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাই চন্দ্র পাল সম্পাদিত; কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১৩; পৃ. ৬।

[255] হুতোমের ভাষায়, 'মাসীর বাড়ি অন্ন ধ্বংস করা, ঠাকুরবাড়িতে শোওয়া, আর সেনেদের বাড়ি আড্ডা দেওয়া' বাবুকূল। যাদের সাজের বাহারকে তিনি 'ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের' সাথে তুলনা করেছেন। দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ. ১৯।

নবীনরা শুধুমাত্র বারোয়ারি পুজোর বাঈজীনাচ দেখতে যাবার বাসনায় ধোপাবাড়ি থেকে ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেল চাপকান, সিল্কের রুমাল-- এইসব সাহেবি পোশাক ভাড়া নিতেন।[256] শ্রীষড়ানন্দ শর্ম্মা লিখেছেন, 'গরম হ'তেছে ক্রমে পূজার বাজার,/এতই দুর্মূল্য দ্রব্য "স্পর্শ করা ভার";/ "স্পর্শ করা ভার" তবে কেন কর ক্রয়?/ "পূজার সামগ্রী এ যে না হইলে নয়।"...।'[257] এ 'না হইলে নয়' ভাবের মধ্যে আমোদের বাসনাই যে কেবলমাত্র ক্রিয়াশীল, তা বলা যাবে না। সেখানে স্ট্যাটাস একটা বড় অনুঘটক। 'পূজার বাজারে – বস্ত্রের বাহার' শিরোনামে অমরেন্দ্রনাথ রায় একটি ব্যাঙ্গাত্মক লেখা লিখেছিলেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্তজ স্ট্যাটাস-প্রিয়তা, দুমুখো প্রবৃত্তিকে খোঁচা দেওয়া। তাঁর ভাষায়, "বস্ত্রের পাড়ের নাম --- মালসী-ধাক্কা-মন্ত্রী-পেড়ে। মুখ-সর্বস্ব-সারভেন্ট-পাছা। ভণ্ডামী-ভরা মহান্তশাড়ী। নীতি-ধাক্কা-চরিত্রহীন-পেড়ে। ভাই-ভাই-ঠাঁই-ঠাঁই-পেড়ে। ডাক্তারী-পাশ-করা খিচুড়ী-কবিরাজ-শাড়ী। অসহযোগ-পোড়া স্বরাজ-পেড়ে। মোটর বিহারী নেতা-পেড়ে। মুচকী হাসি যুবতী-পেড়ে। ম্যালেরিয়া-ধাক্কা ডাক্তার-ডুরে। পরিষদী পারিষদ-শাড়ী। পোষ্টগ্র্যাজুয়েট-বিদ্বেষী-প্রবাসী-পাছা। অভিনয়ের মাথা খাওয়া আর্ট-পেড়ে। ন্যাকামিপূর্ণ-কবি পাছা। কনের বাপে বাঁশ দেওয়া পেড়ে। 'দিনে হরি রেতে যীশুখৃষ্ট' ভজা-পেড়ে। ... ইত্যাদি। আমাদের ষ্টোর্সে 'একদর' নাই। সুবিধা মত দর কমে ও বাড়ে।"[258] সুবিধামত দাম কমে আর বাড়ে কারণ মধ্যবিত্ত সমাজে যখন যে ভাবের ওজন বাড়ে তখন সেই ভাবের কাপড়ের দিকে ঝোঁকও বাড়ে। আর সেরকম ঝোঁক থেকেই মোঘলী আমলের ফ্যাশনেবল 'ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা' অকর্মণ্য হয়ে' চার-পাঁচ পুরুষ ধরে সিন্দুকে বন্দি থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে আধুনিকতার অভিঘাত গ্রস্থ পোশাকি শিষ্টাচারে মাথার পাগড়ি হিসেবে 'ভলান্টিয়ারী' করতে সিন্দুক থেকে নামে। একসময় কোমড়ে ব্যবহৃত কালো ফিতের ঘুনসি বা কটিবন্ধনী এবং তাতে চাবি বাঁধার সিকলি আধুনিকতার অভিঘাতে অশিষ্টাচারতুল্য হয়ে উঠে, আধুনিকতার অন্যতম প্রধাণ মানদণ্ড সময়ানুবর্তিতাকে জানান দেওয়া পকেট ঘড়ির চেন হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকল।[259] ধনে-মানে

---

[256] তদেব, পৃ. ১৯

হুতোম কাপড় ভাড়া নিয়ে বাবুয়ানি দেখানো বিষয়ে আরও বলেছেন, '...বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো। কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনীর এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো।' দ্রষ্টব্য, অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', (কলকাতাঃ আনন্দ, নবম মূদ্রণ ২০১৯), পৃ. ৭১।

[257] শ্রীষড়ানন্দ শর্ম্মা বিরচিত 'দুর্গোৎসব', শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, (কলিকাতাঃ ব্যবসায়ী যন্ত্রে শ্রী অমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত (কত সালে মূদ্রিত তার উল্লেখ নেই। তবে গ্রন্থের অভ্যন্তরে বলা আছে যে লেখক এটি ১২৭৮ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন।) পৃ. ৬।

[258] অমরেন্দ্রনাথ রায়, "পুজোর বাজারে – বস্ত্রের বাহার", কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'সরস সার কথা', দুই খণ্ড একত্রে, (কলকাতাঃ গ্রন্থগৃহ, ১৩৫৩), পৃ ২২৭।

[259] অরুণ নাগ সম্পাদিত 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', পৃ ৭১।

সমাজের নিচু শ্রেণীগুলোতেও পোশাকি শিষ্টাচারের মানসিক নির্মাণ চুঁইয়ে পড়তে থাকল। তেলি, ঢাকাই কামার, চাষা, ধোপারাও পরিবর্তনমান সামাজিক রুচির সাথে সাযুজ্য রেখে সাদা ধুতি, চাদর, দেশি জুতোয় সজ্জিত হয়ে বারোয়ারী পুজোর বাঈজীনাচের আসরে এসে বসতেন। রাত বাড়ত, চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। তবুও বসে থাকা চাই। আর কালীন শিষ্টাচারের নিশান জুতো-জোড়াকেও রক্ষা করা চাই। তাই অনেকে 'জুতোজোড়াটি হয় পকেটে নয় পায়ের নিচে রেখে' চেপে বসতেন।[260] টাকা দিয়ে কেনা জুতো রক্ষার দায়ের মধ্যে আধুনিকতার অভিঘাতে আগত ভোগেরপণ্যের প্রতি যত্নের তাগিদের আভাস পাওয়া যায়। তাই ১৮৭০ এর দশকে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা-পালাতে একজন পালাকার যখন বলেন, "বৃন্দাবনসে দূতী আয়া", সমাজে বিলিতি শিষ্টাচারের সঞ্চরণশীলতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিমানসের প্রতিনিধি অপর পালাকারের কানে তা, "কেয়া বিলাতসে ধুতি আয়া" – হিসেবে ধরা দেয়।[261] সুতরাং পুজোর বাজারেও ধুতি-চাদরে বিলিতি শিষ্টাচারমুখীনতাকে অস্বীকার করা যাবে না। মহেন্দ্রলাল দত্ত বলেছেন, তখনকার দিনের দুর্গা পুজোয় '...বিশেষ আমোদের ছিল নীল মাখান কোরা কাপড় পরে ঢুলিদের বাজনার সঙ্গে ছেলেদের নাচা। তখনকার দিনে নীল রঙ মাখান কোরা তাঁতের কাপড়ই ছেলেদের ভিতর বেশি প্রচলিত ছিল। ধোয়া কাপড় বয়োজ্যেষ্ঠরা পরিত।'[262] এই কাপুড়ে প্রস্থ মল্লকচ্ছের তথাকথিত 'অশিষ্টাচার' মুক্ত হিসেবেই ধরা যায়। পারিচ্ছদিক বহড়ে বিলিতি শিষ্টাচারের প্রভাব পড়লেও সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভাজনের পোশাকি স্বরূপটা তো বজায় ছিলই।

মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারদের সাজগোজের দিকে যদি একটু নজর দিই, তাহলে দেখতে পাবো গোপাল একজোড়া লাল রঙ্গের এস্টাকীং বা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা মোজা পরেছেন, বড় বড় পেতলের বোতাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের ফতুয়া পরেছেন, তার উপর বুটিদার ঢাকাই উড়ুনি গায়ে চড়িয়েছেন, বিলিতি পেতলের আংটি পরেছেন আঙ্গুলে। কিন্তু সময়ের অভাবে জুতো জোড়া কিনে উঠতে পারেননি। তাতে কি! বিলিতি রুচির মোজা পায়ে দেওয়াই যেন এক মস্ত ফ্যাশন। তাই অগত্যা মোজা পরেই স্নানযাত্রায়![263] অন্যদিকে আরেক বন্ধু নবীন গায়ে যে ঢাকাই চাদরটি চাপিয়ে গ্রীষ্মের গরমের মধ্যে স্নানযাত্রায় গেছেন, সেই চাদরটি বহুদিন ধোপা বাড়ি যায়নি। তবু তিনি সেই চাদর পাটভাঙ্গা কালপেড়ে ধুতি ও মোরজাইয়ের সাথে পরেছেন।

---

[260] কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাই চন্দ্র পাল সম্পাদিত; কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১৩; পৃ. ১৭।

[261] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা', (কলিকাতাঃ মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫ই অক্টোবর, ১৯৭৫), পৃ ২৮।

[262] তদেব, পৃ. ১২৪।

[263] কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাই চন্দ্র পাল সম্পাদিত; কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১৩; পৃ. ৭৩-৭৪।

কারণ ঢাকাই চাদর কাঁধে চাপানোটাই সামাজিক সম্ভ্রম প্রদর্শনের অন্যতম মানদণ্ড।[264] তাই গ্রীষ্মের খরতর রৌদ্র হোক, কি চাদরে মালিন্য থাকুক – তা মধ্যবিত্তজ সম্ভ্রমের মানসিক নির্মাণে তেমন দাগ কাটেনি। এ সম্ভ্রমেচ্ছা থেকেই 'আলালের ঘরের দুলাল'এ আমরা বেচারামবাবুর বেণীবাবুকে নির্দেশ দিতে দেখি, 'এখুনি বাইরে বেরুতে হবে, চাদরখানা কাঁধে দাও।'[265] অন্যদিকে আরেক বন্ধু ব্রজ। যিনি কিনা খুব সম্প্রতি ইয়ার্ডে চাকরি পেয়েছেন, সুতরাং 'আজও ভালো কাপড়-চোপড় করে উঠতে পারেননি।' কিন্তু বিগত বৎসর পুজোর সময় যে একজোড়া 'সভ্য' কাপড় তিনি পেয়েছিলেন, তা 'সিকের উপর হাঁড়ির মধ্যে তোলা ছিল।' অর্থাৎ তার আর্থিক সঙ্গতি এতটাই করুণ যে, একটা সিন্দুকও তার নেই। কিন্তু কেতাদার বন্ধু কজন আছে। যাদের সাথে শিষ্টাচার রক্ষা করে বেরুনোর জন্য তাই হাঁড়িবদ্ধ কাপড় নামিয়ে পরাই একমাত্র ভরসা।[266] সর্বশেষ হুতোম আরেকজন বন্ধু গুরুদাস মহাশয়ের পোশাকের বিবরণ দিয়েছেন—'তিনি একখানি সরেস উড়ুনি গায়ে দিয়েছিলেন, উড়ুনিখানি চল্লিশ টাকার কম নয়...তার গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটার্নের পিরাণ, তার উপর বুলু রঙ্গের একটি হাফ চায়না কোট—তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে শান্তিপুরে ফরমেশে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রুপোর বকলস দেওয়া ছিল।'[267] উচ্চবিত্ত ইয়ারদের কালীন ফ্যাশনে এহেন অসামঞ্জস্য সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির দিক থেকে নিম্নবিত্তদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা ব্রজবাবুর হাঁড়িতে করে ভালো পোশাক সংরক্ষণ বা গোপালবাবুর জুতো ছাড়া মোজা পায়ে দিয়ে স্নানযাত্রায় বেরোনোর মধ্য দিয়ে খানিকটা হলেও স্পষ্ট হয়।

কলিকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নগরী হিসেবে বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে, চাষবাস ছেড়ে চাকুরির সন্ধানে বা শিক্ষার তাগিদে পার্শ্ববর্তী গ্রাম-মফস্বলের অনেক পুরুষের স্বপ্নের গন্তব্য হয়ে ওঠে কলকাতা। কিন্তু বছর শেষে একবার অন্তত পুজোর দিনগুলোতে দেশের বাড়ি যাওয়া চাই'ই। সেখানে তাঁদের পরিবার-পরিজন অপেক্ষা করে

---

264 তদেব।

265 টেকচাঁদ ঠাকুর, 'আলালের ঘরের দুলাল', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৮২২ শকাব্দ), পৃ ৩৩।

266 হুতোম ব্রজর পোশাক নিয়ে লিখেছেন, 'গত বৎসর পুজোর সময় তাঁর আই ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দ্যায়, তাই পরে এসেছিলেন; সেগুলি আজও কোরা থাকায় তাঁকে দেখতে মন্দ দেখায় নি। ... তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয় --- বলতে কি, তিনি তা বেশী দিন পরেন নি, কেবল পুজোর সময় সপ্তমী পুজোর দিন একদিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়েছিলেন --- ভাসান দেখতে যাবার সময় একবার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারি পুজো হয়, তাতেই একবার পরে গোপাল উড়ের যাত্রা শুনতে গেছলেন – তা ছাড়া অমনি সিকের উপর হাঁড়ির মধ্যে তোলা ছিল।' দ্রষ্টব্য, কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', নিমাই চন্দ্র পাল সম্পাদিত, পৃ ৭৪।

267 তদেব।

থাকেন—কখন তাঁদের পিতা, পুত্র বা স্বামীরা ফিরবেন। স্বপ্নের নগরী থেকে কি নিয়ে ফিরবেন! সেই অপেক্ষায় প্রতীক্ষার চাইতে প্রত্যাশাই অনেকসময় পাল্লাভারি হয়েছে। শ্রীষড়ানন্দের কবিতায় কলিকাতা নিবাসী স্বামীর জন্য স্ত্রীর অপেক্ষার মধ্যে সেই দোলাচল ধরা পড়েছে —"এসে গেছে বাড়ী প্রায় সকলেই পাড়ার;/ "তাহার[ই] কেবল নাই নাম আসিবার,/ "কি জানি কি হল তথা পেলে কিনা ছুটি,/ "প্রতিবার এসে থাকে এই দিন বাটী;/ "আজি না আসিলে আর আসিবে বা কবে;/ "আসিবে কি যবে পূজা ফুরাইয়া যাবে?/ "কিছুই পূজায় আজও হল না আমার,/ "কি জানি কেমন ছি ছি আক্কেল বা তার,/ "একান্তই যদি তার না হইল ছুটী,/ "কেন না পাঠায়ে দিল সেই দ্রব্যকটী;/ "তাও কিছু বেশি নয় নিতান্ত যা চাই,/ "একখানা লাল-গুল-বসান ঢাকাই,/ "বাবু ধাক্কা পাছাপেড়ে আর একখানা/ "গোলাপীর মত তাও আছে তার জানা,/ "দুটী "বডি" শাটিনের তাও বেশি নয়,/ "এখনও আসে যদি তবু কাজ হয়।...' গ্রামে বাসরতা বধূর উনিশ শতকের সত্তরের দশকে শাটিনের বডি বা জ্যাকেট পরতে ইচ্ছে হয়েছে, স্বামী কলকাতায় থাকেন বলেই তো, না হয় গ্রামে মেয়ে-বৌদের তো কাপড় গিট দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকার চল। গাঁয়ের চাষবাস ছেড়ে উন্নতমানের যাপনের আশায় শহরে গিয়েও যদি কাপুড়ে সুখ পাওয়া না যায়! – ভাবটা অনেকটা এরকম।[268] দিন-আনা দিন-খাওয়া সংসারে এ বস্ত্র ক্রয় বিলাশতুল্য। কিন্তু এ বিলাশ তো না করলেও নয়। স্রোতের বিপরীতে গা ভাসানো মুশকিল। সামাজিকতায় আবদ্ধ মনে আশেপাশের উদাহরণ দংশন করে বেড়ায়।[269] তাই পুজো-আচ্চা উপলক্ষে পুত্র-কন্যা-স্ত্রীর জন্য মধ্যবিত্ত পুরুষের কল্পতরু রূপ ধারণ করতে হয়, না হলে সংসারে সমাজে মান রক্ষা হয় না যে![270] আবার যাদের পুত্র-কন্যা নেই, প্রিয় সমাগমের উপায় নেই, শিক্ষা আছে অথচ শিক্ষা-উপযোগী আয় নেই – এই সামাজিক উৎসবের দিনগুলোয় তাদের একাকীত্ব, সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্নতা অনেকগুণ

---

[268] শ্রীষড়ানন্দ শর্ম্মা বিরচিত 'দুর্গোৎসব', পৃ.১০।

[269] ষড়ানন্দের কবিতা সেই ভাবটিকেও তুলে ধরেছেন—'কত পরিবার মাঝে হয় হাহাকার/ 'পুজোর কাপড়' বুঝি হল না এবার;/ কর্তার কলহ হয় কলত্রের সাথে,/ 'কেমনে কাপড় হবে কিছু নাই হাতে';/ কতদিন হতে কর্ম নাহি কিছু তার,/ ভেবে ভেবে ক্ষুণ্ন মন অখিল আঁধার/ জীবিকা নির্ব্বাহ তরে ভেবে নিরুপায়,/ গৃহিণী আসিয়া কত বকিছেন তায়...।' তাই সামাজিকতা রক্ষার্থে গৃহিণীর কৃচ্ছ্রসাধন —'কিনিতে বসন স্বীয় সন্ততি কারণ,/ হাতে টাকা নেই তবু নয় নিবারণ;/ খুলে দেয় অঙ্গ হতে আভরণ চয়,/ 'পূজার কাপড়' এ যে না হইলে নয়...।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১৪, ১৬।

[270] লেখকের ভাষায়, 'কেহ পুত্র কন্যাদের জন্য বিবিধ মনোরম সামগ্রী কিনিতেছেন। কেহ বা অর্ধাঙ্গ স্বরূপিণীর সোহাগ বাড়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কাপড় বিক্রেতার দোকানে, ঢাকাই, গুলবাহার, বোম্বাই, নীলাম্বরী, কল্কাপেড়ে, মিসিপেড়ে, বাবুধাক্কা, গলাধাক্কাপেড়ে সাড়ী কিনিতেছেন। কেহ বা চন্দ্রহার, গোট, বালা, অনন্ত, গোঁপহার, ছেলেহার, চিক, কান, ঝাঁপটা এবং ফুল ইত্যাদির জন্য স্বর্ণকারকে রাত্রে ঘুমাইতে দিতেছেন না। কেহবা বডি সেমিজ কামিজের জন্য কত কত নবীন প্রবীন কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। গন্ধ বিক্রেতার দোকানে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক, -- কেহ অটোডিরোজ কেহ বা হোইট, কেহ বা ড্যাম্যাক্সরোজ, কেহ বা গমনেলের সাবান ইত্যাদি বিবিধ মন ভোলানো জিনিস কিনিয়া মনের উল্লাসে বাক্সবন্দী করিতেছেন।' দ্রষ্টব্য, "ঘোষজা মহাশয়ের দুর্গোৎসব", নবকুমার ভট্টাচার্য্য ও বাসুদেব মোশাল, 'পুরাতনীঃ পুজো নিয়ে পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন', (কলিকাতাঃ অভিনব প্রকাশনী, ১৩৫৯), পৃ ৮২।

বেড়ে যায়। চারিদিকের উল্লাস, চারিদিকের প্রদর্শনীর ভিড়ে তারা সামাজিক সত্তাকে খুঁজে পান না। আসলে মধ্যবিত্তের সামাজিকতায় ‘থেকেও যন্ত্রণা, না থেকেও’ – এই দ্বৈত উপস্থিতি তার পত্তনকাল থেকেই ছিল।[271] নব্য সভ্যতার হাত ধরে যে প্রদর্শনী-সর্বস্ব মধ্যবিত্ত সমাজ উঠে এল এবং নব্য অর্থনীতির হাত ধরে মধ্যবিত্তের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে দূরত্ব প্রসারিত হচ্ছিল, তাকে সংবেদনশীল লেখকেরা বহু আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন দুর্গাকে লক্ষ্য করে লেখেন – “কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে!/ এ দেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে?/ সন্তানে রাঙ্গতা দিলে / আপনি তাই পরিলে,/ কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে?/ ভারত রতন খনি, রতন কাঞ্চন মণি,/ সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে?/বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা,/ ছেঁড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে?/ তবে--- বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুর খেমটা তালে।।”[272] তখন এই রাঙ্গতা চর্চিত বাহ্যিক আড়ম্বরের তলে এদেশীয় মধ্যবিত্ত সমাজের আন্তরচিত্রটা ফুটে ওঠে। রিপু করা, জোরা-তালির সমাজ ঢাকতেই বোধ হয়, পুজোর কটা দিনের এত প্রদর্শনী। তাই এই প্রদর্শনীতে খামতি হলে চলে না। নতুন কাটের

---

[271] তদেব।

[272] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘দুর্গোৎসব’, নবকুমার ভট্টাচার্য্য ও বাসুদেব মোশাল, ‘পুরাতনীঃ পুজো নিয়ে পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন’, (কলিকাতাঃ অভিনব প্রকাশনী, ১৩৫৯), পৃ ৭০।

ছবি ৪.১৩ & ৪.১৪: পুজোর জ্যাকেটের ডিজাইন ও কে এইচ দে & কোম্পানির পুজোর বিজ্ঞাপন[273] [274]

পোশাক, নতুন কাটের গয়না না হলে প্রদর্শনীর প্যারেডে নিজেদের সামিল করা দায়।[275] এ হল সাজ-পোশাকের সাহেবিয়ানা, সাজ খুললে গরিবি বেরিয়ে পড়ে। তবু সাজ চাই। কারণ সাজ

[273] বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত পুজোর নতুন প্যাটার্নের জামা বা ব্লাউজ। দ্রষ্টব্য, শ্রীরেখা দেবী, 'আনন্দময়ীর আগমনে', বঙ্গশ্রী, ৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ ৩১৩।

[274] Ranabir Ray Choudhury, 'Early Calcutta Advertisements 1875-1925', (Bombay: Nachiketa Publication Ltd., 1992)

[275] ১৯৪০ সালে দুর্গা পূজার আগে একটি প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, 'সামনে পূজা – এখন সবাই ভাবছে, পূজার জামাকাপড় কেনবার কথা, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছে – কবে তাদের পুজোর জামাকাপড় বাড়িতে আসবে তারই আশায়। তাদের মায়েরা ও বোনেরা মনে মনে ভাবছেন, এবার পুজোর কাপড়খানা কি পাড়ের হবে এবং জামাটাই বা কি প্যাটার্নে তৈরি হবে। ... অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরে 'সেকরা'দের ডাক পড়েছে, গয়নার বায়না দিতে – এখন থেকে না দিলে ঠিক দিনে ঘরে উঠবে কেন?... এখন অন্তঃপুরে যে হাওয়া বইছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলতে গেলে করতে হবে কাপড়, জামা ও গহনা নিয়ে আলোচনা। আবার শুধু তাই নয়, এগুলি নিয়ে যা কিছু বলা হবে তাতে থাকা চাই 'নূতনত্ব'। ... "নুতন রকম শাড়ী", "নুতন প্যাটার্নের জামা", "কিম্বা নুতন ধরণের গহনা" – এ কথাগুলি মেয়ে মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করবে, কারণ এগুলি আমাদের প্রিয় বস্তু। তাছাড়া এগুলি নুতন রকম করে তৈরি করিয়ে পরে সুরুচির পরিচয় দিতে ও আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধবী মহলে নাম কিনতে সকল

সভ্যতা। সাজ টাকার পিছনে ছুটে চলার তাগিদ।[276] সেই তাগিদে মধ্যবিত্তীয় মানসকে মাতিয়ে রাখতেই তাই সংবাদপত্রে নতুন কাটের জামা (ছবি ৪.১৩ দ্রষ্টব্য), নতুন রুচির খাদ্য তৈরির নানা টোটকা।[277] নতুন নতুন লোভের আমদানি। আবার নতুন চাওয়ায় মাতিয়ে রাখা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে যখন চারিদিকে বস্ত্র-সংকট তুঙ্গস্পর্শী, তখন প্রদর্শন-প্রিয় মধ্যবিত্তের অন্তর্দহনও তুঙ্গস্পর্শী হয়েছিল। তাই মধ্যবিত্তের একজন যখন পুজোর কালে নতুন জামা কাপড় কিনতে না পারায় স্ত্রীর ক্ষোভের বিষয়ে লেখেন, 'পূজা দুর্যোগে কাটিয়াছে – গ্রামে গিয়াছিলাম, বৃষ্টিতে একেবারে আগাগোড়াই হোম-ইন্টার্নমেন্ট জারি করিয়া রাখিয়াছে, ঘরের বাহির হইতে দেয় নাই। সেটাও অবশ্য একদিক দিয়া বাঁচোয়া, বাহির না হইতে হইলে অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচে।'[278] কারণ পুজোর দিনেও পুরোনো বসন পরে থাকলে, নিজের সামাজিক কঙ্কালটা বেরিয়ে পড়ে না! যদিও যুদ্ধদীর্ণ সময়ে মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থার জন্য দায়ী বিশ্বব্যাপী মন্দা, কিন্তু সেই মন্দার সাথে যুঝতে না পারাটাকে মধ্যবিত্ত নিজের ব্যক্তিগত অক্ষমতা ভেবে নেয়। পুজোর কালে বৃষ্টিপাত সেই অক্ষমতা ঢাকারই যেন অস্ত্র।

মধ্যবিত্ত পুরুষকে বাইরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা অণুঘটকের সাথে যেমন লড়তে হয়, তেমনি পরিবারমধ্যে নানাহ চাহিদার জোগানদার হিসেবে নিজের সর্বৈব অবস্থানকে অটুট রাখার জন্যও তাকে সংগ্রাম করতে হয়, বাহিরের সংগ্রামে ব্যর্থতার ফল যখন ঘরের চাহিদা জোগানে প্রকাশ পায়, তখন গৃহকর্ত্রীর তিরস্কার তাই তাকে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে লজ্জিত হতে বাধ্য করে। লেখকের পরবর্তী মন্তব্যও সেই আভাস দিচ্ছে আমাদের, 'চণ্ডী চামুণ্ডা হইয়াছেন; গতবারে তিনি ভীমা করালবদনী সংহাররূপিণী হইয়াছিলেন, এবার কালী বিবসনামূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিমার দেহে রংকরা মাটির কাপড় দেবীর লজ্জা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছে; আমাদের শুধু মাটি ও রং মাখিয়া বাহির হইবার উপায় নাই, পুলিশে ধরে। সুতরাং এবারের পূজায় বৃষ্টিটাই মান বাঁচাইয়াছে --- বাহির হইতে গেলেই কাপড় দরকার হইত। এ বেশ এক-লুঙ্গি সম্বল করিয়া কাটাইয়া দিলাম।'[279]

মেয়েরই মনে মনে ইচ্ছে থাকে।' দ্রষ্টব্য, শ্রীরেখা দেবী, 'আনন্দময়ীর আগমনে', বঙ্গশ্রী, ৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ ৩১১-৩১২।

276 ছায়াছবি – চালচ্চিত্র, পরিচালক – মৃণাল সেন, আনুষ্ঠানিক মুক্তি – ১৯৮১।

277 সাটিন কাপড়ের কলার দেওয়া জ্যাকেট। চিত্র ৪.১৩ .দ্রষ্টব্য। পুজোয় বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য যেমন চকোলেট-বিস্কুটের রেসিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

278 সম্বুদ্ধ, 'চলন্তিকা', অলকা, ৮ম বর্ষ, অগ্রাণ ১৩৫২, পৃ ১৩৩।

279 তদেব।

সমাজের সচ্ছল মধ্যবিত্তদের মধ্যে পুজোয় দেদার কেনাকাটা, পুজো উপলক্ষে 'চেঞ্জ'এ যাওয়াও আবার নিজেদের শ্রেণী-গরিমা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল।[280] তাঁরা পুজো উপলক্ষ্যে গৃহকর্মে সাহায্যকারী থেকে শুরু করে মুসলমান গোয়ালাকে পর্যন্ত নতুন কাপড় দিতেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যাপারটাকে 'মধ্যযুগীয় আভিজাত্যের' সাথে তুলনা করেছেন।[281] অবশ্যই একে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণি-গরিমা প্রকাশের একটা মাধ্যম হিসেবে না ভেবে পারা যায় না। আর সেই শ্রেণি যেহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষার ফসল, সেহেতু এই শ্রেণি-গরিমাকেও একদম 'আধুনিক' বলতে হবে। এদেশে অন্যান্য আরও অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানের মতো দুর্গা পূজার জনপ্রিয়তার হাত ধরেই তা তৈরি হয়েছে এবং 'বারোইয়ারী' পুজোর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে আরো প্রসারিত হয়েছে। আর পাশ্চাত্য 'এনলাইটেনমেন্ট' ও ব্রহ্মবাদে প্রভাবিত মধ্যবিত্তের আরেকদল দেশের বাড়ির পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে পুজোর ছুটিতে ভ্রমণে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের রুচির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছেন। ষড়ানন্দের বিবরণ—'ছুটী পেয়ে কত বাবু নতুন 'ফ্যাশানে'/ চলিছেন ট্রেনে চড়ি দেশ পর্য্যটনে।/ বুট কোট কৃষ্ণ কায় কিবা সুশোভিত,/ আমরি, কেরিয়ার ব্যাগ আজানুলম্বিত;/ হাতে ছড়ী, দোলে ঘড়ি বুকের উপর/ শিরে শোভে হ্যাটরূপী শোলার টোপর;/কণ্ঠেতে 'কলার'রূপ সভ্যতার হার,/ দু'পকেটে ভরা রাজনীতির 'লেকচার'/ মিষ্টারাবতার এঁরা বঙ্গের ভরসা,/ 'ভারত উদ্ধার' করা কারো কারো পেশা।/...ইংরাজি অক্ষর সনে করেন ধারণ,/প্রান্তে জুড়ি 'স্কোয়ার'রূপ বিলাতিভূষণ;/ ইদানীং ব্যস্ত এঁরা 'স্বায়ত্ত শাসনে',/পূজা অবকাশে ভ্রমিছেন স্থানে স্থানে;... (ছবি ৪.১৪ দ্রষ্টব্য)।'[282] এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার ষড়ানন্দ ১৮৭১ সালে *দুর্গোৎসব* কাব্যটি লিখলেও সেটি যখন মূদ্রণাকারে প্রকাশ পায়, সেখানে তিনি আরো কিছু অতিরিক্ত অংশ যোগ করেছেন। কারণ এই কাব্যগ্রন্থটি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার আগে প্রকাশ পায়নি বা ১৮৭১ সালে 'হোম রুল' আন্দোলনের আগেও প্রকাশ পায়নি। যাই হোক, এখানে

---

[280] পুজোর ছুটিতে স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের মধ্যে ভ্রমণে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান ইচ্ছেয় ইন্ধন জোগাতে পূর্ব রেলওয়েও নিজেদের সামিল করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত 'পূজার ছুটী' শীর্ষক গ্রন্থে পুজোর ছুটিতে পর্যটনে যেতে রেলপথের গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, 'রক্ষণশীল বাঙ্গালী এখনও এই রেলপথের সম্যক ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বাঙ্গালী রেলপথে ভ্রমণে বাহির হয় না।' তাই ইস্টার্ন রেলওয়ের বিজ্ঞাপন—'তোমরা দুর্গাপূজার সময়টি আমোদে কাটাও/ ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ভ্রমণ কর/ "ইহা অবকাশকালে ভ্রমণের লাইন"/সুলভ মূল্যে যাতায়াতের টিকিট পাওয়া যায়।/দ্রুতগামী ট্রেন স্বাস্থ্যজনক এবং দেখিবার জন্য যোগ্য স্থানে যায়।' দ্রষ্টব্য, ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত 'পূজার ছুটী', (কলিকাতাঃ সুরেশ হৃষীকেশ দত্ত অ্যাণ্ড কোং [প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। তবে বইটির লেখার অভিব্যক্তি উপলব্ধি করে মনে হয়, এটি উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বা বিংশ শতকের শুরুর দিকে লিখিত।])

[281] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই' ,পৃ ৪১।

[282] শ্রীষড়ানন্দ শর্ম্মা বিরচিত 'দুর্গোৎসব', পৃ.১৭।

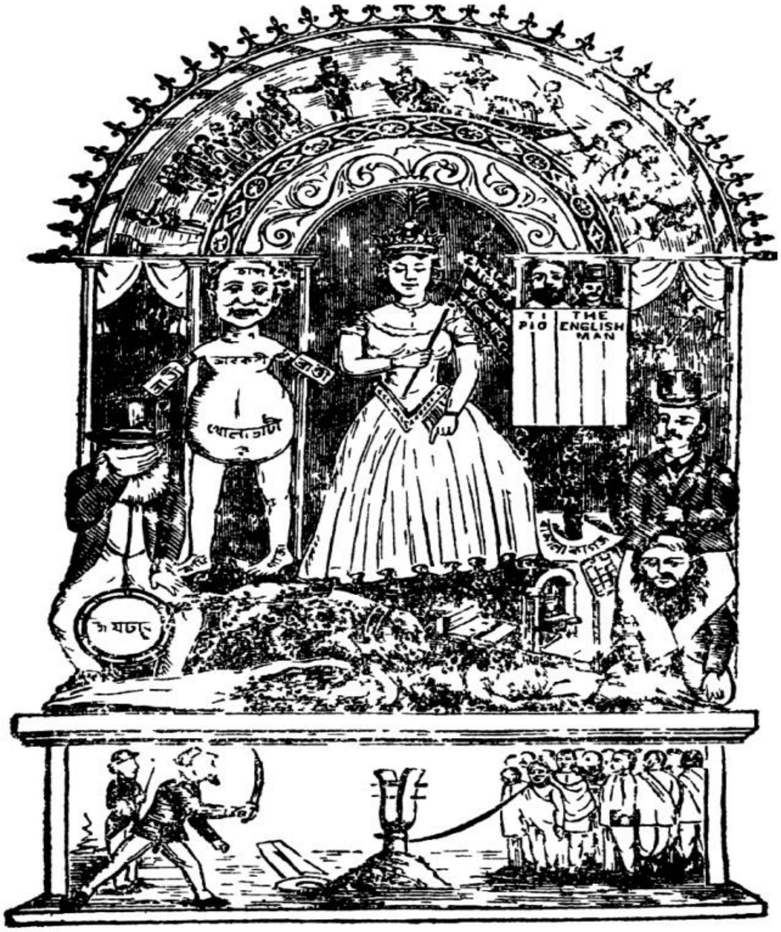

ছবি ৪.১৫: বিংশ শতকের প্রথম দিকের কার্টুনে দুর্গা [283]

ভারতোদ্ধারের কাজে সংকল্প করা যে ব্যারিস্টার, রাজনীতিকদের দেখা মিলছে, তাঁদের মধ্যে প্রথম যুগের কংগ্রেসী রাজনীতির নাকউঁচু ভাব লক্ষনীয়। সেখানে মধ্যবিত্ত সাধারণের চাইতে নিজেদের সামাজিক শরীরকে স্বতন্ত্র দেখানোর বহুল প্রয়াস। তাই বিলিতি কেতাদুরস্ত ভাবের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ভিক্টোরীয় নৈতিকতায় পত্নীকে নিজের যোগ্য সহচরী করে তুলতে ‘মেম’ বানানোর ব্রত। ষড়ানন্দ লিখছেন,--‘আপাতত রেলে স্থিত সঙ্গে পরিবার,/ দেবী বিনা কোথা হয় দেশের উদ্ধার?/অন্তঃসত্তা বিবিজান, তবু সঙ্গে যায়,/ ‘ভারত উদ্ধার’ এত ঠাট্টা কথা নয়!/

[283] নবকুমার ভট্টাচার্য্য ও বাসুদেব মোশাল, ‘পুরাতনীঃ পুজো নিয়ে পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন’, (কলিকাতাঃ অভিনব প্রকাশনী, ১৩৫৯), পৃ ৮৭।

মিস্টার সুন্দর বামে মিসাস সুন্দরী,/ আমরি যুগল মূর্তি অপূর্ব মাধুরী;/ পাড়াগেঁয়ে দেশী মেয়ে গাউন ভিতরে,/ জালে পড়ে কোই যথা হালু চালু করে।...’[284]

কিন্তু মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশের কাছে এত বিলাশ-ব্যসনে দিনযাপন সম্ভব ছিল না। তাই পুজোর বাজারে কোট-প্যান্টালুন-ক্যাপ-গাউন এইসব মধ্যবিত্তের বড় অংশের পোশাক কখনোই হয়ে উঠতে পারেনি। পুজোর সাথে সামাজিক আড়ম্বর প্রদর্শনের এই সম্বন্ধ নিয়ে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ব্যঙ্গাত্মক লেখা যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি ব্যঙ্গচিত্রও। ছবি ৪.১৫-এ দেখা যাচ্ছে, দুর্গা এখানে গাউন ও ক্রাউন পরিহিতা রাণী রূপী, যাঁর লক্ষ্মী স্থানে চাপ-মটন-কাটলেট, খোলা মদের ভাটি, ব্রান্ডী ইত্যাদি মধ্যবিত্তীয় সভ্যতা-সূচক জিনিষপত্র, সরস্বতী স্থানে দ্য ইংলিশম্যান জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের গুণগান পরায়ণ সংবাদপত্র, অসুর স্থানে বাংলা সম্বাদপত্র এবং বলির পাঁঠা হলেন সমুদয় মধ্যবিত্ত পুরুষকুল, যারা দেশীয় সমাজের হোতা। বিলিতি বাজার থেকে বিলিতি সংবাদপত্র, প্রশাসন – সকল সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সীকে এখানে সমালোচনা করা হয়েছে। যাঁরা মধ্যবিত্তজ বিলাস-ব্যসন, দেখনদারীর সাম্রাজ্যবাদী সুফল সর্বাংশে ভোগ করেছিলেন।

উপসংহার

উনিশ শতকের শুরু থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কালে বিলিতি সাম্রাজ্যবাদ, বিলিতি বাজার ও বিলিতি শিক্ষার মিলিত সমীকরণে যে দেশীয় শ্রেণির বিকাশ হল, সেই মধ্যবিত্তের মধ্যে শ্রেণি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশকে তাঁর সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আনুষ্ঠানিক ও আর্থিক সঙ্গতির জীবনে বুঝে দেখার একটা চেষ্টা এই আলোচনায় হল। তবে আলোচনা যতই আরও অগ্রসর হবে, ততই মধ্যবিত্তজ স্বাতন্ত্র্যের একমুখীন রূপ দেখতে পাবো। যে রূপে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অনুশীলনকেই তাঁদের কাছে একমাত্র মান্য অনুশীলন হিসেবে বোধ হতে থাকে। আর এই প্রবণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে উক্ত মান্যতা-মুখীন যাত্রা শুরু হয়। আর এই যাত্রায় অংশগ্রহণকারীরাও মধ্যবিত্তীয় মানসবৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পাশ্চাত্য বাজার, পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের আবর্তে যতই ঢুকে পড়তে থাকেন, ততই উক্ত ক্ষেত্রগুলির আগ্রাসনও বাড়তে থাকে। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতোই মধ্যবিত্তের পুজোর বাজারে কোড়া কাপড়ের জনপ্রিয়তার কথা বলেছিলেন। কম দামে টেকসই জমিন এবং পরের বছর পুজো পর্যন্ত টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই কাপড়ের জনপ্রিয়তার মূল কারণ। কিন্তু পাশ্চাত্য বাজার-নির্ভরতা একসময় দেশী কোড়া কাপড়ের বাজারকেও নষ্ট করে। কোড়া-কাপড়ের মতো টেকসই কাপড় জোগানেও ম্যাঞ্চেস্টারের মিল এগিয়ে আসে। যোগেশচন্দ্রের ভাষায়, ‘আমি তখন খুব ছোট, বোধ হয় বয়স আট-নয় বৎসরের অধিক হইবে।

[284] তদেব, পৃ ১৮।

মনে আছে, আমার মামা বাজার হইতে একজোড়া লালপাড় ধুতি আনিয়া আমার মায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, কাপড়ের কেমন জমি।" মা কাপড় জোড়া হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, বেশ জমি ত, যেন রুটির মতো, কত দাম? মামা বলিলেন, "দুই টাকা"। মা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "দুই টাকা! এত সস্তা!" মামা বলিলেন, "বিলিতি কাপড়। কলে বোণা হয়।" মা বলিলেন, "বিলিতি! আমি দেশী কাপড় মনে করিয়াছিলাম। ঠিক যেন দেশী কাপড়ের মতো পাড় ও জমি করিয়াছে।" '[285] মধ্যবিত্তের বস্ত্র বাজারকে অধিকার করবার একটা বিশেষ সময় ছিল, পুজোর সময়টা। তাই ম্যাঞ্চেস্টরে বোণা কমদামি কাপড় প্রথমদিকে দেশি কাপড়ের রূপ নিয়েই দেশীয় বাজারে জায়গা করে নিয়ে, দেশীয় রুচির কাপড়ের উপর নির্ভরশীল দেশীয়দের চাহিদার ক্ষেত্রটিকে করায়ত্ব করতে অগ্রসর হয়। দেশীয়দের স্থিত রুচি যখন ম্যাঞ্চেস্টার কাপড়ের কম দামের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে তখন থেকে মিলগুলোও নিজেদের কাপড়ে স্বাতন্ত্র্য আনতে থাকে। তাই 'ষাট বৎসর পূর্বে লোকে বিলাতী বস্ত্র দেখিয়া বলিত, ঠিক যেন দেশী কাপড়। আর এখন আমরা সূক্ষ্ম মিলের কাপড় দেখিয়া বলি,--"ঠিক যেন বিলাতী কাপড়।" '[286] একইরকমভাবে সামাজিক মান্যতার পরিসরেও পরিবর্তন শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিষ্টাচার ও লজ্জার ধারণায় গড়া নবযুবাদের মধ্যে চাকরি ও নতুন আয়েশে জীবনযাপনের স্বপ্নে সাফল্য যতই বাড়বে, ততই তাঁরা সমাজে অন্যান্যদের কাছে উদাহরণের কেন্দ্রে পরিণত হবেন। অর্থাৎ বিলিতি কাপড়ের মতোই বিলিতি সভ্যতানুগ জীবনাচরণও ব্র্যাণ্ডে পরিণত হবে।

---

[285] যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'স্মৃতিতে সেকাল', (কলকাতাঃ অর্পণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫০), পৃ. ৯১-৯২।

[286] তদেব।

শরীর, পোশাক ও লজ্জা : মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের পোশাকি নির্মাণ

ভূমিকা

লজ্জার সংজ্ঞা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। তাই অশ্লীলতার সংজ্ঞাও। উনিশ শতকে বাংলার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সূক্ষ্ম-বস্ত্র পরিধানের যে দেশাচার বাংলা দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভদ্রবিত্তদের কাছে লজ্জাজনক ঠেকেছিল, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেও কিন্তু সেই দেশাচার উনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রবিত্তদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বহাল-তবিয়তে বিদ্যমান ছিল। তবে সামাজিক মনস্তত্ত্বে এই পরিবর্তিত অবস্থার জন্য কাকে দায়ী করব — ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতকে না কি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তিকে? অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় কেরানি-গোষ্ঠীর উদ্ভবকেই স্বদেশীয় আচারের দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকানোর আবশ্যিক পূর্ববর্তী কারণ হিসেবে দেখতে হবে। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনার পরেও যদি মেকলে মিনিটের ভাষ্য মোতাবেক উপনিবেশ-রক্ষার প্রয়োজনে 'বাদামি সাহেব' তৈরির দিকে পা বাড়িয়ে 'white-men's burden' তত্ত্ব আওড়ানো না হত, ততদিন যাবত মুঘল-সাম্রাজ্য উদ্ভুত সামাজিক রুচি-কাঠামোই চলমান থাকত। সমাজে নতুন শ্লীলতা ও অশ্লীলতা খোঁজার প্রয়োজন পড়ত না। লজ্জার নব্য সংজ্ঞা আমদানিরও দরকার পড়ত না। অর্থাৎ দেশীয়দের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে উপনিবেশের 'মহৎ' সভ্যতার যজ্ঞে তাদের সামিল করে উপনিবেশের শাসককূল আদপে নিজেদের শাসনকেই সমুন্নত ভিতের উপর সংস্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

Vivinne Richmond বিভিন্ন পোশাক তাত্ত্বিকদের মতামত ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, সভ্যতা বিকাশের নামে উপনিবেশিক সমাজগুলোতে, রাষ্ট্র সর্বদা শাসকশ্রেণীর পোশাকি নৈতিকতার ধারণাকে শাসিতদের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে।[1] ভারতবর্ষে ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় মানুষের দেহে পোশাকের একটা অপ্রতুলতা ছিলই। এবং সেই অপ্রতুলতা প্রাকৃতিক। শীতল আবহাওয়ার জন্য ইউরোপের দেশগুলোতে মানুষের শরীরে শীত থেকে দেহকে বাঁচাতে পোশাকের প্রাচুর্য্য। কিন্তু সেই শীতল অঞ্চলের মানুষ যখন, ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্তা হয়ে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হল, তাঁদের মধ্যে নিজস্ব পোশাকি আচারকে সভ্যতার একমাত্র প্রকাশ হিসেবে দেখানোর একটা ঔদ্ধত্য তৈরি হল। তাই প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রাখতে যারা জন্মগত স্বল্পবাসী, তাদের স্বল্পবাসের উপর অশ্লীলতার দায় চাপানো হল।

---

[1] Vivienne Richmond, 'Clothing the Poor in Nineteenth-Century', (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), pp. 145-146.

Margaret Maynard উপনিবেশিক অস্ট্রেলিয়াতে শাসকশ্রেণীর এহেন মানসিকতাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘lack of clothing is seen as morally incompatible with the “superior” European way of life’[2] অর্থাৎ ইউরোপীয় জীবনচর্যার উচ্চতর আদর্শের সামনে নগ্নতা বা পোশাকের অপ্রতুলতাকে বেমানান হিসেবে দেখা শুরু হয়েছিল। সুরতাং নগ্ন নেটিভদের খ্রিস্টান প্রভাবের আওতাভুক্ত করে পরীশীলিতকরণের একটা প্রক্রিয়া ইউরোপীয় উপনিবেশগুলোতে ক্রিয়াশীল ছিল। Maynard এর ভাষায় – ‘..nudity became the site of major cultural struggle to bring Aborigines within the sphere of Christian influence.’ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখার চেষ্টা করেছিলাম, উপনিবেশবাদীদের লেখায় নেটিভদের শরীর কি প্রকারে দৃষ্ট হয়েছিল—সেখানে আদিমতা, অসভ্যতার একটা গন্ধ খোঁজার প্রবণতা তো ছিলই। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই দিকটার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তিনি বলছেন, এদেশের নারী-পুরুষের দৈহিক বর্ণ-আকার বা দেহের উপর পোশাক চাপানোর ধরণ সবটাই দূরাগত ক্ষমতা-মনস্ক ব্রিটিশদের মধ্যে ‘cultural shock’এর জন্ম দিয়েছিল।[3]

বেশ কিছু উদাহরণ সহযোগে তিনি বিষয়টা পরিবেশন করেছেন। ১৮১১ সালে মারিয়া নাম্নী জনৈকা বিলিতি রমনী তথা ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের পত্নী, সাগরদ্বীপের কাছে তাঁদের জাহাজ নোঙর রাখার পর, এদেশের মাঝি-মাল্লারদের গাত্রবর্ণ, শরীরের গঠন এবং পোশাক পরিধানের ধরণ নিয়ে লিখেছিলেন –‘…The fishermen were a very dark olive, almost black, when very slight figures, but very good countenances. They were dressed in turban , and had large muslin shawls round them, but they throw this off, when at work, and have only a bit round their waists.’[4] অর্থাৎ লেখিকা এঁদের কালো গাত্রবর্ণের কথা বলেও তাঁদের দেহ-সৌষ্ঠবের কথা বলতেও ভুলছেন না। আর সাথে করে এটাও জানিয়ে রাখছেন যে, এই মাঝিরা কোমড়ে ল্যাঙটের মতন একটা স্বল্পবাস ও গায়ে মসলিন চাদর জড়িয়ে[5] থাকতেন। আর কাজ শুরু করবার পর সেই চাদরটি একজায়গায় রেখে খালি গায়ে কাজে নামতেন। লেখিকার এই বর্ণনাতে তাচ্ছিল্যের চাইতে নতুন জায়গায় এসে নতুন ধরণের জীবনযাপনের ধরণ দেখে বিস্ময়টাই বেশি। তাই তিনি মাঝি-মাল্লারদের পাতলা

---

[2] Margaret Maynard, ‘Fashioned from Penury: Dress as Cultural Practice in Colonial Australia’, (Cambridge University Press, 1994), p. 59

[3] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০১৩), পৃ ২৬৮

[4] Lady Nugent Maria, ‘A Journal from the Year 1811 till the Year 1815 Including a Voyage to and Residence in India with a Tour to the North-Western Parts of the British Possessions in that Country, Under the Bengal Government, Vol. I,’ (London: 1839), pp. 68-69

[5] যদিও এই মাঝিদের মসলিনের মতো বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জনে সঙ্গত করা কাপড় পরার সংগতি ছিল কি না, তা প্রশ্নযোগ্য।

কাপড়কেও মসলিন বলে ভ্রম করছেন না তো! যাই হোক, সেই সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্য এই আলোচনা নয়। ১৮৩৭ সালে এমা রবার্টস নাম্নী আরেকজন বিলিতি নারী দেশীয় পুরুষের দেহ নিয়ে কি বলছেন তার দিকে ফেরা যাক— '…in Bengal where the lower orders of palanquin bearers wear very little clothing; it is not agreeable to a female stranger to see them walk into drawing-rooms, and employ themselves in dusting books or other occupations of the like nature. It would be highly disrespectful in any of the upper servants to appear in the presence of their masters without their turbans, or any other garment usually worn, but these things are deemed quite superfluous by the inferior classes, and they never seem to think that they can shock anybody by scantiness of their drapery or the incognity of their appearence.'[6] অর্থাৎ এদেশীয় স্বল্পবেশী যে বেয়াড়ারা পালকি বইতেন, তাঁদের মতো স্বল্পবেশে যদি কোনো দেশীয় চাকর সাদা-চামড়ার গৃহকর্ত্রীর ঘরের এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে কাজকম্ম করতে থাকেন, তা যে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দুটো বিলিতি চোখের পক্ষে কতটা লজ্জার, তা অসভ্য নিম্নবর্গীয় এইসব মানুষগুলো কেমন করে বুঝবে! অর্থাৎ ১৮১১ সালে যে বর্ণনায় দেশীয়দের শরীর নিয়ে বিস্ময় ব্যতীত অন্য কিছু চোখে পড়ল না, ১৮৩৭ সালে তদনুরূপ বর্ণনায় cultural shock এসে উপস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই 'শক'এর কারণ তলিয়ে দেখতেন, কাপুড়ে সভ্যতার বিকাশের মধ্যে। তাঁর চিন্তায়—'গরমদেশে কাপড়ের দরকার হয় না। কৌপিনমাত্রই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডাদেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা-পাজামা ইত্যাদি নানান খানা হয়। তারপর আদুর গায়ে গয়না পরতে গেলেইত ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কারপ্রিয়তাটা ওই কাপড়ের উপর দিয়েই পড়ে। আমাদের দেশে যেমন গয়নায় ফ্যাশন বদলায়, এদের তেমনি ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশন।'[7] সুতরাং যে দেশে জলবায়ুর কল্যাণে শরীর বেশিমাত্রায় পোশাক-আশাক দাবি করে, সেই দেশে সভ্যতার একটা ভিত্তিও কাপুড়ে হওয়াই সমীচীন। আর সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করে অন্যকে বিচার করাটাও মানব-প্রকৃতির বাস্তবিক লক্ষণ। তাই এমন বাস্তবিক লক্ষণে যে শুধুমাত্র উপনিবেশকারীরা আক্রান্ত হন তেমনটা ভাবা ভুল, এমন লক্ষণে উপনিবেশবাসীরাও আক্রান্ত হতে পারেন। তাই যে 'বাঙালি পুরুষের ধুতির নীচে অনাবৃত পা দেখলে সে যুগের ইংরেজদের শিষ্টাচারবোধে আঘাত লাগত', সেই বাঙালি পুরুষরাই আবার হাঁটু অবধি ফ্রক পরা স্কটল্যাণ্ডীয় highlander bagpipe বাদকদরা ১৮৫৭'এর সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলকাতাতে এসে স্বদেশীয় পোশাকে কুচকাওয়াচ করতে শুরু করলে, তাদের দেখে "ন্যাংটা গোরা" বলে শ্লেষ ছুঁড়ে দিতেন।[8]

---

[6] Emma Roberts, 'Scenes and Characteristics of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian Society; Vol. I', (London: W.H. Allen & Co, 1837) p.8

[7] স্বামী বিবেকানন্দ, "কাপড়ে সভ্যতা", 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবন্ধ গ্রন্থ', (কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ সংস্করন, চৈত্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) পৃ ৬৯

[8] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান', পৃ ২৬৯

সুতরাং নগ্নতার কোনো সরলরৈখিক সংজ্ঞা তৈরি করে দেওয়া যায় না। ব্রিটিশদের কাছে যা নগ্নতা নয়, যা শ্লীল, তা অন্য কোনো জাতির কাছে নগ্ন আর অশ্লীল লাগতেই পারে, আর ব্রিটিশের কাছে যা অশ্লীল, সেই অশ্লীলতাই আবার অন্য কারো যাপনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দও এই এক যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই কাপুড়ে লজ্জায় বিশ্বের সামাজিকতার বহুমুখীন চিত্র এঁকেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'ইউরোপে মেয়েদের পা দেখানো বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকতে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক বা না থাক।'[9] আবার অন্যদিকে চিনের সামাজিক লজ্জা অন্যরকম। বিবেকানন্দ এ বিষয়ে লিখছেন, 'চীনে কনফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি-দুরস্ত; খারাপ কথা, চাল, চলন – তৎক্ষণাৎ সাজা। ক্রিশ্চান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেললে। এখন বাইবেল পুরাণ হচ্ছে হিঁদুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ – সে দেবতা মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কার প'ড়ে চীনে তো চটে অস্থির। বললে, 'এই বই কিছুতেই এ দেশে চালানো হবে না, এ তো অতি অশ্লীল কেতাব'; তার উপর পাদ্রিনী বুকখোলা সান্ধ্য পোশাক প'রে, পর্দার বার হয়ে চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটাবুদ্ধি, বললে – 'সর্বনাশ'! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোড়া বইয়ে দিতে এ ধর্ম এসেছে।' এই হচ্ছে চীনের ক্রিশ্চানের উপর মহাক্রোধ। নতুবা চীনে কোনও ধর্মের উপর আঘাত করে না। শুনছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দিহান।'[10] অর্থাৎ ইউরোপে যেখানে মেয়েদের পা না-ঢাকা লজ্জার, সেখানে ভারতবর্ষে মেয়েদের মাথা না-ঢাকা লজ্জার। আবার চিনে মেয়েদের বুক না-ঢাকা লজ্জার। সুতরাং লজ্জা ও নৈতিকতার কোনো সরলরৈখিক সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। যা ইংল্যাণ্ডে লজ্জার, তা ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলিতে লজ্জার হবে – সেরকম ভাবার কারণ নেই। যা ইউরোপীয়দের ধর্মে অনৈতিক হিসেবে গ্রাহ্য নয়, তা তাদের উপনিবেশগুলির মানুষের ধর্মে নৈতিক হিসেবে গ্রাহ্য হবে – তেমন ভাবাও অনুচিত। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে ইংরেজরা নিজেদের 'শ্লীলতা' ও 'লজ্জা'র নির্মিত রূপ দিয়ে এদেশীয়দের সামাজিক শরীরকে বিচার করতে বসেন। আর যেহেতু সেই বিচার ছিল শাসকশুলভ বিচার – তাই সেই বিচারের অভিঘাতে এদেশীয় লজ্জার ধারণাও পাল্টে যেতে শুরু করে।

লজ্জা ও মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রম

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা, লজ্জা ও সম্ভ্রমের পাশ্চাত্য ভাবটি উপনিবেশিক মধ্যবিত্ত পুরুষের নতুন মনলোক গঠন করতে শুরু করেছিল। যে কারণে তারিণী

---

[9] স্বামী বিবেকানন্দ, "পরিব্রাজক", 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্য্যালয়, পৌষ ১৩৬৯), পৃ ৮৭।

[10] স্বামী বিবেকানন্দ, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', পৃ ১৮৭-১৮৮।

কুমার ঘোষ এবং আশুতোষ মিত্ররা গড়পড়তা নেটিভের চাইতে নিজেদের আলাদা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা যে নব-সম্ভ্রমের বীজ উপ্ত করেছিল, সেই সম্ভ্রমে তাঁরা পাশ্চাত্য পরিশীলনে অজ্ঞ নেটিভদের জাত-ভাই বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা পান। পক্ষান্তরে, কোন্ পোশাক পরিধাণ করলে ব্যক্তির উপস্থিতি সামাজিকভাবে মান্যতা পাবে – সামাজিক সম্ভ্রমের এই ভাবটা পাশ্চাত্য পরিশীলনের বিস্তারের সাথে সাথে আরও সচল হয়। আনন্দমোহন বসুর মতো বিলেত-ফেরতা ব্যারিস্টার চোগা-চাপকান পরে আদালতে যাতায়াত শুরু করেছিলেন বলে অন্যান্য নেটিভ ব্যারিস্টাররা তাঁকে একঘরে করেছিলেন।[11] কারণ উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই নবোত্থিত মধ্যবিত্ত সমাজ তার সামাজিকতার পোশাকি গৌরবকে নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই চেষ্টার কেন্দ্রে অবস্থান করছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পাশ্চাত্য পরিশীলনে পরিশীলিত মন। সেই পরিশীলনে বিলিতি শিষ্টাচারের সাথে নিজেদের সংশ্রব গৌরবের, আর দেশীয় আচার সেই জায়গায় খুল্লামখুল্লা বলে প্রতিভাত। সুতরাং তা অশ্লীল ও লজ্জার। কিন্তু যিনি দেশীয় আচারে উদল গায়ে, ধুতি পরে, পায়ে চটি পরে চলেন, তার কাছে তা লজ্জার নয়। কারণ তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষানুগত পরিশীলনে স্নাত হননি। আর হননি বলে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরিশীলিতদের লজ্জা ও তাঁর লজ্জার মধ্যে বিরোধ। একই নেটিভ সমাজের মধ্যে এই দ্বৈত ভাব উপনিবেশিকদের "divide and rule" নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ফলাফল। অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা 'পুরাতন পঞ্জিকা' থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে সেই দ্বৈতভাবের স্থিতি কি হয়েছিল। তিনি বিয়ে বাড়িতে অভ্যাগতদের খেতে বসার শিষ্টাচারে পরিবর্তন নিয়ে বলেছেন, ' ...এখন বাবুরা অনেকে-ই কর্মস্থানের ফেরতা চোগা-চাপকান বা হাট-কোট পরে-ই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান, জুতো ফুতো খুলে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে লুচি-তরকারী খাওয়া অনেকেই পছন্দ করেন না ব'লে এখন আমাদের মৃত রেয়োদের [পূর্বপুরুষ] জন্য কুশাসন কলাপাতার বন্দোবস্ত থাকলেও দরজীর কারিগরী-আঁটা স্যুট-পরা বাবুদের জন্য টেবল-চেয়ার ও শানকের [প্লেট] বন্দোবস্ত থাকে।'[12] অর্থাৎ উপযোগিতা ও সম্ভ্রমের নতুন আদর্শে যা পুরাতন তা কেবল আনুষ্ঠানিক লোকাচার হয়ে উঠছিল। তাই মৃত পূর্বপুরুষদের আপ্যায়ন কুশাসনে হলেও, আধুনিক প্রজন্মের আপ্যায়ন চেয়ার-

---

[11] একটি লেখায় দেখা যাচ্ছে, 'আনন্দমোহন বসুর সম্বন্ধেও ... আমরা শুনিয়াছি যে তিনি নাকি বিলাত হইতে আসিয়া গাউন না পরিয়া চোগা চাপকান লইয়া প্রথমে আদালতে গিয়াছিলেন, তাঁহাতে ব্যারিস্টার-মহল তাঁকে স্বদলচ্যুত করিবার জন্য উদ্যোগ করে, কেহ তাঁহার সহিত আলাপ করিত না, কেহ বা তাঁহাদের নির্দিষ্ট কামড়ায় বসিতে দিতেও আপত্তি করিত। অগত্যা আনন্দমোহন বাবু কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে চোগা-চাপকান ছাড়িয়া বিলাতি পোশাক গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কথাটি কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোক যে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবস্থল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।' অর্থাৎ গৌরবের পোশাকি সংজ্ঞায় পরিবর্তন হচ্ছিল। দ্রষ্টব্য, শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, 'বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া', কল্পনা পত্রিকা, ৫ম খণ্ড, ১২৯৪।

[12] ডঃ অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত, 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি', (কলিকাতা: সাহিত্যলোক, জানুয়ারি ১৯৫৭), পৃ ১৬৭-১৬৮।

টেবিলে। কারণ আধুনিক প্রজন্ম সেলাই করা পোশাকের উপযোগিতা ও সম্ভ্রমে আবদ্ধ। যে উপযোগিতার কাছে পুরাতন উপযোগিতা, সম্ভ্রম ও মূল্যবোধ সেকেলে ও অর্থহীন, তাই মৃত।

এই কারণেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চাষার ছেলের সাথে চাষী বাপের বিরোধ, পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে বিলাত ঘুরে আসা নেটিভের সাথে দেশে থাকা পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেটিভের বিরোধ। এই বিরোধ মূলত সম্ভ্রমের প্রশ্নে। ইংরাজী চালে জীবনযাপনের সাথে সামাজিক পশারের একটা সম্বন্ধ রচিত হচ্ছিল মধ্যবিত্তের মনে।[13] চাষা, তাঁতি বা যেকোনো লোক-পেশার সাথে যুক্ত, লোকশিক্ষায় শিক্ষিত মা-বাপকেও তাই শিক্ষিত সন্তান পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরিশীলিতদের মাঝখানে পরিচয় দিতে লজ্জা পেয়েছেন।[14] 'মডেলভ্রাতা বা আদর্শযুবক' রচনার নগেন্দ্র বাবু যেমন তাঁর লোকশিক্ষায় শিক্ষিত বাবাকে ছোটোবেলা থেকে ইংরেজি বুলি রপ্ত করার পর থেকেই "old fool" বলে ডেকেছেন। রচনাটির লেখক উনিশ শতকের শেষ দিকে এরূপ আরও ঘটনার অবতারণা করেছেন তাঁর লেখায়, 'আজকাল পিতাকে 'বাবু' বলিয়া ডাকিবার প্রথা হইয়াছে। কোন্ একটি বি এ, বি এল উপাধিধারী অল্প পসার সম্পন্ন উকিল, তাঁহার পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কোন কার্যোপলক্ষে সমাগত একটী লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ওটী কে?" উকিল মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন, "বাড়ির পুরানো সরকার!" এই কথাটি বাবার কানে যায়। পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "হ্যাঁ বাড়ির পুরানো সরকার বটে, তবে ওঁর মার সঙ্গে আমার একটু পীরিত আছে, হয় কি না হয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।"[15] পাশ্চাত্য পরিশীলিত মেকি সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের পারিবারিক পরিসরের এই বিরোধগুলো মেকি নয়। ঘোর বাস্তব।

---

[13] শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, 'বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া'।

[14] লেখক অনুল্লিখিত, 'মডেলভ্রাতা বা আদর্শযুবক, ১ম ভাগ', (কলিকাতাঃ মণিরাম যন্ত্রে মূদ্রিত, ১২৯৩), পৃ ৪।

[15] তদেব।

চিত্র ৫.১: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র “সর্বাঙ্গের অশ্রুপাত”(@Victoria & Albert Museum)

অরবিন্দ, দ্বিজেন্দ্রলালদের মতো মুষ্টিমেয় বিলেত-ফেরতারা বাদে বেশিরভাগ দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করা তো দূরের কথা, দেশবাসীর স্বার্থের থেকে নিজেদের স্বার্থকে স্বতন্ত্র মনে করতেন। সমাজে পসার লাভের এই পোশাকি ভিত্তিকে সমালোচনাও উনিশ শতকের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল। ‘কল্পনা পত্রিকা’য় লেখা হয়েছিল, ‘কেহ কেহ বলিতে পারেন ইংরাজী পরিচ্ছদ ধারণ করা, ইংরাজী চালে চলা পশারের পক্ষে সুবিধা করিয়া থাকে। একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পশার করা নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।’[16] এই সত্যটির অবতারণার কেন প্রয়োজন পড়েছিল, তা ১৯১৪ সালে রচিত একটি পুস্তিকা দেখলে তা পরিষ্কার হবে। সেখানে লেখা হচ্ছে, ‘দুঃখের কথা কি বলিব? যাঁহারা জনক-জনকীকে অন্ধ করিয়া, প্রিয়তমা স্ত্রীকে পাগলিনী করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাত গমন করেন, সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া দেশে আসিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে আঁধার ভারতের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন, কিন্তু হায়! আমরা তখন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে দেখিতে পাই, বিলাত হইতে পদার্পণ করিয়াই বাঙ্গালীর অর্দ্ধ আচ্ছাদিত দেহ দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হন, তাহাদের সঙ্গে

[16] । শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, ‘বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া’, কল্পনা পত্রিকা, ৫ম খণ্ড, ১২৯৪।

মেশামেশী করিতে, এমন কি ভাই বন্ধু বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করেন।'[17] অর্থাৎ স্বদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির দেশীয় আচার, পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণির বিদেশী আচারের সঙ্গে শ্লীলতার প্রশ্নে বিরোধের জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়, এই নব্য-শ্লীলতার আমদানি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার হাত ধরে।[18] দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত-ফেরতাদের বিলিতি শিষ্টাচার-অনুরাগ নিয়ে লিখেছিলেন, "আমরা বিলাত ফেরতা ক ভাই/ সাহেব সেজেছি সবাই/ তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচার/ করিয়াছি সব জবাই/ আমরা ইংরাজি ধরণে হাসি/ ফরাসি ধরণে কাসি/ আর পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড়ই ভালোবাসি।।"[19] ১৯১৭ সালে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র 'সর্বাঙ্গের অশ্রুপাত" অর্থাৎ চিত্র ৫.১-এর দিকে তাকালে দেখব, বিলিতি সম্ভ্রমের আদর্শে ক্রান্তীয় আর্দ্রতায় কোট-হ্যাট-বুট পরে বাবু গলদঘর্ম। তবু সাদা চামড়ার সাহেবের কাছে সাহেবত্বের স্বীকৃতি না পাওয়াই তাঁর কষ্টের সীমা নেই।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরুর দিককার এসব সমালোচনা থেকে ধারণা করা যায়, শুধু বিলেত-ফেরতাদের মধ্যেই নয়, ভারতবাসী দেশীয় বাবুদের মধ্যেও পাশ্চাত্য কাপুড়ে শালীনতার বাড়বাড়ন্ত পুরো উনিশ শতক জুড়েই প্রকট হয়েছিল। বিবেকানন্দ গাজীপুর থেকে প্রমদাবাবুকে লেখা একটি পত্রে বলেছিলেন, 'এ স্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় westernized (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন); ... কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি materialistic (জড়ভাবের) ধাঁধাই লাগাইয়াছে!'[20] এই সভ্যতা এতটাই পোশাকি ছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত নবযুবারা চাষ-বাস করাকে, ব্যবসা করাকে শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জিত সামাজিক পুঁজির পোশাকি রূপের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করেছেন। ভাবটা এমন – বেকার থাকব, কিন্তু যা অর্জিত সামাজিক পুঁজির পক্ষে অনিষ্টকর তা করা যাবে না। অন্দরের দৈন্য বাইরে প্রকট করা যাবে না।

স্বদেশী পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষিত দেশীয় যুবাদের সামাজিকতার পোশাকি স্ট্যাটাস রক্ষা করবার চেষ্টাকে সমালোচনার চোখে দেখা শুরু হয়েছিল। শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

---

[17] অনাদিচরণ তরফদার, 'হিন্দু-সমাজ' (কলিকাতাঃ মানিকতলা ষ্ট্রীট, ১৩২০ সাল), পৃ

[18] বিলিতি শিষ্টাচারের আগমনের আগে, দেশীয় পুরুষের যেখানে-সেখানে গা দেখিয়ে স্নান করতে লজ্জা লাগেনি। গা-খুলে ঘুরে বেড়াতেও না। বিবেকানন্দ লিখেছেন, '... আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হোক ডুব লাগালেই হ'ল। ওদের (ব্রিটিশদের) – সে এক বস্তা কাপড় কাপড় খুলতে হবে, তার বন্ধনই না কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই, ওদের বেজায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই, বাপ বেটার সামনে উলঙ্গ হবে – দোষ নেই। মেয়েছেলের সামনে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে।'দ্রষ্টব্য, স্বামী বিবেকানন্দ, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্য্যালয়, পৌষ ১৩৬৯), পৃ ১৭০।

[19] শ্রীঅদ্রিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও শিল্প', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৮৩, পৃ ২৪।

[20] পত্র নং ২৪, প্রমদাবাবুকে লেখা বিবেকানন্দের পত্র, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্য্যালয়, পৌষ ১৩৬৯), পৃ ৩০৩-৩০৪।

লিখেছিলেন, '... আমি বড় ঘরের ছেলে, আমার বাপ-দাদা গাড়ী ঘোড়া চড়িয়াছে, ষোলোটা বেহারা তাহাকে বহিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে – তাহার ছেলে – তাহার নাতি – মাঠে ঘুরিয়া ক্ষেত দেখিয়া বেড়াইবে, -- দোকান করিয়া পান তামাক বেচিবে, -- ফেরি করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিবে, -- ইহা নিতান্তই অসম্ভব।'[21] সামাজিক সম্ভ্রম-পিপাসু, চাকরি-অভিলাষী বেশিরভাগ বাঙালি বাবুর মত ছিল এরকম। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ণিত বিলেত-ফেরতা সাহেব-রূপী বাবুর দল হোক বা বিবেকানন্দ ও সারদা প্রসাদ বর্ণিত পোশাকে-আশাকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাবুর দল,– এঁরা অর্জিত সামাজিক অহংকারে এতটাই আবৃত যে, মন এবং মুখকে কিছুতেই এক করতে পারেন না। পেটে টান পড়লেও বাইরে সেই টানকে প্রকাশ করাকে তাঁরা সামাজিক সম্ভ্রমের কম তেজের কারণ বলে মনে করেন। সারদা প্রসাদের ভাষায় বিষয়টি আরও ভালো বোঝা যায়, 'তিন পুরুষ পূর্বে কবে কে ঘি খাইয়াছিল, সেই গরমে নিজের হাত শুঁকিয়া বসিয়া থাকে? এ রোগের ঔষধ কি? ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া স্বাধীনজীবিকার আদর এজাতি বুঝে না। পৈতৃক ৫০ বিঘা জমি দেশে থাকিতেও আবাদ না হইয়া ডাঙ্গা হইয়া যায়, কিন্তু সেই ব্যক্তি ১০ টী টাকার চাকরির জন্য বিদেশে আসে – গোলামী করে – ঝাঁটা লাথি খায়; শেষে একটু ল্যাভেণ্ডার মাখিয়া, বুকে ফুল গুঁজিয়া, বিলাতী জুতা পায়ে দিয়া বাবু সাজিয়া শূন্য পকেটে দেশে যায়।' সম্ভ্রমের পোশাকি আবর্তে আটকে পড়া 'বেহায়া জাতি'র তিনি উন্নতির কোনো পথ দেখতে পাননি।[22] এই পোশাকি আবর্তকে 'ফ্যাশন' উপাধি দিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'ফ্যাশন ছাড়িলে সব বালাই চুকিয়া যায়। কিন্তু হাড়ে ডুগডুগী বাজিলেও আমরা ফ্যাশন ছাড়িতে পারিব না।'[23]

পাশ্চাত্যের আমদানিকৃত নতুন ফ্যাশনের সম্ভ্রমের প্রতি ঝোঁক পুব বাংলার লোকশিক্ষার বাঁধনে কিরূপ ফাটল ধরিয়েছিল, তার সাক্ষ্য উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগের অনেক প্রহসন রেখেছে। সেরকমই একটা প্রহসনের চরিত্র বিক্রমপুরের রামহরি। নিজের আট বছর বয়সী পুত্র গদাকে পাশ্চাত্য পরিশীলনে পরিশীলিত কলকাতা নিবাসী তাঁর অপর পুত্র রামকৃষ্ণের উপমা দিয়ে বলেছেন, 'না ল্যাহনে কি খাইমা? বাল ল্যাহনে বাবু হুবি। দেহিস্ না, রামবদ্র অতি গোরার চাপে, চিহন ধুতি, বান্দিসী জোতা, কাটা মেরজাই পরনে। ... মোর রামকিষ্ট নি গোরার নিকট আংরেজী বিদ্যা শিক্কা করণে কলহত্তায় পাকা দালানে রয়। ...'[24] অর্থাৎ পড়াশোনা না

---

[21] শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, 'বেকারের উপায়, ১ম খণ্ড' (কলিকাতাঃ দি ইউনিভারসিটী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১৩২০), ভূমিকা।

[22] তদেব।

[23] তদেব। পৃ ২৬।

[24] 'বৌবাবুঃ অপূর্ব্ব সামাজিক প্রহসন' (সাল, লেখক অনুল্লিখিত, Satish Choudhury, 1904 লেখা আছে বইয়ের উপরে), পৃ ১।

করলে খাবি কি, ভালো করে লেখাপড়া করলে বাবু হবি। রামকৃষ্ণ ইংরেজি লেখাপড়ার কল্যাণে কলকাতায় পাকা দালানে থাকে, চিকন কাপড়ের ধুতি পরে, মেরজাই পরে, জুতো পরে। -- দেশীয় লোকশিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যেও এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সামাজিক এই নব-সম্ভ্রম লাভ করতে গেলে ইংরেজি-শিক্ষাই হল একমাত্র উপায়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিয়ের বাজারে নব্যশিক্ষিতের বাবুয়ানির সম্ভ্রম তিনি জীবনে কটা পরীক্ষা পাশ করেছেন—সেই সংখ্যার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। গোপাল হালদার বলেছেন, বাসর রাতে স্ত্রীর প্রথম স্বামী সম্ভাষণে ‘কটা পাশ’ এই প্রশ্নের অবতারণা হত প্রায়। যেন বিয়েটা পাশ দেখে। গোপাল হালদার বলছেন, সেকালে ‘পরীক্ষায় পাশ’ হয়ে উঠছিল চাকরি পাশের প্রথম সূত্র, এবং ‘চাকরির পাশ’ হয়ে উঠছিল ‘পরিণয়-প্রণয়-পাশের’ প্রধান সূত্র।[25] অর্থাৎ শুধু বাবুয়ানি চালচলনে বিয়ের বাজারে তল পাওয়া মুশকিলের হয়ে উঠছিল, তার সাথে সাথে কন্যাপক্ষ এটাও যাচাই করে নিতেন, যে বাবুয়ানি তাঁরা দেখছেন, সেই বাবুয়ানি অর্থাৎ ভোগ-সুখের জীবনশৈলীর মধ্য দিয়ে তাঁরা বিবাহিত স্ত্রীকে চালাতে সমর্থ হবেন কিনা! লোকশিক্ষায় শিক্ষিত পিতার সন্তান প্রতিপালনে হোক বা বিয়ের বাজারে পাত্রের কদর বৃদ্ধির জন্যই হোক – পাশ্চাত্য সভ্যতার পোশাকি রূপ এবং সেই রূপকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সঙ্গতি দরকার, সেই সঙ্গতি মধ্যবিত্তীয় মানসিক বলয়ে ঢুকে পড়া দেশীয় মানসে একটা সম্ভ্রমের জায়গা লাভ করতে থাকে। যতই এই সম্ভ্রমের ভূগোল-অর্থনীতি-রাজনীতির প্রসার ঘটতে থাকে ততই তা মধ্যবিত্তীয় পাশ্চাত্যমুখী লজ্জার পরিসরকে প্রসারিত করতে থাকে।

তাই বিক্রমপুরের রামহরির পাশ্চাত্য শিক্ষিত পুত্র রামকৃষ্ণ, তাঁর বিয়ের ঘটকালি করতে আসা ঘটকের ‘দেশি লুক’ দেখে লজ্জিত হয়ে বলেছেন, ‘... ব্যাটার কি ugly appearance! মাথা ন্যাড়া; আবার তার মধ্যে কতকগুলো চুল, তার উপর একটা টিকি! সর্বাঙ্গ উলঙ্গ। চসমা চুরোটের তো ব্যবহারই জানে না। নস্যি টিপেই সক্ মেটে। এদের civilize করা necessary হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এতদিন নিদ্রিত ছিলাম, কালই এদের উন্নতির

---

[25] গোপাল হালদার, ‘রূপনারায়ণের কূলে, দ্বিতীয় খণ্ড, যৌবনের রাজটীকা’, (কলিকাতাঃ পুঁথিপত্র, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ২৩।

চিত্র ৫.২ পোশাকি সম্ভ্রমের নবরূপ (@CSSSC_ARchive)[26]

জন্য prospectus ছাপাব।'[27] দেশীয় পোশাকি ধরণের মধ্যে কোনো শিষ্টাচার আছে – তা মানতেই নারাজ সামাজিক সম্ভ্রমের মানসিক আবর্তে ঢুকে যাওয়া মধ্যবিত্তের একটি দল। যে আবর্তে, গরমে ঘেমে-নেয়ে গেলেও শরীরে কাপড় রাখতে হবে (ছবি ৫.২ দ্রষ্টব্য)। মাথায় টিকি রাখা চলবে না। চসমা-চুরোট ব্যবহার জানা চাই। না হলে পাশ্চাত্য পরিশীলনে পরিশীলিত সমাজে সম্মান পাওয়া দায়।[28] শুধু সমাজে কেন, সভ্যতারূপ যে শৃঙ্খল পাশ্চাত্য শিক্ষা মধ্যবিত্তকে পড়িয়েছিল, সেই শৃঙ্খলে পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচার অনুশীলন করতে না পারলেও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া বাধ্য। বর্দ্ধমানের মজিলপুর গ্রামের নগেন্দ্র বাবু যেমন, দু'পাতা ইংরেজি পড়তে শিখেছেন কিন্তু পাশের গণ্ডি পার হতে পারেননি বা সরকারি চাকরির বাজারেও ঠাঁই পাননি, কিন্তু শিষ্টাচারের

---

[26] B. 30, 'Three Babus corousing', Battala wood painting, Private Collection of Mr. R. P. Gupta, CSSSC Archive.

[27] 'বৌবাবু' পৃ ১৪।

[28] রামকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু চারুকে বলেছেন, 'যেটা Fashion of the day, তা না কল্লে কি etiquette বজায় থাকে। বিবেচনা করা, তিনটে পিরাণ ব্যবহার করা হচ্চে sign of civilization, সুতরাং গরম হলেও etiquette বজায় রাখার জন্য আমাকে তা করতেই হবে। এইসব বোঝে না বলেই Europran-রা native-দের এত hate করে।' দেশীয় আদব-কায়দার অনুসারী চারু বাবুর সামাজিক মূল্যায়ন নিয়ে তার বক্তব্য, 'এই জন্যই তুমি সব meeting-এ চেয়ার পাও না।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১৪।

পোশাকি শৃঙ্খলে আটকে পড়েছেন। -- 'দুর্জ্জয় পৌষের শীত নগেন্দ্র বাবুকে বড় কাবু করিয়াছে, পায়ে মোজা নাই, সুধু চটি জুতা, গায়ে জামা নাই, একখানি ছেঁড়া র‍্যাপার, লেখাপড়া শিখিয়া কি এ বেশে থাকা যায় গা? থাকুক না থাকুক ভদ্র না সাজা কি ভাল দেখায় গা?'[29] অর্থাৎ সামান্য পাশ্চাত্য লেখাপড়া শিখে যে স্বাতন্ত্র্যের শৃঙ্খল মনে পড়েছে, সেই স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন বাইরেও প্রকট করা চাই – পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে। সেই স্বাতন্ত্র্যের বোধ নিজের পারিবারিক-যাপনের মধ্যেও প্রকট করা চাই – শিক্ষিত স্ত্রী-লাভের মধ্য দিয়ে। সেকারণে স্কুলের গণ্ডি পার হতে না পারা, সামান্য ইংরেজি পড়তে পারা, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কর্মচারীর নিকট ১৫ টাকা মাইনের চাকরি করা নগেন্দ্র বাবু পুরাতন লোকাচার অনুসারে তার বাল্য-বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে মনে মনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, '... মূর্খ অসভ্য মেয়ের আমার মত স্বামী হওয়া যে কত সৌভাগ্যের তা ত ভাবে না।'[30] অসন্তোষ প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তাঁর নতুন কাগজটি (অর্থাৎ পত্রিকা) বেরুলে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে আবার একখান বিয়ে করবেন। 'একটি সভ্যা শিক্ষিত অর্ধাঙ্গিনী প্রাণ জুড়াবে।' অকাট্য সামাজিক সত্যগুলোর সাহিত্যিক এরূপ প্রকাশ থেকে স্পষ্ট, মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রম শুধুমাত্র তার শরীরের দৃশ্যমান পোশাকই নির্মাণ করে না, সাথে সাথে বুঝুন না বুঝুন দু'পাতা শেক্সপিয়র পড়তে পারা, পত্রিকা সম্পাদনা করতে পারা আবার সাথে একটা শিক্ষিতা স্ত্রী পাওয়াও তার সামাজিকতার পোশাকি সম্ভ্রমকে পরিপূর্ণতা দেয়। সম্ভ্রম লাভের এই দৌঁড়ে মধ্যবিত্ত পুরুষ যে হাঁসফাঁস করেননি তেমনটাও বলা যাবে না। "মোহন্তের এই কি কাজ!!" প্রহসনের শহুরে চরিত্র নবীন যেমন। কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে বাড়ি ঢুকবার আগে পুকুর পাড়ে ব্যাগ থেকে আয়না-চিরুনি বের করে ফিট-ফাট হয়ে নেন। আবার ভাবতেও থাকেন – দেখনদারীর একটা গোলোকধাঁধায় শহুরে সভ্যতা তাকে কিভাবে ফেলে দিল। কিন্তু জুতো-জামায় মোড়া সম্ভ্রমের বাইরে নিজের অস্তিত্ব চিন্তা করতেও তার বাঁধে। এই দোলাচলের মাঝখানে গ্রাম দাঁড়িয়ে থাকে সাময়িক স্বস্তির জায়গা হয়ে। যে সভ্যতার যজ্ঞে মধ্যবিত্ত হয়ে নবীন নিজেকে আহুতি দিয়েছেন, সেই সভ্যতার গোলোকধাঁধা থেকে চিরতরে মুক্তি যে জীবৎকালে নেই – তা নবীন জানেন।[31]

উনিশ শতকের শেষ দিকে যেতে যেতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা যে লজ্জা ও সম্ভ্রমের শাসনে মধ্যবিত্তকে বেঁধেছিল – সেই লজ্জার আসল রূপ প্রকট হচ্ছিল। তাই পাশ্চাত্য সম্ভ্রমের

---

[29] লেখক অনুল্লিখিত, 'মডেলভ্রাতা বা আদর্শযুবক, ১ম ভাগ', (কলিকাতাঃ মণিরাম যন্ত্রে মূদ্রিত, ১২৯৩), পৃ ১।

[30] তদেব, পৃ ১৪।

[31] পুকুরপাড়ে আয়না-চিরুনি নিয়ে ফিটফাট হতে হতে নবীনের সগোক্তিতে সেই দোলাচলের প্রকাশ এরূপ, "এই নাকে কানে খৎ [;] আর কখন না, ফোতোবাবুগিরি দেখাতে গেলে নানান বিপদ, কেন বাবু টাইট জুত, টাইট বোতামওয়ালা জামা গায়ে দিয়ে সুখ তো ভারি!" দ্রষ্টব্য, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, "মোহন্তের এই কি কাজ!!" হাওড়া, ১৮৭৩; জয়ন্ত গোস্বামী, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', (কলিকাতাঃ সাহিত্যশ্রী, ১৩৮১), পৃ ২৭১।

ধাঁচে গড়ে ওঠা বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ও ১৮৭০-এর দশকে সেই লজ্জার সমালোচনা করেছে। সেখানে লেখা হয়েছিল, ‘লজ্জার শাসনে সম্পূর্ণ উপকার হয়ই না ত, সর্ব্বদা অপকারও হইয়া থাকে; নবীন সৌখিন ইয়ার ছিন্ন মলিনবসনে বাজারে যাইতে পারিলেন না, বর্ষীয়সী জননী সেদিন অনাহারে রহিলেন; কুম্ভীরে আসিয়া বঙ্গ-বধূর বসন ধরিল, ভয়ে বিহ্বলা হইয়া বধূ বস্ত্র ফেলিয়া নদীকূলে উঠিলেন, বিবসনা, উঠিয়াই দেখেন, সম্মুখে ওপাড়ার পাঁচুঠাকুরপো, এবার লজ্জায় বিহ্বলা হইয়া সলিলবসন পরিবার জন্য লজ্জাবতী জলে ঝাঁপ দিলেন; নক্র বলিল, “এ লজ্জা সলিলবসনে ঢাকে না, এস, তোমায় উদরে লুকাইয়া রাখি।” ’[32] এখান থেকে লেখকের সিদ্ধান্ত লজ্জার শাসন ‘অসম্পূর্ণ এবং অপকারক।’ কিন্তু তবু লজ্জা কেন? – এই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেছেন, লজ্জা হল ‘কর্তব্যে অনাবিষ্ট মনকে উৎসাহ’ দেওয়ার একটা কৌশল। অর্থাৎ যিনি কর্তব্য পালনে অনগ্রসর, তিনিই লজ্জাকে হাতিয়ার করে নিজের অনগ্রসরতাকে ঢাকেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত বা পাশ্চাত্য ভাবগ্রস্ত যুবক নিজ সমাজের আচার-ব্যবহার, সাজ-পোশাককে লজ্জার চোখে দেখে তাকে দূরে ঠেলেন, সেই লজ্জা, পাশ্চাত্য শিক্ষিত পরিশীলনের দ্বারা সমাজকে পরিবর্তনের যে কর্তব্য নব্যশিক্ষিতদের উপর বর্তায়, সেই কর্তব্য থেকে নিজেদের অব্যহতি দেওয়ার অস্ত্র। তাই লেখকের নিদান, নিজ সমাজের যা কিছুকে অব্যবস্থা মনে হচ্ছে – তা দেখে লজ্জা-পাওয়া কোনো গঠনমূলক কাজ নয়, বরং সেই অব্যবস্থার দিকে প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকানো এবং প্রেমের দ্বারা তাকে নিজের যোগাযোগের উপযুক্ত করে নেওয়াই কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরা কর্তব্য। তার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার হাত ধরে আসা লজ্জা’র ব্যাখ্যানকে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি তিনি। তিনি লিখছেন, ‘খ্রীষ্টান কবি, খ্রীষ্টান সৈন্যাধ্যক্ষ, খ্রীষ্টান নারী, খ্রীষ্টান আবালবৃদ্ধ সকলেই যে, পদে পদে লজ্জার দোহাই দিয়া থাকেন, তবে লজ্জা কলঙ্কিনী কেন? সত্য সত্যি লজ্জা কলঙ্কিনী। যাঁদের উপাস্য পুস্তকে লজ্জা সর্ব্বনাশিনী বলিয়া বর্ণিত, তাঁরাই যে লজ্জার দোহাই দিবেন বিচিত্র নয়, কারণ খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টানী উপদেশ-রত্নগুলি আজকাল চকচকে বাইবেলবাক্সে বন্ধ করিয়াই রাখেন, তবে, স্বার্থসাধন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কলাপের সময় কখন কখন ব্যবহার করেন।’[33] অর্থাৎ উপনিবেশে লজ্জার যে ব্যাখ্যান উপনিবেশিকরা গড়ে তুলেছেন, সেই ব্যাখ্যানকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থপুষ্ট বলে একটা অভিযোগের আভাস এই বক্তব্যটিতে আছে। যে রাজনৈতিক স্বার্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল – দেশীয় সমাজ-ধর্ম-কৃষ্টিকে নিচু নজরে দেখা এবং নিজেদের উৎকৃষ্টতা জাহির করা। লেখক খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে ‘লজ্জা’র অবস্থানের গভীরতায় গিয়ে বলেছেন, আদম-ইবের পৃথিবীতে যবে থেকে লজ্জার প্রবেশ ঘটেছে, তখন থেকেই মানুষ নিজেকে সৃষ্টির অন্যান্য জীব থেকে উন্নত হিসেবে মনে করে আত্মাভিমান অনুভব করা শুরু করেছে, ততই সত্যের চাইতে নিজের দূরত্ব বেড়েছে।

---

[32] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘লজ্জা কেন করি?’ বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২, পৃ ৩২১।

[33] তদেব, পৃ ৩২৩।

তাই লেখকের সিদ্ধান্ত সত্যের উপাসক মাত্রই নির্লজ্জ। তাঁর ভাষায়, ‘নির্লজ্জ হওয়া কেবল প্রেমিকদেরই সাজে, আত্মম্ভরি স্বার্থপরের নয়।’[34] অর্থাৎ আত্মম্ভরি স্বার্থপরেরা কখনোই সত্যের উপাসক নন। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার দৌলতে যাঁরা নিজেদের জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-সংস্কারের এক মহামিলন ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে শুরু করেছিলেন – তাঁদের আত্মভিমানই দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে তাদের লজ্জার কারণ। আর এই আত্মভিমানের লোপ না হলে লজ্জার বিলোপ অসম্ভব। সত্য ও প্রেম উপলব্ধি অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও পাশ্চাত্য শিক্ষার আমদানিকৃত শ্লীলতা বাংলায় যে কিরূপ রুচি-পুলিশির পরিবেশ তৈরি করেছিল, সে বিষয়ে তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনীতে লিখে গেছেন। যে ঈশ্বরগুপ্ত কিনা বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষিত পরিশীলনে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল হিসেবে ঠেকেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার অশ্লীলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। ... তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল – উৎসবগুলি অশ্লীল – দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফআখরাই অশ্লীলতার জন্যই রচিত।’[35] সুতরাং সেই সামাজিক বাতাসে লালিত-পালিত ও বর্ধিত ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্য-কৃষ্টিতে অশ্লীলতা থাকাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্লেষণকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত, পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের দ্বারা পরিশীলিত একটা প্রজন্মের তাঁদের বিগত আরেকটি প্রজন্মের মূল্যায়ন হিসেবে বিচার করতে হবে। যাঁদের কাছে আগের প্রজন্মের লোকরঞ্জনের সবকটি স্তরকেই অপরিশীলিত ও অশ্লীল মনে হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই গড়পড়তা মনে হওয়াতেও আটকে থাকেননি। একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে তিনি আরও গভীরে গেছেন। তিনি জানতেন, ‘...লোকের রুচি [যেমন] ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।’ আরও গভীরে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজরা করেন না। ইংরেজের কাছে প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল – ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য –

[34] তদেব, পৃ ৩২২।

[35] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ’, (কলিকাতাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, আশ্বিন ১২৯২), পৃ ৬০-৬১।

মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে।'[36] কিন্তু ইংরেজের শ্লীলতার ধারণা পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেটিভকূলকে এমনি প্রভাবিত করেছিল যে কালিদাসের মেঘদূতের একটি কবিতায় 'কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে বলে, তা তাঁদের পাশ্চাত্য শিক্ষিত পরিশীলনে অশ্লীলতা হিসেবে বিঁধেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্বে এই ভাব ছিল না। ধরণী যদি মা হয়, তবে সেই মাতৃস্তন সন্তানের চক্ষে সবচেয়ে সুন্দর, পবিত্র হিসেবে প্রতিভাত। সেখানে অশ্লীলতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, 'কবি এখানে অশ্লীল নহে, এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে – দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।'[37] যাঁদের কাছে মাতৃস্তন্যও অশ্লীল হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল, তাঁরা তবে অনাবৃত শরীরকে কিভাবে দেখবেন – তা অকল্পনীয় নয়।[38]

দেশীয় পোশাক শ্লীলতার প্রশ্নে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মননের সাথে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেও, পূর্ববর্তী মোঘল শাসকদের দরবারি পরিশীলনজাত পোশাক চোগা-চাপকান-কাবা-পাগড়ি মধ্যবিত্ত মননের সাথে দ্বন্দ্বে পড়ে গেল সম্ভ্রমের প্রশ্নে। সুশীল রায় লিখেছেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পূর্ববর্তী সামাজিক কাঠামোয় ধর্মীয় শ্রেণি বিভাগকে বাদ দিলে দুটি শ্রেণির আধিক্য ছিল। একটি শ্রেণি হল জমিদার এবং অপরটি রায়ত। কিন্তু সূর্যাস্ত আইন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে পুরোনো জমিদারী নিলামে উঠতে শুরু করায় একদল অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটল বাংলায়। যাঁদের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশীয় সমাজে প্রবেশ করবে এবং একটি নতুন শ্রেণি – মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটাবে। যে শ্রেণির অর্থনৈতিক, সামাজিক ঝোঁক চাকরির দিকে। সুশীল রায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের কালকে 'ইঙ্গমোগলাই কাল' বলেছেন। যখন বাদশাহী আমলের বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তার ধ্বংসস্তূপ দেশ থেকে অপসারিত হয়নি। আচার-আচরণে ভাষায়-ভঙ্গিতে বেশভূষায় তখনও বাদশাহী আমলের স্মৃতি রয়ে গেছে। তাঁর ভাষায়, সেই স্মৃতি ক্রিয়াশীল থাকার কালেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ফলে '... একটি নবীন প্রভাব এসে আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করেছে সমাজ ও সংস্কৃতি – সে প্রভাব ইংরেজ

---

[36] তদেব, পৃ ৬১।

[37] তদেব, পৃ ৬২।

[38] বঙ্কিমচন্দ্র কোনো একটা রুচিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে অপর কোনো রুচির আদর্শকে কিভাবে হেয় করা হয়, সেবিষয়ে লিখেছেন, 'আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপবাদী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়দের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ৬২-৬৩।

প্রভাব।’[39] এই দ্বৈত প্রভাবের কালে জন্ম নেওয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, “বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ সজোরে আঘাত করিতেছে, আমরা ঠিক সেই সময়ে জন্মিয়া দুই রকমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্বে পোশাক ছিল চোগা চাপকান কাবা পাগড়ি, এখন হ্যাট ওয়েষ্টকোট এবং পেন্‌টুলন। ভাষায় পূর্বে ফারসী আরবী শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরাজী।”[40] এই পাল্টে যাওয়ার মূল কারণই হল সমাজে উপযোগিতার পরিসরে পরিবর্তন, সমাজে সম্ভ্রমের পরিসরে পরিবর্তন। যা পুরাতন শাসকশ্রেণির কালে মান্য ছিল – তা নতুন শাসকের ক্ষমতার বাহ্য-সংস্কৃতির সাথে খাপ খাচ্ছিল না। তাই ইংরেজ সরকার অফিসে-আদালতে নেটিভদের জন্য চোগা-চাপকান-পাগড়িকে অফিসিয়াল পোশাক হিসেবে মনোনীত করলেও সাধারণ নেটিভ চাকুরেদের অনেকেই তা নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ভাবখানা এমন, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা ইংরেজের রাজত্বে পিছিয়ে থাকা মুসলমান শাসকদের পোশাকি আচারকে কেন গ্রহণ করা হবে।[41] পাশ্চাত্য শিক্ষাটা যখন পেয়েছেন, পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচারটা কেন আচরণে আনতে পারবেন না। এই প্রশ্নটা নব্যশিক্ষিত চাকুরিজীবীদের অনেকের মনে এসেছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা যে সম্ভ্রমের আদর্শে পরিবর্তন করেছিল তা ধারণা করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্য থেকে তা আরও পরিষ্কার হয়। তিনি লিখেছেন, ‘...এখন কিছু আমাদের মুসলমান রাজত্ব নয়, ইংরাজের রাজত্ব। মুসলমানের সময় যদি মুসলমানী পোষাক পরিয়া চাকরি করিয়াছি ত ইংরাজের সময় যে ইংরাজী পোষাক পরিব, তাহাতে ন্যায়ের সূত্রের কোন্‌ জায়গায় ভঙ্গ হইল? চাপকান ইংরাজী আমলে পরা অসাময়িকতা (anachronism)।’[42] অর্থাৎ কোন্‌ পোশাক শ্লীল আর কোন্‌ পোশাক অশ্লীল বিতর্কটা সেই জায়গায় থেমে থাকছে না। তার সাথে যুক্ত হচ্ছে কোন্‌ পোশাক যুগোপযোগী আর কোন্‌ পোশাক যুগোপযোগী নয় – সেই প্রশ্নটি। এখন এই যুগোপযোগিতা নির্ধারিত হয়েছিল সম্ভ্রমের প্রশ্নে। সোজা কথায়, কোন পোশাক পরলে সমাজে সভাতে বেশি গুরুত্ব পাওয়া যায় – সেই প্রশ্নে।

---

[39] সুশীল রায়, ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ সমসাময়িক সমাজ ও কাল’, উত্তরসূরী, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৬৯-১৩৭০।

[40] তদেব।

[41] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উনিশ শতকের শেষের দিকে লিখেছিলেন, পোশাকে-আশাকে জাতীয় চরিত্র লাভ করতে না পারা বাঙালি পুরুষকে যদি ‘নকল করিতে হয় ত মুসলমানের নকল ছাড়িয়া ইংরাজের নকল করাতে আমি কোন হীনত্ব দেখি না। কারণ, প্রথমতঃ এ মুসলমানী রাজত্ব নয় – ইংরাজী রাজত্ব; দ্বিতীয়তঃ এ মুসলমানী রাজত্ব হইলেও অনুকরণ করিতে হয় ও মুসলমান জাতির অনুকরণ করার চেয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সভ্য ইংরাজের অনুকরণ কেন না করি; তৃতীয়তঃ ... সুবিধা হিসেবে ইংরাজী পোষাক মুসলমানী পোষাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ দ্রষ্টব্য, “ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোষাক”, ভারতী, চৈত্র ১৩০২, ‘দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী’, ২য় খণ্ড, (কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০১৭), পৃ ৭৫৪।

[42] “ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোষাক”, ভারতী, চৈত্র ১৩০২, ‘দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী’, ২য় খণ্ড, (কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০১৭), পৃ ৭৫৩।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় সেই যুগচিন্তাটিও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন ‘চাপকানের পক্ষে একমাত্র কথা হচ্ছে যে, এটা খুব শ্লীল। ... দরকারী সভ্যতা ধুতিতেও আছে, প্যান্টেও আছে, পশ্চিমের লোকেদের আঁট-সাঁট ক’রে পরা কাপড়েও আছে। চাপকানের শ্লীলতা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যেহেতু তাহাতে সুবিধা কম এবং সর্ব্বদেশানুমোদিত দরকারী সভ্যতাটুকু প্যান্ট-কোটেও রক্ষিত হয়, সেহেতু চাপকান বর্জ্জনীয় ও তাহার স্থলে ইংরাজী পোষাক গ্রহণীয়। শুদ্ধ সভ্যতা রক্ষা দরকার হইলে আপাদতল একটা বালিশের ওয়াড় পরিলেই ত চলে!’[43] এই বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে যা উঠে আসবে তা হল – শুধু শ্লীলতার কথা যদি বলা হয়, তবে শ্লীলতা একটা আপাদমস্তক বালিশের ওয়ার পরে নিলেও রক্ষিত হয়। সুতরাং শ্লীলতার সাথে সাথে যুগোপযোগী সৌন্দর্য্য এবং সম্ভ্রমের আদর্শের উপর তিনি বেশি জোর দিয়েছেন। যুগোপযোগী সৌন্দর্য্য ও সম্ভ্রম তা’ই, যাতে সমাজ, সভা-সমিতিতে গুরুত্ব বেশি পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষ দিকে যেখানে যুগধর্ম ও যুগ-পৌরুষের পোশাকি রূপ কোট-প্যান্ট-বুট-টুপির আবর্তে আবদ্ধ, সেখানে চোগা-চাপকানের শ্লীলতায় আটকে থাকা মানে পিছিয়ে থাকা – দ্বিজেন্দ্রলাল এই কথাটি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি ইংরেজি পোশাকের পৌরুষ নিয়ে যেমন বলেছেন, ‘ইংরাজী পোষাকে যেমন একটি সুন্দর পৌরুষ ভাব আছে, চাপকান-চোগাতে তাহা নাই।’[44]

স্বদেশী আন্দোলনের কালে মধ্যবিত্তীয় লজ্জা ও সম্ভ্রমের বিকাশের একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখেছিলেন, পাগড়ি পরে বা দেশীয় শিষ্টাচারের পোশাক পরে ইউরোপ তথা লণ্ডনের রাস্তায় বেরুলে সাদা চামড়ার ইউরোপীয়দের কাছে থেকে আলাদা একটা সম্ভ্রমের দৃষ্টি মেলে, সেখানে স্বদেশে দেশী পোশাকে অনীহা ব্রিটিশদের জাতি-বিদ্বেষের পোশাকি রূপকে আরও উস্কে দেয়।[45] তাঁর মতে, দেশী পোশাকে অনীহা দেখিয়ে বাংলার নেটিভকূল যে পোশাক পরেন, তা পাশ্চাত্য পরিশীলন ও রুচিশীলতায় জ্ঞানী মানুষের কাছে

---

[43] তদেব।

[44] তদেব।

[45] দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর ভাষায়, লণ্ডনের রাস্তায় সেদেশীয় লোকজন ‘খাস বাঙ্গালী পোষাক পাগড়ী দেখিয়া বরং অধিক সাহায্য করে। রাস্তার ছেলেরা (Street Arabs) ও কোন কোন ছোট লোক যে হাঁ করিয়া থাকে না কিংবা আপনা আপনি কানাঘুষা কখন করে না , তাহা নহে। তাহাতে বিন্দুমাত্র আসিয়া যায় না; মোটের উপর পগড়ীর যথেষ্ট মান্য আছে, কোন অসুবিধা নাই বরং কোথাও কোথাও সাতখুন মাফ আছে। (ইংল্যাণ্ডে) পাগড়ী ছাড়াইবার জন্য আমাদের পুরাতন একজন Anglo-Indian বন্ধু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আর সকলেই, এমনকি আমার সেই Anglo-Indian বন্ধুর স্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই পাগড়ী বজায় রাখার পক্ষে।’ তাঁর ভ্রমণকথায় এই কথাগুলো বারংবার বলার তাৎপর্য বিষয়ে তিনি লিখেছেন, ‘(একথাগুলো) বার বার বলিবার তাৎপর্য্য যে, ভারতবাসী বিলাতে আসিয়াও নিজ ব্যক্তিগত-জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিলে, ভদ্র ইংরাজ পুরুষ বা মহিলা কোন আপত্তি না করিয়া, বরং শ্রদ্ধা সম্মান করেন, সকল রকম সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, একথা দেশের লোকের বিশেষরূপে বুঝিবার সময় আসিয়াছে।’ দ্রষ্টব্য, শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ‘য়ুরোপে তিনমাস’, ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্য, পৌষ ১৩২১, পৃ ১৪০।

দৃষ্টিনন্দন নয়।[46] বিদেশের মাটিতে বাংলার পোশাকের সম্ভ্রমের উপর আলোকপাত করে, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বদেশী পরবর্তী পোশাকি জাতিসত্তার সাথে জাতীয় সম্ভ্রমের সংযোগ সেতু রচনা করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর মতে, বিলেতের রাস্তাঘাটে যেখানে বাঙালি পোশাক পরলে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, সেখানে এদেশে '"কাপুড়ে বাবুর" জ্বালায় অস্থির' হতে হয়। ' "কাপুড়ে বাবু" আবার "কাপুড়ে সাহেবে" রূপান্তরিত হইলে, আরও ভীষণ – ভীষণতর পদার্থ হইয়া ওঠে।'[47] এরূপ বলার মধ্যে দেশীয় সমাজে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচারের অনুশীলনকে হতোদ্যম করার একটা প্রবণতা রয়েছে। এবং দেশীয় পোশাকের সাথে সম্ভ্রম ও গৌরবের আদর্শকে যোগ করতে বিদেশভূমে দেশী পোশাকের প্রতি বিশেষ-দৃষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশীয় পোশাকের সাথে সম্ভ্রমকে নেটিভদের অন্তরের অন্তরলোকে কতটা সংযুক্ত করা গিয়েছিল – তা প্রশ্নযোগ্য। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের পরে তো বটেই, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বাঙালি পুরুষের মধ্যে কোট-প্যান্ট পরার প্রবণতার বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল।[48] ১৯৫৯ সালে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'বর্তমান বাঙালীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলে মনে হয় আমরা ক্রমশঃ ভোগবাদী হয়ে উঠছি। ভোগে স্বাচ্ছন্দ্যে আরামে বিলাসে এখন আর আমাদের অরুচি

---

[46] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙালি পুরুষের পোশাকি চরিত্রের অসামঞ্জস্য বিষয়ে বলেছিলেন, 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য হিসেবে ... ধুতি ও চাদরই সর্বশ্রেষ্ঠ। পিরাণ আসিয়া তাহার statuesqueness-এর একটু হানি করিয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তিত সমাজে শুদ্ধ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে গেলে চলে না। সুবিধা ও সভ্যতার হিসাবে পিরাণ জিনিষটা দরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের এখন এরূপ পিরাণ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে সে সৌন্দর্য্যটুকু বেশী নষ্ট না হয়।' সুতরাং ধুতির নমনীয় প্রকৃতির সাথে পিরাণের সামঞ্জস্য বিধানে তাঁর নিদান, 'আমার মতে ধুতির সঙ্গে ক্যফ (cuff) প্লেট (plate)-ওয়ালা সার্ট পিরাণ মানায় না। ধুতি চাদরে একটা বেশ মোলায়েম সহজ উদার ভাব আছে, মুড়িয়া সুড়িয়া যেমন তেমন করিয়া পরা যায় বা গায় দেওয়া যায়। তাহার সঙ্গে বিলাতী সার্টের হাতের ক্যফের ও বুকের প্লেটের মোটেই মিল খায় না। তাহাদের কাঠিন্য ও কাটখোট্টা ভাবটা বিশুদ্ধ, আর্য্য, প্রস্তরমূর্ত্তির উপযোগী, ধুতিচাদরের মোলায়েম পাটের (fold) সহিত খাপ খায় না। ধুতি চাদরের সঙ্গে বেশ একটা মোলায়েম সামঞ্জস্য হয়। ইংরাজের প্লেটের ও ক্যফের উদ্দেশ্য এই যে, ইংরাজী পোষাকে ঐটুকুই বাহিরে থাকে (পিরাণের নরম অংশটুকু দেখাইবার জন্য নহে), আর ঐটুকু ইংরাজী পোষাকের সোজা পৌরুষ পোষাকের সহিত বেশ মানায়। বাঙ্গালী অনুকারক ওই প্লেট আর ক্যফের অর্থ না বুঝিয়া বিলিতী সার্ট পুরোপুরি অনুকরণ করিয়াছেন। পুরো অনুকরণ করিতে হয় ত সমস্ত ইংরাজী পোষাকটাই অনুকরণ করিতে হয়। কিন্তু সেটা আবার বাঙ্গালীর রঙের ও নিরীহ স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।' অর্থাৎ বাঙালির দৈহিক গঠন ও রঙের সাথে খাপ খাবে মতন করে বিলিতি পোশাকের অভিযোজনে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু শুধুমাত্র মস্তিষ্কহীন অনুকরণে তাঁর আপত্তি আছে। তাই তিনি বলছেন, বাঙালি পুরুষ পিরাণ পরুন, কিন্তু তার ক্যপ ও প্লেট যাতে মোলায়েম হয় – সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ধুতির মতো লীলায়িত নরম কাপড়ের সাথে পিরাণের কঠোর ক্যফ-প্লেট যায় না। দ্রষ্টব্য, 'ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোষাক', ভারতী, চৈত্র ১৩০২, পৃ ৭৫৮।

[47] শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, 'য়ুরোপে তিনমাস', পৃ ১৪০।

[48] শ্রীসুধীরচন্দ্র খাস্তগীর এই বাড়বাড়ন্ত দেখে বলেছিলেন, 'দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব্বে সাহেবী 'কোট-প্যান্ট' অনেকের আপিস যাবার পোশাক মাত্র ছিল – কিন্তু এখন ত দেখি বহুক্ষেত্রে তা শুধু আপিসের পোশাক নয়, ঘরোয়া পোশাকও হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে এ উপেক্ষা এবং পরানুকরণস্পৃহা বাস্তবিকই দুঃখজনক।' কিন্তু তিনি তবু আশাবাদী কারণ তিনি জানেন 'কলোনিয়াল হ্যাঙ্গোভার' কাটিয়ে উঠতে খানিক সময় লাগবে। দ্রষ্টব্য, শ্রীসুধীরচন্দ্র খাস্তগীর, 'ভারতীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি', প্রবাসী, পৌষ ১৩৬২, পৃ ২৯৫।

নেই, বরং এইগুলি জীবনধারণের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।'[49] যদিও তিনি লিখেছেন যে ব্রিটিশ আমলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে ভোগের দিকে ঝোঁক কম ছিল, তবু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই -- পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটেছিল, তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য পরিশীলনের সাথে সংযুক্ত লজ্জা ও গৌরবের পোশাকি দিকটা শুরু থেকেই সচল ছিল। সাহেবদের সমাজে ঠাট্টা-তামাশার পাত্র হতে হবে বলে অনেকে সেসময় সাহেবি পোশাক পরতে নিরুৎসাহিত থাকলেও, সাহেবরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাই দল দলে অনেকেই কোট-প্যান্টে নাম লিখিয়েছিলেন। তাই এটা ভাবার কারণ নেই যে 'বিদেশী ধরাচূড়ায় সজ্জিত হয়ে বাইরে বেরনোকে' ব্রিটিশরা এদেশ ছাড়ার আগে 'পরমার্থ' ভাবা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গ-বঙ্গের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে একটা গানের কথা ১৮৭৮ সালে উল্লেখ করেছিলেন, "মা, এবার মলে সাহেব হব --/ রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব!/ সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব --/ আবার কালো বদন দেখলে পরে "ডার্কি" বলে মুখ ফেরাব..."[50] এহেন নতুন পোশাকি গৌরবের প্রতি আকর্ষণ বহু আগেই পাশ্চাত্য শিক্ষা তরুণদের মধ্যে তৈরি করেছিল। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী স্বাধীনতা-উত্তর পোশাকি সংস্কৃতির হাব-ভাবে হঠাৎ একলাফে বৃহৎ পরিবর্তন দেখে অবাক হয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'আপিসে-আদালতে তো বটেই, স্কুলে-কলেজেও আজকাল সার্ট-পাৎলুন পরে' যাওয়া রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-সব কাজের সঙ্গে বিজাতীয় পরিচ্ছদ-সজ্জার দৃশ্যতঃ কোনো সম্পর্ক নেই সেখানেও দেখি বিজাতীয় পোশাকেরই আধিপত্য। ... আমরা যারা জাতীয় পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করি তাঁরা নিজেরাই ওই সাহেবী পোশাকওয়ালাদের তুলনায় ছোট ভাবতে আরম্ভ করেছি।'[51] বিংশ শতকের মধ্যভাগ মানে ঔপনিবেশিকতার ফসল মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামের কাল। তার সাথে আছে যন্ত্রসভ্যতার উন্নতি। লীলায়িত দেশি পোশাক পরে প্রাত্যহিক যানবাহনে চলা দুষ্কর। তার সাথে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফেলে যাওয়া পোশাকি ক্ষমতার ভাবটা। সমাজের পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন গোষ্ঠী নিজেদের সামাজিক সম্ভ্রম ও গৌরব জানান দিতে সেই ভাব ভাঙিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন পুরোদমে। একসময় যে ভাবের সাথে অনুশীলনের খানিক দূরত্ব ছিল। কারণ সেই ভাবের সর্বাধিপতি হয়ে ব্রিটিশরা বসে ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালিও তাই সর্বক্ষেত্রে বিলিতি সজ্জা ধরতে কুন্ঠাবোধ করতেন। কিন্তু যেই ব্রিটিশরা এদেশ ছাড়লেন, সেই কুন্ঠা ঘুচে গেল। উর্দ্ধতন সমাজের ঠাট্টা-বিদ্রুপের ভয় রইল না। তাই অন্তরের পাশ্চাত্য ভাবের সাথে অনুশীলনের দূরত্ব ঘুচে গেল।

---

[49] শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, 'বর্তমান বাঙালীর জীবনযাত্রা', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ ১৮।

[50] শ্রীপান্থ, 'কেয়াবাৎ মেয়ে', (কলকাতাঃ আনন্দ, নভেম্বর ২০১৬), পৃ ১৪০।

[51] শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, 'বর্তমান বাঙালীর জীবনযাত্রা', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ ২০।

স্থান-কাল-পাত্রের প্রভাবে সম্ভ্রমের পোশাকি রূপে পরিবর্তনের আরেকটি অনুঘটক হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যে ইউরোপীয়রা সপ্তদশ শতক জুড়ে বা অষ্টাদশ শতকেও নেটিভদের শরীরে পোশাকের অপ্রতুলতা দেখে লজ্জিত হয়েছেন। সেখান থেকে তাঁদের মনে পোশাকের সাথে সামাজিক সম্ভ্রমের যোগটা কতদূর তা ধারণা করাই যায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিশ্বব্যাপী বস্ত্র-সংকট সেই পোশাকি সম্ভ্রমে কোথাও প্রভাব ফেলেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'ইউরোপের লোকেরা অনেক বিষয়ে বেশ সংস্কার-মুক্ত, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তারা বড়োই গতানুগতিকতার অনুসরণ করত। বিগত লড়াইয়ে [অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ] তাদের মধ্যে পরিচ্ছদ বিষয়ে কতকগুলি উন্নতি এনে দিয়েছে, শর্ট বা হাফ-প্যান্ট বা 'কাছ' এর মধ্যে একটী, নরম কলার আর একটী।'[52] এই ইউরোপীয়রাই একসময় ল্যাঙ্গট বা মল্লকচ্ছ ধুতি পরা নেটিভদের দিকে হেয় নজরে তাকাতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে নেটিভ-সমাজে পাশ্চাত্য পরিশীলনের বিস্তারের মধ্য দিয়ে নবোত্থিত মধ্যবিত্ত পুরুষ সেই হেয়ত্বের গ্লানি থেকে বাঁচার জন্য নিজের পোশাকি সম্ভ্রমকে পাশ্চাত্য পোশাকি পরিশীলনের ধাঁচে তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সারা শরীর নানা পোশাকি উপকরণ দিয়ে ঢাকার বিলাসিতায় বাঁধ সাধল বিশ্বযুদ্ধ। ফলত একসময় যারা মল্লকচ্ছের জন্য নেটিভ শরীরকে নগ্নতার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন, তারাই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বস্ত্র-সংকটের সাথে যুঝতে হাফ-প্যান্টের মতো হাঁটু থেকে পায়ের পাতা প্রদর্শনকারী প্যান্টেও ছাড়পত্র দিলেন। যদিও জাহাজে করে ইউরোপ-ভ্রমণে বার হওয়া সুনীতিকুমারের মনে প্রশ্ন ছিল – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-বিদ্ধস্ত জার্মানদের মতো, বিজয়ী-পক্ষ ইংরেজরা পোশাকে-পরিচ্ছদে পুরোপুরি উদার হতে পেরেছিলেন কিনা।[53] কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি জানতেন, 'ইউরোপেও বড্ড বেশী কাপুড়ে হয়ে থাকার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে; এমন কি একেবারে বিবস্ত্র হয়ে কিছুকাল দল-বদ্ধ ভাবে কিছুকাল কোনও বনের উপকণ্ঠে বাস

[52] শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'পশ্চিমের যাত্রী (ইউরোপ ভ্রমণ, ১৯৩৫)', (কলিকাতাঃ মিত্র-ঘোষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), পৃ ৩৫।

[53] তাঁর ভাষায়, '...আমরা আপাতত এই জৈষ্ঠ্য মাসের গরমে, আরব সাগরে আর লোহিত সাগরে, হাফ-প্যান্ট বা পাতলুন, কামিজ বা গেঞ্জি, আর মোজা না পরে খালি পায়ে চপ্পল বা চটি বা ক্যাম্বিসের জুতো প'রে, পরম আরামে আছি। প্রায় সব ইউরোপীয় এই alfresco পোষাক প'রে দিন-রাত কাটাচ্ছে; খালি পায়ে চটি; শর্ট বা পেন্টুলেনের উপরে হাত-কাটা গলা-খোলা কামিজ – ব্যস্, এই পোষাকেও ডিনার খেতে পর্য্যন্ত ইংরেজ, জার্মান ইটালিয়ান, ভারতীয় কারো বাধছে না। ইংরেজের জাহাজ হ'লে পোষাক এতটা ঢিলা-ঢালা হওয়া বোধ হয় ঘ'টত না। এই গরমে ডেকের উপরেও কলার টাই এঁটে অন্ততঃ দুটো জামা – একটা কামিজ একটা কোট – গায়ে চড়িয়ে', মোজা আর ফিতে-আঁটা জুতো পায়ে প'রে, ব'সে ব'সে ঘামতে হ'ত, আর ক্যাবিনের ভিতরে গরমে এই পোষাকে মূর্ছা যাবার মতন অবস্থা হ'ত। আমাদেরই শ্রেণীতে একজন স্কচ পাদ্রি চ'লেছেন, গলায় উলটো কলার পরা। প্রথম রাত্রে নৈশ-ভোজের টেবিলে এলেন full canonicals চড়িয়ে' – কালো কোট প্রভৃতি, সব যেমনটী দস্তুর তেমনটী প'রে। কিন্তু তিনি একা প'ড়ে গেলেন। তার পর থেকে তিনি লাউঞ্জ-সুট প'রেই আসেন। খ্রীষ্টানীর সহিত ব্রিটিশ আভিজাত্য দুই-ই বজায় রাখবার সাধু চেষ্টা তিনি ক'রেছিলেন, কিন্তু 'জমানা বিগড় গয়া' – অবস্থা তাঁকেও মেনে নিতে হ'ল। ভূমধ্যসাগরে পৌঁছোলে পরে পোষাক-বিষয়ে এই রাম-রাজত্ব আমাদের থাকবে কি না, জানিনা। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে একটু ঠাণ্ডা প'ড়বে, তখন আর টাই কোট লাগাতে কষ্ট নেই।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ৩৬-৩৭।

করবার রেওয়াজও ইউরোপে এসে যাচ্ছে। এই Nudism বা নগ্নতা-চর্য্যা জার্মানিতে খুবই প্রকট; অনেক সাধারণ গৃহস্থ ও রুচিবাগীশের কাছে এটা একটা আতঙ্কের কথা হয়ে উঠেছে। মেয়ে পুরুষের নাইবার পোষাকে এখন এই Nudism যেন একটু প্রচ্ছন্ন-ভাবে এসে গিয়েছে। The cult of body – শরীর-সাধন – এই ধুয়া, এখন এইসব মত আর চর্য্যার পিছনে বিদ্যমান।'[54] অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ এসে কাপড়-চোপড়ের কড়াকড়ি নিয়মকে উল্টেপাল্টে দিল। সেই ওলট-পালট শুধু কিছু ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার প্রভাব ব্রিটেনের উপরও পড়েছিল। ইউরোপ-যাত্রায় জাহাজে ভ্রমণ করতে গিয়েই তিনি ঠারে ঠারে তা টের পেয়েছেন।

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ উদ্‌ভুত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটে জেরবার ইউরোপে আধুনিকতা ও সভ্যতার প্রকল্প নিয়ে দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমালোচনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগে সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করা ভারতের সামাজিকতায় সেই আধুনিকতা ও সভ্যতার প্রকল্প যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আনুগত্যের বীজ উপ্ত করে গিয়েছিল, তার ফল প্রকট হতে শুরু করেছিল। আধুনিকতা আনুগত্যের এই পোশাকি রূপখানা কিন্তু উনিশ শতক থেকেই বিকশিত হয়ে এসে স্বাধীনতা-উত্তর কালে অমন রূপ নিয়েছিল। সুতরাং এই দুটি রূপের চলনকে বিচ্ছিন্ন ভাববার কোনো কারণ নেই। আমরা মধ্যবিত্ত পুরুষের পারিচ্ছদিকতার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থ ধুতির উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করতে পারি – কিভাবে পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচার অনুবর্তী লজ্জা ও সম্ভ্রমের ধারণা মধ্যবিত্ত বলয়ের সামাজিক নির্মিতি ঘটাতে সহায়ক হচ্ছিল।

ধুতি: লজ্জা, সম্ভ্রম ও মধ্যবিত্ততার পোশাকি বলয়

লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে সেখানকার পোশাকি সামাজিকতার বিষয়ে স্বদেশী-কালীন সাজাত্যবোধে উদ্‌ভুত ইন্দুভূষণ শশধর রায়কে পাশ্চাত্য চিঠিতে লিখেছিলেন, '[এখানে] আপনি ভাল পোষাক পরে যান [,] আপনাকে gentleman ধরে নেবে যখন ব্যবহারে তার বিরুদ্ধ প্রমাণ না দেন। কিন্তু শুধু ব্যবহার ভাল ও খারাপ পোষাক করে যান [,] আপনাকে অবশ্য man এর right দেবে – gentleman privilege দেবে না।' এরপর তিনি স্বদেশের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'আমাদের দেশে যেমন "মশায়ের নাম জাতি ও পিতার নাম" জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক ঠিক করা যায় ...' (ছবি ৫.৩ দ্রষ্টব্য) এদেশীয় ভদ্রলোকত্বের একটা ছাপ্পা হিসেবে নাম-কূল-গোত্রের ভূমিকা ছিল তো বটেই, কিন্তু পাশ্চাত্য আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির প্রভাবে মধ্যবিত্ততার যে সামাজিক পরিসর তৈরি হচ্ছিল তাতে পোশাকি ভদ্রতার গুরুত্ব যে তৈরি হয়েছিল – তা এতক্ষণের আলোচনা থেকে কিছুটা হলেও

---

[54] তদেব, পৃ ৩৬।

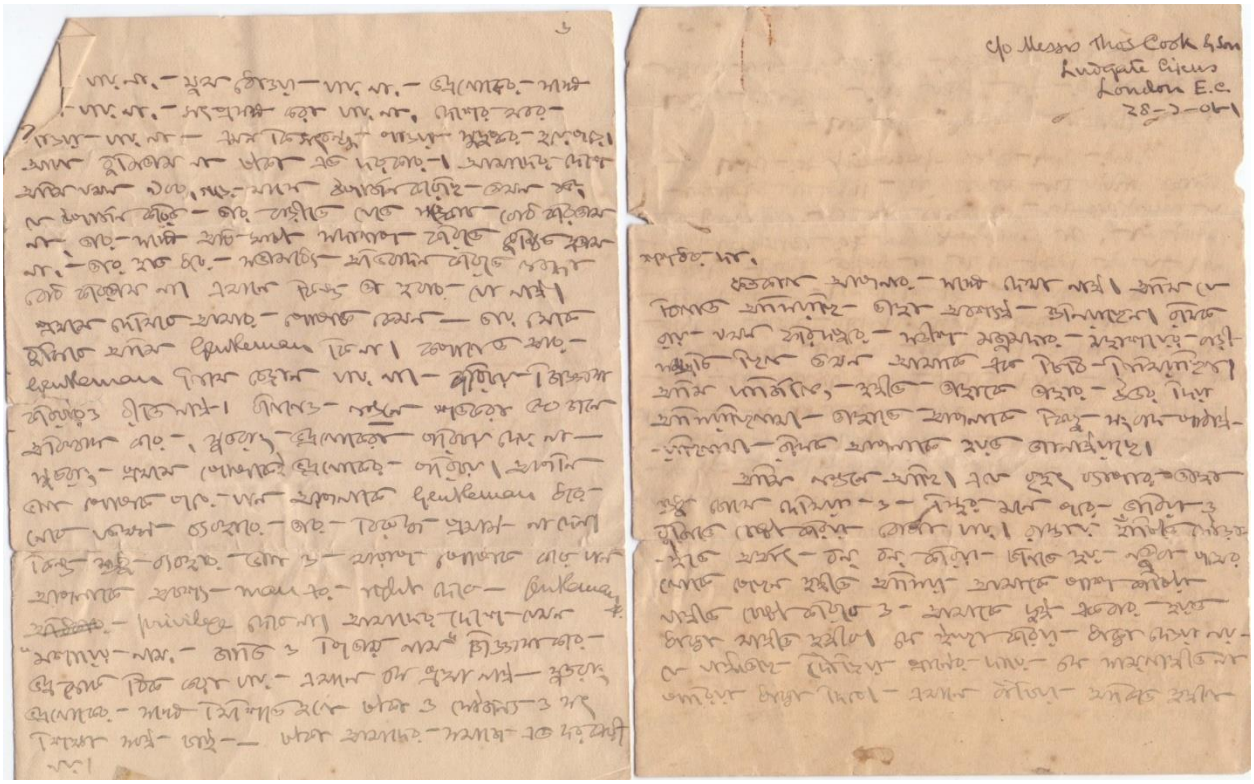
C/o Messrs Thos Cook & Son
Ludgate Circus
London E.C.

চিত্র ৫.৩: শশধর রায়'কে লেখা ইন্দুভূষণের চিঠির একটা অংশ (কৃতজ্ঞতা: ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)।

ধারণা করা যায়। স্কুলে, চাকরি-বাকরিতে ব্রিটিশ পোশাকি আদব-কায়দার লিখিত অলিখিত নানা কানুন মধ্যবিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, নতুন পোশাকি লজ্জা ও সম্ভ্রমের বিকাশের সাথে সাথে মধ্যবিত্তের সামাজিকতায় নানা বিভাজনেরও জন্ম হয়েছিল। মধ্যবিত্তের মধ্যেই অনেক প্রান্তিকতার জন্ম দিয়েছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ছোটগল্প 'কর্মফল'এর ১৩৩২ সালে প্রকাশিত নাট্যরূপ 'শোধবোধ'এ বাঙালি 'পস' মধ্যবিত্তের পোশাকি সম্ভ্রমের মধ্যে কিনারাটি সুন্দর ধরা পড়েছে। লাহিড়ি বাবু যখন সতীশের পোশাকি উপস্থিতিতে শিষ্টাচারের বিষয়ে বলেন – 'সেদিন চা-পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে এসেছিল যে তার মচ্ মচ্ শব্দে দেওয়ালের ইটগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক-এক সময় ভারি অকওয়র্ড হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজারগুলো – থাকগে, লোরেটোতে ছোটোবেলায় তোমার সঙ্গে [অর্থাৎ নলিনীর সঙ্গে] ও একসঙ্গে পড়েছিল, ওকে আমি কিছু বলতে চাই নে, ...।'[55] বোঝাই যাচ্ছে লাহিড়িবাবু মেয়েকে কলকাতার কনভেন্ট স্কুলে পড়িয়ে পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের মধ্যেকার শৃঙ্খলা,

55 "শোধবোধ", শর্মিলা ঘোষ সম্পাদিত 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ', ২য় খণ্ড, (কলকাতাঃ নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৩), পৃ ৮।

সম্ভ্রমের অনুপুঙ্খ অনুসরণের ধারাটিকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর দৃষ্টিতে যে কনভেন্টে পড়েও সেই শিষ্টাচার আত্মস্থ করতে পারেনি, তাকে নিজের 'পস' সমাজে হাজির করাও বিড়ম্বনার কারণ বলে মনে হয়েছে তাঁর।[56] তাই নলিনী যখন বলে '...সেদিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধুতি পরে আসতে বলব, আর দিল্লির জুতো – সে মচ্ মচ্ করবে না।' এর উত্তরে তখন লাহিড়ি বাবুর নিজের শ্রেণির পোশাকি সম্ভ্রম রক্ষার দায় ষোলো আনা জেগে ওঠে – 'ধুতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?'[57] নিজ শ্রেণির মধ্যেই পোশাকি রুচি চালিত এই কিনারাটিগুলি কিন্তু ছোটোগল্প, নাটকে কাল্পনিক নির্মাণ নয়। এই কল্পনার রসদ নাট্যকারের নিজের সময়। রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথাতেই বলেছিলেন, সেকালে মধ্যবিত্তদের দল কংগ্রেসের অধিবেশনে ধুতি-চাদর পরে গেলে মধ্যবিত্ত সহ-নাগরিকদের কিরূপ উপহাসের পাত্র হতে হত। তাঁর ভাষায় –

> ... বড় হয়ে বাবার মুখে শুনেছি। কলকাতায় সেবার কংগ্রেস হচ্ছে। নানান প্রদেশ থেকে বড় বড় নেতারা এসেছেন। দেশোদ্ধার কি করে করা যায় তাই নিয়ে ক'দিন ধরে তেজস্বী বক্তৃতা অনেক হয়ে গেছে কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্ম থেকে। হাট ভাঙার আগে স্যার তারকনাথ পালিত ঠিক করলেন তাঁর বাড়িতে নেতাদের ডিনার পার্টি দেবেন। ... আমার পিতাকে পালিত সাহেব কেবল সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, বিশেষ করে অনুরোধ করলেন নেতাদের বিনোদনের জন্য গান গাইতে হবে। গগনদাদাদের তিন ভাইয়েরও [গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ] নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল জোড়াসাঁকো-বাড়ি থেকে যা চারজন যাবেন একেবারে বাঙালী দস্তুরে ধুতি-চাদর পরে ডিনারে হাজির হবেন। ... ধুতি-পরা বাঙালী বাবুদের ডিনারে যোগ দেওয়া বিদেশী-ভাবাপন্ন কংগ্রেস-নেতৃবর্গের কাছে কিরকম উপহাসের বিষয় হয়েছিল অনুমান করা যায়।[58]

শুধু জাতীয় কংগ্রেসের মিটিঙই নয়, ভারতীয় মালিকের অভিজাত হোটেলে কোনো পার্টি বা ভোজসভার আগেও 'ন্যাশনাল' বা 'সাহেবী পোশাকে' অংশগ্রহণের নির্দেশিকা দিয়ে বিজ্ঞাপন

---

[56] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'পস' মধ্যবিত্তের এই মননবৃত্তি নিয়ে লিখেছিলেন, "ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,/ কর শীগগির ধুতিচাদর-নিবারণী সভা;/ প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে;/ ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে।" দ্রষ্টব্য, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, "প্রায়শ্চিত্ত্ব", কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত, 'সরস সার কথা', দুই খন্ড একসাথে, (কলিকাতাঃ গ্রন্থগৃহ, ১৩৫৩), পৃ ৫৭।

[57] "শোধবোধ", শর্মিলা ঘোষ সম্পাদিত, 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ', পৃ ৮।

[58] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছেলেবেলা", বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি', (কলকাতাঃ ক্যালকাটা বুক হাউস, মে ১৯৫৯), পৃ ১৪৩; প্রমথ চৌধুরী, "পথে প্রবাসে", প্রমথ চৌধুরীর 'ভ্রমনকাহিনী সমগ্র', (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ১৯৫৬), পৃ ১৯।

প্রকাশিত হত।[59] বলা বাহুল্য যে, এই ন্যাশানাল হল – ট্রাউজার, সেরেওয়ানি বা চাপকান এবং পাগড়ি -- যা অফিস-আদালতে ড্রেস কোডের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রচার করেছিল। সেখানে ধুতির কোনো স্থান নেই।[60] যেখানে এই ধুতিই ছিল মধ্যবিত্তের একটা বিরাট অংশের জাতীয় পরিচ্ছদ সদৃশ। অবশ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সেই ধুতি পরিধানের সাথে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সম্বন্ধ রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ ধুতি পরিধানেরও একটা সভ্যতানুসারী মানদণ্ড নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।[61] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতকের সাত আটের দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তের পরিচ্ছদশৈলী নিয়ে লিখেছেন, 'জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই পরতাম পাঁচ-হাত ধুতি ... তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুতিশাড়ির বহর-ওসার বাড়তে থাকে। দশ হাত লম্বা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহর ধুতিশাড়ি বড়রা পরতেন। আজকাল যাঁরা ধুতি পরেন তাদের সেই ধুতিগুলি ক'ইঞ্চি বা ক'ফুট বহরের তা বলা কঠিন – কারণ কোঁচা সব লুটিয়ে চলে।[[62]] আর যাঁরা কোঁচা দেন না, তাঁরা যেভাবে কাপড় পরেন তা না মল্লকচ্ছ, না ভদ্রসভার যোগ্য।'[63] বোঝাই যাচ্ছে যে, লেখক উনবিংশ শতকে তাঁদের ধুতি পরিধানের রুচির নিরিখে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের পুরুষের ধুতি পরিধানকে

[59] প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'কলকাতার ভারতীয় মালিকদের 'অভিজাত' হোটেলে বিজ্ঞাপন থাকে যে 'ন্যাশনাল' বা 'জাতীয়' পোশাক পরে অথবা সাহেবী স্যুটে হোটেলে প্রবেশ করতে পারেন, অর্থাৎ পায়জামা বা চোস্ত, সেরওয়ানী বা মাথায় গান্ধীটুপি হচ্ছে ন্যাশনাল ড্রেস। সেটা কর্তৃপক্ষের সহ্য হবে।। বাংলাদেশের বুকে বসে যে ব্যবসায় চলছে, সেখানে বাঙালীর ধুতিচাদর পরে প্রবেশ নিষেধ। রাণী এলিজাবেথ ভারত সফরে আসেন – জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবী ভোজ দেন। তিনি ঘোষণা করেন – ডিনার স্যুট পরে আসতে হবে। রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রী নিমন্ত্রিত হন। তিনি সাহেবী স্যুট পরে ভোজসভায় যেতে রাজী হলেন না – তখন কী পরিস্থিতি হয় তা স্মরণীয়।' প্রভাতকুমারের আলোচনায় মূলত স্বাধীনতার পরবর্তীকালের ব্যবস্থাপনায় 'কলোনিয়াল হ্যাঙ্গোভার' না কাটার দৃশ্য উঠে এসেছে। এই ধরণের বিষয় তো উপনিবেশিক সময়ে আকচার ঘটত। দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১১১।

[60] প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'আজকালকার মতো পাতলা ফিনফিনে ধুতির নীচে সাদা লংক্লথের ছোট ইজার পরবার রীতি তখন চালু হয়নি।' হতে পারে লংক্লথের ইজার বিহীন ধুতির বুনন ভেদ করে প্রকাশিত শরীরের চামড়ার রং দৃশ্য দূষণ ঘটাত বলেই, ধুতি পাশ্চাত্য শিষ্টাচারে 'দূষিত' তকমাপ্রাপ্ত। দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১১২।

[61] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১১০।

[62] রাজশেখর বসু কোঁচা দুলিয়ে মধ্যবিত্তের নিজেদের সম্ভ্রান্ত হিসেবে প্রদর্শনের মানসিকতার নিয়ে টিপ্পনী কেটেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাঙালীর কোঁচা একটা সমস্যা, পথ চলবার সময় অনেকেই বাঁ হাতে কোঁচার নিম্নভাগ ধরে থাকে। সেকালের ভারতীয় সুন্দরীদের হাতে লীলাকমল থাকত, মধ্যযুগের রাজাবাদশাদের হাতে গোলাপ ফুল বা শিকারী বাজপাখি থাকত, ভিকটোরীয় যুগের বিলাসিনীদের হাতে flirting fan থাকত…' আর আধুনিক কালে বাঙালি পুরুষের একহাতে ধুতির কোঁচার একাংশ ধরা থাকে। লেখকের বক্তব্য 'মানবজাতির কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ওসব অনাবশ্যক প্রথা লোপ পেয়েছে। বর্তমান কর্মময় যুগে পথচারী বাঙ্গালী কোঁচার দায়ে এক হাত পঙ্গু করেছে এই দৃশ্য অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। কোঁচার নীচের অংশটা কোমড়ে গুঁজলে ক্ষতি কি?' দ্রষ্টব্য, রাজশেখর বসু, 'আমাদের পরিচ্ছদ', পৃ ৮।

[63] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১১০।

বিচার করছেন। তাঁর মতে নতুন যে প্রজন্মের বিকাশ ঘটছে, তারা ধুতির কোঁচার সঠিক বিন্যাস করতে জানেন না। যার ফলে একটা পরিধানের ভদ্রতার গুণমান লঙ্ঘিত হয়। লেখকের ধুতি পরিধান সংক্রান্ত আলোচনা থেকে তাই উনবিংশ শতকীয় পোশাকি ভদ্রতার আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তিনি লিখছেন, 'আমরা ছোটবেলা স্কুলে যেতাম ধুতি পরে – কোঁচা দুলিয়ে। মালকোঁচা মেরে যারা পথে চলে তারা তো 'গুণ্ডা'![64][65] বাড়িতে ধুতি পরি ধড়া বেঁধে, অর্থাৎ কোঁচার অংশটা কোমরে জড়িয়ে।'[66] অর্থাৎ লেখকদের সময়ে ধুতির এক অংশ মালকোঁচা দিয়ে, আরেক অংশ সামনে কুচি করে দুলিয়ে দেওয়াই ধুতি পরিধানের শিষ্টাচার ছিল। আর যারা কোঁচা না দুলিয়ে দুই অংশই টেনে গোঁজ দিতেন, তাঁদেরকে ইতর প্রবৃত্তির মানুষ হিসেবে দেখা হত। সেদিক থেকে বিচার করলে, গায়ে-গতরে খাটা মানুষজন মধ্যবিত্ত দৃষ্টিতে ইতর জাতীয়। কারণ কোঁচা দুলিয়ে কাজ করা তাঁদের পক্ষে বিলাসিতা। আর লম্বিত কোঁচার সাথে মধ্যবিত্তের সামাজিক সম্মান এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, তাঁরা ঘরোয়া নিত্যকর্মেও ইতর জাতীয়দের মতন মল্লকচ্ছ রাখতেন না, বরং কাজেকম্মে সুবিধার জন্য কোঁচাটিকে কোমড়ের চারিপাশে জড়িয়ে নিতেন। উড্রফের মতানুযায়ী, পোশাকে-আশাকে এই একই সভ্যতানুরাগ থেকেই, বিলিতি শিষ্টাচার বা সাম্রাজ্যবাদী সরকার নির্দেশিত শিষ্টাচারে পা গলিয়ে দেশীয় ব্যক্তি বা ক্লাবগুলো নিজেদের 'glamour' প্রদর্শনের চেষ্টা করত, ঠিক একসময় তারা যেমন মেয়েদের পর্দানশীন করে রাখার মুসলমান শাসকের আচার অনুশীলন করে নিজেদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনের চেষ্টা করত।[67] আর এই গ্ল্যামারকে উৎকৃষ্ট হিসেবে মান্যতা দেওয়ার একটা প্রবণতা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে

---

[64] উনিশ শতকে এসে মল্লকচ্ছ ধুতি পরার ধরণ 'গুণ্ডামি' বা অশিষ্টাচারের লক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করলেও, এই প্রকারে ধুতি পরার ইতিহাসটা বাংলা দেশে বহুদিনের। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন , 'বাঙ্গালীরা বহুদিন পর্য্যন্ত কোঁচা পেছনে আঁটিয়া ধুতি পরিত, ... বাঙ্গালা প্রাচীন পুস্তকেও ঐ ভাবে সর্ব্বদা কাপড় পরিয়া থাকার কথা আছে। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয় সিংহলরাজ চাঁদ সদাগরের নিকট পট্টবস্ত্র পাইয়া তাহা বাঙ্গালী ভাবে পরিতে শিখিতেছেন "একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখানি মাথায় বান্ধে, আর একখানি দিল সর্ব্বগায়।" পূর্ব্ববঙ্গের লোক ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মালকোঁচা-মারা খোট্টার মত কাপড় পরিত।' সুতরাং সন্দেহ নেই যে, মোঘলী পোশাকি শিষ্টাচারের অনুশীলনের অগ্রগতি এবং পরবর্তীতে বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচারের অগ্রগমনের মধ্য দিয়ে মল্লকচ্ছের সাথে আঞ্চলিক পশ্চাদপদতার গ্লানি জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১), পৃ ৫৯০।

[65] আবার ধুতি পরার উনিশ শতকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও তাগিদ ছিল। শিলাদিত্য যেমন লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরাকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'ধুতি বাঙালীর নিজস্ব জিনিস। কিন্তু চাল যেমন বাঙালীর খাদ্য কিন্তু বাঙলায় দুর্লভ, তেমনি অবস্থা ধুতির। না পরলেই হয় নেহাত না পরলে নয়। সেইজন্যেই প্রায় দেখা যায় ধুতিটাকে পরা হচ্ছে লুঙ্গির মতো করে, নয়তো মল্লকচ্ছ করে কাবুলীদের সিলোয়ার প্যাটার্নে। ধুতি বলে চেনা দায়।' অর্থাৎ ধুতি পরিধানেরও একটা নিজস্ব শিষ্টাচার রক্ষিত হওয়া দরকার বলে লেখক মনে করেছেন। দ্রষ্টব্য, শিলাদিত্য, 'বসন-সঙ্কীর্তন', বসুধারা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭।

[66] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১০০।

[67] Sir John Woodroffe, 'Is India Civilized? Essays on Indian Culture', (Madras: Ganesh & Co. Publishers, 1922), pp. 196.

উঠেছিল।[68] এই উৎকৃষ্টতার এমনি এক সংজ্ঞা মধ্যবিত্ত সমাজ-মননে বিজারিত হয়েছিল, যার দরুণ এদেশীয় যা কিছু পাশ্চাত্যের পোশাকি সামাজিকতার দরুণ সংশ্লিষ্ট হয়েছে, তাকেই সামাজিক মান্যতার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছিল। ছবি ৫.৪-এর দিকে লক্ষ্য করলে তা খানিকটা বোঝা যায়। ডান দিকে দণ্ডায়মান যুবকের পরণে বিলিতি কাটের বেনিয়ান, তার নিচে আছে হাঁটু-ঝুল ওয়েস্টকোট, গলায় নেকারচিফ, পায়ে প্যাটেন্ট লেদারের বুট, টেরিকাটা চুল; বাম দিকে বসা অপেক্ষাকৃত কিশোরের গলাতেও নেকারচিফ, গায়ে বিলিতি কাটের বেনিয়ান, তার নিচে চাপকান, পায়ে প্যাটেন্ট লেদারের বুট, চুল টেরিকাটা। আর মধ্যিখানের প্রাপ্তবয়স্ক জনের পরণে কাফ শার্টের সাথে লঙকোট, ট্রাউজারস ও লেদার বুট এবং অ্যালবার্ট ফ্যাশনে চুল ফেরানো। সুসান নর্থ, প্যাট্রিশিয়া কানিংহাম, আরিয়েন ফেন্নেটক্স, ব্র্যাণ্ডন ব্রেম ফরচুন প্রমুখের গবেষণা থেকে উঠে আসে – অষ্টাদশ শতক থেকে বেনিয়ানের স্টাইলে কিছু কাট-ছাট করে ইউরোপীয় পুরুষের ফ্যাশনে বেনিয়ানের গুরুত্ব বেড়েছিল। আর সেই কাট-ছাট করা বেনিয়ানই আবার ইউরোপ থেকে ফিরে আসে এদেশীয় আধুনিক পুরুষের ফ্যাশনে।[69]

---

[68] তারাশঙ্কর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমাদের স্কুলে নতুন থার্ড মাস্টার এলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আগুনের শিখার মতো দীপ্ত একটি যুবা। ণুতন কালের ভাবধারা জীবনের কানায় কানায় ভরে নিয়ে এসেছেন। দ্বিজেনবাবু ইস্কুলে এলেন কোট-প্যান্ট পরে। সারা ইস্কুলটায় যেন মাছি ভনভন করে উঠল। ... রাধারমণ সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। সে হঠাৎ ক্লাশ থেকে উঠে চলে গেল হেড মাস্টারের কাছে। একবার ঘরের চাবিটা চাই। বিনা প্রশ্নে মাস্টারমশাই চাবি দিলেন। রাধারমণ চাবি নিয়ে হেড-মাস্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে তাঁর পুরনো চাপকান এবং প্যান্ট পরে এসে ক্লাসে গম্ভীর মুখে বসল। ... পরের ঘণ্টায় দ্বিজেনবাবু ক্লাশে এসে চাপকানধারী ছাত্রটিকে একটি বিশিষ্ট ছাত্র ধরে নিয়ে বহু প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করলেন। রাধারমণ নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।' বোঝাই যাচ্ছে, পরিবর্তনমান সামাজিক প্রেক্ষিতে, শাসকের পোশাক ও শাসক নির্দেশিত 'সভ্য' পোশাক কিভাবে বিভ্রমের জন্ম দিয়েছিল। দ্রষ্টব্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতিকথা', প্রথম খণ্ড, পৃ ১৪৬।

[69] Susan North, 'Indian Gowns and Banyans – New Evidence and Perspectives', *Costume*, Vol. 54, No. 1, 2020, pp. 30-55; Brandon Brame Fortune, '"Studious Men are Always Painted in Gowns": Charles Willson Peale's Benjamin Rush and the Question of Banyans in Eighteenth-Century Anglo-American Portraiture', *Dress*, Vol. 29, No. 1, 2013, pp. 27-40; Ariane Fennetaux, ''Indian Gowns Small and Great': Chintz Banyans Ready Made in the Coromondel, c. 1680 – c. 1780', *Costume*, Vol. 55, No. 1, 2021, pp. 49-73; Patricia A. Cunninghum, 'Eighteenth Century Nightgowns: The Gentleman's Robe in Art and Fashion', *Dress*, Vol. 10, No. 1, 2013, pp. 2-11.

ছবি ৫.৪: দেশি পোশাকের বিলিতি সংস্করণ (@CSSSC_Archive) [70]

কিন্তু তার মানে এমন নয় যে ধুতি পরা মধ্যবিত্তদের মধ্যে ‘পস’ চরিত্র সৃজনের দায় ছিল না বা ধুতির মাধ্যমেই নিজেদের মধ্যবিত্ত চরিত্র প্রকটের প্রবণতা ছিল না।[71] ‘কর্মফল’এর প্রায় সমসাময়িক লেখা (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’র অমিত চরিত্রটি যেমন। অক্সফোর্ড পাশ ব্যারিস্টার হলেও তাঁর দেশি কাপড়ই বেশি পছন্দ। না স্বদেশীয়ানা দেখানোর জন্য নয়। বরং ফ্যাশনের গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে, তাঁর শ্রেণির বাকিদের মতন কোট-প্যান্টালুনে সজ্জিত হয়ে সবাকার মতন না হয়ে দেশীয় পোশাককে নিজের অক্সফোর্ড-শিক্ষিত রুচির পরিশীলন দিয়ে

---

70 । “Studio Photograph from Family Album of Sesh Prakash Ganguly, 1920”, Studio/ Photographer – Anon, Collection of Siddhartha Ghosh, CSSSC Archive, Kolkata.

71 সুজয় রায় যেমন ঠাকুরদা হেমচন্দ্রের কথা বলেছেন। যিনি কিনা জমিদারীর শাণ দেওয়া বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিজের জীবনদর্শনে স্থান দেননি। যার মেজাজটা ছিল বঙ্কিমী। কিন্তু তিনি কোঁচা নিভাজ রেখে ধুতি পরতেন। আবেগের আতিশয্যেও তার ধুতি কখনো ভুড়ির নিচে নামেনি। এই হল তার মধ্যবিত্ত পরিশীলন। সেই পরিশীলন আবার নিজের পোশাকি পরিচিতি নিয়েও সচেতন। তাই নাতিদের প্যান্ট পরা নিয়ে তার আক্ষেপ। ‘নাতিগুলো কেন প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পরে না।’ কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে ততদিনে ধুতি বেয়াব্রু-জনক পরিধেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ নাতির ধুতি সম্বন্ধে ধারণা হল, ‘ওটা খুলে যায়’, তাই তার ধুতি পরতে ‘লজ্জা’ করে। দ্রষ্টব্য, সুজয় রায়, ‘সেই আয়না’, (কলকাতাঃ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ১৩৬৬), পৃ ১৮, ৩৬।

মেজে-ঘষে আপন স্টাইল তৈরি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[72] তাঁর ভাষায়, 'ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইল হল মুখশ্রী।' তাই সে 'দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না।'[73] নিজেদের শ্রেণি-চরিত্র জানান দিতে তাঁরা সকলেই কোট-প্যান্টালুনের ভেক ধরেন। যা কিনা একপ্রকার নিজেদের শ্রেণিকেই পোশাকি চিহ্নের উপর ভর করে গায়ে চাপানো। ওতে নিজস্বতা নেই। কিন্তু অমিতের 'ধুতি সাদা থানের যত্নে কোঁচানো।' যত্নে কোঁচানো' কারণ 'ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়।' ধুতির ওপর অমিত 'পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা।' বিলিতি সাজ অমিতের কাছে নিজের শ্রেণি-চিহ্ন প্রকাশকারী ফ্যাশন কারণ ওতে বাধা শিষ্টাচারের অন্যথা হলেই লাহিড়ি বাবুর মতন এটিকেট-নাজি'রা জাজ করতে বসে যেতে পারবেন না, তার মানে এ নয় যে বিলিতি ফ্যাশনে অমিতের নিজস্ব স্টাইলের প্রকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে – কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিসটিনঙ্গুইশড। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রুপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত।'[74]

---

[72] বিবেকানন্দের বিখ্যাত শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ধুতি-শাড়িতে পরিধানের গুণে নিজস্বতা দেখানোর সুযোগকে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, "বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারী কাপড় পরিবার সম্বন্ধে একটি মৌলিক কলাশিল্পের পরিচয় দিয়া থাকেন। সেই ভাবে ধুতি ও শাড়ী পরা বিদেশীরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। অথচ প্যান্ট বা ট্রাউজার কতকটা বালিশের খোলের মত, দরজীই সমস্ত কাজ করিয়া দেয়, যিনি পারিবেন, তিনি পা দুটি ঢুকাইয়া দিলেই তাঁহার কাজ শেষ হয়।" এইকারণেই অমিতের মতো মধ্যবিত্ত সমাজের একশ্রেণির কিছুজন তাঁদের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনে ধুতি-পাঞ্জাবিকেই হাতিয়ার করেছিলেন। দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১), পৃ ৫৯১।

[73] হয়ত এই একই কারণেই তারাশঙ্করের রাজনীতিমনস্ক বাবা বালক তারাশঙ্করকে বীরভূমের বসোয়া ও বিষ্ণুপুরের কাপড় পরাতেন। তাই দেখে সেকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, কংগ্রেস অনুগামী, বিদ্যাসাগর-ভূদেব-বঙ্কিম অনুগামী ইন্দ্রনাথ তারাশঙ্করের বাবাকে বলেছিলেন, '... হরিবাবু, এইজন্য আপনাকে এত ভালোবাসি। এখানে এসে দেখলাম ছোট ছেলেদের গায়ে আগাগোড়াই বিলিতি জামা পোশাক। আপনার ছেলের পরনে দেখছি ফরাসডাঙ্গা ধুতি-দেশি সিল্কের পাঞ্জাবি। ছেলে কাঁদেনি – জরিদার ভেলভেটের পোশাকের জন্যে?' শেষের প্রশ্নটি থেকে বোঝা যায়, সেকালে শিশুদের পরিচ্ছদপ্রেমে বিলিতি রুচির প্রতি কিরূপ আকর্ষণ বেড়েছিল, যা তাদের বায়নার মধ্য দিয়ে বাবার কাছে যে ঝরে পড়ত তা বোঝাই যাচ্ছে। দ্রষ্টব্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতিকথা', প্রথম খণ্ড, পৃ ১১৯।

[74] "শেষের কবিতা", শর্মিলা ঘোষ সম্পাদিত 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড', (কলকাতাঃ নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৩), পৃ ২৭০-২৭১।

ধুতির মাধ্যমে মধ্যবিত্তের সামাজিক স্বাতন্ত্র প্রদর্শনের যে রুচি, তার বাজারি মূল্যকে উপলব্ধি করে 'নয়নসুখ' জাতীয় ফিনফিনে ধুতি তৈরিতে ম্যানচেস্টারের ধুতি প্রস্তুতকারকরাও কিন্তু পিছিয়ে ছিলেন না।[75] বা বিলেত থেকে কলকাতায় এসে জামা-কাপড় বা বিভিন্ন বিলিতি পণ্যের বাজার ধরা কোম্পানিগুলোও পিছিয়ে ছিল না।[76] পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, স্বদেশীর পরে অনেক পাশ্চাত্য রুচি অনুরাগী দেশীয় ভদ্রলোকদের ধুতি পরার অভ্যাসের প্রতি বিরাগ কমলেও, পাশ্চাত্য রুচির আশ্রয়ে থেকে ধুতি পরিধানকেই তারা 'সফিস্টিকেশনের' একমাত্র পথ হিসেবে ভাবতেন। ধুতি পরলে পাশ্চাত্য-রুচির আশ্রয়টা কিভাবে থাকে – এ প্রশ্নটা জাগতে পারে। লেখকের বর্ণনা পড়ে মনে হয়েছে, কোট-প্যান্টালুন নাইবা পরা গেল, অন্তত বিলিতি কোম্পানির ধুতি পরলেও সেই সফেস্টিকেশনের দফারফা হয় না – ভাবখানা এরকম। তাই তেমন ভাবের একটা পরিবারে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার আগে লেখককে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ধুতি পালটে রেলি ব্রাদার্সের (এ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা আছে) ধুতি পরতে হয়েছিল। তা না হলে নিমন্ত্রণকর্তাদের রুচিকে অশ্রদ্ধা করা হয়। অর্থাৎ নিমন্ত্রণকর্তাদের রুচি যে পূজনীয়, তা বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি খুলে রেলির ধুতি পরার মধ্য দিয়ে প্রকট হল। লেখকের বর্ণনায় –

> নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য যে-যার তৈরি হচ্ছি, পাটভাঙা ধুতি পরে পাঞ্জাবিটা পরবার উপক্রম করছি, এমন সময় ননী এসে হাজির হল। কোঁচানো একখানা উৎকৃষ্ট থান ধুতি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'মেমসাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

---

[75] পরিতোষ সেন ১৯৩০ এর দশকে ঢাকা শহরের জিন্দাবাহার লেনের নামজাদা কবিরাজ প্রসন্নকুমার সেনের বাইরে বেরুনোর আগে প্রসাধনের কথা বলেছেন। সেই প্রসাধণ কলকাতার 'পস' মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে নাক-সিটকানোর কারন হতে পারে, কিন্তু নিজের সমাজের মধ্যবিত্তীয় স্বাতন্ত্র প্রকাশে সেই প্রসাধন গুরুত্বপূর্ণ। পরিতোষ সেন লিখেছেন, 'চৌকাঠের সামনে সেকেলে আয়না। আশেপাশে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম – ভাঁজ করা বিলিতি ক্ষুর, সাবান, বুরুশ ইত্যাদি। একটি ছোট বাটিতে কালো রঙের অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ। সকালের স্বচ্ছ আলোয়, জল-চৌকিতে ব'সে বৃদ্ধ, অথচ সবল, গুরুগম্ভীর এক পুরুষ। হাতে মিনিয়েচার টুথ-ব্রাশের মতো দেখতে একটি তুলি। এটি কালো রঙে ডুবিয়ে অনেক দিনের তা-দেয়া গোঁফে এবং পাট-করা চুলে বুলিয়ে দিচ্ছেন। গায়ে সাদা ফতুয়া এবং পাড়-ছাড়া কুচকানো ধুতি। পায়ে খরম! চুল-গোঁফের প্রসাধন সেরে কুচোনো ম্যানচেস্টারি 'নয়নসুখ' ধুতি এবং গিলে-করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পরলেন। ঘরের কোণ থেকে, মাথায় কারুকার্য-করা মোটা লাঠিটি হাতে নিলেন। চালচলনে বিশেষ তাড়া নেই। চুপ ক'রে কী ভাবতে-ভাবতে লাঠিটাকে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখলেন। দেখে মনে হ'ল যেন প্রসাধণের অনুবর্তিতায় কিছু একটা বাদ পড়েছে। পুরোনো, মস্ত বড়ো কাঠের আলমারি খুলে এক টুকরো তুলো, সুগন্ধি আতরে ভিজিয়ে, ডান দিকের কানে গুঁজে দিলেন।' এই পুরো প্রক্রিয়াটায় নিজেকে বাইরের সমাজে উপস্থাপনযোগ্য করে তোলার একটা বাসনা কাজ করেছে। আর সেই উপস্থাপনযোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যেসব উপকরণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তার কিছু নবাবি রুচির অনুবর্তী কিছু দেশী। কিন্তু সেই দেশীয় পণ্য অর্থাৎ ধুতিটি প্রস্তুত হয়ে এসেছে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে। সুতরাং মধ্যবিত্তের সামাজিক শরীরকে সেদিক থেকে পাঁচমিশেলি রুচিশীলতার ফসল বলা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য, পরিতোষ সেন, 'জিন্দাবাহার', (কলিকাতাঃ প্যাপিরাস, ১৩৮৬), পৃ ৪১।

[76] পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন', প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ১৯৫২), পৃ ১৬৯-১৭০।

> ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি ... বীরেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি?'
>
> বীরেন বলে চলল, '... যে ধুতি আপনি পরেন তা বড়বাসার নেমন্তন্নে অচল, তাই ... রেলিব্রাদার্সের থানধুতি একখান আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'
>
> 'কিন্তু কোঁচানো ধুতি ত আমি কখনও পরিনি', বীরেনকে জানালাম।
>
> বীরেন মন্তব্য করলে, 'চৌধুরীদের বড়বাসার নিমন্ত্রণেও কখনও যাননি। সব জিনিসেরই একটা মানানসই ব্যবস্থা হওয়া চাই ত! ...'
>
> বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতিখানি ছেড়ে অগত্যা রেলির কোঁচানো ধুতি পরে ফুলবাবু সেজে গেলাম, পায়ে পরলাম লাল চামড়ার পাঞ্জাবি নাগরাই।'[77]

কিন্তু পুজো-আচ্চায়, বাবুরা নিজেদের আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনে দেশি দামী কাপড় যেমন – তসর, শান্তিপুরী ও ঢাকাই ধুতি ব্যবহার করতেন। ঠিক আজকের কালের মতোই। বছরভর বিলিতি মিলের মিহি ধুতি পরে, পুজো-আচ্চায় দেশীয় দামী কাপড় ব্যবহারও ছিল আসলে মধ্যবিত্ত আয়েশ।[78] আজকের যুগের 'ethnic wear'এর মতো গালভরা নামের উন্মেষ তখনও না ঘটলেও, সেই নামের ভাবটা কিন্তু তখন থেকে রূপ পেতে শুরু করেছিল।[79]

---

[77] তদেব।

[78] কীর্তনের আসরে তাই ব্যারিস্টার চ্যাটার্জী মশায়ের পরণে আদ্দির পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি দেখে কীর্তনিয়া ব্যঙ্গ করে ধুন তুলেছেন, 'হরি হরি! এ কি দেখিলাম! ... ঐ দেখ, সিঁড়ি পার হইয়া হলে ঢুকিবার পথে প্রথম থামটার পাশেই শান্তিপুড়ে কালাপাড় ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি পরিহিত ঐ যে সুগৌরকান্তি সুশ্রী ব্যক্তি , গলায় বেলের সরু মালা, গোঁফ কামানো, মাথায় মস্ত টাক, খালি পা – উনিই মিঃ চ্যাটার্জী, বার-র্যাট-ল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ভারত ষ্টীম নেভিগেশন। ভারত নেভিগেশন চাট্টিখানি কথা নয়। খাস বিলাতী পি-এন-ওর সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতেছে – দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ। ... দিল্লীশ্বরো বা জগদীস্বরো বা! কড়া মনিব ও দুর্দ্দান্ত সাহেব বলিয়া মিঃ চ্যাটার্জীর নামে সমাজের ঘাটে ও আঘাটে, বাঘ, গরু, হরিণ, ভেড়া – একসঙ্গে জল খায়। এহেন চ্যাটার্জী সাহেব ধুতি, পাঞ্জাবি, খালি পা! সুরেন্দ্র বন্দ্যো বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছেন, তর্কানন পঞ্চরত্ন বা ফণী তর্কবাগীশ টিকিহীন হইয়াছেন একথা বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, প্রবলপ্রতাপ চ্যাটার্জী সাহেব – লণ্ডনের বণ্ড ষ্ট্রীট-মেক স্যুট না পরিয়া ধুতি, পাঞ্জাবি! আবার বলি, হরি! হরি! কি দেখিলাম!' দ্রষ্টব্য, শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার, 'কীর্তন', ভারতবর্ষ, ২৯শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃ ২৯৫।

[79] হুতোম লিখেছেন, 'এবার অমুক বাবুর বাড়িতে পুজোর ভারি ধুম। প্রতি প্রদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে। ... বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হব্যাশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত অনবরত নস্য নিচ্চেন ...' পুজো উপলক্ষে আয়েসের বহর কল্পনা করা যায়। দ্রষ্টব্য, নবকুমার ভট্টাচার্য্য ও বাসুদেব মোশাল, 'পুরাতনীঃ পুজো নিয়ে পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন', (কলিকাতাঃ অভিনব প্রকাশনী, ১৩৫৯), পৃ ৪।

পাশ্চাত্য আধুনিকতা-অনুগামী ব্যস্ত মানুষের জীবনে প্রতিটি ক্ষণ যতই অমূল্য হয়ে উঠতে থাকে, ততই ধুতি পরার পিছনে সময় দেওয়াকেও ‘অপচয়’ বলে বোধ হতে থাকে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ধুতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ধুতি পরিধান করতে যে সময় ব্যয়িত হয়, আবার সেই ধুতির কুচি বিন্যাস করতে ও চলাফেরার সময় সেই বিন্যাস রক্ষা করতে যে বেগ পেতে হয় – তার কথা ভেবে প্যান্ট-ধুতির উদ্ভাবন করেন। যা কিনা প্যান্টের মতোই চট্ পরে নেওয়া যেত এবং যার কুঁচি বিন্যাস ঠিক রাখার জন্য ক্লিপ বা বোতাম ব্যবহার করা হত।[80] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নবতর পোশাকের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছিলেন, “তিনি পাজামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। ... এরূপ ... পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে গ্রহণ করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন – আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রুক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।”[81] কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, রাস্তাঘাট ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ভিড়-ভারিক্কি অতিক্রম করে অফিস-কাছারি বা অন্যান্য কাজকম্মে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ততই বেড়েছে এবং প্রলম্বিত কোঁচা রেখে চলা ততই দায় হয়েছে। ১৯৪০ এর দশকে প্রকাশিত একটি গল্পে দেখা যাচ্ছে, পাবলিক বাসের ভিরে কোঁচা নিয়ে বেজায় বিপত্তি। সকলেই অন্যের কোঁচা ধরে টানছেন, নিজের কোঁচার টিকিটি পাচ্ছেন না। শেষে কোঁচা উদ্ধারের পর গল্পের এক চরিত্র বলছেন, ‘এবার থেকে ঠিক করেছি কোঁচা মালকোঁচার পাট একেবারে তুলে দেব। বাড়িতে পরব লুঙ্গি বাইরে প্যান্ট।’[82] ১৯২০র দশকে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এক দেশীয় সংবাদপত্র তো বলেই দিল, আঁটসাঁট পোশাক-আশাক শুধু আধুনিক যুগে সময়ানুবর্তিতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার পক্ষেই উপযুক্ত নয়, তার সাথে বাচ্চাদের ছুটোছুটির পক্ষেও উপযুক্ত, সুতরাং স্বাস্থ্যবান ভবিষ্যত চাইলে বাচ্চাদের আঁটসাঁট পোশাকে পড়ানোর অভ্যাস করতে হবে। লেখাটির ভাষায় , ‘পরিচ্ছদ যত আঁটসাঁট হবে ততই বেশী ছুটাছুটীর সুযোগ হবে, তার জন্যে গায়ে বল বাড়বে, কাজের সুবিধা হবে। আমরা যখন ছোট ছেলেদের কোঁচা দুলিয়ে কাপড় পরিয়ে দিই তখন তারা ধীরে ধীরে দুলে দুলে চলতে থাকে, আর যখন হাফ-প্যান্ট পরিয়ে দিই তখন বেশ ছুটাছুটী করে বেড়ায়। অভিভাবকগণকে মনে রাখতে হবে ছেলেপিলেদের যথেষ্ট ছুটাছুটী করবার সুযোগ

---

[80] অসিতকুমার হালদার, “সাবেকী কথা”, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’ (কলকাতাঃ ক্যালকাটা বুক হাউস, মে ১৯৫৯), পৃ ১৩১।

[81] সমুদ্র গুপ্ত, ‘বঙ্গ ভঙ্গ’, (কলিকাতাঃ আনন্দধারা প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৭৫), পৃ ১১৯।

[82] শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত, ‘কান নিয়ে গেল কাগে’, ভারতবর্ষ, ৩৩ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫২, পৃ ২৯৫।

দেওয়া চাই।’[83] অর্থাৎ লজ্জা, সম্ভ্রম তো আছেই, উপযোগিতার সংজ্ঞা পাল্টানোর সাথে সাথে পোশাকি উপযোগিতাও তার ভোল বদল করতে শুরু করেছিল।

যাই হোক, রবীন্দ্র সাহিত্যে মধ্যবিত্ত ‘পস’ শ্রেণির মধ্যে ধুতির এই দুইরকম উপস্থাপনায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির দুই রকম মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। প্রথম মানসিকতা সম্পূর্ণ রূপে পাশ্চাত্য ঘেঁষা, স্কুলকলেজে, ইংরেজ সরকারের চাকুরিতে যে পোশাকি শিষ্টাচার তোতার বুলির মতো শিখানো হত – তারই প্রতিনিধিত্ব করে। আর দ্বিতীয় মানসিকতা সেই ছককে ভেঙ্গেছে। কিন্তু যে ছক তৈরি করেছে, সেটাও মধ্যবিত্তের নতুন পোশাকি পরিচিতি। সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত পরিশীলনে এবং পূর্ববর্তী দরবারি পরিশীলনে দেশীয় পোশাককে জারিত করে মধ্যবিত্ত শরীর এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে শরীর ফ্যাশনের মধ্যবিত্তীয় বৃত্তকে আরো প্রসারিতই করেছে। ফ্যাশনের মধ্যবিত্তীয় বৃত্ত থেকে খসে পড়েনি। ছবি ৫.৫-এর ১৮৯০ এর দশকের ফটোগ্রাফটির প্রত্যেক পুরুষ চরিত্রই যেমন

ছবি ৫.৫ ও ৫.৬: মধ্যবিত্ত পুরুষের মান্য পোশাকি অবয়ব ও সময়ের আধুনিক অনুশাসন যন্ত্র – পকেট-ঘড়ি [84] [85]

---

[83] ‘খদ্দর ও পরিচ্ছদ সমস্যা’, মাতৃ-মন্দির পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ ২৫৯।

লম্ব-কোঁচা ধুতি, সাদা পিরাণ, কলার, স্টিক এবং অ্যালবার্ট ফ্যাশনে সজ্জিত। তাঁদের সাথে আছেন নিজেদের আধুনিকতার বৃত্ত-সম্পূর্ণকারী লম্বা-হাত জ্যাকেট (ব্লাউজ) পরিহিত পরিবারের আধুনিকা মেয়েরা। উনিশ শতকের শেষ থেকে এইধরণের পোশাককে বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের মান্য রূপ হিসেবে ধরা যায়। তার সাথে সময়ের আধুনিক অনুশাসন মাপার যন্ত্র পকেট ঘড়িও থাকা চাই (ছবি ৫.৬ দ্রষ্টব্য)। গিলে করা ধুতি-পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে উক্ত মান্য পোশাকি পরিসরে নিজের নাম লেখাতে গিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবকদের যে তাঁদের উর্দ্ধতনের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে – এমন উদাহরণও কম নেই। শ্রীগৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য-এর লেখায় তার প্রকাশ মেলে – '... ওই ছোকরা যা রকম ঠাট দেখিয়ে ঢুকল সেটা ওকে মানায় না, ওই পাঞ্জাবি দিয়ে ও নিজের দৈন্য ঢাকতে চেষ্টা করছে ... গিলে করা ঢিলে পাঞ্জাবি পরবার আগে তো সঙ্গতির দিকে তাকাতে হবে! ও একটা আই. বি.-র ইনফর্মার। ওর মুখে বিড়ি আর গায়ে খাটো খাকী হাফশার্ট থাকাই উচিত।'[86] নিম্নমধ্যবিত্ত একজন যুবকের নিজ অবস্থাকে মেনে নিতে না পারার যন্ত্রনাটা আরেকটি দ্যোতনায় ধরা পড়ছে এইভাবে, '... ও একটা চুরুট কিনে তিনদিন চালায়। ... নিজের চোখে তো ধরা পড়বার ভয় রয়েছে, সেই জন্যে মোটা চুরুট লাগিয়ে নিজের চোখে ধোঁয়া দিচ্ছে।'[87] উটপাখির মতো মাটিতে মুখ গুঁজে ঝড় মোকাবিলার ব্যর্থ চেষ্টা বা ভুলে থাকার চেষ্টাও হতে পারে। যদিও একান্ত প্রাত্যহিক যাপনে সেই ঝড় থেকে নিস্তার নেই।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাশ্চাত্য শিষ্টাচারাণুগ ধুতি পরিধানের মধ্য দিয়ে স্টাইলের স্বাতন্ত্রে নিজেদেরকে অভিষিক্ত করবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঔপনিবেশিক শাসকের দরবারি বা অফিশিয়াল পরিসরে কিন্তু ধুতি সম্ভ্রম লাভ করতে পারেনি। রাজদ্বারে এবং সাদা-চামড়ার মানুষের চোখে কিন্তু এই ধুতি পরিহিত দেশীয়দের নিচু নজরেই দেখা হত। সরকারি নথিপত্রও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য রেখেছে। ১৯১১ সালে বাংলার দু'জন পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্বভৌম এবং রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের বেলভেডেরেতে রাজার সম্মানিত Levee তে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। আর সেই Levee তে তাঁদের পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের উপযুক্ত পরিচ্ছদ নির্ধারণ করে দিয়ে চিঠি চালাচালি হয়েছিল।[88] যে চিঠির মূল উদ্দেশ্য ছিল – Levee তে নেটিভ মহোদয়দের

---

[84] "A Family Photograph", Studio/Photographer- Anon, I-55, Family Album of D.N. Mitra, Collection of Siddhartha Ghosh, CSSSC Archive, Kolkata.

[85] Ranabir Ray Choudhury, 'Early Calcutta Advertisements, 1875-1925', (Bombay: Nachiketa Publication Ltd., 1992).

[86] শ্রীগৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য, 'অ্যালবার্ট হল', শনিবারের চিঠি, ২৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৯, পৃ ১৬৪-১৬৫।

[87] তদেব, পৃ ১৬৪।

[88] From – Military Secretary to the Viceroy, To- The Lieutenant-Governor of Bengal, Calcutta, Telegram No- 1030, Dated 4.11.1911, President's Secretariat Department, General Branch, National Archives of India, New Delhi.

ধুতি পরে যাওয়া যে চলবে না, তাদের যে ট্রাউজার ও পেটেন্ট লেদারের বুট পরে উপস্থিত হতে হবে – তা Levee অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেভাগে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া। ভাইসরয়ের মিলিটারি সেক্রেটারির দপ্তর থেকে আসা নির্দেশিকাটি বাঙালি মহোদয়দের সামনে পেশ করা হলে মহোদয়রা জানান – তাঁরা ট্রাউজার পরিধান করে দরবারে যেতে পারবেন না। কারণ রাজদ্বারে তাঁদেরকে আগে খিলাত হিসেবে ধুতি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। তার মানে তাঁরা আগে ধুতি পরিধান করে রাজদ্বারে গিয়েছেন এবং নজরানা হিসেবে ধুতি পেয়ে রাজদ্বারে সম্মানিতও হয়েছেন। তাই তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে – সেই নিয়মে আবার পরিবর্তন কেন! কিন্তু ভাইসরয়ের মিলিটারি সেক্রেটারিকে তাঁরা গভর্নরের অফিসের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন -- দরবারে নিজেদের সমস্ত শরীর দেশীয় বস্ত্রে ভালোভাবে ঢেকে যে তাঁরা উপস্থিত হবেন, এতটুকু নিশ্চয়তা তাঁরা দিতে পারেন।[89] কিন্তু এই চিঠির প্রত্যুত্তরে বাংলার লেফটেন্যান্ট গবর্নরের ব্যক্তিগত সচিব Williams কে মিলিটারি সেক্রেটারি F.A. Maxwell একটি গোপনীয় চিঠিতে লিখেছিলেন, -- '…It has been the unwritten law at Government House not to admit anyone wearing a dhotie and I much regret that I can only admit them if they will conform to the dress regulations and wear trousers with patent leather boots.'[90] অর্থাৎ সরকারি অফিস-আদালতে একটা অলিখিত নিয়মই হল ধুতি পরিহিতদের ভেতরে ঢুকতে না দেওয়া। আর এই অলিখিত কিন্তু পালিত নিয়মটি যদি উক্ত দুজন বাঙালি মহোদয় পালন করে দরবারে আসবেন বলে কথা দিতে না পারেন, তবে একজন সরকারি আধিকারিক হিসেবে তিনি তাঁদের দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবেন না। এমন নয় যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার নিজেদের অনমনীয় চরিত্র প্রদর্শন করবার জন্য ধুতি পরে লিভি কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন না। স্বদেশীর আগে থেকেই এই ধারা চলে আসছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে বড়লাট লর্ড কার্জন কলকাতায় আসলে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে শুভেচ্ছাবিনিময় ও নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করতে যান। সেই দলে ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দেশনায়ক। কিন্তু সেই দলভুক্ত হয়েও তাঁর জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কেবলমাত্র ধুতি, পাঞ্জাবি এবং নাগরা পরিহিত ছিলেন বলে, লাটভবনে প্রবেশাধিকার পাননি।[91] সুতরাং দেশীয় পরিচ্ছদের উপর ভিত্তি করে বিদেশী ক্ষমতার সাকারায়ণ কিভাবে ঘটেছিল – বোঝাই যায়। উনিশ শতক জুড়ে উপনিবেশিক ক্ষমতার সাকারায়ণের তুঙ্গস্পর্শী সময়েও যে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছিল না – তাও বলা যাবে না। বিদ্যাসাগরের

89। From – Lieutenant Governor of Bengal, To – Military Secretary of Viceroy, Telegram No -4, Dated -14.11.1911, President's Secretariat Department, General Branch, National Archives of India, New Delhi.

90। From – Lt. Col. F. A. Maxwell, Military Secretary to the H. E. Viceroy, To- The Private Secretary to H.H. the Lieutenant-Governor of Bengal, Confidential, Dated 27.11.1911, President's Secretariat Department, General Branch, National Archives of India, New Delhi.

91 বিমান বসু সম্পাদিত, 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর', (কলকাতাঃ বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার কমিটি, সেপ্টেম্বর ১৯৬০), পৃ ১২৩।

কথাই যদি ধরি -- ধুতি-চাদর এবং নিজস্ব ধরণের 'তালতলার' চটি পরে লাটভবনে যাতায়াতের যে ছাড়পত্র তিনি আদায় করেছিলেন, তার পশ্চাদে ছিল তাঁর ব্যক্তি-ক্যারিশ্মা। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে পোশাকি চেতনার উদয় বিশ শতকের প্রথম দশকে দেখা গেছে, তার বহু আগে বিদ্যাসাগরের মধ্যে সেই সাহসের বিচ্ছুরণ ঘটেছিল।[92]

যদিও ধুতি নিয়ে শাসক-শাসিতের এই দ্বন্দ্বের মহাফেজখানানির্ভর একটা পূর্ণ ব্যাখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ উক্ত শেষ চিঠিটির প্রত্যুত্তর কি হয়েছিল – তা জানানোর জন্য আর কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ঘটনা জানা না গেলেও, আমাদের আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য এতটুকু তথ্যপ্রমাণও অপ্রতুল নয়। এক্ষেত্রে দুটি দিক লক্ষনীয় – প্রথমত, দুজন বাঙালি পণ্ডিতই ট্রাউজার পরে দরবারে যেতে অস্বীকার করেছেন। কারন পূর্বে খিলাত হিসেবে ধুতি দিয়ে তাঁদেরকে দরবারে সম্মানিত করা হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, সরকারি আধিকারিক খিলাত হিসেবে ধুতি প্রদানের পূর্বেকার বিষয়টি কানে না তুলে তাঁর নির্দেশিকার জবানে স্থির থেকেই বলছেন — Levee তে আসতে চাইলে ট্রাউজার-বুট পরেই আসতে হবে। শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড়, তা এই চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়। সময় এখানে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এবং তার মধ্য দিয়ে স্বদেশীর আদর্শ এদেশীয়দের যাপনের অঙ্গ হয়ে ওঠায় বাঙালি ভদ্রমহোদয়গণ দরবারে ট্রাউজার-বুট পরিধাণ করতে অস্বীকার করে থাকতে পারেন। আর স্বদেশী আদর্শের বিস্তার এবং তার বিপ্লববাদে পর্যবসিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শাসিতের বস্তু-শরীর ঔপনিবেশিকদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে – এই ভয় থেকেই হয়ত একদা খিলাত হিসেবে ধুতি প্রদানকারী শাসক, দরবারে ধুতি পরে প্রবেশের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কারন যাই হোক না কেন, এইভাবে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রে ধুতিকে অশিষ্টাচারের চিহ্ন হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নিজেদের সভ্যতার প্রভুত্বকে জানান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শাসক-শাসিতের ইগোর লড়াই যখন কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধে, তখন উভয় পক্ষই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিভাজনের জিকিরকে স্পষ্ট করে নিজেদের ভার প্রদর্শনের চেষ্টা করে। তখন পোশাকি সম্ভ্রমের সাথে যেটা যুক্ত হয়, সেটা হল – আত্ম-পরিচয় রক্ষার তাগিদ। বলা ভালো, তখন পোশাকের মধ্য দিয়ে আত্ম-পরিচয় জানান দেওয়াটাই লজ্জা ও সম্ভ্রমের আদর্শের সাথে জুড়ে যেতে থাকে।

এপ্রসঙ্গে ১৯২০ সালে প্রকাশিত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর বিলাত ভ্রমণের প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। যিনি কি না ধুতি আর চটি জুতো পরে বিলাত যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন – 'ধুতি চটী জুতা পরিয়া বিলাত যাইবার জন্য কেহ বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন কিনা প্রত্নতত্ত্বে তাহার প্রকাশ নাই। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এই বেশে যখন হাওড়ায় গাড়িতে

[92] তদেব, পৃ ১২৩।

উঠিলাম, আমার কোন ইংরেজ সহযাত্রীর সে দৃশ্য মনঃপূত হইল না। যাঁহারা বিদায় দিতে গিয়েছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেশীয় ব্যারিস্টার ও দুই একজন উর্দ্ধতন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ছাড়া সকলেই ধুতি চাদর পরা ছিল; উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর উপস্থিতিতেও সে দোষের খণ্ডন হইল না। আমার সহযাত্রী ইংরাজ, ষ্টেশন মাষ্টারের সাহায্যে, নিজের তল্পিতল্পা অপর গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়ায় উভয়েরই বেশ সুবিধা হইল। সাহেবটির নাম গাড়ীর রিজার্ভ টিকিটেই আমার নামের নীচে লেখা ছিল। তিনিও Hon'ble; তবে সাধারণ Hon'ble নহেন। তাহার পিতা বিলাতের Lord, ভারতবর্ষের কোন সওদাগর আপিসের তিনি অংশীদার। Lordএর পুত্র হইয়াও নিম্নশ্রেণীর ইংরেজসুলভ বাঙ্গালী বিদ্বেষের হাত এড়াইতে পারেন নাই। ধুতি চটী জুতা পরা বাঙ্গালীর সহিত অন্ততঃ কলিকাতার লোক চক্ষু সম্মুখে এক গাড়ীতে যাওয়া তাঁহার অসহ্য।'[93] সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ধুতি পরিহিত নেটিভ সহযাত্রীর প্রতি ইংল্যাণ্ডের জনৈক লর্ডের পুত্রের আচরণকে হীন চরিত্রের ইংরেজের পরিচায়ক বলেছেন। যেহেতু তাঁকে বিলাত যাত্রায় এগিয়ে দেওয়ার জন্য কয়েকজন গোরা রাজকর্মচারী এসেছিলেন, সেহেতু তাঁর মনে হয়ে থাকতে পারে যে ইংরেজের রাজধর্ম ও সম্ভ্রমের আদর্শে ধুতি পরিহিত নেটিভ শরীরকে তাচ্ছিল্য করবার বিধান নেই। কিন্তু নেটিভ পণ্ডিতদ্বয়ের দরবারে অংশগ্রহণের উপর পোশাকি বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়টি থেকে স্পষ্ট, ঔপনিবেশিক ইংরেজের রাজধর্মে পোশাকি বিভাজনের একটা সুগঠিত জায়গা ছিল। হয়ত সবসময় ড্রেস কোডগুলোতে তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকট হত না। কিন্তু প্রয়োজননানুসারে সরকার বাহাদুর তা প্রকট করতেন।[94]

---

[93] শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, 'য়ুরোপে তিনমাস', (কলিকাতাঃ ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৯২০), পৃ ৮-৯।

[94] ঔপনিবেশিক সরকারের রাজধর্মে পোশাকের উপর নির্ভর করে নেটিভদের চাইতে নিজেদের শিষ্টাচারের উৎকৃষ্টতা জাহির করবার একটা প্রবণতা থাকলেও এবং সেই প্রবণতা ভারতে বসবাসরত কিছু ইংরেজদের মধ্যে সংক্রামিত হলেও, সব ইংরেজকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল, তেমনটা বলা যাবে না। সর্ব্বাধিকারী একজন ইংরেজ সৈনিকের কথা লিখেছেন। যার সাথে বিলেত যাত্রাকালে হাজারিবাগে ট্রেনের কামড়ায় দেখা হয়। তিনি লিখেছেন, 'মধ্যরাত্রে হাজারিবাগে বন্দুক তোষদান লইয়া একজন সৈনিক কর্ম্মচারী সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইলেন। তাহাকে ধুতি চটী জুতা দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ ও সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কক্ষান্তর গমন প্রয়াসের চিহ্নমাত্র দেখাইলেন না। ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখাইতেও তিনি কৃপণতা করেন নাই। সমস্ত পথ বাইবেল পড়া, ভগবদারাধনা ও সদালাপ ছাড়া তাঁহার অন্য কাজ ছিল না। অপর শ্রেণীর ইংরেজের ইতর ব্যবহারে ইংরেজ-সুনাম ও ইংরেজ-শাসনের যে দারুণ ক্ষতি করে এই শ্রেণীর ইংরেজের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও প্রায়শ্চিত্ব হয়। ...' দ্রষ্টব্য, শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, 'য়ুরোপে তিনমাস' পৃ ১১-১২।

ইংরেজের রাজধর্ম বিভাজনমূলক নাকি ঐক্যবিধায়ক – তা নিয়ে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সংশয় জন্মানোর আরেকটা কারণ হতে পারে, হাইকোর্টের জজ হিসেবে ১৯২০র দশকে 'ভারতবন্ধু' হিসেবে পরিচিত John Woodrooffe এর হিন্দু জীবনাচরণ সম্বন্ধে নানা গল্প চাওর হওয়ার কারনেই হয়ত। কারন ইংরেজ সরকার একদিকে যেমন দরবারে ধুতি পরিধানকারী দেশীয়দের প্রবেশে বাধা দিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের নাকের ডগা নিয়ে হিন্দু আদর্শ, আইন-কানুনে বিভোর হয়ে ভারতীয় জীবনাচরণ করতে থাকা উডরফ সাহেবের চালচলনের উপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন বলেও শোনা যায় না। যেরূপ ১৮৩০ এর দশকে ফারুকাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রেড্রিক জন শোরের ভারতীয় ধরণের পোশাক পরে রাজকার্যে অংশগ্রহণ বন্ধ করতে, এদেশে ব্রিটিশ অফিশিয়ালদের জন্য অফিশিয়াল

উপরের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে, বিলিতি শিষ্টাচার বিরোধী, ত্বকের বর্ণ দৃশ্যমান হওয়া হালকা কাপড়ের ধুতি ছেড়ে প্যাণ্টালুন পরিহিত নেটিভদের হয়ত সাদা-চামড়ার মানুষদের দ্বারা বিদ্বেষের শিকার হতে হয়নি, যেহেতু তাঁরা শাসকশ্রেণির পোশাকি শিষ্টাচার ও সম্ভ্রমকে সম্মান করে তাঁদের সামনে তাঁদের মতো করেই পোশাক পরে হাজির হয়েছেন। পাগড়ি বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের অবস্থান বুঝতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, সরকার বিলিতি শিষ্টাচারকে নেটিভদের কাছে অগম্য হিসেবে পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছিলেন। ধুতির ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই মানসিকতার প্রতিফলন পাই। সাধারণ ইংরেজের মনেও ঔপনিবেশিক পরিচালনব্যবস্থায় বিভাজনের মূল সুরটা এমনভাবেই বিস্তারলাভ করেছিল যে, তাঁরাও নিজেদের কর্তৃত্বময় রাজনৈতিক শরীরকে নির্দিষ্ট করে, এমন কোনো চিহ্নের সাথে নেটিভদের শারীরিক সংযুক্তিকে বরদাস্ত করতে পারেননি অনেকসময়। ট্রেনে-জাহাজে ধুতি পরিহিত নেটিভ দেখলে নিজেদের কৌলিন্য রক্ষার দায়ে, ধুতি পরিহিতদের সাথে একই কামড়ায় ভ্রমণ করতে তাঁরা অস্বীকার তো করতেনই, তার সাথে সাথে প্যান্টালুন পরিহিত নেটিভদেরকেও তাঁরা যেকোনো অজুহাতে অপমান করতে ছাড়তেন না। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বর্ণনা থেকে তার একটি স্বরূপ দেখা যাক – '... বম্বে প্রেসিডেন্সিতে এক ... দৃশ্য দেখিলাম। ... দুইজন রেলের বড় কর্ম্মচারী আমাদের গাড়ি আক্রমণ করিলেন। মিস্ চক্রবর্ত্তীর ... খাতিরে ধুতি ছাড়িয়া প্যান্টালুন পরিয়াছিলাম; তাই এই বিপদ ঘটিল। নতুবা গাড়ীতে ধুতিপরা কুলী দেখিলে এই সাহেব পুঙ্গবেরা গাড়ীতে পদার্পণ করিতেন না; সাহেবদের একজন বিবাহ করিতে বিলাত যাইতেছিলেন। তাঁহার অধীনস্ত বিস্তর দেশীয় কর্ম্মচারী মঙ্গল-কামনা করিতে করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। মালা, তোড়া নমস্কারের আদান-প্রদান খুব ধুমধামের সহিত হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর আলাপ-পরিচয় করিয়া আমিও মঙ্গলকামনা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সাহেব অবতারদ্বয় ষ্টেশন ছাড়িবার এক মিনিট পরেই ঘৃণা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সহিত মালা তোড়া ও সোনার তারে বিজড়িত মঙ্গল চিহ্ন সকল দ্রুত নিক্ষেপ করিয়া একেবারে গাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। মনে হইল সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আমার দেশকে, আমার আত্মীয়গণকেও যেন নিক্ষেপ করিলেন।'[95] অর্থাৎ, নেটিভদের মঙ্গলকামনার স্মারকগুলো অবজ্ঞার্থে প্যান্টালুন পরিহিত অপর নেটিভের সামনে

ড্রেস কোড প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে, উড্রফ ভারতের বিচার বিভাগে এমন একসময় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং বিচার বিভাগ থেকে অবসর নেন (১৯০২-১৯১৫), যখন একদিকে নেটিভদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজ দানা বাঁধছে এবং অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ভারতের নেতৃমণ্ডলীর অবস্থান বিষয়ে প্রশাসন ও জাতীয় নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে একটা টানাটানির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। এইসময় অন্তত বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এরূপ এক ভারতপ্রেমীকে থাকতে দেওয়ার মধ্যে সরকারি 'ড্যামেজ কন্ট্রোলের' কূটনীতি কাজ করেছিল কিনা – তাও ভেবে দেখতে হবে। দ্রষ্টব্য, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন', প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ১৯৫২), পৃ ১৭১-১৭২।

[95] তদেব, পৃ ১৫।

তাচ্ছিল্যভরে ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলবার অর্থ হল, পরোক্ষে প্যান্টালুন পরিহিত নেটিভকে বোঝানো – যতই প্যান্টালুন পর না কেন, তোমার সভ্যতার স্থান আমাদের কাছে এরূপ। অর্থাৎ

ছবি ৫.৭: ১৯১৭ সালে প্রকাশিত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র 'রূপান্তর' (@Victoria & Albert Museum)

ঔপনিবেশিক প্রকল্পজাত সভ্যতার চিহ্নকে গায়ে চাপালেই যে ঔপনিবেশিক প্রকল্পজাত 'অসভ্য প্রতিপন্ন করে মানসিক পীড়নের' হাত থেকে বাঁচা যায় – তেমন কথা বলা যাবে না। সভ্যতার চিহ্নধারী তখন পরোক্ষভাবে প্রলম্বিত পীড়ন ভোগ করতে থাকেন। আর 'অশিষ্টাচারের চিহ্নধারী' অর্থাৎ ধুতি পরিহিতদের রাস্তাঘাটে তাৎক্ষনিক নানা পীড়ন ভোগ করতে হত। শুধুমাত্র এইভাবেই নিজেদের জাত-মহিমা জানান দেওয়াতেই সাদা-চামড়ার শাসকশ্রেণী থমকে থাকেনি – কলিকাতা নগরীর ইডেন গার্ডেনের মতো প্রমোদ উদ্যানের কিছু অংশেও ধুতি-পরিহিত 'অভব্য', 'অশিষ্ট'দেরকে নিজেদের দৃষ্টি সীমা থেকে দূরে রাখতে প্রবেশে অলিখিত বাধা নির্দেশ দেওয়া থাকত।[96] মধ্যবিত্তদের শুধুমাত্র সাদা-চামড়ার ইউরোপীয়দের জাতি-বিদ্বেষের শিকার হতে হত

---

[96] সু নামে জনৈক/জনৈকার লিখেছিলেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পরাধীনতাবশত আমাদের দেশের মাটির উপরই সর্ব্বত্র নিজের পোশাক পরিয়া ফিরিতে পারি না। এই কলিকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ উদ্যান "ইডেনগার্ডেন" দেশবাসী সকলের নিকট কর গ্রহণ করিয়া স্থাপিত ও সংরক্ষিত। কিন্তু সেই উদ্যানের কোনো কোনো অংশে আমরা বহুমূল্য দেশী ধূতি পাঞ্জাবি শাল আলোয়ান পরিয়াও যাইতে পারি না। চাঁদনির রোথো হ্যাটকোট পরিয়া কিন্তু যাইবার বাধা নাই।' আর হ্যাট-কোট পরে গেলেও দেহের বর্ণ তো পাল্টানো যায় না! সুতরাং দেহের বর্ণ দেখে কোনো সাহেবের যে জাতি-বিদ্বেষ জেগে উঠবে না – তারও ইয়ত্তা নেই। দ্রষ্টব্য, সু, 'দেশের কথা', প্রবাসী, ৫ম সংখ্যা, ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ফাল্গুন ১৩২৩, পৃ ৪৯৮।

তা'ই নয়, স্বগোত্রীয় কালো চামড়ার ভারতীয়, অথচ ইউরোপীয় চালচলনের মানসিক আবর্তে আবদ্ধ নেটিভদের বিদ্বেষেরও শিকার ছিলেন তাঁরা।[97] জনৈক লেখক একটি গল্প উল্লেখ করেছেন। তা এরকম, 'একবার এক ক্ষীণজীবী বাঙালীর ছেলে মধ্যম শ্রেণীর Reserved for European কামড়ায় ধুতি পরিয়া ভ্রমণ করিতেছিল। গাড়ীতে যখন ওঠে তখন কামড়া খালি ছিল। পথে এক ষ্টেশনে এক ইউরোপীয়-পোশাক-পরিহিত ফিরিঙ্গি আসিয়া ছেলেটিকে বলিল – "তুমি নেটিভ, তুমি কোন সাহসে ইউরোপীয়াদের কামরায় উঠিয়াছ! নামিয়া যাও।" ছেলেটি সেই কৃষ্ণবর্ণ 'য়ুরোপিয়ান'টিকে বলিল – "তুমি আর আমি কেহই য়ুরোপিয়ান নই। অতএব আমাদের একত্রে যাইতে ক্ষতি কি?" তখন ফিরিঙ্গি রাগে গশগশ করিতে করিতে ষ্টেশন মাস্টারকে ডাকিতে ছুটিল। সে চলিয়া যাইবার পর ছেলেটি হঠাৎ একটি তোরঙ্গ খুলিয়া তলদেশ হইতে ... বিবর্ণ প্যান্‌টুলুন বাহির করিয়া কাপড় মালকোঁচা মারিয়া তাহার উপর উহা পরিতে আরম্ভ করিল। ... এমন সময় ফিরিঙ্গি ও ষ্টেশন মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। ষ্টেশন মাস্টার প্রকৃত সাহেব। ছেলেটিকে তদবস্থ দেখিয়া ... বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল —"Hello! What are you doing?" ছেলেটি তখন সাহেবের মুখের দিকে ও ফিরিঙ্গির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "I am becoming a European, Sir!" '[98] চিত্র ৫.৭৩ যেন এই ঘটনার প্রতিধ্বনি করে। সেখানেও নেটিভ মহাশয় ইউরোপীয় টিকিট পরীক্ষককে বলছেন, "don't disturb me, I am about to become a Sab." এ হল আধুনিক লজ্জা, সম্ভ্রম, উপযোগিতা, সুবিধাবাদের মিশেলে মধ্যবিত্তজ আত্মবিস্মৃত সভ্যতার নমুনা।

আধুনিকতার পোশাকি সম্ভ্রমে গা গলিয়ে সমাজে মান্যতা কেনার মানসিকতা মধ্যবিত্তকে বিষয়ের ভাবে প্রবিষ্ট না করিয়ে ভঙ্গিতে আটকে রাখার উদাহরণও তৈরি করেছিল প্রচুর। অবশ্য তা নিয়ে বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পত্র-পত্রিকায় গোছানো সমালোচনাও শুরু হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'তে যেমন চিত্রকর হয়ে ওঠার আগে পোশাকে-আশাকে চিত্রকরের ভাবভঙ্গি রপ্ত করার এবং চিত্রকর মহলে ওই ভাবে যাতায়াত শুরু করে আঁকার চেষ্টা করার বিষয়কে নির্ভর করে 'জিনিয়াস' নামে এক ব্যঙ্গাত্মক লেখা রচিত হয়েছিল। সেখানে চিত্রকর হতে চাওয়া বন্ধুকে আরেক বন্ধু উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমার দরকার ইন্টেলেকচুয়াল দাড়ি, তার তোয়াজই আলাদা ... শিজান (Cezan)[99] প্যাটার্নই তোমার মুখে খাপ খাবে ভাল, বোহেমিয়ান চাল চলবে না ... জিনিয়াস হতে গেলে কেবল তুলি চালালেই চলে না, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চাই।' যুক্তি-বুদ্ধির দৃশ্যমান ভিত্তির

[97] তদেব।

[98] তদেব।

[99] ফরাসি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকর Paul Cezanne (১৮৩৯-১৯০৬) এর অনুকরণে।

একটা মানদণ্ড তৈরি করে নিজস্বতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মধ্যবিত্ত চালে আটকে থাকার এই মধ্যবিত্ততা এখনও চলমান।[100]

লজ্জা ও মধ্যবিত্ত পুরুষের পারিবারিক সম্ভ্রম

মধ্যবিত্তজ এই নতুন সম্ভ্রমের ভিতের উপর মধ্যবিত্ত পুরুষ নিজের পারিবারিক পরিসর, নিজের বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানকেও দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত শালীনতার মানদণ্ডে উনিশ শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষ নিজের মেয়ে-বৌদের সামাজিক শরীরকে বিচার করতে শুরু করেছিলেন। এতদিনকার লোকাচার নবলব্ধ সভ্যতা ও আধুনিকতার আলোকে পুনর্মূল্যায়িত হতে শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গে ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর প্রতি চিঠির কিছু বয়ানের দিকে লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখছেন—‘বাবামশায়কে তোমার ইংলণ্ডে আসিবার কথা লিখিয়াছি, বাবামশায় তাহাতে কি মত দিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক রহিয়াছি। তুমি নিজেই হয়ত কত কি মনে করিতেছ—আমি আবার ইংলণ্ডে কেমন করে যাব। আমার মনে আছে তুমি কেমন লজ্জাশীলা ছিলে—তোমাকে কত বলিয়া একটু নতুন কাপড় কি জুতো কি মোজা পরিতে দিলে তুমি পরিতে চাহিতে না। আমার সামনে এতটুকু খেতেও লজ্জা করিতে। আমাদের স্ত্রীলোকের যা কিছু আচার, যত লজ্জা, যত ভীরুতা, তুমি যেন তার মূর্তিমতী ছিলে। এখনো কি তোমার সেরূপ ভাব আছে?’[101] যে দেশজ লজ্জাশীলতা স্ত্রীকে পাশ্চাত্য শিষ্টাচারী স্বামীর যোগ্য রূপে গঠিত হতে বাধা দেয়, স্বামীর সামাজিক সম্ভ্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে – তা আর কাম্য নয়। তাই সেই লজ্জাশীলতা ভীরুতার নামান্তর। যে ভীরুতার জন্ম কি না আধুনিক সামাজিকতার অশিক্ষা থেকে।

আর সহধর্মিণীকে অশিক্ষা থেকে মুক্ত করে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুসারী তাঁর নিজ সামাজিক সম্ভ্রমের যোগ্য করে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে প্রবেশের মূল সোপান হিসেবে একটি শর্ত রেখেছিলেন। লণ্ডন থেকে ১৮৬৩ সনে লেখা আরেকটি পত্রে সেই শর্তটি এরূপ— ‘...আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীন পূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভাই সত্য কি না? যদিও আমি তোমাকে এবিষয়ে কিছু মুখে বলি নাই, কিন্তু তুমি জান আমার ভাব কি। যে পর্য্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না।’ তবে এই বক্তব্যের ধরণে আদেশ সূচক ভঙ্গি নেই, বরং নব্য-প্রেমের আদর্শ বিদ্যমান। তাই পত্রকর্তার স্ত্রীর প্রতি সবিনয় প্রশ্ন—‘ইহা কি তোমার মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না?’ আর এই

---

[100] শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ‘জিনিয়াস’, শনিবারের চিঠি, ৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫৫, পৃ ২০।

[101] চিঠি নং—৪, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত, ‘পুরাতনী’, (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৭), পৃ ৫৫।

একই বিনয়ই পত্রকর্তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে, স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তোলবার এই ইচ্ছের পিছনে তাঁর নিজের কোনো 'স্বার্থপরতা নেই', কেবল স্ত্রীর হিতাকাঙ্খা রয়েছে।[102] আর সেই হিতাকাঙ্খা থেকেই তিনি পূর্বের পত্রে স্ত্রীকে অনুনয়ের সুরে বলেছেন, ইংল্যাণ্ডে যেতে গিয়ে, 'তোমার যদি কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহাতে অসম্মত হইও না। সত্য বলিতে কি, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কাপড় পরে, তাহা না পরিলেও হয়। তাহা পরিয়া কোনো ভদ্রসমাজে যাওয়া যাইতে পারে না।'[103] পাশ্চাত্য সভ্যতা আসার পূর্বে বড় বাড়ির মেয়ে-বৌরা অন্দরমহলবাসিনী, তাই সূক্ষ্মবসনা। সেটাই সে সময়ে সামাজিক সম্ভ্রমের লক্ষণ। কিন্তু নতুন সম্ভ্রমের মানদণ্ডে বাবুর সাথে বিবিকে যত্রতত্র দেখা না গেলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভিক্টোরীয় বিবাহের প্রেম ও সাহচর্যের যে আদর্শ মধ্যবিত্ত পুরুষের মনে প্রবেশ করেছিল, সেই আদর্শকে মূর্ত করা যায় কিভাবে! তাই মধ্যবিত্ত পুরুষ তাঁর সামাজিক সম্ভ্রমানুগত লজ্জাশীলতায় স্ত্রীকে ঢাকবার দিকে এগিয়ে গেছেন। কারণ পাশ্চাত্য নৈতিকতায় শিক্ষিত দেশীয় পুরুষের কাছে নারী হয়ে উঠছেন পারিবারিক সৌন্দর্য্যের প্রতিভু, পারিবারিক সম্মানের কেন্দ্র।[104]

চিঠিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বক্তব্যের বয়ানগুলোতে শত বিনয়ই থাকুক না কেন, এটা মেনে নিতে নিশ্চয়ই কোনো দ্বিধা থাকবে না যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের সেই বিনয়ী নিঃস্বার্থপরায়ণ মনোভাবেরও একটা স্বার্থ রয়েছে— যদি সভ্য ও আধুনিক হওয়ার বৃত্তটা পূর্ণ করা যায়; পাশ্চাত্য শিক্ষিত পুরুষের পোশাকি পরিশীলনের যোগ্য সহচর হিসেবে যদি তাঁকে গঠন করা যায়![105] তবেই

---

102 পত্র নং ৩, ইন্দিরাদেবী সম্পাদিত, 'পুরাতনী', (কলকাতাঃ আনন্দ, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১৭), পৃ ৫৪-৫৫; সৈকত কওসর জামাল অনূদিত, লীলা মজুমদার-এর 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী', (নয়া দিল্লিঃ ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৯), পৃ ২৫-২৬।

103 চিঠি নং—৪, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত, 'পুরাতনী', পৃ ৫৬।

104 বিশ শতকের ষাটের দশকে একটা রচনায় বলা হচ্ছে, 'যতদিন কবির কাব্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং মানুষের সভ্যতা টিকে থাকবে ততদিন নারীর রূপচর্চা ও বেশবিন্যাস থাকবেই। নারী বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিভু, প্রকৃতি থেকে সে পেয়েছে সুকুমার মনোবৃত্তি। তাই সে সাজতে ভালবাসে নানা আভরণে। কিন্তু এই পর্যন্ত এসে তাকে থামতে হবে। মনে রাখতে হবে সৌন্দর্য যেখানে সুরুচিকে ছাড়িয়ে যায়, আড়ম্বর যেখানে বাহুল্যে পরিণত হয় সেখানে তার আর রূপের শ্রী থাকে না।' নারীর উপর বিশ্বসৌন্দর্যের গুরুভার চাপিয়ে সৌন্দর্য ও সুরুচির মধ্যে ভারসাম্য বজায়ের এই প্রক্রিয়াটি মধ্যবিত্ত পুরুষের নব-পরিশীলনের বিকাশের সাথে সাথে শুরু হয়। দ্রষ্টব্য, বেলা দে, 'মেয়েদের পোষাক এদেশে ও ওদেশে', অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৩।

105 বিশ শতকের ষাটের দশকের আরেকটি লেখায় ফ্যাশনে বৈচিত্র্যের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছিল, 'পূর্বে (লেখকের ভাষায় 'পৌরাণিক যুগে') ভারতের নারীদের ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকার জন্য একখণ্ড কাপড় ব্যবহৃত হত, তাকে বলা হত কাঁচুলি। কিন্তু অয়াশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য লজ্জার ধারণা যখন প্রবেশ করল, তখন থেকে কাঁচুলি বা শাড়ির আঁচল দিয়ে বক্ষ ঢাকা নগ্নতার সমককক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। সুতরাং পুরুষের মধ্য ঊর্ধ্বাঙ্গে বোতাম আঁটা জ্যাকেটের চল শুরু হয়, যা বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান কালের ব্লাউজ।' দ্রষ্টব্য, বাসবী নন্দী, 'ফ্যাশানে বৈচিত্র্য', অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৩; দ্রষ্টব্য, অঞ্জলি চৌধুরী, 'পোশাকে বিবর্তন', অমৃত পত্রিকা, ১১শ বর্ষ

ভবিষ্যত প্রজন্মকে তাঁর সভ্যতার অনুগামী করে তোলা যাবে! আর ভিক্টোরীয় নৈতিকতায় সেই বৃত্তের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটতে পারে, কেবল সর্বক্ষেত্রে যোগ্য সঙ্গিনী হিসেবে স্ত্রীকে পাওয়ার মধ্য দিয়ে, সভ্য সমাজের বিকাশ হতে পারে সভ্য মায়ের মধ্য দিয়ে।[106] তাই যে স্ত্রীর সাথে সববিষয়ে আলোচনা করা যায়; যাঁকে গণ্যমান্যদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়; যাঁর অবস্থান শিক্ষিত স্বামীকে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত করে না; -- তদ্রুপ স্ত্রীই শিক্ষিত পুরুষের কাম্য হয়ে উঠছে। সোজা কথায় বললে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তেই নয় বা কাম নিবৃত্তির জন্যই নয়— 'কাম হইতে মুখ ফিরাইয়া প্রেমমুখীন হইতে হইবে'—শ্রী নীরদ চৌধুরীর মতে এটাই উনবিংশ শতকে বাঙালি নরনারীর সম্পর্কঘটিত ভাববিপ্লবের মূল সূত্র।[107] আর তাই এই প্রেমের স্রোতে নতুন সামাজিক বিকাশকে বহমান রাখতে নারীর শরীর ঢেকে-ঢুকে দেওয়ার এত তাগিদ।[108] যাতে যৌনতার পিচ্ছিলতা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা যায়।[109] সেদিক থেকে ভাবলে নারী শরীরের সাথে পুরুষের চারিত্রিক স্খলনের যে একটা চিরায়ত সম্বন্ধ বিধানের প্রচেষ্টা এখনও বহতা রয়েছে, সেই মূলে উনিশ শতকের আধুনিকতা আঘাত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কারণ নারী শরীরকে আবরণে আবৃত করে পর্দার আপাত বন্ধনমুক্তির মধ্যেও নারীকে সু-মাতা, সু-পত্নী, সু-গৃহিণী, সু-

---

৩৩শ সংখ্যা, ৮ই পৌষ ১৩৭৮, পৃ ৫৪২-৫৪৩; দ্রষ্টব্য, 'আজকের ফ্যাশন', অমৃত পত্রিকা, ১১শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা, ১৫ই পৌষ ১৩৭৮, পৃ ৬১৭-৬২০।

106 অনুরুপা দেবীর লেখায় নরেশ চরিত্র স্ত্রীকে শুধু বিলিতি বিবি সাজানোতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। চেয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিকতার ভাল দিকগুলোর সম্মিলনে স্ত্রীর আন্তরিক বিকাশ হোক। স্ত্রীর প্রতি তাঁর উপদেশ, -- "শুধু বিলিতি বিবিদের বেশ ভূষাকেই অনুকরণ করিলে চলবে না তো, তাদের সদগুণগুলিও সাথে সাথে নিতে হবে। তা' ভিন্ন আমাদের দেশের মেয়েরাও কস্মিনকালে মূর্খ থাকতেন না। বই পড়া কম থাকলেও এবং নাথাকলেও মৌখিক ও দৃষ্টান্তের শিক্ষা সেকালের মেয়েদের অপর্য্যাপ্তই ছিল। তোমরা ঘরের বাইরের সব ত্যাগ করচো, শিখে নিচ্চো শুধু বিলিতি বিলাস সুখ টুকুই। তা করোনা, বড় আশা করে তোমায় নিয়েছি যে আমার সন্তানেরা যেন নির্ম্মল ও নিখুঁত মা পায়, তাদের তা পেতে দিও, পরি।" দ্রষ্টব্য, শ্রীমতি অনুরূপা দেবী, 'হারানো খাতা', (কলিকাতাঃ ভূদেব পাবলিসিং হাউস, কার্ত্তিক ১৩৩০), পৃ ৪৭।

107 শ্রীনীরদ চন্দ্র চৌধুরী, 'বাঙ্গালী জীবনে রমনী', (কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দশম মূদ্রণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ), পৃ ৪৬।

108 শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ধাক্কায় যাঁহারা অতিরিক্ত সাহেব হইয়া গিয়েছিলেন তাঁহারা মদ্যপান ও গৃহলক্ষ্মীদিগকে সিগারেট ধরানটাকেও সভ্যতার অঙ্গ বিবেচনা করিতেন। ... বিলাতপ্রবাসী কোট-প্যান্টধারী বাঙালী স্বামীর পার্শ্বে শাড়ীধারিনী স্ত্রীকে ইংরেজরা কি নজরে দেখে জানি না। সম্ভবতঃ এই যে, "ইহারা আমাদের নকল করিতে চেষ্টা ত করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ পারিয়া উঠেন নাই।' দ্রষ্টব্য, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, 'পশ্চাদ্দৃষ্টি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ ৬৮৯।

109 Himani Banerjee, 'Textile Prison: Discourse on Shame (Lajja) in the Attire of Gentlewomen (Bhadramahila) in Colonial Bengal'; *The Canadian Journal of Sociology* , Spring, 1994, vol.19, No. 2, Special Issue on Moral Regulation; p.170

কন্যা হিসেবে বিনির্মিত করবার ধারা অন্তঃসলিলা ছিল।[110] তাই সত্যেন্দ্রনাথের এই চিঠিগুলো লেখার প্রায় একই দশকে ১৮৬৭ সালে বামাবোধিনী পত্রিকার একটা কবিতা স্ত্রীর কাছে স্বামীর স্থান কি—তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে-- 'কামিনীর পতি হল অঙ্গের ভূষণ।/ কামিনীর বেশ ভূষা পতির কারণ।।/ কামিনীর পতি প্রতি কতই যতন।/ হেরিলে আনন্দ হয় পতির বদন।।/ পতি হন অবলার পরম দেবতা।/ পতি পত্নী হয় যেন বৃক্ষ আর লতা।।'[111] তাই স্ত্রীর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করতে নারীকে ধার্মিকতা, ধৈর্য, নীতিপরায়নতা, সত্যনিষ্ঠা, উদ্যম, উৎসাহ ও প্রেমের আভরণে সজ্জিত হবার উপদেশ দিচ্ছে আরেকটি কবিতা—'ধর্মরূপ শুভ্রবাসে আবর শরীর।/ হেরিবে তাহার শোভা জিনিয়া মিহির।।/ শীলতা অবগুণ্ঠনে ঢাকি রাখ মুখ।/ শীতল হইবে কান্তি দর্শনের সুখ।।'[112] আর বলা হচ্ছে নিজেকে শীলতার প্রতিমূর্তি করে তোলবার মধ্য দিয়েই নারী কেবল কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কবিতার ভাষায়—'অক্ষয় সুদীপ্তিময় রবে চিরকাল।/ না জানিবে দস্যুভয় না ডরাবে কাল।'[113]

উনিশ শতকের মধ্যভাগে এসে বাঙালি রমণীর শরীরের উপর পিরাণ, ব্লাউজ, পেটিকোট চাপিয়ে তাঁকে আধুনিকতার যজ্ঞে সামিল করবার প্রয়াসটি যে পুরুষতান্ত্রিকতার আবর্তের সম্প্রসারণের ফল তা বুঝতে আমরা সমকালীন পারিবারিক প্রবন্ধের দিকেও তলিয়ে দেখতে পারি। ১৮৮৯ সালে কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য লিখছেন—'...স্ত্রী স্বামীকৃত ধর্ম্মকর্ম্মের অর্দ্ধ ফলভাগিনী—এই জন্যই "সস্ত্রাকো ধর্ম্মচরেৎ" শাস্ত্রের বিধি। অতএব সত্য সত্যই স্ত্রীকে আপন্ কার্য্যের ফলভাগিনী করিতে চেষ্টা পাও। তাঁহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ কর। যৌবনাবস্থায় নানা মহৎ মহৎ কার্য্যের কল্পনা করিয়া থাক। স্ত্রীর সহিত সেসকল বিষয়ে কথা কও। সে অশিক্ষিত বালিকা—ওসকল কথার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, একবার ভ্রমক্রমেও এরূপ মনে করিও না। যাহা মনে আসে তাহাই বল, যত রাজা উজীর মারিতে চাও মার। গ্রীস, রোম, আমেরিকার ইতিহাস পড়িয়া যত বারতা ধীরতা উদারতার উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছ, গল্প কর, দেখিতে পাইবে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত বিবরণের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, বীরদিগের কাজেও দুই একটী ভুল ধরিয়া দিবে। এবং তোমার মন কি চায়, কোন দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তাহাও নিশ্চয় বুঝিয়া লইয়া আপনার মনকে তোমার অনুরূপ করিবার চেষ্টা

---

[110] Tanika Sarkar, 'Hindu Wife, Hindu Nation: Community, Religion, and Cultural Nationalism', (Delhi: Permanent Black, 2001); ভারতী রায় সংকলিত ও সম্পাদিত, 'নারী ও পরিবারঃ বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)',(কলকাতা পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯), পৃ ১-১৬।

[111] 'বামাগণের রচনা'; বামাবোধিনী, আশ্বিন, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬০৫।

[112] 'নারীর আভরণ'; বামাবোধিনী, পৌষ, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬৫৬।

[113] তদেব।

করিবে। এরূপ হইলে স্ত্রী তোমার লেখাপড়া কাজকর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবেন না। প্রত্যহ তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের উত্তেজিকা এবং সহায়া হইয়া প্রকৃত 'সহধর্ম্মিনী' পদবাচ্য হইবেন।'[114] দাম্পত্যে আধুনিকতার মূল সুরটা কি, তা বোধয় আর এরপর পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ লেখক সুস্পষ্টভাবেই বলে দিচ্ছেন, আধুনিক বাঙালি পুরুষের বাহ্যিক জীবনকে সাজাতে হলে আগে গার্হস্থ্যকে সাজাতে হবে। অবশ্যই এই সাজানোর প্রয়াসে অপ্রেমের কোনো জায়গা নেই। কারণ শালীন হয়ে উঠতে হলে শীলতার পথ বেয়েই এগোতে হয়। তাই আধুনিক পুরুষের স্ত্রীর প্রতি পারিবারিক শিক্ষার মূল হিসেবে গ্রন্থকার একটি সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। সেটা এরকম—' ছেলে মেয়ে, বৌ জামাই, বাড়ী বাগান, জন ধন, সকলই তোমার [অর্থাৎ স্ত্রীর]—আমিও তোমার—ও সব তোমার বলেই আমার [অর্থাৎ স্বামীর]।'[115] এই পুরো ভাষ্যটির মধ্যে স্ত্রীর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার পরিসরে তখন কি চলছিল, তার কোনো প্রতিধ্বনি নেই।[116] বরং আধুনিক হয়ে উঠতে গেলে পুরুষকে কি করতে হবে—সেই পালনীয় কর্তব্যের দিকটা স্মরণ করানো হচ্ছে মাত্র। আর সেই আধুনিকতায় স্ত্রী স্বামীর হাতের সুর-মণ্ডল হয়ে উঠছে মাত্র। তাই উনবিংশ শতকের সত্তর-আশির দশক থেকে বা বিংশ শতকের প্রথম দিকে এসে পুরুষ-অনুবর্তী হয়ে থাকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা নারীদের গলায় যখন শোনা যায়, 'সময় সময় অধীনতাও প্রকৃত সুখকর বটে'[117]—অবাক হতে হয় না। এই প্রেমময় অধীনতার আদর্শে গড়ে ওঠা মেয়েদের বিয়ের বাজারেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহলে ভালো ডিমান্ড।[118] প্রসন্নতারা দেবীর বয়ানে সেই আদর্শের মূল সুরটি কি – তা শুনে নিই। প্রসন্নতারা তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার কারিগর মাতুল রাজকুমার গুপ্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংসারে অধীনতার সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করেছেন করে বলছেন—'প্রেমই ইহার (অধীনতার) মূল। ঐ প্রেম দ্বারা পরমেশ্বর জগৎ শাসন করেন, মনুষ্য তাঁহার ছায়া মাত্র। পতি পত্নী পরস্পর প্রেমাধীন, সন্তান-সন্ততি পিতামাতার প্রেমাধীন, পিতামাতাও যে সন্তানের অধীন নহেন তাহা বলা যায় না। পিতামাতাও সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধায় বশীভূত, তাহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হন না, ইহা কি সামান্য অধীনতা? এ জগতে সকলেই কোন না কোনও প্রকারে পরস্পরের

---

114 শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, 'পারিবারিক প্রবন্ধ', বুধোদয় যন্ত্রে তৃতীয়বার মূদ্রিত, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪।

115 তদেব, পৃ ১৫।

116 Lata Mani, 'Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India', (California: University of California Press, 1998)

117 প্রসন্নতারা গুপ্ত, 'পারিবারিক জীবন' (কলিকাতাঃ কুন্তলীন প্রেসে মূদ্রিত, ১৩১০ বঙ্গাব্দ) পৃ ৯২

118 অনুরূপা দেবী 'নারীমঙ্গল'এ একটা কালীন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, "নিজের মেয়েটিকে বিবাহের বাজারে বাঁধা নিয়মে কনে-দেখানর মামুলী শিক্ষা দিলেই চলিবে না – উহাকে স্বামীর সহধর্মিণী রূপে গড়িয়া দিতে না পার, তবে 'মেকি টাকা' চালানোর মতো 'খেলো' জিনিষ দান করার অপরাধে ইহ-পর দুই লোকেরই দরবারে তোমার সাজার ব্যবস্থা হইয়া রহিল, নিশ্চিত জানিও।" দ্রষ্টব্য, অনুরূপা দেবী, 'নারীমঙ্গল', কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'সরস সার কথাঃ রবীন্দ্রযুগ ১৮৫১-১৯০০' (কলিকাতাঃ গ্রন্থগৃহ, ১৩৫৩), পৃ ১৯৪।

অধীনতা স্বীকার করে, তাহা অনিচ্ছা পূর্ব্বক নহে; ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতিই পরস্পরের উপর কার্য্য করে। এ প্রকার অধীনতা কষ্টের কারণ নহে বরং সুখের কারণ। ইহাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না।'[119] তাঁর মতে স্বাধীনতার মহত্ত্ব তখনই বিঘ্নিত হয়, যখন তা দুর্বলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার বিকাশ যে পুরুষকে কেন্দ্র করে, তার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে তিনি স্ত্রী জাতির নির্ভরতার প্রশ্নে বলছেন, 'স্ত্রীজাতি শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপর নির্ভর করে, এই পুরাতন কথাটি অসত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ নির্ভরের ভাব স্ত্রী প্রকৃতিতে প্রবল দেখা যায়।'[120] অর্থাৎ পরিবার পরিজনের পারস্পরিক প্রেমময় অধীনতার ধারণার উদ্রেক ঘটিয়ে প্রসন্নতারা, স্ত্রী জাতির উন্নতি যে পিতা, পুত্র, স্বামী রূপী পুরুষের প্রেমময় অধীনতায় থেকেই সম্ভব হবে—এই বক্তব্য পেশ করতে চেয়েছেন। এককথায়, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে নতুন কিছু বলতে পারেননি। সেদিক থেকে কাশীনাথ ভট্টাচার্যের বক্তব্যের সাথে প্রসন্নতারার বক্তব্যের খুব একটা প্রভেদ নেই। কাশীনাথ ভট্টাচার্যও 'আমার সব তোমার বলেই আমার'—মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পুরুষকে প্রেমময় অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে প্রকৃত ভদ্রতার ভিক্টোরীয় পথে এগিয়ে যাবার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

কিন্তু পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রম অর্জনের তাগিদে তার ঘরের মেয়ে-বৌদের শিক্ষিত করবার প্রকল্পটিতে প্রচণ্ড গৃহমুখীনতা বিদ্যমান। নারী বিদ্যাশিক্ষা পেয়ে চাকরি করবেন—এই আশায় ওই শিক্ষা প্রয়াস ছিল ছিল না। বরং নারী মধ্যবিত্ত কেরানি শ্রেণির সম্ভ্রম রক্ষা করবে, এই চিন্তা থেকেই উক্ত প্রয়াস। সেদিক থেকে নারীদের সামাজিক শরীরের সাথে জুড়ে যাওয়া ব্লাউজ, পেটিকোট আসলে মধ্যবিত্তের নতুন সামাজিক আব্রুকে রক্ষা করবার উপকরণ (ছবি ৫.৮ দ্রষ্টব্য)।[121] তাই

---

[119] প্রসন্নতারা গুপ্ত, 'পারিবারিক জীবন', পৃ ৯২।

[120] তদেব, পৃ ৪।

[121] 'একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?' প্রহসনে বিলাত-ফেরত বাঙালি সিভিলিয়ন গোপাল বাবু তাঁর স্ত্রী সরলার কথোপকথনের কিয়দংস তুলে ধরলে বোঝা যাবে, সেকালে স্ত্রীকে বিবি বানিয়ে নিজের পদমর্যাদাকে ধরে রাখা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। --

'সরলা । ছিঃ সোয়ামীর সাক্ষাতে কি মেয়ে মানুষের খেতে আছে?

গোপাল । কেন ঠাকিবে না you little know nothing। বিবিলোক কি প্রকারে টাহাদের স্বয়ামীর সহিট বণ্ডুর সহিট একট্র বসিয়া আহার করে?

সরলা । বিবিদের সঙ্গে কি বাঙালির মেয়েদের তুলনা হয়? তারা যে পর-পুরুষের হাত-ধরা-ধরি করে নাচে, তারা যে ঘোড়ায় চড়ে, বেড়াতে যায়, তাদের দেখে কোন্ বাঙালির মেয়েতে তা কত্তে পারে?

গোপাল । কেন পারিবে না, শিখিলেই পারিবে? It is only education which makes one accomplished খালি শিক্ষা চাই, শিক্ষা হইলেই সকল করিটে পারে;আমি টুমাকে শিক্ষা ডেবে, কেটাব পরিটে, লিখিটে, কারপেট বুনিটে, পিয়ানো

পরবর্তীতে যখন মেয়েরা শিক্ষা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে নামার চেষ্টা শুরু করেছে – তখন তাদের বিভিন্নভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমালোচনায় পড়তে হয়েছিল।[122] 'সুশীলার উপাখ্যানে' সুশীলার মুখ দিয়ে নিজ স্বামীকে যা বলানো হয়েছে তা'ই আসলে ভিক্টোরীয় পিতৃতন্ত্রের মনের কথা – 'বাল্যকালে পিতা আমাকে সর্ব্বদা কহিতেন, সুশীলে! উত্তম গৃহিণী হইবে বলিয়া আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইতেছি, দেখ বাছা, এমন গুরুতর বিষয়ে কখন তুমি অশ্রদ্ধা করিও না। আর মাতাও আমাকে এ বিষয়ে নিয়ত উপদেশ দিয়াছিলেন। এখন সেই উপদেশ অনুসারে গৃহকর্ম্মের প্রতি আমার এমনি অনুরাগ জন্মিয়াছে, যে সাংসারিক ব্যাপারে বিশৃঙ্খলতা দেখিলে আমার অত্যন্ত অসুখ হয়। ...যে স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া উত্তম গৃহিণী না হয়, আর গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা করিতে না পারে, আমার মতে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষাই বৃথা। নাথ! আমি পতিসেবা এবং পতির সন্তোষ উৎপাদন করাকে এ জগতের সারকর্ম্ম বলিয়া জানি। পতি ও গুরুজনদিগের তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত

বাজাইটে, নাচিটে, গাইটে, সব শিক্ষা ডেবে; আর টুমাকে গৌন পরায়ে এবং টেবেলে বসায়ে খানা খাইটে শিক্ষা ডেবে; and then my সরলা you will make a capital mem-sahib.

সরলা। ... তোমার পায়ে পড়ি আমি দুটি কাজ কত্তে পারবো না, লেখাপড়া শিখতে আমি নারাজ নই। ... আমি গৌন (অর্থাৎ গাউন) পত্তে পারবো না – বাবা! সে এক বস্তা কাপড় – চোত্ বোশেক (চৈত্র-বৈশাখ) মাসের গরমিতে ঘেমে হাপসে উঠবো – মাগো! হাঁপিয়ে মরবো! ... আর আমি অখাদ্যি খেতে পারবো না। হিঁদুর মেয়ে অমনি মুখে সদ্য সদ্য কুড়ি কুষ্টি বেরুবে। ...

গোপাল। টুমি বরো superstitious আসে – টোমাকে reform করিটে অটিক সময় লাগিবে, টোমাকে ভারট আশ্রমে পাঠাইতে হইবে। ... সেখানে Bengalee ষ্ট্রি লোকডের মেম সাহেব বানায়। ...

সরলা । আমি সেখানে ককখোনো যাব না। আমি মেম সাহেব হতে পারবো না। আমাকে যমের বাড়ী পাটিয়ে দাও ...

গোপাল। (ক্রোধে ভোজন পাত্র ফেলিয়া উঠন এবং সরলাকে পদাঘাত) You most obstituate girl. টুমার হুকুম কি আমার হুকুম, টুমাকে চাবুকের ডারা সিডা করিতে হইবে, এবং ডেখিবে টুমি মেম সাহেব হয় কি নেই।'

এই পুরো সংলাপটিতে নাটকীয়তার উপাদান থাকলেও সমকালের ইংরেজি শিক্ষিত সরকারি চাকুরেদের স্ত্রীকে বিবি করে তোলার প্রবল যে তাগিদ, তা যুগচরিত্র হিসেবে সুন্দরভাবে প্রকট হয়েছে। দ্রষ্টব্য, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?', (কলিকাতাঃ সরস্বতী প্রেস, ২য় মূদ্রণ, ১৮৮০), পৃ ১৮-২১।

[122] অনুরূপা দেবী 'নারীমঙ্গল' এ পুরুষের সেই বাসনাটিকে তুলে ধরেছেন, 'মেয়েরা বিদূষী হউন; কিন্তু তাঁরা মেয়ে থাকুন, তাঁদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই – এইটুকুমাত্র তাঁদের কাছে অনুরোধ।' দ্রষ্টব্য, অনুরূপা দেবী, "নারীমঙ্গল", কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'সরস সার কথা', পৃ ১৯৫।

চিত্র ৫.৮ বিবাহের ছবি – ভিক্টোরীয় ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী (@CSSSC_Archive)[123]

যে কায়িক পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমকে আমার পরিশ্রম বোধ হয় না।' [124] বামাবোধিনী সভার একটা লেখাতে নারীর শিক্ষার অধিকার বিষয়ে স্বর অনেকটা তীক্ষ্ণ, কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফিরে আসা সেই একজায়গায়—সংসারের সার্বিক উন্নতি আর পুরুষের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। সেই লেখার দিকেই তাকাই—'প্রায় অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে স্ত্রীজাতি এবং পশুজাতি উভয়েই সমান, ইহাদিগকে পিঞ্জরে বন্ধ না করিলে ইহারা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আমাদেরও মানরক্ষা হইবে না, অতএব স্ত্রীদিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াই রাখা কর্তব্য।'[125] এই মতের বিরোধিতা করে বলা

[123] I-113, Studia Photograph, Johnston & Hoftman, Portrait of a lady; from family album of A. P. Ganguly; Jadunath Bhavan, CSSSC, Kolkata.

[124] শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'গার্হ্যস্থ বাঙ্গালা পুস্তক সুশীলার উপাখ্যান, ১ম ভাগ' (কলিকাতাঃ প্রাকৃতা প্রেস, অক্টোবর, ১৮৬৪), পৃ ৫৯-৬০।

[125] শ্রীমতি সারদা, "বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে"; 'বামারচনাবলী, ১ম ভাগ' (কলিকাতাঃ জে জি চ্যাটার্জ্জী অ্যাণ্ড কো'স প্রেস, ১৮৭২), পৃ ১০।

আরেকটি রচনাতেও সেই একই কথার প্রতিদ্ধনি শোনা যাচ্ছে—'একজন অবলা রমণীর উপর একজন যুবকের সুখ শান্তি আশা ভরসা অর্থাৎ জীবনের সমস্ত নির্ভর, ইহা কি কথার কথা? যাহাতে স্বামীর সংসার সুশৃঙ্খল থাকে, যাহাতে তিনি সর্ব্বদা সুখ শান্তি লাভ করিতে পারেন, যাঁহাতে তাঁর জীবন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়া সর্বোতভাবে

হচ্ছে, 'দেশীয় ভদ্রমহাশয়গণ যদি স্ত্রীদিগের মন পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে তাহাদিগকে অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ বলিতে পারেন, পশুর সমান কখনোই বলিতে পারেন না। কারণ স্ত্রীরা রিপু দমনে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠাতেও শ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন তাহাদের যে সকল মন্দ স্বভাব আছে, তাহা পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই মোচন হইবেক না, তাহার জন্য চেষ্টা চাই, উপদেশ চাই, এবং বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তবে সেই সকল মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইবে।'[126] ভারতবাসীর সামনে তৎকালে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা ইংল্যাণ্ডের নারী প্রগতির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে লেখিকা বলছেন—'দেশহিতৈষী মহাশয়গণ একবার ইংল্যাণ্ডনিবাসী বিদ্যাবতী ও গুণবতী মহিলাদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করত কিঞ্চিতকাল মাত্র চিন্তা করুন, তাহা হইলে অবিলম্বেই স্ত্রীশিক্ষার যে কি ফল তাহা নিঃসন্দেহে অনুভব করিতে পারিবেন।'[127] আর এবার আসছে শিক্ষার পুরুষতান্ত্রিক ভিত্তির বৃত্তকে সম্পূর্ণকারী সেই বক্তব্যটি, যা এতক্ষণ ধরে দেখা প্রায় প্রতিটি বয়ানেই ধ্রুবক—'এদেশস্থ পুরুষগণ বিবিধ বিষয়ের উপদেশ ও শিক্ষালাভ করিয়া প্রতিদিনই আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কি পরিতাপ, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ইহাও অবগত নহেন যে তাঁহাদের পরিবারস্থ বিদ্যাহীনা মহিলাগণকে বিদ্যারত্নে ভূষিত না করিতে পারিলে কোন প্রকারেই যথার্থ সুখ ও প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না! স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান করিলে অবশ্যই তাঁহারা গৃহকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারেন এবং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া সদাচার এবং সদ্বিবেচনা দ্বারা পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন।'[128]

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, নারী শিক্ষার সাথে নারীর পোশাকি সংস্কৃতির পরিবর্তনের সম্পর্ক কোথায়? এপ্রসঙ্গে খুব সহজ করে বললে, পুরুষ-নির্ধারিত নারীশিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীকে নিজ শরীর বিষয়ে সচেতন করে তোলে, নারীকে বারংবার মনে করিয়ে দিতে চায়— তাঁর শরীরের উপর সামাজিক শিষ্ঠাচার, ধর্মীয় শিষ্ঠাচার কিভাবে নির্ভর করে। কখনো কখনো তো সেই শিষ্ঠাচারের একটা ধাঁচাও তৈরি হয়ে যায়। যে ধাঁচার উপর নির্ভর করে আজকালকার আধুনিক রাষ্ট্র, সেই শিষ্ঠাচার অনুশীলন করে না—এমন সমাজের উপর, সংখ্যাগুরুর শিষ্ঠাচার চাপিয়ে দিয়ে নিজের ক্ষমতার কাঠামোকে জোরদার করবার পথে এগিয়ে যায়। ঠিক যেমনটা উপনিবেশিক সমাজের শরীরকে বারংবার সমালোচনা করে উপনিবেশিক রাষ্ট্র নিজের সভ্যতার প্রকল্প তথা উপনিবেশিক প্রকল্পকে আরো জোরদার করতে চেয়েছিল। নারী শরীর কিভাবে এরূপ

কল্যাণলাভ করিতে পারে, স্ত্রীর পক্ষে তাহা একান্ত কর্তব্য। যে রমণী এই দুরুহ কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম তিনিই প্রকৃত স্ত্রী।' দ্রষ্টব্য, 'প্রকৃত স্ত্রী', বামাবোধিনী পত্রিকা, ৩৫ বর্ষ, ৩৯৬ সংখ্যা , ১৮৯৮।

[126] তদেব।

[127] তদেব, পৃ ১১।

[128] তদেব, পৃ ১২।

প্রকল্পগুলোর দায়কে বয়ে নিয়ে চলে, এই বিষয়ে চিরন্তন সরকারের একটা সুন্দর কথা আছে, তা এখানে বলে রাখি—'যেকোনো দৃশ্যমান শরীরই ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে রূপায়িত, কেননা, উপস্থাপনের অতীতে বা বহির্দেশে গিয়ে শরীরকে তার অনির্ণীত অবস্থায় চেনাই যায় না। তবু যাকোনো রকমের পুরুষতান্ত্রিক পরিসরে নারীশরীরের প্রসঙ্গে একথা অনেক বেশি তীব্রতায় সত্য হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ, সংস্কার, সামাজিক-রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক প্রকল্প ও প্রস্তাবনাগুলি ধারণ করার লক্ষ্যে মেয়েদের শরীরকে অনেক অভিনিবেশ ও গূঢ় সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত করে তোলা হয়।'[129] সুতরাং শিক্ষাটা হল নারীর পুরুষ-অনুশাসিত সামাজিক শরীরকে প্রস্তুত করে তোলার একটা হাতিয়ার। তাই উনবিংশ শতকের নারী শিক্ষার ধরণের দিকে অভিনিবেশ করলেও দেখা যাবে, সেখানে বাইরের কাজের শিক্ষার দেওয়ার কোনো তাগিদ নেই, সব তাগিদ কেবল তাকে সূচিকর্মের শিক্ষা দিয়ে, হিসাব-নিকাশের শিক্ষা দিয়ে, অক্ষরশিক্ষা দিয়ে বা স্বাস্থ্যশিক্ষা দিয়ে সন্তান, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, স্বামী সর্বোপরি স্বামীর পরিবারের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধণে সীমাবদ্ধ।[130] তাই উনবিংশ শতকে বাঙালি ভদ্রবিত্তদের যখন মনে হচ্ছে যে, তাঁদের নারীরা চারদেয়ালের মধ্যে ইতর জীবনযাপন করে, সাথে সাথে সেই ইতরতার পশ্চাতে কারণ হিসেবেও উঠে আসছে অশিক্ষা—'মূর্খতা, কর্তব্যজ্ঞানশূন্যতা, সদগুনহীনতা, সংক্ষেপত সৎশিক্ষার অভাবের জন্য যতপ্রকার দোষ ঘটিতে পারে সমস্তই এতদ্দেশীয় স্ত্রীসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়।'[131]

কুমারী সৌদামিনী তাই তাঁর রচনায় নারীদের শীলতার পাঠ দিয়েছেন। তাঁর মতে, কথার-কথা লজ্জাশীলা হলে চলবে না, শীলতা বা 'modesty' শিখতে হবে। কাদের কাছে শিখতে হবে? অবশ্যই শীলনে সভ্যতম ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতা থেকে। তাঁর ভাষায়, 'ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম দেশে নৃত্য গীতাদি করিলে তদ্দেশীয়া স্ত্রীগণ প্রসংশনীয়া হন এবং তাঁহারা সকলের সহিত আলাপ ও প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয়া স্ত্রীগণ তদ্রুপ করিলে প্রশংসনীয়া হওয়া দূরে থাকুক, জঘন্যরূপে নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন এবং প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের এবং সকলের সহিত আলাপের পরিবর্তে অবগুণ্ঠনের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন ও কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না। কিন্তু অবগুণ্ঠনের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাহারও সহিত আলাপ না করিলেই লজ্জাবতী হওয়া যায় এমন নহে।' যেখানে লজ্জা ঢাকার জন্য যে অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন হয়, সেই অবগুণ্ঠনটিই অপ্রতুল। তাঁর ভাষায়—' বঙ্গীয়া অনেক মহিলা কুৎসিত লজ্জার বশবর্তী। তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং অনাবৃত শরীরে দাস-দাসী ইত্যাদি পরিজনের সম্মুখে অনায়াসে থাকেন...স্নান গাত্র মার্জ্জন ইত্যাদিও প্রকাশ্য

---

[129] চিরন্তন সরকার, 'শরীরের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির শরীর', (কলকাতাঃ অবভাস, ২০১৯), পৃ ৬০।

[130] Geraldine Forbes, "Education for Women"; Sumit Sarkar & Tanika Sarkar Edited, 'Social Reform in Modern India: A Reader', (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008)

[131] শ্রীমতি প্রেমময়ী, 'বঙ্গমহিলাদিগের বর্তমান হীনাবস্থা', বামারচনাবলী, প্রথম ভাগ, পৃ ২৫।

স্থানে সম্পাদিত হয়। অতএব এরূপ নিয়ম করা উচিত যে, অনুমতি বিনা দাস দাসী কিম্বা অন্যান্য পরিজনেরা সকল গৃহে প্রবেশ করিতে না পারেন এবং স্নান ইত্যাদি গোপনীয় স্থানে সম্পাদিত হয়। লৌকিক আচারে যে নারীরা অনভিজ্ঞ, ইহা কেবল কুৎসিত লজ্জাবশত হইয়া থাকে।'[132] অর্থাৎ যে লজ্জাকে এতদিন নারী নিজের ভূষণ মনে করে, অন্দরমহলে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে নিজেকে পারিবারিক আভিজাত্যের কারণ বলে মনে করে তুষ্টি পেতেন, তার সেই লজ্জার উপরও উনিশ শতক নির্লজ্জতার দায় চাপিয়ে নতুন সমাজে পুরুষের পাল্টে যাওয়া জীবনের সাথে তাল মেলাতে, নতুন লোকাচার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির দিকে ঠেলে দিল। অর্থাৎ আধুনিকতার অভিঘাতে লজ্জার নতুন সংজ্ঞা সৃষ্টির দরকার পড়েছিল কিনা—সেটা ভেবে দেখার বিষয়। উনিশ শতকের গোঁড়ার দিকে সমাচার দর্পণের একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, '...গঙ্গাস্নানে যে শত সহস্র পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন করেন তাহাতে এতদ্দেশীয় পুরুষের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বিদ্যাবতী হইতেই নানাপ্রকারে বিবাদী হন...'[133] অর্থাৎ এতদিনধরে চলে আসা অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গীয় নারীদের 'সর্বাঙ্গ দেখিয়ে' স্নান করতে যাবার বিষয়টি সমালোচনার আওতায় চলে আসছে। এবং এই বিষয়টিকে সমালোচনা করতে গিয়ে নারীদের মধ্যে শিক্ষার অভাবকে আবার কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে—'স্ত্রীলোকেরা যে অন্ধকারে রহিয়াছেন ইহা দূর হওনের কোন সুযোগ হঠাৎ দেখা যাইতেছে না কেননা পুরুষের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরের ভিতর গৃহ মার্জ্জনাদি কর্ম্মে আবৃত থাকেন [।] সুতরাং জ্ঞানি লোকের সহিত আলাপাদিও হয় না এবং বর্ণ পরিচয়ও নাই যে শাস্ত্র পড়িয়া মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পারেন। যদি বা এই নগরের ও তৎপার্শ্বস্থ কয়েক গ্রামের স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে বাহির হন বটে [,] কিন্তু সেই বাহির হওয়া তাঁহাদের কোনো উপকারের নহে [।] যেহেতুক ভাগ্যবন্ত লোকের স্ত্রীলোকেরা প্রায় রাত্রি থাকিতেই গঙ্গাস্নানে যান [।] তাহাতে গঙ্গার ঘাটে বা রাস্তাতে অনেক জ্ঞানি পুরুষ থাকেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সহিত কোন আলাপাদি হয় না এবং যাঁহারা দিবাভাগেও গঙ্গাস্নানে যান তাহাঁরাও কোনো জ্ঞানির সহিত বিশেষালাপাদি করেন না [।] কেবল ঘাটের এবং নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষদের সাক্ষাতে সর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া যান।'[134] মেরেডিথ বর্থউইক সম্ভ্রান্ত ও অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গীয় ঘরের মেয়েদের স্নান করতে যাওয়ার এই ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে তৎকালীন বাঙালি সমাজে শ্রেণিগত এবং স্থানগত বিভাজনের আলোকে দেশাচারের ভিন্নতার দিকটি আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। যেমন গ্রাম বা মফস্বলে ভদ্রপরিবারের মেয়েরা স্নানঘাটে পুরুষের উপস্থিতিতেই স্নান সারতে পারতেন, পথ দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন, এমনকি ধূমপানও করতে

---

132 কুমারী সৈদামিনী, "লজ্জা"; 'বামারচনাবলী, ১ম ভাগ', পৃ-২২-২৪।

133 সমাচার দর্পণ, ৫ জানুয়ারি, ১৮৩৩; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১৮৩০-১৮৪০', ২য় খণ্ড, (কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ফাল্‌গুন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) পৃ ৯৭।

134 তদেব, পৃ ৯৭।

পারতেন। কারণ নারী শরীর দূষিত বা অপবিত্র করার মতো অনুঘটকগুলো শহুরে পরিমণ্ডলে যতটা ক্রিয়াশীল থাকে, গ্রাম-মফস্বলকে সেই অনুপাতে নিরাপদ ভাবা হত হয়ত। কলিকাতার বেশিরভাগ পরিবারের মেয়েদের কঠোর পর্দা প্রথার আওতায় এনে, পুরুষেরা নারী শরীরকে সামাজিক দূষণের হাত থেকে বাঁচানো গেছে ভেবে পারিবারিক আভিজাত্যের নিশান তুলতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বৌদের নাকি ভোর রাতে পালকি সুদ্ধ জলে ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান করানোর রীতি ছিল।[135] খুব মজার বিষয় হল, গ্রাম-মফস্বল থেকে নতুন স্বপ্ন নিয়ে কলিকাতায় এসে কাজ করে একটু প্রতিপত্তি অর্জনের পর অনেক পুরুষের মধ্যে স্ত্রীকে কলিকাতায় এনে, তাদের উপর পর্দাপ্রথা চাপিয়ে ভদ্রলোক হিসেবে সমাজে নাম পাওয়ার উদগ্র বাসনাও কাজ করত।[136] বর্থুইকের এই মতামতের সমর্থন তৎকালীন অনেক সাহিত্য ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে। ভোলানাথ চন্দ্র বৃন্দাবনের রাস্তায় রকমারি রঙের কাপড় পরিহিত বাঙালি রমণীদের যত্রতত্র ভ্রমণ করতে দেখে শেক্সপিয়রের ওথেলো' থেকে একটা বিখ্যাত লাইন আওড়েছিলেন—'They do let heaven see the pranks,/ They dare not show their husbands.'[137]—অর্থাৎ এই মহিলারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে কুলে কলঙ্ক লাগাচ্ছে কিনা কেউ জানি না। তিনি বিশদে লিখছেন—'…Our Bengalee ladies may go and return without infection, may well form a serious matter of apprehension—for it is to the female virtues that we should look, not only for the happiness of our homes, but also for the support of the national character, which has always led to national greatness.'[138] অর্থাৎ যে বাঙালি মেয়েরা বৃন্দাবনের রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরছেন, তাঁরা যে নিজেদের সামাজিক শরীরকে নিরাপদ রাখতে পারছেন—এই বিষয়টা নিয়ে তাঁর সংশয় আছে। এরপরই তিনি পুরুষের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, নারীর মেয়েলি গুণাবলীকে সযত্নে রাখা একটি সমাজের কর্তব্য। কারণ এই গুণাবলীর মাধ্যমে শুধু ঘরে প্রশান্তির সুবাতাস বহতা থাকে না, জাতীয় চরিত্রের সুস্থিতির জন্যও নারীর

---

[135] রাধারমণ মিত্র দেখিয়েছেন, তৎকালে কলিকাতা ঘেঁষা গঙ্গার তীরে তিনধরণের ঘাট ছিল। একধরণের ঘাটে মহিলা-পুরুষ একসাথে স্নান করতে পারতেন, (বলা বাহুল্য এই মেয়েরা নিশ্চয়ই অভিজাত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, নইলে তাদেরকেও পারিবারিক স্বভ্রমের জোয়াল বইতে হত); আরেক ধরণের ঘাট ছিল কেবল পুরুষদের ব্যবহারের জন্য (নিমতলায় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট); এবং অন্যটা শুধু নারীদের ব্যবহারের জন্য (উদাহরণ- গিরিশচন্দ্র বসুর ঘাট)। রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা দর্পণ, ১ম পর্ব', (কলিকাতাঃ সুবর্ণরেখা, পুনঃমুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৪), পৃ ২৫৪।

[136] Meredith Borthwick, 'The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905', (Princeton: Princeton University Press, 1984), pp. 5- 6; অর্ণব সাহা, 'উনিশ শতকে বাঙালি মেয়ের যৌনতা', (কলকাতা প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৭)।

[137] Bholanauth Chunder, 'The Travels of a Hindoo to Various Parts of Bengal & Upper India, Vol. II' (London: N. Trubner & Co, 1869), p. 96.

[138] তদেব, পৃ ৯৭

সামাজিক দেহের নিয়ন্ত্রণ জরুরি। তাই সেদিক থেকে উনবিংশ শতকে নারীর পোশাক-সংস্কারে নামাকেও জাতীয় চরিত্রের স্বচ্ছতার তাগিদ-অনুসারী এবং আব্রুর নতুন সংজ্ঞাকে রূপায়িত করবারও তাগিদ-অনুসারী বলা যায়।

নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের কাছে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে অন্দরমহল এবং বহির্মহলের জীবনচর্যা যে ইতরতার সমতুল ঠেকতে শুরু করেছিল, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রতিবেদনে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের প্রতিবেদন—'আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমাদের পত্রপ্রেরকরা নানাপ্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহা পরিত্যাগ করনার্থ সর্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন, অদ্যপিও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণাবোধ করেন নাই, সেই বিষয় এই যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারে সবস্ত্র বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না [।] শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, যে বস্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় সে বস্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি।'[139] এখন আসছে উনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজে সভ্যতা নামক প্রচারণায় অনুসরণযোগ্য সেই জাতির কথা, যাদের কথা এর আগের বিভিন্ন উক্তিতেও বারবার ফিরে ফিরে এসেছে – 'ইংরাজদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন না, হিন্দুদিগের মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সরু বস্ত্র পরেন না, কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী-পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণে ঢাকা, চন্দ্রকোণা, শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় [।] ওই তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গদেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন তাঁহাদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষত স্নান করিয়া উঠিলে শরীরের সর্ব্বাঙ্গের সূক্ষ্ম রোম পর্য্যন্ত অন্য লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও মান্যবর মহাশয়গণ আপনাদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্বাপর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি।'[140] এইক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষনীয়, লেখক বলছেন বাঙালি ভদ্রমহোদয়রা যাঁদের প্রাণপণে অনুকরণ অনুসরণ করতে চান বা যাঁদের অনুকরণ অনুসরণ করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চান—উভয় শ্রেণির মধ্যেই কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার নেই, কারণ নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম বস্ত্রের সাথে ফ্যাশন তো জড়িয়ে নেইই, বরং আছে ইতরতা। যে ইতরতায় কিছু বাঙালি পুরুষ এবং বেশিরভাগ বাঙালি নারী সামিল বলেই তাঁদের এককথায় 'লম্পট লম্পটী'র ন্যায় দেখতে লাগে। সুতরাং এই দৃশ্যমান লাম্পট্য থেকে নিজেদের মুক্ত করে সুরুচিশীলতায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল সূক্ষ্ণ বস্ত্র নিরোধক আন্দোলনে পুরুষদের তুলনায় নারীদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তির পর বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের ভদ্রবিত্তে পরিণত হতে রুচিশীলতায় যা যা সংস্কার প্রয়োজন সেই সংস্কার তাঁরা চাকরীস্থলে পোশাকি আইন-কানুনের

---

[139] সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৬ জুন, ১৮৫১

[140] তদেব।

প্রত্যাঘাতে হোক বা তৎকালীন বিশ্বের ফ্যাশন-সচেতনতার হাওয়াকে বুঝে সেই অনুযায়ী চলার মানসিকতার মধ্য দিয়েই হোক—যেকোনো ভাবে অর্জন করেছিলেন। এককথায় ঘর ও বাহিরের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, তাঁদের গতায়তের পথটা অনেক মসৃণ ছিল। কারণ তাঁদেরকে জুঝতে হচ্ছিল কেবল উপনিবেশিকতার অভিঘাতের স্াথে। কিন্তু নারীদের পথটা আরো জটিল, কারণ তাঁদের সামনে দুটো অভিঘাত তখন—একটা পুরুষতান্ত্রিকতার, অন্যটা উপনিবেশিকতার। সোজা ভাষায় বললে, উপনিবেশিকতার অভিঘাতে পুরুষতান্ত্রিক ধাঁচার পরিবর্তনই নারীকে নতুন বস্ত্রে ঢেকে নিজের সম্মানের নতুন পরিসর রচনা করেছিল। ১৮৬০ এর দশকেই বাঙালি রমণীদের বস্ত্রসংস্কার বিষয়ে একটা কবিতা লেখা হয়। যার প্রতিটা লাইনই এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক— 'সম্বোধিয়া গুরু কন, প্রিয়তম বামাগণ!/ শুন আজি বসন বিষয়;/ সংক্ষেপে কহিব তার/ দোষ-গুণ ব্যবহার,/ কিবা মন্দ কিসে ভালো হয়।/ অতিসূক্ষ্ম পরিধেয়, পরা অতি অবিধেয়,/ উভয়েরি পুরুষ রমণী;/ ইউরোপ আফরিকা, এস্যা কিবা আমেরিকা,/ এ নিয়ম সমস্ত ধরণী।/ কেবল পুরাণ বেদ, বাইবেল মতভেদ,/ বিবাদ তাদের অতিশয়;/ কিন্তু "দীনে দয়া কর", ইহাতে কি মতান্তর,/ কাহারো সহিত কারো হয়?/তথা ভিন্ন দেশাচার, হক ভিন্ন ব্যবহার/ ভিন্ন মত ভিন্ন সমুদয়;/সভ্য জাতি আছে যত, সবাকার এক মত,/ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধেয় নয়।'[141] অর্থাৎ এখানেও সেই সভ্যতার নিদান দেওয়া হচ্ছে। যে সভ্যতায় শরীরে কাপড়ের সংস্থান শরীর ঢেকে শালীনতা রক্ষার জন্য। কিন্তু শরীর ঢাকার নিমিত্ত বস্ত্রই যখন শরীরকে না ঢেকে উন্মুক্ত রাখে, সেই বস্ত্র নিন্দনীয়। পরের পঙক্তিতে দেখা যাক,-- 'সভ্য দেশ সাধারণ, করিয়াছে নির্ব্বাচন/ যাহা, তাহা অকারণ নয়;/কর সবে দরশন, বসনের প্রয়োজন,/ সূক্ষ্মতায় সিদ্ধ নাহি হয়।'[142] কেন? কারণ—'শীত বাত নিবারণ, সভ্যতার সম্পাদন,/আর লজ্জা করা নিবারণ;/ এই কয় প্রয়োজন, প্রধানত সুসাধন,/ করিবারে বসন ধারণ।'[143] কিন্তু বাংলা দেশে এর বিপরীত দশা দেখে কবি হতাশা ব্যক্ত করেছেন—'আনুষঙ্গী শোভা তার, নহে শোভা মুলাধার,/ বঙ্গে দেখি বিপরীত তার;/ বসনে যা প্রয়োজন, সব দিয়া বিসর্জ্জন,/ শোভাকেই করিয়াছে সার।/ সূক্ষ্ম যে বসন যত, তারি সমাদর তত,/ মোটা নামে সবে চটা হয়;/ দেখি তন্তুবায়গণ, সবে হয়ে সচেতন,/ সূক্ষ্মবস্ত্র বোণে অতিশয়।/ কোন দেশ ভাগ্য ধর, দেখি না এমনতর,/ কোথা আছে ঢাকা শিশুনিয়া;/ কোথা আছে শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা সুরপুর--/ মর্ত্যলোকে না পায়(ই) খুঁজিয়া।/ শান্তিপুরে, শিমুলিয়া, সূক্ষ্ম ধূতি পরিধিয়া,/ এদেশীয় মূর্খ জনগণ;/ আপনাকে ভাগ্যধর, মনে করে শ্রেষ্ঠতর,/ তাহাতেই সুখের গণন।' [144] কবির মন নতুন শ্লীলতার

---

141 'সূক্ষ্মবস্ত্র', বামাবোধিনী, কার্ত্তিক, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ১২৩।

142 তদেব।

143 তদেব।

144 তদেব, পৃ ১...

প্রকল্পে এতই নিমজ্জিত যে, তিনি এদেশীয় আবাহাওয়ার সাথে সূক্ষ্ম বস্ত্রের সম্পর্ককে তলিয়ে না দেখে, নারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ছেন—‘ দেখ দেখি বালাগণ, এত সূক্ষ্ম যে বসন,/ করে কি সে অঙ্গ আবরণ?/ বসনে উলঙ্গ হায়! সভ্যতা কি থাকে তায়?/ নহে সে কি লজ্জার কারন?/ সভ্যতা থাকিবে যায়, তায় দেখি লজ্জা পায়,/ সদাশয় সভ্য জনগণ।’ [145] অর্থাৎ সভ্যতার নতুন মানদণ্ড হল, শরীর ঢেকে সামাজিক বলয়ে অংশগ্রহণ। এই সভ্যতায় পুরুষের ধুতির পিছন থেকে পায়ের ত্বক দেখা যাওয়াটা সুশীল আচরণের অন্তরায় বুঝে পুরুষ হাঁটু পর্যন্ত মোজা পরে, তাকে গার্টার দিয়ে আটকে সভ্যতার বৃত্তে নিজেকে সামিল করতে চেয়েছেন। পাগড়িকে নতুন দেশাচারের বিরুদ্ধ সাব্যস্ত করে, টুপি খুলে হাতে নিয়ে নতুন আদবে শিলমোহর দেওয়া নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সাথে পত্রযুদ্ধ করেছেন। কোর্টে ইংরাজি স্টাইলের বুট পরে, জুতো না খুলে প্রবেশাধিকারের জন্য পত্রযুদ্ধ করেছে। অর্থাৎ এলবার্ট-ফ্যাশন, বিলিতি জুতো, টুপি হয়ে উঠেছিল সভ্যতার নিশান। আর সেই সভ্যতানুসারী চোখ যদি দেখে যে, যে নারীকে অন্দরমহলে আবদ্ধ করা হল, তথাকথিত নারী শরীর কেন্দ্রিক সামাজিক ‘পাপাচার’কে রোধ করার জন্য, সেই শরীরটাই পেটিকোটের বদলে নিতম্বে আলতা মেখে, সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভিতর দিয়ে নিজের ত্বকের দৃশ্যমানতা রোধ করবার চেষ্টা করছে [146]—তখন তো নিজের শীলিত চোখের সামনের পরিসরে যা যা অশীলন ঠেকছে, তাকে পাল্টে ফেলবার চেষ্টা করবেই। তাই কবি লিখছেন, -- ‘একমাত্র সূক্ষ্ম শাটী, পরিচ্ছদ পরিপাটী,/ রমণীর হয় মনোনীত;/ হেনদেশে বামাগণ, অবরোধে রুদ্ধ রন;/ ইহা কভু নহে অনুচিত।.../ হক যত সুশিক্ষিত, কুসংস্কার বিরহিত,/ দূর হক দুষ্ট দেশাচার;/ তবু পরিচ্ছদদোষ, মূর্ত্তিমান অসন্তোষ,/ অন্দরের অর্গল আকার।’[147] অর্থাৎ যে শিক্ষা, উদারতায় এই বস্ত্রদোষকে দোষ হিসেবে না দেখে, দেশাচারের নামে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস চলে, এবং মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে নব্য সভ্যতার নব্য পুরুষকারের সাথে যুক্ত হবার উদযোগ না থাকে, সেই শিক্ষা শিক্ষাই নয়, সেই শিক্ষা আন্তরিক অর্গলে আবদ্ধ। কবি এখন নিদান দিচ্ছেন, কখন কিরকম বস্ত্র পরা যেতে পারে, বা কখন কিরকম বস্ত্র পরলে তা দূষিত আচার জাত—‘ গৃহে যবে অবস্থান, সরু বস্ত্র পরিধান,/ করিলেও তত দুষ্য নয়;/ কিন্তু যবে নিমন্ত্রণে, কিম্বা কোনো প্রয়োজনে,/ স্নানান্তর যাইবারে হয়;/ সরুবস্ত্র সেসময়, কখনই যোগ্য নয়,/ নিশ্চয় দূষিত অতিশয়।’ [148] কবি আক্ষেপ করছেন, এমন অনেক নারী আছেন, যারা গায়ের গয়না দেখানোর জন্য সভ্য মোটা কাপড়ের পরিবর্তে সরু কাপড়ের ফ্যাশনকে সমুচিত মনে করেন, সেই শ্রেণির মেয়েদের ‘লঘুচিত নীচাশয়’ বলে কবির

---

[145] তদেব।

[146] জয়িতা দাস, ‘সাজমহল’, (কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০১৫), পৃ ৩৭।

[147] ‘সূক্ষ্মবস্ত্র’, পৃ ১২৫।

[148] তদেব, পৃ ১২৬।

বক্তব্য—‘আছে বামা কতিপয়, লঘুচিত নীচাশয়,/ দেখাইতে গায়ের গহনা;/ যাহে গাত্র আবরণ, হয় হেন সুবসন,/ ঘৃণা করি কখন পরে না।’[149] পাল্টে যাওয়া দেশকালের নিরিখে নব্য মধ্যবিত্তের ভদ্র পরিচিতির বিনির্মাণে স্ত্রীর উপস্থিতির দাবি মেনে, স্ত্রীকেও ঘরের বাইরে বেরুতে হবে, আর তখন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে বেরুলে যা যা বাস্তবিক সমস্যায় তাকে পরতে হতে পারে, তারও একটা ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন—‘ ...অসৎ পুরুষগণ, করি নারী দরশন, / তাঁর দিকে একদৃষ্টে রয়;/ কভু মন্দ গান গায়, সরমেতে মরে যায়,/ সাধুশীলা রমণী নিচয়।’[150] এরূপ কু-দৃষ্টি, অ-শীলতা, কু-ফ্যাশনের হাত থেকে মুক্ত হতে গেলে তাই কিরূপে যত্নবান হতে হবে, তার নিদান দিয়ে কবির বক্তব্য—‘কিরূপ বসন তবে নিন্দিত নাহিক হবে,/ হইতেছে এবে জিজ্ঞাসিত।/ আছে এতে নানা মত, অনেকের মতামত,/ বিদেশীর সভ্যতানুগত;/ কিন্তু যাহা বঙ্গমাঝে, সমাজে অনেক সাজে,/ সমধিক তাহাই সঙ্গত।’[151] পাশ্চাত্য শিক্ষিত পুরুষ নিজে পাগড়ি খুলে টুপি পরতে চেয়েছেন, দিশি চটি খুলে বুট পরতে চেয়েছেন, কোট-প্যান্টালুন পরতে চেয়েছেন, কিন্তু ঘরের মেয়ে-বৌ শাড়ি ছেড়ে গাউন পরুক, তা চাননি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছেন, ‘তিনি [তৎকালের বড় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ] স্ত্রীর সম্বন্ধে বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাজে বের করবার আগে তাঁকে কনভেন্টে ইংরিজি লেখাপড়া শিখিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয়নি।...সে সময় আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে বাইরে যাওয়া যায় না। তাই উনি [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] কোনও ফরাসি দোকানে ফরমাশ দিয়ে একটা কি পোশাক আমার জন্য করালেন—বোধ হয় তাদের মতে Oriental যাকে বলে। সেটা পরা এত হাঙ্গাম যে ওঁর (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না। দুচারখানা শাড়িও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম’ [152] অর্থাৎ দেশীয় নারীদেরকে নিয়ে সভ্য সমাজের সভাসমিতিতে বা আমোদে সভ্য হিসেবে অংশগ্রহণ করবার তাগিদে, দেশীয় শিক্ষিত উচ্চবিত্তরা স্ত্রীকে সভ্য সমাজের ভাষা শিক্ষা দিয়ে বা সভ্য সমাজে মেয়েদের ফ্যাশনে ব্র্যাণ্ড মূল্যে অতুলনীয় ফরাসি ডিজাইনের পোশাক পরিয়ে, নিজেদের মানরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেও শাড়িকে অতিক্রম করে অন্য কোনো পোশাকি আবর্তে নারী শরীরকে বিনির্মিত করতে চাননি। কবির নিবেদন—‘শুন গো ভগিনীগণ! করিতেছি নিবেদন,/ স্থানান্তর করিতে গমন;/ হও কিছু সাবধান, পট্টবস্ত্র পরিধান,/ করি সবে করিয়া যতন।/ থাকিবে পিরাণ গায়, দূষ্য না ভাবিও তায়,/ তাহে অঙ্গ করে আবরণ...’[153] এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, পিরাণ হল সেলাই করা

---

[149] তদেব, পৃ ১২৬।

[150] তদেব, পৃ ১২৬।

[151] তদেব, পৃ ১২৭।

[152] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, “বস্বের কথা”, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত ‘পুরাতনী’, পৃ ২৫

[153] ‘সূক্ষ্মবস্ত্র’, পৃ ১২৭।

জামা বিশেষ। একসময় হিন্দু পরিবারের অন্দরমহল ছিল সাত্ত্বিকতার জায়গা। বহির্মহলে পুরুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরির প্রয়োজনে চোগা চাপকান, আচকানের মতো সেলাই করা পোশাক পরলেও অন্দরমহলে প্রবেশের আগে সেইসব পোশাক খুলে নিয়ে সেলাই বিহীন ধুতি চাদর খড়ম পরে নিতেন। আর সেই অন্দরমহলের সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি করে রেখেছিলেন নারীকে, শীতকালেও যার শীত নিবারণের ভরসা একটা সেলাইবিহীন ঢোলাই আর একটিমাত্র শাড়ি।[154] বিবেকানন্দের ভাষায়, ওই শাড়ি 'ঘোমটা টানার চোটে কোমরে' ওঠার জোগাড় হয়। তাই নতুন সভ্যতার প্রকল্পের সামনে আসুবিধাজনক সেই সাত্ত্বিকতার আবরণ ভাঙার শুরুর কালে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, -- পিরাণ গায়ে দিলে জাত যাবে এটা ভাবার কারণ নেই। নীরদ চৌধুরী বলছেন, সাত্ত্বিকতার পরিসর ভেঙ্গে এই নূতন সংস্কারমূলকতার 'পিছনে যেসমস্ত ধ্যান-ধারণা বা ঝোঁক ছিল, তাহার প্রায় সবটুকুই বিদেশী, শুধু দেশী ছাঁচে নূতন করিয়া ঢালা।'[155] আর এই ঝোঁকটা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি ভদ্রবিত্তদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে ধীরে ধীরে তাদের পরিবারের মহিলাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মেরুণা মুর্মু বলবেন, এর মধ্য দিয়ে নারী শরীরকে যেন যৌনতার প্রাকৃত রূপ থেকে তুলে ধরে ভিক্টোরীয় সাত্ত্বিকতায় স্থাপন করা হল।[156]

বামাবোধিনী পত্রিকার আরেকটি প্রতিবেদনে তাই নারীর কন্ঠে শোনা যাচ্ছে, এতক্ষণ ধরে বর্ণিত পুরুষ-তান্ত্রিক বয়ানের একই প্রতিধ্বনি—'এদেশে স্ত্রীগণ যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন এদেশে চলিত বলিয়া তাহাতে কোন দোষ বোধ হয়না। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে, ইহা কেবল উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিয়া গায় একটা আবরণ দিয়া মাত্র। পরিচ্ছদ যতদূর সংক্ষেপে সারা যাইতে পারে, তাহা এদেশের রমনীতেই দেখা যায়।'[157] কিন্তু তার মানে এ নয়, সংস্কারকরা নারীদের গায়ে ইউরোপীয় ধাঁচের পোশাক চাপাতে চেয়েছিলেন, বরং তাঁরা পুরোমাত্রায় চেয়েছিলেন যে নারী একসময় ছিল হিন্দু সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি, সেই সাত্ত্বিকতার উত্তরাধিকার তারা দেশীয় শাড়ি-কেন্দ্রিক সংস্কারকে মেনে নিয়েই বহন করে চলুক। সৌদামিনী খাস্তগীর বামাহিতৈষিণী সভার অধিবেশনে বলেছিলেন—'ইংরাজ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত ভাল বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণ মন্দ। সুতরাং তাহাদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে গেলে কয়েকটি দোষ পরিত্যাগ করিতে গিয়া অপর কয়েকটি দোষ গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষত ইংরাজদিগের পরিচ্ছদের

---

154 'পুরাতনী' দ্রষ্টব্য।

155 নীরদ সি চৌধুরী, 'বাঙালি জীবনে রমনী', পৃ ১৬।

156 Maroona Murmu, 'Words of Her Own: Women Author's in Neneteenth-Century Bengal', (New Delhi: Oxford University Press, 2020), p. 84.

157 'বঙ্গাঙ্গনাদের পরিচ্ছদ', বামাবোধিনী, ভাদ্র ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪৮।

অনুকরণ করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই নিঃস্ব, সুতরাং তাহাদের পক্ষে এরূপ পরিচ্ছদ কোনোমতেই সম্ভবনীয় নহে। বম্বে ও উত্তর-পশ্চিমবাসীদের পরিচ্ছদ ভাল বটে, স্বকপোলকল্পিত ও জাতিসঙ্গত কোন একটি সভ্যচিত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিলে যত সুখানুভব হয়, অপর জাতীয়ের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিলে তত হয় না, এরূপ করিলে কিয়ৎপরিমাণে কপটতার ভাব আসিয়া পরে। কারণ যদি কোন বাঙ্গালী ইংরাজের কিংবা অন্যদেশীয় লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করেন, লোকে তাঁহাকে তদ্দেশীয় জ্ঞানে অদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকে। অথবা কোন ব্যক্তি যদি ইংরাজের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহাদের সমাজে গমন করেন, তবে তাঁহাকে স্বধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানে হয়ত তাঁহার সাক্ষতে নিঃসঙ্কোচে বাঙ্গালীদিগের নিন্দা করিতে পারে, এবং সেই নিন্দা তাঁহাকে স্থিরচিত্তে শুনিতে হয়।’ [158] সৌদামিনীর লেখায় স্বাজাত্যবোধ প্রবল কারণ তাঁর পুঁথিগত বিদ্যায় ইংরিজি নভেল-স্টোরির রোম্যান্টিসিজমের হাতছানি নেই। তাই তাঁরই পথের পথিক রাজলক্ষ্মী সেনের গলাতেও শোনা যাচ্ছে একই প্রতিধ্বনি—‘এক্ষণে অনেকেই ইউরোপীয় পরিচ্ছদ উত্তম বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা যেরূপ বৃহৎ তাহাতে এদেশীয়দিগের সাধারণ লোকের উপযুক্ত নহে। কারণ এদশীয় অনেকেই অবস্থানুসারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে বাধ্য হয়েন। তাহাতে এরূপ বৃহৎ ব্যাপারের সমাবেশ হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এদেশীয় লোকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ব্যয় বাহুল্য হয়, এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অনেকেই সক্ষম নহেন।’[159] তাই ‘প্রত্যেক দেশের লোকেরই, পরিচ্ছদে কি আচার ব্যবহারে স্বীয় স্বীয় দেশের চিহ্ন রাখা কর্তব্য। এইজন্য সম্পূর্ণরূপে অন্য দেশের অনুকরণ করা উচিত নহে। তাহাতে হীনতা প্রকাশ পায়। অন্য কোনো দেশে ধর্ম্ম বিষয়ে বা চরিত্র বিষয়ে যে উত্তম ভাব আছে, তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু বাহ্যিক বিষয় সকলের অনুকরণ করিবার কোনো আবশ্যকতা নাই।’ [160]

এপ্রসঙ্গে দাঁড়িয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর উক্তিটি স্মরণীয়, তিনি ব্রিটিশের অনুকরণ প্রসঙ্গে বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, অনুকরণ করতে হয় তো ব্রিটিশের অনুকরণ না করে মুসলমানের অনুকরণ কেন করি। কারণ ব্রিটিশরা তো রাজার জাত, মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে তাদের রাজত্ব। সুতরাং পরাজিত গোষ্ঠীর অনুকরণে কোনো সুফলের আবাদ হতে পারে না বলেই তাঁর মত। কিন্তু নারীদের পোশাক সম্পর্কিত বয়ানগুলোতে বিলিতি পোশাকের আড়ম্বরের প্রতি একটা বিস্ময়ীভূত দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও, তাঁরা পোশাক সংস্কারে না পোশাকের বিলিতি কায়দার সমর্থক না মুসলমানি কায়দার, না তাঁরা ভারতের অন্য প্রদেশের

---

[158] তদেব, পৃ ১৫০।

[159] তদেব।

[160] তদেব, পৃ ১৫১।

পোশাকি কায়দাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। সুমাতা, সুপত্নী, সুকন্যার প্রকল্পকে স্বার্থক করে, তাঁদের পোশাক সংক্রান্ত চিন্তা ঐতিহ্যের চারিপাশেই ঘোরাফেরা করেছে। এদেশীয় মহিলাদের মধ্যে গাউন পরে চলাফেরা সাবলীল ও সুশ্রীতার লক্ষণ হিসেবে গণ্য হয়নি মানে এমন কিন্তু নয় যে, তাঁরা কলকাতার বিলিতি বাজারের উপভোক্তা ছিলেন না। পরিবারের পুরুষের বিলিতি বাজারের কাপড়-চোপড়ের প্রতি, প্রসাধণের প্রতি ঝোঁক বাড়ার সাথে সাথেই, পরিবারের মহিলাদের মধ্যেও সেই ঝোঁক সংক্রামিত হয়েছিল। বা পুরুষেরা অর্ধাঙ্গিনীকে নিজের রুচির যোগ্য সহচরী করে তোলার জন্য, বিলেত প্রভাবিত বা বিলিতি স্নো পাউডারে তাঁদের অভিষিক্ত করতে শুরু করেছিল। যার ফলে স্বদেশী আন্দোলনের কালে পুরুষের বাহির জীবন জাতীয়তার বন্যায় ভাসমান থাকলেও ঘরটি ছিল বিলিতি পণ্যের প্রতি আসক্তিতে নিমজ্জিত। ফলত, স্বদেশীর অনতি বিলম্বেই আবার আমদানি করা বিলিতি পণ্যে ফিরে যেতে সময় লাগেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সৈন্যদের খাওয়া-পরা জোগাতে যখন ভারতের ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা, তখনও বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘরে ওই বিলাসে নিমজ্জন বিষয়ে তাই মধ্যবিত্ত পুরুষের আক্ষেপ, তাঁরা যদি নিম্নবিত্তের মতো ভুখা মিছিলে সামিল হতে পারতেন, তাঁরা যদি সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের ইগোর শৃঙ্খল ভাঙতে পারতেন! কিন্তু তাঁরা পার্‌েন না। কেন পারেনা, তার ফিরিস্তিও শোনানো হয়েছিল, ‘এই মিশ্রণের কাজে বাধা সৃষ্টি করিবেন আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী-সম্প্রদায়। মিলনের প্রথম ধাপ হইল বাহুল্য ও বিলাসিতা বর্জ্জন। আমরা সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি, পাঞ্জাবি ছাড়িয়া ফতুয়া গেঞ্জি সহজেই ধরিতে পারিব; কিন্তু তাঁহারা গহনা-শাড়ি-সাবান-স্নোর আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া ঢেঁকিতে পাড় দিতে আর রাজি হইবেন না। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, যুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে বাগে আনা যায় না; তাঁহারা সর্ব্বদাই এ-বাড়ি ও-বাড়ির নজির দিয়া যুক্তি খণ্ডন করিয়া থাকেন...।’[161] ব্যাপারটা বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে পুরুষতন্ত্রের রক্ষক শ্বাশুড়ির মতন। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের পোশাকি সম্ভ্রম ও মধ্যবিত্ততার রক্ষয়ত্রী হয়েও যেন মধ্যবিত্ত নারীরাই ধরা দিয়েছেন।

মধ্যবিত্ততার সামাজিক সম্ভ্রমের নির্মাণে স্ত্রী-শিক্ষা যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল, তেমনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিজস্ব ক্ষমতার কাঠামোও জটিল হয়ে উঠতে থাকে। যে মেয়েকে বাপ-ঠাকুরদা পাশ্চাত্য পরিশীলনে পরিশীলিত করেছেন, সেই মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে স্বামীর পরিপূরক হয়ে উঠুন – এটা কোথাও সেই মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষার কম তেজের কারণ হয়ে ধরা দিয়েছিল অনেক মধ্যবিত্ত অভিভাবকের কাছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে বা বিশ শতকের শুরুর দিকে এমন প্রহসনও লেখা হয়েছিল, যেখানে দেখা যাচ্ছে – কীটস-বাইরন-শেলী পড়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন পুরুষের বিয়ে হচ্ছে। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষিত পুরুষের সুপার-ইগোর সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মেয়ের সুপার-ইগোর সংঘাতের আশঙ্খা তৈরি হচ্ছিল। ‘মোসাহেবী বা

---

161 ‘সংবাদ-সাহিত্য’, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ ১০০।

কেরানীগিরি করবার চাইতে ঘর-জামাইগিরিকে ... সুখের চাকরি' বলে মনে করা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অ-শিক্ষিত মতিলাল ভটতাচার্য্যের মতো চরিত্র বিকাশের মতো সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই তৈরি হচ্ছিল। যারা মাসে পঞ্চাশ টাকা হাত খরচ, প্রত্যেক জামাই ষষ্ঠীতে প্রাপ্ত ঘড়ি, ঘড়ির চেইন, নতুন আঙটি, কাপড়, উড়ুনি, মোজা, জামার বাবুয়ানিকে সামাজিক সম্ভ্রম প্রাপ্তির লম্বা দৌঁড়ে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার শর্টকাট রাস্তা মনে হিসেবে বিচার করছিলেন।[162] পুরুষ-চরিত্রের এহেন দিকের বিকাশ নিয়ে প্রহসনকারের যে ভীতি প্রহসনের চরিত্র-সৃজনের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়েছে --- সেখানে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার এরূপ শর্টকাট পথকে দীনহীন বাঁচা হিসেবেই আঁকা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে পুরুষের সামাজিক যাপনের পোশাকি ধরণটা কিরূপ হওয়া উচিত, খেয়ে-পরে বাঁচার কোন পথটা সম্মানের, কোনটা দীনতার – এই দিকগুলোও অঙ্কনের মধ্য দিয়ে প্রহসনকাররা উদ্‌ভুত সামাজিক পরিস্থিতির সাথে সাথে মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের একটা মানদণ্ডও নির্ণয় করছিলেন।

উপসংহার

মধ্যবিত্তের শ্রেণি-পরিসরের সংগঠনে লজ্জা ও সম্ভ্রমের পোশাকি রূপ যে আদপেই সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর একটা অবয়ব, তা উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়। সমাজের স্তর বিশেষে এই অবয়বের পরিবর্তন হয়। তাই যা রাজার লজ্জা, তা সাধারণের লজ্জা নাও হতে পারে। যা সাধারণের লজ্জা, তা সন্ন্যাসীর লজ্জা নাও হতে পারে। কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিসর অনুযায়ী প্রতিটি গোষ্ঠী লজ্জা ও সম্ভ্রমের স্বাতন্ত্র্যে স্থিত। আবার পরিসর অনুযায়ী প্রতিটি গোষ্ঠীই একেকটি সামাজিকতার অহঙে আবদ্ধ। রাজার অহঙ, প্রজার অহঙ থেকে স্বতন্ত্র; সন্ন্যাসীর অহঙ গৃহীর অহঙ থেকে স্বতন্ত্র্য। তাই যামিনীকান্ত সেন বলেন –

> মানুষের ভিতর অঙ্গগত বৈচিত্র্য বিশেষ নেই বলেই, মানুষের মনের ভিতর অহরহ যে বৈচিত্র্যের সুধা জেগে উঠছে, তাকে সে চরিতার্থ করছে – বসন ও ভূষণকলার সাহায্যে। রাজা প্রজার যে ভেদ তা দেহগত নয়, -- রাজা মুকুট পরে তলোয়ার হাতে করে শোভিত হয়ে নূতন চেহারা বের করছে – তা'তেই করে প্রজার সঙ্গে তার চাক্ষুস ভেদ উপস্থিত হচ্ছে। সন্ন্যাসী গেরুয়া পরে নিজের চেহারাতে নূতন কিছু আরোপ করছে – নাহলে তার সঙ্গে রাখালের ভেদ নির্ণয় করা দুরূহ। এইরূপে দেখা যায়, বসনভূষণের একটা অবিচ্ছেদ্য আবেষ্টন মানুষের বিচিত্র জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য – এবং যে পরিমাণে এই

---

[162] হরিমোহন পাইন, "বৈষ্ণব মাহাত্ম্য", ১৮৮৭, জয়ন্ত গোস্বামী, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', (কলিকাতাঃ সাহিত্যশ্রী, ১৩৮১), পৃ ১১৯৭-১২০০।

> আবেষ্টনীর সংহতি নিবিড়, গঠন অক্ষত ও সুসম্পূর্ণ এবং ছন্দ নীরন্ধ্র – সেই পরিমাণে সেই জাতি ভাববন্ধনে জমাট, নিষ্ঠায় অপরাজেয়, এবং শৃঙ্খলায় দুর্ভেদ্য।[163]

কিন্তু বসন-ভূষণের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যবে থেকে সম্মিলন ঘটানোর ভাব শুরু হয়, তখন থেকেই চাপিয়ে দেওয়ার ভাবও সচল হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন ১৮০৬ সালে দক্ষিণ ভারতীয় মিলিটারিদের পোশাকে পরিবর্তন এনে, তাতে পাগড়ির পরিবর্তে টুপির মত মস্তকাবরণ জুড়েছিল, বা কানে কোনোরূপ গহনা পরাতে বিধিনিষেধ এনেছিল – এই আইন কিন্তু দেশীয় রেজিমেন্টের কর্মচারীরা নিজেদের নিজস্বতার উপর হস্তক্ষেপ হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে যখন সেই ব্রিটিশরাই এদেশে উনিশ শতকের মধ্যভাগে যেতে যেতে প্রবলরূপে ধরা দিলেন, তখন এদেশীয় স্বাতন্ত্র্য তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করল। তাই তারিণী কুমার ঘোষ দাবি তুলছেন – সরকার বাহাদুর পূর্বের মতো টুপি পরে সম্মান প্রদর্শনের আইন আনুক। অর্থাৎ একটি গোষ্ঠীর সম্মিলিত চেতনা যখন অন্য গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, অন্য গোষ্ঠীর দ্বারা আনিত শিক্ষা, সামাজিকতা ও অর্থনীতিতে নিজেদের সামিল করতে থাকে, তখন থেকেই সেই গোষ্ঠী নিজ সমাজের পুরাতন আচার-বিচারের দিকে লজ্জার চোখে দেখে। কারণ তাদের মধ্যে নতুন লজ্জার বুনন শুরু হয়ে গেছে ততদিনে। দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী বলেছেন, আমাদের সমাজে মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন সম্ভ্রমের জন্ম হচ্ছে। মুহুর্মুহু আমরা বহু পুরাতনকে ‘ব্যাকডেটেড’ হিসেবে দাগিয়ে নতুনকে গ্রহণ করছি, যা আমাদের নতুন অহঙের বিকাশ ঘটাচ্ছে, নতুনের সাথে তাল মেলানোর প্রয়োজনে।[164] তবে তার মধ্যেও প্রবৃত্তিজাত ক্ষমতার কাঠামোটি কিন্তু বজায় থাকছে।

---

[163] শ্রীযামিনীকান্ত সেন, ‘পরিচ্ছদ-কলা’, সবুজ পত্র, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৭৫।

[164] শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ‘জিনিয়াস’, শনিবারের চিঠি, ৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫৫, পৃ ২০।

শরীর, পোশাক ও রাষ্ট্র: পোশাকি স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার নির্মাণ

ভূমিকা

বিগত সকল আলোচনায় উঠে এসেছে বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরে পুরুষের শ্রেণী চরিত্র এবং লজ্জা পোশাকের উপর ভিত্তি করে কিরূপে বিনির্মিত হয়েছিল। সেই পোশাকই আবার মধ্যবিত্ত পুরুষের জাতীয় চরিত্র প্রকট করবার ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা রেখেছে, তা এবার তলিয়ে দেখতে হবে। বিংশ শতকের শুরু থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উপর ভর করে আমরা স্বদেশীয় সামগ্রী গ্রহণ ও বিদেশীয় সামগ্রী বর্জনের তথা বয়কটের একটা হিড়িক ভারতবর্ষ জুড়ে দেখতে পাই। আর এই গ্রহণ-বর্জনের আবর্তে এদেশীয় তাঁতিদের বোণা খাদি কাপড় দেশীয়ত্বের চিহ্নস্বরূপ হয়ে ওঠে। খাদি কাপড় দেশীয়ত্বের চিহ্ন হয়ে উঠল মানে রাতারাতি হিন্দু মধ্যবিত্ত শেলাইবিহীন 'সাত্ত্বিক' ধুতি-চাদরে ফিরে গেলেন, তেমনটাও কিন্তু নয়। আবিগেইল মেকগাউন তীর্থঙ্কর রায়, হারুকা ইয়ানাগিসাওয়া, ডগ্লাস হাইনেস-দের লেখা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, স্বদেশী খাদিকে জাতীয়তার চিহ্নে রূপান্তরিত করলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত পোশাকি রুচিতে দেশীয় কাপড়কে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য পাশ্চাত্য-স্টাইলে পুরুষের জামা-কাপড় বানানোর ট্রেণ্ডও চালু ছিল।[1] শুধুমাত্র সেলাইবিহীন ধুতি উৎপাদন করলে যে মিলের বিকাশ অসম্ভব – তা মিল মালিকরা বুঝতে পারেন।[2] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্বদেশী যুগের অনেক আগে থেকেই তাঁদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথরা দেশি জিনিস তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 'আর্থিক ক্ষতির বোঝাত তাঁদের বহন করতে হয়েছিলই, দেশের লোকের অবজ্ঞা ও উপহাস সে ক্ষতির বোধকে দুর্বিষহ করে তুলেছিলো।'[3] এখান থেকেই অনুমেয় দেশীয় অভ্যাস ও রুচি বিদেশি পণ্যের উপর কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু স্বদেশীর কালে বাজারে বিলিতি রুচির দেশী কাপড়ের সমান্তরালে হাতে বোণা খাদি খদ্দরও বাজারে বিক্রি হত। কারণ স্বাদেশিকতার পালে হাওয়া লাগার সাথে সাথে বেশি দামে খাদি-খদ্দর পরিধান করাও যেন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। বিমল মিত্র যেমন বউবাজারের স্ট্রীটে যাওয়ার একটা গলির কথা লিখেছিলেন। যার প্রথম দোকানটির নাম, 'ইন্ডিয়া

---

[1] Tirthankar Roy, 'Cloth and Commerce: Textiles in Colonial India', (New Delhi: Sage Publications, 1996)

[2] Abigail McGowan, '"Khadi" Curtains and "Swadeshi" Bed Covers: Textiles and Changing Possibilities of Home in Western India, 1900-1960', *Modern Asian Studies*, Vol. 50, No. 2, March 2016, pp. 518-563.

[3] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী, ১ম খণ্ড' (কলিকাতাঃ অভিযান পাবলিশিং হাউস, পৌষ ১৩৫৭), পৃ ৭।

টেলারিং হল’, দ্বিতীয়টি ‘পবিত্র খদ্দর ভাণ্ডার’ এবং তৃতীয়টি ‘স্বদেশী-বাজার’। এই তিনটি নামের দোকানের উপস্থিতি থেকেই ওই অঞ্চলের লোকেদের বস্ত্র-রুচি আন্দাজ করা যায়। পাশ্চাত্য অনুসারী রুচির সাথে স্বদেশী রুচির মানুষজন তো আছেনই, সাথে আছেন খাঁটী স্বদেশী রুচির মানুষ। যারা স্বদেশীয়ানায় কোনো ভেজাল চাইতেন না।[4] বাহ্যিক সাহেবিয়ানায় আটকে থেকে নিজেদের স্বকীয়তাকে জলাঞ্জলি দিতে আর তাঁরা রাজি নন। তাই যে রুচি আন্তরিক বিকাশে বেড়ী পরায়, সেই রুচিকে সমালোচনার চোখে দেখার সূত্রপাত করেছিল স্বদেশী আন্দোলন। যোগেশচন্দ্র রায় ১৯১৮ সালে লিখেছেন, ‘লম্ব-শাট-পটাবৃতকে নির্বোধই বড় মনে করে। নির্বোধ, দেহ ও দেহের আবরণ দেখে, তাহা ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।’[5]

স্বাদেশিকতা: তত্ত্বে এবং অনুশীলনে

মহাত্মা গান্ধী এই খাদিকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবর্তে ‘পণ্য’ এবং ‘জাতীয়তাবাদের চিহ্ন’ হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন।[6] কিন্তু ১৯১৫ সালে গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাগমন করে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মঞ্চে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রকট হতে হতে ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সময় লেগেছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষে নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের বিকাশের সাথে সাথে গান্ধির স্বাবলম্বন ও অহিংসার দর্শনও এগিয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বাবলম্বনের সুর গাঁথা হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।[7] এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মননে একটা তাগিদ জেগেছিল, যার লক্ষ্য ছিল বিদেশী মিলের উপর নির্ভরতা থেকে নিজেদের সরিয়ে আনা। নিজেদের উদ্যোগে মিল প্রতিষ্ঠা করা। ম্যাঞ্চেস্টারের মিলে তৈরি কাপড়ের পরিবর্তে নিজেদের মিলে বোণা কাপড় পরিধান করা। ভারতের তাত্ত্বিক বিশ্বে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের ক্ষয়কারী প্রভাব

---

4 বিমল মিত্র, ‘সাহেব বিবি গোলাম’, (কলিকাতাঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, জানুয়ারী ১৯৫৩)।

5 যোগেশচন্দ্র রায়, ‘বস্ত্র-চিন্তা’, প্রবাসী, ১৮’শ ভাগ, ২য় খণ্ড, কার্ত্তিক ১৯১৮, পৃ ৩৬।

6 Lisa Trivedi, ‘Clothing Gandhi’s Nation: Homespun and Modern India’ (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2007), p. xvii.

7 যেকোনো সমাজে হঠাৎ করে তো কোনো ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না। কোনো কারণের অভিঘাতে কোনো কার্য হয়েছে, সেহেতু সেই কারণকে কার্যটির আবশ্যিক পূর্ববর্তী শর্ত বলা যেতে পারে। তার মানে সেই কার্যের আরো অনেক শর্ত দীর্ঘকাল ধরে চলা সামাজিক চলনের মধ্যে মিশে থাকে। তাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে এদেশে স্বাবলম্বনের সুর গাঁথা হলেও, এদেশে একটা শ্রেণির মধ্যে পাশ্চাত্য ধারা ও ভাব নিয়ে সংশয় কিন্তু ১৮৫০ সালের পর থেকেই অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের কয়েক দশক পর থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে পাশ্চাত্যপন্থীরা দলে ভারী থাকলেও ধীরে ধীরে ভারতীয় ধারার প্রতি সমর্থনকারীরাও বাড়তে থাকেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থিতি প্রকট হয়। দ্রষ্টব্য, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ‘আত্মঘাতী বাঙালী’, (কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪২৫), পৃ ৪৪।

নিয়ে আলাপ-আলোচনা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯০১ সালে দাদাভাই নওরোজী লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বই, 'Poverty and Un-British Rule in India'। যার মূল বক্তব্য ছিল, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত কিভাবে বৈদেশিক শক্তির হাতে লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়েছিল। আর সেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য থেকে দেশবাসীকে তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় 'আত্মশক্তির' উদ্বোধনের কথা বারবার উঠে এসেছে।[8] তিনি বলেছেন, 'ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।'[9] এই যে দেশবাসীকে স্বরূপে বাইরে বেরিয়ে আসার কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সুমিত সরকারের মতে এই আত্মশক্তি অনুভব করে আত্মোন্নতির পথে ঝাঁপানোই হল, 'constructive Swadeshi'। যার মূল স্লোগান ছিল, ব্যবসায়িক, শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় উদ্যোগে জোর দেওয়া, গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করে, হারিয়ে যাওয়া গ্রাম নির্ভর অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে মেলার মতন দেশীয় বিনিময় ব্যবস্থাকে সচল করা। ফলত এইসময়কাল থেকেই চরকায় কাটা সুতোর কাপড় বোনার উপর বিশেষ জোর দিতে দেখা যায়। সমকালীন পুস্তক-পুস্তিকায় তাই নিজেদের উদ্যোগে তুলা চাষ, এবং চরকাতে সুতো কাটার উপর বিশেষ ঝোঁক।[10] সমসাময়িক সামাজিক নাটিকাতে ইংরেজ শাসনের ফসল হিসেবে পোশাকে পরিচ্ছদে বাবুয়ানি দেখানো 'পাশ্চাত্য আনুগত্য' হিসেবে অভিযুক্ত।[11] এককথায়, স্বদেশ, স্বজাতি

[8] Sumit Sarkar, 'Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908', (New Delhi: People's Publishing House, 1973), p. 47.

[9] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', *রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র,* (কলকাতাঃ কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫), পৃ ১০৯।

[10] শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড, 'বঙ্গে কার্পাস চাষ', মৌলবি হাসেম আলি খাঁ কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত (সম্ভবত বিশ শতকের শুরুতে পাকাশিত); কেদারচন্দ্র চৌধুরী, 'স্বদেশী বস্ত্র বয়ন শিক্ষা, ১ম খণ্ড', (ময়মনসিংহ: সুহৃদ যন্ত্রে মূদ্রিত, ১৩১২ বঙ্গাব্দ); রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি, 'বস্ত্র-যজ্ঞ' (কলিকাতা আর ক্যাম্বে এণ্ড কোং, ১৯১৯)।

[11] 'সমাজ' নাটকের একটি দৃশ্যে জমিদারের পক্ষের লোক রতিকান্ত বলেছেন, 'বন্দে মাতরং' তথা স্বদেশী দলের জন্য 'সুখস্বচ্ছন্দ ত্যাগ করব! ডবল দাম দিয়ে...গুণচট কাপড় প'রতে হবে!' বোঝাই যাচ্ছে স্বদেশীর সাথে তাঁদের কোনো লেনদেন নেই। স্বাজাত্যবোধে তাদের কি এসে গেল, যদি উপরমহলের সাথে 'জো হুজুর, হ্যাঁ হুজুর' করে নির্ঝঞ্ঝাট কালনিপাত করা যায়। ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্যে তা আরো স্পষ্ট, 'যজমানেরা আজকাল ওইরূপ বস্ত্র প্রদান করেন। আর তাই পরিধান করে গৃহিনীর পশ্চাদ্দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সুতরাং তাঁহার আদেশ মত মিহি বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে হইল।' রতিকান্তের বক্তব্য, 'এ রকম কাপড় না হ'লে ... পরে সুখ?' কিন্তু পথে জাতীয় ধণভাণ্ডারের জন্য চাঁদা আদায়কারী শরতের চোখে পড়লে ওই বিলিতি কাপড় রাস্তাতেই পোড়ানো হয়। দ্রষ্টব্য, শ্রী মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত 'সমাজ', (কলিকাতাঃ কালিকা প্রেস, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। তবে সূচনা পত্রে উল্লিখিত যে নাটিকাটি ২৮ বৈশাখ ১৩১৪ সনে (ইংরেজি ১৯০৭ সাল) প্রথম অভিনীত।), পৃ ২২-২৪।

এবং স্বাজাত্যবোধকে কেন্দ্র করে একটা আবেগের ধুয়ো তোলা শুরু হয়েছিল।[12] মিহি বিলিতি কাপড়ের পরিবর্তে মোটা কাপড় পরিধান করা, বা চরকা ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা আসলে নিজেদের স্বাজাত্যবোধকে জানান দেওয়ার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল।[13] পিটার গনসেল্‌ভস বলেছেন, সামাজিক মানুষের বাস নানা চিহ্নের অরণ্যে। এর মধ্যে প্রত্যেক চিহ্ন সামাজিক মানুষের জীবনে সমান ব্যঞ্জনা বয়ে আনে না।[14] বলা ভালো কোন চিহ্ন, সামাজিক অগ্রগতির কোন পর্যায়ে কোন ব্যঞ্জনায় ধরা দেবে তা নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বোধের উপর। এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বোধ দুটি বিপরীত স্বার্থের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। দুটি বিপরীত স্বার্থের একপ্রান্তে থাকে ক্ষমতাধর শ্রেণী এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য সুবিধা সৃষ্টির প্রয়াস, এবং অন্যপ্রান্তে থাকে অবদমিত গোষ্ঠী। অবদমিত শ্রেনী তখনই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করে, যখন তারা এই বোধে উপনীত হয় যে, তাদের অবদমন করা হচ্ছে। আর সেই সোচ্চার অবস্থা দুটি শ্রেণীর মধ্যে দ্বৈরথের জন্ম দেয়। সেখান থেকে দ্বৈরথের চিহ্নেরা উঠে আসে। অন্দোলনের চিহ্ন দৃশ্য, শ্রাব্য নানাধরণের হতে পারে। অর্থাৎ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে লেখা কবিতা, গদ্য যেমন শাসকের কাছে আন্দোলনের চিহ্ন প্রতিপাদিত হতে পারে, তেমনি অভিনীত নাটক, সুরারোপিত গান, অঙ্কিত ছবি, বুনিত কাপড়ও আন্দোলনের চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

বিংশ শতকের শুরুর দিকে লর্ড কার্জনের হাত ধরে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব গৃহীত হবার পর, এতদিনের পাশ্চাত্য শিক্ষিত, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে অফিসে-আদালতে কর্মরত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা সরকারের কাছে পাগড়ি নিয়ে, জুতো নিয়ে নানা আবেদন-নিবেদনে মেতেছিল, যেনতেন প্রকারেণ পাশ্চাত্যঘেঁষা আদব-কায়দা যাতে অফিসে-আদালতে অনুশীলন করা যায়, তার ছাড়পত্র আদায়ে মেতেছিল, সেই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তা তলিয়ে ভাবতে হবে। স্বদেশীর সময় বাঙালি ছাত্র-যুবাদের মনে যে দেশীয় সমাজ ও জীবনাচরণের প্রতি একটা ঝোঁক

---

[12] Mimasha Pandit, 'Performing Nationhood: The Emotional Roots of Swadeshi Nationhood in Bengal, 1905-12', (New Delhi: Oxford University Press, 2019)

[13] দীর্ঘদিনের ক্রমানুক্রমিক নিষ্পেষণে দীর্ণ হয়ে ওঠা ভারতীয় দেশীয় শিল্পের হাল ফেরানো অবশ্য সহজ কাজ ছিল না। কারণ ইতিমধ্যেই ভারতের পুরাতন শিল্প ব্যবস্থার কাঠামোটি ম্লান হয়ে সেখানে পাশ্চাত্য শিল্প বিপ্লবজাত ব্যবস্থার ছাপ পড়তে শুরু করেছিল। তাই স্বদেশীর সময়কালে দেশীয় শিল্পব্যবস্থার উজ্জীবনে পাশ্চাত্য শিল্পব্যবস্থার সাথে যুঝতে পাশ্চাত্য শিল্পব্যবস্থার শিক্ষা থাকাটা কতটা জরুরি তার উপর বারংবার গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। বিংশ শতকের মধ্যভাগে, স্বদেশী আন্দোলন স্বাধীনতা প্রাপ্তি পেরিয়েও তাই প্রভাত কুমারের আক্ষেপ, 'বুনিয়াদী শিল্পীদের নতুন ধাতুশিল্পে শিক্ষিত করবার কোনো প্রয়াস দেখতে পাচ্ছিনে গ্রামাঞ্চলে – সর্বত্র cottage industry পরিণত হচ্ছে small industry-তে। power loom তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।' দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', (কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), পৃ ১৯।

[14] Peter Gonsalves, 'Clothing for Liberation: A Communication Analysis of Gandhi's Swadeshi Revolution', (Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications, 2010)

বেড়েছিল, তা সেসময়কার নানা রচনা থেকে বোঝা যায়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, '...স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগের উপলক্ষ্যে। প্রথম ৩০শে আশ্বিন অরন্ধন ও রাখীবন্ধনের দিনে সকালে উঠিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিলাম, মোটা কাপড়ের ধুতি পরিলাম, সেই কাপড়েরই পাঞ্জাবিও পরিলাম – তাও গেরিমাটিতে রঞ্জিত করিয়া – মাথায় পাগড়ি বাঁধিলাম, বিকালে সভায় গিয়া বক্তৃতা শুনিলাম। তখন হইতে বঙ্গবিভাগ থাকা পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে, যতদূর সম্ভব কার্যেও স্বদেশী-আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলাম। আমার মনোভাবও ছিল 'এক্সট্রিমিস্ট', মডারেট নয়। তাই ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেসে জুতা ছোঁড়াছুড়ির সংবাদ মহানন্দে পড়িয়াছিলাম।'[15] এই পুরো কথাটার মধ্যে দেশভক্তির লেশমাত্র ফাঁক নেই। কিন্তু এই দেশভক্তির সাথে যে ইংরেজি শিক্ষা প্রভাবিত জীবনবোধ, তাঁর ভাষায় 'ইংরেজত্বের' কোনো বিভাজন নেই তাও তিনি পরিষ্কার করেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়, একটি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরা কিভাবে তাদের শৈশবেই দেশীয় আচারের সাথে পাশ্চাত্য আচার-বিচারকে নীরবে আত্তীকরণ করত। যার জন্য যৌবনে উপনীত হয়ে তাদের মনে হয়নি – একটিকে লাভ করতে হলে অপরটিকে ছাড়তে হবে।[16] সেদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজী সভ্যতাকে

---

[15] নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি', (কলকাতাঃ আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৩), পৃ ১৬১।

[16] নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, 'বাঙালীত্ব ও ইংরেজত্ব আমার জীবনের পারস্পরিক ধর্ম নয়, দুইটিতেই দীক্ষা একসময়ে, একসঙ্গে আমার অতিশৈশব হইতেই হইয়াছিল – অর্থাৎ এক্টিকে লাভের জন্য আমাকে অন্যটিকে ছাড়িতে হয় নাই।' ইংরেজ প্রভানিত যুগের হাওয়া শিশুর বেড়ে ওঠার প্রতিটি সামাজিক পর্যায়ে কিভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, তা বোঝা যাবে, নীরদচন্দ্রের অপর একটি বক্তব্য থেকে, 'পূর্ববঙ্গের একটি ছোট শহরে বাস করি, রেল স্টেশন হইতে সতেরো মাইল দূরে; বাস টিনের আটচালায় – তাহার বেড়া দরমার, মেঝে মাটির; নিজে বেশির ভাগ সময়ই খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরিয়া বেড়াই। তবু মনের ইংরেজত্ব কি করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। ব্যাপারটা যুক্তিগোচর নয়।'

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আরেকটি লেখা থেকে তাঁর ছোটো থেকে বেড়ে ওঠার ধারার সাথে ইংরেজিয়ানার বুনন কিভাবে শুরু হয়, তা বোঝা যায়। তিনি লিখছেন, ছোটবেলা থেকে তাঁর 'ইংরেজ-বাঙালীত্বে' দীক্ষা '...আমার পিতামাতার জন্যই হইয়াছিল। ' তিনি বলছেন, তিনি যে অগণিত সাধারণ 'ইংরেজ-বাঙালী'কে দেখেছেন, তাঁর পিতামাতা তাঁদেরই দুজন ছিলেন। 'সুতরাং নিজেদের প্রত্যেকটি সন্তানকেও তাঁহারা নিজেদের জীবনের ধারা অনুযায়ী বড় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লালন-পালনে শিশুকালেও আমি কি-ভাবে 'ইংরেজ-বাঙালী' হইয়াছিলাম তাহার বাহ্যিক, বস্তুগত প্রমাণ আমি জ্ঞান হইবার পর দেখিতাম।' যেমন, 'একটি আমার আড়াই বৎসর বয়সে তোলা ফটোগ্রাফ, আমার পিতা, বড় ও ছোট ভাই ও অন্যান্যের সহিত। চেয়ারে-বসা পিতার দুইদিকে দাদা ও আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, দুজনেই সাহেবী পোষাক পরা অর্থাৎ গায়ে শার্ট ও গলাখোলা কোট, নীচে পশমী প্যান্ট ও পায়ে জুতা মোজা...।' দ্রষ্টব্য, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি', পৃ ১৪৫, ১৫৫, ১২০।

শ্রী অরবিন্দের পিতা যেমন নিজের সন্তানদের খাঁটি পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানুষ করে তোলবার জন্য বিলাত গমনের পর সন্তানদের ভার দেন ইংরেজ পাদ্রী ড্রিয়েট এবং তাঁর পত্নীর উপর। তাঁদেরকে তিনি এই নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রগণ যাতে বিলাতে কোনো ভারতীয়ের সংস্পর্শে না আসেন এবং কোনো প্রকারে ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত না হন। দ্রষ্টব্য, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ', (কলিকাতা: সরস্বতী লাইব্রেরী, বৈশাখ ১৩৬৮), পৃ ১০৪।

আত্তীকরণের পর স্বাতন্ত্র্যের দাবির মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলনের সৌন্দর্য্য নিহিত। এবং স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যও ছিল মানুষকে আত্তীকরণের বিষয়ে সচেতন করা, আর অনুকরণপ্রিয় হয়ে ওঠাতে বাধা দেওয়া। স্বদেশী কালের বিপ্লবী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন, 'বাহির হইতে গ্রহণ করিবার আহরণ করিবার পক্ষে কিছু বাধা নাই, কিন্তু চাই হজম করিবার, আপনার মধ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া লইবার শক্তি, চাই ভিতরের সেই সজাগ আত্মসংস্থা যাহা বাহিরকে পরকে আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনারই ছাঁচে গলাইয়া ঢালিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। আমের বীজ জল মাটি আলো বাতাস লইয়া আমের গাছকেই সৃষ্টি করিয়াছে; কাঁঠালের গাছ সৃষ্টি করে নাই ... প্রত্যেক মানুষও তেমনি বাহিরের জল বায়ু আহার্য্যকে অথবা ভাষা ভাব চিন্তাকে আপনার ভিতরের বিশিষ্ট ধর্ম্মের স্বভাবের অনুসারে আহরণ করিয়া বদলাইয়া নিজের নিজের পৃথক রকম শরীর, পৃথক রকম কথা কহিবার ভঙ্গী, পৃথক রকম প্রাণ মন গড়িয়া তুলিয়াছে।'[17] সুতরাং উক্ত 'আত্মসংস্থা'র বোধ তখনই জাগ্রত হয়, যখন উপনিবেশিত সমাজের কোনো সমষ্টি সমাজের প্রতি নিজেদের পূর্ব অবহেলাকে বুঝতে পেরে, সেই দিকগুলো তাদের বর্তমান যাপনের মধ্য দিয়ে মেরামতে উদ্যোগী হয়।

রাজনারায়ণ বসুর মতো স্বাদেশিক মনোভাবাপন্ন মানুষজন ধীরে ধীরে ইংরাজী-নবীশ'দের মধ্যে সেই সত্য নিজেদের জীবনাচরণের এবং কাজের মাধ্যমে বইয়ে দিয়েছিলেন।[18] তাই পূর্ব

---

[17] শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, "স্বদেশী ও বিদেশী", শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখিত 'স্বরাজের পথে', (চন্দননগর: প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৩০), পৃ ২২-২৩।

১৩০৮ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর লেখায় ঠিক এমন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'নূতন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ – ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমনভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্তমানে পরিবর্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্বপুরুষের দোহাই মানিলে তো পূর্বপুরুষ সাড়া দিবেন না। আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের দোহাই পাড়িয়া বলিতেছেন, 'বর্তমানের সহিত সন্ধি করিয়া আমাদের কীর্তিকে রক্ষা করো, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া ইহাকে সমূলে ধ্বংস হইতে দিয়ো না। আমাদের ভাবসূত্রটিকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এক কালের সহিত আর-এক কালকে মিলাইয়া লও, নহিলে সূত্র আপনি ছিন্ন হইয়া যাইবে।' দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভারতবর্ষীয় সমাজ", 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র', (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫), পৃ ৯২।

[18] বিপিনচন্দ্র পাল রাজনারায়ণ বসুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'রাজনারায়ণ বসু সেকালের ইংরাজী-নবীশদিগের মতন প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন। এই যুক্তিবাদই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া আনে। কিন্তু এই যুক্তিবাদ তাঁহাকে নাস্তিকও করিতে পারে নাই বা বিদেশের অনুচীকির্ষাতে প্রণোদিত করিতেও সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের অগ্রণীদলগণ্য হইলেও রাজনারায়ণ বসু স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি কখনও শ্রদ্ধাহীন হয়েন নাই। দেশ-প্রচলিত প্রতিমা-পূজা বর্জ্জন করিয়াও তিনি বেদ ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান যে জগতের সকল ধর্ম্মতত্ত্বের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্টতর, একথা সর্ব্বদাই প্রচার করিতেন। কিন্তু স্বদেশের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহাকে অন্যান্য দেশের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করে নাই। রাজনারায়ণ বসু ইংরেজীতে বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল প্রভৃতি খুব ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন' তিনি বাইবেলের সার-সংগ্রহ করে 'Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theist' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি পার্শিও ভালো জানতেন। 'মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও একখানি অনুরূপ গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। ... কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের

বঙ্গীয় দেখলে নাক-শিটকোনো কলকাতা ও তৎপার্শ্বস্থিত মধ্যবিত্তের সন্তানেরা, যাদের রেলি ব্রাদার্সের জামা-কাপড়, হোয়াইটওয়ে লেইড ল'র দোকানের জিনিসপত্রের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, এমনকি সামাজিক আভিজাত্য রক্ষার জন্য যাদের সব পড়শির সাথে মেশাও বারণ ছিল – তাঁরাও কয়েকবছরের মধ্যে খালি পায়ে, 'মালকোঁচা মেরে' ধুতি পরিধান করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতায় আম-আদমির সাথে এসে দাঁড়াল।[19] যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এত বড়াই, সেই স্বাতন্ত্র্যকেও কালের দাবিতে অচল হতে হল। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের এই অচলায়তন ভাঙার পশ্চাতে কারণগুলিকে তলিয়ে ভাবতে হয়।

শ্রীহট্টের পৈল গ্রামে বিপিনচন্দ্র পালের ছোটোবেলার প্রতিবেশীদের মধ্যে একদল ছিলেন তন্তুবায় 'যোগী'। এই যোগীরা যা কাপড় বুনতেন, তাকে প্রান্তিক ভাষায় বলা হত 'যুগীয়ানী' কাপড়। সম্বৎসর এই কাপড় সেই গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষ পরতেন।[20] অর্থাৎ ওই কাপড় যে সমাজের তন্তুবায়দের জীবন-জীবিকার মেরুদণ্ড ছিল, তা খালি চোখেই বোঝা যায়। কিন্তু বিলাতি মিলের কাপড় এসে, দেশীয় অর্থনীতির নিজস্ব চলনকে উল্টে দিয়ে, মানুষের রুচির আমূল পরিবর্তন করে এই শ্রেণীর সামাজিক বিকাশকে অন্যখাতে বইয়ে দিল।[21] বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বিলিতি

সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনারায়ণ বসু এদেশে হিন্দুর পক্ষে "সুমতৎ বেদ-বেদান্ত অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করা উচিত, ইহা মনে করিতেন; এবং ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মসাধন বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মই জগতের সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বিশ্বাস করিতেন। সেইজন্য রাজনারায়ণ বসু কখনই নিজেকে কেবল Theist বা একেশ্বরবাদী কহিতেন না; বিদেশীয়দিগের সঙ্গে পত্র-ব্যবহারে সর্ব্বদাই নিজেকে Hindu Theist বলিয়া বর্ণনা করিতেন। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াও একদিনের জন্য নিজের হিন্দুত্বের গৌরব বিস্মৃত হন নাই। ' দ্রষ্টব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, 'রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ', বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত 'নবযুগের বাংলা', (কলকাতাঃ যুগযাত্রী, বৈশাখ ১৩৬২), পৃ ১৩১-১৩২।

[19] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ৬২।

[20] বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'আমাদের গ্রামে সত্তর বৎসর পূর্বে সকল বর্ণের ও ব্যবসায়ের লোকই ছিলেন। গ্রামের তন্তুবায়েরা 'যোগী' ছিলেন। ইহারা যে কাপড় বুনিতেন তাহাকে আমাদের প্রান্তিক ভাষায় 'যুগীয়ানী' কাপড় বলিত। সকল শ্রেণীর লোকেরাই বারমাস এই 'যুগীয়ানী' ব্যবহার করিতেন। 'যুগীয়ানী' ধুতি হাঁটুর নিচে বড় নামিত না। গরমের দিনে প্রায় সকলেই খালি গায়ে থাকিতেন, কোথাও নিমন্ত্রাদিতে যাইবার সময় একখানি চাদর গায়ে ফেলিয়া যাইতেন, সেও 'যুগীয়ানী' চাদরই ছিল। আজিকালি (লেখকের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ নাগাদ) চরকায় কাটা সূতা তাঁতে বুনিয়া যে 'খদ্দর' প্রস্তুত হয়, ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে ইহাই আমাদের দেশে সাধারণ লোকে সর্বদা ব্যবহার করিতেন।' দ্রষ্টব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর', সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, (কলকাতাঃ পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃ ৩০।

[21] বিমল মিত্রের রচনায়, স্বদেশী প্রচারকারী গ্রামের মানুষজনকে বোঝাচ্ছেন, 'আমি যে কাপড় পরে আছি (তোমরা) সে কাপড়ই পরবে। আমি আজ যে কাপড় পরেছি তা কি খারাপ কাপড়? এ একটু মোটা কাপড় বটে, কিন্তু নিজের দেশের তুলোয় তৈরী সুতো দিয়ে নিজের দেশের তাঁতীর হাতে তৈরী কাপড় পরতে লজ্জা কী? ... এককালে আমাদের দেশের লোক তো এই কাপড়ই পরত। তখন তো তা পরতে কারো লজ্জা করত না।...' দ্রষ্টব্য, বিমল মিত্র, 'চারপ্রহর', (কলিকাতাঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পৌষ ১৩৭২), পৃ ২৭।

পুঁজির গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া দেশীয় মধ্যবিত্তকে রাজনৈতিক ধাক্কার মাধ্যমে নিজস্ব সমাজের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়েছিল। কারণ এতদিন কলকাতার মধ্যবিত্ত তার পূর্বজদের পূর্ব বঙ্গীয় জমিদারির দৌলতে ফুল্লকুসুমিত হয়েছে, পূর্ব বঙ্গীয়দের 'বাঙ্গাল', 'গ্রাম্য', 'অপরিশীলিত' বলে দূরে ঠেলেছে, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সেই অনুপস্থিত জমিদারির ফসল কলকাতার মধ্যবিত্তই এর বিরোধিতা করে পথে নেমেছে। এতদিন বিলিতি রুচির মিহি কাপড়ে জড়িয়ে এই সময়কালে এসে চরকায় কাটা মোটা সুতোর দামি খদ্দরে ফিরে যাওয়ার আকুতিটা কোথাও বিড়ম্বিত ভাগ্যোদয়ের পথে প্রায়শ্চিত্ত্ব কিনা –সেই ভাবনাও এক্ষেত্রে ওঠা অমূলক নয়।[22] এই প্রশ্নটা এইজন্যই আসে, স্বদেশীর হাওয়া ধীরে ধীরে স্থিমিত হতে হতে দেখা গেল, স্বদেশীর আদর্শও বিংশ শতকের বিশের দশকে অস্তমিত হচ্ছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতকে অনুসরণ করলে বলতে হবে, আপাতদৃষ্টিতে স্বদেশীয় আদর্শ অস্তমিত হচ্ছিল মনে হলেও – আদপেই তা কিন্তু নয়। বরং বলা ভালো স্বদেশীর হিড়িক থিতিয়ে পড়ে, ইংরেজ সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার সম্মিলনে যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রকট হচ্ছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ইংরেজ সভ্যতা, পূর্ববর্তী মুসলমানী সভ্যতা ও তার সাথে দেশীয় সভ্যতার সম্মিলনে পোশাকে-পরিচ্ছদে যে রূপটি স্বদেশীর হিড়িকের পর প্রকট হয়েছিল, তাকে ত্রিশঙ্কুর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলছেন, 'এ-যুগে সারা জগতের যেখানে যেখানে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ স্বাভাবিক পরিচ্ছদ নয়, সেখানে মাত্র দুইটি পোশাক আছে। প্রথম, প্রত্যেকটি জাতির জাতীয় পোশাক, দ্বিতীয়, ইউরোপীয় পোশাক, যাহাকে আজ বিশ্বজনীন পোশাক বলা যায়। জাপানীরা কার্য্যব্যপদেশে ইউরোপীয় পোশাক পরে, গৃহে বিশ্রাম ও অথিতির আপ্যায়নের জন্য নিজেদের পরিচ্ছদ পরে। অন্যত্রও এই নিয়ম। একটা তৃতীয় পরিচ্ছদ আমাদের মধ্যেই একমাত্র আছে, এবং সেটি আমাদের এক বিজেতা জাতির, আমরা এক সময়ে যাহাদের দাস ছিলাম তাহাদের। ইহাতে আমাদের অবস্থা হইয়াছে ত্রিশঙ্কুর মতো – হিন্দু পরিচ্ছদের মর্ত্য হইতে ইউরোপীয় পোশাকের স্বর্গে উঠিতে গিয়া আমরা কুপিত শতমুখরূপী নেহেরুর হুঙ্কারে নিপাতিত হইয়া ইসলামী মধ্যপথে ঝুলিয়া আছি।'[23] স্বাধীনতার পর ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল নেহেরুর পোশাকি অবস্থানকে শুধু নীরদ চৌধুরীই সমালোচনা করেননি,

---

[22] নবীনদের এই স্বদেশী হুজুগ নিয়ে যে এককালে জমিদারের নায়েব-গোমস্তার কাজ করা প্রজন্ম খুশি ছিলেন না, তা বোঝা যায়, বিমল করের উপন্যাসের চরিত্র নন্দজ্যাঠার বক্তব্য থেকে। তিনি একদা জমিদারের নায়েব ছিলেন। একই জমিদারীতে তাঁর সাথে গোমস্তার চাকরি করা সহকর্মীর ছেলে ভূতনাথ স্বদেশীর কালে বাঙ্গালী বাবুর অফিসে চাকরী নিয়েছে শুনে তিনি বেজায় খুশি। কিন্তু যুগের হাওয়া যেদিকে বইছিল, তা নিয়ে তার দারুন হুতাশ প্রকাশ পেয়েছে একটি মন্তব্যে – 'কী যে সব করে! স্বদেশী করছে। তাঁত করছে। বলে – ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। শুনি আর হাসি। যে রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না – ভূগোলে পড়েছি—তাদের সঙ্গে বিরোধ! ডাকাতির জ্বালায় রাস্তায় বেরোনো যেত না। সতীদাহ দেখেছি। আমরা মায়ের ঠাকুরমাকে পেছমোড়া করে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছিল শুনিছি।তা ওই ইংরেজ্রাই এসে তো সব বন্ধ করলে। আর এখন সেই ইংরেজই আবার খারাপ হয়ে গেল।' দ্রষ্টব্য, বিমল মিত্র, 'সাহেব বিবি গোলাম', (কলিকাতাঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, জানুয়ারী ১৯৫৩), পৃ ৩৩৬।

[23] নীরদচন্দ্র চৌধুরী, "হিন্দুর মুসলমানী পরিচ্ছদ কেন?", ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, 'নীরদচন্দ্র চৌধুরী নির্বাচিত প্রবন্ধ', (কলকাতাঃ আনন্দ, সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ ২২৪।

তৎকালীন অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন।[24] তাই যদি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতকে যথার্থ হিসেবে মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে, মহাত্মা গান্ধি সেই সম্মিলিত রূপটির মধ্যেকার ভারতাত্মাকে নিজের বেশ-ভূষায় প্রকট করে বিদেশি শাসকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।[25] এবং স্বদেশী আদর্শকে উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। স্বাদেশিক মনোভাবাপন্নদের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের আদর্শ স্বদেশীর পর গান্ধির মাধ্যমে আবার সজীব হতে শুরু করেছিল।[26] কিন্তু নতুন শিক্ষা-দীক্ষা,আদব-কায়দায় জারিত হয়ে নতুন সমাজের এমন এক মনন তৈরি হয়েছিল, যেখান থেকে ইংরেজি সভ্যতার আদর্শকে পরিস্রুত করে বাদ দেওয়া সম্ভব ছিল না।[27] তাই স্বদেশীর হিড়িকের কালে মোটা কাপড় পরা কর্তব্যের মতো ঠেকলেও, স্বদেশীর পর থেকে

---

[24] রাজশেখর বসু লিখেছেন, ‘সম্প্রতি নেহেরু এক বক্তৃতায় বলেছেন, ইওরোপীয় পোশাকের উপর এ দেশের লোকের অত্যন্ত ঝোঁক তিনি পছন্দ করেন না। কি রকম সাজ ভারতবাসীর উপযুক্ত তা তিনি খোলাসা করে বলেন নি। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন কাগজে তাঁর স্যুট কোট টাই ট্রাউজার পরা ছবি বেরিয়েছিল। সম্প্রতি আমেরিকা ভ্রমণের ছবিতে তাঁর পরনে লংকোট টাই আর গান্ধিটুপি দেখা গেছে। ভারতবর্ষে তিনি চুড়িদার পাজামা আচকান আর গান্ধীটুপি পরে থাকেন। অতএব ধরে নিতে পারি সর্বাবস্থায় সাহেব সেজে থাকাই তাঁর অপছন্দ; ক্ষেত্র বিশেষে বিলাতী বা দেশী-বিলাতীর মিশ্র পোশাকে তাঁর সম্মতি আছে।’ নীরদ চৌধুরী নেহেরুর পোশাকি চেতনার সমালোচনা করতে ধরেছেন পূর্ববর্তী শাসকদ্বয় এবং তাদের শাসনে গড়ে ওঠা এদেশীয় সমাজের নিজস্ব পোশাকি চেতনার প্রতি সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবকে, আর রাজশেখর বসু ধরেছেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দেশের প্রতিনিধিত্বকারী পোশাক কোনটি—সে বিষয়ে সংশয়কে। অর্থাৎ উভয়েই একটা স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কের পোশাকি চেতনার স্বাধীন বিকাশের অভাবকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দ্রষ্টব্য, রাজশেখর বসু, “আমাদের পরিচ্ছদ”, রাজশেখর বসু বিরচিত ‘চলচ্চিন্তা’, (কলকাতাঃ মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৮৮২ শকাব্দ), পৃ ১।

[25] অবশ্য ভারতের রাজনৈতিক আঙিনায় গান্ধির পদার্পণের পর এবং হাঁটুর উপরে ধুতি এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকার জন্য একটি সাদা কাপড়কে রাজনৈতিক পোশাক হিসেবে ধারণকে তাঁর সমসাময়িক মানুষজন বিভিন্নভাবে পাঠ করেছেন। অসহযোগ পরবর্তীকালে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটি বাংলা সংবাদপত্র লিখেছিল, ‘মহাত্মা গান্ধী যে অতি ক্ষুদ্র একখানি কৌপিন মাত্র পরিধান করে থাকেন, তার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি দেখাতে চান যত পরিমাণে কাপড় আমরা দেশে তৈরি করতে পারি গড়ে তার বেশী পরা উচিত নয়।’ অর্থাৎ অধিক বস্ত্র ব্যবহারকে অধিক অপচয়ের সমতুল হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালে দেশজুড়ে বস্ত্রের দাম চড়ার পরও দেখা শুরু হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, ‘খদ্দর ও পরিচ্ছদ সমস্যা’, মাতৃ-মন্দির পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ ২৬০।

[26] নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসু লিখেছিলেন, ‘আমি যে যুগে জন্মেছি সেটা ছিল অসহযোগের যুগ। গান্ধীজী তাঁর অহিংসা অসহযোগের মন্ত্র দিয়ে সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন। বিদেশী সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না, সব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে হবে। ... গান্ধীজী দেশকে জাগিয়েছিলেন প্রধাণত চরকা ও খদ্দরের মাধ্যমে। আমাদের বাড়িতে কোনো ব্যাপারেই ছোটোদের বেলাতেও, খদ্দর ছাড়া কিছু চলবে না। জামা, কাপড়, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার, ধুতি, শাড়ি, গায়ের চাদর, জানালা-দরজার পরদা সবই খদ্দরের।’ অর্থাৎ ধুতি, চাদরের পাশাপাশি বিলিতি শিষ্টাচারের শার্ট প্যান্টেরও ব্যবহার আছে, কিন্তু সবটাই খদ্দর কাপড়ের। অন্যদিকে ‘কোনো বিশেষ কারণে সিল্ক পরতে হলে, সেটাও পুরোপুরি দেশী সিল্ক হওয়া চাই।’ যেহেতু ‘সেকালে ভাল গরম কাপড় বেশির ভাগই বিলেত থেকে আসত’, তাই শীতের পোশাকেও স্বদেশিয়ানা বজায় রাখতে ‘খুঁজে-পেতে পাঞ্জাব বা কাশ্মীরে তৈরি গরম কাপড় যোগাড় করে মা আমাদের গরম কাপড়-জামা বানিয়ে দিতেন।’ দ্রষ্টব্য, শিশিরকুমার বসু, ‘বসু বাড়ি’, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫৮),পৃ ২০-২১।

[27] গোপাল হালদার, ‘রূপনারায়ণের তীরে, দ্বিতীয় খণ্ড, যৌবনের রাজটীকা’, (কলিকাতাঃ পুঁথিপত্র, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)।

আবার বিলিতি মিহি কাপড়ের চল বেড়েছিল।[28] নীরদচন্দ্র চৌধুরী ভারতের প্রথম প্রধাণমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পারিচ্ছদিক বিবর্তনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখান থেকে স্বদেশীর সাথে প্রেমের চাইতে আরোপিত কর্তব্যের যোগের বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তিনি বলছেন, ‘নেহেরু নিজে বাল্যকালে ও মোতিলাল প্রাপ্ত বয়সে ঘরে যাহাই পরুন, বাহিরে সাহেবী অর্থাৎ ইউরোপীয় পোশাকের পাট রাখিয়াছিলেন। ইহা ইঙ্গ-বঙ্গীয় ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ানদের মতোই আচার। বিলাতে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর জবাহর ব্যারিস্টারি করিলে নিশ্চয়ই সাহেবী পোশাকই বজায় রাখিতেন। কিন্তু তাহাতে বাধা জন্মিল। পিতাপুত্র দুইজনেই জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন, ইহার জন্য দুইজনকেই সাহেবী পোশাক ছাড়িতে হইল।’[29] লক্ষ্য করলে বুঝতে পারব, জাতীয়তার যে ডিসকোর্স তৈরি হচ্ছিল, সেই ডিসকোর্সের সাথে পোশাকের একটা সম্বন্ধ তৈরি হচ্ছিল। বলা ভালো, জাতীয় রাজনীতির প্রয়োজনে সেই সম্বন্ধ তৈরি করা হচ্ছিল। আর সাধারণ জনগণ যারা এই ডিসকোর্সের বাইরে ছিলেন, তারা সেই ডিসকোর্স অনুসারী পোশাক পরিধান করতে বাধ্য ছিলেন না। আবার সেই ডিসকোর্সের মধ্যেও নানা মতাদর্শের নানা বিভাজন ছিল। নীরদ চৌধুরী সেদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন, ‘মোতিলাল পূর্ণ গান্ধীপন্থী না হওয়ায় পুরাতন মুসলমানী বেশে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু মহাত্মার শিষ্য জবাহরকে হিন্দু ধুতি পরিধান করিতে হইল। উহা সাধুর ভেকের মতোই অবশ্যপরিধেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯২০ সন হইতে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত তিনি সাধারণত ধুতি-পাঞ্জাবি পরিতেন। আমি যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে এই পোশাক ছাড়া অন্য পোশাকে দেখি নাই। তবে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করিল তখন জবাহরলালও জাতীয় আন্দোলনের হিন্দু ভেক ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা পাইলেন। হিন্দু আচার-ব্যবহার তাঁহার কাছে কখনই প্রীতিকর মনে হইত না, হিন্দু ধুতিও হইবার নয়। রাজনৈতিক কারণে যেমন তিনি বিশ্বাস না করিয়াও গান্ধীবাদ মানা কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন, তেমনই উত্তরাপথের হিন্দু জনসাধারণের নেতা হিসেবে ধুতি পরাও সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন।’[30] নীরদচন্দ্রের মতে, মুসলমান শাসনামলে জওহরলালের পরিবার এলাহাবাদে সামাজিক সম্ভ্রম লাভের আশায় মুসলমানি কায়দায় পরিচ্ছদ ধারণ শুরু করেছিলেন, তার উপর তাঁরা কাশ্মীরী হওয়ায় ‘সাধারণ হিন্দুস্তানী হিন্দু অপেক্ষাও বেশি মুসলমানগন্ধী ছিলেন।’ নীরদচন্দ্রের এই পুরো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পোশাকের রাজনীতির ধরণকে খানিক হলেও উপলব্ধি করা যায়। এবং সেখান থেকে বলা যায়, স্বদেশীর সময়কালে দেশি মোটাকাপড় ধারণ সবসময় যে প্রেম-প্রসূত ছিল তেমন নয়, অনেকসময় তা কালের চাপানো কর্তব্যের আকার ধারণ করেছিল।

---

[28] নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ‘হিন্দুর মুসলমানী পরিচ্ছদ কেন?’, ২২৩-২২৪।

[29] তদেব।

[30] তদেব।

স্বদেশী আন্দোলনে জোরজবদস্তি বিলিতি পণ্য পোড়ানো বা বয়কট কর্মসূচীকে অতিক্রম করে স্বদেশীর যে মূল আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মতন তৎকালীন চিন্তাবিদরা বেঁধে দিয়েছিলেন, তাতে স্বদেশীর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নতুনকে যথযোগ্য আসন দেওয়া।[31] নতুনকে আশ্রয় দিতে গিয়ে স্বদেশীয় সমাজের 'চিত্ত'কে গৃহছাড়া করা এর উদ্দেশ্য ছিল না। বা স্বদেশীয় সমাজের চিত্তশুদ্ধির অলীক কল্পনায় মজে নতুন সময়ের দাবিকে এড়িয়ে চলাও এর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই স্বদেশীর কালে ঠাকুর পরিবারের শিলাইদহ জমিদারির আশেপাশে লাট্‌টুমার্কা বিলিতি কাপড়, বেলোয়ারি চুড়ি ইত্যাদি পোড়ানো শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-যুবকদের কাজের নিন্দা করে বলেন, "দেশের লোককে কাপড় পরাবার ক্ষমতা নেই, তাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পোড়ানো মূর্খতা! দেশে এত তাঁতি জোলা থাকতে ম্যাঞ্চেস্টারের মুখ চেয়ে থাকতে তোমাদের লজ্জা করে না? ঘরে ঘরে তাঁত চালাও, কিসের অভাব আমাদের? কলের তাঁত বসাও, কেউ বিলিতি কাপড় আমদানি করবে না। ..."[32]

সেদিক থেকে বিচার করলে সমাজে অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি লাভের জন্য অর্জিত ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তিত সমাজবোধ এদেশীয় মধ্যবিত্তকে যে দেশপ্রেমে দীক্ষিত করেছিল, সেই দেশপ্রেমের আদর্শেও সুবিধাবাদ এবং ক্ষনিক জয়ের আনন্দের প্রচ্ছন্ন প্রবাহ তো ছিলই। অরবিন্দ এবং গান্ধির মতন ব্যক্তিত্বরা অহৈতুকী প্রেমের আদর্শের সাথে দেশপ্রেমের আদর্শকে মিলিয়ে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ তৈরির চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সে গভীরতায় প্রবেশ করতে জাতীয় মনন কতটা সফল হয়েছে, তা ভাববার বিষয়।[33] জাতীয় জীবনের কাছে বিলিতি দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশীয় দ্রব্য গ্রহণ সাময়িক কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল। যার মূল কারণ ছিল, স্বদেশ বিষয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র আন্তরিক উন্নতির বিকাশের কথা না ভেবে দেশীয়দের জোরজবদস্তি বয়কটে সামিল করানো। স্বদেশীকালীন সামাজিক নক্সাকারের লেখায় উঠে আসে, স্বদেশী করা প্রেমিক পুরুষের পছন্দ নয় বলে প্রেমিকাকে ম্যাকেসর ছেড়ে চুলে কুন্তলীন মাখতে হচ্ছে। নক্সাকার অমৃতলাল বসুর সামাজিক নক্সায় বিনো চরিত্র বান্ধবী সমীপে গেয়েছে – 'আমার এমন চিকন্ কেশে মাখতে মানা ম্যাকেসর।/ বিলিতী তেলে চুল ভিজুলে চোটে যান যে প্রাণেশ্বর।।/

---

31 স্বদেশীর সময়কাল থেকে ইউরোপীয় সভ্যতার সকল কিছুকে সন্দেহের চোখে দেখার প্রবণতার মনস্তত্বকে বুঝিয়েছেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। তিনি বলছেন, 'ইউরোপের সহিত প্রথম সংস্পর্শে আসিয়া তাহার ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সকল বিষয়ে ইউরোপকেই আদর্শ করিয়া লইয়া ছিলাম। বর্ত্তমানে আবার অন্যদিকে যে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ইউরোপের যাহা কিছু সকলই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি, সেটা প্রথম যুগের অতিরিক্ত ভক্তির অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ ভাবটিকেও ঠিক ঠিক ন্যায়সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।' দ্রষ্টব্য, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, "ইউরোপের দান", শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখিত 'স্বরাজের পথে', (চন্দননগরঃ প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৩০), পৃ ৩৩।

32 শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ', (কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, জানুয়ারি ১৯৫৪), পৃ ৩৫৩।

33 সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'আত্মজীবনী', (কলিকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), পৃ ৪৩।

আমার গলা ধোরে আদর কোরে বলেন "ডিয়ার বিনো,"/ কিনো না আর পিয়ারস্, পাইভার, রিমেল, গসনেল্ পিনো,/ জানিস্ বিষ ব'লে বিদিশী জিনিস ঘর থেকে তফাৎ কর।।/ সোহাগ কোরে বলে তোমার থাকবে না আপসোস,/ চুলে দেবো কুন্তলীন রুমালে দেলখোস,/ হবে প্রাণ পরিতোষ মেখে দিশী বোসের এসেন্স মনোহর।'[34] এমন শুনে বান্ধবীর জবাব – 'খেয়াল ভাই খেয়াল। পুরুষেরা হোলেন রাজা, আমরা হোলেম দাসী। ছেলে বেলায় যম পুকুরও কোরেছি, সেঁযুতির বরতোও কোরেছি; তার পর বড় হোতে, বাবুরাই ছবিটি কোরে বিবিটী সাজালেন। তাঁদের কাছেই শিখিছি – বিলিতীর সবই ভাল। আবার এখন যখন তাঁরাই উলটো ধুয়ো ধোরছেন, আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হবে । আমরা হোলেম পানসিখানি বইত নয়। পুরুষের মনের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে আমাদের মতি গতি ফেরাতে হবে।'[35] অর্থাৎ সেদিক থেকে বিচার করলে ভিক্টোরিয়ান সাহচর্যের আদর্শে নারী-পুরুষ সম্পর্কটির বন্ধুত্বের দিকটি একটা পক্ষের উপর এরূপ বোঝা হিসেবেই চেপেছিল। প্রেমিকার হৃদয়ে বিলিতি ম্যাকেসরের প্রতি প্রেম যে কুন্তলীন অধিকার করতে পারেনি, তার কারণ হয় কুন্তলীন গুণে মানে ম্যাকেসরের মতন ছিল না[36], বা সবচেয়ে বড় কারণ দেশীয়দের মনে স্বদেশীয়ানার বীজ গভীরভাবে উপ্ত করা যায়নি।[37] তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের বস্ত্র সংকটকে সামাল দেওয়ার জন্য তেমন কোনো দেশীয় উদ্যোগ ছিল না। মহালক্ষ্মী কটন মিলকে তাই স্বদেশী-কালের সেইসব দেশপ্রেমের হিড়িকের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়েছে -

---

[34] শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রনীত 'সাবাস বাঙালী: সামাজিক নক্সা', (কলিকাতাঃ কিশোর প্রীন্টিং ওয়ার্কস, ১৩১২), পৃ ৫৭-৫৮।

[35] তদেব।

[36] নীলিমা দেবী বলেছিলেন, স্বদেশী স্নো-পাউডার প্রস্তুতকারকরা বিলিতি স্নো-পাউডারের অনুকরণে স্নো-পাউডার প্রস্তুত করতে গিয়ে, দেশীয় নারীদের গাত্রবর্ণের সাথে নিজেদের পণ্যের সামঞ্জস্য-বিধাণ করতেই পারেননি। দ্রষ্টব্য, নীলিমা দেবী, 'অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ', মাসিক বসুমতী, ২৪শ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৫২, পৃ ৭৭।

[37] স্বদেশীর হিড়িক অস্তমিত হওয়ার পর, এমনকি গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের শেষেও মেয়েদের সংবাদপত্রে শাড়ির বিকল্প পোশাকের নীলনক্সা প্রদান করা হয়েছিল। কারন 'একখানি বস্ত্রে আপাদমস্তক সর্ব্বত্র আবৃত করে চলাফেরা করা বাস্তবিকই অত্যন্ত অসুবিধার কথা।' তাই তিনি যে পোশাকের পরীক্ষামূলক পরিধানের প্রস্তাব দিচ্ছেন, তা এরূপ, 'চার হাত লম্বা ধুতি লুঙ্গির মতো করে অথবা খুব ঢিলে সায়ার মতো জুড়ে সেলাই করা হবে। গায়ে হাফ হাতা ঢিলে জামা, মাজার নীচে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ঝুল হবে। মাথায় বড় রুমালের মত কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া , তার নীচের ভাগ কাঁধ ও বুক বেয়ে পড়বে। দু হাত বা ন-পোয়া চৌকা কাপড়ে পিঠ ও বুক ঢেকে গলায় জড়ান হবে। এই চৌকা কাপড়খানা বিপরীত দুটি কোণ ধরে দুভাজ করে পিঠের উপর দিয়ে বুকের কাছে এনে সেপটিপিন বা বোতামে আঁটা হবে। মোট কথা মেয়েদের পরিচ্ছদ একখণ্ড গোটা সাড়ি না হয়ে ভিন্ন কয়েকটি টুকরা কাপড়ে হবে। এতে সর্ব্বদা কাজকর্ম্মের সুবিধা হবে। আর ধোয়া ও শুকানর পক্ষে ছোটো কাপড়ই সুবিধাজনক।' দ্রষ্টব্য, 'খদ্দর ও পরিচ্ছদ সমস্যা', মাতৃ-মন্দির পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ ২৬০।

নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর পরিহাস বাঙ্গলার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে যে ক্রুর অট্টহাস্য করেছিল, ঐক্যবদ্ধ সমগ্র বাঙ্গলা তার উত্তর দিয়েছিল, সেই সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতাকে চিতার আগুনে সঁপে দিয়ে, কবরের মাটি চাপা দিয়ে। দুঃসাহসিক, দাম্ভিক কার্জ্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ ব্রিটিশশাসনকে নিশ্চিতভাবে মসীলিপ্ত করেছে। বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙ্গলার বুকে শুধু দুর্ব্বার চাঞ্চল্যই এনে দেয়নি, তা স্বাদেশিকতার বীজ নতুন করে রোপণ করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, গোখলে প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভাবান মনীষিরা এই দুষ্টনীতির বিরুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করে যে আন্দোলন সুরু করেছিলেন, তা শুধু এই ব্যবস্থাকেই উল্টে দেয়নি, সমগ্র ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব্ব আত্মচেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল। স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের এই মন্ত্র পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। (ছবি ৬.১ দ্রষ্টব্য)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা থেকে বোঝা যায়, এই অনুদ্যোগ ও হিড়িকে হড়কে যাওয়ার মনোভাবের মূল কারণ হল – দেশীয় সমাজে ব্যক্তিবিশেষের বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক অনুন্নতি। তাঁর ভাষায়, ‘মানুষের মনের দুর্ব্বলতা এরূপ, এবং বিবেচনা শক্তি এরূপ সীমাবদ্ধ, একটি দাবির সত্যে মুগ্ধ হইয়া, ঐ সঙ্গে অন্য অনেকগুলি দাবিও সত্য,

চিত্র ৬.১ ও ৬.২: স্বদেশী বিজ্ঞাপন (@CSSSC_Archive) [38]

[38] Mahalakshmi Cotton Mills, “1905, Ekatar Bedi Mule”, Ananda Bazar Patrika, 20.09.1949, p.6, A02, CSSSC Archive, Jadunath Bhavan, Kolkata.

ধরিয়া লইতে ইচ্ছুক হয়। কতগুলি জনহিতকর কাজে, সমাজ-সমষ্টির প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া, মানুষ ধীরে ধীরে ভ্রমে পড়িয়া, মনে করিতে শিখে, সমাজ-সমষ্টির একাধিপত্ব অস্বীকার করিয়া ব্যক্তিবিশেষের কোন মঙ্গল কল্পনা করা যায় না, যেন ব্যক্তিগুলির সমষ্টি লইয়া সমাজ নয়, যেন বিভিন্ন লোকেদের মঙ্গলের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয় না, সমাজ একটি মনগড়া সমষ্টি, যার মধ্যে, একছাঁচে প্রস্তুত করিয়া মানুষগুলোকে ঢুকান দরকার। সৃষ্টিবৈচিত্র্য যে একটি মহান সত্য, এবং স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা যে মনুষ্যত্বের এবং পারমার্থিক জীবনের মূলস্বরূপ, সমষ্টিবাদীরা তাহা বুঝিতে পারে না।'[39] মানুষের প্রাকৃতিক চরিত্রের কেন্দ্রও সমষ্টির মধ্যে যা কিছু সামাজিক ক্ষমতার দিক থেকে, ঐহিক বাসনার দিক থেকে প্রয়োজনীয় ঠেকে, তার দিকে হেলে থাকে। সমষ্টির যা কিছু চোখে চকমকির বাতাবরণ তৈরি করে না, সেদিকে বাহ্যিক দৃষ্টিও কম ঝোঁকে। সময়ের সাথে সাথে সেই সূক্ষ্ম আন্তরিক সংকট বাহ্যিক সংকটের রূপ ধারণ করে।

এদেশের বাজারকে বিলিতি বস্ত্রের অনাবিল চারণক্ষেত্র বানাতে দিয়ে, এদেশীয় সমাজের গতিতে বিদেশী ইংরেজকে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে দিয়ে, বঙ্গভঙ্গের কালে সেই বিদেশীয়ত্বের চিহ্ন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় পোড়ানোও সেই আন্তরিক সংকটের বাহ্যিক প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই বাহ্যিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে অতীতের ভ্রম তো সংশোধন হলই না, বরং অতীতের ভ্রম যে দৃশ্যমান ফল দান করেছে, সেই ফলেই আটকে থাকা হল। তাই তাঁর স্বদেশীর আদর্শ ছিল সমাজের মধ্যে না থেকে বাহিরের দিকে প্রবিষ্ট হওয়া 'সমাজের মন'কে ঘরে ফেরানো। আর তাঁর মতে সেই ঘরে ফেরার দিকে তখনই এগিয়ে যাওয়া যায়, যখন পরমুখপেক্ষিতা কমে যায়। সরকার বাহাদুরকে সমূহ আশা ভরসার জায়গা না দিয়ে নিজের আত্মশক্তিকে আশাভরসার মূল কেন্দ্র বানানো যায়।[40] এর মধ্য দিয়েই কেবল নিজের কর্ম উদ্যোগ বাড়ে। কর্মউদ্যোগী না হয়ে হিড়িকের বশে 'জ্বালানো-পোড়ানো নীতি' মঙ্গলকর অনুশীলন নয়। সেই আদর্শ থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের এবং বিলিতি পণ্য বর্জন আন্দোলনের দুই-তিন বছর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উদ্ভুত বস্ত্র-সংকটকে সামাল দিতে তেমনি আরেক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বদেশী কাল থেকে জাতীয়তার চিহ্ন হয়ে উঠতে থাকা চরকা। ডানদিকের বিজ্ঞাপনে কেনিকো মিলের তরফে লেখা হয়েছিল, 'সুতাকাটার ইতিবৃত্তে তকলীই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে এবং খৃষ্ট পূর্ব এমনকি তিন হাজার বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া আজও ইহার প্রচলন রহিয়াছে। সত্যি বলিয়া মনে না হইলেও ইহাই সত্যি যে অতি আধুনিক সুতাকাটার জন্মও এই তকলীরই উন্নতসংস্করণ মাত্র। ... কেলিকো মিল ভারতের অন্যতম আধুনিক যন্ত্রসমন্বিত বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ... পূর্বের মত ইহা আজও জাতীয় বস্ত্র সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিতেছে।' দ্রষ্টব্য Calico Mills, "Charkar Abishkar", Ananda bazaar Patrika, 10.05.1947, p. 7, A016, CSSSC Archive, Jadunath Bhavan, Kolkata.

[39] সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'আত্মজীবনী', (কলিকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), পৃ ৪৯।

[40] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ", 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র', (কলকাতাঃ কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫), পৃ ৯৪।

আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বয়ন বিদ্যালয় ও তাঁতের কারখানা স্থাপন করেছিলেন।[41] সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীও বলেছেন, সরকারকে 'মা-বাপ' ভেবে নিলেই, এবং নিজেদের বিকাশের পথে একমাত্র সোপান ভেবে নিলেই বার বার মোহভঙ্গ হতে থাকে। তাই তিনি বলেন, রাষ্ট্রকে একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর শোষণের হাতিয়ার জেনে, স্ব-উদ্যোগে কাজে নামতে হবে। তবেই নিজেদের স্বীয় অধিকার লাভ হতে পারে।[42] আর সমকালের ফলকে অস্বীকার করে তো স্ব-উদ্যোগী হওয়া যায় না। তাই যা কিছু কালের স্রোত থেকে সঞ্চয়, যা কিছু বাইরের থেকে সঞ্চয় তাকে নিজের ঘর সাজাতে কাজে লাগাতে হবে। যন্ত্রের সাহায্যে কম সময়ে অধিক বস্ত্র উৎপাদন যেমন। বিলিতি মিলের সাথে যুঝতে সেই যন্ত্রের উপরই ভরসা করতে হবে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য রক্ষার গোঁ ধরে বসে থাকা কোনও কোনও গঠনমূলক ফল দেবে না।[43] কিন্তু পরের ভালো দিকগুলি নিয়ে ঘর সাজাতে

---

[41] শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ', (কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, জানুয়ারি ১৯৫৪), পৃ ৮৯- ৯৪।

[42] তিনি লিখছেন, '...ইংরাজ আমাদের কাপড় পরিতে শিখাইবে, হাত ধরিয়া লইয়া চলিতে শিখাইবে, মুখের নিকট আহার ধরিয়া খাইতে অনুরোধ করিবে, দেশহিতৈষী হইতে শিক্ষা দিবে, এবং তার পর যদি একদিন মধুর প্রভাতে, তাদের বোচকা বাঁধিয়া, গলায় বস্ত্র জড়াইয়া, আমাদের নমস্কার করিয়া, নিজের দেশে ফিরিয়া না যায়, তাদের কি মহৎ বলিতে পারা যায়? আমরা কেবল তালিকা করিতে শিখিয়াছি, ইংরাজ আমাদের জন্য কি করিল না, আমাদের কি করা উচিত ছিল এবং করি নাই, তার যদি কেহ একটা তালিকা প্রস্তুত করিত, তাহা হইলে বুঝা যাইত আমাদের দেষিতৈষীতার বহর কিরূপ।' সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এটা লিখছেন ১৯৩৯ সালে, যখন স্বদেশী আন্দোলন গত, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী এবং তার স্বাবলম্বন ও অহিংসার আদর্শ জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয়দের তথা বাঙ্গালির মনোলোকে ইংরাজ নির্ভরতা কাটেনি। দ্রষ্টব্য, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'আত্মজীবনী', পৃ ৫২।

রবীন্দ্রনাথ সেই নির্ভরতার কোনো সুফল দেখেননি। বরং যে ফল সর্বসাধারণ কল্পনা করেছেন, তাকে 'আকাশকুসুমের' সাথে তুলনা টেনেছেন। তাঁর ভাষায়, 'এখন জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয় – যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। নাহয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?' দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ", পৃ ৯৪।

[43] রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক, বিদ্যা ও ধনমান অর্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে – তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সময়ের দাবিকে অস্বীকার করছেন না। কিন্তু সময়ের দাবি মানতে গিয়ে একটি উপনিবেশিত জাতি নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি বিস্মৃত হোক – তা তিনি চাননি। তাই তাঁর বক্তব্য – 'এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্টাপাল্টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ৯৭।

বাংলা দেশের পল্লীগুলি এদেশীয় নগর সভ্যতার প্রাণ, এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, কিন্তু দেশ আর পল্লী এক নয়। দেশের কল্যাণ করতে গেলে পল্লীর কল্যাণ সাধন করতে হবে সত্য, কিন্তু দেশের বিশাল সমষ্টির জীবনকে সমকালীন জীবনমানের উপযোগী করতে হলে যন্ত্র-সভ্যতাকে গ্রহণ করতেই হবে। তাঁর ভাষায়, '...দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না – এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের

গিয়ে নিজের ‘স্বভাবের স্বধর্ম’ ঢাকা পড়ে গেলেই মুশকিল।[44] আবার ‘স্বভাবের স্বধর্ম’ বলে এক বস্তু আছে, তাকে রক্ষা করতে হবে, এই অঙ্গীকারে যা কিছু অন্যের, তার বিষয়ে ছুঁৎমার্গ রাখলেও বিকাশ হতে পারে না। কারণ স্বদেশী চিন্তাবিদরা বিকাশ বলতে বুঝেছেন, যা কিছু বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটা জাতিকে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল রেখে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য উন্মুখ রাখতে পারে, তা’ই।[45] সেকারণে প্রবল ইংরেজ বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও ‘হিন্দু মেলা’র প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র ইংরেজ বিতাড়নে বাঙ্গালির বাহুবল বাড়ানোর যে পণ নিয়েছেলেন, সেই পণে তিনি দেশীয় যুবকদের স্বদেশী শরীরচর্চার সাথে সাথে বিলিতি শরীরচর্চার উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[46]

হিন্দু মেলার কথা যেহেতু চলেই এল, এপ্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত, উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই ভারতবর্ষের উন্নতি প্রচেষ্টায় দুটি ধারা সজীব ছিল। একটি ধারা চাইত ইংরেজানুকরণের মধ্য দিয়ে এবং ইংরেজ শাসকের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে নিজেদের উন্নতি। আরেকটি ধারা কারও সাহায্যের তোয়াক্কা না করে স্বচেষ্টায় উন্নতি প্রয়াসী ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু’রা উল্লেখযোগ্য। ১৮৬১ সালে

সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।...কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে।’ কিন্তু শুধু কলের মধ্য দিয়েই ভারতের উন্নতি হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কলের মধ্য দিয়ে ভারতের উন্নতি সম্ভব — এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম না হচ্ছে – এই কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১০২-১০৩।

[44] নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন, ‘ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষা বিধিব্যবস্থা ইউরোপের স্বভাবের স্বধর্ম্মের পরিণতি, উহার মধ্যেই ইউরোপের প্রাণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই ইউরোপের অন্তরাত্মার সার্থকতা। ভারতবর্ষও তেমনি আপন জীবনদেবতার নির্দ্দেশ অনুসারে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহার বিশেষ রীতিনীতি – এসকল বদলাইয়া ফেলিয়া পরের মাপে কাটা, পরের প্রয়োজন অনুসারে তৈয়ারি করা পরিধান সে যদি নিজের অঙ্গে লয় তবে তাহার ফল হইবে কি? এস্কিমোদের দেখাদেখি আমরাও যদি সেই রকম পশমের স্তূপে ডুবিয়া থাকি তবে দমবন্ধ হইয়া মরা ছাড়া আর আমাদের কোন পরিণাম নাই।’ দ্রষ্টব্য, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, “স্বদেশী ও বিদেশী”, পৃ ২৩-২৪।

[45] নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন, ‘একথা স্বীকার করিলেও আমরা মানিব না ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইবার, তাঁহার মধ্যে জীবনের প্লাবন বহাইয়া দিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে বিদেশীর জন্য সকলের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখা আমরা ত মনে করি ভারতবর্ষ আজ আর রোগী নয়, সে এখন বল স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিবার প্রয়াসী, এখন তাঁহাকে ক্ষুধানুসারে পুষ্টিকর খাদ্য, যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গ সঞ্চালনের অবকাশ দেওয়া চাই। তাহা না করিয়া এখনও যদি আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করি তবে মৃত্যুর পথই তাঁহার জন্য সরল করিয়া দিব মাত্র। দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ২৮।

[46] বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, ‘নবগোপালবাবু একটি ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ... এই আখরাতে বিলাতী ব্যায়ামের সকল সরঞ্জামই ছিল, কিন্তু নবগোপালবাবু কেবল বিলাতী ব্যায়াম শিখাইয়াই ক্লান্ত ছিলেন না। আখড়ার ছাত্রদিগকে লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, গুলেল-খেলা এবং বন্দুক-ছোঁড়া পর্য্যন্ত শেখান হইত।’ দ্রষ্টব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, “হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র”, বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত ‘নবযুগের বাংলা’, (কলকাতাঃ যুগযাত্রী, বৈশাখ ১৩৬২), পৃ ১৪৩-১৪৪; দ্রষ্টব্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ‘বাঙ্গালীর বাহুবল’, (কলিকাতাঃ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, ভাদ্র ১৩৪১); দ্রষ্টব্য অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ‘বাঙ্গালীর সার্কাস’, (কলিকাতাঃ পাবলিসিটি স্টুডিও, ১৩৪৩)।

যেমন রাজনারায়ণ বসু দেশীয় সংস্কার, জাতীয় গৌরব রক্ষার নিমিত্তে সুরাপান-নিবারণী সভা তৈরি করেন। এবং সুরাপায়ীদের কোপে পড়ে উপলব্ধি করেন, 'স্বদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, এককথায় আমাদিগের যাহা কিছু' তার রক্ষণ ও পোষণ করা জরুরি।[47] সেই তাগিদ থেকে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করেন। ১৮৬৬ সালে এই সভার একটি অনুষ্ঠান-পত্র ছাপা হয়, সেখানে লেখা হয়েছিল, -

> হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন, যত পারা যায় বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পর পত্র লেখা এবং বাঙ্গালীর সভায় বাঙ্গালায় বক্তৃতা করা, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা, হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা, স্বদেশীয় সুপ্রথা রক্ষা করা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন করা, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার কার্য্য সম্পাদন পরিত্যাগ করা, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়।[48]

আবার অন্যদিকে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো গুণীজনও উনিশ শতকের সত্তরের দশকে আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য ব্রিটিশদের সামনে বিলিতি শিষ্টাচারের পোশাক পরতে অস্বীকার করেছিলেন।[49] যেসময় দাঁড়িয়ে রাজনারায়ণ বসু 'বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান' পরিত্যাগ করার কথা লিখছেন বা মহেন্দ্রলাল সরকার বিলিতি ধরণে পোশাক পরে ইংরাজ রাজপুরুষের

---

[47] শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত', (কলিকাতাঃ মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, আশ্বিন ১৩৫২)

[48] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৯৮ শকাব্দ।

[49] ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যখন ভারতীয় বিজ্ঞান সভার কাজে পুরোদমে মনোনিবেশ করেছেন, তখন তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে সাহেবী পোশাকে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন বাংলার গভর্নর (১৮৭৪ সাল) স্যার রিচার্ড ট্যাম্পেলকে একবার গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এতে ডাঃ মহেন্দ্রলাল যা প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তা থেকে উপলব্ধি করা যায়, স্বদেশীর কালে পোশাক-পরিচ্ছদের স্বদেশীয়ানার তাগিদ একদিনে তৈরি হয়নি। তা কয়েক দশক ধরে তৈরি হয়ে আসছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আমি কেন একজন বিদেশীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এমন অধর্ম করিতে যাইব। আমায় জাতীয় পোষাকে সজ্জিত দেখিয়া যদি সাহেব চটিয়া যায় যাউক, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবে, আমি তাঁহার কাছে চাকরীর উমেদার নহি। আমি আমার দেশের দাবী তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিতে যাইতেছি, আমাদের ন্যায্য দাবি তিনি যদি অগ্রাহ্য করেন ত করুন কিছু আসিয়া যায় না। আমরা দেশের লোক সমবেত হইয়া দেশের কার্য্য করিব। ... সাহেবরা ত আমাদের পূজা পার্ব্বণে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আহুত হইয়া তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ ছাড়িয়া আমাদের গেরুয়া বেশে বা ধুতি চাদর পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন না।' দ্রষ্টব্য, শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ, 'ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতীয় বিজ্ঞান সভা', ভারতবর্ষ, ৫২শ বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৭১, পৃ ৫৫।

সামনে আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকার করছেন -- স্মরণে রাখতে হবে সেই দশকটিতেই ইংরেজ রাজপুরুষের সামনে বিলিতি স্টাইলে জুতো পরার জন্য দেশীয় চাকুরিজীবীদের আবেদন-নিবেদন, যুক্তি-প্রতিযুক্তি একবেবারে তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল। আবার ওই সময়েই ছোট্ট কুটীর শিল্প, বয়নশিল্প, দেশীয় আমোদ-প্রমোদের হরেক পসরা সাজিয়ে দেশীয়দের মধ্যে জাতীয়তা বোধের উজ্জীবন ঘটাতে নবগোপাল মিত্রের (তাঁর সমসাময়িককালে অনেকে কৌতুক করে তাঁকে বলতেন "ন্যাশানাল নবগোপাল") উদ্যোগে হিন্দু মেলা'র উদ্ভব ঘটে।[50] যার প্রথম অধিবেশনও কিন্তু এই ষাটের দশকেই হয়। অর্থাৎ একশ্রেণির নিজেদের সভ্য প্রতিপাদনের জন্য ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বিলিতি স্টাইলে জুতো পরা ও পাগড়ি ছেড়ে ক্যাপ পরার ছাড়পত্র আদায়ের জন্য আবেদন-নিবেদনের সাথে সাথেই সমানতালে চলেছে অন্য একশ্রেণির দেশকে স্বাবলম্বনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস।[51]

১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ এই দুটি ধারার মিলেমিশে একাকার হওয়ার একটা ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। অন্তত সমকালীন চিন্তাবিদেরা নিজেদের লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু শাসকের সামনে নিজেদের মানসিক বিক্ষোভকে সাকার করে তুলতে সমকালীন পত্র-পত্রিকা

[50] বিপিনচন্দ্র পাল হিন্দু মেলার মধ্য দিয়ে এদেশীয় তাঁত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য যে উদ্যম সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'এই হিন্দু মেলাতেই প্রথম নতুন রকম তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল এরূপ মনে পড়ে। ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতবামা ডাঃ মহেন্দ্রলাল নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া -- অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া – মহেন্দ্রবাবু তখন পটুয়াটুলি লএনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। একটা তাঁত তিনি প্রস্তুত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে যেন মহেন্দ্র বাবুর এই নূতন তাঁত হিন্দু মেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ... এরূপ শুনিয়াছি যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দু মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন – লোকে বলে নাচিয়াছিলেন।' স্বদেশী তাঁত এবং সেই তাঁতে প্রস্তুত স্বদেশী কাপড় গামছা, আর তা মাথায় বেঁধে সমাজের একজন গন্যমান্যের হিন্দু মেলাতে আসা এবং সেই গামছা বাঁধা নিয়ে লোকমুখে নানা গল্প চাউর হওয়া, গামছার স্বদেশিয়ানার প্রতীককে যেন ব্যাপ্ত করে। দ্রষ্টব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, 'হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র', বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত 'নবযুগের বাংলা', (কলকাতাঃ যুগযাত্রী, বৈশাখ ১৩৬২), পৃ ১৪৫; দ্রষ্টব্য, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 'গগনে গগনে আপনার মনে', অমৃত পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা, ১১ই কার্ত্তিক ১৩৭৮, পৃ ৯৩২।

[51] ১৮৬৯ সালে হিন্দু মেলার তৃতীয় অধিনেশনে রজনীকান্ত গুপ্ত হাতের কাজের প্রদর্শনীতে বিলিতি ডিজাইনের চাইতে দেশীয় ডিজাইনের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে বলেন। তাঁর ভাষায়, "মেলাস্থলে প্রদর্শিতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই – যখন জাতি-সাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আমাদের রমনীগণ বিলাতী আদর্শানুবর্ত্তিনী হইয়া যে সকল সূচিকর্ম্ম ও সামান্য সামান্য কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ দেখিয়া চিত্র করিতে শিখিতেছেন, তাহার প্রদর্শন দ্বারা সম্যক ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবহার পক্ষে সেই সকল শিল্পকর্ম্মের উপযোগিতা অতি অল্প – না সংসারের কাজে লাগে, না সমাজের উপকারে আইসে ... যাহাদিগের পূর্ব্ব-সমাজ ও পূর্ব্ব-সভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয়, সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধও হইবার নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। এবং যদি বিদেশীয় এমন কোনো কারুকার্য্য থাকে, যাহা আমাদের সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুষমা ও রুচিবর্দ্ধক, তবে তাবন্মাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।...' দ্রষ্টব্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত', (কলিকাতাঃ এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, আশ্বিন ১৩৫২), পৃ ১৬-১৭।

মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। যেমন কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ইংল্যাণ্ডের কোন কোন পণ্য ভারতে আমদানি হয়, এবং তারমধ্যে কোনটি ভারতেও উৎপাদিত হয় – সেবিষয়ে তালিকা প্রকাশ করত। এবং জনগণকে সচেতন করবার চেষ্টা করত আমদানিকৃত দ্রব্যের বদলে, ভারতে উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করলে ইংরেজের বাণিজ্য কিভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবে। জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাবটিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য 'সঞ্জীবনী' এমনও প্রস্তাব করেছিল, --বাঙালি তাঁতি, জোলারা যাতে বেশি দামে কিনে বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুরের কলের কাপড় পরে। পত্রিকাটির বিশ্বাস ছিল, ইংরেজকে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ রুখতে বাধা দিতে গেলে বিরোধিতার এই দৃশ্যমান ভিত্তিকে অবলম্বন করে পথে নামতে হবে।[52] ১৯০৫ সালের ৭ই নভেম্বর অশ্বিনীকুমার এবং আরো কিছু নেতা একটি আবেদনপত্র প্রচার করেছিলেন। সেখানেও দেশবাসীকে সরলভাবে বোঝানো হয়েছিল, কিভাবে এদেশের তৈরি সুতো ব্রিটিশ সরকার ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করে, সেখানকার কাপড়ের কলে তৈরি হওয়া সেই সুতোর কাপড়-চোপড় এদেশে বেশিদামে বিক্রি করে নিজেদের মিল মালিকদের পকেট ভরছেন। তাই তাঁদের বক্তব্য ছিল সেই সুতোয় দেশে কাপড় উৎপাদন হলে দেশের টাকা বিদেশিদের পকেটে যাবে না।[53] আর এইকারণে ওই আবেদনপত্রে স্বদেশবাসীদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলা হয় যে, তারা স্বদেশী বস্ত্রই পরবেন। প্রভাতকুমার লিখেছেন, স্বদেশীর প্রতিজ্ঞাপত্রে ছাপা হয়েছিল – 'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বঙ্গচ্ছেদ যতদিন রদ না হয়, ততদিন বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিব না।'[54] সেদিক থেকে ভাবতে গেলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় মিল-মালিকদের ব্যবসায়িক লাভের ক্ষতি করে ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গের পথ থেকে সরানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য, পাশ্চাত্য শিষ্টাচারকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সামাজিক স্বাতন্ত্রের নিজস্ব পথ তৈরি কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল না। তাই স্বদেশীর হাওয়া স্থিমিত হওয়ার পর, যাওবা দেশীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের মাধ্যমে নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য জানান দেওয়ার একটা প্রবণতা বেঁচেবর্তে ছিল, প্রভাতকুমারের মতে, স্বাধীনতার পর সেই প্রবণতার অন্তর্ধান হয়ে 'ইংরেজীয়ানা বিদেশীয়ানা সহস্রগুণে ফিরে এসেছে।'[55] কিন্তু এক্ষেত্রে এটাও স্মরণ রাখা দরকার – দুটি ভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ বা গোষ্ঠীকে যখন কোনো একটি ব্যক্তি, সমাজ বা গোষ্ঠীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়, তখন ওই দুই ভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ বা গোষ্ঠী একই প্রভুত্বের ছত্রতলে থেকেও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই রূপ থেকে ওই দুই ভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের স্ব স্ব সৎ সত্তাকে বাদ দিতে পারে না বা প্রভু শ্রেণির প্রভাবকেও বাদ দিতে

---

[52] জগদীশ ভট্টাচার্য, 'বন্দে মাতরম্', (কলিকাতাঃ কবি ও কবিতা প্রকাশন, জুন ১৯৭৮), পৃ ৪৯।

[53] 'নব ভারত স্রষ্টা রমেশ চন্দ্র দত্ত', (নূতন দিল্লী, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, জুন ১৯৭৬), পৃ ১১৮, ২৮০, ২৮৩।

[54] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১০৭।

[55] তদেব, পৃ ৬২।

পারেনা। সেকারণে প্রতিটি উপনিবেশ যে সমাজের জন্ম দিয়েছে, সেই সমাজের প্রকৃতি, শিষ্টাচার, আচার-বিচার পাঁচমিশেলি বা cosmopolitan হতে বাধ্য। তাই স্বদেশীর সময়কালে স্বাতন্ত্র্যের জন্য যতই দেশের নামে সন্ন্যাস নেওয়া হোক[56], যতই বাড়ি বাড়ি ঘুরে 'স্বদেশী ছোকড়া'রা স্বদেশী বস্ত্র ফেরি করুক না কেন[57], বা চাকরি-বাকরি ছেড়ে কেউ কেউ স্বদেশী পণ্যের দোকান খুলে বসুক না কেন[58] – সেই পাঁচমিশেলি হাওয়াকে রোধ করা অসম্ভব। কারণ একটা সময় যখন শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে নানা পরিবর্তনের প্রভাবে পাল্টে যায়, তখন কার্য-কারণের আবর্তে পাক খেতে খেতে সেই পাল্টে যাওয়া সমাজের মনটিই বয়ে যায়। স্বদেশী এসে স্বদেশী-বস্ত্র না কিনে বিলিতি বস্ত্র কিনলে তাই সাধারণের উপর যতই জুলুম করুক বা বিলিতি দ্রব্য ক্রয়কারীদের সামাজিকভাবে যতই 'একঘরে' করুক, কিন্তু পাল্টে যাওয়া চাহিদাকে পাল্টে ফেলতে পারেনি। সাধারণের পছন্দের 'লাট্টুমার্কা সস্তা বিলিতি ধুতি'র পরিবর্তে 'চটপানা' স্বদেশী ধুতি সব্বাইকে পরাতে পারেনি, পরিষ্কার বিলাতি লবণের পরিবর্তে 'ময়লা কচকচে দেশী লবণ'ও সবাইকে খাওয়াতে পারেনি।[59] বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের মধ্য থেকে চাকরি-প্রীতি উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি।[60]

আবার মধ্যবিত্তের এহেন দেশপ্রেমের সাময়িক জিকিরে সামিল হওয়া দিন আনা-দিন খাওয়া শ্রেণীর কাছে বিলাসিতা তুল্যই ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রত্যেকেও পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের স্বদেশী-

---

[56] প্রভাতকুমারের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারবো, স্বদেশীর নামে সন্ন্যাসটি কি জিনিস – 'একদিন ... বরিশাল থেকে এক সন্ন্যাসী এলেন আমাদের শহরে, উঠলেন আমাদেরই বাড়িতে। খবর নিয়ে তিনি জেনেছিলেন 'স্বদেশী'দের আড্ডা আছে আমাদের বাড়িতে। সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক, মাথায় গেরুয়া চাদরের পাগড়ি। সঙ্গে ছোট পুঁটলি ও হাতে একতারা। সন্ন্যাসীর যে গানের গলা ছিল তা নয়; তবুও মোটা গলায় গান গাইলেন – তার একটুখানি মনে আছেঃ 'প্রাণে প্রাণে মনে মনে কে শোনাল মায়ের নাম'। সন্ন্যাসীর প্রতি কী শ্রদ্ধা আমাদের। খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভয়ে ভয়ে শুধোই , 'মাছ মাংস খাবেন?' ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমরা তো স্বদেশী সন্ন্যাসী, আমাদের আহারে বাদ-বিচার নেই।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১০৭।

[57] প্রভাতকুমারের লেখা থেকে স্বদেশীর কালে দেশীয় যুবকদের স্বদেশী পণ্য ফেরি করবার কর্মকাণ্ড বিষয়েও সম্যক ধারণা পাই। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের শহরের (রানাঘাট) যে সব যুবকরা কলকাতায় কাজ করেন বা পড়েন তাঁরা 'স্বদেশী' বস্ত্র আনেন সপ্তাহান্তে। লালু পালের কাপড়ের দোকানের উপর ছিল 'পাবলিক লাইব্রেরী' – সেখানে সেগুলি থাকে ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। স্কুলের ছোট ছেলেরা সেই সব ধুতি শাড়ি বেঁধে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যায়।' দ্রষ্টব্য, তদেব।

[58] প্রভাতকুমার তাঁদের অঞ্চলের ধীরেন ব্যানার্জীর কথা বলেছিলেন, যিনি সেকালীন স্বপ্নের চাকরি স্বদেশী দোকান খুলেছিলেন। দ্রষ্টব্য, তদেব।

[59] জগদীশ ভট্টাচার্য, 'বন্দে মাতরম্', পৃ ৫৯-৬০; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১০৯।

[60] শ্রীকালীচরণ ঘোষ লিখেছেন, বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত পুরুষ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদগাতা হলেও তারা স্বদেশীর লভ্যাংশকে ঘরে তুলতে পারেননি, তাদের ব্যবসা-বিমুখতার জন্য। তাঁর মতে 'স্বদেশী আন্দোলন ও স্বার্থত্যাগের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া সম্প্রদায়।' দ্রষ্টব্য, শ্রীকালীচরণ ঘোষ, 'বাংলার বস্ত্রশিল্পের প্রতি অবিচার', ব্যবসা-বাণিজ্য পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫৩/১৯৪৬, পৃ ২২।

পূর্ববর্তী বিলাসিতা থেকে নিজেদের সরিয়ে এনে এই নতুন বিলাসিতায় নাম লেখাতে পারেননি। তাই মধ্যবিত্ত পরিসরের মধ্যেই স্বদেশীদের নিয়ে নানা ঠাট্টা-তামাশা চলত।[61] দেশীয়দের স্বদেশী ব্যবসা-বৃত্তি নিয়েও নানা নেতিবাচক কথাবার্তা চলত।[62] কিন্তু তবু একটা বড় অঙ্কের মধ্যবিত্তের মতো না হলেও কিছু সংখ্যক মুটে-মজুরকেও স্বদেশীর হিড়িক স্পর্শ করেছিল।[63] মধ্যবিত্তের অনেকের মতো মুখে আশুতোষী গোঁফ রেখে, মোটা বুননের মেটে রঙের ধুতি পাঞ্জাবি পরে 'ভেতর থেকে ... ত্যাগ, শক্তি ও সংগ্রামের আহ্বান' উপলব্ধির বিলাসিতা না থাকলেও, দিনের উপার্জনের কিছুটা স্বদেশী-যুবকদের হাতে তুলে দিয়ে মুটে-মজুররা নিজেদেরকে স্বদেশব্রতে সামিল করত।[64] কিন্তু তীর্থঙ্কর রায়, নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে যে বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে এই স্বদেশী হিড়িক দেশি শিল্পকে এগিয়ে দেওয়ার চাইতে পিছিয়ে দিয়েছিল বেশি।[65] যার অন্যতম মূল কারণ স্বদেশী মধ্যবিত্ত সমাজ উদ্যোগের চাইতে দেশপ্রেমের বিলাসে ও দেখনদারীত্বে আটকে থাকা ছিল বেশি।[66] ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পরতে মধ্যবিত্ত

---

[61] প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপগুলির 'কুলি'দের জন্য যে মোটা কাপড় বোনা হতো, সেই বস্ত্রই বাংলাদেশে এলো।' কারন 'তখন বাংলাদেশে কোনো কাপড়ের কল ছিল না। 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' স্থাপনের প্রস্তাব হচ্ছে।' ফলত 'মনে আছে স্কুলে গেছি এই কাপড় পরে – আমেদাবাদের 'গুজরাট জনিং মিলে' তৈরী। ধোপারবাড়ি থেকে ধুতি ধুয়ে এসেছে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে পাড়ের রং ছড়িয়ে গেছে। তাই দেখে ছেলেদের কি বিদ্রুপের হাসি, 'দেখ্ দেখ্, প্রভাত 'স্বদেশী চট্' পরে এসেছে।' ' দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১০৭-১০৮।

[62] পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিমূলক রচনায় মুকুন্দ দাস নামক এক চরিত্র স্বদেশী বিনিয়োগ নিয়ে বলেছেন, 'বাঙালী নাকি ব্যবসা ধরেছে – এ খবর আমার কাছে বহুবার পৌচেছে। বাঙালীর ব্যবসা যে কি, তার প্রমাণ আমি পেলাম কলকাতায়। তিনখানা ভাঙা বেঞ্চি ও দুটো হাতলভাঙা চিনে মাটির বাটি নিয়ে মস্ত বড় 'গ্রাজুয়েট কেবিন' সাইনবোর্ড ঝুলালে দুখানা সাইকেলের ভাঙ্গা চাকা সাজিয়ে সাইকেল মেরামতের দোকান করলেই কি আর ব্যবসা হয়!' দ্রষ্টব্য, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন', প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ভাদ্র ১৩৫৯), পৃ ২৫২।

[63] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি, পল্লীসমিতির মিটিঙের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম করে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, বললে , আজকের রোজগার। একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটেমজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্য কিছু করবার, কিছু দেবার।' দ্রষ্টব্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী যুগের গল্প', বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (কলকাতাঃ ক্যালকাটা বুক হাউস, মে ১৯৫৯), পৃ ১।

[64] পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন', প্রথম পর্ব, পৃ ২৫১।

[65] Tirthankar Roy, ' The Crafts and Capitalism: Handloom Weaving Industry in Colonial India', (London, New York: Routledge, 2020).

[66] মধ্যবিত্তীয় সমাজে দেশপ্রেমের এই দেখনদারীত্বের মনোভাবটি অচিন্ত্যকুমার সেনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতায় বোমা আতঙ্ককাল বিষয়ে লেখা একটি কাহিনীতে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি মধ্যবিত্ত যুবক বারিধির বিষয়ে লিখছেন, 'দেশের কাজ। বারিধির এ এক রকমের বিলাসিতা। ... এ এক রকমের মাতলামো। জমিদারের ছেলে হয়ে কমিদর-দের সাথে মিশছে এ এক-রকমের বাহাদুরি।' এই সংগ্রামের রাস্তাতে জমিদার-কমিদর মিশ্রণ হলেও জমিদারের ছেলের আলাদা সম্ভ্রম, তাই লেখক বলছেন, 'নিজে না খেলে পাশে বসে 'বল' চালাবে, এ উপর-চাল ছাড়া কিছু নয়।' তার উপর আছে বাপের দেখানো পথে না চলে, নতুন কিছু করবার তাগিদ, সেই তাগিদের মধ্যেও আসলেই বিলাসিতা। লেখকের ভাষায়, 'বাবার হস্তবুদে খাঁকতি পড়ে এ কখনো চায়না বারিধি। ... সে ভোলে যে সে অসাধারণ

শ্রেণীর নিজ স্বাতন্ত্র্য হারানোর ভয় তো অন্তঃসলিলা হয়ে ছিলই। তাই জমিদারী উদ্‌ভুত মধ্যবিত্তের ছেলেরা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কমিদারদের সঙ্গে এক সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেও চলনে-বলনে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাননি। অচিন্ত্যকুমার সেনের রচনায় স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী শ্রীভূষণ তাই তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের বারিধির মধ্যে অন্য সামাজিক শ্রেণীগুলির সাথে মিশেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রবণতা দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন – 'খালি পায়ের ধুলো মুছে মাঝে মাঝে সে রাজবেশ পরে – আন্তঃপ্রাদেশিক পোষাক – মাথায় কাপড়ের টুপি, পায়ে আলখাল্লার ধরণে পাঞ্জাবি, পরনে পা-জামা, পায়ের চটিটা মুণ্ড়ু-ওলটানো।' এই বেশে 'যখন সে বক্‌তৃতা করে, যখন সে গরিবের দাবী নিয়ে দাঁড়ায় গিয়ে বন্ধ দরজার কাছে। তখনই কিছুটা আশ্বস্ত হন শ্রীভূষণবাবু। তার ঐ ঢিলেঢালামিতে পরিচিতি পরিমিতি খুঁজে পান। খুঁজে পান আলস্যের আভাস, আরামের গন্ধ। আশ্বস্ত হন যখন দেখেন, তার স্বাস্থ্য বলোদ্ধত, ভাষা মার্জিত, ভঙ্গি সম্মত-সঙ্গত। যখন দেখেন শিক্ষা-সহবৎ কিছুই সে ছাড়েনি, ছাড়েনি তার কৌলিন্যের ধনবত্তার দায়িত্ব।'[67] অর্থাৎ শরীরের উপর চাপানো প্রত্যেকটি পোশাকি প্রস্থকে, চলা-ফেরা-বলার প্রতিটি আঙ্গিককে যদি সামাজিক ইতিহাস রচনার পাঠ হিসেবে দেখি, তবে শ্রেণি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদগুলি এইভাবে বেরিয়ে আসে। যদিও শ্রেণি-স্বাতন্ত্র্যের তাগিদ আপদ-কালীন সময়ে অন্যরূপ নিয়েও আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হতে পারে। তা'ই এবার দেখতে হবে।

বস্ত্র যখন মূর্তিমান বিদ্রোহ:

যেকোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সাথে মানুষের সামাজিক দেহের সামাজিক পাঠ পরিবর্তিত হয়। সেই পাঠ দ্বিমুখীন। একদিকে সামাজিক বিদ্রোহের কালে বিদ্রোহকারীদের দ্বারা যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিত হচ্ছে, তাদের সামাজিক দেহের পাঠ। অন্যদিকে ক্ষমতাধরদের দ্বারা বিদ্রোহীদের সামাজিক দেহের পাঠ। এই পাঠ, প্রতি-পাঠের মানসিক আবর্তে সমাজ তখনই পতিত হয়, যখন সমাজের ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ বা বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রের মধ্যেকার অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। তাই হেনরি বার্গসন বলছেন, আমাদের চারিপাশে আমাদের যা কিছু ঘিরে থাকে, তার সবটুকুকেই আমরা কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে দেখি – "We se(ns)e what we need to se(ns)e in a given

---

কিছু করছে, তার এই নেমে আসায়ও সেই আভিজাত্যের চেতনা। সম্ভ্রান্ততার স্বাদ।' খালি পায়ের ধুলো মুছে মাঝে মাঝে সে রাজবেশ পরে – আন্তঃপ্রাদেশিক পোষাক – মাথায় কাপড়ের টুপি, পায়ে আলখাল্লার ধরণে পাঞ্জাবি, পরনে পা-জামা, পায়ের চটিটা মুণ্ড়ু-ওলটানো।' দ্রষ্টব্য, অচিন্ত্যকুমার সেন, 'যায় যদি যাক', (কলিকাতাঃ ডি এম লাইব্রেরি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২), পৃ ২০।

[67] অচিন্ত্যকুমার সেন, 'যায় যদি যাক', পৃ ২১।

context.”[68] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, তাঁর দাদা দিনেন্দ্রনাথ স্বদেশীর কালে মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, গায়ে আলখাল্লা পরে পাঁচ বছর বয়সী তাঁকে কাঁধে নিয়ে গাইতেন ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল।’[69] গেরুয়া রঙ এমনিতে ত্যাগের প্রতীক। কিন্তু স্বদেশীর কালে সর্বসাধারণের কাছে সেটি স্বাদেশিকতা এবং আত্মনিবেদনের চিহ্নে পরিণত হয়েছিল।[70] বা তিনি যখন বলছেন, তাঁদের বাড়িতে স্বদেশীর কালে বিলিতি কাঁচের বাসনপত্তর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল।[71] সব বিলিতি বাসন একত্রিত করে তা সর্বসমক্ষে ভাঙ্গাও কোনো সময়ের প্রেক্ষিতে একটা অর্থ হিসেবে প্রাকাশ পায় বৈকি! সমাজের দেহের মধ্যে বিদ্রোহ, বিপ্লবের এই ছোটো ছোটো প্রকাশগুলো তখনই অর্থবহ হয়, যখন অপর পক্ষ এই প্রকাশ নিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে।

এই অস্থিরতাই দুটি ভিন্ন স্বার্থের গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণকে ঘনীভূত করতে থাকে। তাই বিদ্রোহীদের সামাজিক রীতি-নীতি থেকে শুরু করে লেখা-জোখা, এমনকি সামাজিক দেহ তথা পোশাক-আশাকও ক্ষমতাধর শক্তির সন্দেহের আতসকাঁচের তলে চলে আসে। শুধুমাত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীই নয়, অনেকসময় রাষ্ট্রীয় স্টিরিওটাইপের শিকার কোনো গোষ্ঠীও এই সন্দেহের অধীনে চলে আসতে পারে।[72] যেমন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের উপর ভিত্তি করে সংগঠিত হওয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লববাদের দিকে চালিত হওয়ার দরুণ এদেশীয় সাহিত্য, সংবাদপত্র, থিয়েটার অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সব অক্ষপথের মতোই পোশাক-পরিচ্ছদও ব্রিটিশ সরকারের সেন্সরের তলে চলে আসছিল।

---

68 Peter Corrigan, ‘The Dressed Society: Clothing, the Body and Some Meanings of the World’, (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications, 2008), p. 1.

69 সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘যাত্রী’, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতাঃ অভিযান পাবলিশিং হাউস, পৌষ ১৩৫৭), পৃ ৭।

70 এক্ষেত্রে গেরুয়া রঙের গভীরতা বুঝতে বিমল মিত্রের রচনার একটা চরিত্রের সংলাপের দিকে দেখতে পারি, ‘...হলেন ইতিহাসের ‘বিবেক’। যাত্রাপালা-গানে দেখনি, মাঝে মাঝে একজন লোক গেরুয়া রঙের আলখাল্লা আর গেরুয়া রঙের পাগড়ি পরে গান গাইতে গাইতে আসরে ঢোকে। সে গানের মধ্য দিয়ে পালার চরিত্রদের ব্যাখ্যা করে , পালার চরিত্রদের সাবধান করে দেয়, কখনও ভবিষ্যদ্বাণী করে, আবার কখনও চরম দুঃসময়ে নাটককে চড়া-পর্দায় তুলে নিয়ে গিয়ে একসময়ে অন্তর্ধান করে।’ পার্ফর্ম্যান্সে এই গেরুয়া রঙটিই একটি চরিত্রকে নাটকের বাদবাকি চরিত্রের জাগতিক সংসক্তি থেকে প্রাথমিকভাবে আলাদা করে এবং জাগতিক সমস্ত টানকে অগ্রাহ্য করে, যা কিছু ধ্রুব – তাকে প্রকাশ করে। স্বদেশীর কালে গেরুয়ার ব্যবহারকেও সেদিক থেকে ইঙ্গিতবহ মনে হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার জাগতিক ভ্রম থেকে তা স্বজাতির মনকে সত্য অর্থাৎ স্বধর্মে, স্বাধীনতায় ফেরার ইঙ্গিত দেয়। দ্রষ্টব্য, বিমল মিত্র, ‘ভগবান কাঁদছে’, (কলিকাতাঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, আগস্ট ১৯৫৮), পৃ ২২।

71 তদেব, পৃ ৮।

72 Peter Corrigan, ‘The Dressed Society’, p. 7.

এবিষয়ে ১৯১০ সালের একটি সরকারি নথি উল্লেখযোগ্য সাবুদ রাখছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ আইনসভায় ভারতীয়দের তথা বাঙ্গালির পরিধেয় কিছু ধুতি নিয়ে প্রশাসন বেশ ঘামিয়েছে।[73] স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে বাংলাদেশে যে সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রসার লাভ করে, তারই ফলশ্রুতিতে ১৯০৮ সালের ১১ অগস্ট বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। বাংলার জাতীয় জীবনে ১৮ বছর বয়সী ক্ষুদিরামের ফাঁসি গভীর রেখাপাত করেছিল। কোনো এক অজ্ঞাত চারণ কবির পদ ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। এই পদের

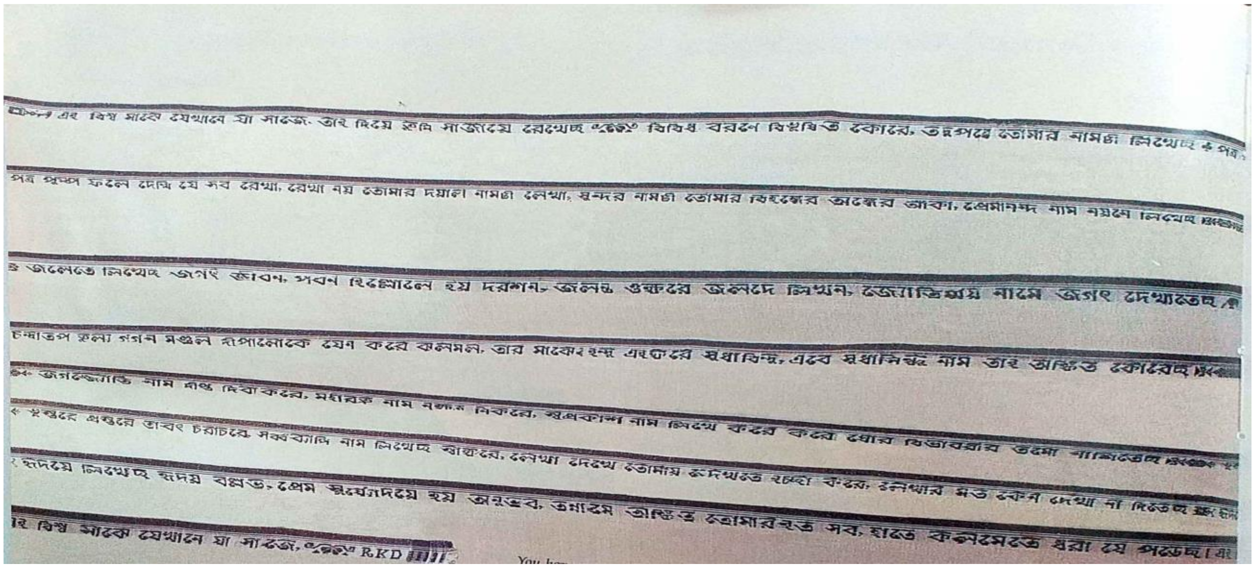

চিত্র ৬.৩: ধুতির পাড়ে ফুটিয়ে তোলা কাব্য (ঋণ: রুবি পালচৌধুরী, Bihar & West Bengal: Saris of India)[74]

প্রসার এমনি হয়েছিল যে, তা শুধুমাত্র লোকমুখেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেই সীমা অতিক্রম করে তা দেশীয় তাঁতিদের বোনা ধুতির পাড়েও লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং স্বদেশী মানসিকতার মানুষের পরিধেয় হিসেবে সমাদর পেতে শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে ‘বেঁচে থাকুন বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে’’পাড় ধুতি, বা চিত্র ৬.৩-এর ভক্তিমূলক পদ ছাপা পাড়ের ধুতিকে আমরা সেকালীন ধুতির পাড়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কিভাবে বোনা হত – তার উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি।

---

[73] Parliamentary questions and answers regarding the proscription under the Press Act of certain *dhotis* by the Bengal Government, Proceeding Nos. 152-153, Home Department, Political Branch, 1910, National Archive of India, New Delhi.

[74] Martand Singh edited, Rita Kapur Chisti compiled, ‘Bihar & West Bengal: Saris of India’, (New Delhi, Bangalore: Wiley Eastern Ltd.)

যাই হোক, আমাদের আলোচ্য ধুতির সেই পদটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন -- "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। / [আমি] হাসি হাসি পরব ফাঁসি/ দেখবে ভারতবাসী।।/ কলের বোমা তৈরি করে / দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে [মাগো]/ বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম/ আর এক ইংলণ্ডবাসী।।/ শনিবারের বেলা দশটার পরে/ জর্জ কোর্টেতে লোক না ধরে [মাগো]/ হ'ল অভিরামের দ্বীপচালান মা / ক্ষুদিরামের ফাঁসী।।/ বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি/ রইল মা তোর ব্যাটা-বেটি মাগো/ তাদের নিয়ে ঘর করিস মা/ বৌদের করিস দাসী।।/ দশমাস দশদিন পরে/ জন্ম নিব মাসীর ঘরে [মাগো]/ [ও'মা] তখন যদি না চিনতে পারিস/ দেখবি গলায় ফাঁসী।।"[75] সরকারী অনুবাদক এস. কে. মহাপাত্র পাঁচ গজ ধুতিগুলির পাড়ে লিপিবদ্ধ পদটি ইংরেজ সরকারের জ্ঞাতার্থে অনুবাদ করেছিলেন – 'Mother, Farewell,/ I shall go to the gallows with a smile./ The people of India will see this./ One bomb can kill a man./ there are a lakh of bombs in our homes./ Mother, what can the English do? If I come back,/ Do not forget, Mother,/ Your foolish child Khudiram./ See that I get your sacred feet at the end./ When shall I call you again "Mother" with the ease of my mind?/ Mother, do not keep this sinnerin another country./ It is written that you have 36 crores of sons and daughters./ Mother Khudiram's name vanishes now./ He is now turned to dust./ If I have to rise again,/ See that, Mother, I sit on your lap again./ In this kingdom of Bhisma who else is there like you?/ You are unparalleled Mother./ When shall I depart from this world with a shout of Bande Mataram?/ This is the saying of Bhabataran./ Farewell, Mother./ I shall go to the gallows with a smile./ The people of India will see this./ One bomb can kill a man./ There are a lakh of bombs in our homes./ Mother what can the English do?'[76] এক্ষেত্রে লক্ষনীয় হল, পদটির বাংলা এবং ইংরেজী মাধ্যমে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। হতে পারে মুখে মুখে বাহিত হয়ে বিভিন্ন রূপে পদটি ছড়িয়েছিল। তাঁতিদের শিল্পকর্মে তার একটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তবে যে ইংরেজি অনুবাদটি সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত, সেই রূপটি বহুল প্রচলিত বাংলা রূপটির চাইতে যে অনেক জ্বালাময়ী – তা অস্বীকার করবার নয়।

কাপড়-চোপড়ে এমন দেশপ্রেমের বারুদে-গন্ধ পেয়ে ব্রিটিশ সরকারের চক্ষু যে চড়কগাছ হয়েছিল তা বোঝা যায়, এমনতর কাপড়ের উপর Press Act কেন লাগু হবে না – এই জাতীয় প্রশ্নে। সেখানে বলা হচ্ছে, 'To ask Under Secretary of State for India, whether, in the case of the recent confiscation by the Government of Bengal a large quantities of waist cloths on the ground that they are seditious documents within the meaning of the New Press Act, the owners of these documents received or were entitled to receive any warning that the documents were considered

---

75 গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা স্বদেশী গান', (দিল্লীঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৮৩), পৃ ২৩৬।

76 . 'Farewell Mother', S. K. Mahapatra translated, Forfeiture under the Indian Press Act, 1910, (1 of 1910) of all *dhotis* having on their borders a poem in Bengali entitled "Farewell Mother", 17th Feb 1910, Home department, Political Branch, National Archives of India, New Delhi.

seditious or were given any opportunity of making any explanation; and if not, whether they have any right of appeal to a court of justice against this action of the executive.'[77] এক্ষেত্রে লক্ষনীয়, প্রশ্নকর্তা শুরুতেই নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, দেশাত্মবোধক পদ লেখা পাড়যুক্ত যে ধুতিগুলি পাওয়া গেছে নতুন প্রেস অ্যাক্ট অনুযায়ী সেই ধুতিগুলি তো রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক! কিন্তু কাপড়ে এই রাষ্ট্রদোহাত্মক পদ লেখা ধুতি বিকিকিনি করাকে কি লঘু ভাবে দেখা উচিত! কোনোভাবেই যে নয় তা বোঝা যায়, প্রশ্নকর্তার পরবর্তী বক্তব্যের অব্যক্ত অনুভূতিগুলির দিকে তাকালে। সেখানে বলা হচ্ছে, ধুতিগুলির মালিককে অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হবে যে ধুতিগুলি রাষ্ট্রদোহাত্মক এবং এই ধুতিগুলি বিষয়ে মালিক কোথাও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন কিনা। আর যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার মালিকের থাকে তবে মালিক কোন কোর্ট অব জাস্টিসে মামলার বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। অর্থাৎ ধুতিগুলির মালিক যে আত্মপক্ষ সমর্থনের অযোগ্য অপরাধ করেছেন, তা বোঝা যায় আত্মপক্ষ সমর্থনের গোঁড়ায় 'যদি'র ব্যবহারে। এককথায় বিংশ শতকের দশের দশকে বাংলা দেশে বিপ্লববাদের প্রসার শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক অবিশ্বাসকে এতই ঘনীভূত করে তুলেছিল যে, শাসিত যখন একদিকে নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক দেহের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিচ্ছে এরকম ধুতি পরিধান করে, তখন শাসক আইন প্রয়োগ করে নিজের সার্বভৌমত্বের কাগুজে বৈধতাকে প্রকট করার জন্য জনগনের শরীর থেকে তাদের রাজনৈতিক সত্তাকে বিশ্লিষ্ট করতে চাইছে।

সরকারী নথী আরও বিশদে পড়লে, নাগরিক দেহের রাজনৈতিক সত্তায় রূপান্তর এবং তা নিয়ে সরকারের উদ্বেগের চালচিত্র ধরা পরবে। তৎকালীন Officiating Director of Criminal Intelligence C. J. Stevenson-Moore যেমন এই 'উস্কানিমূলক' পাড়যুক্ত ধুতিগুলি কোথায় প্রস্তুত হয়েছিল, সে বিষয়ে বিশদে খোঁজ নেওয়ার কথা বলেছেন।[78] পরবর্তীতে বাংলার চিফ সেক্রেটারিকে দেওয়া ভারত সরকারের সেক্রেটারির চিঠিতে 'seditious' এবং 'inflammatory' কবিতাযুক্ত ধুতিগুলির উৎপাদন ও বিক্রির কেন্দ্র হিসেবে যথাক্রমে মেদীনিপুর ও কলকাতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।[79] F.C. Woodman বলেছিলেন, প্রেস অ্যাক্টের বারো নম্বর ধারায় বলা

---

[77] Parliamentary questions and answers regarding the proscription under the Press Act of certain *dhotis* by the Bengal Government, Proceeding Nos. 152-153, Home Department, Political Branch, 1910, National Archive of India, New Delhi.

[78] রিপোর্টে বলা হচ্ছে, 'Tell Mahapatra (অর্থাৎ পাড়ে লিখিত পদটির অনুবাদক) to get opinion of expert cloth dealer as to place of manufacture of *dhoti* and its border. 'দ্রষ্টব্য, Forfeture under the Indian Press Act 1910 (1 of 1910), of all *dhotis* having on their borders a poem in Bengali entitled "Farewell Mother", April 1910, Home Department, Political Branch, National Archive of India, New Delhi.

[79] From – The Secretary to the Government of India, Home Department, To- The Chief Secretary to the Government of Bengal; Pro. No. 36, 4th March 1910; Home Department, Political Branch; National Archives of India, New Delhi.

হয়েছিল রাষ্ট্রদোহাত্মক যে কোনো 'document' এর বিরুদ্ধে section 2 (6) ধারায় মামলা রজু করা যাবে।[80] H. A. Stuart বলেছিলেন উড ব্লক ব্যবহার করে দেশদ্রোহী কবিতা লিপিবদ্ধ পাড়যুক্ত ধুতিগুলির প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সেকশন বারো অনুসারে মামলা রজু হওয়া দরকার। কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্যই সরকার বিরোধিতাকে উস্কে দেওয়া[81] তাই বাংলার চিফ সেক্রেটারিকে দেওয়া ভারত সরকারের সেক্রেটারির চিঠিতেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে উক্ত পাড়যুক্ত ধুতিগুলিকে সেই 'document' হিসেবেই দেখতে হবে এবং ১২ (১) ধারানুসারে ধরপাকড়ের অঙ্গীভূত করতে হবে।[82] সরকারি চিঠি চালাচালির উপর ভর করে ১৯১০ সালের মার্চ মাসের ১২ তারিখ বাংলার চিফ সেক্রেটারি একটা নোটিশ জারি করেন। সেখানে লেখা হয়, -- 'Now therefore in exercise of the power conferred by section 12, sub-section (I) of the said act, the Lieutenant-Governor hereby declares all copies of the said documents wherever found in Bengal, and whether printed in Bengali, English or any other language, to be forfeited to His Majesty.'[83] অর্থাৎ বাংলা দেশে কাপড়ের মাধ্যমে সরকার বিরোধিতার বিকাশ লক্ষ্য করে প্রশাসন দেশের অন্যান্য ভাষাভাষীরা কাপড়-চোপড়ের মধ্য দিয়ে যাতে বিদ্রোহের বিকাশ ঘটাতে না পারে – সে বিষয়ে সচেতন হয়ে গিয়েছিল।

আবার এসব ধুতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে যাতে বাঙ্গালিদের বিদ্রোহ সম্প্রসারণের মুনাফা হিসেবে কাজ করতে না পারে, সেবিষয়েও প্রশাসনের কড়া নজরদারি ছিল। H.C. Woodman যেমন এবিষয়ে সেন্ট্রাল প্রভিন্সের চিফ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। Deputy Director of Criminal Intelligence A. B. Barnard এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'We have not heard of these *dhotie* having found their way into the Central Provinces, but there are several Bengali employes of the Railway with advanced ideas there for whose benefits this precautionary measure has probably been taken.'[84] অর্থাৎ সেন্ট্রাল প্রভিন্সগুলিতে এই ধুতিগুলি গিয়ে না

---

[80] Woodman লিখেছিলেন, 'This appears to be a 'document' within the meaning of section 2 (b) of the Press Act. Action should be taken at once by local Government under section 12.' দ্রষ্টব্য, Ibid,

[81] . Sruart এর ভাষায়, 'The printing is probably done by wooden blocks. I agree that section 12 is applicable.' দ্রষ্টব্য, Ibid.

[82] From – The Hon'ble Mr. F. W. Duke, I.C.S., Chief Secretary to the Government of Bengal, To- The Secretary to the Government of India, Home Department; Pro. No. 37, 12th March 1910; Home Department, Political Branch; National Archives of India, New Delhi.

[83] Notification by The Chief Secretary to the Government of Bengal, 12th March 1910, Home Department, Political Branch; National Archives of India, New Delhi.

[84] Letter from the Chief Commissioner, Central Provinces, No. 731, Dated 19th March 1910, Home Department, Political Branch, National Archives of India, New Delhi.

পৌঁছালেও সরকার এই ধুতিগুলির গতি সম্বন্ধে সচেতন। কারণ ওই প্রদেশে রেলে চাকরির সুবাদে এমন অনেক শিক্ষিত বাঙালি থাকেন, যাঁদের গায়ে এই ধুতিগুলি উঠলেই বারুদে দেশলাই পড়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হবে – এ আশঙ্খায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একপ্রকার নিদ্রা ছুটেছিল। সেকারণে সেন্ট্রাল প্রভিন্সগুলির চিফ সেক্রেটারি এবং পূর্ব বঙ্গ ও আসামের চিফ সেক্রেটারিকেও নির্দেশিকা জারি করতে হয়েছিল।[85] সেন্ট্রাল প্রভিন্সের চিফ সেক্রেটারি নির্দেশিকায় ধুতিগুলি উৎপাদনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন, '...the local Government of the Central Provinces, has received reliable information that certain *dhotis* (waist-cloths), having on their borders a poem in Bengali entitled "Farewell Mother", contain incitements to violence and words calculated to bring into hatred and contempt His Majesty and the Government established by law in British India, and to excite disaffection towards His Majesty and the said Government…'[86] অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও উস্কানি ছড়ানোই এই ধুতিগুলির মূল উদ্দেশ্য। যেহেতু ধুতিগুলিতে স্বদেশী উদ্‌ভুত দেশপ্রেমজাত কবিতা লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তাই Christopher pinny এই ধুতিগুলিকে 'cross-media artifact' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যেখানে ধুতিগুলিই যেন ঔপনিবেশিক সরকারের নথিতে একটা চরিত্র লাভ করেছে এবং শাসকের সামনে বিপ্লবের রূপকে পরিণত হয়েছে।[87] ঠিক যেমনটা তৎকালীন থিয়েটার, গান, শ্লোগান, পত্রপত্রিকা, বইপত্তর সরকারী অণুবীক্ষণের তলে চলে এসেছিল, তেমনি ১৯১০ সালের এই রিপোর্ট প্রমাণ রাখছে যে পোশাক-

---

[85] From- B.P. Standen, Esq., C.I.E., Chief Secretary to the Chief Commissioner, Central Provinces, To- The Secretary to the Government of India, Home Department. Pros. No- 38, 19th March 1910; From- The Hon'ble Mr. R. Nathan, C.I.E., I.C.S., Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam, To- The Secretary to the Government of India, Home Department, Pro. No- 39, 29th March 1910, Home Department, Political Branch, National Archives of India, New Delhi.

[86] সেন্ট্রাল প্রভিন্সের চিফ সেক্রাটারি নির্দেশিকায় বলেছেন – 'Whereas the local Government of the Central Provinces, has received reliable information that certain *dhotis* (waist-cloths), having on their borders a poem in Bengali entitled "Farewell Mother", contain incitements to violence and words calculated to bring into hatred and contempt His Majesty and the Government established by law in British India, and to excite disaffection towards His Majesty and the said Government, and whereas it appears to the said local Government that the said *dhotis* (waist-cloths) are documents within the meaning of section 2, clause (b) of the Indian Press Act, 1910 (I of 1910), and whereas the said local Government is of opinion that immediate action should be taken with respect to the said dhotis (waist-cloths) under the said Act in order that they may be prevented from disseminating matter, the publication of which is punishable under section 124-A of Indian Penal Code, the said local Government acting under the powers vested in it by section 12 (I) of the said Act hereby declares the said document whether printed in Bengali, English or any other language, to be forfeited to His Majesty.'

[87] Christopher Pinny, ' 'Photos of Gods': The Printed Image and Political Struggle in India', (London: Reaktion Books, 2004), p. 116; Christopher Pinny, "Iatrogenic Religion and Politics", Raminder Kaur & William Mazzarella ed., 'Censorship in South Asia: Cultural Regulation from Sedition to Seduction', (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2009), pp. 40-41; Sumathi Ramaswamy, 'The Goddess and the Nation: Mapping Mother India', (Durham & London: Duke University Press, 2010), pp. 145-146; Purnima Bose, "Engendering the Armed Struggle: Women, Writing and Bengali "Terrorist" Movement", Thomas Foster, Carol Siegel and Ellen E. Berry ed., 'Bodies of Writing, Bodies in Performance', (New York & London: New York University Press, 1996), p. 163.

পরিচ্ছদও সেই আওতার বাইরে থাকেনি। কারণ সামাজিক কথোপকথনের দৃশ্য-শ্রব্য অন্য মাধ্যমগুলির মতন পোশাকও সমাজের সম-রুচি ও সম-রাজনৈতিক চিন্তার আবর্তের মানুষকে একইভাবে প্রভাবিত করে।[88] উনবিংশ শতকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগরের চেষ্টাকে কুর্নিশ জানিয়ে "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হয়ে।" – ধুতি-শাড়ীর পাড়ে লিপিবদ্ধ করে যেমন তাঁতিরা নিজেদের সামাজিক দায় পালন করেছিলেন, তেমনি স্বদেশীর কালেও তাঁরা নিজেদের সামাজিক দায় পালন করেছেন। কিন্তু পার্থক্য হল, সময়ের। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ শাসক পালনকর্তা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংরেজ একটি উপনিবেশিত (colonized) জাতির গড়ে উঠতে থাকা জাতীয় চরিত্রের পক্ষে অনিষ্টকর।[89] আবার একইভাবে ওই জাতীয় চরিত্রের বিবিধ প্রকাশ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কাছেও অনিষ্টকর ঠেকেছিল। তাই যে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি পুরাতন স্বেচ্ছাচারী শাসকের হাত থেকে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করে নতুন শাসনের ভালো দিকগুলি দিয়ে দেশগঠনের দিকে 'সন্তান দলকে' ঠেলে দিয়েছিল, সেই ধ্বনিই যখন সময়ের সাথে সাথে নতুন শাসকের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করল, তখন থেকেই শাসকের দৃষ্টিতে সেই ধ্বনি তোপের মতন ঠেকল। সেকারণেই

---

[88] বঙ্গভঙ্গকে বিরোধিতা করে রাখিবন্ধন পালিত হবার দিন স্বদেশপ্রেমে স্ফুরিত প্রায় লক্ষ জনতা বিকেলে আপার সার্কুলার রোডের সভা থেকে পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে স্বদেশপ্রেমূলক গান গাইতে গাইতে মিছিল করে হাজির হয়েছিলেন। এই সভাতে স্বদেশী কাপড় তৈরির জন্য একটি ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দশদিক থেকে মুদ্রাবৃষ্টি হয়েছিল। এভাবেই সভাস্থল থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এখান থেকে অনুমান করা যায়, স্বদেশিয়ানার কাপুড়ে আবেগ কোন মাত্রায় পৌঁছেছিল। দ্রষ্টব্য, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, 'বন্দে মাতরম্', (কলিকাতাঃ কবি ও কবিতা প্রকাশন, জুন ১৯৭৮), পৃ ৫৩-৫৪।

[89] এই বিবর্তনের পথটা যত সহজে বলা হল, তত সহজ নয়। কোট-প্যান্টালুনের প্রতি ঝোঁক থাকা একটা প্রজন্ম হঠাৎ করে জাতীয়তাবাদী কবিতা লিপিবদ্ধ ধুতি পড়ে বিপ্লবী সাজেনি। তজ্জন্য স্বাজাত্যের মনন সৃজনের দরকার হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা থেকে আমরা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারব, কিভাবে একটা পাশ্চাত্য শিক্ষিত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তির বীজ উপ্ত হচ্ছিল। চায়ের ঠেকে 'ভাবী-বিপ্লবের খোস গল্প'ও কিভাবে শিক্ষিত যুবাদের নিজের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সমাজকে তলিয়ে দেখতে টানছিল। শ্রী অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারিন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, 'আমি কিছুকালের জন্য স্তুপাকার বই-এর মাঝে ডুব দিলুম। পড়তে হবে, জগতের পরাধীন জাতির ইতিহাস আমাকে পড়তে হবে, মানুষকে বোঝাবার আগে নিজে বুঝতে হবে যে সশস্ত্র বিপ্লব বিনা গতি নেই, রাজনৈতিক মুক্তি বিনা ভারতের মুক্তি অসম্ভব। তখন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙালীর ধারণা ছিল ইংরাজ রাজত্বের মত' এমন সুসভ্য এবং সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য আর নাই, এর প্রতিষ্ঠা ন্যায় ও পরার্থের উপর, অসভ্য অশিক্ষিত ভারতবাসীকে এরা জ্ঞান ও সভ্যতা দিতে এসেছেন। এই ধারণাকে কাটাবার যুক্তি আহরণ করতে হবে ইতিহাস থেকে, অর্থনীতি থেকে, বীর যোদ্ধা ও জাতি গঠক মহাপুরুষের জীবনী থেকে, পুরাণ, মহাভারত থেকে, ধর্ম্ম শাস্ত্র থেকে। আজ ছেলেরা বিপ্লব করতে নেমেই বোমা ফেলে মানুষ মারে। আমাদের ওটা ছিল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার, আন্দোলনের অনেক পরে নিতান্তই দায়ে পড়ে সেটা আত্মপ্রকাশ করেছিল। আমাদের প্রধাণ লক্ষ্য ছিল জাতির মন্টিকে গড়া, জাতীয় শিক্ষা, বাঙ্গালীকে নব মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করা। মুক্তি যে চাই এই কথা আগে বোঝাতে হবে, আনতে হবে মানুষের প্রাণে একটা অস্তিত্ব, বাঁচবার তীব্র ইচ্ছা, বড় হবার অদম্য প্রেরণা।' এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সফল হয়েছিলেন বলেই, মানুষ নিজেদের দেশমাতৃকার সন্তান হিসেবে উপলব্ধি করেছে এবং সেই উপলব্ধি দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের রাজনৈতিক দেহকে সাজাতে ব্রিটিশ সরকারের নথি কথিত 'দেশদ্রোহী' কবিতা লিপিবদ্ধ ধুতি পরেছিল। দ্রষ্টব্য, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 'বোমার কাহিনী', স্বদেশ পত্রিকা, ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, পৃ ৪২৫।

বরিশালে ১৯০৬ সালে 'বন্দে মাতরম' ব্যাজ পরিহিত ছাত্রদলের উপর ঔপনিবেশিক পুলিশের নির্যাতন নেমে এসেছিল।[90] এক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম' বিরোধের চিহ্নে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা খালি চোখেই বোঝা যায়, কিন্তু সেই চিহ্নের সাথে শাসিতের দেহের সংসর্গে শাসিতের দেহও বিদ্রোহের প্রদর্শন মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। আবার অন্যদিকে 'লাল পাগড়ি' দেখলেই জনগণের মধ্যে বিশ শতকের তিরিশের দশকে বরিশালের জনগণ উত্তেজিত হয়েছেন। কারণ 'লাল পাগড়ি' হয়ে উঠেছিল উপনিবেশিক সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী পুলিশকে চিহ্নিত করবার মাধ্যম।[91] এক্ষেত্রে ফুকোর সামাজিক শরীর বিষয়ে বক্তব্যকে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ফুকো বলেছিলেন, 'The body -- and everything touches it : diet, climate, soil – is the domain of the *Herkunft* (origin).' অর্থাৎ মানুষের শরীর এবং যা কিছু এই শরীরকে জীবন থেকে মৃত্যুর মাঝের সময়টাতে স্পর্শ করে সবটাই কোনো না কোনো অর্থ তৈরি করে। 'the body manifests the stigmata of past experiences and also gives rise to desires, failings and errors.' আর সেই অর্থ যা অভিজ্ঞতা হিসেবে ব্যক্তির চলার পথে সঞ্চিত হয়, তার উপর নির্ভর করে এই ব্যক্তি শরীর আশা,নিরাশা ও ভ্রান্তির জন্ম দেয়। 'These elements may join in a body where they achieve a sudden expression, but as often, there encounter is an engagement in which they efface each other, where the body becomes pretext of their insumerable conflict.' আর এই আশা-নিরাশা-ভ্রান্তি শরীরকে মাধ্যম করেই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, পারস্পরিক বিক্রিয়ায় তার কোনোটি শরীর দীর্ঘদিন ধারণ করে, কোনোটি মুছে যায়, কিন্তু শরীর থেকে যায় অসংখ্য দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হিসেবে। সুতরাং 'The body is the inscribed surface of events … totally imprinted by history and the process of history's destruction of the body.' অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে চলতে থাকা নানান ঘটনা এই শরীরে ছাপ ফেলে যায়, এইভাবেই শরীর ইতিহাসকে বহন করে আবার ইতিহাসের বিনির্মিতির সাক্ষী থাকে।[92]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতবর্ষের পূর্বাংশে এই শরীরই পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচিবোধকে ধারণ করেছে, আবার নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ওই শরীরই বিংশ শতকের শুরুর দিকে এসে স্বাজাত্যবোধের চিহ্ন ধারণের দিকে বয়ে গিয়েছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে বস্ত্রের উপর দেশাত্মবোধক পদের

---

[90] Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, (New Delhi: People's Publishing House, 1973), pp. 292-293; সমুদ্র গুপ্ত, 'বঙ্গ ভঙ্গ', (কলিকাতাঃ আনন্দধারা প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৭৫), পৃ ১১৩-১১৪; শ্রীমতিলাল রায়, 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী', (কলিকাতাঃ প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৫৭), পৃ ৪; অশ্বিনীকুমার দত্ত, 'ভক্তিযোগ', (কলিকাতাঃ চক্রবর্তী, চাটাৰ্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৯৬৫), পৃ ২২-২৩।

[91] Tanika Sarkar, 'Bengal 1928-1934: The Politics of Protest', (Delhi: Oxford University Press, 1987), p. 119.

[92] Michel Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History", Donald F. Bouchard ed. And Donald F. Bouchard & Sherry Simon Translated 'Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews by Michel Foucault', (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1977), p. 148.

অলংকরণ, বস্ত্রকে বিদ্রোহের অস্ত্রে পরিণত করেছিল তো বটেই, তার সাথে সেই বস্ত্র দেহে চাপবার মধ্য দিয়ে দেহও তার এতদিনকার নির্মিতি (তা হতে পারে পাশ্চাত্য রুচিপ্রেমী, ইংরেজ সরকার পন্থী বা ইংরেজ শাসন বিষয়ে ভাবলেশহীন) ভেঙে নতুন নির্মিতিতে ঢুকে পড়েছে। এই পরিচলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল নিজের সৎ সত্তার দিকে ফিরে যাওয়া, যে সত্তা এতদিন বাইরের প্রভাবে নিজেকে ভুলে ছিল। তাই চরকার তৈরি ধুতি খাটো হলেও, পাশ্চাত্য শিষ্টাচার-শিক্ষিত যুবাদের পরিশীলনে আঘাত আসেনি।[93] কারণ স্বদেশী এতদিনকার ভুলে থাকা সত্তার বিষয়ে দেশীয় সমষ্টির বিবেককে জাগিয়ে, তাদেরকে বাহিরের সজাগ আত্তীকরণ ঘটানোর দিকে চালিত করেছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে যে শরীরের কথা বলা হচ্ছে, তাকে সমষ্টির শরীর বুঝতে হবে। স্থান-কালের নিরিখে যখন কোনো আদর্শ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির প্রাত্যহিক আদান-প্রদানের, কথোপকথনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, তখন তা সমাজের প্রতিটি বা বেশিরভাগ মানুষের দেহের উপর ছাপ রেখে যায় এবং সমষ্টির শরীরের বিকাশ ঘটায়, যা (যদি মধ্যেকার চরমপন্থী ও নরমপন্থী বিভাজনগুলো তুলে দিই) সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। যতক্ষণ সংঘ কল্যাণকর থাকে, সংঘের মনন জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ ব্যক্তি সেই সংঘের দ্বারা প্রভাবিত হয়।[94] স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপ্তির পিছনে সেইরূপ সংঘবদ্ধতার ভূমিকা রয়েছে, যেকারণে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ সংঘবদ্ধ জনতার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে শুরু করে।[95] পূর্ববঙ্গের বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও পিকেটারদের ধরপাকড় শুরু হয়

---

[93] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, বাড়ির গিন্নি থেকে চাকরবাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘরঘর করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। ... ছোটো ছোটো গামছা, ধুতি তৈরি ক’রে মা আমাদের দিলেন – সেই ছোটো ধুতি হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প’রে আমাদের উৎসাহ কত!’ দ্রষ্টব্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ঘরোয়া”, ‘অবনীন্দ্র রচনাবলী’, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা প্রকাশ ভবন, মাঘ ১৩৭৯), পৃ ৭০।

[94] শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন, ‘ব্যক্তিরা যখন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা নিজে নিজে থাকে তখন কিছু নয়, কিন্তু যখনই পরস্পরের সংস্পর্শে সম্বন্ধে আসিয়াছে, তখনই এই সংস্পর্শ এই সম্বন্ধ একটা পৃথক নিজস্ব সত্তা পাইয়াছে, একটা বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, আর ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত গঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যক্তিই প্রথমে সঙঘকে সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্ট হইবামাত্র এই সঙঘই আবার ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।’ দ্রষ্টব্য, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, “সমষ্টি-পুরুষ”, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখিত ‘স্বরাজের পথে’, (চন্দননগরঃ প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৩০), পৃ ৭৪।

[95] । জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাত্রা যত বৃদ্ধি পেয়েছিল ততই পোশাকের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ পুলিশের নজরদারিও বেড়েছিল। গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের সূত্রে কলেজ স্কোয়ারে প্রাদেশিক কংগ্রেসের স্বয়ংসেবকদের ঘাঁটিতে বে-আইনী লবণ তৈরিতে কালো খদ্দরের পাঞ্জাবি এবং মোটা খদ্দরের ধুতিতে সজ্জিত হয়ে অংশ নিতে যাওয়া মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর দাদামশাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “ঐ কালো পাঞ্জাবি আর ঐ ঝুলিটা দেখলেই পুলিশে ধরবে।” তাই দাদামশায়ের বকুনিতে তাঁকে কালো পাঞ্জাবি আর খদ্দরের ধুতি ছেড়ে ‘মার্কিনের জামা পাজামা পরতে হল।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের বাজারে মার্কিনী বস্ত্রের বাজার প্রসারিত হয়। দ্রষ্টব্য, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘দক্ষিণের বারান্দা’, (কলিকাতাঃ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৯৫৯), পৃ ৬৩-৬৫।

এবং বাজারে বিলাতী-বস্ত্র পুনঃপ্রচলনের চেষ্টাও ব্রিটিশ পুলিশ করতে থাকে।[96] এ না হয় গেল, দেশীয়দের রাজনীতির পোশাকি রূপ নিয়ে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির একটা ভাষ্য, কিন্তু এবার স্বদেশীকালীন আনুষ্ঠানিক পরিসরে পোশাকি অনুশীলনের দিকে তাকাতে হয়, যাতে করে স্বদেশীর চরিত্রকে আরও গভীরে গিয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

পোশাকি স্বাদেশিকতার স্বরূপ: অনুষ্ঠান ও উদযাপনে

১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংগঠিত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সময় দুর্গা পুজোর বস্ত্র বাজার জাতীয়তাবাদের বোধকে দেশীয়দের মনে সঞ্জীবিত করবার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে থাকে। তৎকালীন ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় ১৯০৩ সাল থেকে বিদেশি বস্ত্র বর্জন করে স্বদেশী গ্রহণের আবেদন নিয়ে প্রচুর বিজ্ঞাপন

চিত্র ৬.৪: স্বদেশি লিথোগ্রাফে হিন্দু পুরাণ – পাশ্চাত্য ভোগবাদের অতীব বিস্তারে কুপিত শিব (@CSSSC_Archive) [97]

---

[96] শ্রীমতিলাল রায়, ‘আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী’, (কলিকাতাঃ প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৫৭), পৃ ৪।

[97] AW3, Lithograph: Materialism, Size -48*33, Gita Press, Gorakhpur, Artist – Jagannatha, Color Transparencies of late 19th & early 20th Century , Courtesy: Sanjit Chaudhury, CSSSC, Kolkata.

প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালের একটা বিজ্ঞাপনের শিরোনাম এরকম—'FOR THE POOJAHS—Nothing Bideshi/ Everything Swadeshi'। সেই বিজ্ঞাপনে তিন রকম দামের 'original' ও 'exclusive' সিল্ক শাড়ির কথা বলা হয়েছিল। দাম যথাক্রমে ১২, ১৬ ও ২৩ টাকা। এবং সেই শাড়িগুলোর সাথে মানানসই ব্লাউজ ও জ্যাকেটের দাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৬ টাকা। মেয়েদের জন্য পিনাফর ও ফ্রকের দাম মোটামুটি ২, ৪, ৬ টাকা থেকে শুরু বলা হয়েছে আর ছেলেদের জন্য নিকার-বুকার এবং লম্বা সিল্ক কোটের দামও ২, ৩, ৬ থেকে শুরু হচ্ছে, বলা হয়েছিল।[98] এখানে দ্রষ্টব্য বিষয় হল, অন্যান্য প্রসাধনীর চাইতে মহিলাদের শাড়ীর দাম অনেকটাই বেশি। সব শ্রেণির মানুষের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে বস্ত্র কেনা সম্ভব ছিল না, সেহেতু স্বদেশী চলাকালীন সময়েও চোরাগোপ্তাভাবে বিলিতি কাপড়ের বাজার চলত। 'সচিত্র শিশির' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, স্বদেশীর পর গ্রামের বিলিতি কাপড়ের ব্যবসায়ী হরিচরণের দুরাবস্থা—'আজ মহালয়া। প্রভাত হইতেই বাবুদের বাড়িতে থেকে থেকে ঢাক ঢোল বেজে উঠিল। অন্য বছর হরিচরণ এই সময়ে বাড়িতে বসে থাকিত না। ...এক প্রহর রাত্রি থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া দোকান খুলিতে যাইতে হইত। দশখানা গ্রামের লোক সকাল হইতে শুরু করিয়া দেড় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত পূজার কেনাকাটা করিতে আসিত।' কিন্তু এবছর পুজোর বাজার করতে তার দোকানের চৌকাঠ মাড়াচ্ছে না কেউ। কারণ তার দোকান বিলিতি শাড়ী, ধূতি, দোলাই, চাদরে পরিপূর্ণ।[99] একটা সময় যখন তিনি এইসমস্ত কাপড় নামমাত্র দামে বেঁচে লাভের আশায় খদ্দর কিনলেন, তখন মহাত্মা গান্ধীর ছয় বছরের জেল হওয়ার খবর চাউর হয়, এবং লোকজন বেশিদামে খদ্দর না পড়ে লুকিয়ে চুপিয়ে কমদামের বিলিতি কিনতে শুরু করে।[100] অর্থাৎ স্বদেশীর যে ঢেউ এসেছিল, তা প্রাথিমকভাবে একটা সময়ের দাবি এবং পরবর্তীতে যুক্তি-বুদ্ধি ব্যতিরেকে একজন ব্যক্তির ক্যারিশ্মা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ায়, সেই ঢেঊয়ে সুদূরপ্রসারী কোনো লাভ হয়েছে কিনা—এই প্রশ্নটি তৎকালীন অনেক সংবাদপত্রে উঠে এসেছিল। ভারতের বাজারে ম্যাঞ্চেস্টারজাত বস্ত্রের প্রসার এদেশীয় চড়কা চালিত তাঁতের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল, যা স্বদেশীর মাধ্যমেও পুনরুদ্ধার করা গিয়েছিল কিনা সন্দেহ থেকে যায়। তার উপর আবার ১৯১৪ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে বস্ত্রের সংকট শুরু হয়। যা দেশীয়দের পুজোর কেনাকাটাকেও প্রভাবিত করে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সাময়িকী অংশে লেখা হয়—'পূজা আসিয়াছে। যাঁহারা দুর্গোৎসব করেন তাঁহারা পূজার আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা পূজা করেন না এমন হিন্দু-গৃহস্থও নিশ্চিন্ত নহেন। এই বস্ত্রের মহার্ঘ্যতার সময়ও যাঁহার যেমন সাধ্য পুত্র-কণ্যাগণের জন্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেছেন। যে

---

[98] Bengalee, Oct. 3, 1909, p.10

[99] সচিত্র শিশির, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা; ৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৩০, পৃ. ৮১।

[100] তদেব।

দরিদ্র পিতা ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া সেদিন কণ্যা-বিবাহের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি এখন এই পূজার সময় জামাতাগৃহে তত্ত্ব পাঠাইবার ব্যয় নির্বাহের জন্য বন্ধক দিবার মত আর কিছু না দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন।......আর যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, যাঁহারা উচ্চবেতনভোগী, তাঁহাদের অনেকেই এই পুজোর অবকাশে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের গৃহে পিতৃ-পিতামহের আমল হইতে পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারা অগত্যা বাড়ির গোমস্তাদের উপর পূজার ভার দিয়া মধ্যপুর, শিমূলতলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে যাওয়া—বল কি! সেখানে যে ম্যালেরিয়া!'[101] বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, পরিচ্ছদের সংকটের কারণে সমাজের এক শ্রেণির কপালে যখন বার্ষিক পরবের মরশুমে চিন্তার ভাজ, বস্ত্র সংকটের কারণে হাটে বাজারে যখন কাপড় লুটের খবর শোনা যায়, লজ্জাভয়ে অনেক বঙ্গরমণীকে যখন আত্মহত্যা করতে শোনা যায়, তখনও কিন্তু শহরনিবাসী মধ্যবিত্তের একটা শ্রেণির কাছে গ্রাম পরিত্যক্তই থেকেছে। স্বদেশীর প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের উন্নতি তো দূরঅস্ত, বরং ম্যালেরিয়ার অজুহাতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে মধ্যবিত্তজ বিভাজনের একটা পাচিল উঠেছিল – তা অনুমান করা যায়।[102]

স্বদেশী সময়কালে কিছুদিনের হিড়িকে পোশাকি স্বাদেশিকতা দেখিয়ে বিদেশি পোশাক জ্বালানো-পোড়ানো আর অন্যদিকে সেই অনুপাতে নিজেদের গ্রামীণ সমাজের উন্নতি ও স্বার্থের জন্য নিরুদ্বিগ্ন ভাবের পরিণতিও মধ্যবিত্ততার সামাজিক পরিসরে ধীরে ধীরে প্রকট হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীবিরুপাক্ষ ছদ্মনামে মধ্যবিত্ত সমাজের কোনো এক প্রতিনিধি, সময়ের অভিঘাতে মধ্যবিত্তের পরিবর্তনমান জীবনশৈলীর খাঁটি বাস্তবকে তুলে ধরেছিলেন এইভাবে-- 'মশাই, পটকার জন্য ঠায় রোদ্দুরে তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে পাঁচ গজ ছিট, ঘেচির জন্য ফ্রকের বাহারি কাপড়, গিন্নীর জন্য তিন টাকা দশ আনা দিয়ে সদ্য কোড়া কাপড়, পান্তুর জন্য এগারো সিকি দিয়ে একটা প্যান্টালুন নিয়ে এলুম, পাড়ার তিনটি বাঁকে যে যা চাইলে, সর্বজনীন পুজোর চাঁদা দিলুম, ভেবেছিলুম তিন জায়গা থেকে মায়ের ভোগ চেয়ে এনে অন্তত নিজের ত্রিসন্ধ্যের রেশনটা বাঁচিয়ে ফেলব।'[103] কিন্তু লেখকের আফসোস বৃষ্টি তার সব পরিকল্পনাতে জল ঢেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি মধ্যবিত্তের হিসেব কষে পা ফেলবার প্রতিচ্ছবি একটা উৎসব পালনের নিমিত্তে খরচ হওয়া অর্থের জন্য হুতাসের মধ্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-- 'এই বাজারে কতকগুলো পয়সা নষ্ট হল, কে কার জামাকাপড় দেখলে তার

---

[101] ভারতবর্ষ পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ-প্রথম খণ্ড-পঞ্চম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৪, পৃ. ৭৮৫।

[102] যোগেশচন্দ্র রায়, 'বস্ত্রচিন্তা', প্রবাসী, ১৮শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, কার্ত্তিক ১৩২৫; পৃ. ৩৪ ।

[103] শ্রীবিরুপাক্ষ, 'পূজার ঝঞ্ঝাট', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২; পৃ. ১৯২।

ঠিক নেই।'[104] তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে কতকগুলো প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উঠে এসেছে। প্রথমত, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্তের যখন পকেটে টান, তখন চাঁদা তুলে পুজোর পিছনে খরচ করে লাভ কি? চাঁদার টাকায় একদিনের জন্য লোক দেখানো কাঙ্গালি ভোজন করিয়ে কি আদপেই কাঙ্গালিদের সম্বৎসরের খিদের জ্বালা মেটানো যায়? তাঁর ভাষাতেই যদি বলি—'...শক্তিকে আমরা ক্রমশ ভাগ করে চলেছি, বিকৃত করতে শুরু করেছি, মানে বাঙ্গালীর যা হয়ে থাকে, এক পাড়ায় সাতখানা ঠাকুর, তাই না পাওয়া যায় পুরুত, না মেলে ঢাকী; কারণ—রেশারিশি! এ দলের জোর ও দলকে দেখানো চাই, আর এই অমুককে চাঁদা দিলেন আমাদেরও দিতে হবে, কিন্তু আমরা আর দিই কত? উৎসবের নামে যদি এত ঝঞ্ঝাট বাড়তে থাকে, তাহলে ওসব বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।......এই কথাটা একজন ভদ্রলোককে বলেছিলুম বলে তো তিনি আমায় যাচ্ছেতাই গালমন্দ দিলেন, বললেন, জানেন, এই উৎসব করে আমরা কত কাঙালীকে খাওয়াই?......আমি বললুম, কাঙালী খাওয়ানো ভালো কথা, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালী আমরা, আমাদের যে একবেলা খাবার জুটছে না মশাই! ওদের আর একদিন খাইয়ে হবে কি? পেটের অসুখ বাড়াবেন বই তো নয়! তার চেয়ে জাতটাকে আরো সতেজ করে তোলার চেষ্টা করুন না চাঁদা তুলে, যাতে দেশে কাঙালী কেউ না থাকে!"[105] বিশ শতকের মধ্যভাগে যেতে যেতে মধ্যবিত্ততার স্বাতন্ত্র্য-বিলাস যে কাঁটা হয়ে ফুটতে আরম্ভ করেছে, তা এই বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায়। যার মূল কারণ হল – মধ্যবিত্ত নিজেদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সমষ্টির কথা চিন্তা করেনি। সমষ্টির উন্নতিবিধানের চাইতে নিজেদের স্ব স্ব সামাজিক স্বাতন্ত্র্যে আটকে থেকেছিলেন। আর সেই স্বাতন্ত্র্যে শুধুমাত্র যে গ্রামীণ সমাজের অপরায়ন ঘটল, তা কিন্তু নয়, সাথে সাথে ইংরেজি শিক্ষা না নিয়ে, পুরাতন শাসনের দম্ভ ও শিষ্টাচারকে আশ্রয় করে থাকা মুসলমানদেরও অপরায়ন ঘটল। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় তা উঠে আসবে।

লুঙ্গি: সাম্প্রদায়িকতার নির্মিতি

স্বদেশী আন্দোলন একদিকে যেমন কলকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্বাদেশিকতার বীজ রোপন করেছিল, তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকা পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠতা-কেন্দ্রিক কলকাতার রাজনৈতিক আবর্ত থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থিক-সামাজিক উন্নয়নের একটা আশার সঞ্চার করেছিল। আর সেকারণেই স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়েছিল। যা অনেক সময় এতদিনের অত্যাচারিত মুসলিম রায়তদের হিন্দু জমিদারদের প্রতি ক্ষোভজাত। ফলত বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কালে তা হিন্দু-মুসলিম

---

[104] তদেব।

[105] তদেব।

দাঙ্গার আকারে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। জন আর. ম্যাকলেন লিখেছেন, বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের বৃহত্তর হিন্দু-মুসলিম স্বার্থের বিভাজিত রূপটি প্রকট হতে থাকে। একদিকে এই আন্দোলন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এককালে মুসলিম শাসনে অবদমিত হিন্দুদের নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। অন্যদিকে শিক্ষা ও রাজনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা হিন্দুদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের সামাজিক অগ্রগতি পিপাসু মুসলিমদের স্বার্থ-সচেতন কর্মসূচী। সেকারণে ১৯০৭ সালে কুমিল্লার সাতাশ মাইল উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত ‘মোগরা’ নামক হাটের সন্নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে স্বদেশী স্বচ্ছাসেবকদের দ্বারা প্রভাবিত স্কুলছাত্ররা মুসলমানদের বিলিতি পণ্য বিক্রয়ে বাধা দিলে, তা দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহ করে।[106] ম্যাকলেন বলছেন, এই দাঙ্গায় মুসলমানরা ছিল মূল আক্রমণকারী। ম্যাকলেন বিষয়টিকে হিন্দু জমিদারীর সংগঠিত শোষণের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এক জায়গায় এরূপ দাঙ্গার পরিবেশ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও দাঙ্গার সূত্রপাত করে। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম স্বার্থের বিরোধ যে স্বদেশীর সাথে জড়িয়ে ছিল, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর সেই বিরোধ যে চেতনার পোশাকি রূপের মাধ্যমে প্রকট হতে বাধ্য। সেই চেতনার বিষয়ে তলিয়ে ভাবতে হবে। সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির এই দ্বৈরথ বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান ধীরে ধীরে নিজেদের মর্মমূলকে উপলব্ধি করার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাই স্বদেশী পরবর্তী নানা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূল কারণ হিসেবে বাঙালি হিন্দু পরিচালিত অনেক পত্র-পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের ভিন্নতাকে অভিযুক্ত করা হলে, শিক্ষিত হিন্দুদের আসল উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিশ শতকের বিশের দশকে মোহাম্মদ আকরম খাঁ একে শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণির হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি পঞ্চম জাতিবর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পর) সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন।[107] মোহাম্মদ আকরম খাঁর অভিযোগ – সংবাদপত্রগুলির হিন্দু মান্যবররা বলেছিলেন, মুসলমানরা যদি বিদেশি পরিচ্ছদ তথা ট্রাউজারস-আচকান-চাপকান বর্জন না করেন, পশ্চিমমুখী হয়ে নামাজ পড়া বন্ধ না করেন, বিদেশী আরবি ভাষায় উপাসনা বন্ধ না করেন – হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ মীমাংসা অধরা থেকে যাবে। মোহাম্মদ খাঁর মতে, হিন্দু চিন্তানায়করা অবিদিত ছিলেন না যে – এই কথাগুলির সাথে মুসলমানের ‘জীবনমরণ রহস্য’

[106] Extracts from ten judgements by the Session Judge and Magistrate of Tippera, Enclousure to H. Le Mesuner, Officiating Chief Secretary, East Bengal and Assam to Secretary, Govt. of India, Home Department., 29 June 1907, Prog. No. 192, IHP., Pol. নিয়েছি জন আর ম্যাকলন, “বঙ্গবিভাগ (১৯০৫); হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক”, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, ১ম খণ্ড’ (কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ১৯৯৩), পৃ ১৮০ থেকে।

[107] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ‘জাতীয় পোষাক’, মাসীক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্‌গুন ১৩৩৫। পৃ ২৬৫।

লুকায়িত আছে।[108] আর এই উপলব্ধিই বাঙালি মুসলমানকে বাঙালি হিন্দুর জীবণাচরণ থেকে তফাতে সরিয়ে নিতে শুরু করেছিল।

রূপঙ্কর সরকার একাত্তরের প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে লিখেছিলেন, 'আবার সে লুঙ্গিরও হিন্দু-মুসলিম ছিল। রিফিউজিদের কলোনিতে প্রচুর 'হিন্দু' লুঙ্গি দেখা যেত। সেগুলো এক রঙের হত। কয়েকটা বাঁধা রঙ ছিল, খুব গাঢ় নীল, সবুজ ও বেগুনি। তাদের একটা সরু পাড়ও থাকতো। চেক লুঙ্গি মানেই সেগুলি মুসলমানের লুঙ্গি।'[109] অর্থাৎ বিশ শতকের সত্তরের দশকে বাঙালি মুসলমান এবং বাঙালি হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য একই পোশাকের দুটি ভিন্ন রূপকে আশ্রয় করে প্রকট হয়ে গেছে। রূপঙ্কর সরকারের লুঙ্গি সংক্রান্ত বিশ্লেষণটা মূলত দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে পশ্চিম বাংলায় হিন্দু শরণার্থী উদ্‌ভুত উদ্বাস্তু সমস্যার আলোকে। সেহেতু উনবিংশ শতকের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে তা অনেকটা দূরবর্তী। কারণ হিন্দু-মুসলমান পরিচিতির উপর ভিত্তি করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া একটি জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই যখন ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভর করে আবার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ওঠে, তখন বাঙালি মুসলমানের পরিচ্ছদ কিভাবে উর্দুভাষী মুসলমানের পরিচ্ছদের সাথে সচেতন দূরত্ব রচনা করল এবং নিজেদের পোশাকি জাতীয়তাকে প্রকট করল – সেই প্রশ্নটাই উক্ত সময়ের নিরিখে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই প্রশ্নটার সম্ভাব্য ক্ষেত্র একদিনে তো তৈরি হয়নি। তার স্ফুরণ বিন্দু বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কালে কিভাবে হয়েছে – তার আভাস আলোচনার শুরুতে খানিক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতকে, যখনও এদেশের মুসলমান সমাজ ভারতে নিজেদের গৌরবময় অতীত সাম্রাজ্যের কথা ভুলতে পারেনি, তখন তাদের পোশাকি পরিচিতিটা কিরূপ ছিল – এই প্রশ্নটা সবচেয়ে আগে বুঝতে হবে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমাদের সময় হাফ-প্যান্ট, লুঙ্গি, পায়জামা কেউ পরতো না – মুসলমানরাও ধুতি পরতো। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ মাথায় সাদা গোল টুপি পরতো।'[110] পুব বাংলার ফরিদপুরে জন্ম

---

[108] তদেব।

[109] রূপঙ্কর সরকার, 'আমার কলকাতা', (কলকাতাঃ একটি সৃষ্টিসুখ প্রয়াস, ২০১৮), পৃ

১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে লুঙ্গির ফ্যাশনে পরিণত হওয়া নিয়ে শারদীয়া সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, 'আমাদের ভারতীয় সাড়ি (আজকাল তার সঙ্গে ঘাঘড়া ওড়না চোলি অথবা মিনি ব্লাউজও) যেমন বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে, আবার তেমনই বিভিন্ন দেশের সাজ সজ্জাকে আমরা অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে নতুন স্টাইল হিসেবে গ্রহণ করেছি। বর্মা মালয় ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশগুলি থেকে নানা ধরনের "সারং কাবায়া" লুঙ্গি আর কুর্তায় রূপান্তরিত করে আমাদের ছেলেমেয়েরা নতুন ফ্যাশানে ফ্যাশানেবল হয়ে উঠেছে। ... সত্য কথা বলতে কি, এখনও পর্যন্ত আমাদের বাঙালি মেয়েদের কাছে সেই বেণারসী বালুচরি মুর্শিদাবাদ ধনেখালি টাঙ্গাইল প্রিন্টেড ইত্যাদি সাড়ির কদর এতটুকুও কমেনি। দেশ বিদেশ থেকে যত রকম ফ্যাশানেবল সাজ পোষাক আসুক না কেন, তার অপ্রতিরোধ্য দুর্বার স্রোত আমাদের সাড়ির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তিল মাত্র এদিক ওদিক করতে সক্ষম হয়নি।' দ্রষ্টব্য, মায়া বসু, 'ফ্যাশানের জগতে অ্যাটমিক বিপ্লব', শারদীয়া আভা, সপ্তম বর্ষ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৮৫।

[110] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ফিরে ফিরে চাই', পৃ ১১০।

নেওয়া কবি জসীম উদ্দীনেরও একই মত। শুধু তিনি এর সাথে যুক্ত করেছেন, মুসলমান মুরব্বী মানুষের অর্থাৎ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের দাড়ি রাখার বিষয়টি।[111]

কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজে ধুতির মান্য পোশাক হয়ে ওঠারও একটা যাত্রা আছে। কর্মজীবী মুসলমানদের মধ্যে মল্লকচ্ছ দিয়ে ধুতি পরা মান্য পোশাক হলেও, সরাসরি কৃষির সাথে বা অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রম নির্ভর কাজের সাথে না-যুক্তরা সেরূপ ধুতি পরতেন কিনা – সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আধুনিকতার অভিঘাতে সৃষ্ট মল্লকচ্ছ থেকে কোঁচা দোলানো ধুতির শিষ্টাচার বাঙালি মুসলমানের পোশাকি শিষ্টাচারে কিভাবে প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে দেখা দরকার। মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার উপর জোর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করবার ক্ষেত্রে বেশকিছু মুসলিম সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল। তন্মধ্যে বার্মা ঘেঁষা চট্টগ্রামে উনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে জন্ম নেওয়া, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পরও তিনি নিজের পোশাকে-আশাকে ফার্সি-উর্দুভাষী শিষ্টাচারকে অনুশীলন করেননি। আহমেদ শরীফ লিখেছেন, সাহিত্য সম্মেলনাদিতে তিনি আচকান-পাজামা পরে গেলেও, পাকিস্তান সরকারের অফিসে, রাজনৈতিক সভায় ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর পরে যেতেন। এবং মাথায় থাকত বাঙালি মুসলিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক ফেজটুপি। অবশ্যই ধুতি-চাদর-ফেজ বেশ ধারণ যে নিজের বাঙালি মুসলমান জাতি-পরিচয়কে জানান দেওয়ার জন্য—সেবিষয়ে কোনো দ্বিরুক্তি হবে না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তিনি ভারতভাগের পর এই পোশাক ধরেছেন। আহমেদ শরীফ লিখেছেন, ভারত ভাগের আগে থেকেই তিনি এ পরিচ্ছদই পরেছেন। 'প্যান্ট চাপকান পরেননি কখনো।' দায়ে পড়ে অবশ্য পাজামা পরতেন। বাইরে যাওয়ার সময় সু পরলেও, ঘরে প্রায়ই পরতেন কুমিল্লাখ্যাত বোলের খড়ম।[112] সুতরাং এখান থেকে

---

[111] কবি হিসেবে গড়ে ওঠার কালে এক মুসলিম পত্রিকা সম্পাদকের সাথে আলচনাকালে সম্পাদকটি জসীম উদ্দীনকে অনুযোগ জানিয়েছিলেন, কারণ তিনি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মাথায় ফেজ পরেননি। জসীম উদ্দীন লিখেছেন, 'আমি মুসলমান হইয়া কেন মাথায় টুপি পরি নাই – এই বলিয়া তিনি আমাকে অনুযোগ করিলেন। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম ... সে আজ তিরিশ বৎসরেরও আগের কথা। তখনকার দিনে মুসলমানরা অধিকাংশই ধুতি আর মাথায় টুপি পরিতেন। বড়রা সকলেই দাড়ি রাখিতেন।' ১৯৬০ এর দশকে এই স্মৃতিকথায় তিনি একথা লিখেছেন। সুতরাং এর ত্রিশ বছর অর্থাৎ ১৯৩০ এর দশকেও মুসলিমদের মধ্যে ধুতি ছিল মান্য পোশাক। দ্রষ্টব্য, জসীম উদ্দীন, 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়' (কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬১), পৃ ১৩৪।

[112] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আহমদ কবির সম্পাদিত, 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১০), পৃ ২৭৮-২৭৯।

'মহম্মদ চরিত'এর লেখক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর বাল্যকালের (আনুমানিক ১৮৬০ সাল) কথা লিখেছিলেন, 'তখন ফরাজী আন্দোলন (হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে সংগঠিত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সংস্কারকে প্রবেশ করিয়ে বাংলার ইসলাম ধর্মকে সুগঠিত করা।) আরম্ভ হয় নাই।' যদিও ফরাজি আন্দোলন উনবিংশ শতকের শুরুতেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে ময়মনসিংহে তার প্রভাব তখনও তেমন প্রসারলাভ করেনি। 'মুসলমানেরা নামাজ পড়িত না; গ্রামে কোনো মসজিদও ছিল না; স্থানে স্থানে দরগা ছিল। মুসলমানেরা তপন (অর্থাৎ তহবন্দ) বা লুঙ্গি পরিত না; কাছা কোঁচা দিয়া ধুতি পরিত। তাদের

মনে হতে পারে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ধুতি ছিল বাঙালি গণ-পুরুষের পোশাক। কিন্তু মুসলমানের ধুতি পরিধাণের বিষয়টি যে সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত ছিল বা এক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাওয়া হিন্দুদের মান্য সামাজিক শিষ্টাচারের চাপ কাজ করেনি – তাও বলা যাবে না।[113]

চিত্র ৬.৫ ও ৬.৬: মুসলিম অভিজাত ও মুসলিম সাধারণ (@CSSSC_Archive) [114]

অনেকেরই হিন্দু নাম ছিল, যেমন, গোপাল, সনাতন, ঈশান ইত্যাদি। মুসলমানেরা দুর্গা কালী প্রভৃতি পূজায় ভোগের জন্য মানকচু, কুমড়া ও বলির জন্য পাঁঠা দিত ...' দ্রষ্টব্য, কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'বাল্য-কাহিনী', উৎস মানুষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২৭ তম বর্ষ, জুন ২০০৬, পৃ ২; দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ, 'তিতুমীরের ধর্ম এবং বিদ্রোহ', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮০, পৃ ৫।

[113] মীর মোশারফ হোসেন বিংশ শতকের শুরুতে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তির মধ্য দিয়ে তাঁর পোশাক-আশাক আদব-কায়দায় কিরকম প্রভাব পড়েছিল – তা লিখেছেন। তাঁর মতে, তৎকালীন পাঠ্যপুস্তক এতই হিন্দু প্রভাবিত ছিল যে সেখানে আল্লাহ ও রসুলের উল্লেখ না থাকলেও, পাঠ্যক্রমে দুর্গা, কালী, সরস্বতী হরি, রাম প্রমুখের কথা থাকত। আর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট এ ভর্তির পর তাঁকে পাজামা চাপকান বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল, কারন স্কুলের পোশাক ছিল ধুতি, চাদর। যাকে তিনি 'হিন্দুয়ানী পোশাক' বলেছেন। স্কুলের সহপাঠীরা তাঁর টুপিটি পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল। সুতরাং বোঝাই যায়, শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাওয়া হিন্দু শ্রেণী পিছিয়ে যাওয়াদের উপর নিজেদের শিষ্টাচার কিভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছিল। দ্রষ্টব্য, মীর মোশারফ হোসেন, 'আমার জীবনী ১৯০৮-১৯০৯', ১ম খণ্ড, (কলিকাতাঃ), পৃ ১০৬; দ্রষ্টব্য, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১', পৃ ৭৪৯।

[114] হাঁটুর নিচে ঝুলওয়ালা আচকান, ট্রাউজার, ফেজ এবং প্যাটেন্ট লেদারের বুট পরিহিত। এখানে প্যান্টের কাট এবং জুতোর ব্যবহারে বিলিতি প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম নিম্নবিত্ত বাজানাদারের মাথায় পাগড়ি, কাঁধে গামছা, অধোবাস লুঙ্গি, এবং গায়ে উরু পর্যন্ত ঝুলযুক্ত পাঞ্জাবি। ছবি ৬.৫ দ্রষ্টব্য, Portrait, S. Nasiruddin, I-12 Siddhartha

বিষয়টির আরো গভীরে গেলে দেখা যাবে, চোগা-চাপকান-ইজার ছেড়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উচ্চাভিলাষী বাঙালি মুসলমানের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর পরিধানকে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাওয়া, ঔপনিবেশিক সরকারের কাজেকর্মে বাছবিচার না রেখে অংশগ্রহণ করা হিন্দুদের অনুকরণ বলেছেন। কারণ মুসলিম সমাজের একাংশ বুঝতে পারছিলেন যে, নতুন শিক্ষা-দীক্ষা-প্রযুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের পূর্বেকার স্বর্ণযুগের স্মৃতি আঁকড়ে থাকলে ভবিষ্যত ভালো কোনো ফল প্রদান করবে না। তাই যারা পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে বরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, উচ্চাভিলাষী মুসলিমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।[115] পোশাকে-পারিপাট্যেও তাদের ধারা অবলম্বন করতে শুরু করেন। সে মত অনুসরণ করলে বলতে হবে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদরের পারিচ্ছদিক রুচিও সেভাবেই সঞ্চারিত। কিন্তু এটাও হতে পারে যে, প্রাথমিকভাবে হিন্দু নির্দেশিত সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর পরলেও পরবর্তীতে তাঁর পোশাকি দর্শনে ধুতি-খরম পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিল, কারণ এগুলি বাংলার একান্ত নিজস্ব পোশাকি সজ্জা বলেই হয়ত। হযরত মহম্মদের আগমনের পরও আরবদের ধর্মীয় যাপনে সেলাইবিহীন সাদা থান কাপড়ের দুটি খণ্ড ঊর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গে ব্যবহারের বিধি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। হয়ত সেকারণেই ধুতির সাথে ইসলামের তেমন দ্বৈরথ বোধ করেননি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাথমিক অভিঘাতের শিকার মুসলিমরা।[116] তাঁরা ভালো ভাবেই জানতেন, যে ইজার চাপকানকে মুসলমানের পোশাক হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সেটা আসলে পোশাকি শিষ্টাচারের বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ইসলামের রাজনৈতিক

Ghosh Collection, CSSSC Archive, Jadinath Bhavan, Kolkata; ছবি ৬.৬ দ্রষ্টব্য, Figure Study by Satish Sinha, 1929, Collection of the Government College of Art and Craft, CSSSC Archive, Jadunath Bhavan, Kolkata.

115 আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আহমদ কবির সম্পাদিত, 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, তদেব, পৃ ২৬৯।

116 স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'মহম্মদের পূর্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হ'য়ে প্রদক্ষিণ করতে হ'ত, তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মুসলমানেরা নমাজের সময় ... ধুতির কাছা খুলে দেয়।' যাতে নমাজের সময় শিষ্টাচার রক্ষিত হয়। দ্রষ্টব্য, স্বামী বিবেকানন্দ, "পরিব্রাজক", 'জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, পৌষ ১৩৬৭), পৃ ৯৮; এস এম আখতার হোসেন, 'বিশ্বতীর্থ হজ ও যিয়ারাত', (কলিকাতাঃ বাণী প্রকাশ, মে ১৯৫৭), পৃ ৯৭।

তবে ধুতির দাম যতই বেড়েছে, বা ধুতির উপর ভিত্তি করে বিলাসিতার বহরে ইসলামে যে 'না-জায়িজ' বা অশাস্ত্রীয় – সেই বোধের আবাদ যতই বাড়তে থেকেছে, ততই সাত্ত্বিক মুসলমানরাও ধুতি ছেড়ে আবার তহবন্দ বা একরঙা ঘেরা কাপড়ে ফিরে গিয়েছিলেন। ইবনে মাসুদ্দীন আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, তাঁর এলাকার মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষার যতই বিস্তার ঘটতে আরম্ভ করল, 'অধিকাংশ লোক ধুতির পরিবর্তে তহবন্দ পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকের খরচের মাত্রাও কমিয়াছে।' দ্রষ্টব্য, ইবনে মাযুদ্দীন আহমদ, 'আমার সংসার জীবন – ইসলামের জীবন্ত প্রভাব' (কলিকাতাঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩২১), পৃ ৩৭৩

পোশাকে রূপান্তরিত হয়েছিল।[117] কারণ ইজার-চাপকান আদপে এশীয় কুশানদের পোশাক। যা কুষাণ সময়কালে ভারতে প্রচলিত ছিল, এবং পরবর্তীতে মধ্য এশিয়া ইরান হয়ে তুর্কী-মুঘল শাসনামলে ভারতে আবার ফিরে আসে।[118] কিন্তু যারা এটি জানতেন না, তারা সৌখিনত্বের খাতিরে হলেও কোঁচা দোলানো ধুতি পরতেন। অজিতকৃষ্ণ বসু তাঁর স্মৃতিমন্থনে বেগুন বিক্রেতা আইনু মিয়াঁর কথা বলেছেন। যিনি এমনি সময় তাঁর স্বগোষ্ঠীয়দের সাথে একত্ব বজায় রাখতে তাদের মতন লুঙ্গি পরলেও, কিন্তু নিজের সৌখিন অবসরে স্বগোত্রীয়দের চাইতে নিজের 'স্বতন্ত্র এককত্ব' প্রকাশ করতেন ধুতি পাঞ্জাবি পরে। সেই ধুতির কোঁচা আভূমি প্রলম্বিত থাকত।[119]

কিন্তু হিন্দু মধ্যবিত্তকে অনুকরণের আদর্শ থেকে বাঙালি মুসলিমের পোশাকি রুচির স্বাতন্ত্র্যের দিকে চলন ছিল। ধুতির সাথে মুসলমান সত্তার কোনো বিরোধ না থাকলেও মুসলমান সমাজের শিক্ষিত স্বাতন্ত্র্য-অভিলাষীরা উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বা বিশ শতকের শুরু থেকে মুসলমান সমাজকে হিন্দু সমাজের অনুকরণে হতোদ্যম করার প্রয়াস নিতে থাকেন। মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেছিলেন, 'আমরা সাহিত্যে এবং আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদে হিন্দুর অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, একথা যদি সত্য হয় – তাহলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা বড় আমরা ছোট, তাহারা উচ্চ আমরা নীচ, তাহারা সম্পন্ন আমরা নিস্ব, একথাকেও [বাঙালি মুসলিম] জাতির অন্তরাত্মা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।'[120] এই হীনমন্যতার জন্য বাঙালি হিন্দুর উপরও দায় বর্তায়। যে সমাজে একটি অগ্রসর গোষ্ঠী অপর অনগ্রসর গোষ্ঠীকে সামাজিক, আচার-আচরণগত ও ধর্মীয় দিক থেকে হেয়জ্ঞান করে আনন্দ পায় -- সেই সমাজে ক্রমাগত হেয় হওয়া অনগ্রসররা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন।[121] আর উপনিবেশিক ক্ষমতার মূল কাজ হল উপনিবেশিত জাতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজনের সূত্রগুলিকে চাড়িয়ে তুলে নিজেদের শাসন-ক্ষমতার একটা একটা সুরক্ষিত বলয় তৈরি করা। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে বা ঔপনিবেশিক ভূমি-ব্যবস্থার ফসল হিন্দুদের

---

[117] বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'সিকন্দর শা ইরান জয় ক'রে, ধুতি-চাদর ফেলে দিয়ে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর দেশীয় সৈন্যরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মতো হয়েছিল। মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ – ইজার-জামা চালিয়ে দিলেন।' দ্রষ্টব্য, স্বামী বিবেকানন্দ, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", 'জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, (কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, পৌষ ১৩৬৭), পৃ ১৮৬।

[118] আবদুল মতিন খান, 'বড়র পিরীতি', পরিচয়, বিশেষ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৯৭-১৩৯৮/ এপ্রিল-মে ১৯৯১, পৃ ৫০।

[119] অজিতকৃষ্ণ বসু, 'স্মৃতিমন্থন', সাহিত্যের খবর, অষ্টম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৭, পৃ ১৪।

[120] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'জাতীয় পোষাক', মাসীক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্‌গুন ১৩৩৫। পৃ ২৬৬।

[121] আহমদ কবির সম্পাদিত, 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১০), পৃ ১৩৮।

মধ্যে মুসলিম-বৈরিতা মেকলের শিক্ষা-নীতি এবং নতুন ভূমি-ব্যবস্থাজাত বলতে হবে। যে শিক্ষানীতি ভারতের জনজীবনের সাথে মিশে যাওয়া পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় জীবনবোধের চাইতে আলাদা হিসেবে সাব্যস্ত করে, নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দার পথকে প্রশস্ত করেছিল।[122] যে ভূমিব্যবস্থা বকলমে হিন্দু জমিদার শ্রেণিকে পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনের অন্যায়-অবিচারের একটা পালটা ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। যেকারণে এককালে সহাবস্থানে বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষের প্রবণতা বাড়ে। তাই যেসব মুসলিম পূর্ববঙ্গে হিন্দু জমিদারীর নায়েব-আমলাদের জাতি-বিদ্বেষ দেখে বড় হয়েছিলেন, শুধু মুসলমান বলে নায়েব-আমলার কাছারিতে বসার জায়গা পর্যন্ত পাননি, বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও 'তুই বা তুমি' সম্বোধিত হয়েছেন বা হতে দেখেছেন – তাদের মধ্যে নিজস্ব পরিচিতির আকাঙ্খা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।[123] খিলাফত-অসহযোগের ডাকে ১৯২০'র দশকে কলেজ ত্যাগ করা আবুল মনসুর আহমদ যেমন, কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, গান্ধীটুপি পরেছেন, কিন্তু ধুতি পরেননি। আন্দোলনের জন্য কলেজ ছেড়েছেন, পড়ানোর চাকরি নিয়ে, আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সুবিধার্থে ময়মনসিংহ শহরে আস্তানা নিয়েছেন এক বিনা পয়সার বাসাবাড়িতে। 'সস্তা মোটা খদ্দরের তহনন্দ[124] ও পাঞ্জাবী' পরেছেন। বা 'বছরে দুই টাকা চার আনা' দিয়ে দুটো ধুতি কিনে, দর্জিকে দিয়ে বারো আনায় সেই ধুতির কাপড়ে দুইটি পাঞ্জাবি এবং দুই আনা দিয়ে দুটি তহবন্দ শেলাই করিয়েছেন। আর ধুতির বাদবাকি টুকরো দিয়ে গান্ধী টুপি শেলাই করিয়েছেন।[125] কিন্তু ধুতি পরেন নি। অর্জুন দাস লিখেছেন, আবুল মনসুর আহমদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বদা ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে অনুসরণ করলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি সবসময় রক্ষণশীল

---

[122] দেশভাগ এবং স্বাধীনতার পর হিন্দু-মুসলিম দ্বৈরথের মূল খুঁজতে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে, যেখানে মূলত অভিযুক্ত ব্রিটিশ সরকারের বিভাজন-মনস্ক শিক্ষানীতি। ১৯৯০ এর দশকে বাবরি মসজিদ বিতর্কের মধ্যেই আবদুল মতিন খান হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের সূত্রটি ধরিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন, 'কতিপয় দালালকে কমিশন খাইয়ে অনন্তকাল ধরে যাতে শুষতে পারে এ জন্য ইংরেজ মানুষের মধ্যে (শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা) প্রবিষ্ট করে যায় যে ভারতের প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের পোশাক, ভাষা ও খাদ্য পৃথক এবং এগুলি তাদের কাছে যেমন পবিত্র, অন্য সম্প্রদায়ের কাছে তেমনি অপবিত্র হেতু বর্জনীয়। আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজের এই অবৈজ্ঞানিক দুরভিসন্ধিমূলক তত্ত্ব এদেশের 'শিক্ষিত' সমাজ গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী সমাজকে সংগঠিত করে। হিন্দুরা তাতে অভ্যস্ত হয় আরবী, ফার্সী, উর্দু মুসলমানী ভাষা, আচকান, শেরোয়ানি, পাজামা, কোর্তা মুসলমানী পোশাক, পোলাও, বিরিয়ানী, কোর্মা, কোফতা, কাবাব, ফিরনি ইত্যাদি মুসলমানী খাদ্য। ... অনুরূপভাবে মুসলিমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয় যে সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি হিন্দু জবান; ধুতি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি হিন্দু লেবাস; ঘণ্ট, নিরামিষ হিন্দু খাদ্য। ...' দ্রষ্টব্য, আবদুল মতিন খান, 'বড়র পিরীতি', পরিচয়, বিশেষ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৯৭-১৩৯৮/ এপ্রিল-মে ১৯৯১, পৃ ৪৮।

[123] আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ ৫।

[124] এক রঙের সরু পাড়যুক্ত।

[125] আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', পৃ ২৮-২৯।

ও প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। সেকারণেই ১৯৪৭ সালের আগেই তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষে রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান হোক না হোক সাংস্কৃতিকভাবে পাকিস্তান হতে বাধ্য। তাই তিনি স্বদেশী সহ আরো বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্রে হিন্দুদের সঙ্গে দেশের নানাপ্রান্তে গেলেও, কখনও 'জল' চাননি, চেয়েছেন 'পানি', হিন্দুদের বাড়িতে কখনও 'ডিম' 'মাংশ' খাননি, খেয়েছেন 'আণ্ডা' 'গোস্ত'। হিন্দুরা লুঙ্গি পরিধানকে হেয় করতেন বলে ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি ধরেছেন। কংগ্রেসীরা দাড়ি রাখাকে নিন্দা করত বলে নিজে দাড়ি রাখতেন।[126] কারণ বিভাজনের যে বীজ ছোটোবেলাকার অভিজ্ঞতা উপ্ত করেছিল, তার পরিচলন ছিল স্বাতন্ত্র্যের দিকে। যদিও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ধর্মীয় সংস্কারের উপর ভিত্তি করে বিভাজনের দেওয়াল যে আসলে ধর্মব্যাপারীদের রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছিল, তার সমালোচনা করে ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আব্দুল ওদুদকে এক চিঠিতে লেখেন, "দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধি অজ্ঞতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত করেছে সেই অজ্ঞতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে।"[127]

পারস্পরিক বিভাজন, পারস্পরিক উপেক্ষার, অসম্মানের স্তূপের উপর ১৯৪৩ সালের ১৬ই ও ২৩শে জুলাই আবুল মনসুর আহমদ 'অরণি' পত্রিকায় বাঙালি মুসলমানের এই লুঙ্গি-ফেজের আত্মপরিচিতির সন্ধান আকাঙ্খার যৌক্তিকতা বিষয়ে বলেছেন, "আমাদের মানস, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের রীতিনীতি, আমাদের সমাজব্যবস্থা কি এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছে? খানার টেবিলে বা পর্ব উৎসবাদিতে কি আমরা এক হতে পেরেছি? খোরাকে পোশাকে কি আমরা সাদৃশ্য লাভ করতে পেরেছি? সাহিত্যে রঙ্গমঞ্চে আমরা কি গলাগলি করতে পেরেছি? এক ভাষায় কথা বলতেই কি আমরা পেরেছি? এক পাড়ায় এক মহল্লায় বাস করতেই কি আমরা শিখেছি? আমার খাদ্য পেঁয়াজ রসুন আজও আপনার নাসিকা কুঞ্চন করছে; আমার মুরগি আজও আপনাকে জ্বালাতন করছে। আমার ভোজ্য গরু আজও আপনার দেবতা হয়েই রয়েছে। আমার পোশাক লুঙ্গি তহবন্দ আজো আপনার কাছে বর্বরতা, আপনার দেবতা আজো আমার কাছে মাটির ঢেলা হয়েই আছে; আপনার ধর্মের ঢোল আজো আমার ধর্মের বিঘ্ন হয়েই রয়েছে। এক কথায় ধর্মীয় সংস্কার ও সমাজব্যবস্থা আপনার ও আমার মানসিক গঠনকেই ভিন্ন করে তুলছে। ... আপনার সাহিত্যে আমি উপেক্ষিত।"[128] পাকিস্তান আন্দোলন হয়ে দেশভাগ এবং শেষে পূর্ব পাকিস্তানের

---

126 অর্জুন দাস, 'বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী- আবুল মনসুর আহমদ', দর্পণ, ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৯।

127 অমিতাভ চক্রবর্তী, 'বাঙালি মননঃ সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা', (কোলকাতাঃ একুশে, ডিসেম্বর ২০০০), পৃ ২৩৩।

128 হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "হিন্দু ও মুসলিম", প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত 'হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়'এর নির্বাচিত প্রবন্ধ', প্রথম খণ্ড, (কলকাতাঃ মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭), পৃ ৬৯ ।

কিন্তু এই মুসলমানিত্ব যে সংস্কৃতি, ভাষা, ভৌগোলিকতার দান বাঙালিত্বকে এড়িয়ে চলতে পারেনা, তাও পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাওয়া মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৯৪৯ সালে (বাংলা ১৩৫৬ সন)

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি মুসলিম জাতিসত্ত্বার আত্মপরিচিতির দাবি থেকে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উন্মেষ অবধি নিরন্তর রাজনৈতিক সাধনার মধ্য দিয়ে সেই উপ্ত বীজ থেকে স্বাধীনতারূপী গাছের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক সাধনায় ধর্ম কোথাও প্রভাবক হয়ে রয়ে গিয়েছিল, তাই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম সমাজকে সামিল করতে যখন বলা হয়েছিল, 'স্যুট পরলে, শ্যেভ করলে, টেরি কাটলে মুসলমানের হবে অনন্ত নরকবাস'[129] – তখনি মুসলমানের রাজনীতিকে ধর্মরক্ষার সমতুল্য করে তোলা হয়েছিল। মোহাম্মদ আকবর খাঁও বলেন, পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা অনুসারে যদি একই ভাষা-সংস্কৃতির গোষ্ঠী 'নেশন' হিসেবে কল্পিত হয়, তবে একই ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনকারী গোষ্ঠীও নিজেদের 'নেশন' হিসেবে দাবি করতেই পারেন। সুতরাং যারা বলেন, বাঙালি জাতির অংশ হিসেবে মুসলমানরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে তাতে কোনো দোষ নেই এবং ইসলামের উদারপন্থী চিন্তা-চেতনায় পোশাকের কোনো বাধা-ধরা নিয়ম নেই, তাদের তিনি কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, '... যে পোষাক পরিচ্ছদ অপব্যয় সাপেক্ষ, মুছলমান তাহা গ্রহণ করিবে না। ... যে শ্রেণীর পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণতঃ মানুষের মনে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া দেয়, মুছলমানের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। ... যে শ্রেণীর পোষাক পরিচ্ছদ ভব্যতা ও শ্লীলতার বিঘ্ন উৎপাদন করে, মুছলমানের পক্ষে তাহা বর্জ্জনীয়। ... যে শ্রেণীর পোষাক পরিচ্ছদের কল্যাণে মুছলমানকে অমুছলমানের মধ্য হইতে চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, মুছলমানের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ।'[130]

এই ভাব থেকেই আবুল মনসুর ধুতি কিনে সে ধুতি পরতেন না। তার দুই অংশ জোড়া দিয়ে তহবন্দ সেলাই করতেন। এই তহবন্দ মধ্যযুগ ধরে বাঙালি সাধারণ মুসলমানের প্রাত্যহিক পোশাক ছিল। মধ্যযুগীয় লোকসাহিত্য 'পূর্ববঙ্গগীতিকায়' আছে "পরনেতে তহমান কালা কুর্তা গায় মাথার উঅর [উপর] টুপি"– এই হল সাধারণ বাঙালি মুসলমানের প্রাত্যহিক পরিচ্ছদ।[131]

সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।" দ্রষ্টব্য, 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', ৭ম খণ্ড (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১৪), পৃ ৫২৫।

129 আবদুল মতিন খান, 'বড়র পিরীতি', পরিচয়, বিশেষ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৯৭-১৩৯৮/ এপ্রিল-মে ১৯৯১, পৃ ৫০।

130 মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'জাতীয় পোষাক', মাসীক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্‌গুন ১৩৩৫। পৃ ২৬৭।

131 আহমদ শরীফ, 'সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা', ড পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩), পৃ ৭০৭-৭০৮।

এছাড়াও আরো পাই, একসময়কার প্রতিপত্তিশালীর দীনদশা বর্ণিত হয়েছে -- 'ছিড়া কাপড় ছিড়া কুর্তা টুপি নাই মাথাত্।' দ্রষ্টব্য, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গগীতিকা', পঞ্চম খণ্ড, (কলিকাতাঃ ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৩), পৃ ৩৮৪।

"পাজামা নিমা টুপী পরি কটিবন্দ।"[132]--এ ছিল শিক্ষিত মধ্যযুগীয় উচ্চবিত্ত এবং সরকারি চাকুরে পুরুষের পরিচ্ছদ। লালন ফকিরের সাধন-গানে আছে – 'তখন খেলকা [অর্থাৎ ফকিরের আলখাল্লা] তহবন্দ ছিল না।' – বোঝাই যাচ্ছে তহবন্দ ফকিরি পথেও প্রাত্যহিক পরিধেয় ছিল।[133] পাশ্চাত্য আধুনিকতার আমদানির সাথে সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু চাকুরিজীবী যতই সভ্যতা অনুসারী 'tidy', 'gentlemanly' হওয়ার চেষ্টা করেছে, ততই ধুতি, তহবন্দ জাতীয় পরিধানগুলি তাদের কাছে অশিষ্টাচারের চিহ্ন হয়ে উঠেছে।[134] পাশ্চাত্য শিষ্টাচার অনুবর্তী ধুতি পরার তাগিদও

ফকিরের সাজ বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লার নাম লয়্যা ফিরোজ ফকিরের সাজ ধরে।।/ আলখিল্লা পইরা মিয়া মাথায় দিল টুপি।/ রাইতদুপরে তাম্বু ছাইড়া যায় চুপি চুপি।।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১৫৫-১৫৬।

নিজাম ডাকাতের শীতের পোশাকি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে – 'মানুষ মাইর‍্যা ট্যাকা-পয়সা মাডিত রাইখ্যাছে গাড়ি (মাটিতে পুতে রেখেছে)।।/ মাডির ট্যাকা মাডিত রইছে এক পয়সা নেই সে খায়।/ ছিড়া কানি (ছেড়া কাপড়) গায়ত দিয়া শীতর কাল কাডায়।।/ কোথায় পাইব ভালা খাওন কামিজ কুর্তা শাল...' অর্থাৎ কামিজ-কুর্তা-শাল সেসময় থেকে আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত। দ্রষ্টব্য, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গগীতিকা', চতুর্থ খণ্ড, (কলিকাতাঃ ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৩), পৃ ৩১৬।

132 "দ্বিজবংশীবদনের রচনা", দীনেশ্চন্দ্র সেন সম্পাদিত, 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ১ম খণ্ড, (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪), পৃ ২১৬।

133 পুরো পদটিতে মাতৃগর্ভে শিশুর অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। যেখানে দেহ-মনের উপর সমাজের পরানো আগলগুলি ছিল না, ছিল শুধু খেলকারূপী (বা ফকিরি আলখাল্লা) গর্ভাশয়ে মোড়া দেহটি, যা সেই খেলকা ভেঙ্গে মাটির পৃথিবীতে নগ্ন আসে এবং এখানে এসে জড়ায় সামাজিক নানা নির্মিতিতে। পদটি এরূপ – 'তোমার নিগূঢ়লীলা সবাই জানে না/ নিরঞ্জন যে প্যাঁচের ধারা বোঝা গেল না।।/ না ছিল নূরের বিন্দু/ না ছিল নিরাকার সিন্ধু/ তখন আমার দীনবন্ধু/আওয়াজ করে এই ভেদ বলতে মানা।।/ পঞ্চনূরী পঞ্চঅঙ্গে/ দাঁড়িয়েছিল প্রেমতরঙ্গে/ আলিফ লাম মিম কোন অঙ্গে/ তখন খেলকা তহবন্দ ছিল না।।/ খেলকা ছিল মায়ের উদরে/ নেংটা এলাম ভবসাগরে/ লালন বলে বিচার করে/ তখন লজ্জা শরম ছিল না।।' দ্রষ্টব্য, আবদেল মান্নান সম্পাদিত, 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত', (ঢাকাঃ রোদেলা, ২০১০), পৃ ১৩০।

এক্ষেত্রে বাংলার খাঁটি বাউলদের পোশাকের সংস্থান বিষয়ে বলে রাখা উচিত। বাংলার বাউলেরা ঊর্ধ্বাঙ্গে পরেন সাদা খেলকা বা আলখাল্লা এবং নিম্নাঙ্গে সাদা তহবন্দ। পারস্যের সুফী জালাল উদ্দীন রুমির প্রভাবেই এ দেশের বাউলের পারিচ্ছদিক দর্শনে সাদা রঙের প্রশ্নে। যার মূল ভাবটি হল – মৃত্যু আসবার আগেই মরার মতো হবার সাধনা। এই সাধনে সফল হলেই আসে 'ফানা' বা মোক্ষ। রুমির মতে জীবৎকালে 'ফানা'তে উত্তীর্ণ হতে হলে গসসালের বা মৃতদেহকে গোসলদানকারীদের আচরণ অভ্যাস করতে হবে। তাই সাদা খেলকা-তহবন্দে বাউলের 'জ্যান্তে-মরা'র পোশাকি চেহারা ধারন – 'জিন্দা দেহে মরার বসন', যাতে 'মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।' দ্রষ্টব্য, সৈয়দ মুজতবা আলী, 'মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের', চতুরঙ্গ, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৪১২; দ্রষ্টব্য, সুধীর চক্রবর্তী, 'গান নিয়ে যা মনে এল', সুধীর চক্রবর্তী লিখিত 'গান হতে গানে', (কলকাতাঃ পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০০০), পৃ ৪২১।

134 যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'লুঙ্গিটা পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদেরই একচেটীয়া ছিল। যখন আমরা হুগলী কলেজে পড়িতাম, তখন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পুত্র আমার সহপাঠী ছিলেন। অনেক সময় আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের বাটীতে কাহাকেও লুঙ্গি পরিতে দেখি নাই। প্রায় সকলেই কাপড় পরিতেন, কেহ কেহ ইজের পরিতেন। হুগলীতে অনেক ভদ্র মুসলমানের বাস আছে, কিন্তু আমার ছাত্রাবস্থায় কোন মুসলমান ভদ্রলোককে পথে লুঙ্গি পরিয়া বেড়াইতে দেখি নাই।' তার মানে দাঁড়ায় যাদের লুঙ্গি পরে

দেখা দিয়েছে। যারা পাশ্চাত্য ধারা অনুযায়ী শিষ্টাচারের বিলাসিতায় সামিল হতে পারেনি, তারাও ধুতির উপর নির্ভর করে নিজেদের উৎকৃষ্টতা প্রমাণে রত ছিল। তাদের আদর্শে লম্বমান কোঁচা রেখে ধুতি পরা হয়ে উঠল শিষ্টাচারী পোশাক, আর মল্লকচ্ছ ধুতি, পায়ের গোঁড়ালির উপর পর্যন্ত পরিদৃশ্যমান হওয়া তহবন্দ পরিধাণ হয়ে উঠল ভিক্টোরীয় শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। তাই তা অশিষ্ট, অসভ্যদের পোশাক। এই শিষ্টাচারের আদর্শের সাথে কালে কালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নানা রঙ জুড়ে গেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের চরিত্র সুনীলকে তাই ঠাকুমার সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে লুঙ্গি পাল্টে যেতে হয়েছে। 'লুঙ্গি পরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে কার্যসিদ্ধি তো হইবেই না, অনর্থক বকুনি খাইতে হইবে।'[135] বিশ শতকের পাঁচের দশকে লেখা এই উপন্যাসের ঠাকুমা চরিত্রটির মধ্যে নাতির পোশাকি শিষ্টাচারের প্রতি উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম দিককার অর্জিত অবজ্ঞা ঝরে পরার যে আশঙ্কা করা হয়েছে, সেই অবজ্ঞাটিই আসলে উক্ত সময়কার একটা শ্রেণির যুগধর্মের পোশাকি রূপ। যেরূপে মুসলমানরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে 'নেড়ে' বলে সাব্যস্ত।[136] তাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ। আর তাদের অনুরূপ পোশাক তো নৈব নৈব চঃ। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলন কালেই আবার চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিলিতি ধুতি বর্জন করে দেশি লুঙ্গি ধারণ করতে থাকেন। সেদিক থেকে লুঙ্গির সাথে আঞ্চলিক জাতীয়তার সম্বন্ধটিকেও অস্বীকার করা যাবে না।[137]

পথে ঘাটে দেখেছেন, সকলেই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। পোশাক কিভাবে দৃশ্যমাধ্যমে শ্রেণী বিভাজনের অস্ত্র হয়, তা এখান থেকে বোঝা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সেকালের পরিচ্ছদ', বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪০।

আরেকটি গল্পে যেমন বলা হচ্ছে, হঠাৎ প্রতিপত্তিশালী হওয়ায় একজন মুসলমানের লুঙ্গি থেকে পায়জানা-আচকানে পোশাকি উত্তরণ হয়েছে, 'লোকটার (আবু তাহের) পরণে কয়েক বৎসর আগেও থাকিত তাঁতের মোটা খাটো বহরের লুঙ্গি হঠাৎ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের মত লোকটা মোটা হইয়াছে, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হইয়াছে, আজকাল পরিতেছে ঢিলা-পায়জামা আচকান।" দ্রষ্টব্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দ্বারমণ্ডল', ভারতবর্ষ, ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৬, পৃ ২৫।

[135] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দন্তরুচি', (কলিকাতাঃ এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, পৌষ ১৩৬২), পৃ ১০।

[136] মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নেড়া মাথা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবজ্ঞা করে 'নেড়ে' ডাকত। যুগপরিবর্তনের সাথে সাথে সেই বৌদ্ধরাই ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং সেই ডাক প্রযোজ্য হল সেই মুসলমানদের প্রতি। দ্রষ্টব্য, শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, *অপরাধ বিজ্ঞান*, পঞ্চম খণ্ড, (কলিকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মাঘ ১৩৬৬), পৃ ১২৯; দ্রষ্টব্য, বিপ্লব দাশগুপ্ত, 'বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা- প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব', (কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশন, মার্চ ২০০০), পৃ ২১৬।

[137]। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে কক্সবাজার রামুর অন্যতম কারাবন্দী নেতা আবদুল মজিদ সিকদার, পেকুয়ার জমিদার গুরা মিয়া চৌধুরী, কুতুবদিয়ার কৈয়ারবিলের মাওলানা আজিজুর রহমান, মাওলানা আফজালুর রহমান প্রমুখ এবং রাম মোহন বড়ুয়া, অগ্নিযুগের বিপ্লবী কমরেড সুরেশ সেন, অ্যাডভোকেট জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তী প্রমুখরা সেই অঞ্চলে খেলাফত আন্দোলনে গতিসঞ্চার করে, স্বাদেশিকতার প্রতীক হিসেবে বিদেশি ধুতি বর্জন করে লুঙ্গি ধারণ করেন। দ্রষ্টব্য, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতিঃ কক্সবাজার', (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, জুন ২০১৪), পৃ ৭৩।

পোশাক মানুষের শরীরে ওঠে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ হয়ে। ফলত স্বাচ্ছন্দ্যের আবশ্যিক শর্তগুলি পূরণ করে কোনো পোশাক যদি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, তবে সেই পোশাকের ফ্যাশনে পরিণত হতে বাধা থাকে না। সেভাবেই আরাকানী প্রভাবে একরঙা তহবন্দ এবং ধুতির জায়গায় ডুরি কাটা লুঙ্গির ফ্যাশন শুরু হয়।[138] কারণ ব্রিটিশ আগমনের আগে তো বটেই এমনকি ব্রিটিশ আগমনের পরেও বেশিরভাগ চট্টগ্রামী মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে আরাকান রাজ্যের (যা ১৯৯০ এর দশকে রাখাইনে নামান্তরিত হয়) রাজধানী আইক্কাব নগরের (বর্তমানে সিতবি) নিবিড় যোগসূত্র ছিল। সেখানকার বৌদ্ধরা উদারভাবাপন্ন হওয়ায় অনেক মুসলমান বর্মী-আরাকানী স্ত্রীও গ্রহণ করেছেন। হিন্দুরাও ব্যবসা-কারবারে গিয়ে তাদের দরবারি শিষ্টাচারের সচেতন-অবচেতন আত্তীকরণ করেছেন। ফলে চট্টগ্রামের সামাজিক ভৌগোলিকতায় বার্মিজ বৌদ্ধ জীবনাচরণের প্রভাব চলে এসেছে।[139] বার্মায় গিয়ে প্রতিপত্তি অর্জনকারী চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিম্নাঙ্গে সারং বা বর্মি স্টাইলে লুঙ্গি পরার ফ্যাশনও তাই প্রসার লাভ করেছিল।[140] বিংশ শতকের

---

[138] অনেক প্রবন্ধকার কিন্তু বৌদ্ধযুগে বাংলার প্রাচীন টেরাকোটা মূর্তির অধোবাস হিসেবে কয়েকটি রেখাযুক্ত কাপড়ের অবস্থান দেখে প্রমাণ করেছেন যে, লুঙ্গি বা তহবন্দ বা তপন বাংলাদেশে মুসলিম আগমনের আগেও ছিল। কিন্তু বৌদ্ধদের পোশাক হিসেবেই ছিল। পরবর্তীতে সেই বৌদ্ধরা এবং নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে লুঙ্গি বাংলার মুসলমানদের পোশাক হয়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য, শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বৃহত্তর ভারতে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ১৯৩।

[139] যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় লুঙ্গির প্রসার নিয়ে লিখেছেন, 'লর্ড ডাফরিনের সময় ব্রহ্মদেশ ইংরেজদের অধীন হইলে ব্রহ্মদেশের যুবরাজ মেইনগুনকে ভারত গভর্নমেন্ট বন্দী করিয়া বারাণসীতে আটক রাখেন। তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া প্রায় এক বৎসর বাস করেন। তিনি চন্দননগরে আসিলে কলিকাতা ও ব্রহ্মদেশ হইতে বহু বার্মিজচন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। সেই সকল বার্মিজকে আমি প্রথম লুঙ্গি পরিতে দেখি। তাহার পূর্ব্বে কখনও লুঙ্গি দেখি নাই।' দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সেকালের পরিচ্ছদ', বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪০। দ্রষ্টব্য, আবুল কাসেম, *রামুর ইতিহাসঃ ইংরেজ আমল পর্যন্ত*, (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০০০), পৃ ৮১; দ্রষ্টব্য, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালাঃ কক্সবাজার', (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, জুন ২০১৪), পৃ ২১৬।

[140] সাহিত্যে ব্রহ্মদেশের সাথে ব্যবসায়িক যোগে আবদ্ধ বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে বিলাশ উপকরণ হিসেবে বর্মি লুঙ্গির ব্যবহারের নানা তথ্য পাওয়া যায়। যেমন 'চাওয়া-পাওয়া' উপন্যাসে হৈমন্তী গায়ে সবুজ সিল্কের বর্মি লুঙ্গি এবং ফিনফিনে আদ্দির কাপড়ের পাঞ্জাবি পরিহিত স্বামীকে বাইরে বেরুতে দেখে প্রচণ্ড চাপা রাগে ফুঁসছিলেন। কারন 'স্বামীর এই গায়ে-ফুঁ-দিয়ে-বেড়ানো শৌখিন ভাবটা আজকাল একেবারেই সইতে পারেন না তিনি।' দ্রষ্টব্য, 'চাওয়া ও পাওয়া' (লেখকের নাম ও প্রকাশের সাল-তারিখ পাওয়া যায়নি), পৃ ২৬১, Archive.org/details/dli.bengal.10689.3991

আরেকটি বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, 'আগন্তুকটী একটু অগ্রসর হইয়া হাতের মোটা বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়া চায়ের টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ... পরনে ময়ূরকন্ঠী রঙের সিল্কের লুঙ্গি তাহার উপর জরির কাজ করা সাটিনের কাবুলি জামা, পায়ে হলদে পেটেন্ট চামড়ার ঘুন্টি দেওয়া জুতা; মাথার মাঝ দিয়া সিঁথির দুইপাশে বড় কালো কোঁকড়ান চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এক ঘন সবুজ সিল্কের রুমাল কায়দা করিয়া জড়ান; হঠাৎ দেখিলে বর্ম্মাবাসী বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে ...' দ্রষ্টব্য, 'অতিথি', বঙ্গবাণী, দ্বিতীয় বর্ষ কার্ত্তিক ১৩৩০।

লুঙ্গিও যে বিংশ শতকের মধ্যভাগে আভিজাত্যের পোশাকি উপকরণের সাথে যুক্ত হচ্ছিল তা শ্রী শিলাদিত্যের লেখা থেকে বোঝা যায়, 'ছোটসাহেব কালে সাহেব হলেন! অর্থাৎ পদোন্নতি হল, হাতে পয়সা এল। পোশাক বদলাল। ডিনার

বিশের দশকে চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া আহমদ শরীফ, চট্টগ্রামে লুঙ্গি-পাম্পসু-শার্ট পরিহিত কেরানিও দেখেছেন। স্কুল কলেজে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এই পোশাকের কদর দেখেছেন। পাজামা তখনও ওই অঞ্চলে মুসলিম উকিল ও মৌলবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর তাঁর ভাষায়, 'অশিক্ষিত মুসলিমরা ধুতি-পাঞ্জাবি বা কামিজ পরে বর সাজত।' তার মানে বিংশ শতকের তিরিশের দশকের আগে থেকেই হিন্দু পোশাকি পরিশীলনকে উৎকৃষ্ট মেনে নিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবিধারী মুসলিমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে আধুনিক হিন্দু পরিশীলনের আদর্শ থেকে সরে আসতে থাকেন। আর রাজনৈতিক শিক্ষাহীন মুসলমানদের মধ্যেই আচারে-অনুষ্ঠানে তখন ধুতি-পাঞ্জাবির ব্যবহার সীমায়িত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে, আধুনিকতার যে নিজস্ব সংজ্ঞা তৈরি হয়েছিল, সেই সংজ্ঞায় অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে ধুতি-পাঞ্জাবির ব্যবহারকে আত্মপরিচিতি হীনতা হিসেবে দেখা শুরু হয়। তাই মুসলিম লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের রাজনীতি ও পাকিস্তান দাবি যতই এগিয়েছিল, মুসলিমদের মধ্যে ধুতির ব্যবহার ততই অস্তমিত হচ্ছিল।[141] পাকিস্তান আন্দোলন বুনোট বাঁধার কালে ১৯২৮ সালে মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখেছিলেন, 'একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলার মুছলমানেরা তাঁহাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি [ট্রাউজারস-চোগা ও চাপকান] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার উচ্চ ও মধ্যস্তরের মুছলমানকে প্রতিবেশী অমুছলমানদিগের মধ্য হইতে চিনিয়া লওয়া সাধারণতঃ একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'[142] বোঝাই যাচ্ছে, বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলিমের মধ্যে পোশাকি স্বাতন্ত্র্য রচিত হউক – এই তাগিদের উন্মেষ হচ্ছিল। তাছাড়া হিন্দুদের মতো কোঁচা ঝুলিয়ে পোশাক পরা এবং বাবুয়ানি দেখানোকে কাপড়ের অপচয় ও ইসলাম-বিরুদ্ধ হিসেবে দেখা শুরু হয়।

আর অন্যদিকে কংগ্রেসী জাতীয়তার আদর্শের বিকাশ এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতার উন্মেষের সাথে সাথে সেই জাতীয়তার পরিপন্থীদের পোশাকের সাথে হিন্দুদের

স্যুট হল, প্রিন্স কোট হল, চোস্ত শেরোয়ানী হল ... থ্রি পিস হল, সিল্কের লুঙ্গি হল। বাড়িতে পরবার ড্রেসিং গাউন, কিমোনো হল। ঘুমের পোশাক স্লিপিং স্যুট হল। সুতি বা সিল্কের জায়গায় ড্যাক্রন, টেরিলিন আমদানি হল। ধুতি কিন্তু মিটিকো কাপড় হয়েই রইল। ... ভাইফোঁটার বোনেদের দেওয়া বা ষষ্ঠীবাটায় (জামাই ষষ্ঠীর ভেট) শাশুড়ীর পাঠানো ধুতি অনেক জমে গেলে তাকে দুপাট করে লুঙ্গি ধরনের পরবার চেষ্টা চলল।' অর্থাৎ যত দিন এগিয়েছে, ধুতির মতো করে ধুতি পরবার ধৈর্য্য গেছে, তার বদলে ধুতিকেও লুঙ্গির মতো করে পরার চল লক্ষ্য গেছে। দ্রষ্টব্য, শিলাদিত্য, 'বসন-সঙ্কীর্তন', বসুধারা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭।

[141] পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', সপ্তম খণ্ড, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১৪), পৃ ৩৮৯।

[142] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'জাতীয় পোষাক', মাসীক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ ২৬৫।

দূরত্ব বেড়েছে।[143] শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে লুঙ্গি হয়ে উঠেছে অশিষ্টাচারী পোশাক।[144] কলকাতার নাক উঁচু হিন্দু ইংরেজি শিক্ষিতের কাছে পূর্ব বঙ্গীয় গ্রাম্যতার চিহ্ন।[145] অনেক সময় বাঙালি হিন্দু স্বীকারও করতে চায়নি যে, কোনো বাঙালি লুঙ্গি পরতে পারে। ঘুরিয়ে বলতে গেলে লুঙ্গি পরিহিতদের বাঙালি সত্তা স্বীকার করতে চায়নি হয়ত।[146] ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'ক্ষুধা' গল্পে এই অস্বীকৃতির আবর্তটা একটা কথোপকথের মধ্যে প্রকট হয়েছে। --

> আলোকিত রাস্তা দিয়া প্রায় ইয়াসুফের সমবয়সী কি একটু ছোট একটি কিশোর চলিয়াছিল অন্যমনস্ক হইয়া। বাঙালী ভদ্রঘরের বালক। ইয়াসুফের হাঁকে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। ইয়াসুফ উৎসাহিত হইয়া ডাকিল, "আসুন বাবু, খেয়ে যান খাস কলকাতার চানাচুর, বড় মজাদার, গরম গরম।" ... ততক্ষণে ছেলেটি তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, "তুমি বাংলা বলচো যে, তুমি কোথাকার লোক?" ... আনন্দে সে প্রায় গলিয়া গিয়া জবাব দিল, "বাবু, আমি যে বাঙালী।" ছেলেটির মুখে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি, সে তাহার লুঙ্গির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "তবে লুঙ্গি পরেছ যে?" ইয়াসুফ

---

143 আহমদ কবীর সম্পাদিত 'আহমদ শরীফ রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, মার্চ ২০০৬), পৃ ১৮৩।

144 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বস্ত্রসমস্যার মধ্যে দুর্গাপুজোর জন্য নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে না পারা একজন শহুরে মধ্যবিত্ত পুরুষের প্রতিভু যেমন গ্রাম থেকে শহরে ফিরেছেন। তার আশা ছিল, কলকাতা শহরে ট্রাম ধর্মঘটের কারণে আর কারো বাড়ি বিজয়া করতে যেতে হবে না। কিন্তু ট্রাম ধর্মঘট উঠে গিয়েছে, এদিকে তার নতুন কাপড়ের অভাব, 'ধুতি তিনটির মধ্যে যেটিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সূতা আছে সেটি একুশ জায়গায় ফুটা ও ফাটা; পাঞ্জাবি পাঁচটিকেই উপর্যুপরি পরিধান করিলে তবে সমস্ত দেহ কথঞ্চিৎ আবৃত হইতে পারে' – পুরোনো কাপড়েরও এই দশা। কিন্তু পরনে কেবল লুঙ্গি, যা পরে 'গ্রামে চলিয়াছে, শহরে ফিরিয়া আর লুঙ্গিতে চলে না।' কিন্তু অর্থাভাবের কালে মধ্যবিত্তীয় চক্ষুলজ্জাও বড় বালাই। বিজয়ার প্রণাম বলে কথা। তাই বক্তার রাগ ঝরে পড়েছে এইভাবে, 'হতভাগ্য বৃষ্টিও সময় বুঝিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে; এত সাধের ট্রাম স্ট্রাইক, তাহাও মিটিয়া গেল। ইহাতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়, ধর্ম্মঘটের উদ্যোক্তারা দেশের প্রকৃত হিতৈষী নয়, দেশের সহিত তাহাদের নাড়ীর যোগ নাই। দেশের দুঃখ যদি সত্যই বুঝিত তবে তাহারা ধর্ম্মঘটটা (আগে) না বাধাইয়া এখন বাধাইত, বিজয়া-দশমীর দেখা সাক্ষাৎ বস্তুটা অনায়াসে এড়াইয়া যাইবার একটা চমৎকার কৈফিয়ৎ জুটিত আমাদের ...' কি নিদারুণ ভব্যতার অসহায় আবর্তে মধ্যবিত্ত আবদ্ধ তা চিন্তা করা যায়! দ্রষ্টব্য, সম্বুদ্ধ, 'চলন্তিকা', অলকা, ৮ম বর্ষ, অগ্রাণ ১৩৫২, পৃ ১৩৩।

145 ১৯৪০'এর দশকের শেষের দিকে হিন্দু মধ্যবিত্তের এই পোশাকি বিভাজনের মানসিকতাটি বহুদিন ধরে মুসলমান সমাজে কি মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল, তা হিন্দু দোকানদার ও মুসলিম খরিতদারের মধ্যেকার দাঙ্গাপ্রবণ কথাবার্তায় উঠে আসে, -- 'চকবাজারের দোকানদার। একজন মুসলমান গেঞ্জির দাম জিজ্ঞাসা করিল। দাম বলা হইল – সে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া আবার দাম জিজ্ঞাসা করিল – দোকানদার বলিল দাম তো একবার বলিয়াছি। সক্রোধে উত্তর হইল মশায় আমায় লুঙ্গি পরা দেখিয়া তুচ্ছ করেন? সে বলিল, আমরা জিনিষ বিক্রয় করিতে বসিয়াছি, কাহাকেও তুচ্ছ করি না, লুঙ্গি পরিয়া আসুক, আর উচ্চ পোষাক পরিয়া আসুক। গর্জ্জিয়া উঠিল খরিদ্দার, কি মশায় আমায় লেংটি পরা বলেন। জুটিয়া গেল ৪০-৫০ জন স্বধর্মী। লোক আসিল – দোকান যায় যায় – হিন্দু দোকানদারগণ ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।' দ্রষ্টব্য, 'বিবিধ প্রসঙ্গ', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫।

146 শ্রীশক্তিপদ কোঙার, 'বাঙালী' (ছোটগল্প), বঙ্গশ্রী, ১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫১, পৃ ২০৯।

আপনার লুঙ্গির পানে তাচ্ছিল্ল্যভাবে তাকাইয়া বলিল, "তাতে কি হয়েছে? জাতে আমি মোচলমান, কিন্তু কলকাতায় থাকি, বাঙালী তো? সেখানেই আমার জম্ম কম্ম সব। শুধু বোমার ভয়েই না দেশ ঘর ছেড়ে এই বিদেশে এসে পড়েছি? আর কতগুলো অজ হিন্দুস্তানীর ভেতর বাস করচি। আজ আপনার মুখে বাংলা শুনে এত আনন্দ হল বাবু, মনে হচ্ছে আপনি যেন আমার কত আপনার লোক। ...[147]

আপনার লোক তো বটেই, কিন্তু নানা সামাজিক, ধর্মীয়, মানসিক নির্মাণে আবদ্ধ হয়ে সেই আপনত্বে দূরত্বই যে বেশি – তা বোঝাই যাচ্ছে। লুঙ্গি পরিহিতরা না হয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু পোশাকি শিষ্টাচারে অপরিশীলিত হিসেবে দৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু চোগা-চাপকান-ট্রাউজারস-ফেজ পরিহিতরা! মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখেছিলেন, শিক্ষিত হিন্দুদের ওসব পোশাকি প্রস্থ দেখলে স্বদেশীয়ত্ব জেগে ওঠে।[148] ওইদিকে শার্ট, প্যান্ট, কোট, বুট, কামিজ, গেঞ্জি, সোয়েটার, নেকটাই, স্টকিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বিদেশি পণ্য বিদ্বেষের একটুও লক্ষণ প্রকাশ পায় না।[149] হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সন্দেহ, বাঙালি মুসলমানকে কোথাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল যে, -- বাঙালি হিন্দুর স্বদেশিয়ানার তলে তলে মুসলমান-বিদ্বেষই আসলে জিগির তুলেছে। জাতীয় জীবনের প্রাত্যহিকতায় ক্রমাগত হেয় প্রতিপন্ন হতে হতে যতই এই বিশ্বাসের মূল প্রোথিত হয়েছে, ততই মুসলিম-মানসে হিন্দুদের প্রতিও ঘৃণার জিগির উঠেছে। যে ঘৃণা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকট হয়েছে। আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হার যতই বেড়েছে, ততই হিন্দুর কাছে লুঙ্গির সাথে সন্দেহের দ্যোতক জুড়েছে। বিশেষত নোয়াখালীর দাঙ্গায় যখন হিন্দু যুবাদের কলমা পড়িয়ে লুঙ্গি পরতে বাধ্য করা হচ্ছিল, তখন থেকে লুঙ্গি যেন একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র লাভ করেছে।[150] পরবর্তীতে ভারতে হিন্দু মহাসভার হাত ধরে সেই সাম্প্রদায়িকতার প্রতীকীকরণ

---

147 তদেব।

148 আবার মুসলমানরা ট্রাউজারস-চোগা-চাপকান ছেড়ে বিলিতি কায়দার পোশাক ধরেছিলেন বলেও শঙ্করে হিন্দুর মনে ভয়। যদি ভুলক্রমে কোনো মুসলমানের ছায়া মাড়ানো হয়! কারণ বিলিতি পোশাক পরলে তো, কোনো স্বাতন্ত্র্য সূচক চিহ্ন ছাড়া হিন্দু-মুসলিম ভেদ করা কঠিন। মোহাম্মদ আকরম খাঁ একজন হিন্দু দোকানদারের উদাহরণ দিয়েছেন, 'কলিকাতায় কোনো এক বিখ্যাত মোদক মহাশয়ের দোকানের সামনে "মুছলমানের প্রবেশ নিষেধ" বলিয়া বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ড লটকাইয়া দেওয়া হয়। জনৈক উদার প্রকৃতির হিন্দু ইহার প্রতিবাদ করায় মোদক মহাশয় বলেন – মশায় বলছেন ও কথা। আজকাল মুছলমানেরা সব ভদ্রলোকের মতো কাপড় চোপড় পরে দাড়ী কামাতে আরম্ভ করেছে। কে মুছলমান, কে ভদ্রলোক, তা চেনা যায় না। নেড়েগুলো আবার হুড়হুড় করে দোকানে ঢুকে পড়ে। না লিখে কি করি?' দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'জাতীয় পোষাক', মাসীক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফাল্‌গুন ১৩৩৫, পৃ ২৬৭।

149 তদেব।

150 ১৯৪৯ সালে লেখা হয়েছিল, 'কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে বা স্নান করে অনেকেই একখানি আটহাত ধুতি পরতেন। চোদ্দ হাত ধুতিতে লজ্জা নিবারণ হয় না, এমন সব শ্রীঅঙ্গে যখন সেই আটহাতি ধুতি পরত, তখন যে

উত্তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যার সেই বিতর্কিত স্থানে উন্মত্ত করসেবকরা স্লোগান তুলেছিল, "হারাম কো মিটানা হ্যায়/ কুমার সে লুঙ্গি, মুঁ হুঁ সে পান/ ভাগাও সালেকো পাকিস্তান..."[151] বোঝাই যাচ্ছে দেশভাগের আগে থেকে শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

কি শোভা হত তা বলাই বাহুল্য – গোহত্যার গন্ধ থাকলেও তার তুলনায় লুঙ্গিও ঢের সভ্য।' দ্রষ্টব্য, 'প্রভাত-সঙ্গীত', মাসিক বসুমতী, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৫।

১৯২৭ সালে নাগপুর দাঙ্গার সূত্র ধরে সারা ভারতে যে দাঙ্গার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে কলকাতার এক হিন্দু বাড়িতে মুসলিম আগন্তুকের আগমনকে কিভাবে দেখা হয়েছে, তার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, লুঙ্গি কিভাবে দাঙ্গাকারী মুসলমানের সমর্থক হয়ে উঠেছিল,

'মেজদা, একটা মোচলমান তোমায় ডাকছে।

- এ্যাঁ, মোচলমান!
- হ্যাঁ।
- কি রকম দেখতে, ষণ্ডা মতন লুঙ্গি পরা?
- না ইজের আচকান পরা। ...'

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে হিন্দু মধ্যবিত্ত নাগরিক চেতনায় লুঙ্গি পরা মুসলমানের সাথে দাঙ্গার একটা সম্বন্ধ তৈরি হচ্ছিল। দ্রষ্টব্য, 'হিন্দু মুসলমান ফ্যাক্ট', বঙ্গবাণী, পঞ্চম বর্ষ , আষাঢ় ১৩৩৩ ।

তাছাড়া দাঙ্গার পরিস্থিতিতে নোয়াখালী এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে হিন্দুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে লুঙ্গি-টুপি ধারণ করানো, এবং সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতালব্ধ বই প্রকাশ -- লুঙ্গির সাথে আতঙ্কের সম্বন্ধকে আরও প্রলম্বিত করেছিল। সুকুমার রায় লিখেছিলেন, 'আমি নিজে কোন কোন বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছি এবং ব্যক্তিগতভাবে দুর্গতদের সাথে আলাপ করিয়াছি; কাজেই অপর কাহারও কথা বিশ্বাস করার আমার প্রয়োজন নাই – বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইয়াছে – সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে জোর করিয়া লুঙ্গি ও টুপি পরান হইয়াছে – উহাদের নাম বদলান হইয়াছে।' দ্রষ্টব্য, সুকুমার রায়, 'নোয়াখালীতে মহাত্মা', (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, আগস্ট ১৯৪৭), পৃ ২১।

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা থেকেও বোঝা যাবে, হিন্দু-মুসলমানের প্রত্যাহিক ধর্মযাপনের পোশাক কিভাবে গায়ের জোরের যুদ্ধ অর্থাৎ দাঙ্গার পোশাক উঠেছে, 'যুদ্ধের পোষাক না পরে যুদ্ধে নামলে তাকে আর তখন যুদ্ধ বলা হয়না। যার খুসি যেমন পোষাক যেমন ইচ্ছে অস্ত্র নিয়ে -- তা পেনসিলকাটা ছুড়িই হোক আর পকেটকাটা কাঁচিই হোক – বাগিয়ে মার মার রবে বেরিয়ে পড়ল – এধরনের অভিযানকে যুদ্ধ না বলে দাঙ্গা বলে থাকে। কেউ লুঙ্গি পরে বেরুলো, কেউ নামাবলী গায়ে -- কোনো বাধা নেই। এ জাতীয় যুদ্ধের উপর পোষাকের কোন প্রভাব নেই – এবং পোষাকের উপরেও এ যুদ্ধ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাছাড়া এ যুদ্ধে অস্ত্রবলের চেয়ে বাহুবলটাই বড়ো, কেননা পকেট কাটা কাঁচির সাহায্যে মাথা কাটতে হলে কতখানি কব্জির জোর থাকা দরকার আমি তো তা ধারণা করতেই পারি না। যুদ্ধের এই প্রহসন ঢাকা থাকাই বাঞ্ছনীয়।' আর ফর্ম্যাল রূপহীন এই যুদ্ধে যে মানুষে কতটা উদ্বেগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তা বলাই বাহুল্য। সেই উদ্বেগে লুঙ্গি পরা মানুষ দেখলেও দাঙ্গাবাজ বলে ভ্রম হতে পারে। দ্রষ্টব্য, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, 'আমাদের পোষাকে যুদ্ধের প্রভাব' (অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে পঠিত রচনা), বঙ্গশ্রী, ১২শ পর্ব, ২য় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩৫১, পৃ ৬৭; দ্রষ্টব্য, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, *আসামের অশান্তি প্রসঙ্গে,* অনুবাদঃ সুধীরচন্দ্র লাহা, (কলিকাতাঃ সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি, জুলাই ১৯৬১), পৃ ৫২-৫৩; দ্রষ্টব্য, 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ', পরিচয়, শারদীয়া ১৯৯৩, পৃ ৮২-৮৩।

[151] 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ', পরিচয়, শারদীয়া ১৯৯৩, পৃ ৮০।

লুঙ্গিকে কোন প্রতীকে স্থিত করেছিল। এই লুঙ্গির উপর ভিত্তি করেই উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ইতিহাস লেখা সম্ভব। অথচ মুঘল আধিপত্যের সূর্যাস্তের পরেও পার্সি ভাষায় পণ্ডিত বা পার্সি-পড়িয়ে হিন্দুদের মধ্যে 'কানে শরের কলম আর লুঙ্গি না হলে চলত না', সাথে 'মাথাও ঢাকা চাই!'[152] – এই ছিল পার্সি-শিক্ষিত মান্য শিষ্টাচার। লুঙ্গির উপর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক রঙ চড়ার পরও কিন্তু ঘরোয়া পরিসরে হিন্দু পুরুষের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করে লুঙ্গি পরার চল ছিল। কিন্তু সে লুঙ্গি হত একরঙ্গা, সরু পাড়যুক্ত। কেউ কেউ সিল্কের, রেশমের, জড়ি পাড় লুঙ্গি পরে বাইরেও যেতেন।[153] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বস্ত্রসংকটের কালে বাজারজুড়ে ধুতি শাড়ির হাহাকার সৃষ্টি হয়েছিল।[154] সেই হাহাকার থেকে নিস্তার পেতেও বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিকতার সাথে লুঙ্গি যুক্ত হয়েছিল।[155] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লম্বা ধুতি কিনে তাকে প্রয়োজনমতো খণ্ড-বিখণ্ড করে, সেই খণ্ডগুলো গোলাকার জোরা লাগিয়ে সেলাই করে, পছন্দমতো রঙে চুবিয়ে সেই লুঙ্গি বানানো হত।[156] সেই বস্ত্র-সংকটের অভিঘাতে প্যান্টের ঝুল কমে উঠল হাঁটুর উপরে, যা এখন সর্বজনবিদিত হাফ-প্যান্ট।[157] এরপর ধীরে ধীরে বেকারত্বের হার যত বেড়েছে, মধ্যবিত্ত পুরুষের বয়স যত বেড়েছে, বারো-চোদ্দ হাত ধুতি পরা ততই বিলাসিতা হয়ে উঠেছে। সাশ্রয়ী পুরুষের ঘরোয়া চাহিদার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে লুঙ্গি।[158] কিন্তু স্বদেশি ও স্বদেশি

---

[152] 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, (কলিকাতাঃ প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ১৯৭৩), পৃ ৪৭।

[153] সন্তোষকুমার ঘোষ, 'মোমের পুতুল', (কলিকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২), পৃ ৫।

[154] যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 'তখন কাগজে খবর বের হত -- অমুক নারী কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যা করেছে।' দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, 'কৃষি-কাজ', মৌচাক, ৪০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৬; দ্রষ্টব্য, অমরেন্দ্র আদক, 'কালের চালচিত্রে শ্রীমা সারদা', (কলকাতাঃ অনুভব প্রকাশন, ২০০৭) পৃ ১১৮।

[155] ১৯৪৪ সালে একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজাত বস্ত্র-সমস্যা ও অন্যদিকে মুসলিম লিগের পাকিস্তান আন্দোলনজাত আত্মনিয়ন্ত্রণের পোশাকি প্রতীকীকরণে হিন্দু মধ্যবিত্তের বস্ত্ররুচি কিভাবে ফেঁসে গিয়েছিল, দেখা যাক – 'বঙ্গদেশের আধুনিক রাজনীতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এই নীতির দিক হইতেও বস্ত্রহীনতার মধ্যে ভাবিবার কথা আছে। কাপড় কাচার হাঙ্গাম এড়াইতে কাপড় রং করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে; এবার কাপড়েরই অভাব। বহুকালের অভ্যাস; একবারে সমস্ত কাপড় ত্যাগ করা সহজ হইবে না। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে" বলিয়া প্রথমে অর্দ্ধেক ত্যাগ করিব – দশহাতি কাপড় কাটিয়া দুইটি পাঁচহাতি লুঙ্গি বা তিনটা পায়জামা বানাইব। বস্ত্রাভাবের ফলে ধুতি ছাড়িয়া লুঙ্গি ও পায়জামা ধরিব – ইহাতে মুসলমানের সঙ্গে আমাদের বৈষম্য ঘুচিবে; এক কৃষ্টি ও এক পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া ক্রমে হয়তো একধর্ম্মেই আমাদের মিলন ঘটিবে, এমন স্বপ্ন দেখা দোষ নাই। হয়তো এই স্বপ্ন দেখিয়া মুসলমান সম্প্রদায় উল্লসিত হইতে পারিবেন।' দ্রষ্টব্য, সম্বুদ্ধ, 'চলন্তিকা', অলকা, ৭ম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৫২, পৃ ২২৪।

[156] শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, 'জাহাজ', প্রবর্ত্তক, চৈত্র ১৩৬৪।

[157] যোগেশচন্দ্র বাগল, 'কৃষি-কাজ', মৌচাক, ৪০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৬।

[158] গল্পের আশুদা চরিত্র যেমন। সদ্য স্বাধীন ভারতে চাকরি থেকে পেনসন নিয়ে সাশ্রয় করবার আশায় আর ধুতিতে কাছা দিতেন না যাতে কম দামে ছোটো ধুতিতে চলে যায়। তিনি বলতেন, 'মাইনে যেমন অর্ধেক হয়ে গেল, ধুতিও তেমনি অর্ধেক হওয়াই ভাল। বেকার লোকেদের কাছা-কোঁচার বাহুল্য শোভা পায় না। বছরখানেকের মধ্যেই

পরবর্তীকালে শিষ্টাচার ও সফিস্টিকেশনের প্রশ্নে ধুতি ও লুঙ্গির আলোচিত বিভাজনটাই বাস্তব ছিল। বিভাজনের এই সূত্রগুলির ভয়াবহতা পরবর্তীকালে যে তৎকালীন সংস্কারবাদী হিন্দুরা উপলব্ধি করেননি তা নয়। সে উপলব্ধির ধরণ এবং প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও তলিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে।

ন্যাশানাল ড্রেস প্রতর্ক: বাঙালি জাতীয়তার পোশাকি নির্মিতি ও তার অধরা দিক

আব্দুল ওদুদকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের চিঠিটিকে দু'ভাবে পাঠ করা যায়। একভাবে পাঠ করলে মনে হয়, তিনি ধর্মব্যাপারীদের সমালোচনা করছেন। আরেকভাবে পাঠ করলে মনে হয় তিনি বাঙালি মুসলমানের ধুতি-বিদ্বেষকে সমালোচনা করছেন। কারণ তিনি ধুতিকে সর্বান্তকরণে বাঙালি পুরুষের অধোবাস হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন হয়ত। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার একদম প্রাথমিক লগ্নে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এক পার্টিতে অবনীন্দ্রনাথরা তিনজন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ধুতি-চাদরে সজ্জিত হয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, "রবিকাকা বললেন, সব ধুতি চাদরে চলো। পরলুম ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে দিলুম শুঁড় তোলা পাঞ্জাবী চটি। এখন খালি পায়ে কী করে যাই। চেয়ে দেখি রবিকাকার পায়ে মোজা। আমরাও চটপট মোজা পরে নিলুম। যাক মোজা পরে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তখনকার দিনে মোজা ছাড়া চলা সে একটা ভয়ানক অসভ্যতা।"[159] কারণ বিলিতি শিষ্টাচারের উপযোগী করে তোলার জন্য ধুতির ঝুল পায়ের গোঁড়ালি অবধি টেনে সামনে লম্বমান ঝুল রাখা গেলেও, কাছা দিতে গিয়ে পায়ের পশ্চাতে শরীরের ত্বকটা তো ঢাকা যায়নি। সেটা ঢাকার জন্য হাঁটু অবধি লম্বা মোজা পরাই ছিল শিষ্টাচারী পোশাকের মানদণ্ড। লম্বিত কোঁচা ধুতি পরে মোজা পরে থাকলে সামাজিক সভ্যতার নির্মাণে আঘাত লাগার ভয় ততটা থাকেনা। তাই অবনীন্দ্রনাথরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। আবার ভয়ও পাচ্ছিলেন। দেশীয় পোশাককে যতই শিষ্ট, পরিশীলিত করে পরুন না কেন, পোশাকটা তো দেশীয়ই, "আমি, দাদা, সমরদা ও রবিকাকা সেজেগুজে রওনা হলাম, সবাই আমরা মনে মনে ভাবছি ইঙ্গবঙ্গের কেল্লায় কী রকম অভ্যর্থনা হবে ভেবে একটু একটু হৃৎকম্পও হচ্ছে, কিছুদূর গেছি দেখি রবিকাকা হঠাৎ এক এক টানে দুপায়ের মোজা খুলে গাড়ির পাদানীতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। আমাদের বললেন, আর মোজা কেন ও খুলে ফেলো; আগাগোড়া দেশী সাজে যেতে হবে।

ধুতিগুলো ছিড়ে যাওয়ার পর অধুনা তিনি লুঙ্গি পরতে শুরু করেছেন।' বোঝাই যাচ্ছে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের জিকির তুলে দেশ ভাগ হল, বিভাজনের যে চিহ্নগুলো সবার গণচেতনায় প্রকট হয়েছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে মুছতে শুরু করেছিল। তাই আশুদা পাকিস্তানে গিয়ে বাস করতে চেয়েছে। কোথাও ধর্মের চাইতে আশুদার কাছে সংস্কৃতিক পরিচয়টা বড়ো হয়ে উঠেছে। দ্রষ্টব্য, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, 'আমাদের ছেলেবেলা', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫৮; দ্রষ্টব্য, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, 'পশ্চাদ্দৃষ্টি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ ৬৮৯; দ্রষ্টব্য, ছায়াছবি – আকালের সন্ধানে, পরিচালক – মৃণাল সেন, গল্প – অমলেন্দু চক্রবর্তী, https://youtube.be/SRZqN-b0VpM

[159] সমুদ্র গুপ্ত, 'বঙ্গ ভঙ্গ', (কলিকাতাঃ আনন্দধারা প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৭৫), পৃ ১১৯।

আমরাও তাই করলুম , সেই গাড়িতে বসেই যার যার পা থেকে মোজা খুলে দিলুম।”[160] সমকালীন ‘পস’ মধ্যবিত্তের সভায় মোজা খুলে যাওয়া মানে, অন্য জাতির শ্লীলতার বর্ম ঝুলিয়ে যে সত্তা নিজের প্রকৃত পরিচয় ভুলতে বসেছিল, সেই সত্তাকে উক্ত শ্লীলতা নামক নির্মিতি থেকে সরিয়ে নির্ভার করা। এবং সে নির্ভারকরণের দ্রষ্টাদের অবচেতনে বা চেতনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া – তোমার প্রকৃত পোশাকি সামাজিকতা থেকে তুমি সভ্য হওয়ার ঘোড়দৌড়ে সামিল হতে হতে একটা বৃথা প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়েছ। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন, “পার্টি বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় আমরা চার মূর্তি গিয়ে উপস্থিত। আমাদের সাজসজ্জা দেখে সবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, কেউ আর কথা কয় না। অনেকে ছিলেন আমাদের বন্ধু – আমাদের পরিবারের বন্ধু। কিন্তু সবাই গম্ভীর মুখে ঘাড় সোজা করে রইলেন, আমাদের দিকে ফিরে চাইলেন না আর। রবিকাকা চুপ করে রইলেন, কিছু বললেন না। ... পরে শুনেছি ওরা নাকি খুব চটে গিয়েছিলেন, বলেছেন, এ কী রকম ব্যবহার, এ কী অসভ্যতা, লেডিজদের সামনে দেশী সাজে আসা তার উপর খালি পায়ে, মোজা পর্যন্ত না, ইত্যাদি সব।”[161]

‘পস’ মধ্যবিত্তীয় অহঙে ব্যাপারটা ভালোই আঘাত করতে পেরেছিল, যা তাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যায়। দেশীয় সমাজের সামনে সাহস করে লম্বকচ্ছ ধুতির সাথে মোজাহীন হয়ে আসা শিষ্টাচারের মানসিক আগলকে ভাঙতে পেরেছিল। সেকারণেই সেদিনের ঘটনা চাওড় হতেই সাধারণের মধ্যে মোজাহীন চলাফেরা বাড়তে লাগল। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, তাঁরা সেই যে মোজা ছেড়েছেন, আর কখনও মোজা পরেননি। এমনকি এই ঘটনার পর এককালে ধুতিকে অশিষ্টাচারী পোশাক সাব্যস্ত করে ধুতি বর্জন করা বিলেত-ফেরতারাও ধীরে ধীরে ধুতি পরতে শুরু করলেন পুনরায়।[162] শ্রীনলিনাক্ষ বলেছেন, বড় বড় শিক্ষিত বাঙালিরা জাতীয় পরিচ্ছদ বিষয়ে বেশ গর্বও অনুভব করতেন। সরকারি অফিস ব্যতীত আর কোথাও কোট-প্যান্ট-বুট, শোলার-টুপি-নেকটাই পরে যেতেন না। সামাজিক অনুষ্ঠানে, আত্মীয় বাড়িতে, পুজো-পার্বণে ধুতি-চাদর, পিরাণ বা মোর্জাই এবং শীতকালে বড়জোর তার নিচে র‍্যাপার পরে নিতেন। অফিসে-আদালতে যেসব সাত্ত্বিক হিন্দুরা প্রশাসনিক পোশাকি বিধি পালনের জন্য কোট-প্যান্ট-বুট পরতে বাধ্য হতেন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে সেইসব হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের সাত্ত্বিক আচারের

160 তদেব, পৃ ১১৯-১২০।

161 অবনীন্দ্রনাথ আরো লিখছেন, সেই যে তাঁরা মোজা পরা ছেড়েছেন, আর কখনও মোজা পরেননি। অন্য আরেকটি লেখায় পাই, রবীন্দ্রনাথও আর ‘ইংরেজী জুতা কখনও ... পরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বেশী সময়ই চটিজুতা পায়ে দিতেন। এই চটিজুতা যত বেশী অদ্ভুত রকমের হইত, তত বেশী তাঁহার পছন্দ হইত।’ দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ১২০; দ্রষ্টব্য, ‘রবীন্দ্রনাথ’, বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ১৬২।

162 তদেব।

প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর প্রবণতাও বেড়ে যায়।[163] বিলাতি সাজ সেজে 'জাত ভাঁড়াবার' ইচ্ছা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে শুরু করে।[164] কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো কাজের জায়গাতেও সরকারি ড্রেস কোডকে অগ্রাহ্য করে দেশীয় ধুতি-মের্জাই-তালতলার চটিতে সজ্জিত হয়ে ক'জন যেতে পেরেছেন!

কংগ্রেসীদের মধ্যেকার স্বদেশী-পূর্ব পোশাকি সাহেবীয়ানাকেও স্বদেশীর হাওয়া এসে আঘাত করেছিল। আর তৎকালে জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, বাংলায় কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে তারকনাথ পালিতের বাড়ির ডিনার পার্টিতে রবীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গান শোনাতে গিয়েছিলেন এবং তার ফলে 'বিদেশী ভাবাপন্ন' কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পোশাকি শিষ্টাচারে আঘাত লেগেছিল।[165] হয়ত এই অভিজ্ঞতা থেকেই স্বদেশীর কালে রবীন্দ্রনাথের মনে কংগ্রেসকে 'ন্যাশানালাইজ' করার একটা তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "কলকাতায় যেবার কংগ্রেস হয়, দেশবিদেশের নেতারা এসেছিলেন অনেকেই। কর্তাদের শখ হল এখানেই সেই অথিতি অভ্যাগতদের একটা পার্টি দিতে হবে। ঠিক হল সবাই ন্যাশানাল ড্রেসে আসবে। আমি বলি, সে কী করে হবে। রবিকাকা বললেন, না, তা হতেই হবে। তিনি নিমন্ত্রণ পত্রে ছাপিয়ে দেওয়ালেনঃ all must come in national dress. তাতে একটা বিষম হৈ চৈ পড়ে গেল ইঙ্গবঙ্গ সমাজের চাঁইদের মধ্যে।"[166] কিন্তু এই ন্যাশানাল ড্রেস যে সবসময় দেশীয় সুতোয় তৈরি হত, তা বলা যাবে না। স্বদেশীর ফলে বিলিতি ধুতি-শাড়ীর অদর্শনে বাংলা দেশের অনেক বিলিতি-শিষ্টাচারমুখী পরিবার স্বদেশী চরকায় বিলিতি সুতোর ধুতি শাড়ী বুনতেও শুরু করেছিলেন। সেই উদ্যোগকে নিয়ে হেঁয়ালি করে লেখা হয়েছিল, "বিলাতী সূতা আনাইয়া খাঁটী

---

[163] শ্রীনলিনাক্ষ কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ উপাচার্য স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন। যিনি প্রতিদিন খালিগায়ে ও খালিপায়ে গঙ্গা স্নানে যেতেন। চাকরিস্থলে সাহেবী পোশাক পরে গেলেও সামাজিকতায় সবসময় দেশীয় পোশাকি আচার পালন করতেন। এবং বলতেন, "আমরা বাঙালী, সাহেবী পোষাক পরলে যেন হাঁপিয়ে উঠি..." দ্রষ্টব্য, শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ, 'পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ', ভারতবর্ষ, ৫২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৭২, পৃ ৭৩৫।

[164] শ্রীনলিনাক্ষ বর্ধমান ডিভিশানের জেলাশাসক পদ থেকে বিভাগীয় শাসক পদে পদোন্নিত ব্রজেন্দ্রনাথ দে'র কথা বলেছেন। যিনি নিজের সরকারি বাংলোতে ধুতি-চাদর-পিরাণ ও স্লিপার পরে থাকতেন। নিমন্ত্রণ-উৎসবাদিতেও দেশীয় সাজে যেতেন, এবং কেউ তাঁকে সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কাজ সত্ত্বেও দেশীয় জামা-কাপড় পরার প্রবণতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিতেন, "এ তো আর আমার এজলাস বা আফিস নয় বা বিলাতও নয়, তবে কেন শুধু শুধু বাজে বোঝাগুলো বয়ে মরি।" দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ৭৩৬।

[165] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছেলেবেলা", বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (কলকাতাঃ ক্যালকাটা বুক হাউস, মে ১৯৫৯), পৃ ১৪৩।

[166] সমুদ্র গুপ্ত, 'বঙ্গ ভঙ্গ', পৃ ১২০-১২১।

স্বদেশী তাঁতে এই সকল ধুতি ও সাটী আমরা প্রস্তুত করাইয়াছি। এই বস্ত্র-প্রভাবে প্রকৃতির পুরুষত্ব ও পুরুষের প্রকৃতিত্ব প্রসূত হইবে, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাবু-বৌ বা বৌ-বাবুর আবির্ভাব হইবে।"[167]

জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর-নাগড়ার এই "ন্যাশানাল ড্রেস"কে সমকালীন মুসলিম চিন্তকেরা 'প্রাদেশিকতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতবর্ষের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বিলিতি

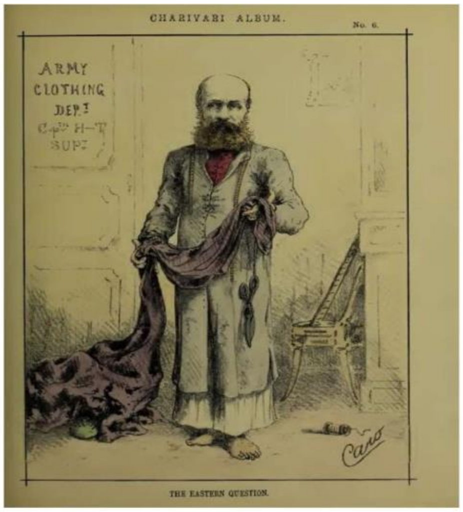

চিত্র ৬.৭: মাদ্রাজের গভর্নর Vere H. Hobert (১৮৭২-১৮৭৫)-এর মুসলিম প্রীতিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে আঁকা ছবি [168]

সভ্যতার সাথে সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া পোশাককে কি আদপেই "ন্যাশানাল" বলা যায়? তাঁদের মতে, কোনভাবেই একে ন্যাশানাল বলা যাবে না। কারণ এতে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের

---

[167] অমরেন্দ্রনাথ রায়, "পূজার বাজারে -- বস্ত্রের বাহার", কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'সরস সার কথা', দুই খণ্ড একসাথে, (কলিকাতাঃ গ্রন্থগৃহ, ১৩৫৩), পৃ ২২৭।

[168] 'Charivari'তে এই ছবিটি ছাপানো হয়েছিল। ছবিটির তলে লেখা আছে 'The Eastern Question', যা ছবিটিকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে Eastern Question অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যে বা তুর্কিতে ইউরোপীয় গ্রেট পাওয়ারগুলোর সমরনীতি এবং রাজনৈতিক ফায়দা লাভের কৌশলগত সংঘাতকে বোঝায়। ১৮৭০ এর দশকে মাদ্রাজের গবর্নর ভেরে হোবারট মাদ্রাজের সরকারি নিয়োগে মুসলমানদের গুরুত্ব দিতে শুরু করলে, অভিযোগ ওঠে – তিনি অটোমান সাম্রাজ্যে ব্রিটেনের রাজনৈতিক কৌশলকে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য কাজ করছেন। অর্থাৎ এতদিনধরে সরকারি চাকরি-বাকরিতে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পেয়ে হিন্দুরা ব্রিটিশ সরকারের হঠাৎ মুসলিম প্রীতির আসল উদ্দেশ্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেও নেমেছিলেন। চরিভরিতে লেখা হয়েছে – এই ছবিটি মাদ্রাজের সংবাদমাধ্যমগুলোর সেরূপ বিশ্লেষণের ফল। দ্রষ্টব্য, Sir Punch, 'Indian Charivari Album', Vol. 1, (7 Dacre's Lane Calcutta, 1875, Publisher was not mentioned).

প্রতিনিধিত্ব নেই। এতে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতিনিধিত্ব নেই। তাঁদের আরও বক্তব্য, বাঙালি মুসলমানেরা যদি কেবলমাত্র তাদের ভূখণ্ডের একটি শ্রেণির পোশাককে "ন্যাশানাল" বলা হচ্ছে ভেবে নিজেদেরকে সেই "ন্যাশানাল পোশাকের" অংশীদার মনে করে গৌরব অনুভব করে থাকেন, তবে তারা ভুল করছেন। কারণ সেই তথাকথিত "ন্যাশানাল"এ বাঙালি মুসলমানের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। মোহাম্মদ আকরাম খাঁ'র মতে, মুসলমানদের তখনি এই "ন্যাশানাল" পোশাকের জাতীয়ত্ব স্বীকার করা উচিত, যদি সেই "ন্যাশানাল" ড্রেস ভারতের সব জনজাতির প্রতিনিধিত্ব করে। বা বাঙালির জাতীয় পোশাক হিসেবে মুসলমানরা তখনি ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবিতে নিজেদের সাজাতে পারেন, যদি বাঙালি হিন্দুরাও তথাকথিত মুসলমানী পোশাক -- চোগা-চাপকানকে উদার চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর মতে, একতরফা গ্রহণ কখনোই স্বাস্থ্যকর সমাজের পরিচায়ক নয়। হিন্দু নির্দেশিত এই "ন্যাশানাল ড্রেসে" নিজেদের শরীর গলানোকে খাঁ মহাশয় 'শোচনীয় পরাজয়' এবং 'মর্ম্ম বিদারক আত্মসমর্পণ' হিসেবে দেখেছেন।[169] স্বদেশীর কালে পাশ্চাত্য শিষ্টাচারে পায়ের পাতা অবধি ঝুলের কোঁচা রেখে মোটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি চাপিয়ে যে জাতীয়তাকে পোশাকি আচারে পরিস্ফুট করা হল, সেই পোশাকি জাতীয়তার ভিত্তি নিয়ে স্বাদেশী পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যেও মোটা দাগের প্রশ্ন উঠেছিল। গান্ধীর অসহযোগের রেশ কাটতে না কাটতেই ১৯২৫ সালের দিকে মহিলাদের পরিচালিত একটি সংবাদপত্রে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, -- 'এই যে দশহাতি-চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের লম্বা কোঁচা-কাছা – এ আমাদের কতদিনের জাতীয়তা, একি এই বিলাতের ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে সম্বন্ধের পর থেকে নয়? আমাদের ঠাকুরদাদার আমলে পুরা মানুষের কাপড় ছিল পাঁচ হাত লম্বা, দেড় হাত বহর। কোঁচা ত ছিলই না। ... সে কাপড়ে হাঁটু ঢাকা পড়ত না। শীতের দিনে গায়ে একটা মোটা চাদর, এই ছিল একশো বছর আগেকার বাংলার জাতীয় পরিচ্ছদ। দু-একটি রাজা-জমিদারের মধ্যে চোগা-চাপকান ব্যবহারের কথা শোনা যায়, সেটিও সম্ভবত বিদেশী মুসলমান রাজার অনুকরণে।'[170] অজ্ঞাতনামা লেখক/লেখিকার মূল বক্তব্য হল, যে পোশাককে জাতীয়তার চিহ্ন হিসেবে ধরে স্বদেশীর হিড়িক তোলা হচ্ছে, সেই পোশাকি শিষ্টাচার তো ইংরেজদের মিলের তৈরি দশহাতি ধুতির চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের কোঁচার কল্যাণে।[171] শুধু পরিধেয়টি ধুতি বলে জাতীয়তার মোড়কে চালানো

---

[169] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'জাতীয় পোষাক', মাসীক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ ২৬৮।

[170] 'খদ্দর ও পরিচ্ছদ সমস্যা', মাতৃ-মন্দির পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ

[171] এই বিষয়টি নিয়ে ভাববার সময় এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, উপমহাদেশের ইতিহাসে লম্বা ধুতির নিদর্শন কম নেই। খ্রিষ্টীয় প্রথম থেকে পঞ্চম শতকে গান্ধার চিত্রকলার লম্বা ধুতি জড়ানো মূর্তিগুলোর কথা স্মরণ করা যায়। বা অমরকোষ ও জৈন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত ধুতির নানাহ নামের কথা স্মরণ করা যায়। যেমন – অন্তরীয়, উপসংব্যান, পরিধান, অধোংশুক, আর চাদরের মধ্যে প্রাবার, উত্তরাসংগ, বৃহতিকা, সংব্যান, উত্তরীয় ইত্যাদির নাম জানা যায়। যদিও এই কাপুড়ে প্রস্থগুলির বিষয়ে বিশদে জানা যায় না। কিন্তু এতটুকু অনুমান করা যায় যে, ভারতবর্ষে কোনো একপ্রকার ধুতি বা চাদরের সংস্কৃতি ছিল না। অঞ্চল বিশেষ এবং সুবিধা বিশেষে নানা অঞ্চলে নানা প্রকার ধুতি-চাদর পরার চল ছিল। বাংলা দেশের পুরুষের মধ্যে যদি খাটো ধুতির চল থেকে থাকে, তা বাংলার আবহাওয়ার জন্য। তার

যাচ্ছে। কিন্তু সেই ধুতি পরিধানের যে ভাব, সেই ভাব তো পাশ্চাত্য শিষ্টাচারের আমদানি। সেই ভাবকে বাদ দিয়ে জাতীয়তাবাদীরা তো ধুতি গ্রহণ করছেন না। লেখক/লেখিকার কথার ভাবটা এমন, -- যদি জাতীয়তা দেখানোই পোশাক ধারণের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পাশ্চাত্যের শিষ্টাচারে দেশীয় পোশাক পরিধান ছেড়ে পুরাতন দেশীয় শিষ্টাচার অনুযায়ী ধুতি পরাই শ্রেয়, তাতে কাজেরও সুবিধা হয়, এবং পোশাকের মূল ভাবটিও সুরক্ষিত থাকে। আর যদি পাশ্চাত্য শিষ্টাচার গ্রহণ করতেই হয়, তবে পাশ্চাত্য পরিধেয় গ্রহণে দোষ কি? – এই প্রশ্নটা লেখক/লেখিকার আলোচনায় নানাভাবে এসেছে। এক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য শিষ্টাচার-অনুসারী ধুতি পরিধানের কয়েকটি সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সৌন্দর্য্যবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত আভূমি কোঁচা। তাঁর মতে, এই কোঁচা অনর্থক। কাজে বিঘ্নসৃষ্টিকারী।[172] দ্বিতীয়ত, যতই পাশ্চাত্য শিষ্টাচার অনুসারী হয়ে কোঁচা দিয়ে ধুতি পরা হোক, তাঁর মতে ধুতি তবু ভদ্র পোশাক নয়। ধুতির এতখানি কাপড় শুধুই অপচয়।[173] তৃতীয়ত, ছোটোবেলা থেকে শিশুদের ধুতি পরানো অভ্যাস করলে একটা স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত কখনোই জাতি লাভ করতে পারবে না।[174] কারণ ছেলে-পুলেদের ছোটোবেলা থেকে যতই ধুতি পরার অভ্যাস করা হবে, ততই তারা পোশাকি প্রতিবন্ধকতা হেতু দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধূলায় অসমর্থ হবে এবং ভবিষ্যতে রূগ্ন হয়ে উঠবে। অর্থাৎ স্বদেশীর পর এবং জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধির উত্থানের কালে একজন যখন সাহস করে পোশাকি জাতীয়তার রূগ্ন দিক নিয়ে লিখেই ফেললেন এবং তা যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হল – তখন ধরে নিতে

মানে এমন নয়, লম্বা ধুতির ধারণা ব্রিটিশ আসার পূর্বে ছিল না। দ্রষ্টব্য, ধ্রুবজ্যোতি সেন, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাজসজ্জা', অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৩।

172 তাঁর ভাষায়, '... এই সম্মুখে দোলায়মান কোঁচা, যাহা অন্যূন ৬ হাত লম্বা কাপড়ের ভাঁজে তৈরী, এই কোঁচাটার স্বার্থকতা কি? এই কোঁচা ঝুলিয়ে আপিসের চেয়ারে বসে কেরাণীগিরির কলম চালনা করা যেতে পারে বটে কিন্তু চলবার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য। ... চলবার সময় কোঁচা আমাদের যে ভাবে হাঁটবার বাধা দেয় তা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কেউ কোঁচার নিচের অংশটা ফিরিয়ে কোমরে গোঁজেন, কেউ কোঁচার মাথা হাতে ধরে চলেন, কেউ বা পকেটে গোঁজেন; এ সব আর কিছুই নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে ভ্রম সংশোধনের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।' দ্রষ্টব্য, 'খদ্দর ও পরিচ্ছদ সমস্যা', মাতৃ-মন্দির পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ ২৫৯।

173 তাঁর ভাষায়, 'আমরা যে ধুতি পরিধান করি এই অকর্তিত এক সিট ... বস্ত্র কখনও পরিচ্ছদের উপযোগী হতে পারে না। এতে উলঙ্গতাও সম্পূর্ণ ঢাকে না। আমাদের মত গ্রীষ্ম দেশবাসী কোন সভ্য জাতিই এই রকম সিট পরিধান করে না। এই বাঙালীর ধুতিকে যদি কেউ আদিমকালের অসভ্য যুগের প্রথম বস্ত্রখণ্ডের ব্যবহারের অনুকরণ বলে গালি দেয় তার জন্য বোধ হয় আমাদের কিছু বলবার থাকে না। কারণ এতে কোন চিন্তাশক্তির ব্যবহার নাই। বিশেষত একখানি ধুতিতে যতখানি কাপড় ব্যবহৃত হয়, ঐ পরিমাণ কাপড়ে দুইটা পা-জামা আর একটা গায়ের জামা হতে পারে।' দ্রষ্টব্য, তদেব।

174 লেখাটি এরূপ, 'পরিচ্ছদ যত আঁটসাঁট হবে ততই বেশী ছুটাছুটীর সুযোগ হবে, তার জন্যে গায়ে বল বাড়বে, কাজের সুবিধা হবে। আমরা যখন ছোট ছেলেদের কোঁচা দুলিয়ে কাপড় পরিয়ে দিই তখন তারা ধীরে ধীরে দুলে দুলে চলতে থাকে, আর যখন হাফ-প্যান্ট পরিয়ে দিই তখন বেশ ছুটাছুটী করে বেড়ায়। অভিভাবকগণকে মনে রাখতে হবে ছেলেপিলেদের যথেষ্ট ছুটাছুটী করবার সুযোগ দেওয়া চাই।' দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ ২৫৯।

কোনো অসুবিধা থাকে না বাঙালির পোশাকি জাতীয়তা নিয়ে মধ্যবিত্তের এক মহলে খানিক উষ্মার পরিবেশ ছিল।

একদিকে জাতীয়তার পোশাকি হাতছানি, অন্যদিকে সেই পোশাকি জাতীয়তা নিয়ে উষ্মা – বাঙালি পরিচিতির পোশাকি ব্যাখ্যানে দোলাচলের ভাবকেও সংযুক্ত করেছে কিনা – তাও ভাবতে হবে। ১৯৬০ এর দশকে একজন কৌতুক করে লিখেছেন, 'যখন স্বদেশীর হিড়িক চলছিল, বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ধুম-ধাড়াকা পড়ে গিয়েছিল, বাঙালী তখন একবার চেষ্টা করেছিল নিজস্ব পোশাক উদ্ভাবন করতে। সব নষ্ট করল মাথায় গান্ধীটুপি লাগিয়ে। মাথায় তেলমাখা স্বভাব, তার উপর সাদা টুপি। টুপি দু'দিনেই তেলচিটে হয়ে কি অপরূপই না দেখাত।'[175] এ নাহয় গেল কৌতুক কিন্তু বাস্তবিক অর্থেই বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষ স্বদেশী হাওয়ায় বিলিতি পোশাকি শিষ্টাচারের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও বাংলার বাইরে থেকে নানা পোশাকি প্রস্থ গ্রহণে কার্পণ্য করেননি। তা ধুতি পাঞ্জাবির সাথে মাদ্রাজী চাদরেই হোক বা গলাবন্ধ কোটের ওপর ভাগলপুরী রামপুরী চাদরেই হোক। বাঙালিকে পোশাকে-আশাকে চেনা দায় – আদপেই সে কোন জাতীয়। তাই লেখক বলেছেন, 'মাড়ওয়ারীকে পোশাক দেখে চেনা যায়। পাঞ্জাবীকেও যায়। পার্সীদের নিজস্ব পোশাক আছে। গুজরাটী-ভাটিয়াদের আছে। নাগা-ভায়েদের আছে। কিন্তু হায় বাঙালী তোমার নাই।'[176] বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি রুচির এই বহুমাত্রিকতার মূল কারণ কি? বিষয়টি নিয়ে তলিয়ে ভাবা দরকার।

বাঙালি আসলে যে নৃগোষ্ঠী থেকে সৃষ্ট (অর্থাৎ প্রোটো-অস্ট্রালইয়েড ও মঙ্গলয়েডের মিশ্রণ), তাদের ঐতিহ্য ছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শরীরের উপরিভাগ অনাবৃত রাখা। এবং অধোবাস হিসেবেও মল্লকচ্ছ দিয়ে তারা যে কাপড় পরত তার ঝুল হাঁটুর নিচে যেত না। কিন্তু পোশাকের উপর ভিত্তি করে সভ্যতা ও পশ্চাদপদতার মানদণ্ড নির্ণয়ের সূত্রপাত হল এদেশে পশ্চিমা উপনিবেশিক শক্তিগুলি আসার ফলে। পাশ্চাত্য শ্লীলতার মানদণ্ডে মল্লকচ্ছ দেওয়া ধুতি পরিহিত বাঙালি পুরুষ 'অর্ধ-নগ্ন' ও 'বন্য' হিসেবে দৃষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই বাঙালি পুরুষের অনাবৃত শরীর সভ্যতা-বন্যতার ঔপনিবেশিক প্রতর্কে জুড়ে গেল। পরবর্তীকালে নেটিভদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে সেই 'অর্ধ-নগ্ন' দেহে ভিক্টোরীয় পোশাকি শিষ্টাচারের খেলা শুরু হল। মল্লকচ্ছের ঝুল হাঁটুর নিচে নেমে এল। সামনে লম্ব-কোঁচার সংযোজন হল। মুঘল সময়কাল থেকেই যে শ্রেণীর সাথে চাষবাস বা গায়ে-গতরে খাটুনির যত দূরত্ব ধীরে ধীরে রচিত হচ্ছিল, ততই সেই শ্রেণীর কাপড়ের ঝুল বাড়তে থাকল। ব্রিটিশ শাসনে এসে ইংরেজের কাছ থেকে জমিদারি পেয়ে বিলাস-ব্যসনে থাকা অভ্যাসে পরিণত হলে এবং পরবর্তীতে ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে সরকারি

[175] শিলাদিত্য, 'বসন-সঙ্কীর্তন', বসুধারা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭।

[176] তদেব।

কেরানি হবার বাসনা মজ্জাগত হলে -- ধুতির সামনের কোঁচাটি প্রলম্বিত হতে হতে আভিজাত্যের লক্ষণ হয়ে মাটিতে লুটোল। স্বদেশীর সময়ে বিলিতি বারো হাত ধুতি বর্জন করে চরকার ধুতি ব্যবহারের চল বাড়ার সাথে সাথে অবশ্য ধুতির ঝুল একটু কমেছিল বটে, কিন্তু স্বদেশীর পর আবার লম্বা কোঁচা ফিরে এল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী জীবনসংগ্রামে ধুতি পরার ধরণ খানিক ফ্যাশনে ও খানিক প্রয়োজনের তাগিদে 'সলওয়ারী' ধরণের হয়ে উঠেছিল।[177] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসতে আসতে সেই প্রবণতাও ফিকে হয়ে সব প্যান্টশার্টে আশ্রয় নিল। প্রাত্যহিক জীবনের ক্রমবর্ধমান দৌড়, ভিড় বাস-ট্রামে চলাফেরায় ধুতির নিচে ইন করা শার্ট বা লম্বমান কোঁচা অভিযোজনে অপারগ হল। তাই ধুতি-পাঞ্জাবির জায়গা হল এথনিক ওয়্যারের শোকেসে। যে পোশাকি এথনিসিটির জন্ম উনিশ শতকে, আধুনিকতার সাথে যুঝতে গিয়ে! সত্যিকারের পোশাকি জাতিত্ব পালন করতে গেলে বাঙালি পুরুষকে মালকোঁচা দেওয়া হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঝুলযুক্ত ধুতি আর খালি গায়ে উর্দ্ধবাস হিসেবে কেবল একটি উত্তরীয়তে ফিরে যেতে হয়। আর এই পোশাকের কথা কল্পনায় আনতে গিয়েই যে নাসিকাকুঞ্চন হয় মনের অজান্তেই, তা ব্রিটিশের আমদানি করা 'আধুনিকতা'র দৌলতে।

প্রশ্নটা যেহেতু শরীর ঢেকে সভ্যতা প্রদর্শনের, তাই স্বদেশীর কালে বিলিতি উপায়ে শরীর ঢাকার সাথে দেশী উপায়ে শরীর ঢাকার একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও, বাঙালির পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরিশীলিত মনন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শরীর-ঢাকার পোশাকি প্রস্থ থেকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছে। তাই বাঙালির দেহে পোশাকি প্রস্থ হয়ে সারা ভারত এসে মিলেছে বললে – বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। মধ্যবিত্ত উচ্চতর জীবনযাপনের একটি মানসিক সীমানায় আটকে আছে – এটা যদি বাঙালি মধ্যবিত্তকে নিয়ে মধ্যবিত্তের একটি প্রজন্মের আত্ম-মূল্যায়ণ হয়, তবে মধ্যবিত্তের পোশাকি রুচিতে ভারত এসে মিলেছে – এ বাঙালি মধ্যবিত্তকে সেই মানসিক সীমানা থেকে উঠে উদারতা্র দিকে চালিত করার একটা নির্মোহ সত্য। কিন্তু সেই সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করার মতো উদারতা মনে থাকা চাই। বাঙালি মধ্যবিত্তের বাহ্যিক উদারতার সাথে আন্তরিক উদারতার বড় ফাঁক স্বদেশীর আগেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। পুস্তকরাম ছদ্মনামে একজন তাত্ত্বিক -- অন্য সংস্কৃতির সাথে দেশীয় সংস্কৃতির মিলনের ক্ষেত্রেকে আতিথেয়তার সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ পথ চলতে গিয়ে যা'ই পথে আসুক – তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো অলীক কল্পনার মতো। উপনিবেশে বিভিন্ন সামাজিক পরিসরের সাথে এই পথ-চলাকে তিনি চার রকমে ভাগ করেছেন। প্রথমত, ঔদারিক; দ্বিতীয়ত, পৈষাকিক; তৃতীয়ত, আসবাবিক ও চতুর্থত, আত্মিক। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই চারটির মধ্যে প্রথম তিনটি বাহ্যিক ও শেষেরটি আন্তরিক। লেখকের মতে, 'আত্মিক আতিথেয়তাই সাত্ত্বিক, অন্যগুলি তামসিক বা রাজসিক।' খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরের আসবাব-পত্রে ব্যক্তির রুচির ভৌগোলিকতা

[177] "বাঙালীর পরিচ্ছদ", অচিন্ত্যেশ ঘোষ, 'একালের চোখে', (কলিকাতাঃ মিত্রালয়, আশ্বিন ১৩৬৪), পৃ ২২-২৩।

যদি ব্যক্তিকে আত্মিক বিশ্বের সব সংকীর্ণতা ভাঙতে সাহায্য করতে না পারে তবে, বাহ্যিক উদারতা দিনের শেষে মূল্যহীন।[178] এককথায় – প্রকৃত আন্তরিক উদারতা প্রাপ্তি কেবল মধ্যবিত্ত পুরুষ নিজে যে যে রুচির অনুসারী, সেই রুচি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের মধ্য দিয়েই সম্ভব। নিজের দেশ-কাল সম্বন্ধে গভীর বোধ না থাকলেও ব্যক্তির যাপনে নিজস্বতা ফুটে ওঠে না। তাই বাহ্যিক আবরণের উদারতার মধ্য দিয়ে যাপনের সূক্ষ্মতম সত্যকে পরিপুষ্ট করা যায় না। সেই উদারতা কথার কথা উদারতা হয়েই রয়ে যায়। অর্থাৎ স্থান-কালের নৈপুণ্যকে না বুঝে শুধুমাত্র অঙ্গ-সাজাবার জন্য যার যা কিছু দেখতে সুন্দর মনে হচ্ছে, এই মস্তিষ্ক-বর্জিত গ্রহণকে উদারতা বলে না।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীযামিনীকান্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের মিশ্র-রুচির প্রতি ঝোঁককে সমালোচনা করেছেন। বাঙালি পুরুষের পোশাকি শিষ্টাচারের মধ্যে ধুতির সাথে কোট পরা ধরণের নানা পরস্পর-বিরোধিতাকে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আসল কথা আমাদের ভিতরেই বিরোধ এসেছে, আমাদের ভিতরে কোনো সামঞ্জস্য নেই, তাই বাইরেও এইসব বৈপরীত্য এসে পড়েছে।' বাংলার মধ্যবিত্ত পুরুষের বস্ত্র-সংস্কারকদের দিকে নির্দেশ করে তাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা সংস্কার করছেন, তাঁরাও কেউ মান্দ্রাজী চটি নিচ্ছেন, তা মান্দ্রাজীদের লাল পাগড়ী ও চওড়া লাল পাড়ের চাদর ও ধুতির সঙ্গে মানায়; আমাদের সাদা ধুতি-চাদরের সঙ্গে তার যোগ হয় না। তেমনি এদেশের ছড়ি, ওদেশের টুপি, কারও পায়জামা কারও বা উষ্ণীব নিয়ে, পঞ্চগব্য তৈরি হচ্ছে

---

[178] সুরসিক লেখক এর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, ঔদারিক আতিথেয়তা সম্পন্ন শিববাবুর কথা তিনি বলেছেন – 'পাঁঠা আসিল, উদর আশ্রয় দিয়া তাহার সৎকার করিলেন; মুরগী আসিল, তাহাকেও আশ্রয় দিলেন। চপ, কাটলেট, রোষ্ট, যে বেশে যে জন্তুই আসুন, শিববাবুর প্রশস্ত উদার উদরে আশ্রয় পাইবেন।' অন্যদিকে পৌষাকিক আতিথেয়তা সম্পন্ন শ্যামাপদবাবুর বিষয়ে বলছেন, 'আজ টুপি, কাল ফেজ, পরশু পাগড়ি, তার পর দিন হ্যাট, যিনিই আসুন, শ্যামাপদ তাহাকেই শিরে ধারণ করেন; অঙ্গে পিরান, সাহেবী কোট, চাপকান, পাঞ্জাবী, কেহই অনাদৃত হয় না। খড়ম, তালতলার চটী, গ্রীসিয়ান স্লিপার, নাগরা জুতা, অক্সফর্ড শু বুট সকলেই শ্রীচরণে স্থান পায়।' অন্যদিকে আসবাবিক আতিথেয়তার নমুনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'গৃহলক্ষ্মীরা পিতলের পিলসুজ প্রদীপ ছাড়েন না। বাবুরা হিচকক ল্যাম্প ব্যবহার করেন। গৃহে গৃহে মাদুর, সতরঞ্চ আছে, আবার টেবিল, টিপাইও আছে, আকিয়া আছে, সোফাও আছে। কালীঘাটের পট, রবিবর্ম্মার অলিয়োগ্রাফ, রাফেলের ম্যাডোনার প্রতিলিপি, জাপানী তিরস্করণী (Screen), একই গৃহে দেখা যাইতে পারে। তাই বলি আমাদের আসবাবিক আতিথেয়তা যথেষ্ট আছে। কারণ, সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব জাতির গৃহসজ্জাকে আমরা গৃহে স্থান দি।' কিন্তু আত্মিক আতিথেয়তার বিষয়ে তিনি আমাদের সংকীর্ণতাকে তুলে ধরেছেন, 'বিদেশের, বিজাতির, ভিন্নধর্মীয় ভাব ও চিন্তাকে নিরপেক্ষভাবে আত্মার অঙ্গীভূত করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আমাদের খুব বেশী নয়। ... আমরা পাশ্চাত্য দেশের কত নিন্দা করি, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা সকল জাতির, সকল ভাষার, সকল ধর্ম্মের ভাল ভাল বহি তর্জ্জমা করাইয়া আদরের সহিত পাঠ করেন। তাহার একটা সুপরিচিত প্রমাণ ম্যাক্সমুলারের "প্রাচ্য পবিত্র পুস্তাকাবলী" (Sacred Books of the East)। আমরা অনেকেই সংস্কৃতের রত্নরাজির পরিচয় ইউরোপীয়দিগের সাহায্যে পাইয়াছি। তাঁহারা চীন, মিসর, আসীরিয়া, কালডিয়া, ভারত, মেক্সিকো, সকল দেশের ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম্ম, প্রত্নতত্ত্ব, লোকাচার, উপকথা, চিত্র, প্রস্তরমূর্ত্তি, ইমারৎ প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া কত নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার করিতেছেন। আমরা কেবল খানা, পোষাক, আসবাবে তাঁহাদের নকল করিতেছি। আত্মিক ব্যাপারে কেন তাঁহাদের অনুকরণ করি না?' দ্রষ্টব্য, 'পুস্তকরামের আড্ডা', প্রবাসী, ২য় সংখ্যা, ৩য় ভাগ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ ৫৯।

আমাদের বাংলাদেশে। ...'[179] কিন্তু স্বদেশী-বিদেশির আবর্তে ঢুকে বিদেশাগতদের যা কিছু নিজের সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে, তাকে গা-জোয়ারি করে আলাদা করতে চাওয়াকেও স্বেচ্ছাচার বলে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যামিনীকান্তের শৈল্পিক বোধের সুখ্যাতি করলেও, স্বদেশীর জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ যতই পরিণত হয়েছেন, ততই তার ঔদার্য্যের পোশাকি রূপে আন্তর্জাতিকতা এসে মিশেছে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির সৌম্য রূপটি প্রকট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পোশাকি চরিত্র: দ্বিধাবিভক্তির দিকে সমন্বয়ের বার্তা?

প্রত্যেক সমাজ এবং সভ্যতার ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কিছু মানুষেরা তাঁদের যাপন, কর্ম এবং উত্তরাধিকারসূত্রে এমনি ছাপ ফেলে যান যা সমাজ, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রের বিভাজিত বর্তমানে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। যাতে ব্যক্তিমানুষের সামাজিক পদচারণায় একাত্মতার মানবিক বোধ জাগ্রত থাকে। এবং সেই বোধ থেকেই আত্মিক উন্নতির দিতে এগিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের এযাবৎ আলোচনায় পরিধেয় হিসেবে পোশাকের সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায় বিমূর্ত হবার নানা আঙ্গিক উঠে এসেছে। কিন্তু পোশাককে সচেতনভাবে সম্মিলনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবার চেষ্টার দিকটি উহ্য রয়ে গেছে। পোশাককে দলাদলির মাধ্যম বানান মানুষ, আবার সেই পোশাককের উপর ভর করে দলাদলি ঘুচাতে এগিয়ে আসেনও মানুষই। উনিশ শতকের বাংলায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, বিলিতি শিষ্টাচারের দৌলতে একদিকে যখন যা কিছু দেশীয় বা যা কিছু পূর্বকাল থেকে লব্ধ – তার সবটুকুকেই নিচু নজরে দেখবার প্রবণতা তৈরি হচ্ছিল, তখন কিন্তু ঠাকুর পরিবারের মতো কিছু পরিবার নিজেদের পোশাকি ঐতিহ্যকে অটুট রেখেও অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের নতুন সময়ের কারিগরদের সাথে ওঠাবসা করেছেন। এবং সেই ওঠাবসা একবিংশ শতকের শুরু থেকে বাংলার জাতীয় চরিত্র বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সাথে কাটানো তাঁর বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতায় স্মৃতির ডালি সাজিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের জাতি-পরিচিতি নিয়ে তাঁর সমকালেই অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যার মূল কারন রবীন্দ্রনাথের পোশাক – পায়জামা ও ঢিলে আলখাল্লা।[180] মানুষের মনে ঠেকেছিল 'প্রবল-প্রতাপ' ইংরেজদের রাজদণ্ডতলে থেকেও যারা পূর্বেকার মোঘলী পোশাকি শিষ্টাচার ছাড়তে পারেননি, তারা মুসলিম গোত্রীয় ছাড়া আর কি হতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই মুসলমানরাই কিন্তু মধ্যযুগ থেকে হিন্দুদের প্রতিবেশী। আর ইংরেজরা আধুনিকতার ধ্বজাধারী। তাই দুশো বছরেও হিন্দু-মুসলমানের প্রতিবেশী হয়ে উঠতে

---

[179] শ্রীযামিনীকান্ত সেন, 'পরিচ্ছদ-কলা', সবুজ পত্র, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৩৪, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, পৃ ৫৮৩-৫৮৪।

[180] নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ', (কলিকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৫০), পৃ ৪৬।

পারেননি। মানুষের সংশয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও জ্ঞাত ছিলেন। তাই নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুর পরিবার একদা নবাব সরকারে প্রভাবশালী ছিলেন, তারি দৌলতে মোগলাই সাজ-সজ্জা তাঁদের ঘরে ঢুকে পড়ে। পড়েছিল আরো অনেক পরিবারেই – কিন্তু ইংরাজ আমলে তাঁরা চটপট মোগলাই কেতা বদলে বিলেতী কেতা অভ্যাস করে ফেললেন – ঠাকুররা বিলেতী শিক্ষা-সহবৎ দস্তুর মোতাবেক গ্রহণ করলেও , সাজ-সজ্জাটায় কিন্তু রক্ষণশীল রয়ে গেলেন। ... নবাগত শাসক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ঠাকুরদের মনের গভীরে কোথাও ছিল একটা প্রকাণ্ড বিরুদ্ধ ভাব, তাই তারা নূতনের বন্যায় ভেসে যান নি। একটা জায়গায় খাড়া থেকে গিয়েছিলেন – পোষাকটা আর বাহ্য অবলম্বন, কিন্তু আসল জায়গাটা ছিল তাঁদের মন। এই মন থেকেই ধুঁইয়ে উঠেছিল প্রথম স্বদেশীয়ানা, যাতে একদা আমাকেও প্রবেশ করতে হয়েছে।"[181] সেকারণেই পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের পোশাকি-রুচিতে সংমিশ্রণের একটা প্রবণতা। পরিবার থেকেই যদি মোঘলী পোশাকি শিষ্টাচারের প্রতি অবজ্ঞা বা দেশীয় শিষ্টাচারের প্রতি হেয়জ্ঞান লাভ করতেন, তাহলে হয়ত তাঁর পোশাকি রুচি বিবিধের ঐক্যমঞ্চ হত না।[182] বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলিম (এবং পূর্বের বৌদ্ধ) সংস্কৃতির যৌথ স্বতঃস্ফূর্ত ধারাটিকে উপলব্ধি করে তিনি বুঝেছিলেন, যা কিছু বিদেশি উপকরণ এদেশের জল-মাটি-বায়ু-জনজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গি মিশে গিয়ে ধারণের উপযোগী হয়ে উঠেছে, তাকেই স্বচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করা যায়। কোনো বেগ পেতে হয়না। আর যা কিছু স্থান-কাল-পাত্রের দূরত্বকে ঘুচিয়ে, ক্ষমতার দম্ভকে অতিক্রম করে প্রাত্যহিকতার সাথে মিশতে পারেনা, তাকে গ্রহণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততাও থাকে না। যা থাকে তা হল দেখানোর তাগিদ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "য়ুরোপীয় জীবনের অবিরাম গতিশীলতা আমাদের জীবনে এলে, আপনিই তার জন্যে উপকরণের বদল হবে – তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু সব কিছু অবিকৃত রেখে য়ুরোপীয় সাজ-সজ্জার কসরত করা কেন? যাদের হাতে আমরা উপেক্ষিত, তাদের কাছে আনুগত্য জ্ঞাপন করা, আর যারা আমাদের আশে-পাশের মানুষ তাদের থেকে নিজেদের আলাদা করে দেখানো ত!"[183] পাশের জনের থেকে নিজেকে আলাদা দেখানোর মধ্যে, এতকাল যাবৎ যাদের সঙ্গে নিজেদের সত্তা মিলেমিশে গেছে, সেই সত্তাকে জোর করে অস্বীকারের বৃথা চেষ্টা। নিজের সত্তার সাথে যা সম্বন্ধিত, তাকে স্বীকার না করে অস্বীকার করা একপ্রকার আত্মসংহারের

---

[181] তদেব, পৃ ৪৬-৪৭।

[182] রবীন্দ্রনাথ নিজের স্মৃতিকথাতেই ছেলেবেলায় পিতামাতাদের দ্বারা প্রতিপলিত হবার ধরণ নিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের শিশুকালে ভোগ-বিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপর তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। ... আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপর আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। তাতে কোনো দিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই।' দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮), প ১১-১২।

[183] নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ', পৃ ৪৯।

নামান্তর। সেই আত্মসংহার সমাজের মধ্যে প্রলম্বিত আকারে দেখা দেয়। যেমনটা দেশভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়েছে এবং হয়ে চলেছে।

এই সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য নিজের ইতিহাস-সমাজের অন্তর্মুখীন পাঠ, বোধ দরকার। আমাদের সমাজের মধ্যবিত্তীয় বোধ তার জন্মলগ্ন থেকেই কতটা পোশাকি ছিল, তা বোঝা যায়, নন্দগোপালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশ্নে, "মুসলমানের প্রবর্ত্তিত হাজার হাজার শব্দ বাংলা ভাষায় নিত্যকার ব্যবহারে চলছে, তাদের আনা খাদ্য-পানীয় ফল-ফুল দিব্যি জলাচরণীয় হয়েছে। তবে কি আপত্তি শুধু তাদের পোষাক সম্বন্ধে?"[184] প্রায় একই প্রশ্ন উনিশ শতকের গোঁড়ায় রাজা রামমোহন রায় সেলাই-বস্ত্র পরিধানের জন্য তাঁকে সমালোচনায় বিদ্ধ করা দেশীয় ভদ্রমহোদয়দের কাছে রেখেছিলেন। বিংশ শতকে এসে সেই একই প্রশ্ন যখন আরেকজন চিন্তাবিদের কথায় উঠে আসে, তাহলে ধরে নিতেই হয় সমাজে সূক্ষ্ম ঐক্যবিধায়ক ভাবের চাইতে স্থূল পোশাকি বিভাজনে মেতে থাকা ভাবেরই আনাগোনা বেশি। রবীন্দ্রনাথের পোশাকি রুচি স্থুল ও সূক্ষ্মের মধ্যে একটা সেতুবন্ধের চেষ্টা করেছে। তিনি যেমন মনে করতেন, "...পোষাকে শুধু উপযোগিতাটাই বড় কথা নয় – তার রুচিকরতাও লক্ষণীয়। মুসলমানী পোষাকের কতকাংশ যে সেদিক থেকেও রমনীয়, এ স্বীকার করবে আশা করি।"[185] তিনিই আবার ঢিলে-ঢালা, শ্রমসাধ্য কাজের জন্য অনুপযোগী বাঙালি সজ্জা নিয়ে বলেছেন, "আমাদের বহিঃপ্রকৃতি ও মেজাজের সঙ্গে ওর খাসা সামঞ্জস্য দেখতে পাই – যেন প্রচুর অবসর, প্রচুর আলস্যের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে জীবনকে।"[186] গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুতে, যেখানে সামান্য কাজেকর্মে মানুষের হাঁফ ওঠে – সেখানে নাতিশীতোষ্ণ বা শীতপ্রধাণ অঞ্চলের মতো আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করা হোক, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনোই অভিপ্রেত ছিল না। তাই প্রায় সারাজীবন নিজের কাজেকর্মে তিনি আজানুলম্বিত ঢিলে আলখাল্লা ও পায়জামাকে নিজের কাজের পোশাক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যার দুটিই পোশাকে তাঁর মোগলাই রুচিকে প্রতিনিধিত্ব করে। তবে উপরের ঢিলে আলখাল্লা মতন পোশাকটি মোঘলী পিরাণ থেকে তিনি নিজের মতো সংস্করন করেছিলেন। তবে জীবনসায়াহ্নে চলাচলের সুবিধার জন্য হোক বা নিজের পোশাকি দর্শনের পরিপূর্ণতাই হোক -- তিনি পোশাকে-আশাকে মাটির আরও কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৩০ এর দশকের দিকে যখন কিনা পাকিস্তান আন্দোলন এবং জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হাত ধরে সাম্প্রদায়িক পোশাকি বিভাজনের ভাষা প্রকট হচ্ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের পোশাক পরিবর্তনে সমন্বয়ের কোন বার্তাও দেওয়া হয়েছিল কিনা – তাও

[184] তদেব, পৃ ৪৮।

[185] তদেব, পৃ ৪৮।

[186] তদেব, পৃ ৪৮-৪৯।

ভাবতে হয়। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'ইদানীং চলৎশক্তির শ্লথতা হেতু পায়জামা ছেড়ে তার বদলে পরতেন একটা আধা-লুঙ্গি আধা-পেটিকোট ধরণের জিনিষ, যা ঝুলে থাকত পায়ের পাতা পর্য্যন্ত। আলখাল্লাটা হত তাঁর নিজের ফরমায়েস অনুসারে – জানুর নীচে পর্য্যন্ত ঝুল, ঢোলা হত, বোতামের নীচে ফিতে দিয়ে গলাবন্ধ করারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আমি দেখেছি তাঁকে বেশিরভাগ সময়ই কমলালেবু রঙের খদ্দর ব্যবহার করতে – মটকা বা গরদও পরতেন মাঝে মাঝে, কিন্তু বেশী না।'[187] তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ মাথায় ইরানী ফেজের মতো টুপিকেও নিজের পারিচ্ছদিক রুচির সাথে যুক্ত করেছিলেন।[188] সুধীরচন্দ্র করের মতে, এইসব পোশাকের কাপড়-চোপড় যে 'খুব বাছাই-করা সূক্ষ্ম বা দামী কিছু' ছিল তেমন নয়, বরঞ্চ এর গুণমান ছিল 'সাদাসিধে মাঝারি গোছের।'[189] তাঁর এই পারচ্ছদিক বৃত্তে বাংলা দেশের তাবৎকালের লুঙ্গি পরিহিত, নীচু নজরে দৃষ্ট মানুষরা যেমন আছেন, মধ্যবিত্তরাও তেমনি আছেন, খদ্দর রূপে কংগ্রেসী স্বাবলম্বন যেমন আছে, তেমনি সম্প্রদায়গত বিভাজনের চিহ্নও একদেহে লীন হয়েছে কমলা বর্ণে। যে বর্ণের মূল বার্তা ব্যক্তিস্বার্থের স্থূলতা থেকে উঠে সমষ্টির স্বার্থের দিকে যাত্রা।[190]

---

[187] তদেব, পৃ ৫১।

সুধীরচন্দ্র করের লেখাতেও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের লেখার অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'কবির বেশভূষার বিশেষত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদিকে নিজের রুচিকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। একটি ঢিলে পাঞ্জাবী এবং একটি দোসূতী মোটা লুঙ্গী বা পাজামা – এই ছিল তাঁর সাধারণ পরিধেয়। ... অনেক সময় দুটা পাঞ্জাবী একত্রে পরতেন; ভিতরের দিকেরটা থাকত ঘাম শুষতে।' দ্রষ্টব্য, শ্রী সুধীরচন্দ্র কর, 'কবকথা' (কলিকাতাঃ সুপ্রকাশ, ১৯৫১), পৃ ১৫; দ্রষ্টব্য, শ্রীরাণী চন্দ, 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ ১৩৫১), পৃ ৫১।

[188] রাণী চন্দ এই টুপির স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে লিখেছেন, 'গুরুদেবের টুপি ছিল নতুন ধরনের। সুতির বা ভেলভেটের বা ঘন রঙের মোটা সিল্কের টুপি পরতেন তিনি। সে টুপি অন্য কারো টুপির সঙ্গে মেলে না। একেবারে আলাদা। আকারে অনেক বড়ো, নরম। মাথায় পরলে উপরের অংশটা আপনা হতে নানান ভাঁজে নেমে পড়ত। বড়ো সুন্দর লাগত দেখতে। ... তিনি (রবীন্দ্রনাথ) অনেকবার অনেক রকম করে তৈরি করার পর এ টুপির আবিষ্কার করেছিলেন।' দ্রষ্টব্য, শ্রীরাণী চন্দ, 'গুরুদেব', (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৩৯৪), পৃ ৪৬।

[189] শ্রী সুধীরচন্দ্র কর, 'কবি-কথা', (কলিকাতাঃ সুপ্রকাশ, ১৯৫১), পৃ ১৫।

[190] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, গান্ধীজির সাথে তাঁর পিতার বড়ই আন্তরিক সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তাঁদের পোশাকি অস্তিত্বের দিকে চোখ বুলালে অনেকের মনে হতে পারে, 'কোথায় কটিবাসপরিহিত সন্ন্যাসী, আর কোথায় রঙিন জোব্বায় সুসজ্জিত কবি।' যেন আকাশপাতাল তফাত। রথীন্দ্রনাথ এই দুই পোশাকি দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, 'গান্ধিজির কটিবাস ছিল অন্নহীন বস্ত্রহীন এই দরিদ্র দেশের প্রতীক। এই প্রতীকের যে একটি গভীর তাৎপর্য ছিল তাতে সংশয় নেই। কিন্তু তা বলে বাবার সুরুচিসম্মত পরিচ্ছদের কোনো তাৎপর্য ছিল না এমন নয়।' তাঁর মতে, 'গান্ধিজি নিজের জীবনযাপনে যে আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন, তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে মাত্রাতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ভাব এসে গেছে। এটা স্বয়ং গান্ধিজির অভিপ্রেত ছিল কি না জানি না। তবে এমনটি ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' রথীন্দ্রনাথ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সব অভাব-অনটনের মধ্যেও যতটা সম্ভব রুচিসম্মত বসবাসের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'পোশাকে পরিচ্ছদে বাবার বিলাসী রুচি নিয়ে অনেকে বক্রোক্তি করেছেন, ... কিন্তু একটা কথা তাঁদের জানা ছিল না, বাবার পোশাক-পরিচ্ছদ যে-সব কাপড়ে তৈরি হত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দাম বেশি ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা গরিমা ছিল যে নিতান্ত শাদাসিধে পোসাকেও তাঁকে দেখাত রাজার মতো।' তবু পোশাকে-পরিচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে রথীন্দ্রনাথের

রবীন্দ্রনাথের শীতের পরিচ্ছদেও পোশাকি রুচির একটা সমন্বিত রূপ চোখে পড়ে। নন্দগোপাল লিখেছেন, তিনি 'শীতকালে সময় সময় কালো বা ছাই রঙের একটা গরম হোজ পরতেন – অনেকটা বিলেতী গ্রেট কোট আর ভারতীয় সালোয়ারের মিশেলে তৈরি একটা নূতন ধরণের জামা। তার উপর সাল নিতেন একখানা।'[191] অর্থাৎ যা সমকালের নিরিখে এটিকেট, সেই এটিকেটের অচলায়তন ভেঙ্গে তিনি নিজের কল্যাণময় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সবকিছু নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং আরামের পরিসর বজায় রাখতে গিয়েও তাঁর আত্মিক শক্তিকে ভেসে যেতে দেননি। সবকিছুকে সবকিছুর জায়গায় সাজিয়ে তিনি নিজের কর্মসাধনায় আত্মমগ্ন থেকেছেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখছেন, '... শীত গ্রীষ্ম কোন সময়ই আবহাওয়ার আতিশয্য তাঁকে অভিভূত করতে দেখিনি। প্রচণ্ড গরমেও দেখেছি অবলীলায় পুরু খদ্দর পরে গভীর অভিনিবেশ সহকারে লেখা-পড়া করছেন – আবার দারুণ শীতেও সূতি কাপড়ে বেশ আছেন – এ দৃশ্য হরদম দেখেছি।'[192] ঠাট্টা করে হলেও নন্দগোপালের সাথে এ বিষয়ে কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের সত্য অবস্থাটিকে তুলে ধরেছিলেন, "শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ বোধ স্বস্তিত হয়েছে। বলতে পারো কূটস্থ।"[193] ভোগ-বিলাসী বস্তুকেন্দ্রিকতায় আটকে থাকা মধ্যবিত্তীয় জীবনচক্রে বস্তুময় আতিশয্যে বাস করেও বস্তুধীন না হয়ে কিভাবে বাঁচা যায় --- এ সেই শিক্ষার সামান্য এক ঝলক মাত্র।[194] আর বস্তুর অধীনতা থেকে মুক্তি কেবলমাত্র বস্তুর সাথে

অভিমত, 'বাবা এরকম (অর্থাৎ গান্ধীজির মতন) বৈরাগ্যসাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।' ভারতে আধুনিক যুগ প্রবর্তনের সূচনাতে রাজা রামমোহনের ভাবটিও অনুরূপ ছিল। জীবনে বিলাস না থাকলে যে সেই বিলাস-বাসনাকে অতিক্রম করা যায় না, তা তিনও বুঝতেন। রবীন্দ্রনাথও সেটি বুঝেছেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাবা হয়তো ভাবতেন – আমাদের গরিব দেশে, যেখানে অধিকাংশ লোক বঞ্চিত ও বুভুক্ষিত, সেখানে ত্যাগের আদর্শ কৃত্রিম উপায়ে তুলে ধরার কোনো অর্থ হয় না। বরঞ্চ উচিত, তাবৎ সভ্যজগৎ জীবনধারণের ক্ষেত্রে যা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে , সেই-সব দিকে মানুষের রুচিকে প্রবর্ত্তিত করা।' দ্রষ্টব্য, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃস্মৃতি', (কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭),পৃ ২২৪; দ্রষ্টব্য, শ্রীরাণী চন্দ, *গুরুদেব*, পৃ ৪৬।

191 তদেব।

192 তদেব।

193 তদেব, পৃ ৫১-৫২।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাতেও দেখতে পাই, 'তিনি তখন 'পুনশ্চে'র উত্তর দিকে বারান্দায় বসে "বিজ্ঞান পরিচয়" বইখানি লিখছিলেন। ঘরের সমস্ত জানালা খোলা। গায়ে রয়েছে একটা ফিকে, গৈরিক রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির গলার কাছে দু-একটি বোতাম খোলা। ঘরে না-ছিল বিজলী পাখা, না বা খসখস। আমি অবাক হয়ে গেলুম। পরিপূর্ণ বার্ধক্যে এমন ভাবে তাঁকে কাজ করতে দেখব, আশা করিনি। মনে হল, এ ত প্রায় ধর্ম-সাধকের কৃচ্ছ্র-সাধন!' দ্রষ্টব্য, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ', (কোন্নগড়ঃ শ্রীনাথ নিবাস, জানুয়ারী ১৯৩৯), পৃ ৯৬।

194 কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কর্মে আত্মমগ্নতা বিষয়ে লিখেছেন, 'লেখার তাগিদ যখন আসে, কোন আড়ম্বরেরই দরকার হয় না। না রেশমী পোশাক, না হাল আমলের কোচকেদারা, না-বা ঝকঝকে, তকতকে দামী আসবাব সজ্জা।' দ্রষ্টব্য, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ', পৃ ৯৬।

মানুষের স্বাধীন সম্পর্ক দ্বারাই লাভ হতে পারে। গান্ধিজির খাদি-খদ্দর পরিধানের নীতি সেই স্বাধীনতায় আগল পরিয়েছিল, তাই খাদি-খদ্দর হয়েছিল কংগ্রেসীদের 'মীটিংকা কাপড়া', নিত্য ব্যবহার্য কাপড়ে পরিণত হতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ খাদি-খদ্দরের এই নিয়মে গান্ধিজির সাথে সহমত ছিলেন না। কারন মানুষের রুচির স্তর প্রসারিত না হলে, খাদি-খদ্দর পরার নিয়মকে বোঝার মতন মনে হতে বাধ্য। তার ঝোঁক থাকবে সর্বদা অন্য কাপড়ের দিকে। সব রকম কাপড় পরার আশ মিটে গিয়ে কোনো নির্দিষ্ট কাপড়ে স্থিত হওয়ার মধ্য দিয়েই কেবল মানুষের মন ও কাপড়ে একাত্মতা তৈরি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক যাপনের সাথে কিন্তু খাদি-খদ্দর একাত্ম হয়েছিল।[195] তবে সেই একাত্মতায় কাপড় তাঁর যাপনকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব কাপুড়ে ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেনি। তাকে ছাড়িয়ে গেছে। সমকালীন এবং তাঁর পরবর্তীকালের মধ্যবিত্তীয় যাপনে কাপুড়ে হওয়ার পাল্লা যেখানে ভারী ছিল।[196] অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজস্বতা-বিমুখ মধ্যবিত্তের কাছে সেই কাপুড়ে যাপনের আদর্শ এবং 'জিনিয়াসনেসে'র দৃশ্যমান ভিত্তি হয়ে উঠেছেন। আত্মসমালোচনা-প্রিয় মধ্যবিত্ত তা নিয়ে ব্যঙ্গও করেছেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের একদম শেষে তেমনি এক রচনায় চিত্রশিল্পী হতে চাওয়া বন্ধুকে আরেক বন্ধু উপদেশ দিয়েছে, 'তোমার ঢিলে পাঞ্জাবি আর পায়জামাকে বর্জন করতে হবে। গোড়ালিচুম্বিত গলাবদ্ধ জুব্বা দরকার। খাস লক্ষ্ণৌ এর সুরমা পরা দরজীকে বলে এসেছি, আজকালের মধ্যেই মাপ নেবার জন্য এসে যাবে। আঁট-সাঁট ছাঁট দেখে ঘাবড়ো না, ওই হল এদেশে আধুনিক জাত-জিনিয়াসের ফ্যাশন। প্রথম দর্শনেই লোকে বলে দেবে পয়লা-নম্বর চলছে ...'[197] এখানে নিজস্বতাটা হল রবীন্দ্রনাথের ঢিলে জোব্বাকে আঁট-সাঁট গড়ন দেওয়ার মধ্যে। তাই এই আঁটসাঁট জোব্বা পরে চিত্রশিল্পী হতে চাওয়া বন্ধু যখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে – তা পরাণুকরনপ্রিয় মধ্যবিত্তের মানবিক উর্দ্ধগতি প্রাপ্তির পথে বাধার রূপক হয়ে ধরা দেবে।

এতক্ষণ ধরে যে পোশাকি রবীন্দ্রনাথ দেখলাম, সেটা প্রাত্যহিক যাপনের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া রূপ। সেই তৈরি হয়ে ওঠার প্রতিটি পদক্ষেপে ভুল-ভ্রান্তির সাথে সাথে ব্যর্থতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তবু যত্ন বা তবু প্রেমে সেই ব্যর্থতা মিশে গেছে। বাহিরকে জেনে অন্তরে সেই জানার সংশ্লেষ

---

195 সুধীরচন্দ্র কর, 'কবিকথা', পৃ ১৫।

196 প্রমথনাথ বিশী এর সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। 'প্রসাধণের রহস্য এই যে, বেশভূষা যেন মানুষকে ছাপাইয়া না যায়। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটে, পোশাকটাই লক্ষ্য হইয়া উঠে, মানুষটাকে আর চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যত সুন্দর পোশাকই পরুন-না কেন, তিনিই সর্বদা লক্ষ্যগোচর থাকিতেন। একস্থানে তিনি পোশাককে 'দেহগানের তান' বলিয়াছেন। তাঁহার গানে কথাকে ছাপাইয়া তান যেমন উৎকট হইয়া উঠিতে পায় না তেমনি এই 'দেহগানের তান' তাঁহার মূর্তির চেয়ে কখনো প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।' দ্রষ্টব্য, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী, আষাঢ ১৩৫১), পৃ ১২৯। দ্রষ্টব্য, মৈত্রেয়ী দেবী, 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ', (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৫২), পৃ ৬১-৬২।

197 শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, 'জিনিয়াস', শনিবারের চিঠি, ৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫৫, পৃ ২০।

ঘটলে, সেই জানা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণে আবার প্রস্ফুটিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পোশাকি চরিত্রে সমন্বয়ের আদর্শও সেইরূপ প্রস্ফুটন। বিশ্বময় উগ্র জাতীয়তাবাদের ধংসাত্মক রূপ একটি মহাযুদ্ধে দেখেছেন, এবং সেই যুদ্ধ জাতীয়তার বিষফল কিভাবে উপ্ত করেছে – তাও দেখেছেন। সেখান থেকে তাঁর লেখা-পত্রের ভাবে, রাষ্ট্রচিন্তার ভাবে, আধ্যাত্মিক ভাবে, সাজ-পোশাকের ভাবে সমন্বয়ের আদর্শ প্রবেশ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুরু থেকেই তিনি সমন্বয়বাদী ছিলেন না। স্বদেশীর রবীন্দ্রনাথ ঘোরতর জাতীয়তাবাদী। ধুতি-পিরাণ-শাল-নাগরাইতে সজ্জিত ঘোর হিন্দু পোশাকি শিষ্টাচার-অনুবর্তী বাঙালি। তার মানে পরবর্তীতে তিনি এই পোশাক পরেননি তেমন নয়। বিশেষ বিশেষ দিনে তিনি দেশীয় পোশাকে সজ্জিত হতেন। সে বিষয়ে নন্দগোপাল আলোকপাত করেছেন। -- ‘২৫শে বৈশাখের জন্মতিথি উপলক্ষে যখন তিনি আম্রকুঞ্জে আসতেন, তখন কোঁচানো গরদের ধুতি ও গিলে-করা পাঞ্জাবী পরে আসতেন, গলায় নিতেন ব্যাটিকের কাজ করা ধোয়া উড়ানি – পায়ে পরতেন কটকি চটি, অথবা ফুলদার নাগরা।’ ৭ই পৌষের উৎসবে মন্দিরে সারমন দিতে যাওয়ার সময়ও তিনি এই পোশাকেই যেতেন।[198] কিন্তু স্বদেশীর কালে তাঁর পোশাকি

---

[198] তদেব, পৃ ৫০।

সুধীররঞ্জন দাস তাঁর স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক পোশাক নিয়ে লিখছেন, ‘ভোলাদাদা গিয়েই তাঁকে প্রণাম করলেন, দেখাদেখি আমিও করে ফেললাম। ‘আরে এসো, এসো’ বলে হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি আমাদের পাশের দুটো চেয়ারে বসতে বললেন। এইবার তাঁর দিকে তাকালাম। বুঝলাম ইনিই রবীন্দ্রনাথ, এঁরই স্কুলে আমি পড়তে এসেছি। দেখলাম বেশ লম্বা, মাঝবয়সী লোক, ধবধবে রঙ। পরনে সাদা থানের ধুতি এবং তার উপরে সাধারণ লংক্লথের পাঞ্জাবি। ঢোলা হাতাদুটোর মধ্যে বলিষ্ঠ বাহুদুটির খানিকটা দেখা যাচ্ছিল ... পায়ে ঠনঠনের বিদ্যাসাগরী লাল চটি। ... নাকে গোল স্প্রিং দেওয়া চশমা, গলায় জড়ানো কালো ফিতের সঙ্গে বাঁধা ...’ দ্রষ্টব্য, শ্রীসুধীররঞ্জন দাস, ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’, (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আশ্বিন ১৩৬৬), পৃ ২২।

সুধীরচন্দ্র কর রবীন্দ্রনাথের পোশাকে ঋতুক্রমিক রঙবৈচিত্র্য বিষয়ে লিখেছেন, ‘সাজে রঙের বাহার লাগত ঋতু-উৎসবগুলিতে। বর্ষায় কালো বা লাল, শরতে সোনালি, বসন্তে বাসন্তী রং-এ চোখ ঝলসাত রেশমী উত্তরীয়। ... শেষদিকে একবার দোলের আসরে ভুলে পরে চলে গেছেন কালো আলখাল্লা। চাকররা যা হাতে দিয়েছে, তাই পরে ফেলেছেন, তাড়াতাড়িতে অত খেয়াল করেননি। উৎসবে গিয়ে কিন্তু রঙের রুচি নিয়ে মেয়েদের হাসিঠাট্টার মুখে পড়লেন।’ সামনাসামনি এই হাসিঠাট্টার জবাব দিতে না পারলেও, এর জবাব দিয়েছিলেন ‘নবজাতক’ কাব্যের ‘জবাবদিহি’ কবিতায়। দ্রষ্টব্য, সুধীরচন্দ্র কর, ‘কবিকথা’, পৃ ১৬।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় বসন্তোৎসবে রবীন্দ্রনাথের বেশের বর্ণনা করেছেন, ‘তাঁর অঙ্গে ছিল বাসন্তী রঙের দামী রেশমী ধুতি আর পাঞ্জাবি। মাথার উপরকার সাদা চুলগুলি পরিপাটী করে আঁচড়ানো। চোখে মুখে খুশির অপূর্ব দীপ্তি। যেন উৎসবের আনন্দ-ভরা তাঁর মন দেহের অঙ্গে অঙ্গে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। ...’ দ্রষ্টব্য, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, ‘মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, (কোন্নগড়ঃ শ্রীনাথ নিবাস, জানুয়ারী ১৯৩৯), পৃ ৯৯।

রাণী চন্দ লিখেছেন, ‘নানা রঙের জোব্বা ছিল গুরুদেবের। কালো ঘননীল খয়েরী বাদামী কমলা গেরুয়া বাসন্তী মেঘ-ছাই --- সিল্কের সুতোর। যখন যেটি পরতেন, মনে হত এইটিই যেন বেশি মানাল তাঁকে।’ দ্রষ্টব্য, শ্রীরাণী চন্দ, ‘গুরুদেব’, পৃ ৪৭।

তবে জীবনের একদম শেষ পর্যায়ে রোগশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথের পোশাকে সাদা রঙের প্রাধান্যই ছিল বেশি। তাঁর কাছে সাদার মাহাত্ম্য কি ছিল, সে বিষয়ে তিনি রাণী চন্দকে বলেছেন, ‘গেরুয়া রং সন্ন্যাসীর সাজ, তা আমায় মানাবে

চরিত্রে জাতীয়তাবাদের ফুটন্ত রূপটি বিদ্যামান। জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ স্বরূপ উপলব্ধি করে যেটা ধীরে ধীরে নিজের সৌম্য রূপে প্রকট হয়েছিল।

উপসংহার

স্বদেশি থেকে স্বদেশির পর পর্যন্ত পোশাকি জাতীয়তার বিস্তার এবং তার সাম্প্রদায়িক চরিত্রের স্বরূপে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের শ্রেণিচেতনার একমাত্রিক রূপটি প্রকট হয়, কিন্তু সেই একমাত্রিকতা বা সমাজের বহু'র অপরায়ন হল ঔপনিবেশিকতার রাজনীতির ফসল। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে উপনিবেশবাদীদের 'ডিভাইড এণ্ড রুল'এর ফসল। যার মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী শাসনতন্ত্রের যা কিছু নিজেদের সামাজিক দেহের সাথে সংযুক্ত, তাকে অশিষ্টাচারের লক্ষণ হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা যে স্বাদেশিকতার জন্ম দিয়েছিল – তা একমাত্রিক স্বাদেশিকতা। কিন্তু শতকের পর শতক জুড়ে এদেশীয় জল-হাওয়ার সাথে মিশে যাওয়া সকল বিজাতীয় উপকরণকে হয়ত সচেতনভাবে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু অবচেতনে তা সত্তাকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে থাকে। আর এই সচেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্বে যা বাড়ে তা হল নিজের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উদ্বেগ। যা কখনো দাঙ্গার স্বরূপে উদগাটিত হয়, কখনো বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি নিস্পৃহার রূপে প্রকট হয় । কিন্তু সমাজ দেহে এমন ব্যক্তিত্বরাও জন্ম নেন, যাঁরা এসবের ক্ষয়কারী রূপকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করে সমন্বয়ের চেষ্টায় ব্রতী হন, উদারতায় ব্রতী হন। মধ্যবিত্ততার পোশাকি আগল থেকে একটি শ্রেণিকে তুলে ধরে বাস্তবমুখীন ও সর্বজনীন জীবনবোধের বিস্তারে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় বৈকি!

কেন। আমি তো সন্ন্যাসী নই। সাদা রং হচ্ছে শুদ্ধ, পবিত্র। তাই সাদাই আজকাল ভালো লাগে বেশি। ...' দ্রষ্টব্য, শ্রীরাণী চন্দ, *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*, পৃ ৫৫; দ্রষ্টব্য, লীলা মজুমদার, 'এই যা দেখা', (কলিকাতাঃ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৬৩), পৃ ৩৪।

উপসংহার

পাশ্চাত্য বাজার, পাশ্চাত্য শিক্ষার সমীকরণে যে রুচির পরিসর গড়ে ওঠে, তাকে উপনিবেশের বাজার ও সাম্রাজ্য রক্ষার হাতিয়ার ভাবলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সেই রুচি-নির্ভর মধ্যবিত্ততাকে সংগঠিত শোষণযন্ত্র চালনার বাসনা থেকে উদ্‌ভুত ভাবতে হয়। সামাজিকতার দৃশ্যমান স্তরে যা বিভাজন ও স্বাতন্ত্র্যের নতুন বীজ উপ্ত করেছিল। এই বিভাজনের মনন উপনিবেশিক সমাজের উর্দ্ধস্তর থেকে নিম্নস্তরে প্রবাহিত হয়। সমাজের উচ্চকোটির স্বঘোষিত রুচিশীলদের বাহ্যিক রুচি-বিস্তার সবসময় সমাজের নিম্নকোটির উপর অথবা বৃহত্তর ক্ষেত্রে উচ্চকোটির বিচারে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশ বা গোষ্ঠীর উপর সামগ্রিক শোষণযন্ত্রের উপর নির্ভর করে। গোপাল হালদার খুব সুচারুভাবে আমাদের তা বুঝিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'নেটিবদের দেশ টাকা না যোগালে কোনো ভারতত্যাগী ভারতবাসী বা ভারতগ্রাসী ইংরেজের পক্ষেও, 'ওদের দেশে' থাকা চলে না— না হলে সে দেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম। 'ওদের দেশে' যারা খেটে খেয়ে সামান্যভাবে থাকে তাদের আবার 'জীবনমান' কি? – তা জীবনই নয়।'[1] অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভোগবিলাসের যে স্থূলচিত্র দেখে এদেশের নব্যশিক্ষিতরা উপনিবেশিকদের নিজেদের 'প্রভু' ভেবে দাম্ভিক হয়ে উঠছিলেন, সেই প্রভুদের বাহ্যিক চাকচিক্যের পশ্চাতে ছিল শোষণ। আবার সেই প্রভুদের জীবনমানকে আত্তীকরণ করতে গিয়ে, উপনিবেশিক শিক্ষা ও অর্থব্যবস্থার দাসরা যে জীবনমানে নিজেদের সামিল করতে তৎপর হন, সেটাও উপনিবেশিক রুচির চাকচিক্যে ইন্ধন দেয়। অনেকে একে শরীরের সূক্ষ্মত্ব থেকে স্থূলত্বে স্থিতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যেমন যামিনীকান্ত সেন উপনিবেশজাত মধ্যবিত্তদের পোশাকি নান্দনিকতায় অসামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'সুইডেনবর্গ এককালে বলেছিলেন যে, মানুষের দেহের ভিতর ভুবনের প্রতিমা রয়েছে, যেমন এদেশের বৈষ্ণব-তান্ত্রিকরা দেহের ভিতর দেহাতীতের প্রকাশ উপলব্ধি করেন, এবং একালের নব্য শিল্পীরা মানুষের দেহ-রচনায় গতি ও স্থিতির সকল ছন্দ খুঁজে পান। এমনি করে মানুষের শরীরকে একটা বড় দিক থেকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে, এবং তাতে করে অসীমের সঙ্গে সৌন্দর্য্যগত এমনি একটি মনোহর আদিম বৃত্তির প্রকাশ-লীলা বাইরে দেখতে মন সত্যই ব্যাকুল হয়ে ওঠে।'[2] সেই গভীরতা থেকে স্খলিত হয়ে মন যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক নির্মিতির দেখনদারিত্বে স্থিত হয় তখনই মানুষের সামাজিক দেহ বিভ্রমের জন্ম দেয়। সে এমনি বিভ্রম যে, সামাজিক হয়েও দেহ তখন নিজের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যকে দেহের উপর ঝুলিয়ে রাখতে সদা-

---

[1] গোপাল হালদার, 'রূপনারায়ণের তীরে, দ্বিতীয় খণ্ড, যৌবনের রাজটীকা', (কলিকাতাঃ পুঁথিপত্র, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ১১।

[2] শ্রীযামিনীকান্ত সেন, 'পরিচ্ছদ-কলা', সবুজ পত্র, ১০ম বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৫৭৫।

সচেষ্ট। নিজের কাঙ্ক্ষিত সামাজিকতায় চলনসই হয়ে উঠতে সদা-ব্যস্ত। গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য-এর ভাষায়, 'উর্বশী, মিনার্ভা, শকুন্তলা, তিলোত্তমারা কিছু খই-মুড়কির মতো ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যান না, কোনো কালেই না। তাই পোশাকে-পরিচ্ছদে সেজেগুজে যতটা পারা যায়, নজরসই হওয়ার সদর রাস্তাটাই বেশিরভাগ মানুষকে নিতে হয়। কথায় বলে প্রথমে দর্শনধারী হওয়া চাই, তার পরে আসছে গুণের কথা। মাকাল, রাঙামূলো – এসব উপমার পেছনে প্রতারিত হওয়ার বেদনাই কি বড় নয়? রূপের মোহে ভ্রান্ত হওয়ার পর যখন গুণের ঘরে শূন্যকুম্ভ জুটলো, তখনই না মোহমুদ্গরের চোট খাওয়া অনুভূতি, ওই ধরণের খেদ-প্রবাদ জন্ম দিয়েছে। তা হোক, নয়ন যতদিন থাকবে, নয়ন ভুলানোর আয়ুও তার চেয়ে আগে ঘুচবে না। সেই কারণে সাজ-সজ্জার কদর কোনোকালে, কোনো সমাজেই কমতি ছিল না, নেই বা হতে পারে না।'[3]

এই দেখনদারিত্বে হড়কে যাওয়ার প্রবণতাই আসলে মধ্যবিত্ততার সামাজিক বলয় তৈরি করতে থাকে। যে বলয়ের মানুষজন নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে কোনোমতেই তুষ্ট নন। তাই যুগের স্বাতন্ত্র্য সূচক পোশাকি চরিত্র যতই দৃষ্টকটু হোক – তা গ্রহন করতে তাদের দ্বিধা থাকে না। কারণ যুগের হাওয়াকে অস্বীকার করার মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জোর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বে আকীর্ণ মধ্যবিত্ততায় তেমনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। যার দরুণ নিজ পরিসরের চাইতে তথাকথিত উন্নত পরিসরের অনুকরণে একটা আস্ত জীবন কেটে যায়। তাই ব্রিটিশ আমলে যে মধ্যবিত্ততার সীমানায় আটকে পড়াদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন ছিল সাদা-সাহেবদের পোশাককে অনুকরণ করা, সেই মধ্যবিত্তই ব্রিটিশ পরবর্তীকালে হিন্দি সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের দেখে (সবসময় সিনেমায় নয়, বরং সিনেমা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, বা পত্র-পত্রিকায় তাঁদের ছবি দেখে) নিজেদের পোশকের কাট-ছাটে পরিবর্তন করে। এতে দেখতে কতটা সুশ্রী লাগছে, তার তুলনায় যুগের হাওয়াটাই বড় হয়ে ধরা দেয়। বিশ শতকের ষাটের দশকে বাঙালি পুরুষের পোশাকি ফ্যাশন নিয়ে গৌরিশঙ্করের অভিমত, ছেলেদের কাপুড়ে ফ্যাশনে 'সব সরু। ট্রাউজার আর গায়ের চামড়ার মাঝখানে হাওয়াটুকুও ঢোকার সুযোগ না পায় এমন কাটের প্যান্ট, পায়ের জুতোও অনুরূপ ছুঁচলো, হাতে ঘড়ির ব্যাণ্ড নয়, ব্যান্ডের মতো অলঙ্কার, তাতে চেনযুক্ত লকেট, গায়ের জামার রং যতো পারা যায় ডগডগে করা। চোখে পড়ার এ এক বিচিত্র পন্থা। প্রথম প্রথম সত্যি চোখে কদর্য লাগতো।'[4] এমনকি দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অর্থাৎ পুলিশদের মধ্যেও এই চড়া ফ্যাশন সন্দেহের উদ্রেগ করেছিল। যা কিছু শীলনের লোকপ্রিয় বা সর্বসম্মত আদর্শকে লঙঘন করে, তা সামাজিক ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের চোখে অস্বাভাবিক লাগা স্বাভাবিক। আর সে কারণেই তা সন্দেহ-দ্যোতকও। লেখকের ভাষায়, 'এইসব উঠতি যুবকদের ওপর পুলিশও ক্ষেপে গিয়েছিল। ড্রেন-পাইপ প্যান্ট দেখলেই গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত।

---

[3] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, 'বিউটিলিটি', অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৩, পৃ ৬০১।

[4] তদেব।

কিন্তু তাতে দেখা গেল যে, আসলে ওই ধরণের সাজ যারা করে, তারা সবাই কিছু 'রোড সাইড রোমিও' নয়। অত্যন্ত সরল, নিরপরাধ তাদের মধ্যে বিস্তর। ফিল্ম স্টারের অনুকরণ ছাড়া বাড়তি দোষ তাদের কিছু ছিল না।' কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পোশাকের ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতটা কমে যায়। কারণ নতুন ফ্যাশন গা-সওয়া হয়ে যায়। তাই লেখক বলছেন একসময়কার গা-জ্বালা ধরানো ফ্যাশন 'আজকাল [উক্ত ড্রেন-পাইপ প্যান্টের ফ্যাশন] আমাদের চোখে সয়ে গেছে।'[5] কিন্তু লেখকের খেদ 'এই অর্বাচীন পোশাক বাংলাদেশের কালচারকে ষোল আনা বাতিল করেছে। কেমন বলি – শহরে একটা বিয়ে বাড়িতে বর সাজছে, তেমনি বাড়ির ভাইরাও সাজছে বরযাত্রী যাবে বলে। সমস্যা বেধেছে ধুতি পরা নিয়ে। বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ধুতি কি করে পরতে হয় তা শেখেনি। পা-জামা, নয় ট্রাউজার এই দিয়েই দিব্যি চলেছে। এখনও ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কর্তব্য এই বোধটুকু ঘোচেনি বলেই সমস্যা। আস্তে আস্তে হয়ত ব্যাঙাচির লেজের মতোই ওটা খসে যাবে।' কারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পাল্টে যাওয়া সময়ের সাথে অভিযোজনে অক্ষম। তাঁর ভাষায়, 'বসে বসে আক্ষেপ করে লাভ নেই। মানুষের কাজের ধরন, যানবাহনের সুবিধা-সুযোগ ইত্যাদি বিবিধ কারণেই আজ ধুতি, পাঞ্জাবী, উড়ুনি, বিদ্যাসাগরী চটি প্রায় নির্বাসিত।' বাঙালি পুরুষের ঢিলেঢালা পোশাকে তাদের ছিপছিপে, পেশিহীন গড়ন ঢাকা যেত, কিন্তু পাশ্চাত্য পরিশীলন বাঙালি পোশাকি রুচিতে পরিবর্তন আনলেও, বাঙালিকে কতটা পেশি-বহুল পৌরুষের দিকে চালিত করেছিল – সে বিষয়ে সংশয় থেকেই গেছে তাঁর। তাই তাঁর বক্তব্য, '... যে পোশাকের খোলস পুরুষেরা গ্রহণ করেছে, তাতে স্বাস্থ্যের দৈন্যটা আগের চেয়েও উৎকটভাবে প্রকাশ পায়। পেশল চেহারায় এ পোশাক পরলে অত খারাপ দেখায় না – এইটুকু স্মরণ রেখে যদি স্বাস্থ্যচর্চার দিকে ছেলেরা ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তাঁদের নয়া পোশাকেও বাঁকাচোরা দেখাবে না। কিন্তু শরীরের জন্য সময় নষ্টের চেয়ে অনেকে একাঙ্কিকার মহলা দেওয়াই তারা পছন্দ করে। কিম্বা খেলাধূলোর মেহনৎ বাদ দিয়ে স্পোর্টস-জগৎ নিয়ে তর্কের তুফান তোলা।'[6] পাশ্চাত্য পোশাকি শিষ্টাচারের সাথে সাথে এই একবিংশ শতকে পেশি-বহুল পৌরুষ প্রদর্শনের যে সাধন, তাও যে একদিনে হয়নি, তা গৌরীশঙ্করের মতামতকে সময়ানুক্রমে বিচার করলে বোঝা যায়।

সুশীলকুমার দেব বাংলা দেশে পুরুষের পোশাক বিভ্রাটের কারণ হিসেবে আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে বেশ বিন্যাসে অনীহাকে তুলে ধরেছিলেন। বিশ শতকের মধ্যভাগে তিনি লিখেছিলেন, যার যতটা পোশাক পরার সামর্থ্য, তার ততটাই পরা উচিত।[7] তাঁর মতে, পোশাকি পরিশীলন মানে

---

5 তদেব।

6 তদেব।

7 শ্রীসুশীলকুমার দেব, বাঙ্গালী জাতির পোষাক, বিচিত্রা পত্রিকা, জৈষ্ঠ্য ১৩৪১, ৬৮১।

যুগের হাওয়ায় ভেসে যাওয়া নয়, বরং স্ব স্ব সামাজিক স্তরের উপযোগিতানুযায়ী পরিচ্ছন্ন বেশ-বিন্যাসই হল আসল পরিশীলন। বিশ শতকের মধ্যভাগে আরও বিভিন্ন নাগরিক-রচনায় আধুনিক পরিশীলনের প্রতি সমালোচনা দেখে একে পোশাকি পরিশীলনের সংজ্ঞার্থে পরিবর্তন ঘটানোর গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবেই বোধ হয়। কারণ নিজেদের দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে বিদেশি মিলের তৈরি বস্ত্রের হাতে উৎসন্ন হতে দিয়ে এবং বিলিতি আধুনিকতা ও সভ্যতার দান পোশাকি সম্ভ্রমের অনুশীলন করতে গিয়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালি মধ্যবিত্ততার পরিসরকে এক বিরাট বস্ত্র-সংকটজাত লজ্জার ঢেউ সামাল দিতে হয়েছে। আধুনিক লজ্জার বিকট রূপকে সামাল দিতেই হয়ত সংশোধনবাদীরা পরিশীলনের বোধে পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন!

উপাদান

ক. প্রাথমিক উপাদান:

ক.১: সরকারি মহাফেজখানা

Financial Department, Commerce Branch, June 1870, West Bengal State Archive (WBSA), Kolkata.

Financial Department, Commerce Branch, March 1869, WBSA, Kolkata.

Foreign Department Miscellaneous Branch, No.131, National Archive of India (NAI), New Delhi.

Foreign Department General Branch, September 1867, NAI, New Delhi.

Foreign Department General Branch, March 1868, NAI, New Delhi.

Finance and Commerce Department, Statistics and Commerce Customs Branch, August 1893, NAI, New Delhi.

Financial Department, Separate Revenue Customs Branch, September 1862, WBSA, Kolkata.

Financial Department, Separate Revenue Customs Branch, October 1895, WBSA, Kolkata.

General Proceedings, B, June 1870, WBSA, Kolkata.

General Department, Miscellaneous Branch, B, February 1892, WBSA, Kolkata.

Home Department, Calcutta, 1810, NAI, New Delhi.

Home Department, Public Branch, January 1795, NAI, New Delhi.

Home Department, Political Branch, 1910, NAI, New Delhi.

Macaulay's Minute on Education. 1835. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html

Municipality Department, January 1900, WBSA, Kolkata.

Old Office Records, Hyderabad Residency, 1826, NAI, New Delhi.

Political Department, January, February 1880, WBSA, Kolkata.

President's Secretariat Department, November 1911, NAI, New Delhi.

Proceeding B, November 1881, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, 1879, WBSA, Kolkata.

Revenue Deapartment, Land Revenue Branch, December 1867, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Land Revenue Branch, July 1861, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Land Revenue Branch, May, June, July, August, 1862, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Land Revenue Branch, October 1863, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Land Revenue Branch, December 1863, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Land Revenue Branch, March, April 1864, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Land Revenue Branch, January, February, March 1868, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Agricultural Branch, 1868, WBSA, Kolkata.

Revenue Department Agricultural Branch, November 1869, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Agricultural Branch, January, April 1872, WBSA, Kolkata.

Revenue Department, Agricultural Branch, December 1871, WBSA, Kolkata.

ক.২: মুদ্রিত রিপোর্ট

A. K. Ray, 'Census of India, 1901, Vol. VII. Calcutta, Town and Suburbs, Part I, A Short History of Calcutta', (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902).

By a Bengal Officer, 'Observations and Remarks on the Dress, Discipline of the Military' (Calcutta: C.A Vogel—Telegraph Press, 1798).

Charles Moreland, 'Clinical Researches on Disease in India' (London: Brown, Green & Longmans, 1856).

Colonel R. H. Phillimore collected and compiled, 'Historical Records of India, Vol. I, 18th Century' (Dehra Dun: Office of the Geodetic Branch, 1945).

'East India Question. Abstract of the Minutes of Evidence Taken in the Hon. House of Commons Before a Committee of the Whole House to Consider the Affairs of the East India Company. By the Editor of the East India Debates', (London: Printed for Black, Perry & Co., 1813).

Fredrick John Shore, 'Notes on Indian Affairs, Vol. I', (London: John W. Parker, 1837).

Henry Rivett-Carnac, 'Report on the Cotton Department for the Year 1867-1868' (Education Society's Press, 1869).

N. G. Mukerji, 'The Silk Fabrics of Bengal' (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1903).

William Twinning, 'Diseases of Bengal with the Result of an Inquiry into Their Pathology and Treatment', (Calcutta: Baptist Mission Press, 1832).

ক.৩: ভিজুয়াল আর্কাইভ

Collection of Siddhartha Ghosh, CSSSC, Kolkata.

Private Collection of Mr. Radhaprasad Gupta, CSSSC, Kolkata.

Priya Paul Collection, Heidelberg Centre for Transnational Studies.

Private Collection of Dr. Suchetana Chattopadhaya, Professor, Jadavpur University.

Victoria & Albert Museum.

The British Library.

ক.৪: স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, গার্হস্থ্য ও উপদেশ পুস্তিকা

বাংলা

অনুরূপা দেবী, 'হারানো খাতা', (কলিকাতা: ভূদেব পাবলিশিং হাউস, কার্ত্তিক ১৩৩০)।

অশোক মিত্র, ‘তিন কুড়ি দশ: প্রথম চব্বিশ বছর ১৯১৭-১৯৪০’, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, কার্তিক ১৩৬০)।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ‘ভারতের শিল্প ও আমার কথা’,(কলিকাতা: এ মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৯৬৯)।

অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত, ‘অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি’, (কলিকাতা: সাহিত্যলোক, জানুয়ারি ১৯৫৭)।

অঘোরনাথ অধিকারী, ‘বিদ্যালয়-বিধায়ক বিবিধ বিধাণ – বালকবালিকার অধ্যাপক ও অভিভাবকের সাহায্যার্থে’, (কলিকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, অক্টোবর ১৯০৯)।

আবুল মনসুর আহমদ, ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’, (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৩)।

ইবনে মাযুদ্দীন আহমদ, ‘আমার সংসার জীবন – ইসলামের জীবন্ত প্রভাব’, (কলিকাতা রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩২১)।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ‘আচার’, (কলিকাতাঃ মুখার্জী অ্যান্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৬)।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘স্মৃতিকথা’, ২য় পর্ব, (কলিকাতা: ডি এম লাইব্রেরি, আশ্বিন ১৩৫৮)।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, ‘মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, (কোন্নগড়: শ্রীনাথ নিবাস, ১৯৩৯)।

কেদারচন্দ্র চৌধুরী, ‘স্বদেশী বস্ত্র-বয়ন শিক্ষা’, (ময়মনসিংহ সুহৃদ যন্ত্রে মূদ্রিত, ১৩১২ সন)।

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’, বুধোদয় যন্ত্রে তৃতীয়বার মূদ্রিত, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

কুমারী সৌদামিনী, ‘লজ্জা’, “বামারচনাবলী, ১ম ভাগ”, (কলিকাতা জে জি চ্যাটার্জী এণ্ড কো’স প্রেস, ১৮৭২)।

গোপাল হালদার, ‘রূপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, যৌবনের রাজটীকা’, (কলিকাতা: পুঁথিপত্র, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত)।

জসীম উদ্দীন, ‘ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়’, (কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬১)।

জে এম কানিংহাম, ‘ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহের নিমিত্ত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম পুস্তক’, (কলিকাতা: প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে মূদ্রিত, ১৮৮১)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘স্মৃতিকথা’, ১ম খণ্ড, (কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস, বৈশাখ ১৩৬৭)।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, ‘আমার দেবোত্তর সম্পত্তি’, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৩)।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, ‘আত্মঘাতী বাঙালী’, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ)।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ‘চলমান জীবন, ১ম পর্ব’, (কলিকাতা: ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ১৯৫২)।

প্রমথনাথ বিশী, ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’, (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ় ১৩৫১)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘ফিরে ফিরে চাই’, (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭)।

প্রসন্নতারা গুপ্ত, ‘পারিবারিক জীবন’, (কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেসে মূদ্রিত, ১৩১০ বঙ্গাব্দ)।

প্রেমময়ী, ‘বঙ্গমহিলাদিগের বর্তমান হীনাবস্থা’, “বামারচনাবলী, ১ম ভাগ”, (কলিকাতা: জে জি চ্যাটার্জী এণ্ড কো’স প্রেস, ১৮৭২)।

বিপিনচন্দ্র পাল, ‘সত্তর বৎসর’, (কলকাতা: পত্রলেখা ডিসেম্বর ২০১৩)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত, ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’, (কলিকাতা: পুস্তক বিপিণি, ১৯৫৯)।

বৃন্দাবন পুততুণ্ড, ‘বঙ্গে কার্পাস চাষ’, ১ম সংস্করণ, মৌলবী আলি খাঁ কর্তৃক প্রকাশিত, (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত। তবে ধারণা করা যায়, উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের শুরুতে প্রকাশিত।)

মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’, (কলিকাতা: মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫ই অক্টোবর)।

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘গার্হ্যস্থ বাঙ্গালা পুস্তক – সুশীলার উপাখ্যান, প্রথম ভাগ’, (কলিকাতা: প্রাকৃতা প্রেস, অক্টোবর ১৮৬৪)।

মতিলাল রায়, ‘আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী’, (কলিকাতা: প্রবর্তক পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৫৭)।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'দক্ষিণের বারান্দা', (কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৬১)।

মৈত্রেয়ী দেবী, 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ', (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৫২)।

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'স্মৃতিতে সেকাল', (কলিকাতা অর্পণ, ১৯৫০)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃস্মৃতি', (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৬৭)।

রমাপদ চৌধুরী, 'হারানো খাতা', (কলকাতা আনন্দ, ২০১৬)।

রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', (কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯)।

রাণী চন্দ, 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ)।

রাণী চন্দ, 'গুরুদেব', (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)।

রূপঙ্কর সরকার, 'আমার কলকাতা', (কলকাতা: একটি সৃষ্টিসুখ প্রয়াস, ২০১৮)।

লীলা মজুমদার, 'এই যা দেখা', (কলিকাতা: ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৩৬৬)।

লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯)।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ',(কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৫৪)।

শিশিরকুমার বসু, 'বসু বাড়ি', (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৫৮)।

শ্রীমতি সারদা, 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে', ''বামারচনাবলী, ১ম ভাগ'', (কলিকাতা: জে জি চ্যাটার্জী এণ্ড কো'স প্রেস, ১৮৭২)।

সত্যজিৎ রায়, 'যখন ছোট ছিলাম', (কলকাতা: আনন্দ, চৈত্র ১৪১৫)।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'আত্মজীবনী', (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)।

সুধীরচন্দ্র কর, 'কবিকথা', (কলিকাতা: সুপ্রকাশ, ১৯৫১)।

সুধীররঞ্জন দাস, 'আমাদের শান্তিনিকেতন', (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬৬)।

সুকুমার রায়, 'নোয়াখালীতে মহাত্মা', (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৪৭)।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী, ১ম খণ্ড', (কলিকাতা: অভিযান পাবলিশিং হাউস, পৌষ ১৩৫৭)।

ইংরেজি

'An Anglo-Indian Domestic Sketch: A Letter from an Artist to His Mother in England', (Calcutta: W. Thacker and Co. St. Andrews Library, 1849).

An Old Resident, 'Real Life in India, Embracing a View of the Requirements of Individuals Appointed to any Branch of the Indian Public Service; the Methods of Proceeding to India; and the Course of Life in Different Parts of the Country', (London: Houlston & Stoneman, 1847).

Captain Bellew, 'Memoirs of Griffin or a Cadet's First Year in India, 2 Vols. Together', (London: WM. H. Allen & Co., New edition 1880).

Captain Thomas William, 'The East India Vade-Mecum or Complete Guide for Gentlemen Intended for the Civil, Military or Naval Service of the Hon'ble East India Company', (London: Black, Parry and Kings-buny, 1810).

Douglas Dewar, 'Bygone Days in India', (London: John Lane the Bodily Head Ltd., 1922).

Edmund Hull, 'The European in India or Anglo-Indian's Vade-Mecum. A Handbook of Useful and Practical Information for those Proceeding to or Residing in the East Indies, Relating to Outfits, Routes, Time for Departure, Indian Climate and Seasons, Housekeeping, Servants, etc., etc.; also an Account of Anglo-Indian Social Customs and Native Character', (London: Henry S. King & Co. 1871).

Edward J. Waring, 'The Tropical Resident at Home: Letter Addressed to Europeans Returning from India and the Colonies, on Subjects Connected with Their Health and General Welfare', (London: John Churchill & Sons, 1846).

Edmund C. P. Hull, 'The European in India or Anglo-Indian's Vade-Mecum', (London: C. Kegan Paul & Co., 1878).

Emma Roberts, 'Scenes and Characteristics of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian Society, Vol. I', (London: W. H. Allen & Co., 1837).

Fanny Parks, ‘Wanderings of a Pilgrim: In Search of Picturesque, during Four-and Twenty Years in the East; with Revelations of Life in the Zenana, Vol. I’, (London: Pelham Richardson, 1850).

F. A. Steel & G. Gardiner, ‘The Complete Indian Housekeeper and Cook’, (Edinburgh & Bombay: Edinburgh Press, Educational Society’s Press, 1893, 3rd edition).

Hem Chandra Sarkar ed., ‘The Life and Letters of Rammohun Roy’, Compiled and Edited by the late Sophia Dobson Collet, (Calcutta: Publisher is not mentioned, 1914).

John McCosh, ‘Medical Advice to the Indian Strangers’, (London: WM. H. Allen & Co., 1841).

John Briggs, ‘Letter Addressed to Young Person in India’, (London: John Murray, 1828).

Kathleen Blechyden, ‘Calcutta: Past and Present’, (London: W. Thacker & Co., 1905).

Nirad C. Chaudhury, ‘Autobiography of an Unknown Indian’, (Mumbai: Jaico Publishing House, 2017).

Rev. A. D. Rowe, ‘Everyday Life in India: Illustrated from Original Photographs’, (New York: American Tract Society, 1881)

T. D. Hampreys ed., ‘The Record of Fashion and Tailor and Cutter’s Guide’, Vol. VII, 4 January 1882.

W. Hickey & A. Spercer edited, ‘Memoirs of William Hickey, Vol. I’, (London: Hurst & Blackett, 1913).

Walter Kelly Firminger ed., ‘The Original Letters from India of Mrs. Eliza Fay’, (Calcutta: Messrs Thacker Spink & Co., 1908).

W. T. Webb, ‘English Etiquette for Indian Gentlemen’, (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1890).

ক.৫: ভ্রমণকথা

বাংলা

আবু আহমেদ হাবিবুল্লা, ‘আল বেরুণীর ভারততত্ত্ব’, (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)।

আশুতোষ মিত্র, ‘ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ’, (কলিকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১২৯২ বঙ্গাব্দ)।

দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ‘য়ুরোপে তিন মাস’, (কলিকাতা: ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিঃ, ১৯২০)।

প্রমথ চৌধুরী, ‘ভ্রমণকাহিনী সমগ্র’, (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৫৬)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ‘পশ্চিমের যাত্রী (ইউরোপ ভ্রমণ, ১৯৩৫)’, (কলিকাতা: মিত্র-ঘোষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)।

ইংরেজি

Anna Harriette Leonowens, ‘Life and Travels in India’, (Philadelphia: Porter & Coates, 1884).

Bholanath Chunder, ‘The Travels of a Hindoo to Various Parts of Bengal & Upper India, Vol. II’, (London: N. Trubner & Co., 1869).

E. Terry, ‘A Voyage to East India’, (London: Ja. Martin & J. Allestrye, 1777, reprinted from 1655 edition).

Fra Paolinno Da San Bartholomeo, ‘Voyage to East Indies: Containing an Account of the Manners, Customs, & c. of the Natives, with a Geographical Description of the Country’, (London: J. Davis, 1800).

James Johnson, ‘Change of Air or the Philosophy of Travelling’, (New York: Samuel Wood & Sons, 1831).

Lady Nugent Maria, ‘A Journal from the Year 1811 till the Year 1815 Including a Voyage to and Residence in India with a Tour to North-Western Parts of the British Possessions in the Country, Under the Bengal Government’, Vol. I, London: 1839.

Mr. Webb, ‘Journal From Calcutta in Bengal, by Sea to Bufferah’, (London: T. Kinnersly, 1758).

Viscount George Valentia, ‘Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, and Egypt, in the Years 1802, 1803, 1804, 1805, 1806’, (London: William Miller, 1809).

ক.৬: বাংলা সাহিত্য ও পুরাতন বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘অবনীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড’, (কলিকাতা: প্রকাশ ভবন, মাঘ ১৩৭৯)।

অমৃতলাল বসু, ‘সাবাস বাঙালীঃ সামাজিক নকশা’, (কলিকাতা: কিশোর প্রিন্টীং ওয়ার্কস, ১৩১২ বঙ্গাব্দ)।

অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ‘বাঙ্গালীর সার্কাস’, (কলিকাতা: পাবলিসিটি স্টুডিও, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)।

অশ্বিনীকুমার দত্ত, ‘ভক্তিযোগ’, (কলিকাতা: চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৯৬৫)।

অচিন্ত্যকুমার সেন, ‘যায় যদি যাক’, (কলিকাতা: ডি এম লাইব্রেরী জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২)।

অরুণ নাগ সম্পাদিত, ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্শ, নবম মূদ্রণ ২০১৯)।

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত, ‘শার্লক হোমস রচনাসমগ্র’, সটীক সংস্করণ, (কলকাতা: লালমাটি, ২০২১)।

অনাদিচরণ তরফদার, ‘হিন্দু-সমাজ’, (কলিকাতা: মানিকতলা ষ্ট্রীট, ১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

আশাপূর্ণা দেবী, ‘গল্পসমগ্র’, চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৭১)।

‘আহমদ শরীফ রচনাবলী’, ৮ম খণ্ড, (ঢাকা আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আহমদ কবির সম্পাদিত, ‘আহমদ শরীফ রচনাবলী’, চতুর্থ খণ্ড, (ঢাকা: আগামী প্রকাশন, ২০১০)।

আহমদ কবির সম্পাদিত, ‘আহমদ শরীফ রচনাবলী’, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০)।

‘আহমদ শরীফ রচনাবলী’, (ঢাকা আগামী প্রকাশনী, ২০১৪)।

আবদেল মান্নান সম্পাদিত, ‘অখণ্ড লালনসঙ্গীত’, (ঢাকা: রোদেলা, ২০১০)।

ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত, ‘পূজার ছুটী’, (কলিকাতাঃ সুরেশ হৃষীকেশ দত্ত অ্যাণ্ড কোং [প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। তবে বইটির লেখার অভিব্যক্তি উপলব্ধি করে মনে হয়, এটি উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বা বিংশ শতকের শুরুর দিকে লিখিত।])

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, ‘স্ত্রীভূষণ বিসম্বাদ ও ঘোর কলির অনুবাদ’, (কলিকাতা: কালীপ্রসন্ন দত্ত দ্বারা মূদ্রিত, ১৮৯২)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ, ‘হুতোম প্যাঁচার হকশা’, নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, (কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক স্টোর, ২০১৩; প্রথম প্রকাশ ১৮৬১)।

কাটীরাম ঠাকুর, ‘আটাকাটি’, (কলিকাতা: সংস্কৃত প্রেস, ১২৯১ বঙ্গাব্দ)।

কেদারনাথ দত্ত, ‘সচিত্র গুলজারনগর’, (কলিকাতা: প্রিন্টিং প্রেস, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ/১৮৭১)।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ‘সারস্বতকুঞ্জ’, (কলিকাতা: বঙ্গবাসী ষ্টীম প্রেস, ১২৯২ বঙ্গাব্দ)।

জগদীশ ভট্টাচার্য, ‘বন্দে মাতরম’, (কলিকাতা: কবি ও কবিতা প্রকাশন, জুন ১৯৭৮)।

‘জন্ম শতবর্ষ স্মরণে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড’, (কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, পৌষ ১৩৬৭)।

জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ‘জমিদারশ্রেণীর অবনতি’, (কলিকাতা: নববিভাকর যন্ত্রে মূদ্রিত, ১২৯০ বঙ্গাব্দ)।

টেকচাঁদ ঠাকুর, ‘আলালের ঘরের দুলাল’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৮২২ শকাব্দ)।

ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত, ‘আহমদ শরীফ রচনাবলী’, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৩)।

ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পাদিত, ‘আহমদ শরীফ রচনাবলী’, ৭ম খণ্ড, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৪)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শতাব্দীর মৃত্যু’, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬০।

দুর্গাচরণ রায়, ‘দেবগণের মর্ত্যে আগমন’, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

‘দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী’, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, নবম মূদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪২১)।

‘দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী’, ২য় খণ্ড, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০১৭)।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ‘প্রায়শ্চিত্ব’, কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত ‘‘সরস সার কথা’, দুই খণ্ড একসাথে, (কলিকাতা: গ্রন্থগৃহ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)।

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ‘বঙ্গসাহিত্য পরিচয়’, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪)।

ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, ‘নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ’, (কলকাতা: আনন্দ, সেপ্টেম্বর ২০১১)।

নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ‘বস্ত্রসমস্যা’, (ময়মনসিংহ: লিলিপ্রেসে মূদ্রিত, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, (কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৫০)।

নলিনীকান্ত গুপ্ত, ‘স্বরাজের পথে’, (চন্দননগর: প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৩০)।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ‘রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ’, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মাঘ ১৩১৪)।

নবকুমার ভট্টাচার্য্য ও বাসুদেব মোশেল, ‘পুরাতনীঃ পুজো নিয়ে পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন’, (কলিকাতাঃ অভিনব প্রকাশনী, ১৩৫৯)।

পরিতোষ সেন, ‘জিন্দাবাহার’, (কলিকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ)।

পরশুরাম, ‘পরশুরাম গ্রন্থাবলী’, ২য় খণ্ড।
Archive.org/details/dli.scoerat.10776parasuramgranthabali2ndkhanda

পঞ্চানন ঘোষাল, ‘অপরাধ বিজ্ঞান’, ৫ম খণ্ড, (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)।

প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত, ‘হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর নির্বাচিত প্রবন্ধ’, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭)।

প্রিয়নাথ পাল, ‘তিনটী চিত্র’, (কলিকাতা: গ্রেট টাউন প্রেস, ১৮৯৪)।

বনফুল, ‘বৈতরণী-তীরে’, (কলিকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৫৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘আনন্দমঠ’, (কলিকাতা: ইউনাইটেড পাবলিশার্স, তৃতীয় পাকাশ, জানুয়ারী, ২০০৫)

বামাচরণ বসু, ‘বস্ত্রবয়ন শিক্ষা’, (কলিকাতা: দীনময়ী প্রেস, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ)।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ‘একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?’ (কলিকাতা: সরস্বতী প্রেস, ২য় মূদ্রণ, ১৮৮০)।

বিমল মিত্র, ‘সাহেব বিবি গোলাম’, (কলিকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৫৩)।

বিনয় ঘোষ, ‘কালপেঁচার রচনাসমগ্র’, (কলিকাতা: পাঠভবন, জুন ১৯৬৮)।

বিপিনচন্দ্র পাল, ‘নবযুগের বাংলা’, (কলকাতা: যুগযাত্রী, বৈশাখ ১৩৬২)।

বিমল মিত্র, ‘চারপ্রহর’, (কলিকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পৌষ ১৩৭২)।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ‘বাঙ্গালীর বাহুবল’, (কলিকাতা: শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ)।

‘বৌবাবুঃ অপূর্ব্ব সামাজিক প্রহসন’,(সাল, লেখক, প্রকাশক অনুল্লিখিত, Satish Choudhury 1904 লেখা বইয়ের উপরে)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা ও পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব’, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মাঘ ১৩৬৩)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ‘রামমোহন গ্রন্থাবলী’, (কলিকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৫২)।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘নববাবুবিলাস’, রমেনকুমার সর সম্পাদিত “ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র”, (কলিকাতা: সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩; প্রথম প্রকাশ ১৮৩১)।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কলিকাতা কমলালয়’, রমেনকুমার সর সম্পাদিত “ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র”, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জানুয়ারি ২০১৩; প্রথম প্রকাশ ১৮২৩)।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ‘বঙ্গরহস্যঃ বঙ্গসমাজের বর্তমান প্রকৃতির আলোচনা’, ১ম ও ২য় খণ্ড, (কলিকাতা: বসুমতী প্রেস, ১৯০৭)

মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত, ‘সমাজ’, (কলিকাতা: কালিকা প্রেস, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। তবে সূচনা পত্রে উল্লিখিত যে নাটিকাটি ২৮ বৈশাখ ১৩১৪ সনে প্রথম অভিনীত)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কর্মফল’, পৌষ ১৩১০, “গল্পগুচ্ছ”, (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৪১৮), পৃ ৪৩৭-৪৬২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কোট ও চাপকান’, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, “রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র”, (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, জানুয়ারি ২০১৫), পৃ ৬৯২-৬৯৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘চরকা’, ভাদ্র ১৩৩২, “রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র”, (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, জানুয়ারি ২০১৫), পৃ ১১০৬-১১১৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', ভাদ্র ১৩১১, ''রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র'', (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', শ্রাবণ ১৩০৮, ''রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র'', (কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৫)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষের কবিতা', (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ভাদ্র ১৩৩৬)।

রাজশেখর বসু বিরচিত, 'চলচ্চিন্তা', (কলকাতাঃ মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৮৮২ শকাব্দ)।

রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি, 'বস্ত্র-যজ্ঞ', (কলিকাতা আর ক্যাম্বে এণ্ড কোং, ১৯১৯)।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, 'মোহন্তের এই কি কাজ!!', হাওড়া, ১৮৭৩।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দন্তরুচি', (কলিকাতা এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

শংকর, 'কত অজানারে', (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর ১৯৫৯)।

শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃথ্বীরাজ সেন সম্পাদিত, (কলকাতা: মাইতি বুক হাউস, ২০১৬)।

শ্রীপান্থ, 'রাজসিক', (কলিকাতা: ত্রিবেণী প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)।

শ্রীবাসব, 'গোমতী গঙ্গা', (কলিকাতা: বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৬৯)।

শ্রীষড়ানন্দ শর্ম্মা বিরচিত, 'দুর্গোৎসব', শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, (কলিকাতাঃ ব্যবসায়ী যন্ত্রে শ্রী অমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত [কত সালে মুদ্রিত তার উল্লেখ নেই। তবে গ্রন্থের অভ্যন্তরে বলা আছে যে লেখক এটি ১২৭৮ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন।])

সমুদ্র গুপ্ত, 'বঙ্গ ভঙ্গ', (কলিকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৭৫)।

সন্তোষ কুমার ঘোষ, 'মোমের পুতুল', (কলিকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'বেকারের উপায়', ১ম খণ্ড, (কলিকাতা দি ইউনিভারসিটী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

সুজয় রায়, 'সেই আয়না', (কলকাতা: বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, আষাঢ় ১৩৬৬)।

সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'সৌরিন্দ্র গ্রন্থাবলী', ২য় ভাগ, (কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির)।

স্বপন বসু সম্পাদিত, রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল',(কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনী, ২০১৪)।

স্বামী বিবেকানন্দ, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', (কলকাতা: উদ্বোধণ কার্য্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ, চৈত্র, ১৩৪৫)।

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', (কলিকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়, পৌষ ১৩৬৯)।

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, 'কলকাতার রাত্রি রহস্য', সম্পাদনা ও টীকা কৌশিক মজুমদার, (কলকাতা: বুক ফার্ম, ২০২০; প্রথম প্রকাশ ১৯২৩)।

লেখক অনুল্লিখিত, 'কাল-মহমা-রহস্যঃ বাবি কী?'প্রকাশক- শ্রীক্ষীরোদ বসু, (কলিকাতা: স্মৃতিসাধন সারস্বত মন্দির, ১৩১২ বঙ্গাব্দ)।

লেখক অনুল্লিখিত, 'মডেলভ্রাতা বা আদর্শ যুবক', ১ম ভাগ, (কলিকাতা: মণিরাম যন্ত্রে মূদ্রিত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ)।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত, 'পূর্ববঙ্গগীতিকা', চতুর্থ খণ্ড, (কলিকাতা: ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত, 'পূর্ববঙ্গগীতিকা', পঞ্চম খণ্ড, (কলিকাতা: ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)।

ক.৭: ইংরেজি সাহিত্য ও পুরাতন গ্রন্থ

Benjamin Moseley, 'A Treatise on Tropical Diseases and on the Climate of the West-Indies', (London: T. Cadell, MDCCLXXXVII/1787).

'Cotton Goods Guide for Buyer and Seller: A Pocket Manual', (New York: Premium Books, 1890).

David Hume, 'The History of England', (London: R. Bowyer, 1812).

F. A. Steel & G. Gardiner, 'The Complete Indian Housekeeper and Cook', (Edinburgh & Bombay: Edinburgh Press & Educational Society's Press, Third edition 1893).

George C. M. Birdwood, 'The Industrial Arts of India', (Henrietta Street: Chapman and Hall Ltd., 1880).

George Moore, 'Drama in Muslin: A Realistic Novel', (London: Vizetelly & Co., 1882).

G. W. Steevens, 'India', (New York: Dodd, Mead & Comp, 1905).

Henry Shaw, 'Dress and Decorations of Middle Ages', Vol.II, (London: William Pickering, 1843).

James Taylor, 'A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca', (London: John Mortimer, 1851).

James Johnson, 'The Influence of Tropical Climates more Specially Climate of India on European Constitutions', (London: R. J. Stockdale, 1813).

John Forbes Watson, 'Textile Manufacture and the Costumes of the People of India', (London: India Office, 1866).

John Clark Marshman, 'The Story of Carey, Marshman & Ward: The Serampore Missionaries', (London: J. Heaton & Sons, 1864).

John Forbes Watson, 'Textile Manufacturers of India', Vol. 1-18, (London: India Office, 1866).

L. S. S. O'Molley, 'The Indian Civil Service, 1601-1930', (London: John Murray, 1931).

Lvke Scrafton, 'Reflections on the Government of Indostan with the Short Sketch of History of Bengal, 1738-1756', (London: W. Strahan, 1770).

Mrs. Monkland, 'The Nabob at Home or Return to England, Vol. I', (London: Henry Colburn, 1842).

Robert Orme, 'Historical Fragments of the Mogul Empire, of the Morattoes, and of the English Concerns in Indostan, from the Year MDCLIX/1659', (London: Printed for F. Wingrave, MDCCCV/1805).

Shib Chunder Bose, ‘The Hindoos as They are: A Descriptions of the Manners, Customs, and Inner Life of Hindoo Society in Bengal’, (Calcutta: Thacker, Spink and Co, Second Edition 1883)

Sir Punch, ‘Indian Charivari’, Vol. I, (7 Dacre’s Lane Calcutta, 1875, Publisher was not mentioned).

Sir John Woodroff, ‘Is India Civilized? Essays on Indian Culture’, (Madras: Ganesh & Co. Publishers, 1922).

‘The Collected Poems of Rudyard Kipling’, (Kent: Wordsworth Poetry Library, 1994).

W.H. Carey, ‘The Good Old Days of Honorable John Company, Vol. I’, (Calcutta: R. Cambray & Co., Law and Antiquarian Booksellers & Publishers, 1906).

William Bolts, ‘Considerations of Indian Affairs, Vol. III’, (London, New York: Routledge, 1998).

ক.৮: পত্রপত্রিকা

বাংলা:

অলকা পত্রিকা, বৈশাখ, অঘ্রাণ ১৩৫২; অমৃত পত্রিকা, চৈত্র ১৩৭৩, পৌষ, কার্ত্তিক ১৩৭৮; উত্তরসূরী পত্রিকা, কার্ত্তিক-আশ্বিন ১৩৬৯-১৩৭০; উৎস মানুষ, জুন ২০০৬; এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮০ বঙ্গাব্দ; ঐতিহাসিক চিত্র, জানুয়ারি ১৮৯৯; কল্পনা পত্রিকা, ৫ম ও ৭ম খণ্ড, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৯৮ শকাব্দ; তন্তুবায় সমাচার, ফাল্‌গুন, কার্ত্তিক ১৩৩৮; দর্পণ, নভেম্বর ১৯৭৯; নব্যবঙ্গ, মার্চ ১৯০২; পরিচয়, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৯৭-১৩৯৮ বঙ্গাব্দ; প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৯১৮; প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২১; প্রবাসী, ফাল্‌গুন ১৩৬৮, ১৩২৩; প্রবাসী, পৌষ ১৩৬২; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬৬; প্রবর্তক, চৈত্র ১৩৬৪, ১৩৬৮; বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২; বসুধারা, বৈশাখ ১৩৬৭; বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪০, ১৩৫১, আশ্বিন ১৩৪৭; বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক ১৩৩০; বামাবোধিনী, আশ্বিন, পৌষ ১২৭৪, কার্ত্তিক ১২৭৫, ভাদ্র ১২৭৮; বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪; বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩; বীণাপাণি পত্রিকা, ভাদ্র ১৩০২, জৈষ্ঠ ১৩০১; ব্যবসা ও বাণিজ্য, বৈশাখ ১৩৫৩; ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২১, কার্ত্তিক ১৩২৪; ভারতবর্ষ, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৯১৮; ভারতবর্ষ চৈত্র ১৩৩৬, ১৩৫২; ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৮; ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৭১, জৈষ্ঠ্য ১৩৭২; ভারতী, ৭ম সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ; মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক ১৩৫২; মাতৃমন্দির পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২; মাসীক মোহাম্মদী, ফাল্‌গুন ১৩৩৫; মৌচাক, মাঘ ১৩৬৬; শারদীয়া আভা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৮৫; শনিবারের চিঠি, কার্ত্তিক ১৩৪১, ১৩৫৫, অগ্রহায়ণ ১৩৫২; সবুজ পত্র, জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় ১৩৩৪; সচিত্র শিশির, ১ম বর্ষ, তৃতীয়

সপ্তাহ; সচিত্র শিশির, অগ্রহায়ণ ১৩৩০; সমাচার দর্পণ, জুলাই ১৮৩২; সম্বাদভাস্কর, ডিসেম্বর ১৮৪৯; সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, জুন ১৮৫১; সবুজ পত্র, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৩৪; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮২ খণ্ড, সংখ্যা ১-২, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ; সাধারণী পত্রিকা, ভাদ্র ১২৮১; সাধারণী, আষাঢ় ১২৮১; সাহিত্যের খবর, চৈত্র ১৩৬৭; স্বদেশ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

ইংরেজি

Bengalee, October 1909.
Calcutta Gazette or Oriental Advertiser, March, April, May, June, December 1784.
Friend's Intelligencer & Friend's Journal, Vol. XLII, Vol. XIII, (Philadelphia: Friend's Intelligencer pvt. Ltd., 921 Aech Street, 1885).
The Journal of Tropical Medicine and Hygiene, February 1907.
The Englishman and Military Chronicle, Calcutta, May 1837.
The Indian Daily News, September, October 1868.
The Indian Daily News, February 1869.
The Journal of Indian Art, Vol. I, No. 1-16, London, October 1886.

খ. সহায়ক গ্রন্থ:

খ.১: জীবনী

বাংলা

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামোহন রায়ের জীবনচরিত', (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ১৯২৮)।

নবকৃষ্ণ ঘোষ, 'প্যারীচরণ সরকারঃ জীবনবৃত্ত', (কলিকাতা: এলম প্রেস, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ)।

প্রমথনাথ বসু, 'স্বামী বিবেকানন্দ জীবনচরিত, ১ম খণ্ড', (কলিকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৩২৬)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ', (কলিকাতা: শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, আশ্বিন ১২৯২)।

বিহারীলাল সরকার, 'বিদ্যাসাগরঃ সমালোচনা-সংবলিত বিদ্যাসাগরের জীবনী', (কলিকাতা: শাস্ত্র-প্রকাশ কার্য্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ ১৩২৯)।

লীলা মজুমদার, 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী', সৈয়দ কওসর জামাল অনূদিত, (নয়া দিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৯)।

সনৎ মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জুজু দত্ত সম্পাদিত, 'বিবেকানন্দ পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত ও তৎকালীন সমাজ [১৮৭৬-১৯০৭]', (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, আষাঢ় ১৩৯৬)।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৭)।

ইংরেজি

Blair B. Kling, 'Partner in Empire: Dwarakanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India', (Calcutta: Firma KLM Private Ltd., 1981).

N. N. Ghose, 'Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur', (Calcutta: B. K. Basu, 1901).

Rev. James Chambers, 'Bishop Hebers and Indian Missions', (London: John W. Parker, 1846).

খ.২: বিশ্লেষণধর্মী বই

বাংলা

অতুল সুর, 'কলকাতাঃ চার্ণক থেকে সি. এম. ডি. এ. পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস', (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৪)।

অতুল সুর, 'তিনশো বছরের কলকাতা পটভূমি ও ইতিকথা', (কলকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮)।

অজিত রায়, 'বাংলা স্ল্যাং: সমুদয় ঠিকুজিকুষ্ঠি', (কলকাতা: গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা, ২০১৭)।

অমরেন্দ্র আদক, 'কালের চালচিত্রে শ্রীমা সারদা', (কলকাতা: অনুভব প্রকাশন, ২০০৭)।

অর্ণব সাহা, 'উনিশ শতকে বাঙালি মেয়ের যৌনতা', (কলকাতা: প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৭)।

অমিতাভ চক্রবর্তী, 'বাঙালি মনন – সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা', (কলকাতা: একুশে, ২০০০)।

আব্দুল করিম, 'ঢাকাই মসলিন', (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০১৬)।

আবুল কাসেম, 'রামুর ইতিহাসঃ ইংরেজ আমল পর্যন্ত', (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০)।

আবুল আহসান চৌধুরী, ‘অবিদ্যার অন্তঃপুরে: নিষিদ্ধ পল্লীর অন্তরঙ্গ কতকথা’, (ঢাকা: শোভা প্রকাশ)।

এস এম আখতার হোসেন, ‘বিশ্বতীর্থ হজ ও যিয়ারাত’, (কলিকাতা বাণী প্রকাশ, ১৯৫৭)।

ওয়াকিল আহমদ, ‘উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা’, (কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

কালীচরণ ঘোষ, ‘ভারতের পণ্যঃ তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার, ২য় খণ্ড’, (কলিকাতা: কে পি বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)।

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, ‘রাজা রামমোহনঃ বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি’, (কলকাতা: বর্ণপরিচয়, অক্টোবর ১৯৫৯)।
কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত, ‘সরস সার কথাঃ রবীন্দ্র যুগ ১৮৬১-১৯০০’, (কলিকাতা: গ্রন্থগৃহ, ১৩৫৩)।

গিরিশ্চন্দ্র বেদান্ততীর্থ, ‘প্রাচীন শিল্প পরিচয়’, (কলিকাতাঃ সুবর্ণরেখা, আষাঢ় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)।

গীতা মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা সেকাল ও একাল পর্ব’, (কলিকাতা: কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত)।

গীতা চট্টোপাধ্যায়, ‘বাংলা স্বদেশী গান’, (দিল্লী: দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি ১৯৮৩)।

গোপাল হালদার, ‘বাঙালী সংস্কৃতির রূপ’, (কলিকাতা: অগ্রণী বুক ক্লাব, মে ১৯৪৭)।

গোলাম মুরশিদ, ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’, (ঢাকা: অবসর, ২০১৫)।

গোলাম মুরশিদ, ‘রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা’, (ঢাকা: অবসর, ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, ‘আসামের অশান্তি প্রসঙ্গে’, অনুবাদে সুধীরচন্দ্র লাহা, (কলিকাতা সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি, ১৯৬১)।

চিত্রা দেব, ‘ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল’, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬)।

চিরন্তন সরকার, ‘শরীরের সংস্কৃতি সংস্কৃতির শরীর’, (কলকাতা: অবভাস, ২০১৯)।

জয়ন্ত গোস্বামী, ‘সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন’, (কলিকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ)।

জয়িতা দাস, ‘সাজমহল’, (কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৫)।

জ্যোতির্ময় সেন, ‘আঠারো ও উনিশ শতকে কলকাতার বাজার’, (কলকাতা: অলকানন্দা পাবলিশার্স, জুন ২০১৪)।

জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত, ‘বংশ পরিচয়, চতুর্থ খণ্ড’, (কলিকাতা: কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে জ্ঞানেন্দ্র কুমার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, ‘সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে রামমোহন রায়’, (কলকাতা: কোরক, ফেব্রুয়ারি ২০২২)।

‘দেবেশ দাশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড’, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত)।

দীনেশচন্দ্র সেন, ‘বৃহৎ বঙ্গ’, (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১)।

ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, ‘নীরদ চন্দ্র চৌধুরী নির্বাচিত প্রবন্ধ’, (কলকাতা আনন্দ, ২০১১)।

‘নব ভারত স্রষ্টা রমেশ্চন্দ্র দত্ত’, (নূতন দিল্লী তথ্য ও বেতার মন্ত্রক প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, জুন ১৯৭৬)।

নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী, ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড’, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ)।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘সংস্কৃতির ধর্মঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি’, (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি,১৯৬৪)

নির্বেদ রায়, ‘ইউরোপীয়দের চোখে কলকাতা’, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০২২)।

নীহাররঞ্জন রায়, ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব’, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, প্রথম পূনঃমূদ্রণ ১৩৫৯)

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ‘বাঙ্গালী জীবনে রমনী’, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০১ বঙ্গাব্দ)।

পূর্ণেন্দু পত্রী, ‘এক যে ছিল কলকাতা’, (কলকাতা: প্রতিক্ষণ, মার্চ ২০১৮)।

প্রমথনাথ মল্লিক, ‘কলিকাতার কথা, আদি কাণ্ড’, (কলিকাতা: শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩১)।

প্রমথনাথ মল্লিক, ‘কলিকাতার কথা, মধ্য কাণ্ড’, (কলিকাতা: শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৫)।

বদরুদ্দীন উমর, ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক’, (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনী, মে ১৯৮৩)।

বামাচরণ মজুমদার, ‘বাঙ্গালার জমিদার’, (কলিকাতা: গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

বিনয় ঘোষ, ‘টাউন কলিকাতার কড়চা’,(কলিকাতা: বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৬১)।

বিনয় ঘোষ, ‘মেট্রোপলিটনঃ মন, বিদ্রোহ, মধ্যবিত্ত’, (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০১৬)।

বিনয় ঘোষ, ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০’, (কলিকাতা: পাঠভবন, নভেম্বর ১৯৬০)।

বিনয় ঘোষ, ‘বাংলার নবজাগৃতি’, (কলিকাতা: ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৫৫)।

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মতিলাল লাহা, ‘সচিত্র কার্পাস’,(কলিকাতা: সরকার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯২১)।

বিমান বসু সম্পাদিত, ‘প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর’, (কলকাতা: বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার কমিটি, ১৯৬০)।

বিপ্লব দাশগুপ্ত, ‘বাঙালি জাতি ও বাঙলা ভাষা – প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব’, (কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ২০০০)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড’, (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চৈত্র ১৩৭৭)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১৮৩০-১৮৪০’,(কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ফাল্‌গুন ১৩৪৮)।

ভারতী রায় সংকলিত ও সম্পাদিত, ‘নারী ও পরিবারঃ বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ’, (কলকাতা পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯)।
মলয় রায়, ‘বাঙালির বেশবাসঃ বিবর্তনের রূপরেখা’, (কলকাতা: মনফকিরা, ২০১৬)।

যোগেশচন্দ্র বাগল, ‘জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত’, (কলিকাতা: মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, আশ্বিন ১৩৫২)।

রজতকান্ত রায়, ‘পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ’, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১১)।

রাধারমন মিত্র, ‘কলিকাতা দর্পণ, ১ম পর্ব’, (কলিকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০১৪)।

লোকনাথ ঘোষ, ‘কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত’, (কলকাতা: অয়ন, ১৯৫৮)।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, ‘বিদ্যাসাগরঃ নতুন করে জানা অন্যভাবে চেনা’, (কলকাতা পুনশ্চ, ফেব্রুয়ারি ২০২১)।

শামসুজ্জামান খান, ‘বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতিঃ কক্সবাজার’, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪)।

শান্তনু মিত্র, ‘কলিকাতার কল-কথা’, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৯)।

শ্রীপান্থ, ‘কলকাতা’, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬)।

শ্রীপান্থ, ‘ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক’, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫)।

শ্রীপান্থ, ‘কেয়াবাৎ মেয়ে’, (কলকাতা: আনন্দ, মে ২০১৯)।

সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ‘বর্ধমানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড’, (বর্দ্ধমান: বর্দ্ধমান প্রেস, অগস্ট ১৯৫৬)।

সত্যরঞ্জন সেন, ‘প্রবাদ-রত্নাকর’, (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, ১৯৫৭)।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ‘কার্পাস শিল্প’, (কলিকাতা: নিউ আর্টিস্টিক প্রেস, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ‘কালীকট থেকে পলাশী’, (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৬)।

সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা’, (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)।

সুশীল চৌধুরী, ‘সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য’, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৭)।

সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসঃ আদি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত’, (কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৪০)।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’, (কলকাতা: অনুষ্টুপ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩)।

সুশান্ত কৃষ্ণ দেব, ‘তিন শতাব্দীর শোভাবাজার রাজবাড়ি’, (কলিকাতা: শরৎ বুক হাউস, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ)।

সুকুমার সেন, ‘বঙ্গভূমিকা ৩০০-১২৫০ খ্রি’, (কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৫৮)।

সুধীর চক্রবর্তী, ‘গান হতে গানে’, (কলকাতা: পত্রলেখা, ২০০০)।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ‘বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ১ম খণ্ড’, (কলকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৯৩)।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ভারতের শিল্প বিপ্লব – রামমোহন ও দ্বারকানাথ’, (কলকাতা: বৈতানিক, ১৯৬৪)।

স্বপন চক্রবর্তী, ‘পুরোনো চাল’, (কলকাতা দে’জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০২২)।

হরিহর শেঠ, ‘প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়’, (কলিকাতা: ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)।

হরিপদ ভৌমিক, ‘নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা’, (কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০০০)।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, ‘স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ’, (কলিকাতা: সরস্বতী লাইব্রেরী, বৈশাখ ১৩৬৮)।

ইংরেজি

A. Biswas, ‘Indian Costumes’ (New Delhi: Publications Division, first print 1985, reprint 2003).

A. F. Salahuddin Ahmed, ‘Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-1835’, (India: RDDHI, June 1976).

Alexandra Palmer, ed., ‘A Cultural History of Dress and Fashion in the Modern Age’ (London, Oxford: Bloomsbury, 2018).

Alfred Crosby, ‘Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe’, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Alexandra Palmer and Hazel Clarke ed., ‘Old Clothes, New Looks: Second Hand Fashion’, (Oxford, New York: Berg, 2005).

Alison Lurie, ‘The Language of Clothes: The Definitive Guide to People Watching Through Ages’, (Middlesex: Hamlyn Publishing, 1983).

Andrew Gordon, ‘Fabricating Consumers: The Swing Machine in Modern Japan’, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2011).

Brian A. Hatcher, ‘Hinduism Before Reform’, (Cambridge, Massachusetts: Harverd University Press, 2020).

Annette B. Weiner & Jane Schneider ed., ‘Cloth and Human Experience’, (Washington, London: Smithsonian Institution Press, 1989).

Anne McClintock, ‘Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in Colonial Context’ (New York, London: Routledge, 1995).

Anne de Courcy, ‘Fishing Fleet: Husband Hunting in the Raj’ (London: Weidenfield & Nicolson, 2012).

Barbara Karl, ‘Embroidered Histories: Indian Textiles for the Portuguese Market during 16th to 17th Centuries’ (WiesingerstraBc: Bohlau Verlag Wien Koln Weimar, 2016).

B. V. Roy, ‘Old Calcutta Cameos’, (Calcutta: Dipali Press, 1946).

Beverly Lemire, ‘Fashion’s Favourite: The Cotton Trade and the Consumer in Britain, 1660-1800’ (Oxford: Oxford University Press, 1991).

Bernard S. Cohn, ‘Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India’, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996).
Christina J. Hodge, ‘Consumerism and the Emergence of the Middle Class in Colonial America’ (New York: Cambridge University Press, 2014).

Cheryl Kolander, ‘A Silkworker’s Notebook’, (Colorado: Interweave Press, 1985).

Clark Blaise & Bharati Mukherjee, ‘Days and Nights in Calcutta’, (New York: Doubleday & Company, 1977).

Christopher Pinny, ‘‘Photos of Gods’: The Printed Image and Political Struggle in India’ (London: Reaktion Books, 2004).

David Gilmour, ‘The Ruling Caste: Imperial Life in Victorian Raj’ (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2006).

David Kuchta, ‘The Three Piece Suit and Modern Masculinity, England 1550-1850’, (Berkley, Los Angles, London: University of California Press, 2002).

Dharma Kumar and Meghnad Desai, eds, ‘Cambridge Economic History of India, 1757-1970’, Vol.II, (Calcutta: Firma K.L Mukhopadhyay, 1960).

Donald F. Bouchard ed., & Donald F. Bouchard, Sherry Simon trans., ‘Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews by Michel Foucault’ (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1977).

Emma Tarlo, ‘Clothing Matters: Dress and Identity in India’ (Chicago: The University of Chicago Press, 1996).

E. M. Collingham, ‘Imperial Bodies’ (Cambridge: Polity Press, 2007).
Fernand Braudel, ‘Capitalism and Material Life 1400-1800’, translated from French by

Miniam Kochan, (New York, London: Harper Torchbooks, 1974).

Georgio Riello & Tirthankar Roy edited, ‘How India Clothed the World: The World of South Asian Textiles, 1500-1800’ (Leiden, Boston: Brill, 2009).

Harasankar Bhattacharyya, ‘Aspects of Indian Economic History (1750-1950)’ (Kolkata: Progressive Publishers, 1980).

H. Tajfel, ‘Social Identity and Intergroup Relations’ (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).

Hemendra Prasad Ghose, ‘The Famine of 1770’ (Calcutta: The Book Company Ltd., 1943).

Homi Bhabha, ‘The Location of Culture’, (London: Routeledge, 1994).

Henry Yule and C. A. Burnell, ‘Hobson-Jobson: The Definitive Glossary of British India’ (Oxford: Oxford University Press, 2015).

Ipshita Nath, ‘Memsahibs: British Women in Colonial India’ (London: C. Hurst & Co. Publishers, 2022).

Jairas Banaji, ‘A Brief History of Commercial Capitalism’ (Chicago, Illinois: Haymarket Books, 2020).

James A. Millword, ‘The Silk Road: A Very Short Introduction’ (Oxford, New York: Oxford University Press, 2013).

Jacob Burckhardt, ‘The Civilization of the Renaissance in Italy’ (London: Phaidon Press,1955, originally published in 1860).

Jamila Brij Bhushan, ‘The Costumes & Textiles of India’ (Bombay: Taraporevala’s Treasure House of Books, 1958).

Jennifer Craik, ‘The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion’ (London, New York: Routledge, 1993).

K. N. Chaudhuri, ‘Trading World of Asia and the English East India Company’ (Cambridge University Press, 1978).

Katie Hickman, ‘Courtesans: Money, Sex and Fame in Nineteenth Century’ (London: William Morrow, 2003).

Katie Hickman, ‘She-Merchants, Buccaneers & Gentlewomen’, (London: Vergo, 2020).

Lata Mani, ‘Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India’ (California: University of California Press, 1998).

Laura F. Edwards, ‘Only the Clothes on Her Back: Clothing and Hidden History of Power in Nineteenth-Century United States’, (New York: Oxford University Press, 2022).

Lisa Trivedi, ‘Clothing Gandhi’s Nation: Homespun and Modern India’, (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2007).

Margaret Maynard, ‘Fashioned from Penury: Dress as Cultural Practice in Colonial Australia’ (Cambridge University Press, 1994).

Marie Fourcade & Ines G. Zupanow ed., ‘L’INDE DES LUMIERES: Discours, histoire, saviors (XVIIe – XIXe siècle)’, (Paris: Editions de l’Ecole des hautes etudes en Sciences Sociales, Published in Open edition 16 September 2020).

Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, ‘Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments’, Edited by Gunzellin Schmid Noerr, translated by Edmund Jephcott, (Stanford, California: Stanford University Press, 2002).

Martand Singh edited, Rita Kapur Chisti compiled, ‘Bihar & West Bengal: Saris of India’ (New Delhi, Bangalore: Wiley Eastern Ltd.).

Meredith Borthwick, ‘The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905’ (Princeton: Princeton University Press, 1984).

Maroona Murmu, ‘Words of Her Own: Women Author’s in Neneteenth-Century Bengal’ (New Delhi: Oxford University Press, 2020).

M. K. A. Siddiqui, ‘Muslims of Calcutta: A Study in Aspects of Their Social Organisation’ (Kolkata: Anthropological Survey of India, June 2005).

Mrinalini Sinha, ‘Colonial Masculinity: The ‘Manly Englishman’ and the ‘Effiminate Bengali’ in the Late Nineteenth Century’ (New York, Manchester: Manchester University Press, 1995).

Mina Roces and Louise Edwards ed., ‘The Politics of Dress in Asia and the Americas’ (Brington & Portland: Sussex Academic Press, 2007).

Mimasha Pandit, ‘Performing Nationhood: The Emotional Roots of Swadeshi Nationhood in Bengal, 1905-12’ (New Delhi: Oxford University Press, 2019).

Michael Carter ed., ‘Fashion Classics: From Carlyle to Barthes’ (Oxford, New York: Berg, 2003).

Nirad C. Chaudhuri, ‘Culture in the Vanity Bag’ (Mumbai: JAICO Publishing House, 2009).

Norbert Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations, translated by Edmund Jephcott, (Oxford: Blackwell Publishing, 2000).

P. J. Marshall, ‘Bengal: The British Bridgehead’ (Cambridge University Press, 1987).

Peter McNeil ed., ‘A Cultural History of Dress and Fashion in the Age of Enlightenment’ (London, Oxford: Bloomsbury, 2017).

Peter Linebough, ‘The London Hanged: Crime and Civil Society in Eighteenth-century’ (London: Verso, 2003).

Peter Gonsalves, ‘Clothing for Liberation: A Communication Analysis for Gandhi’s Swadeshi Revolution’ (Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publication, 2010).

Peter Corrigan, ‘The Dressed Society: Clothing, the Body, and Some Meanings of the World’ (Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications, 2008).

Pierre Bourdieu, ‘Masculine Domination,’ Richard Nice trans. (Stanford, California: Stanford University Press, 2001).

Pierre Bourdieu, ‘The Logic of Practice’ (Stanford: Stanford University Press, 1992).

Pierre Bourdieu, ‘Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste’, translated by Richard Nice, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 8th Print, 1996).

P. K. Mohanty, ‘Tropical Tasar Culture in India’ (Delhi: Daya Publishing House, 1998).
Ratnalekha Ray, ‘Change in Bengal Agrarian Society 1760-1850’ (New Delhi: Manohar, 1979).

Rajat Kanta Ray, ‘Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927’ (Delhi: Oxford University Press, 1984).

Ranajit Guha, ‘A Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement’ (Stosius Inc/Advent Books Division, 1982).

Ranabir Ray Choudhury, ‘Early Calcutta Advertisements 1875-1925’ (Bombay: Nachiketa Publication Ltd., 1992).

Raminder Kaur & William Mazzarella ed., ‘Censorship in South Asia: Cultural Regulation from Sedition to Seduction’, (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2009).

Richard M. Eaton, ‘Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760’ (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press).

Rosinka Chaudhuri, ‘Modernity at Home: A Genealogy of the Indian Drawing Room’ (Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences, January 2011).

Rosinka Chaudhuri, ‘Freedom and Beef Steaks: Colonial Calcutta Culture’, (New Delhi: Orient Blackswan, 2012).

R. Firth, ‘Themes in Economic Anthropology’ (London: Lavistock, 1967).

R. J. Peake, ‘Cotton: From the Raw Material to the Finished Product’ (London: Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., 1934).

Rosemarry Crill, ‘Chintz: Indian Textiles for the West’ (London: V&A Publications, 2008).

Romesh Dutt, ‘The Economic History of India: Under Early British Rule’ (London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 7th edition).

Sabyasachi Bhattacharya ed., ‘A Comprehensive History of Modern Bengal, 1700-1950, Vol. III’, (Delhi: The Asiatic Society & Primus Books, 2020).

Saloni Mathur, ‘India by Design: Colonial History and Cultural Display’ (Delhi: Orient Blackswan, 2011).

Samarpita Mitra, ‘Periodicals, Readers and the Making of Modern Literary Culture: Bengal at the Turn of the Twentieth Century’ (Leiden, Boston: Brill, 2020).

Sarmistha De, ‘Marginal Europeans in Colonial India; 1860-1920’ (Kolkata: Thema, 2008).

Sirajul Islam, 'The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation 1790-1819' (Dacca: Bangla Academy, 1979).

Sheldon Stryker, 'Symbolic Interaction: A Social Structural Version' (Menlo Park: Benjamin Cummings Publishing Company, 1980).

Sudit Krishna Kumar and Suvobrata Sarkar edited, 'Contextualizing the Body: An Indian Experience' (Delhi: Manohar, 2021).

Sushil Chaudhury, 'From Prosperity to Decline: 18th century Bengal' (New Delhi: Manohar, 1995).

Suchitra Choudhury, 'Textile Orientalisms: Cashmere and Paisley Shawls in British Literature and Culture' (Athens: Ohio University Press, 2023).

Sukanta Chaudhuri edited, 'Calcutta: The Living City, Vol. 1, The Past' (New Delhi: Oxford University Press, December 1990).

Sumanta Banerjee, 'Under the Raj: Prostitution in Colonial Bengal' (New York: Monthly Review Press, 1998).

Sumit Sarkar & Tanika Sarkar ed., 'Social Reform in Modern India: A Reader' (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2008).

Sumit Sarkar, 'Swadeshi Movement in Bengal1903-1908' (New Delhi: People's Publishing House, 1973).

Sumathi Ramaswamy, 'The Goddess and the Nation: Mapping Mother India' (Durham & London: Duke University Press, 2010).

Sir John Woodroffe, 'Is India Civilized? Essays on Indian Culture' (Madras: Ganesh & Co. Publishers, 1922),

Sven Beckert, 'Empire of Cotton: A New History of Global Capitalism' (Penguin Books, 2015).
Tanika Sarkar, 'Hindu Wife, Hindu Nation: Community, Religion, and Cultural Nationalism' (Delhi: Permanent Black, 2001).

Tanika Sarkar, 'Bengal 1928-1934: The Politics of Protest' (Delhi: Oxford University Press, 1987).

T. G. P. Spear, ‘The Nabobs: A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India’ (London: Humphrey Milford & Oxford University Press, 1932).

Theon Wilkinson, ‘Two Monsoons’ (London: Duckworth, 1967).

‘The Encyclopedia of India’, Vol. III, (Calcutta: The Cyclopedia Publishing Co., 1909).

Thomas Foster, Carol Siegel and Ellen E. Berry ed., ‘Bodies of Writing, Bodies of Performance’ (New York, London: New York University Press, 1996).

Tirthankar Ray, ‘Cloth and Commerce: Textiles in Colonial India’ (New Delhi: Sage Publications, 1996).

Tirthankar Roy, ‘The Crafts and Capitalism: Handloom Weaving Industry in Colonial India’ (London, New York: Routledge, 2020).

Toolika Gupta, ‘The Birth of Sherwani: The Influence of British Rule on Elite Indian Menswear’ (New Delhi: South Asian Press, 2022).

Uma Dasgupta edited, ‘The World of Indian Ocean Merchant 1500-1800’ (New Delhi: Oxford University Press, 2005).

Utsa Ray, ‘Culinary Culture in Colonial India’ (New Delhi: Cambridge University Press, 2015).

Vivienne Richmond, ‘Clothing the Poor in Nineteenth-Century England’ (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

W. H. Moreland, ‘From Akbar to Jahangir: A Study in Indian Rconomic History’ (London: Macmillan, 1923).

William Dalrymple, ‘White Mughal’ (Penguin Books, 2002).

William Dalrymple edited, ‘Forgotten Masters: Indian Painting for the East India Company’ (London: Philip Wilson Publishers, 2019).

Windy Parkins ed., ‘Fashioning the Body-politic: Dress, Gender and Citizenship’ (Oxford, New York: Berg, 2002).

Xinru Liu, ‘The Silk Road in World History’ (Oxford, New York: Oxford University Press, 2010).

Xinru Liu, ‘Silk and Religion: An Exploration of Material Life and the Thought of People’ (New Delhi: Oxford University Press, 1996).

খ.৩: প্রবন্ধ

বাংলা

সুমিত কান্তি ঘোষ, ‘ ‘পাগড়ি হঠাও’: শরীর, পোশাক ও ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক পরিচালন’, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* সংখ্যা ২৬, ২০২১, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১-১৪।

সুমিত কান্তি ঘোষ, ‘পুজোর আমোদ, কেনাকাটা ও ক্ষমতারঃ ঔপনিবেশিক কলকাতায় দুর্গাপূজা এবং বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের শ্রেণিচেতনা’, *ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০২০, পৃ ৬০-৭৯।

ইংরেজি

Abigail McGowan, ‘ “khadi” Custains and “Swadeshi” Bed Covers: Textiles and Changing Possibilities of Home in Western India, 1900-1960’, *Modern Asian Studies*, vol. 50, no. 2, March 2016, pp. 518-563.

Ariane Fennetaux, ‘‘Indian Gowns Small and Great’: Chintz Banyans Ready Made in the Coromondel, c. 1680 – c. 1780’, *Costume*, Vol. 55, No. 1, 2021, pp. 49-73.

Beverly Lemire, Giorgio Riello, ‘East and West: Textiles and Fashion in Early Modern Europe’, *Journal of Social History*, Vol. 41, No. 4, 2008, pp. 887-916

Brandon Brame Fortune, ‘”Studious Men are Always Painted in Gowns”: Charles Willson Peale’s Benjamin Rush and the Question of Banyans in Eighteenth-Century Anglo-American Portraiture’, *Dress*, Vol. 29, No. 1, 2013, pp. 27-40.

Christine Furedy, ‘Development of Modern Elite Retailing in Calcutta, 1880-1920’, *The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XVI, No. 4.

David M. Higgins, Aashish Velkar, ‘“Spinning a Yarn”: Institutions, Law, and Standards c. 1880-1914’, *Enterprise & Society*, Vol. 18, No. 3, September, 2017, pp. 591-631.

Himani Banerjee, ‘Textile Prison: Discourse on Shame (Lajja) in the Attire of Gentlewomen (Bhadramahila) in Colonial Bengal’; *The Canadian Journal of Sociology,* Spring, 1994, vol.19, No. 2, Special Issue on Moral Regulation; p.170

J. S. Toms, ‘Growth, Profits and Technological Choice: The Case of the Lancashire Cotton Textile Industry’, *Journal of Industrial History,* Vol. I, No. I, 1998, pp. 35-55.

Jan E. Stets and Peter Burke, ‘Identity Theory and Social Identity’, *Social Psychology Quarterly,* Vol. 63, No. 2, September 2000, pp. 224-237.

Jayne Shrimpton, ‘Dressing for the Tropical Climate: The Role of Native Fabrics in Fashionable Dress in Early Colonial India’, *Textile History*, Vol. 23, No. 1, pp. 55-70.

K. K. P. Johnson, N. Schofield, and J. Yurchisin, ‘Appearance as a source of information: a qualitative approach to data collection’, *Clothing and Textiles Research Journal*, Vol. 20, No. 3, 2002, pp. 125-37.

K.N. Panikkar, ‘The ‘Great’ Shoe Question: Tradition, Legitimacy and Power in Colonial India’, *Studies in History,* Vol. 14, No. 1, n.s. 1998, SAGE Publication, pp. 21-36.

M. E. Roach-Higgins and J. B. Eicher, ‘Dress and identity’, *Clothing and Textiles Research Journal*, Vol. 10 No. 4, 1992, pp. 1-8.

Monica Sklar, Kim K. P. Johnson, ‘Men at Work: Using Dress to Communicate Identities’, *Journal of Fashion Marketing and Management*, Vo. 15, Issue 4, September 2011, pp. 412-427.

Neil Howlett, Karen Pine, Ismail Orakcioglu, Ben Fletcher, ‘The Influence of Clothing on First Impressions: Rapid and Positive Responses to Minor Changes in Male Attire’, *Journal of Fashion Marketing and Management,* Vol. 17, No. 1, 2013, pp. 38-48.

Patricia A. Cunninghum, ‘Eighteenth Century Nightgowns: The Gentleman’s Robe in Art and Fashion’, *Dress,* Vol. 10, No. 1, 2013, pp. 2-11.

Pramod K. Nayar, ‘Marvelous Excesses: English Travel Writing and India, 1608-1727’, *Journal of British Studies,* Vol. 44, No. 2, April 2005, pp. 213-238.

Pramod K. Nayar, ‘The Colonial Home: Managing Objects and Servants in India’, *Anglo Saxonica*, Vol. 17, Issue 1, 2020, pp. 1-9.

Robert Travers, ‘Death and the Nabob: Death and the Commemoration in Eighteenth-century India’, *Past & Present,* No. 196, August 2007, pp. 83-124.

Ryan Johnson, 'European Cloth and "Tropical" Skin: Clothing Material and British Ideas of Health and Hygiene in Tropical Climates', *Bulletin of the History of Medicine'*, Vol. 83, Number 3, Fall 2009, pp. 530-560.

Sheldon Stryker, and P. J. Burke, 'The past, present, and future of an identity theory', *Social Psychology Quarterly*, Vol. 63 No. 4, 2000, pp. 284-297.

Susan North, 'Indian Gowns and Banyans – New Evidence and Perspectives', *Costume*, Vol. 54, Issue 1, 2020, pp. 30-55.

Sumit Kanti Ghosh, 'Body, Dress, and Symbolic Capital: Multifaceted Presentation of PUGREE in Colonial Governance of British India', *Textile*, pp. 1-32, https://doi.org/10.1080/14759756.2023.2208502

Sylvia Houghteling, 'The Emperor's Humbler Clothes: Textures of Courtly Dress in Seventeenth-century South Asia', *Ars Orientalis*, Vol. 47, 2017, pp. 91-116.

Tara Mayer, 'From Craft to Couture: Contemporary Indian Fashion in Historical Perspective', *South Asian Popular Culture*, Vol. 16, Issue 2-3, 2018, pp. 183-198.

খ.৪: অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

বাংলা

অনসূয়া বাগচী, 'ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে – নারীর পোশাকের বিবর্তন', পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,২০১৩।

ইংরেজি

Alexis Wearmouth, 'Thomas Duff & Co. and the Jute Industry in Calcutta, 1870-1921: Managing Agents and Firm Strategy', Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Dunbee, 2015.

Cecilia Yu Sen Leong-Salobir, 'A Taste of Empire. Food, the Colonial Kitchen and the Representation and the Role of Servants in India, Malaysia and Singapore, c. 1858-1963', Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Western Australia, 2009.

Humaira Chowdhury, ‘A Social and Economic History of Darzis (Muslim Tailors) in Calcutta, c. 1890-1967’, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Cambridge, 2022.

Joanne Lea Taylor, ‘The Great Houses of Kolkata 1750-2006’, (Thesis submitted in requirements for the Degree of Master of Built Environment by Research, University of New South Wales, 2008).

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে ডক্টরেট (Ph.D) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের **সারাংশ**

সুমিত কান্তি ঘোষ

পিএইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0101417

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ২৯/১১/২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক: ড. উৎসা রায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি, ১৮৫০-১৯২০

ঔপনিবেশিক শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভারতীয় বা আরও বিশেষভাবে বাংলা দেশের পোশাকি অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হয় শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধটি। প্রথমেই আসি শরীরের কথায়। সামাজিক শরীর পারিবারিক, সামাজিক, লৈঙ্গিক, এবং আরও বৃহত্তরভাবে রাষ্ট্রীয় নানান বিধাণ বয়ে চলে। নানান ভৌগোলিক পরিসরে, নানান ভাষা, ধর্ম, পারিবারিক বোধ, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহে জন্ম নেওয়া মানুষ উত্তরাধিকারজাত সংস্কৃতিকে বহন করে। পরে কালের নিয়মে পরিণত হতে হতে শিশুর শরীর যতই সামাজিকতার নানা স্তর অতিক্রম করতে থাকে, ততই অর্জিত শিক্ষা ও কালীন স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সেই উত্তরাধিকারজাত সংস্কৃতিতে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রকট হয় তার চাল-চলনের মাধ্যমে। সেদিক থেকে ব্যক্তির সামাজিক শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, তার সামাজিক অস্তিত্বকেই নানা ভাবে তুলে ধরে। খৎনা করা থেকে নাক-কান ছিদ্র করা বা শরীরের নানা অঙ্গে উল্কি আঁকা থেকে চুল দাড়ির নানান ধরণ সবেতেই ব্যক্তির সামাজিক, লৈঙ্গিক, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য জানান দেওয়ার তাগিদ কাজ করতে থাকে। আর ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বর্ণীয়, রুচিজ অবস্থানকে জানান দেওয়ায় সবচাইতে যে ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হল পোশাক। Roach-Higgins & Eicher-এর মতে পোশাক হল "an assemblage of modifications of the body and/or supplements to the body" অর্থাৎ পোশাক হল শরীরের সংশোধনীর সমাবেশ এবং/ অথবা শরীরের সম্পূরক। এই সংশোধন ও সম্পূরণের তাগিদ অবশ্যই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। তাই জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের শরীর সামাজিকতার নানামুখীন ভাষ্য তৈরির একটি ক্ষেত্র। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে কোনো ভূখণ্ডের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিকে নিয়ে কাঠামোবদ্ধ, সেখানে সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শরীর যে ক্ষমতানুগত্যকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হবে – তাই স্বাভাবিক। আর এই আনুগত্যপ্রিয়তা ও অনুগামিতার মনস্তত্ব মানুষের নিত্যকার পোশাকি অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে। Brian J. McVeigh-এর মতে, এই মনস্তত্ব সহজাত নয়। কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে জন্ম নেওয়া শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সাথে এই মনস্তত্বের বিকাশ হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে স্থান-কাল-পাত্রের কার্য-কারণাধীন পরিসরে জন্ম নেওয়া শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে পোশাকি বিকাশ ঘটতে থাকে তা তার সামাজিক অর্জন।

সামাজিক পরিসরের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় দেহের ব্যক্তিত্বে রূপান্তরণের প্রক্রিয়ায়, সমাজ হল বর্দিউ-বর্ণীত সেই ক্ষেত্র, যার সংস্পর্শে এসে জৈব দেহ কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আচার-বিচার, প্রথা-কৃষ্টি-ভাষায় বিজারিত হয়। আবার কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে উদ্ভুত নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও সেই ভূখণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচলনকে প্রভাবিত করতে থাকে;

এবং নতুন সামাজিক আচার-বিচারের অনুশীলনকে ত্বরান্বিত করে নতুন অভ্যাসের প্রতিষ্ঠান বা ‘habitus’-এর বিকাশ ঘটায়।

আমাদের আলোচ্য সন্দর্ভে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাড়িত নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ফল। যে ক্ষেত্রের উদ্ভব নতুন শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচারকে ত্বরান্বিত করে এবং তারই ফলে নতুন দেহ-রাজনীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। যে দেহ-রাজনীতি মধ্যযুগীয় দেহ-রাজনীতি থেকে ভিন্ন। যার মূল কারণ হল পাশ্চাত্য বাজার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশেলে যুক্তি-বুদ্ধি-রুচির নতুন ঢেউ। সেই যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি প্রভাবিত শ্রেণি পরিচিতিও বর্ণ ও ধর্ম বিভাজিত বাংলা দেশে আরেকটি স্বতন্ত্র বিভাজন হিসেবে প্রকট হয়। আর সেই বিভাজনের দৃশ্যমান ভিত্তি হিসেবে উঠে আসে পোশাক। নতুন পোশাকি শিষ্টাচার। সুতরাং এই সন্দর্ভের মূল বিবেচ্য প্রশ্নটি হল, বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের শ্রেণি পরিসরের সংগঠনে পোশাকি রুচিকে কিভাবে সামাজিক পুঁজি, লিঙ্গ, ক্ষমতা ও জাতিত্বের সূচক হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়? এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত পুরুষের পোশাকি-রুচি বিষয়ে কেন সন্দর্ভটি সীমাবদ্ধ থাকছে। তা আগে পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বৃহত্তর অর্থে ঘরের সাথে বাইরের সম্পর্ক রক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পুরুষেরাই পালন করেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদের আদি অভিঘাত এসে পড়েছে পুরুষের উপর। তা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে হোক, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হোক বা সামাজিক আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে। তাই পুরুষকে এই আলোচনার কেন্দ্রে বসিয়ে আলোচনাটা জরুরি।

এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় **ঔপনিবেশিক বাংলায় পোশাকি রুচির পরিবর্তন: বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয় ও বিলিতি উদ্যোগের সাপেক্ষে**-এর মূল বিবেচ্য প্রশ্নটি হল ভারত তথা বাংলা দেশের প্রাগৌপনিবেশিক বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ব্রিটিশ সময়কালে এসে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং সেই পরিবর্তন এদেশীয় বস্ত্র-রুচিকে কিভাবে পালটে দিয়েছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের রুচি-নির্ভর ভিত্তিটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল – তা দেখাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় **শরীর, পোশাক, এবং ক্ষমতা: ঔপনিবেশিক কলিকাতায় বিলিতি পোশাকি রুচি ও রাজনীতি**-এর মূল প্রশ্নটি হল ভারতীয় উপমহাদেশে বিলিতি সাম্রাজ্যবাদের পোশাকি ভিত্তি কিভাবে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বিলিতি সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতার দৃশ্যমান ভিত্তি হিসেবে পোশাককে কিভাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেই ব্যবহারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল কিভাবে, যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপের উপর ভিত্তি করে স্বদেশির আগে পর্যন্ত এদেশীয় মধ্যবিত্তীয় পুরুষের শ্রেণি চেতনা বিবর্তিত হবে।

সন্দর্ভটির তৃতীয় অধ্যায় **শরীর, পোশাক, এবং রাষ্ট্র: বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকুরে পুরুষ ও তার সামাজিক পরিসরের পোশাকি নির্মিতি**-এর মূল আলোচ্য প্রশ্নটি হল পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ততার পোশাকি দ্বন্দ্বের জায়গাগুলি কি।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ড্রেস কোডে মুঘলী শৈলীর পোশাক পরার বিধাণ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচি মধ্যবিত্ত পুরুষের দেহকে কিভাবে দ্বন্দ্বের একটা ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে কিভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বীজ উপ্ত হচ্ছিল।

সর্বোপরি নতুন শিক্ষা ও নতুন বাজার পোশাকি লজ্জা ও পোশাকি সম্ভ্রমের বিনির্মাণ ঘটিয়ে কিভাবে মধ্যবিত্ততার পোশাকি পরিসর গড়ে তুলছিল তা আলোচিত হবে চতুর্থ অধ্যায় **শরীর, পোশাক ও লজ্জা: মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক সম্ভ্রমের পোশাকি নির্মিতি**-তে। আর এই আলোচনাটি শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত পুরুষের সামাজিক পরিসরেই আটকে থাকবে না, তার পারিবারিক পরিসরও এখানে টেনে আনা হবে। অর্থাৎ পরিবারের মেয়ে-বউদের লেখা-পড়া শেখানো থেকে তাদের "এনলাইটেন্ড" স্বামী বহনের সার্বিক উপযোগী করে তোলার মধ্য দিয়ে যে আসলে মধ্যবিত্ত পুরুষ তার স্বাতন্ত্র্যের অলঙ্করণে নেমেছিল – তাও এই আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসবে।

পঞ্চম অধ্যায় **শরীর, পোশাক ও রাষ্ট্র: পোশাকি স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার নির্মাণ**-এর মূল আলোচ্য প্রশ্ন হল স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তীয় পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের তাগিদ কিভাবে বৃহত্তর একটা ক্ষেত্র লাভ করেছিল এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একই সাথে অপরীকরণের শক্তি কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, বা সেই অপরীকরণ রোধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগিদই বা কেমন ছিল।

এ সন্দর্ভের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন নির্ভর যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে আর্কাইভটি গড়ে উঠেছে সেটি নানামুখীন। অর্থাৎ শরীর ও পোশাকের রাজনৈতিক সম্বন্ধকে বুঝতে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা থেকে আহরিত দলিল-দস্তাবেজ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি অন্যদিকে শরীর ও পোশাকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধকে বুঝতে আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথা থেকে শুরু করে চিঠিপত্র, আলোকচিত্র এবং সমকালীন সাহিত্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার শরীর ও পোশাকের বাজারি সম্বন্ধকে বোঝানোর জন্য সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এসব বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরিত তথ্যসম্ভার বৃহত্তরভাবে যা তুলে ধরতে চেয়েছে, তা হল বাঙালি মধ্যবিত্ততার পোশাকি স্বরূপ। যে স্বরূপটি আধুনিকতার নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের একটা মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছে।

Urna Ray 10/10/23
Signature of the Supervisor

Sumit Kanti Ghosh 10/10/23
Signature of the Candidate

ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF HISTORY
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700 032